তলস্তয় উপন্যাসসমগ্র

(তৃতীয় খণ্ড)

অনুবাদ

মণীন্দ্র দত্ত

তুলি-কলম

১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ ১৩৬৬

প্রকাশক : কল্যাণব্রত দত্ত ॥ তুলি-কলম ॥
১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

মুদ্রক : নলিনীকান্ত প্রামাণিক ॥ কণ্টাই প্রেস ॥
২৪৪/২ মানিকতলা মেইন রোড, কলকাতা-৫৪

প্রচ্ছদ : সত্য চক্রবর্তী

সূচীপত্র

TOLSTOY UPANYAS SAMAGRA

Vol. III

Translated by Manindra Dutta

Price Rupees Forty only.
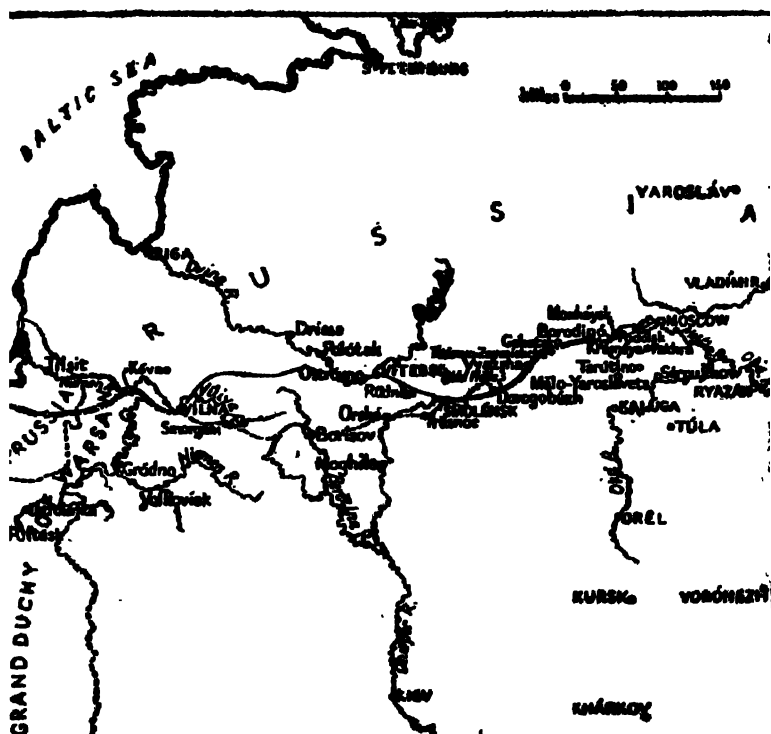
॥ প্রকাশকের নিবেদন ॥

"তলস্তয় উপন্যাস সমগ্র"-এর তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল। এ খণ্ডে সন্নিবেশিত হল War and Peace (সংগ্রাম ও শান্তি)-এর অবশিষ্ট খণ্ডগুলি ও দুটি দীর্ঘ পরিশিষ্ট। তাছাড়া এ খণ্ডে আছে The Kreutzer Sonata, The Cossacks এবং একটি অসমাপ্ত উপন্যাসের প্রথমাংশ Landlord's Morning-এর পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ।

War and Peace-এর মত সুদীর্ঘ কলেবর, অসংখ্য বিচিত্র চরিত্র ও ঘটনাপরিকীর্ণ কাহিনী, এবং ইতিহাস ও যুদ্ধের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ও তথ্য-সম্বলিত রচনার পূর্ণাঙ্গ ভাষান্তর স্বভাবতই অত্যন্ত কঠিন ও শ্রমসাধ্য কাজ। আলোচ্য গ্রন্থমালার ভাষান্তরিক সেবিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন থেকে অসাধারণ নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে তাঁর কর্তব্য পালন করেছেন। ফলাফলের বিচারের ভার সাহিত্য-রসিক পাঠকসমাজের।

—কল্যাণব্রত দত্ত
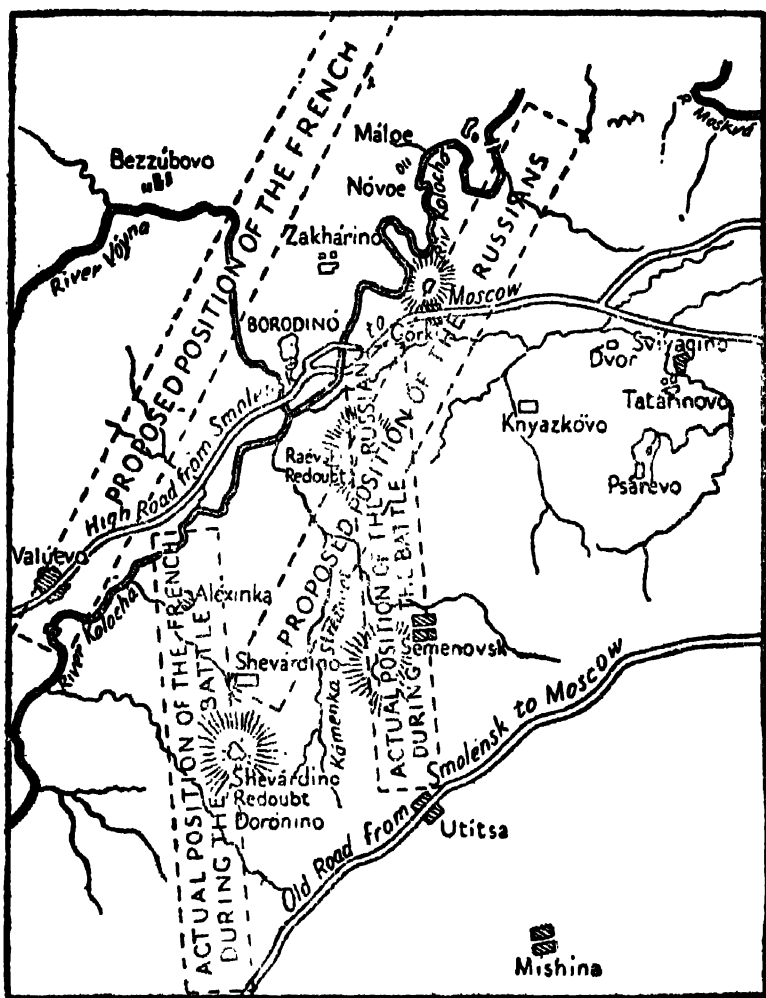
বরদিনো যুদ্ধের মানচিত্র

(দ্বিতীয় খণ্ড দশম পর্ব, অধ্যায়—১৯)

"সংগ্রাম ও শান্তি" প্রসঙ্গে তলস্তয়-দুহিতা আলেক্সান্দ্রা তলস্তয়

Some of the characters of War and Peace partly resembled members of the Tolstoy family: Prince Bolkonsky—Volkonsky—his grandfather on his mother's side, a man of great pride who never beat his head before the strong and powerful; old Count Rostov—Tolstoy's grandfather, a kindhearted and jolly man who squandered his property and married the wealthy Princess Marie Volkonsky—Tolstoy's mother A great many traits in Natasha Rostova were taken from Tolstoy's sister-in-law Tania Bers. She was pretty, merry, with a beautiful soprono voice and very attractive.

...War and Peace had an enormous success and is considered Tolstoy's greatest work.

প্রধান ঘটনাবলীর তারিখ

॥ দ্বিতীয় খণ্ড ॥

১৮১২

১লা সেপ্টেম্বর	...	কুতুজভের নির্দেশে মস্কো থেকে যাত্রা
৬ই অক্টোবর	...	তারুতিনোর যুদ্ধ
	...	ফরাসীদের মস্কো ত্যাগ
১২ই ,,	...	মালো-ইয়ারো স্লাভেতের যুদ্ধ
২১শে ,,	...	ভিয়াজ্‌মায় সংঘর্ষ
১৮শে ,, —		
২রা নভেম্বর	...	স্মোলেন্‌স্ক-এ ফরাসী বাহিনী
৪ঠা—৮ই ,,	...	ক্রাসনুর যুদ্ধ
৯ই ,,	...	সসৈন্যে নে-র ওর্শা আগমন
১৪ই—১৬ই ,,	...	বেরেজিনা অতিক্রম
২৬শে ,,	...	স্মোর্‌গনি থেকে নেপোলিয়নের যাত্রা
৬ই ডিসেম্বর	...	নেপোলিয়নের প্যারিসে প্রত্যাবর্তন

সংগ্রাম ও শান্তি

War and Peace

(শেষাংশ)

অধ্যায়—১২

সেদিন রাতে প্রিন্সেস মারি খোলা জানালার পাশে বসে অনেক সময় কাটিয়ে দিল। অনেক দূরের গ্রাম থেকে চাষীদের গলা কানে আসছে, কিন্তু তাদের কথা সে ভাবছে না। সে বুঝতে পেরেছে, যতই ভাবুক না কেন তাদের সে বুঝতে পারবে না। সে ভাবছে নিজের দুঃখের কথা। বর্তমান দুশ্চিন্তার ফলে সে দুঃখ যেন এখন অতীতের বস্তু হয়ে গেছে। এখন সে-কথা মনে করে সে কাঁদতে পারে, প্রার্থনাও করতে পারে।

সূর্যাস্তের পরে বাতাস পড়ে গেছে। রাতটা শান্ত ও সতেজ মনে হচ্ছে। মাঝ রাতের দিকে দূরাগত কণ্ঠস্বর থেমে গেল, মোরগের ডাক ভেসে এল, লেবু গাছের আড়াল থেকে ভরা চাঁদ দেখা দিল, একটা সাদা শিশিরভেজা কুয়াশা সবে উঠতে শুরু করেছে, সমস্ত গ্রাম ও বাড়িটার উপর নেমে এসেছে একটা শান্ত স্তব্ধতা।

নিকট অতীতের ছবিগুলি—বাবার অসুখ ও শেষ মুহূর্তগুলি—একের পর এক স্মৃতির পাতায় ভেসে উঠল। শোকাকুল আনন্দের সঙ্গে সেই সব ছবি সে দেখতে লাগল। শেষ ছবিটা তার মনকে আঘাত করল—বাবার মৃত্যুর ছবি; মনে হল, রাতের এই কুয়াশাচ্ছন্ন স্তব্ধ মুহূর্তে কল্পনায়ও সে ছবি সে আঁকতে পারত না। ছবিগুলি এখন এত স্পষ্ট হয়ে তার কাছে দেখা দিল যে সেগুলিকে কখনও মনে হয় বর্তমানের। কখনও অতীতের, আবার কখনও ভবিষ্যতের।

প্রথম স্ট্রোকের মুহূর্তটা স্পষ্টভাবে তার মনে পড়ল। বল্ড হিলসের বাগানের পথ দিয়ে সকলে তাকে ধরাধরি করে নিয়ে আসছে, অসহায় জিভটা নেড়ে বিড়বিড় করে কি যেন বলছে, পাকা ভুরু দুটি কুঁচকে গেছে, অস্বস্তি ও ভয়ের সঙ্গে তার দিকেই তাকিয়ে আছে।

সে ভাবতে লাগল, "মৃত্যুর দিন বাবা আমাকে যেকথা বলেছিল সেই-দিনও সেই কথাটাই বলতে চেয়েছিল। সেই কথাই সে বরাবর ভেবে এসেছে।" সেরাতে সে ঘুমোতে পারে নি, পা টিপে টিপে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গিয়েছিল, দরজার পাশে দাঁড়িয়ে কান পেতেছিল। যন্ত্রণা-কাতর ক্লান্ত গলায় তিখনের সঙ্গে কথা বলছিল, বলছিল ক্রিমিয়া ও তার আতপ্ত রাতের কথা, সাম্রাজ্ঞীর কথা। তাকে বুঝি কথায় পেয়েছিল। "তাহলে কেন আমাকে ডাকল না? তিখনের বদলে আমাকে কেন ঘরে ঢুকতে দিল না?" এই কথাটা প্রিন্সেস মারি অনেকবার ভেবেছে, এখনও ভাবল। "তার মনের মধ্যে যেকথা ছিল তা তো এখন আর কাউকে বলতে পারবে না। যেকথা সে বলতে চেয়েছিল সেকথা বলবার মুহূর্তটি তো তার বা আমার জীবনে আর কোনদিন আসবে না; তিখন পারে নি, কিন্তু আমি তো তার কথা শুনতে পারতাম, বুঝতে পারতাম। তাহলে কেন আমি ঘরে ঢুকলাম না? "মৃত্যুর দিন যেকথা আমাকে বলেছিল,

হয়তো সেইদিনই সেকথা আমাকে বলত। তিখনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে দুবার সে আমার কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। সে আমাকে দেখতে চেয়েছিল, অথচ দরজার বাইরে কত কাছে আমি দাঁড়িয়েছিলাম। মনে পড়ছে, লিজা সম্পর্কে বাবা এমনভাবে কথা বলছিল যেন সে বেঁচে আছে—সে যে মরে গেছে সেকথা বাবা ভুলেই গিয়েছিল—তিখন্ যখন মনে করিয়ে দিল যে লিজা বেঁচে নেই সে তখন চেঁচিয়ে বলেছিল, 'মূর্খ!' তার খুব কষ্ট হয়েছিল। দরজার পিছন থেকে আমি শুনতে পেলাম একটা আর্তনাদ করে বিছানায় শুয়ে পড়ে সে চেঁচিয়ে বলেছিল 'হা ঈশ্বর!' কেন তখন ভিতরে গেলাম না? গেলে বাবা আমার কি করত? কি হারাতাম আমি? হয় তো বাবা সান্ত্বনা পেত, সেই কথাটা আমাকে বলত।" "সোনা আমার"—বাবার সেই আদরের কথাটা উচ্চারণ করে প্রিন্সেস মারি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। চোখের জলে তার মন কিছুটা শান্ত হল। বাবার মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। শিশুকাল থেকে যে মুখ সে চিনেছে, যে মুখ সে দেখেছে দূর থেকে সে-মুখ নয়, এই সেই ভীরু, দুর্বল মুখ যা সে সেইদিন প্রথম দেখেছিল খুব কাছে থেকে যেদিন তার কথাটা বুঝবার জন্য সে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল বাবার মুখের উপর।

"সোনা আমার," কথাটা সে আর একবার বলল।

"এই কথাটা বলবার সময় বাবা কি ভাবছিল? এখনই বা সে কি ভাবছে?" প্রশ্নটা হঠাৎই তার মনে এল, আর ঠিক তার জবাবেই সে যেন চোখের সামনে বাবাকে দেখতে পেল—সাদা রুমাল দিয়ে থুত্‌নি বাঁধা অবস্থায় শবাধারে শুয়ে তার মুখে যে ভাব ফুটে উঠেছিল ঠিক সেই ভাব নিয়ে। তখন যে ভয় তাকে পেয়ে বসেছিল এখনও সেই ভয় আবার তাকে চেপে ধরল। অন্য কিছু ভাববার ও প্রার্থনা করবার চেষ্টা সে করল, কিন্তু কোনটাই করতে পারল না। দুই বিস্ফারিত চোখ মেলে চাঁদের আলো ও ছায়ার দিকে তাকিয়ে রইল; প্রতিটি মুহূর্তেই মনে আশা যে বাবার সেই মৃত মুখটা দেখতে পাবে। তার মনে হতে লাগল, যে নিস্তব্ধতা বাড়িটার বাইরে ও ভিতরে ছড়িয়ে আছে তা যেন তাকেও চেপে ধরেছে।

ফিস্ ফিস্ করে ডাকল, "দুনিয়াশা।" আর্তনাদ করে বলল, "দুনিয়াশা!" তারপর সেই নিস্তব্ধতাকে ছিঁড়ে ফেলে ছুটে গেল চাকরদের মহলে বুড়ি নার্স ও দাসীদের সঙ্গে দেখা করতে; তারাও ছুটে এল তার দিকে।

অধ্যায়—১৩

১৭ই অগস্ট তারিখে বন্দীদশা থেকে সদ্য খালাস পাওয়া লাভ্রুশ্‌কা ও একটি হুসার আর্দালিকে সঙ্গে নিয়ে রস্তভ ও ইলিন বোগুচারভো থেকে দশ মাইল দূরবর্তী ইয়াংকভোর আস্তানা থেকে ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়ল—ইলিন

যে নতুন ঘোড়াটা কিনেছে সেটাতেও চড়া হবে, আবার গ্রামে কিছু খড় পাওয়া যায় কি না সে খোঁজও করা হবে।

গত তিন দিন যাবৎ দুটি বিরুদ্ধ সেনাদলের মাঝখানে পড়ে বোগুচারভোর দিন কাটছে ; ফলে রুশ বাহিনীর পিছনের অংশ আর ফরাসী বাহিনীর অগ্রবর্তী অংশ দুইয়ের পক্ষেই সেখানে পৌঁছনো সমান সহজ ; তাই একজন সতর্ক স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডার হিসাবে রস্তভ ঠিক করেছে ফরাসীদের হাতে পড়বার আগেই সে বোগুচারভোর অবশিষ্ট রসদপত্র সংগ্রহ করে নেবে।

রস্তভ ও ইলিন বেশ খোস মেজাজে আছে। লাভ্রুশ্‌কাকে নেপোলিয়ন সম্পর্কে নানান প্রশ্ন করে তার গাল-গল্প শুনে হাসতে হাসতে তারা ইলিনের ঘোড়াটাকে পরীক্ষা করার জন্য দৌড়-প্রতিযোগিতা শুরু করে দিল।

রস্তভের কোন ধারণাই নেই যে তার বোনের সঙ্গে যে বল্‌কন্‌স্কির বিয়ের কথা হয়েছে তাদের গ্রাম ও জমিদারিতেই তারা ঢুকতে যাচ্ছে।

ইলিনকে মেরে দিয়ে রস্তভের ঘোড়াই গ্রামের পথে প্রথম পা ফেলল।

"তুমিই প্রথম," মুখ লাল করে ইলিন বলল।

"হ্যাঁ, সব সময়ই প্রথম—কি তৃণভূমিতে, কি এখানে," দোনেৎ-এর উত্তপ্ত পিঠে চাপড় দিতে দিতে রস্তভ বলল।

নিজের লোমশ গাড়ি-টানা ঘোড়াটাকে দেখিয়ে লাভ্রুশ্‌কা পিছন থেকে বলল, "আমার এই ফরাসিনীকে নিয়েই আমি জিততে পারতাম ইয়োর এক্সেলেন্সি, শুধু আপনি দুঃখ পাবেন বলেই তা করিনি।"

পায়ে হাঁটা গতিতে তারা গোলাবাড়িতে পৌঁছল ; সেখানে অনেক চাষী ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে।

কেউ কেউ মাথার টুপি খুলল, আবার অনেকে টুপি না খুলে নবাগতদের দেখতে লাগল। বলিরেখায় ভরা মুখ আর পাতলা দাঁড়িওয়ালা দুই ঢ্যাঙা বুড়ো সরাইখানা থেকে বেরিয়ে হাসতে হাসতে, টলতে টলতে, অসংলগ্ন গান গাইতে গাইতে অফিসারদের দিকে এগিয়ে গেল।

রস্তভ হেসে বলল, "খাসা লোক সব! এখানে কিছু খড় মিলবে কি?"

"দুটি যেন মাণিক-জোড়," ইলিন বলল।

খুশির হাসি হেসে একটি চাষী গেয়ে উঠল, "ব-ড় খু-শি-খুশি আ-জ…"

ভিড়ের ভিতর থেকে একজন রস্তভের দিকে এগিয়ে গেল।

বলল, "আপনারা কোন্ পক্ষের?"

ইলিন তামাশা করে বলল, "ফরাসীদের, আর ইনি স্বয়ং নেপোলিয়ন"—লাভ্রুশ্‌কাকে দেখিয়ে দিল।

"তাহলে আপনারা রুশ?" চাষীটি আবার শুধাল।

একটি বেঁটে লোক এগিয়ে গিয়ে বলল, "আপনাদের বেশ বড় একটা দল এখানে আছে তো?"

"খুব বড়," রস্তভ জবাব দিল। "কিন্তু তোমরা এখানে জড় হয়েছ কেন? আজ কি ছুটির দিন?"

চাষীটি যেতে যেতে বলল, "বুড়োরা সব কম্যুন নিয়ে কথা বলতে জড় হয়েছে।"

ঠিক সেইসময় বড় বাড়িটার রাস্তা ধরে দুটি স্ত্রীলোক ও সাদা টুপিধারী একটি পুরুষকে আসতে দেখা গেল।

দুনিয়াশকাকে তার দিকেই ছুটে আসতে দেখে ইলিন বলল, "যার পরনে পাটল রঙের পোশাক সেটি আমার, অতএব দূর হটো!"

"আমাদের সকলের," লাভ্রুশ্‌কা চোখ টিপে বলল।

ইলিন হেসে বলল, "তোমার কি চাই সুন্দরী?"

"প্রিন্সেস আপনাদের রেজিমেন্টের নাম ও আপনাদের নাম জানতে আমাকে পাঠিয়েছেন।"

"ইনি কাউন্ট রস্তভ, স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডার, আর আমি তোমার বশংবদ ভৃত্য।"

ইলিনের কথা শুনে স্বর্গীয় হাসি হেসে মাতাল চাষীটি জোর গলায় বলে উঠল, "কো—ম্পা—নি!" দুনিয়াশার পিছন থেকে আল্‌পাতিচ এগিয়ে এসে কিছুটা দূর থেকেই টুপিটা খুলে ফেলল।

বুকের ভিতরে একটা হাত ঢুকিয়ে তরুণ অফিসারটির প্রতি শ্রদ্ধা অথচ ঈষৎ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, "আপনাকে একটু বিরক্ত করছি ইয়োর অনার। এ মাসের ১৫ই তারিখে পরলোকগত জেনারেল-ইন-চিফ প্রিন্স নিকলাস বল্‌কন্‌স্কির কন্যা আমার বর্তমান মনিব এইসব লোকদের"—চাষীদের দেখিয়ে—"অভদ্রতায় বিপন্ন বোধ করে আপনাদের তার বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন।...আপনারা কি দয়া করে ঘোড়া নিয়ে আর একটু এগিয়ে...কারণ এই সব লোকদের সামনে..." ঘোড়ার গায়ে মাছির মত যে দুটি চাষী তার গায়ের কাছে এসে হাজির হয়েছে তাদের দেখিয়ে বলল।

খুশি মনে তার দিকে তাকিয়ে চাষীরা বলে উঠল, "আহা!...আল্‌পাতিচ ...আহা ইয়াকভ আল্‌পাতিচ...চমৎকার...খৃস্টের দোহাই, আমাদের ক্ষমা কর। কি বল?"

মাতাল চাষীদের দিকে তাকিয়ে রস্তভ হাসল।

আল্‌পাতিচ গম্ভীর মুখে বলল, "আপনি হয়তো ওদের দেখে একটু মজা পাচ্ছেন ইয়োর অনার?"

"না, এখানে মজা পাবার মত কিছু নেই। কিন্তু ব্যাপারটা কি?" রস্তভ বলল।

"যদি অভয় দেন তো বলি, এই দুষ্ট চাষীরা আমাদের কর্ত্রীকে জমিদারি থেকে চলে যেতে দিচ্ছে না, গাড়ি থেকে ঘোড়া খুলে নেবে বলে ভয়

দেখাচ্ছে; তাই সকাল থেকে মালপত্র গাড়িতে বোঝাই করেও হার্ এল্পেলেজ্জি বাড়ি থেকে বের হতে পারছে না।"

"অসম্ভব!" রস্তভ চেঁচিয়ে বলল।

"আমি সত্যি কথাই বলছি," আলপাতিচ বলল।

রস্তভ ঘোড়া থেকে নেমে ঘোড়ার ভার আর্দালির হাতে দিয়ে আল-পাতিচের পিছন পিছন বাড়িটার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে সমস্ত ব্যাপারটা জেনে নিল। দ্রোণ শেষ পর্যন্ত চাবির গোছা ফেরৎ দিয়ে চাষীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে, আলপাতিচ ডেকে পাঠানো সত্বেও আসে নি, এবং সকালে প্রিন্সেস যাত্রার জন্য তৈরি হলে চাষীরা সদলবলে গোলাবাড়িতে এসে খবর পাঠিয়েছে যে প্রিন্সেসকে যেতে দেওয়া হবে না: গ্রাম ছেড়ে না যাবার হুকুম এসেছে, তাই তারা গাড়ি থেকে ঘোড়া খুলে নেবে। আলপাতিচ তাদের বকুনি দিতে বেরিয়ে এলে তাকেও স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে (ভিড়ের মধ্যে দ্রোণকে দেখা যায় নি, কথাবার্তা বলেছে মূলতঃ কার্প) তারা প্রিন্সেস-কে যেতে দিতে পারে না, হুকুম এসেছে গ্রামে থাকতে; তবে প্রিন্সেস যদি বাড়িতে থেকে যায় তাহলে তারা আগের মতই তার কাজ করবে, সব ব্যাপারে তাকে মেনে চলবে।

রস্তভও ইলিনকে ঘোড়ার পিঠে আসতে দেখে তাদের ফরাসী সৈন্য মনে করে কোচয়ান গাড়ি ফেলে পালিয়ে গেল, আর বাড়ির মধ্যে মেয়েরা কান্না-কাটি শুরু করে দিল।

রস্তভ যখন বাইরের ঘর পেরিয়ে ভিতরে ঢুকল তখন নানা কণ্ঠে ধ্বনি উঠল: "বাবা! উদ্ধারকর্তা! ঈশ্বরই আপনাকে পাঠিয়েছেন!"

কিংকর্তব্যবিমূঢ় অসহায় প্রিন্সেস মারি বড় বসবার ঘরটায় বসে ছিল। রস্তভকে সেখানেই নিয়ে আসা হল। লোকটি কে, কেনই বা এসেছে, তার নিজেরই বা কি হবে—সে কিছুই বুঝতে পারল না। কিন্তু তার রুশসুলভ মুখ, তার চলার ভঙ্গী এবং প্রথম কথাগুলি শুনেই বুঝতে পারল সে তারই সমশ্রেণীর মানুষ; গভীর উজ্জ্বল চোখে তার দিকে তাকাল; আবেগকম্পিত গলায় কথা বলতে শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে এই সাক্ষাৎটি রস্তভের কাছে একটি রোম্যান্টিক ঘটনা হয়ে দেখা দিল। প্রিন্সেসের দিকে তাকিয়ে তার ভীরু কাহিনী শুনতে শুনতে সে ভাবতে লাগল: "শোকাভিভূত একটি অসহায় মেয়ে উচ্ছৃংখল রূঢ় চাষীদের করুণার পাত্রী হয়ে পড়েছে! আর বিচিত্র নিয়তিই আমাকে এখানে এনে ফেলেছে! তার আকৃতি ও প্রকৃতিতে কী শান্ত সুষমা ও মহত্ব!"

এ সব কিছুই ঘটেছে বাবার শেষকৃত্যের ঠিক পরের দিন—এই কথাটা বলতে গিয়ে প্রিন্সেসের গলাটা কাঁপতে লাগল। সে চোখ তুলে দেখল রস্তভের চোখেও জল। মারির চোখে ফুটে উঠল যে কৃতজ্ঞতার আভাষ

তাতে তার মুখের সাধারণ ভাবটা চাপা পড়ে গেল।

রস্তভ বলল, "ঘটনাক্রমে ঠিক এই সময়ই আমি যে এখানে এসে পড়েছি এবং আপনার কাজে লাগতে পারছি সেজন্য আমি যে কত খুশি হয়েছি তা বোঝাতে পারব না। আপনি যেখানে খুশি চলে যান; আমি কথা দিচ্ছি কেউ আপনাকে বিরক্ত করতে সাহস করবে না; শুধু আমাকে আপনার সঙ্গে থাকবার অনুমতি দিন।" যেন কোন রাজ-পরিবারের মহিলাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করছে এমনিভাবে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানিয়ে রস্তভ দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

তার সশ্রদ্ধ কণ্ঠস্বরই বলে দিল, যদিও প্রিন্সেস মারির সঙ্গে পরিচিত হতে পারলে সে খুবই সুখী হবে, তবু তার দুর্ভাগ্যের সুযোগ নিয়ে সে কোন-রকম জোর খাটাবে না।

প্রিন্সেস মারিও সেটা বুঝতে পেরে খুশি হল।

ফরাসীতে বলল, "আপনার কাছে আমি খুবই কৃতজ্ঞ, কিন্তু আমি আশা করছি যে এ সবটাই ভুল বোঝাবুঝির ফল, এতে কারও কোন দোষ নেই।" হঠাৎ সে কেঁদে ফেলল।

"আমাকে ক্ষমা করবেন!" সে বলল।

ভুরু কুঁচকে আর একবার মাথাটা ঈষৎ নুইয়ে রস্তভ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অধ্যায়—১৪

"আচ্ছা, খুবই সুন্দরী কি? আরে বন্ধু—আমার গোলাপীটি তো উপাদেয় বস্তু; তার নাম দুনিয়াশা...."

কিন্তু রস্তভের দিকে চোখ পড়তেই ইলিন থেমে গেল। বুঝতে পারল, তার নায়ক ও কম্যাণ্ডারের চিন্তার ধারা সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে বইছে।

সক্রোধ দৃষ্টিতে ইলিনের দিকে তাকিয়ে কোন কথা না বলে রস্তভ দ্রুত পা ফেলে গ্রামের দিকে এগিয়ে চলল।

মনে মনে বলল, "ওদের দেখিয়ে দেব; শিক্ষা দিয়ে দেব, ডাকাতের দল!"

আল্পাতিচ অনেক কষ্টে তার গতির সঙ্গে তাল রেখে পাশে পাশে চলল। একসময় বলল, "আপনি কি সিদ্ধান্ত করলেন?"

রস্তভ থেমে গেল; হঠাৎ ঘুষি পাকিয়ে আল্পাতিচের দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

"সিদ্ধান্ত? কি সিদ্ধান্ত? অকর্মা বুড়ো! ...." সে চেঁচিয়ে উঠল। "তুমি কি করছিলে? অ্যা? চাষীরা হাঙ্গামা করছে, আর তুমি তার কোন ব্যবস্থা করতে পারছ না? তুমি নিজেও বিশ্বাসঘাতক! আমি তোমাকে

চিনি। জ্যান্ত তোমার চামড়া তুলে নেব।” “নিজেই অকারণে রাগ করছে বুঝতে পেরে সে আল্‌পাতিচকে ছেড়ে দ্রুত এগিয়ে চলল। আল্‌পাতিচ মনের ক্ষোভ চেপে রেখে প্রায় দৌড়বার ভঙ্গীতে তার পাশে পাশে চলতে চলতে কৈফিয়ৎ দিতে লাগল। চাষীরা বড়ই একগুঁয়ে, আর বর্তমান পরিস্থিতিতে সশস্ত্র বাহিনী ছাড়া ওদের সঙ্গে বাড়াবাড়ি করাটাও যুক্তিযুক্ত নয়; কাজেই সর্বাগ্রে “মিলিটারি” ডাকাই ভাল নয় কি?”

যুক্তিহীন জান্তব ক্রোধে রুদ্ধশ্বাস হয়ে রস্তভ বলে উঠল, “সশস্ত্র বাহিনীই দেব ব্যাটাদের···বাড়াবাড়িই করব!”

কি করবে না ভেবেচিন্তেই সে দৃঢ় পদক্ষেপে দ্রুত এগিয়ে চলল ভিড়কে লক্ষ্য করে। যতই তাদের কাছে যাচ্ছে ততই আল্‌পাতিচের মনে হচ্ছে যে এই যুক্তিহীন কাজের ফলটা ভালই হবে। রস্তভের দৃঢ় পদক্ষেপ ও ভ্রূকুঞ্চিত মুখ দেখে ভিড়ের মধ্যে চাষীদের মন কিছুটা দমে গেল।

হুজাররা গ্রামে আসায় এবং রস্তভ প্রিন্সেসের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ায় চাষীদের মধ্যে কিছুটা গোলমাল ও মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। কিছু চাষী বলল, নবাগতরা নিশ্চয়ই রুশ, আর কর্ত্রীকে আটক করায় তারা রুষ্ট হতে পারে। দ্রোণেরও তাই মত; কিন্তু সেকথা বলামাত্রই কার্প ও অন্য কেউ-কেউ প্রাক্তন গ্রাম-প্রধানের উপর চটে উঠল।

কার্প চেঁচিয়ে বলল, “কম্যুনের পয়সায় কত বছর ধরে পেট মোটা করেছ? তোমার আর কি! মাটি খুঁড়ে টাকার ঘড়া তুলবে আর তাই নিয়ে পগার পার হবে। ···আমাদের বাড়ি ঘর থাকল কি গেল তাতে তোমার কি যায়-আসে?”

“আমাদের হুকুম তামিল করতে বলা হয়েছে, কাউকে বাড়িঘর ছেড়ে যেতে বা এক দানা শস্য নিয়ে যেতে দেওয়া হবে না; বাস, ফুরিয়ে গেল!”

একটি ছোটখাট বুড়ো হঠাৎ দ্রোণকে আক্রমণ করে বলল, “তোমার ছেলেকে সেনাদলে নেবার পালা ছিল, কিন্তু তোমার ভয় কি! তোমার হোৎকা ছেলেটা পার পেয়ে গেল, আর তারা আমার ভাংকাকে নিয়ে গেল মাথা মুড়িয়ে সৈন্য বানাতে! কিন্তু মরতে আমাদের সকলকেই হবে।”

দ্রোণ বলল, “ঠিক বলেছ, আমাদের সকলকেই মরতে হবে। আমি তো কম্যুনের বিপক্ষে নই।”

“হয়েছে—বিপক্ষে নই! নিজের পেট মোটা করেছ····”

ঢ্যাঙা চাষী দুটোরও কি যেন বলার ছিল। কিন্তু ইলিন, লাভ্রুশ্‌কা ও আল্‌পাতিচকে সঙ্গে নিয়ে রস্তভ কাছে এসে পড়ায় কার্প কোমরবন্ধের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে ঈষৎ হেসে এগিয়ে গেল। দ্রোণ সরে গেল পিছনের দিকে। আর জনতা আরও ঘন হয়ে এল।

দ্রুত পায়ে ভিড়ের কাছে এসে রস্তভ চীৎকার করে বলল, “এখানে

তোমাদের গ্রাম-প্রধান কে ? অ্যা ?"

"গ্রাম-প্রধান ? তাকে আপনার কি দরকার ? ..." কার্প জানতে চাইল।

কিন্তু তার মুখের কথা শেষ হবার আগেই তার মাথার টুপিটা উড়ে গেল, আর একটা প্রচণ্ড ঘুষি লেগে তার মাথাটা একদিকে বেঁকে গেল।

"মাথার টুপি খুলে ফেল বিশ্বাসঘাতকের দল!" ক্রুদ্ধ কণ্ঠে রস্তভ গর্জে উঠল। "গ্রাম-প্রধান কোথায় ?"

"গ্রাম-প্রধান...গ্রাম-প্রধানকে চাইছেন...দ্রোণ জাখারিচ, তুমি!" ভিড়ের ভিতর থেকে নানান ভীরু ও ব্যতিব্যস্ত কণ্ঠ শোনা গেল ; সকলেই টুপি খুলে ফেলল।

"আমরা তো গোলযোগ করছি না, হুকুম তামিল করছি।" কার্প কথাগুলি বলতেই আর কয়েকজন একসঙ্গে বলে উঠল, "বৃদ্ধরা এই সিদ্ধান্তই নিয়েছে— হুকুম করার মালিকতো আপনারা অনেকেই।"

"কথার উপর কথা! বিদ্রোহ! ...ডাকাতের দল! বিশ্বাসঘাতক!" কার্পের কলার চেপে ধরে রস্তভ এমন অর্থহীনভাবে চীৎকার করে উঠল যেন সে কণ্ঠস্বর তার নিজের নয়। "ওকে বেঁধে ফেল! বেঁধে ফেল!" লাভ্রুস্কা ও আল্‌পাতিচ ছাড়া অন্য কেউ সেখানে নেই জেনেও সে কথাটা বলল।

যাইহোক, লাভ্রুশ্‌কা ছুটে গিয়ে পিছন থেকে কার্পের হাত চেপে ধরল। বলল, "পাহাড়ের ওপার থেকে সৈন্যদের ডেকে আনব কি ?"

চাষীদের দিকে ঘুরে আল্‌পাতিচ হুকুম দিল, দুজন এসে কার্পকে বেঁধে ফেলুক। তারাও বিনীতভাবে ভিড়ের ভিতর থেকে এগিয়ে এসে নিজেদের কোমরবন্ধ খুলতে শুরু করল।

"গ্রাম-প্রধান কোথায় ?" রস্তভের চড়া গলা।

বিবর্ণ ভ্রূকুটির মুখে দ্রোণ ভিড়ের ভিতর থেকে এগিয়ে এল।

"তুমিই গ্রাম-প্রধান ? লাভ্রুশ্‌কা, একেও বেঁধে ফেল!" রস্তভ চীৎকার করে বলল ; যেন এ হুকুমকে বাধা দেবারও কেউ নেই।

সত্যি সত্যি আরও দুটি চাষী দ্রোণকে বাঁধতে শুরু করল ; যেন তাদের সাহায্য করতে দ্রোণ নিজের কোমরবন্ধটাই খুলে দিল।

তখন রস্তভ চাষীদের বলল, "তোমরা সকলেই শোন! এই মুহূর্তে যার যার বাড়ি চলে যাও ; তোমাদের কারও গলা যেন আর না শুনি।"

"কেন ? আমরা তো কোন ক্ষতি করি নি। শ্রেফ বোকার মত কাজ করেছি। যতসব বাজে ঝামেলা...আমি তখনই বলেছিলাম কাজটা ঠিক হচ্ছে না," পরস্পরের প্রতি দোষারোপের ভাষা শোনা গেল।

এতক্ষণে আল্‌পাতিচ আবার স্বমূর্তি ধারণ করল। বলল, "হল তো ? আমি কি বলেছিলাম ? এটা অন্যায় বাপধনরা!"

"সবই আমাদের বোকামি আলুপাতিচ," বলতে বলতে সকলে কেটে পড়ল।

যে দুটি লোককে বাঁধা হয়েছে তাদের মনিবের বাড়িতে নিয়ে চলল। মাতাল দুটিও তাদের পিছু নিল।

একজন কার্পকে বলল, "আহা, তোমাকে দেখে দুঃখ হচ্ছে!"

অপরজন বলল, "মনিবের সঙ্গে কখনও ওভাবে কথা বলতে আছে? তুমি কি ভেবেছিলে হে বোকারাম? খাঁটি বোকা!"

দু'ঘণ্টা পরে। বোগুচারভো ভবনের সামনে গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে। চাষীরা মালিকের মালপত্র বয়ে এনে গাড়িতে বোঝাই করছে। প্রিন্সেস মারির ইচ্ছানুসারে দ্রোণের বাঁধন খুলে দেওয়া হয়েছে। উঠোনে দাঁড়িয়ে সেও তদারক করছে।

দাসীর হাত থেকে একটা গহনার বাক্স নিয়ে একটি চাষী বলল, "এটাকে এমন হেলাফেলা করে রেখো না। জান এর জন্য কত টাকা খরচ হয়েছে! ওভাবে দড়ির নীচে যে রাখছ, ওটার গায়ে ঘসা লাগবে না? এরকম কাজ আমি পছন্দ করি না। সব কাজ নিয়মমাফিক কর। এই দেখ, এটা বাকলের মাদুরের নীচে রেখে খড় দিয়ে ঢেকে দাও—এইভাবেই এসব জিনিস রাখতে হয়!"

প্রিন্স আন্দ্রুর লাইব্রেরির কাবার্ডটা এনে আর একটি চাষী বলল, "আরে বই, বই! ধাক্কা দিও না। এটা খুব ভারী—বইয়ে একেবারে ঠাসা।"

উপরের অভিধানগুলোর দিকে আঙুল বাড়িয়ে অর্থপূর্ণভাবে চোখ টিপে গোল-মুখ ঢ্যাঙা চাষীটি বলল, "হ্যাঁ, ওরা তো সারাদিন কাজ করেন, মোটেই খেলাধুলা করেন না!"

প্রিন্সেসের সঙ্গে গায়েপড়ে ভাব করার অনিচ্ছায় রস্তভ বল্‌কুন্স্কি ভবনে ফিরে না গিয়ে গ্রামেই প্রিন্সেসের যাত্রার জন্য অপেক্ষা করে রইল। প্রিন্সেসের গাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে রস্তভও ঘোড়ায় চেপে বোগুচারভো থেকে আট মাইল পর্যন্ত তার সঙ্গে সঙ্গে গেল। সেখান থেকেই রাস্তাটা আমাদের সেনাদলের দখলে। ইয়ংকভো সরাইখানাতে সে সশ্রদ্ধভাবে প্রিন্সেসের কাছ থেকে বিদায় নিল এবং এই সর্বপ্রথম তার হাতে চুমো খেল।

তাকে উদ্ধার করার জন্য প্রিন্সেস মারির কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উত্তরে রস্তভ রক্তিম মুখে বলল, "একথা কেন বলছেন! যেকোন পুলিশ অফিসারই তো একাজটা করত। আমাদের যদি অনবরত চাষীদের সঙ্গেই লড়াই করতে হয় তাহলে শত্রুপক্ষকে এতদূর আসতে দেওয়া উচিত হয় নি। আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়ে খুশি হয়েছি। বিদায় প্রিন্সেস!

আপনার সুখ ও সান্ত্বনা কামনা করি ; আশা করি মধুরতর পরিবেশে আবার আমাদের দেখা হবে। আমাকে যদি লজ্জা দিতে না চান তো দয়া করে ধন্যবাদ দেবেন না !"

কথায় ধন্যবাদ না জানালেও প্রিন্সেস কিন্তু ধন্যবাদ জানাল কৃতজ্ঞতা ও মমতায় উজ্জল মুখের ভাব দিয়ে। তাকে ধন্যবাদ জানাবার কিছু নেই একথা প্রিন্সেস বিশ্বাস করে না ; বরং সে নিশ্চিত বোঝে যে রস্তভ না এলে সে বিদ্রোহী চাষী ও ফরাসীদের হাতে মারা পড়ত, তাকে বাঁচাতে এই মানুষটি ভয়ংকর বিপদের ঝুঁকি নিয়েছিল ; উচ্চ আদর্শ ও মহৎ অন্তরের এই মানুষটি তার অবস্থা, তার দুঃখকে উপলব্ধি করতে পেরেছে। নিজের ক্ষতির কথা বলতে গিয়ে সে নিজে যখন কাঁদছিল, তখন এই মানুষটির সদয়, অশ্রুভরা চোখ দুটির স্মৃতি সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না।

রস্তভের কাছে বিদায় নিয়ে সে যখন একলা দাঁড়িয়েছিল তখন হঠাৎ তার চোখ জলে ভরে এল, আর তখনই এই প্রথম একটা বিচিত্র প্রশ্ন তার মনে দেখা দিল : সে কি রস্তভকে ভালবেসেছে ?

মস্কোর পথে চলতে চলতে প্রিন্সেস মারি ভাবল : "আচ্ছা ধরা যাক আমি তাকে ভালবাসি, তাহলে ?"

যে মানুষ কোনদিন তাকে ভালবাসবে না সে যে তারই প্রেমে পড়েছে এ-কথা নিজের কাছে স্বীকার করাও যে লজ্জার ; তবু এই কথা ভেবে সে সান্ত্বনা পেল যে একথা কেউ কোনদিন জানবে না ; এ-কথা কাউকে কোন দিন না জানিয়েও জীবনে প্রথম এবং শেষবারের মত যাকে সে ভালবেসেছে তাকে যদি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ভালবেসে যায় তাহলে তো কেউ তাকে দোষ দিতে পারবে না।

মাঝে মাঝে যখনই রস্তভের চাউনি, তার সহানুভূতি, তার কথাগুলি মনে পড়ে, তখনই সুখের আস্বাদন তার কাছে অসম্ভব বলে মনে হয় না।

সে ভাবতে লাগল : "ঠিক সেইমুহূর্তে নিয়তিই কি তাকে বোগুচার-ভোতে এনে হাজির করে নি ? নিয়তির বশেই কি তার বোন আমার দাদাকে প্রত্যাখ্যান করে নি ?, "(নাতাশা যদি প্রিন্স আন্দ্রুকে বিয়ে করত তাহলে সেটা হত 'মারি ও নিকলাসের বিয়ের পথে বিঘ্নস্বরূপ।) সবকিছুর মধ্যেই প্রিন্সেস মারি বিধাতার নির্দেশ দেখতে পেল।

রস্তভেরও প্রিন্সেসকে ভাল লেগেছে। তার কথা মনে হলেই সে আনন্দ পায়। তার বোগুচারভো অভিযানের কাহিনী শুনে সহকর্মীরা যখন বলতে শুরু করল যে খড় খুঁজতে গিয়ে সে রাশিয়ার সব চাই ধনবতী উত্তরাধি-কারিণীকে খুঁজে পেয়েছে, তখন তার রাগ হল। তার রাগের কারণ, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই প্রিন্সেস মারিকে বিয়ে করার কথা একাধিকবার তার মাথায় এসেছে। নিকলাস ব্যক্তিগতভাবে তার চাইতে ভাল স্ত্রী কামনা করে না ;

তাকে বিয়ে করলে তার মা কাউন্টেস সুখী হবে, তার বাবার সাংসারিক বিপদ কেটে যাবে, এমন কি প্রিন্সেস মারির সুখও নিশ্চিত হবে।

কিন্তু সোনিয়া? আর তার বাকদান? সহকর্মীদের কথায় এই জন্যই রস্তভ রাগ করেছিল।

অধ্যায়—১৫

প্রধান সেনাপতির কার্যভার হাতে নিয়েই কুতুজভের মনে পড়ল প্রিন্স আন্দ্রুকে; তাকে খবর পাঠাল প্রধান ঘাঁটিতে এসে তার সঙ্গে দেখা করতে।

জারেভো-জ্যামেশিতে কুতুজভ যেদিন প্রথম সেনাদল পরিদর্শন করল ঠিক সেইদিনই প্রিন্স আন্দ্রু সেখানে এল। গ্রাম্য পুরোহিতের যে বাড়িটার সামনে প্রধান সেনাপতির গাড়ি দাঁড়িয়েছিল প্রিন্স আন্দ্রু সেই বাড়িতেই থামল; ফটকের বেঞ্চিটাতে বসে অপেক্ষা করতে লাগল "প্রশান্ত মহামহিম"-এর জন্য—সকলে এখন ঐ নামেই কুতুজভকে ডাকে। গ্রামের অদূরের মাঠ থেকে কখনও ভেসে আসছে সেনাদলের বাজনার শব্দ, কখনও বা নতুন প্রধান সেনাপতির প্রতি বহু কণ্ঠের "হুররা!" ধ্বনি। দু'জন আর্দালি, একজন সংবাদবাহক ও একজন প্রধান ভাণ্ডারী কাছেই প্রিন্স আন্দ্রুর দশ পা দূরে দাঁড়িয়ে আছে। একজন বেঁটে, মোটা হুজার লেফ্‌টেন্যান্ট কর্ণেল ঘোড়া ছুটিয়ে এল; মুখে ঘন গোঁফ ও গালপাট্টা; প্রিন্স আন্দ্রুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "প্রশান্ত মহামহিম" সেখানেই থাকেন কিনা এবং শীঘ্রই ফিরবেন কি না।

প্রিন্স আন্দ্রু জবাব দিল, সে "প্রশান্ত মহামহিমের" স্টাফের লোক নয়, এখানে নতুন এসেছে। লেফটেন্যান্ট-কর্ণেল একজন আর্দালির দিকে এগিয়ে গেল। সে জবাব দিল, "কে? প্রশান্ত মহামহিম? আশা করছি তিনি অচিরেই এসে পড়বেন। আপনার কি চাই?"

হুজার লেফটেন্যান্ট-কর্ণেল আর্দালিটির গলার স্বরে গোঁফের নীচে একটুখানি হেসে ঘোড়া থেকে নামল, ঘোড়াটাকে সহিসের জিম্মায় দিয়ে মাথাটা ঈষৎ নুইয়ে বল্‌কন্‌স্কির দিকে এগিয়ে গেল। বল্‌কন্‌স্কি বেঞ্চিতে একটু জায়গা করে দিল; লোকটি তার পাশে বসে পড়ল।

লোকটি বলল, "আপনিও প্রধান সেনাপতির জন্য অপেক্ষা করছেন? লোকে বলে তিনি সকলের সঙ্গেই দেখা করেন, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! ঐ মাংসখেকোদের নিয়েই যত বিপদ! এতদিনে রুশদের একটা হিল্লে হবে। এতদিন যে কি হচ্ছিল তা শুধু শয়তানই জানে। আমরা তো পিছিয়েই চলেছি। আপনি কি অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন?"

প্রিন্স আন্দ্রু জবাব দিল, "শুধু যে পশ্চাদ্‌পসরণে অংশ নেবার সৌভাগ্য হয়েছে তাই নয়, সেই পশ্চাদ্‌পসরণের কালে আমার যা কিছু প্রিয় সব

হারিয়েছি—শুধু জমিদারি ও জন্ম-ভিটের কথাই বলছি না—হারিয়েছি আমার বাবাকে; শোকের আঘাতেই তিনি মারা গেছেন। আমি স্মোলেন্স্ক্ প্রদেশের লোক।”

“ওঃ! আপনি প্রিন্স বল্‌কন্‌স্কি? আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ভারী খুশি হলাম! আমি লেফ্‌টেন্যান্ট-কর্নেল দেনিসভ, ‘ভাস্কো’ নামেই অধিক পরিচিত,” প্রিন্স আন্‌দ্রুর হাতটা চেপে ধরে বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেনিসভ বলল। “হ্যাঁ, আমি শুনেছি।…আর, এই সিদীয় যুদ্ধ। যুদ্ধ ভাল জিনিস—শুধু যাদের গলায় চেপে বসে তাদের পক্ষে তা নয়। তাহলে আপনিই প্রিন্স আন্‌দ্রু বল্‌কন্‌স্কি? আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ভারী খুশি হলাম!” বিষণ্ণ হাসির সঙ্গে সে আবার প্রিন্স আন্‌দ্রুর হাতটা চেপে ধরল।

প্রথম প্রণয়ী সম্পর্কে নাতাশা তাকে যা বলেছে দেনিসভ সম্পর্কে প্রিন্স ততটুকুই জানে। এই স্মৃতি তাকে হর্ষ ও বিষাদে ভরা সেই বেদনাময় দিনগুলিতে ফিরিয়ে নিয়ে গেল যার কথা সে ইদানীং আর ভাবে না, অথচ মন থেকেও মুছে যায় নি। সম্প্রতিকালে এত সব নতুন ও গুরুতর ঘটনা তার জীবনে ঘটেছে—যেমন স্মোলেন্স্ক থেকে পশ্চাদ্‌পসরণ, বল্ড হিল্‌স্‌-এ প্রত্যাবর্তন, ও বাবার মৃত্যু-সংবাদ এবং এত বিচিত্র অনুভূতির অভিজ্ঞতা তার হয়েছে যে দীর্ঘদিন সেই সব অতীত স্মৃতি তার মনেই পড়ে নি। দেনিসভের দিক থেকেও বল্‌কন্‌স্কির নামের সঙ্গে জড়িত হয়ে যে অতীত স্মৃতি তার মনে জেগে উঠেছে তাও তো এক দূর অতীতের রোমান্টিক স্মৃতিমাত্র—যখন নৈশভোজনান্তে নাতাশার গান শেষ হলো সে যে কি করছে তা না বুঝেই একটি পঞ্চদশী মেয়ের কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছিল। সেকথা মনে হতেই মৃদু হেসে দেনিসভ বর্তমান অভিযান প্রসঙ্গে তার একটা নতুন পরিকল্পনার কথা তুলল। সমস্ত ব্যাপারটা প্রিন্স আন্‌দ্রুর কাছে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে বলল, “সবগুলো সীমান্ত তারা রক্ষা করতে পারবে না। সেটা অসম্ভব। তাদের ব্যূহ আমি ভেদ করবই। আমাকে পাঁচশ’ সৈন্য দিন, আমি ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে যাব। এটা একেবারে নিশ্চিত কথা! আমাদের সামনে একটি মাত্র পথ আছে—গেরিলা যুদ্ধ!”

দেনিসভ যখন বল্‌কন্‌স্কির কাছে নিজের পরিকল্পনা বোঝাতে গিয়ে নানারকম অঙ্গভঙ্গী করে চলেছে, তখনই কানে এল সৈন্যদের হৈ-হল্লা আর গান-বাজনার শব্দ। চেঁচামেচি ও ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ ক্রমেই গ্রামের দিকে এগিয়ে আসছে।

ফটকে দাঁড়ানো একটি কসাক চেঁচিয়ে উঠল, “তিনি আসছেন। তিনি আসছেন!”

বলকন্‌স্কি ও দেনিসভ ফটকের দিকে এগিয়ে গেল। তারা দেখতে পেল,

একটা ছোট ঘোড়ায় চেপে এগিয়ে আসছে কুতুজভ। তার পিছনে আসছে অশ্বারোহী সেনাপতির একটা বড় দল। ঠিক পিছনেই আসছে বাকৃলে। একদল অফিসার ছুটতে ছুটতেই চীৎকার করছে "হুর্‌রা!"

চারদিকের "হুর্‌রা! হুর্‌রা!" ধ্বনির মধ্যে কুতুজভ প্রিন্স আন্‌দ্রু ও দেনিসভের পাশ কাটিয়ে উঠোনে ঢুকল।

প্রিন্স আন্‌দ্রু যখন তাকে শেষবারের মত দেখেছিল কুতুজভ এখন তার চাইতেও বেশী মোটা হয়েছে, গায়ের চামড়া আরও ঝুলে পড়েছে। কিন্তু চোখের সাদা তারা, ক্ষতের দাগ ও ক্লান্তির ছাপ আগের মতই আছে। মাথায় অশ্বরক্ষীর সাদা টুপি ও মিলিটারি ওভারকোট; কাঁধের উপর ঝুলছে সরু ফিতে দিয়ে বাঁধা একটা চাবুক। ছোট ঘোড়াটার পিঠে চেপে বসে দুলে দুলে চলছে।

উঠোনে ঢুকেই শিস্ দিল "হু-হু হু!" মুখে ফুটে উঠল স্বস্তির আভাষ। রেকাব থেকে বাঁ পাটা তুলে গোটা শরীরটাকে ঝুঁকিয়ে মুখটা বেঁকিয়ে অনেক কষ্টে জিনের উপর রেখে হাঁটুর উপর ভর দিয়ে পিছলে নীচে নেমে গেল, আর অপেক্ষমান অ্যাড্‌জুটাণ্ট ও কসাকরা তাকে যেন কোলে করে নামিয়ে দিল।

শরীরটাকে সোজা করে চোখ কুঁচকে চারদিকে তাকাতে কুতুজভের নজর পড়ল প্রিন্স আন্‌দ্রুর উপর; কিন্তু তাকে চিনতে না পেরে দুলতে দুলতে সামনে এগিয়ে গেল। "হু···হু···হু" শিস্ দিতে দিতে আর একবার প্রিন্স আন্‌দ্রুর দিকে তাকাল। বুড়ো মানুষদের বেলায় যেমন হয়ে থাকে, তারও প্রিন্স আন্‌দ্রুকে চিনতে কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগল।

"আরে, কেমন আছ হে প্রিন্স? কেমন আছ বাবা? এস, এস····" বলে কুতুজভ বারান্দায় উঠে গেল। তার দেহের ভারে বারান্দাটা কঁকিয়ে উঠল।

কোটের বোতাম খুলে সে বারান্দার বেঞ্চিতে বসল।

"তোমার বাবা কেমন আছেন?"

প্রিন্স আন্‌দ্রু সরাসরি জবাব দিল, "গতকালই বাবার মৃত্যু-সংবাদ পেয়েছি।"

বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে কুতুজভ তার দিকে তাকাল: তারপর টুপি খুলে ক্রুশ চিহ্ন আঁকল।

"তিনি স্বর্গরাজ্য লাভ করুন! আমাদের সকলের জন্যই ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!" কুতুজভ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল; তার বুকটা ওঠা-নামা করতে লাগল; বেশ কিছুক্ষণ সে চুপ করে রইল। "আমি তাকে ভালবাসতাম, শ্রদ্ধা করতাম, সমস্ত অন্তর দিয়ে তোমাকে সহানুভূতি জানাচ্ছি।"

প্রিন্সকে আলিঙ্গন করে তার স্থূল বুকের উপর তাকে জড়িয়ে ধরল, বেশ

কিছুক্ষণ ছেড়ে দিল না। ছাড়া পেয়ে প্রিন্স আনদ্রু দেখল, তার মোটা ঠোঁট দুটি কাঁপছে, দুই চোখে টলমল করছে অশ্রুর বিন্দু। আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াবার জন্য দুই হাতে বেঞ্চির উপর চাপ দিল।

"এস, আমার সঙ্গে এস ; কথা আছে," কুতুজভ বলল।

ঠিক সেইমুহূর্তে দেনিসভ বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল ; অ্যাড্জুটান্ট-দের ক্রুদ্ধ ফিস্ ফিস্ কথায় বাধা মানল না।

আসনের উপর হাত রেখেই কুতুজভ চোখ কুঁচকে তার দিকে তাকাল। নিজের নাম ঘোষণা করে দেনিসভ জানাল যে দেশের কল্যাণের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ে "প্রশান্ত মহামহিমকে" জানাতেই সে এসেছে। কুতুজভ ক্লান্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে বিরক্তিসূচক ভঙ্গীতে দুই হাত তুলে পরে পেটের উপর ভাঁজ করে রেখে বলল, "আমাদের দেশের কল্যাণের জন্য ? ব্যাপার কি ? বল!" মুখটা মেয়ের মত লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেও সে স্মোলেন্স্ক ও ভিয়াজমার ভিতর দিয়ে শত্রু পক্ষের ব্যূহভেদ করার পরিকল্পনাটা সাহসের সঙ্গে বুঝিয়ে বলতে শুরু করল। দেনিসভ এই অঞ্চলেরই মানুষ, কাজেই দেশটাকে সে ভালই চেনে। তার পরিকল্পনাটা সত্যি ভাল ; বিশেষত যেরকম দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে সেটাকে সে বুঝিয়ে বলল তাতে সেটাকে সত্যি ভাল মনে হল। কুতুজভ নিজের পায়ের দিকে তাকাল, মাঝে মাঝে পার্শ্ববর্তী ঘরটার দিকেও তাকাতে লাগল, যেন সেখান থেকে অপ্রীতিকর কিছু বেরিয়ে আসার আশংকা আছে তার মনে। দেনিসভের কথার মাঝখানেই সেই কুঁড়েঘর থেকে বেরিয়ে এল একজন জেনারেল ; তার বগলে একটা পোর্টফোলিও।

কুতুজভ বলে উঠল, "সে কি ? তুমি এত শীঘ্র তৈরি হয়েছ ?"

সেনাপতি উত্তর দিল, "আমি তৈরি প্রশান্ত মহামহিম।"

কুতুজভ এমনভাবে মাথা নাড়ল যেন বলতে চাইল ; "একটা মানুষ এত সব সামাল দেবে কেমন করে ?" তারপর দেনিসভের কথায় মন দিল।

দেনিসভ বলতে লাগল, "একজন রুশ অফিসার হিসাবে আমি কথা দিচ্ছি, নেপোলিয়নের যোগাযোগ-সূত্রটা আমি ছিঁড়ে ফেলতে পারব।"

তার কথায় বাধা দিয়ে কুতুজভ শুধাল, "ইন্টেণ্ড্যাণ্টজেনারেল কিরিল আনদ্রীভিচ দেনিসভ তোমার কে হন ?"

"তিনি আমার খুড়োমশাই প্রশান্ত মহামহিম।"

"আচ্ছা, আমরা দুজনতো বন্ধু," কুতুজভ সানন্দে বলল। "ঠিক আছে, ঠিক আছে বন্ধু, আজ এখানে থাক, কাল তোমার সঙ্গে কথা হবে।"

দেনিসভের দিকে মাথাটা নেড়ে সে কাগজপত্রগুলির জন্য কনভ্নিৎসিন-এর দিকে হাত বাড়াল।

অসন্তুষ্ট গলায় কর্তব্যরত জেনারেল বলল, 'প্রশান্ত মহামহিম কি ভিতরে

আসবেন? পরিকল্পনাগুলি পরীক্ষা করে দেখতে হবে, কিছু কাগজপত্রে সই করতে হবে।"

একজন অ্যাড্‌জুটাণ্ট বেরিয়ে এসে জানাল, ভিতরে সবকিছু প্রস্তুত। কুতুজভ কিন্তু কাজ শেষ না করে ভিতরে যেতে চাইল না। মুখটা বিকৃত করল...

"না হে বাপু, ওদের বল একটা ছোট টেবিল এখানেই নিয়ে আসুক। এখানে বসেই কাগজপত্রগুলো দেখব।" প্রিন্স আন্‌দ্রুর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, "তুমি যেয়ো না।"

এইসব কথাবার্তা যখন চলছে তখন প্রিন্স আন্‌দ্রু দরজার পিছনে নারীকণ্ঠের ফিস্‌ফিসানি ও রেশমী পোশাকের খসখসানি শুনতে পেল। বারকয়েক সেদিকে তাকিয়ে সে দরজার পিছনে একটি গোলগাল, গোলাপী সুদর্শনাকে দেখতে পেল; পরনে গোলাপী পোশাক, মাথায় লিলাক-রঙের রুমাল বাঁধা। একটা থালা হাতে নিয়ে প্রধান সেনাপতির জন্য অপেক্ষা করে আছে। কুতুজভের অ্যাড্‌জুটাণ্ট প্রিন্স আন্‌দ্রুর কানে কানে বলল, এই মহিলা বাড়ির মালিক পুরোহিতের স্ত্রী; প্রশান্ত মহামহিমকে রুটি ও লবন দিয়ে অভ্যর্থনা করবে। তার স্বামী প্রশান্ত মহামহিমকে গির্জায় স্বাগত জানিয়েছে ক্রুশ দিয়ে, আর স্ত্রী তাকে স্বাগত জানাবে বাড়িতে। মহিলাটি খুবই সুন্দরী" অ্যাড্‌জুটাণ্ট ঈষৎ হেসে কথা শেষ করল। কথাগুলো কানে আসতেই কুতুজভ ঘুরে দাঁড়াল। প্রিন্স আন্‌দ্রু প্রধান সেনাপতির মুখের দিকে ভালভাবে তাকাল; তার চোখে পড়ল শুধু বিরক্তি, মেয়েদের ফিস্‌ফিস্ কথাবার্তা সম্পর্কে কৌতূহল এবং ভদ্রতা রক্ষা করে চলার বাসনা। জেনারেলের প্রতিবেদনের পাণ্ডিত্য অথবা দেনিসভের পরিকল্পনার দেশাত্ম-বোধ—কোনটার প্রতিই তার বিশেষ আগ্রহ দেখা গেল না। প্রতিবেদনের যে জায়গায় রুশ সৈনিকদের লুটতরাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে একমাত্র সে সম্পর্কেই কুতুজভ নিজের থেকে একটা স্পষ্ট নির্দেশ দিল। প্রতিবেদনের শেষে কুতুজভের স্বাক্ষরের জন্য একটা কাগজ জেনারেল তার সামনে মেলে ধরল; সৈন্যরা যেসমস্ত তাজা যই ফসল ক্ষেত থেকে কেটে নিয়ে গেছে জমির মালিকরা তার দরুণ ক্ষতিপূরণ দাবী করে দরখাস্ত করায় সেনাবাহিনীর কম্যাণ্ডাররা যেসব টাকা ব্যয় করেছে কাগজটাতে তারই উল্লেখ করা হয়েছে।

সব ব্যাপারটা শুনে কুতুজভ ঠোঁট দিয়ে ঠোঁট মুছতে মুছতে মাথা নাড়তে লাগল।

মুখে বলল, "উনুনে ফেলে দাও...আগুনে পুড়িয়ে দাও! শেষবারের মত তোমাদের বলে দিচ্ছি, এ সবকিছু আগুনে পুড়িয়ে দাও! তারা খুশি মত ফসল কাটবে, কাঠ কেটে আগুন জ্বালাবে! সেরকম কোন হুকুম আমি

দিচ্ছি না, সেধরনের কাজ হোক তাও চাই না, কিন্তু ক্ষতিপূরণের দাবীও চলবে না। এ ছাড়া চলতে পারে না। 'কাঠ যখন কাটা হবে তখন টুকরো চাকলা তো উড়বেই।" সে আবার কাগজটার দিকে তাকাল। মাথা নেড়ে বিড়বিড় করে বলল, "ওঃ, যত সব জার্মান কেতা।"

অধ্যায়—১৬

শেষ দলিলটা সই করে কুতুজভ বলল, "বাস। সব শেষ!" তারপর উঠে দাঁড়িয়ে গলার ভাঁজগুলো সমান করে খুশি মনে দরজার দিকে পা বাড়াল।

পুরোহিতের স্ত্রী লজ্জায় আরও লাল হয়ে নীচু হয়ে অভিবাদন করে থালাটা কুতুজভের দিকে এগিয়ে দিল।

কুতুজভ চোখ ঘুরিয়ে একটু হাসল; তার থুতনিটা তুলে ধরে বলল, "আঃ, কী সুন্দর! অনেক ধন্যবাদ মিষ্টি মেয়ে!"

ট্রাউজারের পকেট থেকে কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা বের করে থালার উপরে রাখল। তারপর তার জন্য নির্দিষ্ট ঘরের দিকে চলতে চলতে জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা, সব খবর ভাল তো?" পুরোহিতের স্ত্রী হাসল, তার গালে একটা টোল পড়ল, কুতুজভকে অনুসরণ করে সেও ঘরে ঢুকল। অ্যাড্‌জুটাণ্ট বেরিয়ে এসে প্রিন্স আন্দ্রুকে তার সঙ্গে লাঞ্চ খেতে ডাকল। আধ ঘণ্টা পরে আবার কুতুজভের ঘরে প্রিন্স আন্দ্রুর ডাক পড়ল। কুতুজভ একটা হাতল-চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে; তখনও সেই বোতাম-খোলা ওভারকোটটাই গায়ে রয়েছে। হাতে একখানা ফরাসী বই। প্রিন্স আন্দ্রু ঘরে ঢুকতে বইটা বন্ধ করে একটা ছুরি দিয়ে জায়গাটা নির্দিষ্ট করে রাখল। প্রচ্ছদ দেখে প্রিন্স আন্দ্রু বুঝল বইটা মাদাম দ জেঁলি-র "শেভালিয়ের্স দু সাই নে।"

কুতুজভ বলল, "বস হে, এখানে বস। কিছু কথা বলা যাক। দুঃখের, খুবই দুঃখের কথা। কিন্তু মনে রেখো বাবা আমিও তোমার বাবার মত, দ্বিতীয় পিতা…"

বাবার মৃত্যু সম্পর্কে যা জানত, বল্ড হিল্‌স্‌-এর ভিতর দিয়ে আসবার সময় যাকিছু দেখেছে প্রিন্স আন্দ্রু সেসব কথাই কুতুজভকে বলল।

"কোথায়…আমাদের ওরা কোথায় নিয়ে এসেছে!" কুতুজভ হঠাৎ উত্তেজিত গলায় চীৎকার করে বলল; রাশিয়ার বর্তমান ছবিটা যেন স্পষ্ট হয়ে তার চোখের সামনে ফুটে উঠেছে। "কিন্তু আমাকে সময় দাও, সময় দাও!" তারপরই এই উত্তেজিত আলোচনায় ইতি টেনে বলল, "তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি আমার কাছে রাখব বলে।"

"অনেক ধন্যবাদ প্রশান্ত মহামহিম, কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে দপ্তরে কাজ করার মত যোগ্যতা এখন আর আমার মধ্যে নেই," উত্তর দেবার সময়

প্রিন্স আন্‌দ্রুর মুখের হাসিটুকু কুতুজভের দৃষ্টি এড়াল না।

সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে প্রিন্স আন্‌দ্রুর দিকে তাকাল।

প্রিন্স আন্‌দ্রু বলতে লাগল, "কিন্তু সবচাইতে বড় কথা, রেজিমেন্টে থাকাটা আমার অভ্যাস হয়ে গেছে, সেখানকার অফিসারদের আমি ভালবাসি, সৈনিকদেরও আপনজনের মতই দেখি। রেজিমেণ্ট ছেড়ে আসতে আমার কষ্ট হবে। আপনার সঙ্গে থাকতে পারার সম্মানকে যদি ফিরিয়ে দেই, তো বিশ্বাস করুন····"

একটা কঠোর, সদয়, অথচ সূক্ষ্ম ব্যঙ্গাত্মকভাব ফুটে উঠল কুতুজভের ফোলা-ফোলা মুখে। সে বল্‌কন্‌স্কিকে থামিয়ে দিল।

"আমি দুঃখিত, কারণ তোমাকে আমার দরকার। কিন্তু তুমি ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ! এখানে মানুষের কোন দরকার নেই। পরামর্শ দেবার লোক অনেক আছে, কিন্তু মানুষ নেই। ভাবী পরামর্শদাতারা যদি সেনাদলে কাজ করত তাহলে রেজিমেণ্ট অন্যরকম হয়ে যেত। অস্তারলিজে তোমাকে আমার মনে আছে····মনে আছে, হ্যাঁ, পতাকা হাতে তোমার সেই মূর্তি আমার মনে আছে!" কুতুজভের মুখে কথাগুলি শুনে প্রিন্স আন্‌দ্রুর মুখটা আনন্দে রক্তিম হয়ে উঠল।

তার হাত ধরে নীচে টেনে নামিয়ে কুতুজভ চুমো পাবার জন্য গালটা বাড়িয়ে দিল; আর একবার প্রিন্স আন্‌দ্রু দেখল বুড়ো মানুষটির চোখে জল এসেছে। যদিও প্রিন্স আন্‌দ্রু জানে কুতুজভের চোখে সহজেই জল আসে, তার সাম্প্রতিক ক্ষতির জন্য লোকটি তার প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল, তবু অস্তারলিজের কথা মনে করিয়ে দেওয়াটা তার কাছে যেমন আনন্দের, তেমনই গর্বের।

"তুমি তোমার পথেই চলে যাও; ঈশ্বর তোমার সহায় হোন। আমি জানি, সম্মানের পথই তোমার পথ!" একটু থেমে কুতুজভ আবার বলল, "বুখারেস্টে তোমার অভাব আমি খুবই অনুভব করেছি, কিন্তু পাঠাবার মত একজন লোকের যে আমার বড়ই দরকার হয়ে পড়েছিল।" প্রসঙ্গ পরিবর্তন করার জন্য তুর্কী যুদ্ধ ও সন্ধির কথা বলতে শুরু করল। বলল, "হ্যাঁ, যুদ্ধ ও সন্ধি দুইয়েরই জন্য আমাকে দোষী করা হয়েছে। ····কিন্তু ঠিক সময়ে ঠিক কাজটিই করা হয়েছে। একটা দুর্গ দখল করা কিছু শক্ত কাজ নয়, শক্ত একটা অভিযান জয় করা। আর সেজন্য দরকার—দুর্গ দখল ও আক্রমণ নয়, দরকার ধৈর্য ও সময়। এই দুটোরই আশ্রয় আমি নিয়েছিলাম, আর তাই কামেন্‌স্কির চাইতে অনেক বেশী দুর্গ দখল করেছি, আর তুর্কীদের ঘোড়ার মাংস খেতে বাধ্য করেছি! ···বিশ্বাস কর, ফরাসীদেরও সেই অবস্থা হবে, তাদেরও আমি ঘোড়ার মাংসই খাওয়াব!" চোখের জলে আবার তার দৃষ্টি আবছা হয়ে উঠল।

"কিন্তু যুদ্ধ তো আমাদের করতেই হবে," প্রিন্স আন্দ্রু বলল।

"সকলে যদি চায় তো তাই হবে; কোন উপায় নেই⋯কিন্তু আমার কথা বিশ্বাস কর বাবা, ধৈর্য ও সময়ের চাইতে শক্তিশালী আর কিছু নেই, যা কিছু করার এরাই করে। এ অবস্থায় আমাদের কি করা উচিত? আমি বলছি কি করা দরকার।" একটি ফরাসী প্রবাদ উদ্ধৃত করে বলল: "সন্দেহ যখন দেখা দেয়, মন্ চের, তখন কিছুই করো না।"

"আচ্ছা, তাহলে বিদায়; মনে রেখো, সমস্ত অন্তর দিয়ে আমিও তোমার দুঃখের অংশীদার, আর তোমার কাছে আমি প্রশান্ত মহামহিম নই, প্রিন্স নই, প্রধান সেনাপতিও নই, আমি শুধু পিতা। কখনও কোন দরকার হলে সোজা আমার কাছে চলে এসো। বিদায় বাবা!"

আর একবার প্রিন্স আন্দ্রুকে আলিঙ্গন করে তাকে চুমো খেল; কিন্তু সে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া মাত্রই কুতুজভ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে অসমাপ্ত উপন্যাস মাদাম দ জেঁলিস-এর "লে শেভালিয়েৰ্স দু সাইনে"তে মনোনিবেশ করল।

এটা কেমন করে ঘটল বা কেন ঘটল তা বুঝিয়ে বলতে না পারলেও কুতুজভের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে প্রিন্স আন্দ্রু এই নিশ্চিত ধারণা নিয়ে রেজিমেণ্টে ফিরে গেল—যে লোকটির উপর সব ভার পড়েছে সে যোগ্য লোক। সে ভাবল, "তিনি নিজের কোন পরিকল্পনা উপস্থিত করবেন না। কোন উপায় উদ্ভাবন করবেন না অথবা সেইভাবে কাজও করবেন না। কিন্তু তিনি সব কথা শুনবেন, সব কথা মনে রাখবেন, সব কিছুকেই যথাযোগ্য স্থানে রাখবেন। কোন দরকারী কাজে বাধা দেবেন না, আবার কোন ক্ষতিও হতে দেবেন না। তিনি জানেন যে তার নিজের ইচ্ছার চাইতে শক্তিশালী ও গুরুতর কিছু আছে—ঘটনার অনিবার্য গতি; সে গতিকে তিনি বুঝতে পারেন, তার তাৎপর্যকে ধরতে পারেন, এবং ধরতে পারেন বলেই তাতে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকেন।⋯সব চাইতে বড় কথা, জেঁলিস-এর উপন্যাস ও ফরাসী প্রবাদ সত্ত্বেও তিনি রুশ বলে লোকে তাকে বিশ্বাস করে; বিশ্বাস করে তার আরও কারণ তিনি যখন বললেন: 'আমাদের ওরা কোথায় নিয়ে এসেছে!' তখন তার গলা কাঁপছিল, আর যখন তিনি বললেন: 'তাদেরও ঘোড়ার মাংস খাইয়ে ছাড়ব!' তখনও তার গলা কান্নায় ভিজে উঠেছিল।"

এই অনুভূতি কম-বেশী প্রায় সকলেরই; তাই দরবারী প্রভাব সত্ত্বেও সর্বসম্মত সাধারণ স্বীকৃতির সঙ্গেই প্রধান সেনাপতি পদে কুতুজভের নির্বাচনকে গ্রহণ করা হয়েছে।

অধ্যায়—১৭

সম্রাট মস্কো থেকে চলে যাবার পরে সেখানকার জীবনযাত্রা আবার

স্বাভাবিক খাতেই বইতে শুরু করেছে; আর সেটা এত বেশী স্বাভাবিক যে সম্প্রতি যে দেশপ্রেমের এতবড় একটা উচ্ছ্বাস ও উন্মাদনা দেখা দিয়েছিল আজ সেটা মনে করাই শক্ত হয়ে উঠেছে; একথা বিশ্বাস করাও আজ শক্ত যে রাশিয়া আজ সত্য সত্যই বিপন্ন, আর ইংলিশ ক্লাবের সদস্যরা সকলেই দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত পিতৃভূমির সন্তান। শুধু একটা ক্ষেত্রে দেশপ্রেমের উন্মাদনা সমান তালেই চলতে লাগল; সেটা হল, সৈন্য ও অর্থ সরবরাহের আহ্বান; যেমুহূর্তে সেইসব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তখন থেকেই সেটা আইনগত সরকারী রূপ নিয়ে অনিবার্য হয়ে দেখা দিয়েছে।

শত্রু যতই মস্কোর দিকে এগিয়ে আসছে আসন্ন বিপদ সম্পর্কে মস্কো-পন্থীদের হেলাফেলার ভাবটা ততই যেন বেড়ে যাচ্ছে। নানা ধরনের ইস্তাহার ছাপিয়ে ফরাসীদের সম্পর্কে হাল্কা রসিকতা করা হয়েছে, আর ক্লাবে-রেস্তোরাঁতে তাই নিয়ে সরস আলোচনা চলছে। ইংলিশ ক্লাবের কোণের ঘরটাতে সদস্যরা তেমনি একটা ইস্তাহার পড়ে শোনাচ্ছে। রস্তপ্‌চিনের ইস্তাহারে জনৈক রুশ নাগরিক ফরসীদের ঠাট্টা করে বলছে: "রাশিয়ার বাঁধা-কপি খেয়ে তাদের পেটমোটা হবে, তাদের যবের পরিজ খেয়ে পেট ফাটবে, আর বাঁধাকপির ঝোল খেয়ে দমবন্ধ হবে। তারা তো সব বেঁটে-বামন, একটা চাষী মেয়েই খড়ের কাঁটা দিয়ে তাদের তিনজনকে ঠেঙাবে।" কেউ কেউ বা এ সুরটা পছন্দ করছে না; বলছে, এটা বড়ই বোকা-বোকা আর ইতর মনের পরিচায়ক।

জুলি পরদিনই মস্কো ছেড়ে যাবে; সেই উপলক্ষ্যে একটা বিদায়-সভার আয়োজন করা হয়েছে। অন্য অনেক কথার সঙ্গে রস্তভদের প্রসঙ্গও আলোচনায় স্থান পেয়েছে।

জুলি বলল, "শুনেছি তাদের অবস্থা খুব খারাপ যাচ্ছে। আর লোকটি এত অবিবেচক, মানে আমি স্বয়ং কাউণ্টের কথা বলছি। রাজুমভ্‌স্কিরা তার মস্কোর উপকণ্ঠস্থ বাড়ি ও জমিদারি কিনতে চেয়েছিল, কিন্তু দরাদরির আর শেষ হচ্ছে না। তিনি বড় বেশী দর হেঁকেছেন।

একজন বলল, "না না, আমার তো মনে হয় কয়েকদিনের মধ্যেই বিক্রি পাকা হয়ে যাবে। যদিও এখন মস্কোর কোন কিছু কেনাই পাগলামি।"

জুলি শুধাল, "কেন? আপনি নিশ্চয়ই মনে করেন না যে মস্কো বিপন্ন?"

"তাহলে আপনি মস্কো ছেড়ে যাচ্ছেন কেন?"

"আমি? এটা কি প্রশ্ন হল? আমি যাচ্ছি কারণ…কারণ সকলেই যাচ্ছে; আর তাছাড়া—আমি তো জোয়ান অব্ আর্ক বা আমাজন নই।"

"তাতো বটেই, তাতো বটেই।"

রস্তভের কথা উল্লেখ করে জনৈক বেসরকারী অফিসার বলল, "সবকিছু ভালভাবে চালাতে পারলে তিনি সব ঋণ পরিশোধ করে দিতে পারবেন।"

"বুড়ো মানুষ ভাল, তবে কাজের লোক নয়। আর এত দীর্ঘকাল তারা মস্কোতেই বা আছেন কেন? অনেক আগেই তো তাদের দেশে ফিরে যাবার কথা। নাতালি তো এখন বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছে, তাই না?" সবজান্তা হাসি হেসে জুলি পিয়েরকে জিজ্ঞাসা করল।

পিয়ের জবাব দিল, "তারা ছোট ছেলের জন্য অপেক্ষা করে আছে। ছেলেটি ওবোলেন্‌স্কির কসাকদের সঙ্গে যোগ দিয়ে বেলায়া জেবকভ-এ চলে গেছে; সেখানে একটা রেজিমেণ্ট গড়া হচ্ছে। এখন তারা চেষ্টাচরিত্র করে ছেলেটিকে আমার রেজিমেণ্টে বদলি করিয়েছে; আশা করছে, যেকোন সময়ে সে এসে পড়বে। কাউণ্ট অনেক আগেই চলে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ছেলে না ফেরা পর্যন্ত কাউণ্টেস কিছুতেই মস্কো ছেড়ে যাবেন না।"

"গত পরশু আর্খারভদের বাড়িতে তাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। নাতালি সুস্থ হয়ে উঠেছে; মুখও অনেক উজ্জ্বল হয়েছে। একটা গানও গাইল। কত সহজেই মানুষ সবকিছু ভুলে যেতে পারে!"

"কি আবার ভুলে গেল?" অসন্তুষ্ট চোখে পিয়ের শুধাল।

জুলি হাসল।

"কি জানেন কাউণ্ট, আপনার মত নাইটদের শুধু মাদাম দ সুজার উপন্যাসেই পাওয়া যায়।"

"কোন্ ধরনের নাইট? আপনি কি বলতে চাইছেন?" সলজ্জ ভঙ্গীতে পিয়ের শুধাল।

"ঠিক আছে কাউণ্ট, ঠিক আছে। আপনি তো সবই জানেন!"

"আমি কিচ্ছু জানি না," পিয়ের বলল।

"আমি জানি নাতালির সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব ছিল, আর তাই····কিন্তু আমার বন্ধুত্ব ছিল ভেরার সঙ্গে—আদরের ভেরা।"

অসন্তোষভরা গলায় পিয়ের বলতে লাগল, "না মাদাম, নাতালি রস্তভার নাইটের ভূমিকা আমি কখনও গ্রহণ করি নি, আর প্রায় এক মাস তাদের বাড়িতেও যাই নি। কিন্তু আমি বুঝতে পারি না এই নিষ্ঠুরতা·····"

"কৈফিয়ৎ দেওয়া মানেই দোষ স্বীকার করা।" জুলি হাত নেড়ে হেসে বলল। তারপর প্রসঙ্গ পাল্টে শেষ কথাটি বলল, "আর আজ কি শুনে এসেছি জানেন? বেচারি মারি বল্‌কন্‌স্কায়া গতকাল মস্কো এসেছেন। আপনি কি জানেন তিনি বাবাকে হারিয়েছেন?"

"সত্যি? তিনি কোথায় আছেন? তার সঙ্গে একবার অবশ্য দেখা করতে হবে," পিয়ের বলল।

"গতকাল সন্ধ্যা বেলাটা তার সঙ্গেই কাটিয়েছি। আজ বা কাল সকালেই ভাই-পোকে সঙ্গে নিয়ে তিনি মস্কোর নিকটবর্তী জমিদারিতে যাবেন।"

"আচ্ছা, তিনি কেমন আছেন?" পিয়ের শুধাল।

"ভালই আছেন, তবে মন খারাপ। কিন্তু জানেন কি কে তাকে উদ্ধার করেছে? সে এক রোমান্টিক ব্যাপার। নিকলাস রস্তভ। সকলে তাকে ঘিরে ধরেছিল, খুনই করে ফেলত, তার কিছু লোক আহতও হয়েছে। নিকলাস রস্তভ ছুটে গিয়ে তাকে উদ্ধার করেছে।…"

বেসরকারী অফিসারটি বলল, "আবার একটা রোমাঞ্চ। সত্যি, এই সঠিক পলায়নের সুযোগ সব বয়স্কা কুমারীদেরই বিয়ের ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে। এদিকে কাতিচে, আর ওদিকে প্রিন্সেস বল্‌কন্‌স্কায়া।"

"আপনি কি জানেন, আমার কিন্তু বিশ্বাস তিনি এই যুবকের কিঞ্চিৎ প্রেমে পড়েছেন'?"

"আবার ফরাসী ভাষা? জরিমানা দিন!"

"কিন্তু একথা কি রুশ ভাষায় বলা যায়?"

অধ্যায়—১৮

পিয়ের বাড়ি ফিরলেই সেদিনের আনা রস্তপ্‌চিনের দু'খানা ইস্তাহার তার হাতে দেওয়া হল।

প্রথম ইস্তাহারে বলা হয়েছে, কাউণ্ট রস্তপ্‌চিন জনসাধারণকে মস্কো ত্যাগ করতে নিষেধ করেছে বলে যে খবর রটেছে সেটা মিথ্যা; বরং মহিলারা ও ব্যবসায়ীদের স্ত্রীরা শহর ছেড়ে চলে যাওয়ায় সে খুশিই হয়েছে। ইস্তারে বলা হয়েছে, "এবার ত্রাস কমে যাবে, গুজবও কম ছড়াবে; কিন্তু আমার জীবনটাকে পণ রেখে বলছি, সেই শয়তান কোনদিনই মস্কোতে প্রবেশ করতে পারবে না।" এই কথাগুলি থেকেই পিয়ের সর্বপ্রথম পরিষ্কার-ভাবে বুঝতে পারল যে ফরাসীরা মস্কোতে ঢুকবে। দ্বিতীয় ইস্তাহারে বলা হয়েছে, আমাদের প্রধান ঘাঁটি ভিয়াজ্‌মাতে সরিয়ে আনা হয়েছে, কাউণ্ট উইৎগেন্‌স্তিন ফরাসীদের হটিয়ে দিয়েছে; কিন্তু মস্কোর অনেক বাসিন্দাই অস্ত্রসজ্জিত হতে ইচ্ছুক, তাই রাজকীয় অস্ত্রাগারে তাদের জন্য সব রকম অস্ত্র-শস্ত্র মজুত রাখা হয়েছে: তলোয়ার, পিস্তল, বন্দুক সবই কম দামে পাওয়া যাবে। পিয়ের দুটো ইস্তাহার নিয়েই কিছুক্ষণ ভাবল। যে ভয়ংকর ঝড়ো মেঘকে সে সর্বান্তঃকরণে কামনা করছিল সেটা আসন্ন হয়ে উঠেছে।

"আমি কি সেনাদলে চাকরি নেব, না অপেক্ষা করব?" শততম বারের জন্য সে নিজেকে প্রশ্নটা করল। টেবিলের উপর থেকে তাসের প্যাকেটটা নিয়ে পেশেন্স" খেলার আয়োজন করল।

তাসগুলো বেটে হাতে নিয়ে মাথাটা তুলে ভাবল, "পেশেন্স খেলাটা যদি মিলে যায় তাহলে বুঝব…কি বুঝব?"

এ প্রশ্নের কোন মীমাংসা করার আগেই বড় প্রিন্সেস দরজায় দাঁড়িয়ে জানতে চাইল, সে ঘরে ঢুকতে পারে কি না।

"তাহলে বুঝব যে আমাকে সেনাদলে যেতেই হবে," নিজের মনে কথাটা বলে সে প্রিন্সেসের উদ্দেশ্যে বলল, "এস, এস।"

একমাত্র বড় প্রিন্সেসই এখনও পিয়েরের বাড়িতে বাস করছে। উত্তেজিত গলায় সে বলল, "তোমার কাছে আসার জন্য আমাকে ক্ষমা কর। তুমি তো জান, একটা সিদ্ধান্তে আসতেই হবে। কি ঘটবে কে জানে? সকলেই মস্কো ছেড়ে চলে গেছে। লোকজনরা দাঙ্গা শুরু করেছে। অথচ আমরা এখনও এখানেই বসে আছি কেন?"

ঈষৎ ঠাট্টার সুরে পিয়ের বলল, "বরং সব কিছু তো ভালই মনে হচ্ছে দিদি।"

"ভালই বটে! খুব ভাল! আমাদের সৈন্যরা যা খেল দেখাচ্ছে সেকথা বারবারা আইভানভ্না আজই আমাকে বলেছে। এসবই নিশ্চয় তাদের কৃতিত্বের পরিচায়ক। এদিকে লোকজনরা তো বিদ্রোহ শুরু করে দিয়েছে—কেউ কথা শুনছে না, আমার দাসীটি পর্যন্ত রুক্ষ ব্যবহার শুরু করেছে। এরকম চলতে থাকলে অচিরেই তারা আমাদের মার লাগাতে শুরু করবে। রাস্তায় পর্যন্ত বের হওয়া যাচ্ছে না। সবচাইতে বড় কথা, ফরাসীরা যেকোনদিন এখানে এসে হাজির হবে; তাহলে আমরা এখানে অপেক্ষা করে আছি কিসের জন্য? তোমার কাছে আমার একটিই অনুরোধ ভাই, আমার পিতার্সবুর্গ যাবার ব্যবস্থা করে দাও। আমি যেই হই না কেন, বোনাপার্তের শাসনাধীনে বাঁচতে চাই না।"

"আহা, আমার কথাটাই শোন দিদি। এসব খবর তুমি কোথায় পেলে? বরং···"

"নেপোলিয়নের বশ্যতা আমি স্বীকার করব না! অন্যরা যা খুশি করুক···· তুমি যদি ব্যবস্থা করে দিতে না চাও···"

"ব্যবস্থা অবশ্যই করব; এই মুহূর্তে হুকুম দিচ্ছি।"

রাগ দেখাবার মত কাউকে না পাওয়াই যেন প্রিন্সেসের রাগের কারণ। নিজের মনে বিড় বিড় করতে করতে সে একটা চেয়ারে বসে পড়ল।

পিয়ের বলতে লাগল, "কিন্তু তুমি ভুল খবর পেয়েছ। শহর এখন খুব শান্ত, তিলমাত্র বিপদ কোথাও নেই। শোন! এইমাত্র পড়ছিলাম····" সে ইস্তাহারটা দেখাল। "কাউন্ট রস্তপ্চিন লিখেছেন, শত্রু যাতে মস্কোতে ঢুকতে না পারে সেজন্য তার জীবনটাই তিনি পণ রাখছেন।"

প্রিন্সেস বিদ্বেষভরা গলায় বলল, "ওঃ, তোমাদের সেই কাউন্ট তো! সে তো একটা ভণ্ড, সেই তো লোকদের দিয়ে দাঙ্গা বাঁধিয়েছে। এইসব বাজে ইস্তাহারে সে কি একথা লেখেনি যে 'সে যেই হোক চুলের মুঠি ধরে তাকে হাজতে নিয়ে যেতে হবে? (কী বোকার মত কথা!) আর তাকে যে গ্রেপ্তার করবে তাকে দেওয়া হবে সম্মান ও গৌরব।' তার চাটুবাদই তো

আমাদের এত নীচে টেনে নামিয়েছে! বারবারা আইভানভ্না আমাকে বলেছে, সে ফরাসীতে কিছু বলেছিল বলে উচ্ছৃংখল জনতা তাকে প্রায় খুন করে ফেলেছিল।"

"ওঃ, কিন্তু অবস্থা তো…তুমি সব কিছুতেই এত ভেঙে পড়," এই কথা বলে পিয়ের পেশেন্স খেলায় মন দিল।

খেলাটা না মিললেও পিয়ের সেনাদলে যোগ দিতে গেল না, সেই একই উত্তেজিত, অস্থিরচিত্ত, শংকিত মনেই জনবিরল পরিত্যক্ত মস্কোতে রয়ে গেল; একটা ভয়ংকর কিছুর সানন্দ প্রতীক্ষায় দিন কাটাতে লাগল।

পরদিন সন্ধ্যায় প্রিন্সেস রওনা হয়ে গেল। বড় নায়েব এসে খবর দিল, একটা জমিদারি না বেচলে তার রেজিমেণ্টের সাজ-সরঞ্জাম কেনার পয়সা জুটবে না। সে পরিষ্কার করেই জানিয়ে দিল যে একটা রেজিমেণ্ট গড়ে তোলার পরিকল্পনাই তার সর্বনাশ ডেকে আনবে। পিয়ের কান পেতে শুনল; তবু ঠোঁটের হাসিটা চাপতে পারল না।

বলল, "বেশ তো, বেচে দিন। কি আর করা যাবে? এখন তো আর কথা ফেরানো চলে না!"

অবস্থা যত খারাপ হতে লাগল, বিশেষ করে তার নিজের অবস্থা, পিয়ের যেন ততই খুশি হয়ে উঠল: ততই সে যেন নিশ্চিত হল যে তার প্রত্যাশিত বিপদটি আসন্ন হয়ে উঠেছে। তার পরিচিত কেউই শহরে নেই। জুলি চলে গেছে, প্রিন্সেস মারিও। ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে আছে শুধু রস্তভরা; কিন্তু সে তাদের সঙ্গে দেখা করতেও যায় না।

মনকে অন্যদিকে সরিয়ে নেবার জন্য একদিন সে ভরন্ত্‌শোভো গ্রামে গেল; শত্রুকে ধ্বংস করার জন্য সেখানে লেপ্‌পিচ নামক যে বড় বেলুনটা তৈরি হচ্ছে সেটা দেখতে এবং পরদিন যে পরীক্ষামূলক ওড়ানো হবে সেটাও বেলুনটাকে দেখতে। বেলুন তৈরি এখনও শেষ হয় নি; পিয়ের শুনল যে সম্রাটের ইচ্ছানুসারেই সেটা তৈরি হচ্ছে। সম্রাট কাউণ্ট রস্তপ্‌চিনকে লিখেছে:

"লেপ্‌পিচ প্রস্তুত হওয়া মাত্রই তার গাড়ির জন্য একদল নির্ভরযোগ্য বুদ্ধিমান লোক যোগাড় করবেন এবং জেনারেল কুতুজভকে খবরটা জানাতে একজন সংবাদবাহককে তার কাছে পাঠাবেন। আমি তাকে ব্যাপারটা জানিয়েছি।

"লেপ্‌পিচ প্রথম কোথায় অবতরণ করবে সেবিষয়ে যেন সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়; সেটা যেন ভুল করে শত্রুর হাতে না পড়ে। প্রধান সেনাপতির গতি-বিধির সঙ্গে তার গতিবিধির মিল থাকা একান্ত দরকার।"

ভরন্ত্‌সোভো থেকে বাড়ি ফিরবার পথে বলোৎমুপ্লেস-এর পাশ দিয়ে যাবার সময় পিয়ের দেখল লোব্‌নুপ্লেস-এ (মস্কোর মৃত্যুদণ্ড দেবার জায়গা; সেকালে জায়গাটি ছিল ক্রেম্‌লিনের সম্মুখবর্তী রেড স্কোয়ারে।) অনেক

লোকের ভিড় জমেছে। সে গাড়ি থামিয়ে সেখানেই নেমে পড়ল। গুপ্তচর-বৃত্তির অভিযোগে একজন রাঁধুনিকে চাবুক মারা হচ্ছে। দণ্ডদান শেষ করে জল্লাদ সেই শক্ত-সমর্থ লোকটির বাঁধন খুলে দিচ্ছে। লোকটির মুখে লাল গোঁফ, পরনে নীল মোজা ও সবুজ কুর্তা। সে করুণ স্বরে আর্তনাদ করছে। শুকনো, বিবর্ণ অপর অপরাধী কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। মুখ দেখেই বোঝা যায়, দুজনই ফরাসী।

শুটকো ফরাসী লোকটির মুখের মত ভয়ার্ত, যন্ত্রণাদীর্ণ ভাব ফুটে উঠল পিয়েরের মুখে। ভিড় ঠেলে অগ্রসর হতে হতে সে প্রশ্ন করতে লাগল: "কি হয়েছে? লোকটি কে? কেন এই শাস্তি?"

ভিড়ের মধ্যে সমবেত ছোট-বড়, নারী-পুরুষ সকল ধরনের মানুষই তখন লোব্‌নু প্লেস-এর কার্যকলাপ দেখতে এতই ব্যস্ত যে কেউ তার প্রশ্নের জবাব দিল না। শক্ত-সমর্থ লোকটি উঠে দাঁড়াল, ভুরু কুঁচকাল, কোনদিকে না তাকিয়ে গায়ের কুর্তাটা খুলতে লাগল; তার পরেই হঠাৎ তার ঠোঁট দুটি কাঁপতে লাগল, সে কাঁদতে শুরু করল। ভিড়ের মানুষরা এতক্ষণে গলা ছেড়ে কথা বলতে লাগল; পিয়েরের মনে হল, নিজেদের করুণার অনুভূতিকে চাপা দেবার জন্যই তারা এমন করছে।

"লোকটা কোন প্রিন্সের রাঁধুনি।"

"আর মঁসিয়, রুশ সজি ফরাসীদের জিভে টকই লাগে। ...একেবারে দাঁতে দাঁত লেগে গেছে!" পিছন থেকে একজন করণিক বলে উঠল।

তার কথা শুনে কেউ কেউ হাসল, কেউবা জল্লাদের দিকেই তাকিয়ে থাকল।

পিয়েরের গলা বন্ধ হয়ে আসছে, মুখ কুঁচকে গেছে; তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে গাড়িতে চাপল। যেতে যেতেই তার শরীর শিউরে উঠতে লাগল; আপন মনেই বারকয়েক এত জোরে কথা বলল যে কোচয়ান জিজ্ঞাসা করল:

"কিছু বলছেন হুজুর?"

কোচয়ানকে লুবিয়াংকা স্ট্রীট ধরে গাড়ি চালাতে দেখে পিয়ের চীৎকার করে বলল, "কোথায় চলেছ?"

"আপনার হুকুম মত শাসনকর্তার বাড়িতে," কোচয়ান বলল।

"মূর্খ! নির্বোধ!" পিয়ের চীৎকার করে কোচয়ানকে বকুনি দিল—একাজটা সে কদাচিৎ করে থাকে।" তোমাকে তো বলেছি বাড়ি যেতে! আরও জোরে চালাও, মাথামোটা কোথাকার!" নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলল, "আজই আমি চলে যাব।"

লোব্‌নু প্লেস-এ নির্যাতিত ফরাসীটিকে ও ভিড়ের লোকগুলিকে দেখে পিয়ের এতই স্পষ্টভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে সে আর একদণ্ডও এখানে থাকবে না। সেইদিনই সেনাদলে যোগ দিতে যাত্রা করবে, যে তার মনে

হল হয় সে নিজেই কোচয়ানকে সেকথা বলেছে, অথবা নিজের থেকেই সেটা বুঝতে পারা কোচয়ানের উচিত ছিল।

বাড়ি পৌঁছেই পিয়ের বড় কোচয়ান এভ্‌স্তাফেকে হুকুম করল, সেই রাতেই সে মোঝায়েস্ক-এ সেনাদলে যোগ দিতে যাত্রা করবে; কাজেই তার ঘোড়াগুলোকে যেন সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এভ্‌স্তাফে যখন জানাল যে একটা দিনের মধ্যে এতসব ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়, তখন সে বাধ্য হয়ে পরের দিন পর্যন্ত যাত্রা স্থগিত রাখল।

একটানা বৃষ্টির পরে ২৪ তারিখে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। ডিনারের পরে পিয়ের মস্কো ত্যাগ করল। সেদিন রাতে পের্খু শ্‌কভোতে ঘোড়া বদল করবার সময় সে জানতে পারল, সেদিন সন্ধ্যায়ই সেখানে একটা বড় রকমের যুদ্ধ হয়ে গেছে। (এটাই শেভার্দিনোর যুদ্ধ।) তাকে বলা হল, গোলাবর্ষণের ফলে পের্খু শ্‌কভোর মাটি কেঁপে উঠেছিল, কিন্তু যুদ্ধে কে জিতেছে এ-প্রশ্নের উত্তর কেউ দিতে পারল না। পরদিন ভোরেই পিয়ের মোঝায়েস্ক-এর কাছে পৌঁছে গেল।

মোঝায়েস্ক-এর প্রতিটা বাড়িতেই সৈন্যরা আস্তানা পেতেছে; যে হোস্টেলে তার সহিস ও কোচয়ানের সঙ্গে পিয়েরের দেখা হল সেখানে একটা ঘরও পাওয়া গেল না। সব ঘরই অফিসারে ভর্তি।"

মোঝায়েস্ক-এ এবং তাকে ছাড়িয়ে অনেক দূর পর্যন্ত সৈন্যরা হয় আস্তানা পেতেছে, নয়তো চলাচল করছে। সর্বত্র চোখে পড়ছে পদাতিক ও অশ্বারোহী কসাক, মালগাড়ি, বারুদের গাড়ি আর কামান। 'পিয়ের' যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এগিয়ে চলল; মস্কো যত দূরে সরে যেতে লাগল ততই সে যেন ডুবে যেতে লাগল সেনা-সমুদ্রে, আর ততই এমন একটা অশান্ত উত্তেজনা ও সানন্দ অনুভূতি তার মনে জাগতে লাগল যার অভিজ্ঞতা আগে কখনও তার হয় নি। সম্রাটের পরিদর্শনকালে স্লবোদা প্রাসাদে যে অনুভূতি তার হয়েছিল এখনকার অনুভূতি ঠিক তারই অনুরূপ—কোন কিছু করার এবং কোন কিছু ত্যাগ করার অনিবার্য প্রয়োজনের অনুভূতি। তার মনে এই সানন্দ চেতনা জাগল যে মানুষের সুখের যত কিছু উপকরণ—জীবনের আরাম, অর্থ, এমন কি জীবনটা পর্যন্ত—সবই তুচ্ছ; এমন কিছু আছে যার তুলনায় এসব কিছু ছুঁড়ে ফেলাও আনন্দের···কিন্তু সেটা কি? সেকথা পিয়ের বলতে পারল না; কার জন্য এবং কিসের জন্য সব কিছু ত্যাগ করাতে এই আনন্দ সেটা বুঝতেও সে চেষ্টা করল না। কিসের জন্য এই ত্যাগ স্বীকার সে প্রশ্ন তার মনেই এল না; ত্যাগটাই তাকে এনে দিল সম্পূর্ণ নতুন এক আনন্দময় অনুভূতি।

অধ্যায়—১৯

২৪শে আগস্ট হল শেভার্দিনো দুর্গের যুদ্ধ, ২৫শে তারিখে কোন পক্ষ থেকেই একটিও গুলিবর্ষণ করা হল না, আর ২৬শে তারিখে হল বরদিনোর যুদ্ধ।

শেভার্দিনো আর বরদিনোতে কেন যুদ্ধ করা হল, আর কেমন করেই বা সেটা ঘটল? বরদিনোর যুদ্ধটাই বা হল কেন? ফরাসী বা রুশ কারও দিক থেকেই এ যুদ্ধের কোন সঙ্গত কারণ ছিল না। রুশদের পক্ষে এ যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফল হল—আর সেটাই হতে বাধ্য—মস্কো ধ্বংস হওয়ার আরও কাছাকাছি আমরা এসে পড়লাম, অথচ পৃথিবীতে সেটাকেই আমরা ভয় করেছি সবচাইতে বেশী; আবার ফরাসীদের পক্ষে এ যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফল হল, তাদের গোটা বাহিনীর ধ্বংসের আরও কাছাকাছি তারা এসে পড়ল—অথচ পৃথিবীতে সেটাকেই তারাও ভয় করেছে সবচাইতে বেশী। ফল যে কি হবে তা জানাই ছিল, তবু নেপোলিয়ন সে যুদ্ধে এগিয়ে এল, আর কুতুজভ সে যুদ্ধের আহ্বানকে গ্রহণ করল।

দুই সেনাপতি যদি যুক্তির দ্বারা পরিচালিত হত তাহলে নেপোলিয়নের পরিষ্কার বোঝা উচিত ছিল যে তেরো শ' মাইল ভিতরে ঢুকে মোট সৈন্যের এক-চতুর্থাংশকে হারাবার সম্ভাবনা নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে সে নিশ্চিত ধ্বংসের দিকেই এগিয়ে চলেছে; আবার কুতুজভেরও সমান পরিষ্কারভাবে বোঝা উচিত ছিল যে এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এক-চতুর্থাংশ সৈন্য হারাবার ঝুঁকি নিলে সেও নিশ্চিতভাবেই মস্কোকে হারাবে। কুতুজভের কাছে এটা তো গাণিতিক হিসাবের মতই পরিষ্কার; যেমন ড্রাফ্‌ট্‌স্‌ খেলায় (একরকম দাবা খেলা) আমার যদি একটা ঘুঁটি কম থাকে এবং তারপরেও আমি যদি ক্রমাগত ঘুঁটি পাল্টা-পাল্টি করি তাহলে শেষ পর্যন্ত আমার হার হবেই, আর তাই পাল্টা-পাল্টি করা আমার পক্ষে উচিত নয়। যখন প্রতিপক্ষের আছে ষোলটি ঘুঁটি আর আমার আছে চৌদ্দটি, তখন তার তুলনায় আমার দুর্বলতা আট ভাগের এক ভাগ, কিন্তু আমি যদি আরও তেরোটি ঘুঁটি বদল করি, তাহলে সে হবে আমার চাইতে তিনগুণ বেশী শক্তিশালী।

বরদিনো যুদ্ধের আগে ফরাসীদের তুলনায় আমাদের সৈন্যসংখ্যা ছিল মোটামুটি ছয়জনে পাঁচজন, কিন্তু ঐ যুদ্ধের পরে সেটা দাঁড়াল দুজনে একজন: অর্থাৎ যুদ্ধের আগে আমাদের সৈন্য ছিল এক শ' বিশ হাজারের বিরুদ্ধে একশ' হাজার এবং যুদ্ধের পরে সেটা দাঁড়াল একশ' হাজারের বিরুদ্ধে পঞ্চাশ হাজার। তথাপি অভিজ্ঞ, ঝানু কুতুজভ সে যুদ্ধকে গ্রহণ করল, আর প্রতিভা-দীপ্ত সেনাপতি বলে বর্ণিত নেপোলিয়ন সেই যুদ্ধ করে হারাল এক-চতুর্থাংশ সৈন্য এবং তার যোগাযোগ ব্যবস্থা হল আরও অনেক বেশী দীর্ঘ। বলা হয়ে থাকে, ভিয়েনা দখল করেই যেভাবে আগেকার অভিযানে ইতি টানা

হয়েছিল, ঠিক সেইভাবে মস্কো দখল করেই এ অভিযানকে শেষ করার ইচ্ছাই নেপোলিয়নের ছিল। কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণ অন্য কথাই বলে। নেপোলিয়নের ইতিহাসকাররা নিজেরাই বলেছে, স্মোলেন্স্ক্ পার হবার পর থেকেই নেপোলিয়ন থামতে চেয়েছে, যুদ্ধের পরিধি ব্যাপকতর করার বিপদ সম্পর্কে সে অবহিত ছিল, সে জানত যে মস্কো দখল করলেই অভিযান শেষ হবে না, কারণ স্মোলেন্স্ক্-এর বেলায়ই তো দেখেছে কিভাবে রুশ শহরগুলিকে তার হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, বারবার সন্ধির আলোচনার কথা ঘোষণা করা সত্ত্বেও রুশদের পক্ষ থেকে কোনরকম সাড়া পাওয়া যায়নি।

বরদিনোতে যুদ্ধের প্রস্তাব করা এবং সে প্রস্তাবকে গ্রহণ করা—উভয় ক্ষেত্রেই কুতুজভ কাজ করেছে সম্পূর্ণ ইচ্ছাশক্তি রহিতভাবে, যুক্তিবিবর্জিত ভাবে। কিন্তু পরবর্তীকালে ইতিহাসকাররা ঘটনার সঙ্গে খাপ খাইয়ে সুকৌশলে সেনাপতিদের দূরদৃষ্টি ও প্রতিভার স্বপক্ষে নানা সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করেছে, অথচ ইতিহাসের হাতে অন্যসব অন্ধ যন্ত্রের মতই তারাও ছিল অতিমাত্রায় শৃংখলিত ও ইচ্ছাশক্তিরহিত।

প্রাচীনকালের মানুষরা আমাদের জন্য এমন অনেক বীরত্বব্যঞ্জক আদর্শ কাব্য-কাহিনী রেখে গেছে যেখানে নায়করাই কাহিনীর মূল কেন্দ্র; আর আমরাও আজ পর্যন্ত এ সত্যকে মেনে নিতে পারি নি যে আমাদের যুগে সে ধরনের ইতিহাস সম্পূর্ণ অর্থহীন।

অন্যদিকে, বরদিনোর যুদ্ধ এবং তার পূর্ববর্তী শেভার্দিনোর যুদ্ধ কিভাবে হয়েছিল সে সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা আছে তা সুস্পষ্ট ও সুপরিচিত হলেও সম্পূর্ণ মিথ্যা। সব ইতিহাসকারই সে ঘটনার নিম্নরূপ বর্ণনা দিয়েছে:

"রুশ বাহিনী স্মোলেন্স্ক থেকে পশ্চাদ্‌প্সরণের পথে যুদ্ধের পক্ষে সব-চাইতে উপযুক্ত একটা জায়গা খুঁজতে খুঁজতে সেটা পেয়ে গেল বরদিনোতে।

"মস্কো থেকে স্মোলেন্স্ক যাবার বড় রাস্তার বাঁ দিকে এবং তার সঙ্গে সমকোণে অবস্থিত বরদিনো থেকে উতিৎসা যাবার পথের পাশে ঠিক সেই জায়গাটাকে আগে থেকেই সুরক্ষিত করে রাখল যেখানে পরে যুদ্ধটা হয়েছিল।

"সেই ঘাঁটির ঠিক সামনে শত্রুপক্ষের উপর নজর রাখবার জন্য শেভার্দিনো স্তূপের উপর একটা সুরক্ষিত ফাঁড়ি গড়ে তোলা হল। ২৪শে তারিখে নেপোলিয়ন সেই অগ্রবর্তী ঘাঁটিটাকে আক্রমণ করে দখল করে নিল এবং ২৬শে তারিখে বরদিনো রণক্ষেত্রে যুদ্ধের জন্য অপেক্ষারত গোটা রুশ বাহিনীকেই আক্রমণ করল।"

ইতিহাস এই কথাই বলে, কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভুল, আর প্রকৃত সত্য জানতে আগ্রহী যেকোন লোক সহজেই সেটা বুঝতে পারে।

রুশরা কোন ভাল ঘাঁটিরই খোঁজ করে নি; বরং পশ্চাদপসরণের পক্ষে

বরদিনোর চাইতে অনেক ভাল ভাল জায়গা পার হয়ে গিয়েছিল। তারা যে সেসব কোন জায়গাতেই থামে নি তার অনেকগুলি কারণ: নিজের পছন্দ ছাড়া অন্য কোথাও ঘাঁটি তৈরির ইচ্ছা কুতুজভের ছিল না; জনসাধারণের যুদ্ধের দাবী তখনও যথেষ্ট জোরদার হয়ে প্রকাশ পায় নি; মিলোবাদভিচ তখনও অসামরিক বাহিনী নিয়ে এসে হাজির হয় নি; এরকম আরও অনেক কারণ ছিল। আসলে বরদিনোর ঘাঁটি (যেখানে যুদ্ধটা হয়েছিল) সুরক্ষিত তো ছিলই না, বরং তাকে একটা ঘাঁটিই বলা যায় না; রুশ সাম্রাজ্যের মানচিত্রের বুকে বিনা ভাবনা-চিন্তায় যেখানে একটা পিন ফুটিয়ে দেওয়া যায় সেই স্থানটিকেই ঘাঁটি হিসাবে বরদিনোর চাইতে ভাল বলা যেতে পারে।

বরদিনোর রণক্ষেত্রে রুশরা যে কোনরকম শক্ত ঘাঁটি গড়ে তোলেনি তাই শুধু নয়, ১৮১২-র ২৫শে অগাস্টের আগে তারা ভাবেই নি যে সেখানে একটা যুদ্ধ হতে পারে। নানা ঘটনা থেকেই এটা বোঝা যায়। প্রথমত, ২৫ তারিখের আগে সেখানে কোন পরিখাই কাটা হয় নি, আর ২৫শে তারিখে যেসব পরিখা কাটা শুরু করা হয়েছিল তাও শেষ করা হয় নি; দ্বিতীয়ত, শেভার্দিনো দুর্গের অবস্থান। যে স্থানটা যুদ্ধের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিল তার ঠিক সামনে ওরকম একটা দুর্গ গড়া একেবারেই অর্থহীন। অন্য সব ঘাঁটি থেকে সেটাকেই বা বেশী শক্তিশালী করা হয়েছিল কেন? ২৪ তারিখ গভীর রাত পর্যন্ত সেটাকে রক্ষা করতে গিয়ে কেন সব শক্তি নিঃশেষ করা হল? কেনই বা ছ'হাজার সৈন্যকে বিসর্জন দেওয়া হল? শত্রুর উপর নজর রাখার জন্য একটা কসাক রক্ষীদলই তো যথেষ্ট ছিল। তৃতীয়ত, যুদ্ধটা কোথায় হবে সেটা যে আগে থেকে জানা ছিল না এবং শেভার্দিনো দুর্গটা যে অগ্রবর্তী ঘাঁটি ছিল না তার প্রমাণস্বরূপ আমরা জানি যে ২৫শে তারিখ পর্যন্ত বার্ক্‌লেদ তলি এবং ব্যাগ্রেশনের ধারণা ছিল যে শেভার্দিনো দুর্গ ছিল সেই ঘাঁটির বাম ব্যূহ, আর যুদ্ধের পরে তাড়াতাড়িতে লিখিত প্রতিবেদনে কুতুজভ নিজেই বলেছে যে শেভার্দিনো দুর্গ ছিল ঘাঁটির বাম ব্যূহ। অনেককাল পরে যখন ধীরে সুস্থে অবসর সময়ে বরদিনো যুদ্ধের প্রতিবেদন লিখিত হল তখন (সম্ভবত অভ্রান্ত প্রধান সেনাপতির ভুল-ভ্রান্তিগুলিকে সমর্থন করার জন্যই) এই মর্মে অসত্য ও অসাধারণ বিবৃতিগুলি আবিষ্কার করা হল যে শেভার্দিনো দুর্গ ছিল একটা অগ্রবর্তী ঘাঁটি এবং আমরা বরদিনোর যুদ্ধ করেছিলাম পূর্বনির্বাচিত একটা পরিখা-বেষ্টিত রণক্ষেত্রে, অথচ আসলে যুদ্ধটা হয়েছিল এমন একটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত জায়গায় যেখানে কোনরকম পরিখাই ছিল না।

আসলে ব্যাপারটা ঘটেছিল এই রকম: কলোচা নদী যেখানে বড় রাস্তাটাকে কেটে বেরিয়েছে সমকোণে নয়, একটা সূক্ষ্ম কোণ সৃষ্টি করে—

সেখানে কলোচা নদীর তীর বরাবর একটা জায়গা বেছে নেওয়া হয়েছিল ; ফলে ঘাঁটির বাম ব্যূহ ছিল শেভার্দিনোতে, দক্ষিণ ব্যূহ ছিল নভু নামক একটা গ্রামের কাছে, আর কেন্দ্র ছিল কলোচা ও ভয়না নদীর সঙ্গমস্থলে বরদিনোতে।

২৪শে তারিখে অশ্বারোহণে ভালুভো-র দিকে যেতে যেতে উতিৎসা থেকে বরদিনো পর্যন্ত কোথাও রুশদের কোন ঘাঁটি নেপোলিয়নের চোখে পড়ে নি (ইতিহাসের বইতে অবশ্য লেখা হয়েছে যে নেপোলিয়ন তা দেখেছিল), বা কোন অগ্রবর্তী ঘাঁটিও সে দেখে নি (দেখা সম্ভব নয় কারণ তাদের কোন অস্তিত্বই ছিল না) ; কিন্তু পশ্চাৎবর্তী রুশ বাহিনীকে অনুসরণ করে নেপোলিয়ন শেভার্দিনো দুর্গে রুশ ঘাঁটির বাম ব্যূহের সামনে এসে পড়ে এবং রুশদের পক্ষে একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে কলোচা নদীর তীর বরাবর সৈন্যদের পরিচালিত করে। এদিকে একটা যুদ্ধ শুরু করবার মত সময় হাতে না থাকায় রুশরা তাদের বাম ব্যূহটাকে সরিয়ে নিয়ে এমন একটা জায়গায় ঘাঁটি করল যেটা আগে ভাবাই হয় নি এবং ফলে যেখানে কোনরকম রক্ষা-ব্যবস্থাই ছিল না। কলোচা নদী পার হয়ে বড় রাস্তার বাঁ দিকে পৌছে নেপোলিয়ন আসন্ন যুদ্ধটাকেই ডান দিক থেকে বাঁ দিকে (রুশদের দৃষ্টিকোণ থেকে) সরিয়ে উতিৎসা, সেমেনভ্স্ক্ ও বরদিনোর মধ্যবর্তী এমন একটা প্রান্তরে নিয়ে গেল—রণক্ষেত্র হিসাবে যেটা রাশিয়ার অন্য যে-কোন প্রান্তরের চাইতে সুবিধাজনক কিছু নয়—এবং সেখানেই ২৬শে তারিখের পুরো যুদ্ধটা হল। যে যুদ্ধের কথা ভাবা হয়েছিল এবং বাস্তবক্ষেত্রে যেখানে যুদ্ধটা হয়েছিল তার একটা রেখা-চিত্র সংযোজিত হল।

নেপোলিয়ন যদি ২৪শে তারিখ সন্ধ্যায় অশ্বারোহণে কলোচা নদীতীরে না পৌছত এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দুর্গ আক্রমণের নির্দেশ না দিত, তাহলে হয় তো আমাদের পরিকল্পনা মতই যুদ্ধটা হত। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে আমাদের পশ্চাদ্বর্তী বাহিনীর পশ্চাদপসরণের পরে সেই সন্ধ্যায়ই আমাদের বাম ব্যূহের উপর আক্রমণ হওয়ায় এবং ২৪শে তারিখ সন্ধ্যায়ই একটা যুদ্ধে লিপ্ত হবার মত বাসনা বা সময় কোনটাই রুশ সেনাপতিদের না থাকায় ২৪ তারিখেই বরদিনোর যুদ্ধের প্রথম ও প্রধান সংঘর্ষে আমাদের হার হল এবং স্বভাবতই ২৬শে তারিখের যুদ্ধেরও সেই একই ফল হল।

শেভার্দিনো দুর্গ হাতছাড়া হবার পরে ২৫শে তারিখ সকালে আমাদের বাম ব্যূহের কোন ঘাঁটি না থাকায় সেটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে যেকোন একটা স্থানে পরিখা কেটে তাড়াতাড়ি সেখানে ঘাটি বনানো হল।

২৬শে তারিখে রুশ বাহিনী যে অসম্পূর্ণ ও দুর্বল একটা পরিখা দ্বারা রক্ষিত ছিল তাই শুধু নয়, আমাদের সৈন্যদের আরও অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল রুশ সেনাপতিদের অজ্ঞতার জন্য—আমাদের বাম ব্যূহের ঘাঁটি যে

হাতছাড়া হয়ে গেছে এবং আসন্ন যুদ্ধের গোটা রণক্ষেত্রই যে ডান থেকে বাঁ দিকে স্থানান্তরিত হয়েছে সেটা পুরোপুরি বুঝতে না পারায় তারা নোভু থেকে উতিৎসা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ঘাটিটাই রক্ষা করতে চেষ্টা করল এবং তার ফলে যুদ্ধ চলার সময়েই তাদের সৈন্যদের ডান থেকে বাঁ দিকে সরিয়ে নিতে হল। ফল এই দাঁড়াল যে যুদ্ধের সময় আগাগোড়াই রুশ বাহিনীকে গোটা ফরাসী বাহিনীর মোকাবিলা করতে মাত্র অর্ধেক সৈন্য নিয়ে। কাজেই বরদিনোর যুদ্ধের যে বিবরণ আমরা পাই আসলে যুদ্ধটা মোটেই সেভাবে হয় নি। কাজেই কোন পূর্ব-নির্বাচিত পরিখা-বেষ্টিত রণক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের তুলনায় সামান্য দুর্বল সৈন্যশক্তি নিয়ে আমরা বরদিনোর যুদ্ধে লড়াই করি নি; শেভার্দিনো দুর্গ হারাবার ফলে রাশিয়াকে সে যুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছে ফরাসী সৈন্যসংখ্যার অর্ধেক সৈন্য নিয়ে প্রায়-পরিখাবিহীন একটি উন্মুক্ত প্রান্তরে; অর্থাৎ লড়াই হয়েছিল এমন পরিস্থিতিতে যাতে দশ ঘণ্টা লড়াই চালানো এবং ফলাফলকে অমীমাংসিত রাখাটা যে অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার তাই শুধু নয়, তিন ঘণ্টার জন্যও একটি সেনাদলকে সম্পূর্ণ বিপর্যয় ও পলায়নের হাত থেকে রক্ষা করাটাও অচিন্ত্যনীয়।

অধ্যায়—২০

২৫শে সকালে পিয়ের মোঝায়েস্ক থেকে যাত্রা করল। খাড়া পাহাড়টার উৎরাইয়ের মুখে একটা আঁকাবাঁকা রাস্তা যেখানে গির্জাটাকে ডাইনে রেখে শহর থেকে বাইরের দিকে চলে গেছে সেখানে তখন গির্জায় প্রার্থনা চলছে, ঘণ্টা বাজছে। গাড়ি থেকে নেমে পিয়ের পায়ে হেঁটে এগিয়ে গেল। তার পিছনে একটা অশ্বারোহী রেজিমেণ্ট গায়কদের সামনে নিয়ে পাহাড় থেকে নেমে আসছে। আগের দিনের যুদ্ধে আহত সৈনিকদের নিয়ে এক সার গাড়ি তার দিকেই উঠে আসছে। চাষীরা হৈ-হৈ করতে করতে ঘোড়ার পিঠে চাবুক কসিয়ে রাস্তা পারাপার করছে। প্রতিটি গাড়িতে তিন বা চারজন আহত সৈনিক শুয়ে-বসে আছে। খাড়া উৎরাইয়ের উপর পাথর বিছিয়ে রাস্তার মত যা তৈরি করা হয়েছে তাতে ঠোকর খেয়ে গাড়িগুলো টালমাটাল হয়ে চলেছে। ছেঁড়া ন্যাকরা দিয়ে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা আহত সৈনিকদের গাল বিবর্ণ, ঠোঁটে ঠোঁট চাপা, কুঁচকানো ভুরু দুটো একসঙ্গে জুড়ে আছে। পরস্পরের সঙ্গে ঠোকাঠুকি বাঁচাতে তারা গাড়ির পাশগুলো চেপে ধরে আছে। প্রায় সকলেই শিশুসুলভ সরল কৌতূহলে পিয়েরের সাদা টুপি ও সবুজ চাতক-লেজ কোটের দিকে তাকিয়ে দেখছে।

পিয়েরের কোচয়ান রেগে চীৎকার করে আহত সৈনিকদের গাড়িগুলোকে একদিকে সরে যেতে বলল। গায়কবৃন্দসহ অশ্বারোহী রেজিমেণ্টটি নেমে এসে পিয়েরের গাড়িটাকে ঘিরে ধরল; রাস্তাটা বন্ধ হয়ে গেল। পিয়ের

থামল। আহত সৈনিকদের একটা গাড়ি পিয়েরের ঠিক পাশেই থেমে গেল। বাকলের জুতো পরা গাড়োয়ানটি তখনও হাঁপাচ্ছে; টায়ারবিহীন পিছনের চাকার নীচে একটা পাথর বসিয়ে সে ছোট ঘোড়াটার পরিচর্যায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

একটি আহত বুড়ো সৈনিক ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাত নিয়ে গাড়ির পিছন পিছন হেঁটে আসছিল। ভাল হাতটা দিয়ে গাড়িটাকে ধরে সে পিয়েরের দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

"বলুন তো দেশের মানুষ, এরা কি আমাদের এখানে ছেড়ে দেবে, নাকি মস্কো নিয়ে যাবে?" লোকটি শুধাল।

পিয়ের তখন এত বেশী চিন্তামগ্ন যে প্রশ্নটা শুনতে পেল না। সে একবার অশ্বারোহী রেজিমেণ্টের দিকে তাকাচ্ছে, আবার পাশের গাড়িটাকে দেখছে। গাড়িতে দুটি আহত লোক বসে আছে, ও অপর একজন শুয়ে আছে। যে দুজন বসে আছে তাদের একজনের গালে আঘাত লেগেছে। মাথাটা ন্যাকড়ায় জড়ানো, আর গালটা ফুলে একটি শিশুর মাথার মত হয়েছে। তার নাক ও মুখ একপাশে বেঁকে গেছে। সে গির্জার দিকে তাকিয়ে ক্রুশ চিহ্ন আঁকছে। অপরটি বয়সে তরুণ; শীর্ণ মুখখানি এত সাদা যে মনে হয় তাতে রক্তের লেশমাত্র নেই। সে হেসে পিয়েরের দিকে তাকাল। যে শুয়ে আছে তার মুখটা দেখা যাচ্ছে না। অশ্বারোহী গায়করা পাশ দিয়ে চলে গেল:

"হায় হারিয়ে গেলাম। একেবারেই হারিয়ে গেলাম···
মাথায় তীব্র ব্যথা,
যেন বিদেশে বাস করছি···"

তারা সৈনিকদের নাচের গান গাইছে।

বুঝিবা সেই গানেরই প্রত্যুত্তরে মাথার উপরে ঘণ্টা বাজছে ধাতক শব্দ করে। সূর্যের আতপ্ত কিরণ ছড়িয়ে পড়েছে উল্টো দিকের উৎরাইয়ের মাথায়।

গাল-ফোলা সৈনিকটি সক্রোধে অশ্বারোহী গায়কদের দিকে তাকাল। ঘৃণাভরে বিড়বিড় করে বলল, "আঃ, ভাঁড়ের দল।"

গাড়ির পিছনে দাঁড়ানো সৈনিকটি বিষণ্ণ হাসি হেসে পিয়েরকে উদ্দেশ্য করে বলল, "শুধু সৈনিকরাই নয়, আজ আমি চাষীদেরও দেখেছি··· চাষীরা—তাদেরও চলে যেতে হচ্ছে। আজকাল কোন বাছ-বিচার নেই। ···তারা চায় যে গোটা জাতি তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ুক—, এককথায়, এই তো মস্কো! তারা এর অবসান ঘটাতে চায়।'

সৈনিকটির কথার অস্পষ্টতা সত্বেও সে যে কি বলতে চায় তা বুঝতে পেরে পিয়ের সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল।

রাস্তাটা আবার পরিষ্কার হয়েছে। পাহাড়ের নীচে নেমে পিয়ের ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

পরিচিত মুখের সন্ধানে সে পথের দুই দিক দেখতে দেখতে চলল; কিন্তু সর্বত্রই নানা বিভাগের সামরিক কর্মীদের মুখই তার নজরে পড়ল। তারা সকলেই সবিস্ময়ে তার সাদা টুপি ও লেজওয়ালা সবুজ কোটের দিকে তাকিয়ে দেখছে।

প্রায় তিন মাইল চলবার পরে একজন পরিচিত লোককে দেখে সাগ্রহে তাকে ডাকল। সমর-বিভাগের একজন বড় ডাক্তার। সে যাচ্ছে একটা ঢাকা গাড়িতে; তার পাশে বসে আছে একটি যুবক সার্জন; পিয়েরকে চিনতে পেরে সে চালকের আসনে উপবিষ্ট কসাককে গাড়ি থামাতে বলল।

ডাক্তার বলল, "কাউণ্ট! ইয়োর এক্সেলেন্সি, আপনি এখানে এলেন কেমন করে?"

"আরে, কি জানেন, আমি দেখতে চাই…"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখবার মত কিছু অবশ্যই পাবেন…"

গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে পিয়ের কথাপ্রসঙ্গে ডাক্তারকে তার যুদ্ধে অংশ গ্রহণের ইচ্ছার কথা জানাল।

ডাক্তার তাকে সরাসরি কুতুজভের কাছে আবেদন করার পরামর্শ দিল।

তরুণ সঙ্গীটির সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় করে বলল, "যুদ্ধের মধ্যে কেন যেখানে-সেখানে ছিটকে পড়বেন? আর যাই হোক, প্রশান্ত মহামহিম তো আপনাকে চেনেন, সাদরেই গ্রহণ করবেন। সেটাই আপনার করা উচিত।"

ডাক্তারকে দেখে মনে হল সে ক্লান্ত; তাড়া আছে।

পিয়ের বলল, "আপনি তাই মনে করেন? …আচ্ছা, আমি আরও জানতে চাই যে আমাদের ঘাঁটি এখন ঠিক কোথায়?"

ডাক্তার বলল, "ঘাঁটি? দেখুন, ওটা আমার এক্তিয়ার নয়। তাতারিনভা ছাড়িয়ে চলে যান, অনেক খোঁড়াখুঁড়ি দেখতে পাবেন। পাহাড়ের চূড়ায় উঠে গেলেই সব দেখতে পাবেন।"

"সেখান থেকে দেখা যাবে? …আপনি যদি…"

কিন্তু তার কথায় বাধা দিয়ে ডাক্তার তার গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। নিজের গলা দেখিয়ে বলল, "আপনার সঙ্গে যেতাম, কিন্তু বিশ্বাস করুন, কাজের চাপ আমার গলা পর্যন্ত ঠাসা। একটা কোম্পানির কম্যাণ্ডারের কাছে চলেছি। অবস্থা কি রকম? আপনি তো জানেন কাউণ্ট, আগামীকাল একটা যুদ্ধ হবে। এক লক্ষ সৈন্যের অন্তত বিশ হাজার আহত হবে, অথচ আমাদের হাতে যা স্ট্রেচার, বাংক, ড্রেসার অথবা ডাক্তার আছে তা ছ' হাজারের পক্ষেও যথেষ্ট নয়। দশ হাজার গাড়ি আমাদের আছে, কিন্তু অন্যসব জিনিসও তো চাই—যতদূর সম্ভব একটা ব্যবস্থা তো করতেই হবে!"

হাজার হাজার যুবক ও বৃদ্ধ যারা অবাক বিস্ময়ে তার টুপিটার দিকে তাকিয়েছিল তাদের মধ্যে বিশ হাজারের অনিবার্য নিয়তি আঘাত ও মৃত্যু —এই চিন্তাই পিয়েরকে বিস্মিত করে তুলল।

"তারা তো কালই মরতে পারে; তাহলে মৃত্যু ছাড়া অন্য কিছু তারা ভাবছে কেন? অশ্বারোহী সৈন্যরা ঘোড়া ছুটিয়ে যুদ্ধে চলেছে, আহতদের দেখেও মুহূর্তের জন্য নিজেদের ভাগ্যের কথা ভাবছে না, আহতদের দিকে চোখ টিপে এগিয়ে চলেছে। অথচ এদের ভিতরেই বিশ হাজারের অনিবার্য নিয়তি মৃত্যু, আর তারা কি না টুপি দেখে অবাক হচ্ছে। আশ্চর্য!" ভাবতে ভাবতে পিয়ের তাতারিনভার দিকে এগিয়ে চলল।

রাস্তার বাঁদিকে একটি জমিদার বাড়ির সামনে অনেক গাড়ি, মালগাড়ি, আর্দালি ও সেপাই-শান্ত্রীর ভিড়। প্রধান সেনাপতি সেই বাড়িতেই বাসা নিয়েছে, কিন্তু পিয়ের যখন সেখানে পৌঁছল তখন সে ভিতরে ছিল না, পদস্থ কর্মচারিও কেউ নেই—সকলেই গির্জায় গেছে। পিয়ের গোর্কির দিকে গাড়ি চালাল।

পাহাড়ের মাথায় উঠে একটা গ্রাম্য রাস্তায় পড়ে সে এই প্রথম একদল অসামরিক চাষী সৈনিককে দেখতে পেল। সাদা শার্ট পরে টুপিতে ক্রুশচিহ্ন এঁটে তারা হেসে গল্প করতে করতে উত্তেজিত ও ঘর্মাক্ত দেহে ঘাসে-ঢাকা একটা বড় গোল পাহাড়ের উপর কাজ করছে।

কেউ মাটি কাটছে, কেউ মাটি সরাচ্ছে, কেউ বা কিছুই করছে না।

গোল পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে অফিসার কাজের তদারক করছে। মনে হচ্ছে, সৈনিক জীবনের অভিনবত্বে চাষীরা খুবই মজা পেয়েছে। পিয়েরের মনে পড়ে গেল মোঝায়েস্ক-এর আহত সৈনিকদের কথা; একটি সৈনিক যে বলেছিল: "ওরা চাইছে গোটা জাতিটাই ওদের পিছনে চলুক" তার অর্থটা সে এবার বুঝতে পারল। যুদ্ধক্ষেত্রে কর্মরত এই সব দাড়িওয়ালা চাষীদের দেখে, তাদের বিশ্রী নোংরা বুট, ঘর্মাক্ত গলা, বুক খোলা শার্টের ফাঁকে বেরিয়ে পড়া রোদে পোড়া কণ্ঠাস্থি দেখে পিয়েরের মনে এই মুহূর্তটি যে-রকম গাম্ভীর্য ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিল তেমনটি সে আগে কখনও দেখেও নি, শোনেও নি।

অধ্যায়—২১

পিয়ের গাড়ি থেকে নামল; অসামরিক সৈনিকদের পাশ কাটিয়ে গোল পাহাড়ের মাথায় উঠে গেল, ডাক্তার বলেছে, সেখান থেকেই যুদ্ধক্ষেত্রটা দেখা যাবে।

বেলা প্রায় এগারোটা। সূর্য তার কিছুটা বাঁয়ে ও পিছনে পড়েছে; দূরপ্রসারিত প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে।

সেই দৃশ্যপটকে দ্বিখণ্ডিত করে স্মোলেনস্ক বড় রাস্তাটা উপর থেকে বাঁদিকে এঁকেবেঁকে একটা গ্রামের ভিতর দিয়ে চলে গেছে ; গোল পাহাড়ের নীচে শ' পাঁচেক পা সামনে একটা সাদা গির্জা দেখা যাচ্ছে। এই গ্রামটাই বরদিনো। গ্রামের নীচে রাস্তাটাই একটা সেতুর উপর দিয়ে নদী পেরিয়ে অনেক চড়াই-উৎড়াই কাটিয়ে উপরে উঠতে উঠতে প্রায় চার মাইল দূরবর্তী ভালুভো গ্রামের দিকে চলে গেছে। সেখানেই তখন নেপোলিয়নের ঘাঁটি। ভালুভো পেরিয়ে রাস্তাটা দিগন্তের কোলে একটা হলুদ বনের মধ্যে হারিয়ে গেছে। রাস্তার ডানদিকে অনেক দূরের বার্চ ও ফার গাছের জঙ্গলের মধ্যে কলোচা মঠের ক্রুশ ও ঘণ্টা-ঘরটা সূর্যের আলোয় চকচক করছে। জঙ্গল ও রাস্তার ডাইনে ও বাঁয়ে গোটা নীল প্রান্তর জুড়ে এখানে-ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে আমাদের ও শত্রুপক্ষের ধূমায়মান শিবিরের আগুন আর অসংখ্য সৈন্য। কলোচা ও মস্কভা নদীর তীর বরাবর ডানদিকের মাঠ ভাঙা-ভাঙা ও পর্বতসংকুল। তার খাঁড়ির ফাঁকে ফাঁকে অনেক দূরে দেখা যাচ্ছে বেজুবভা ও জাখারিনো গ্রাম দুটি। বাঁদিকে মাঠ অনেক বেশী সমতল, সেখানে ফসলের ক্ষেত আছে ; অগ্নিদগ্ধ ধূমায়মান সেমেনভস্ক্ গ্রামটাও দেখা যাচ্ছে।

বাঁদিকে অথবা ডানদিকে পিয়ের যা কিছু দেখতে পেল তাতে তার প্রত্যাশা পূর্ণ হল না। যে রণক্ষেত্র দেখার আশা সে করেছিল তা কোথাও দেখা গেল না, শুধুই মাঠ, প্রান্তর, সেনাদল, জঙ্গল, শিবির-আগুনের ধোঁয়া, গ্রাম, স্তূপ, আর নদী নালা ; অনেক চেষ্টা করেও সেখানে কোন সামরিক ঘাঁটি তার চোখে পড়ল না ; এমন কি আমাদের ও শত্রুপক্ষের সৈন্যদেরও সে আলাদা করে চিনতে পারল না।

"সবকিছু জানে এরকম কাউকে জিজ্ঞাসা করা যাক," এই কথা ভেবে পিয়ের একজন অফিসারের দিকে এগিয়ে গেল। অফিসারটি তার অসামরিক মূর্তির দিকে সকৌতূহলে তাকিয়ে ছিল।

"সামনে ওটা কোন্ গ্রাম জানতে পারি কি ?"

একজন সঙ্গীর দিকে ফিরে অফিসারটি বলল, "বুদিনো, তাই না ?"

"বরদিনো," সঙ্গীটি কথাটা শুধরে দিল।

কথা বলার একটি লোক পেয়ে অফিসারটি খুশি মনে পিয়েরের কাছে এগিয়ে এল।

"ওখানে ওরা কি আমাদের সৈন্য ?" পিয়ের শুধাল।

অফিসার বলল, "হ্যাঁ, আর ঐ দূরে আছে ফরাসীরা। ঐ যে অনেক দূরে দেখতে পাচ্ছেন।"

"কোথায় ? কোথায় ?" পিয়ের শুধাল।

"খালি চোখেই তো দেখা যাচ্ছে...কেন ঐ তো !"

বাঁদিকে নদীর ওপারে যে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে সেইদিকে হাত বাড়িয়ে অফিসারটি বলল।

বাঁদিকের গোল পাহাড়ে কিছু সৈন্য দেখতে পেয়ে পিয়ের বলল, "আচ্ছা, তাহলে ওরাই ফরাসী! ঐ যে দূরে?"

"ওরা আমাদের সৈন্য!"

"ওঃ আমাদের! আর ওই ওখানে?...." দূরে আর একটা গোল পাহাড় দেখিয়ে পিয়ের বলল। পাহাড়টার উপরে একটা বড় গাছ; সেখানেও কিছু শিবির—আগুনের ধোঁয়া ও কালো কালো কি যেন দেখা যাচ্ছে।

অফিসার বলল, "ওটা আবার 'তার' হয়ে গেছে। (ওটাই শেভার্দিনো দুর্গ) কালও আমাদেরই ছিল, কিন্তু এখন 'তার'।"

"তাহলে আমাদের ঘাঁটি কোথায়?"

"আমাদের ঘাঁটি?" আত্মতুষ্টির হাসি হেসে অফিসারটি জবাব দিল। "সব আপনাকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলছি, কারণ প্রায় সবগুলি পরিখাই আমি কাটিয়েছি। ওই যে, দেখতে পাচ্ছেন? ঠিক ওখানেই বরদিনোতে আমাদের কেন্দ্রীয় ঘাঁটি", সামনের সাদা গির্জাওয়ালা গ্রামটা দেখিয়ে সে বলল। "ওখানেই কালোচা নদী পার হতে হয়। নীচে ওই যে একসারি ঘড় পড়ে আছে ওখানেই রয়েছে সেতুটা। ওটাই আমাদের কেন্দ্র। আমাদের দক্ষিণ ব্যূহটা ওইদিকে" —সে ডান দিকটা দেখাল। "ওখানেই আছে মস্ক্‌ভা নদী, ওখানেই আমরা তিনটে দুর্গ গড়েছি—খুব শক্ত-পোক্ত করেই গড়া হয়েছে। আর বাম ব্যূহটা....." এইখানে অফিসারটি থামল। "কি জানেন, এটা বোঝানো একটু শক্ত....গতকাল আমাদের বাম ব্যূহ ছিল ওইখানে শেভার্দিনোতে; ওই যে, যেখানে ওক গাছটা দেখতে পাচ্ছেন, কিন্তু আজ আমাদের বাম ব্যূহটা সরিয়ে আনা হয়েছে—এখন সেটা আছে ওখানে, ওই যে একটা গ্রাম আর ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছেন? ওটাই সোমেনভ্‌স্ক্‌; হ্যাঁ, ওই যে," সে রায়েভ্‌স্কি পাহাড়টা দেখাল। "কিন্তু যুদ্ধটা ওখানে হবে না 'তারা সেনাদল সরিয়ে নেওয়ায় ওটা একটা ফন্দিমাত্র; 'সে' হয় তো ঘুরে মস্ক্‌ভা নদীর ডান দিকে চলে যাবে। কিন্তু যুদ্ধ যেখানেই হোক, কাল অনেক লোক হারিয়ে যাবে।"

একজন বয়স্ক সার্জেণ্ট এগিয়ে এসে তার কথাগুলি শুনছিল; এইখানে অফিসারের বক্তব্য মনোমত না হওয়ায় সে তাকে বাধা দিল।

কঠোরকণ্ঠে বলল, "মাটির ঝুড়ির ব্যবস্থা করতে হবে।"

অফিসারটি অপ্রস্তুত বোধ করল; সে বুঝতে পারল, কাল কত সৈন্য হারিয়ে যাবে সেটা জানা থাকলেও বলা উচিত নয়।

তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "বেশ তো, তিন নম্বর কোম্পানিকে পাঠিয়ে দিন।"

"আর আপনি, আপনি কি একজন ডাক্তার ?"

"না, আমি নিজের থেকেই এসেছি," বলে পিয়ের পাহাড় বেয়ে নেমে গেল।

যে লোকগুলি কাজ করছে তাদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে নাক চেপে ধরে অফিসারটি অস্ফুটে বলে উঠল, "আ, যত সব বাজে লোকের ভিড় !"

"ওরা আসছে···তাঁকে নিয়ে আসছে···ওই তো দেখা যাচ্ছে····এক মিনিটের মধ্যেই এখানে এসে পড়বে," হঠাৎ নানা কণ্ঠস্বর শোনা গেল; অফিসার, সৈনিক, ও অসামরিক লোকজনরা রাস্তায় ছুটে চলল।

বরদিনো থেকে গির্জার একটা শোভাযাত্রা পাহাড় বেয়ে উঠে আসছে। ধুলোভরা রাস্তায় প্রথমে এল পদাতিক দল। তাদের পিছন থেকে ভেসে এল গির্জার সঙ্গীত।

সৈনিক ও অসামরিক লোকজনরা পিয়েরকে পাশ কাটিয়ে খালি মাথায় শোভাযাত্রার দিকে ছুটে গেল।

"ওরা তাঁকে নিয়ে আসছে, আমাদের রক্ষাকারিণীকে ! ···আইবেরীয় ঈশ্বর-জননী !" কে একজন চেঁচিয়ে বলল।

আর একজন তাকে শুধরে দিয়ে বলল, "স্মোলেন্স্ক ঈশ্বর-জননী।"

বেসরকারী লোকজন যারা গ্রামে ছিল এবং যারা ঘাঁটিতে কাজ করছিল সকলেই কোদাল ফেলে গির্জার শোভাযাত্রা দেখতে ছুটে গেল। সৈনিকদের পিছন পিছন এল পরিচ্ছদধারী পুরোহিতরা—মাথায় পাগড়ি বাঁধা একটি ছোটখাট বুড়ো মানুষ এল অনুচর ও গায়কদের সঙ্গে নিয়ে। তাদের পিছনে সৈনিক ও অফিসাররা বয়ে নিয়ে এল খোদাই-করা ধাতুর ঢাকনা দেওয়া একটি মস্ত বড় কালো-মুখ দেবমূর্তি। এই দেবমূর্তিটিকেই নিয়ে আসা হয়েছে স্মোলেন্স্ক থেকে এবং সেই থেকে সেনাবাহিনীর সঙ্গেই আছে। পিছনে, সামনে, দুইপাশে অসামরিক লোকগুলো খালি মাথায় হাঁটছে, আর মাটিতে মাথা ঠুকছে।

পাহাড়ের মাথায় উঠে দেবমূর্তিসমেত সকলেই থামল। সূর্যের আতপ্ত রশ্মি তির্যকভাবে মাটিতে এসে পড়ছে, একটা মৃদু বাতাস এসে খোলা মাথাগুলির চুল ও দেবমূর্তির সাজসজ্জার ফিতেগুলো নিয়ে খেলা করছে। গান সমানভাবেই চলেছে। অফিসার, সৈনিক ও অসামরিক লোকজনরা খালি মাথায় দেবমূর্তিকে ঘিরে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। গায়করা ক্লান্তকণ্ঠে গেয়ে চলেছে: "হে ঈশ্বর-জননী, তোমার সেবকদের এই বিপদ থেকে রক্ষা কর"; সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিত ও ডিয়েকন সুর ধরল: "কারণ ঈশ্বরের পরে দুর্ভেদ্য প্রাচীর ও আশ্রয়স্বরূপ তোমার কাছেই আমরা এসেছি।" সকলের মুখেই আর একবার জলে উঠল আসন্ন মুহূর্তের গাম্ভীর্য সম্পর্কে সেই সচেতন ভাব যা পিয়ের একটু আগেই দেখেছে মোঝায়েস্ক পাহাড়ের নীচে অনেক লোকের

মুখে এবং ক্ষণিকের জন্য হলেও আজ সকাল থেকে যাদের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে তাদের সকলেরই মুখে।

হঠাৎ দেবমূর্তির চারদিককার ভিড় সরে গিয়ে পিয়েরকে চেপে ধরল। যেরকম দ্রুততার সঙ্গে পথ করে দেওয়া হল তাতেই বোঝা গেল যে একজন খুবই বড় মাপের মানুষ দেবমূর্তির দিকে আসছে।

লোকটি কুতুজভ। ঘাঁটি পরিদর্শন করে তাতারিমোভা ফিরবার পথে সে এখানে একবার থেমেছে। তাকে দেখেই পিয়ের চিনতে পারল; তার চেহারার অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যই তাকে অন্যের থেকে আলাদা করে চিনিয়ে দেয়।

তার বিরাট বৃষস্কন্ধ দেহটা লম্বা ওভারকোটে ঢাকা, সাদা মাথাটা অনাবৃত, ফোলা মুখের নষ্ট হওয়া চোখের সাদা মণিটা দেখা যাচ্ছে। দুলতে দুলতে ভিড়ের ভিতর দিয়ে হেঁটে কুতুজভ পুরোহিতের পিছনে এসে থামল। অভ্যস্ত ভঙ্গীতে ক্রুশ-চিহ্ন আঁকল, ঝুঁকে পড়ে মাটিতে হাত রাখল এবং সাদা মাথাটা নুইয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কুতুজভের পিছনে বেনিংসেন ও দলবল। প্রধান সেনাপতির উপস্থিতি উর্ধ্বতন অফিসারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও অসামরিক লোকজন ও সৈনিকরা তার দিকে নজর না দিয়ে তাদের প্রার্থনাতেই মেতে রইল।

অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলে কুতুজভ দেবমূর্তির কাছে এগিয়ে গেল, ভারী শরীর নিয়ে নতজানু হয়ে চেপে বসল, আভূমি নত হল, এবং পুনরায় উঠবার জন্য অনেকক্ষণ ধরে বৃথাই চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু দুর্বলতা ও দেহের বোঝার জন্য উঠতে পারল না। উঠবার চেষ্টায় সাদা মাথাটা কাঁপতে লাগল। শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁড়াল, শিশুর মত ঠোঁট ফুলিয়ে দেবমূর্তিকে চুমো খেল এবং পুনরায় মাথা নুইয়ে হাত দিয়ে মাটি স্পর্শ করল। অন্য সেনাপতিরা তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করল; তারপর অফিসাররা, এবং তারপরে সৈনিক ও অসামরিক লোকজনরা উত্তেজিত মুখে ঠেলাঠেলি করতে করতে ভিড় করে এগিয়ে গেল।

অধ্যায়—২২

ভিড়ের মধ্যে ধাক্কা খেতে খেতে পিয়ের চারদিকে তাকাতে লাগল।

"কাউণ্ট পিতর কিরিলেভিচ! তুমি এখানে কেমন করে এলে?" একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

পিয়ের চারদিকে তাকাল। হাত দিয়ে হাঁটু ঝেড়ে (সম্ভবত দেবমূর্তির সামনে নতজানু হওয়ায় হাঁটুতে ধুলো লেগেছে) বরিস দ্রুবেৎস্কয় হাসতে হাসতে এগিয়ে এল। বরিসের পরনে রুচিসম্মত পোশাক, তাতে অভিযানের উপযোগী একটা সামরিক কেতার ছোঁয়াও লেগেছে। গায়ে একটা লং কোট; কুতুজভের মতই একটা চাবুক কাঁধ থেকে ঝোলানো।

ইতিমধ্যে কুতুজভ গ্রামে পৌঁছে কাছাকাছি একটা বাড়ির ছায়াতে বসেছে। একজন কসাক দৌড়ে একটা বেঞ্চি এনে দিল, আর একজন তাড়াতাড়ি তার উপর একটা কম্বল বিছিয়ে দিল। চারদিক থেকে দলবল তাকে ঘিরে ধরল।

ভিড়সহ দেবমূর্তিকে আরও দূরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বরিসের সঙ্গে কথা বলতে বলতে পিয়ের কুতুজভের কাছ থেকে প্রায় ত্রিশ পা দূরে থেমে পড়ল।

যুদ্ধে উপস্থিত থেকে ঘাঁটি দেখবার বাসনা সে জানাল।

বরিস বলল, "সেটাই তো তোমার করা উচিত। তোমার থাকার ব্যবস্থা আমিই করে দেব। কাউণ্ট বেনিংসেন যেখানে থাকবেন সেখান থেকেই সবকিছু ভালভাবে দেখতে পাবে। তুমি তো জান আমি তার দলেই আছি; তাকে তোমার কথা বলব। কিন্তু যদি ঘাঁটিটা ঘুরে দেখতে চাও তো আমাদের সঙ্গে চল। আমরা এখনই বাম ব্যূহে যাচ্ছে। ফিরে এসে রাতটা আমার সঙ্গেই কাটাবে; তাস খেলার ব্যবস্থাও করা যাবে। তুমি তো দিমিত্রি সেগিভিচকে চেন? ঐ তো তার বাসস্থান।" আঙুল বাড়িয়ে গোর্কি গাঁয়ের তৃতীয় বাড়িটা দেখিয়ে দিল।

"কিন্তু আমি দেখতে চাই দক্ষিণ ব্যূহটা। সকলে বলছে সেটা খুব শক্তপোক্ত। আমার ইচ্ছা মস্ক্‌ভা নদী থেকে শুরু করে ঘোড়ায় চেপে চারদিকটা চক্কর দেই।"

"বেশ তো, সেটা পরেও করতে পারবে, কিন্তু আসল চিজ হচ্ছে বাম ব্যূহটা।"

"ঠিক, ঠিক। কিন্তু প্রিন্স বল্‌কন্‌স্কির রেজিমেণ্টটা কোথায়? সেটা দেখাতে পার কি?"

"প্রিন্স আন্‌দ্রূর তো? আমরা সেখান দিয়েই যাব। তোমাকে তার কাছেও নিয়ে যাব।

"বাম ব্যূহের কি হবে?" পিয়ের শুধাল।

গোপন কথা বলার মত গলা নামিয়ে বরিস বলল, "তোমাকে সত্যি কথাটাই বলছি; বাম ব্যূহের অবস্থা যে কি তা শুধু ঈশ্বরই জানেন। কাউণ্ট বেনিংসেন যা চেয়েছিলেন তা মোটেই ঘটে নি। গোল পাহাড়টাকে তিনি অন্যভাবে শক্তিশালী করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু····" বরিস দুই কাঁধে ঝাঁকুনি দিল, "কিন্তু প্রশান্ত মহামহিমের তা ইচ্ছা নয়, অথবা অন্য কেউ তাকে সেই রকমই বুঝিয়েছে। দেখ···" বরিসের কথা শেষ হবার আগেই কুতুজভের অ্যাড্‌জুটাণ্ট কেসারভ পিয়েরের কাছে এসে হাজির হল। কোনরকম বিচলিত না হয়ে বরিস তাকে বলল, "আরে, কেসারভ! আমাদের অবস্থাটা কাউণ্টকে বুঝিয়ে বলছিলাম। প্রশান্ত মহামহিম যে কেমন করে আগে

থেকেই ফরাসীদের অভিপ্রায় বুঝতে পেরেছিলেন সেটাই আশ্চর্য।"

"আপনি বাম ব্যূহের কথা বলছেন কি?" কেসারভ শুধাল।

"হ্যাঁ, ঠিক তাই; এখন তো বাম ব্যূহ খুবই শক্তিশালী।"

কুতুজভ সব অপ্রয়োজনীয় কর্মচারিদের বরখাস্ত করলেও বরিস এখনও কায়দা করে প্রধান ঘাঁটিতেই টিকে আছে। কাউণ্ট বেনিংসেনের কাছে সে তার আসন পাকা করে নিয়েছে; যখন যার অধীনে কাজ করেছে সেই তরুণ প্রিন্স ক্রবেৎস্কয়কে মহামূল্যবান বলে মনে করেছে।

উপর মহলে এখন দুটো পরিষ্কার আলাদা দল হয়েছে: কুতুজভের দল আর বেনিংসেনের দল। বরিস শেষোক্ত দলের লোক; কিন্তু কুতুজভের প্রতি দাসসুলভ ভক্তি দেখিয়েও সে এরকম একটা ধারণার সৃষ্টি করেছে যে বুড়োটা কোন কর্মের নয়, বেনিংসেনই সবকিছু করেছে, সেটা সে ছাড়া আর কেউ পারত না। এখন তো যুদ্ধের চরম পর্যায় সমুপস্থিত; এবার কুতুজভের পতন হবে, আর সব ক্ষমতা যাবে বেনিংসেনের হাতে; এমন কি যুদ্ধে কুতুজভের জয় হলেও সকলে মনে করবে যে যা কিছু করার সব বেনিংসেনই করেছে। অবস্থা যাই হোক, কালকের যুদ্ধের জন্য অনেক বড় বড় পুরস্কার দিতে হবে, আর রণক্ষেত্রে আসবে অনেক নতুন মানুষ। কাজেই আজ সারাটাদিন বরিস খুবই খুশি-খুশি।

দূর থেকে পিয়েরকে দেখতে পেয়ে কুতুজভ বলল, "ওকে আমার কাছে ডাক।"

অ্যাডজুটাণ্টই প্রশান্ত মহামহিমের ইচ্ছাটা পিয়েরকে জানাল; সেও কুতুজভের বেঞ্চির দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু জনৈক অসামরিক লোক তার আগেই সেখানে পৌঁছে গেল। লোকটি দলখভ।

"ও লোকটা এখানে এল কেমন করে?" পিয়ের শুধাল।

"ও জীবটি সব জায়গাতেই নাক গলাতে পারে!" জবাব এল। "আপনি তো জানেন, ওর পদাবনতি ঘটেছিল। ও আবার ফুলে উঠতে চাইছে। এটা-ওটা নানা রকম ফন্দিফিকিরের কথা বলছে; রাতের বেলা শত্রুর পিকেট-লাইনেও হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকেছে···লোকটি সাহসী।"

পিয়ের টুপি খুলে সশ্রদ্ধভাবে কুতুজভকে অভিবাদন জানাল।

তখনও দলখভ বলছে, "আমি স্থির করলাম, প্রশান্ত মহামহিমের সঙ্গে দেখা করে সব কথা বললে আপনি আমাকে দূরে পাঠিয়ে দিতে পারেন, অথবা এও বলতে পারেন যে আমি যা বলছি তা আপনি আগেই জানতেন, কিন্তু যাই হোক না কেন তাতে আমার তো কোন ক্ষতি নেই····"

"ঠিক, ঠিক।"

"কিন্তু আমার কথা যদি ঠিক হয় তাহলে আমার পিতৃভূমির এমন একটা কাজ করা হবে যার জন্য মরতেও আমি প্রস্তুত।"

"ঠিক, ঠিক।"

"আর প্রশান্ত মহামহিমের যদি এমন একটি লোকের প্রয়োজন হয় যে তারজন্য নিজের চামড়া খুলে দিতেও দ্বিধা করবে না তাহলে দয়া করে আমার কথাটা মনে রাখবেন…হয়তো প্রশান্ত মহামহিমের কিছু দরকারে আমি লাগতে পারব।"

"ঠিক…ঠিক…" কুতুজভ বার বার একই কথা বলল; পিয়েরের দিকে তাকিয়ে তার হাস্যময় চোখটা ক্রমেই ছোট হতে লাগল।

ঠিক তখনই পারিষদসুলভ দক্ষতার সঙ্গে বরিস কুতুজভের কাছেই পিয়েরের পাশে গিয়ে দাঁড়াল এবং অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে গলা না চড়িয়ে এমনভাবে কথা বলতে শুরু করল যেন আগেকার কোন আলোচনারই জের টানছে।

"অসামরিক বাহিনী তো সাদা শার্ট পরে জান দিতেও প্রস্তুত। কী বীরত্ব, কাউণ্ট!"

প্রশান্ত মহামহিম যাতে শুনতে পায় তেমনভাবেই কথাগুলি বলা হল। সে জানতো এই কথাগুলি কুতুজভের মনোযোগ আকর্ষণ করবেই।

কুতুজভ বরিসকে শুধাল, "অসামরিক বাহিনী সম্পর্কে কি বলছ হে?"

"প্রশান্ত মহামহিম, পরিষ্কার সাদা শার্ট পরে ওরা কালকের জন্য—মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।"

"ওঃ! …আশ্চর্য, অতুলনীয় মানুষ ওরা!" বলে কুতুজভ চোখ বুজে মাথা দোলাতে লাগল। "অতুলনীয় মানুষ!" দীর্ঘশ্বাস ফেলে কথাটা আবার বলল।

তারপর পিয়েরকে বলল, "তাহলে তুমিও বারুদের গন্ধ শুঁকতে চাও? ভাল, খুব ভাল গন্ধ। তোমার স্ত্রীর প্রশংসাকারীদের মধ্যে আমিও আছি। সে ভাল আছে তো? আমার বাসস্থানের দরজা তোমার জন্য খোলাই আছে।"

বুড়ো মানুষদের বেলায় যেমন সচরাচর ঘটে থাকে, যা কিছু বলার বা করার ছিল সব ভুলে গিয়ে কুতুজভ অন্যমনস্কভাবে ইতস্তত তাকাতে লাগল।

তারপর হঠাৎ যেন কি মনে পড়ায় অ্যাডজুটাণ্টের ভাই আন্দ্রু কেসারভকে ইসারায় কাছে ডাকল।

"সেই কবিতা…মারিন-এর সেই কবিতা…আহা, কি যেন লাইনগুলো? জেরাকভ সম্পর্কে তিনি যা লিখেছেন: 'সৈনিকদের জন্য লিখিত ভাষণ'… আবৃত্তি কর, সেগুলি আবৃত্তি কর!" বলে সে যেন হাসবার জন্য তৈরি হল।

কেসারভ আবৃত্তি করতে লাগল। …কুতুজভ হেসে কবিতার তালে তালে মাথা নাড়তে লাগল।

পিয়ের কুতুজভের কাছ থেকে সরে গেলে দলখভ তার কাছে এসে হাতটা

ধরল।

অপরিচিত লোকদের উপস্থিতিকে অগ্রাহ্য করেই সে উঁচু গলায় বলল, "এখানে তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুব খুশি হয়েছি কাউণ্ট। আমাদের দুজনের মধ্যে কে যে বেঁচে থাকবে তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন; তাই আজকের দিনে তোমাকে বলছি যে আমাদের মধ্যে যে ভুল-বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল সেজন্য আমি দুঃখিত, আর আমার ইচ্ছা যে তুমিও আমার প্রতি কোনরকম বিরূপ মনোভাব পোষণ করো না। আজ তোমাকে এই কথাটা বলার সুযোগ পেলাম বলেও আমি খুশি। আমার মিনতি, তুমি আমাকে ক্ষমা করো।"

কি বলবে বুঝতে না পেরে পিয়ের দলখভের দিকে তাকিয়ে হাসল। অশ্রুভেজা চোখে দলখভ তাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেল।

বরিস তার সেনাপতিকে কি যেন বলল; কাউণ্ট বেনিংসেন পিয়েরের দিকে ঘুরে তাকেও অশ্বারোহণে তাদের অনুগামী হতে বলল।

"তোমার ভাল লাগবে," সে বলল।

"হ্যাঁ, খুব ভাল লাগবে," পিয়ের বলল।

আধ ঘণ্টা পরে কুতুজভ তাতারিনভাব উদ্দেশে যাত্রা করল, আর বেনিংসেন পিয়েরকে সঙ্গে নিয়ে সদলবলে রণক্ষেত্র বরাবর ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

অধ্যায়—২৩

গোর্কি থেকে বেনিংসেন সেতুর দিকে যাবার বড় রাস্তায় নামল। সেতু পেরিয়ে বরদিনো গ্রামে ঢুকে তারা বাঁ দিকে মোড় নিল, অসংখ্য সৈন্য ও কামান পার হয়ে সেই উঁচু গোল পাহাড়টায় পৌঁছল যেখানে অসামরিক লোকজনরা পরিখা খুঁড়ছে। সেটাও একটা দুর্গ, এখনও নামকরণ না হলেও পরবর্তীকালে সেটা রায়েভ্স্কি দুর্গ নামেই খ্যাত হয়েছিল। পিয়ের সেটার দিকে বিশেষ নজর দিল না। সে তো জানত না যে গোটা বরদিনো প্রান্তরের মধ্যে সেই জায়গাটাই একদিন তার কাছে সবচাইতে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

একটা খাঁড়ি পার হয়ে তারা সেমেনভ্স্ক্-এ পৌঁছল। সেখানে সৈন্যরা কুঁড়েঘর ও গোলাবাড়ি থেকে শেষ কাঠের গুঁড়িগুলোও টেনে বের করছে। তারপর সৈন্যদের পায়ে-পায়ে দুমড়ানো জই-ক্ষেতের ভিতর দিয়ে অনেক চড়াই-উৎড়াই পেরিয়ে তারা যেখানে পৌঁছল সেখানে তখনও পরিখা খোঁড়ার কাজ চলছে।

বেনিংসেন পরিখার পাশে থামল; উল্টো দিকের শেভার্দিনো দুর্গের দিকে তাকাল; আগেরদিনও সেটা আমাদেরই ছিল; কয়েকজন অশ্বারোহী সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অফিসাররা বলল, নেপোলিয়ন বা মুরাৎ দুজনের যেকোন একজন সেখানে আছে। সকলে সাগ্রহে সেদিকে তাকাতে লাগল। শেষ

পর্যন্ত অশ্বারোহীরা স্তূপ থেকে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বেনিংসেন জনৈক সেনাপতিকে আমাদের সৈন্যদের অবস্থান ও গতিবিধি বুঝিয়ে বলতে লাগল। পিয়ের মনোযোগ দিয়ে সব শুনল, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারল না। পিয়ের তার কথা শুনছে দেখে কথা থামিয়ে বেনিংসেন হঠাৎ তাকে বলল, "এসব কথা তোমার ভাল লাগছে বলে মনে হয় না।"

মনের কথা না বলে পিয়ের উত্তরে বলল, "বরং আমার খুবই ভাল লাগছে!"

খাঁড়ি থেকে আরও বাঁ দিকে এগিয়ে তারা যে পথটা ধরল সেটা ছোট ছোট বার্চ গাছের ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে। মাইল দেড়েক চলার পরে তারা জঙ্গলের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গায় পৌঁছে গেল। সেখানে তুচ্‌কভের সেনাদলকে মোতায়েন করা হয়েছে বাম ব্যূহ রক্ষার জন্য।

ব্যূহের একেবারে শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে বেনিংসেন খুব উত্তেজিতভাবে অনেক কথা বলে গেল। পিয়েরের মনে হল, সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নির্দেশও দেওয়া হল। তুচ্‌খভের সৈন্যদের সামনে কিছুটা উঁচু জমি রয়েছে; সেখানে কোন সৈন্য মোতায়েন করা হয় নি। এই ভুলের তীব্র সমালোচনা করে বেনিংসেন বলল, চারদিকে নজর রাখা যায় এরকম একটা উঁচু জায়গাকে অরক্ষিত রেখে তার নীচে সেনা সমাবেশ করা তো পাগলামি। কয়েকজন সেনাপতিও সেই অভিমত প্রকাশ করল। একজন তো সামরিক উত্তাপের সঙ্গে বলে উঠল যে তাদের ওখানে রাখা হয়েছে খুন হবার জন্যই। বেনিংসেন নিজের কর্তৃত্ববলেই হুকুম দিল, ঐ উঁচু জায়গায় সেনাসমাবেশ করা হোক।

বামব্যূহের এই সব ব্যবস্থা দেখে সামরিক বিধি-ব্যবস্থা বুঝবার ব্যাপারে নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে পিয়েরের সন্দেহ আরও বেড়ে গেল। যে লোকটি সৈন্যদের পাহাড়ের নীচে মোতায়েন করেছিল সে যে এতবড় একটা সহজ-বোধ্য ভুল কেমন করে করেছিল তা সে কিছুতেই বুঝতে পারে নি।

পিয়ের মোটেই জানত না যে বেনিংসেনের অনুমানমত ঐ সৈন্যদের ঘাঁটি রক্ষার জন্য সেখানে রাখা হয় নি, তাদের সেখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল অতর্কিত আক্রমণের জন্য, যাতে কোন অগ্রসরমান শত্রুকে তারা অপ্রত্যাশিতভাবে আক্রমণ করতে পারে। বেনিংসেন সেটা জানত না, এবং ব্যাপারটা প্রধান সেনাপতির গোচরে না এনেই নিজের ধারণামত সৈন্যদের সামনের দিকে সরিয়ে দিল।

অধ্যায়—২৪

সেদিন ২৫শে অগস্টের উজ্জ্বল সন্ধ্যায় প্রিন্স আন্দ্রু তার সেনা-শিবিরের একেবারে শেষ প্রান্তে কনিয়াজকোভো গ্রামের একটা ভাঙা চালাঘরে

কনুইতে ভর দিয়ে শুয়েছিল। ভাঙা দেয়ালের ফাঁক দিয়ে সে দেখতে পেল, ত্রিশ বছরের পুরনো একসারি বার্চ গাছের নীচু ডালগুলি সব কেটে ফেলা হয়েছে, মাঠের বুকে জইয়ের স্তূপগুলো দাঁড়িয়ে আছে, কতকগুলি ঝোঁপ-ঝাড়ের পাশ থেকে সৈনিকদের রান্নাঘরের ধোঁয়া উঠছে।

এই মুহূর্তে তার মনে হচ্ছে জীবনটা সংকীর্ণ, বোঝাস্বরূপ ও প্রয়োজন-হীন। সাত বছর আগে অস্তারলিজে যেমন মনে হয়েছিল আজও যুদ্ধের প্রাক্কালে তার তেমনই উত্তেজিত ও বিরক্ত বোধ হচ্ছে।

পরদিনের যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ সে পেয়েছে এবং প্রচার করেছে, এখন আর নতুন করে কিছু করার নেই। কিন্তু নিজের চিন্তার হাত থেকে—সরলতম, স্পষ্টতম ও ভয়ংকরতম চিন্তার হাত থেকে তার নিস্তার নেই। সে জানে, এতদিন যত যুদ্ধে সে যোগ দিয়েছে তার মধ্যে কালকের যুদ্ধই হবে সবচাইতে ভয়ংকর, আর জীবনে এই প্রথম সে মৃত্যুর সম্ভাবনার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে—সে সম্ভাবনা যেমন স্পষ্ট ও ভয়ংকর, তেমনই নিশ্চিত। সহসা সারাটা জীবন ম্যাজিক-লণ্ঠনের ছবির মত তার সামনে একে একে ভেসে উঠতে লাগল। বিশেষ করে জীবনের তিনটি মহৎ দুঃখ তার সামনে বড় হয়ে ফুটে উঠল: একটি নারীর প্রতি ভালবাসা, বাবার মৃত্যু, আর অর্ধেক রাশিয়ার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ফরাসী আক্রমণ। "ভালবাসা! ⋯⋯ছোট্ট মেয়েটি কী রহস্যময় শক্তিতে একেবারে কানায় কানায় ভরে উঠেছিল! হ্যাঁ, আমি তাকে ভালবেসেছিলাম। তাকে নিয়ে ভালবাসার ও সুখের কত পরিকল্পনাই করেছিলাম! আঃ, আমি কী ছেলেমানুষই ছিলাম!" তিক্তকণ্ঠে সে বলে উঠল। "হায়রে! এমন এক আদর্শ ভালবাসার উপর আমি ভরসা করেছিলাম যা আমার একটি বছরের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও তাকে আমার প্রতি বিশ্বস্ত রাখবে! উপকথার ভীরু কপোতীর মত আমার বিরহে সে কাঁদবে⋯⋯কিন্তু আসলে ব্যাপারটা কত সরল⋯⋯কত সরল আর কত ভয়ংকর।

"বাবা যখন বল্ড হিল্‌স্‌ গড়ে তুলেছিল তখন সে ভেবেছিল জায়গাটা তার—তার জমি, তার বাতাস, তার চাষীর দল।' কিন্তু নেপোলিয়ন এল, আর পথের খড়কুটোর মত তাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল; তার বল্ড হিল্‌স্‌, তার সারাটা জীবন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। প্রিন্সেস মারি বলে, এটা উপরওয়ালার পরীক্ষা। কিন্তু বাবাই যখন রইল না, আর কখনও ফিরে আসবে না, তখন কিসের জন্য এই পরীক্ষা? বাবা তো নেই! তাহলে কার জন্য এই পরীক্ষা? পিতৃভূমি ও মস্কোর ধ্বংস! আর কাল আমি নিহত হব, হয়তো কোন ফরাসীর হাতেও নয়, হয়তো আমাদেরই কোন সৈনিক আমার কানের পাশ থেকে বন্দুক দাগবে, কাল তো সেই ঘটনাই একটা ঘটেছে, আর পাছে তাদের চোখের সামনে আমি মরে যাই সেই ভয়ে

ফরাসীরা এসে হাত-পা ধরে আমাকে একটা গর্তের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। গড়ে উঠবে জীবনের নতুন পরিবেশ, অপরের কাছে সেটা খুবই সহজ ও সাধারণ বলে মনে হবে, অথচ সে সম্পর্কে আমি কিছুই জানব না। আমি তো থাকবই না।"

সূর্যকিরণে ঝলসিত বার্চ গাছগুলোর দিকে সে তাকাল; তাদের নিথর সবুজ পাতা ও সাদা বাকল চোখে পড়ল। "মরে যাব···কালই মরে যাব··· আমার কোন অস্তিত্ব থাকবে না···এসবকিছুই থাকবে, থাকব না শুধু আমি···"

আলো-ছায়ায় ঘেরা বার্চ গাছেরা, কুণ্ডলি পাকানো মেঘের দল, শিবির-আগুনের ধোঁয়া, চারদিকে যা কিছু আছে, সব যেন মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেল, ভয়াল, ভয়ংকর হয়ে দেখা দিল। একটা ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল তার শিরদাঁড়া বেয়ে। তাড়াতাড়ি উঠে চালাঘরের বাইরে গিয়ে সে ইতস্তত হাঁটতে লাগল।

আবার ভিতরে এসে শুনতে পেল বাইরে কারা যেন কথা বলছে। "কে ওখানে?" সে চেঁচিয়ে বলল।

লাল-নাক ক্যাপ্টেন তিমোখিন একজন অ্যাডজুটাণ্ট ও একজন তবিল-দারকে সঙ্গে নিয়ে সলজ্জভাবে ঘরে ঢুকল।

সব কাজের কথা শুনে প্রিন্স আন্‌দ্রু তাদের আরও কিছু নির্দেশ দিল, এমন সময় ঘরের পিছন থেকে একটা অস্পষ্ট গলা শোনা গেল।

কোন কিছুতে ঠোক্কর খেয়ে কে যেন বলে উঠল, "জাহান্নামে যাও!"

ঘর থেকে বেরিয়ে প্রিন্স আন্‌দ্রু দেখল একটা কাঠের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে পিয়ের প্রায় পড়েই যাচ্ছিল। পিয়েরকে দেখে প্রিন্স আন্‌দ্রুর মন অপ্রসন্ন হয়ে উঠল; শেষবারের মস্কো ভ্রমণের বেদনাময় স্মৃতি তার মনে পড়ে গেল।

"তুমি? কী আশ্চর্য! তুমি এখানে কেন এসেছ? এ যে অপ্রত্যাশিত!"

বলতে বলতে প্রিন্স আন্‌দ্রুর চোখে-মুখে যে ভাব দেখা দিল তা নিস্পৃহ-তারও বেশী—তাতে প্রকাশ পেল বিরূপ মনোভাব, আর সেটা পিয়েরের নজর এড়াল না।

"আমি এসেছি···শুধু···কি জান···এসেছি···এসব দেখতে আমার ভাল লাগে···আমি যুদ্ধ দেখতে চাই," পিয়ের বলল।

প্রিন্স আন্‌দ্রু ঠাট্টা করে বলল, "আচ্ছা, তা যুদ্ধ সম্পর্কে তোমার সংঘ-ভাইরা কি বলে? তারা কোন্ পথে এ যুদ্ধ থামাতে চায়? ···যাকগে, মস্কোর খবর কি বল? আর আমার লোকজনরা? তারা কি মস্কো পৌঁচেছে?"

"হ্যাঁ, পৌঁচেছে। জুলি ক্রবেৎস্কয়া আমাকে সেইরকমই বলেছে। তাদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। দেখা হয় নি। তারা তোমাদের মস্কোর নিকটবর্তী জমিদারিতে চলে গেছে।"

অফিসারদের বিদায় নেবার সময় হল, কিন্তু প্রিন্স আন্দ্রু বন্ধুকে নিয়ে একা থাকতে অনিচ্ছুক হওয়ায় তাদের আরও কিছুক্ষণ থেকে চা খেয়ে যেতে বলল। বসার আসন ও চা এল। অফিসাররা অবাক হয়ে পিয়েরের লম্বা-চওড়া চেহারার দিকে তাকিয়ে তার মুখ থেকে মস্কোর কথা এবং সদ্য-দেখা আমাদের ঘাঁটির অবস্থার কথা শুনতে লাগল। প্রিন্স আন্দ্রু চুপচাপ বসে থাকল; তার মুখের বিরূপভাব দেখে পিয়ের প্রধানত ব্যাটেলিয়ন-কম্যাণ্ডার ভাল মানুষ তিমোখিনকে উদ্দেশ করেই কথা বলতে লাগল।

প্রিন্স আন্দ্রু বাধা দিয়ে বলল, "তুমি তাহলে আমাদের সৈন্যদের অবস্থানটা ভালই বুঝতে পেরেছ?"

পিয়ের জবাব দিল, "হ্যাঁ—আচ্ছা, তুমি কি বলতে চাও? আমি তো সামরিক বিভাগের লোক নই, কাজেই ব্যাপারটা পুরোপুরি বুঝেছি এমন কথা বলতে পারি না, কিন্তু মোটামুটি বুঝে নিয়েছি।"

"আচ্ছা, তুমি তো তাহলে অন্য অনেকের চাইতে বেশী বুঝেছ," প্রিন্স আন্দ্রু বলল।

বিব্রতভাবে প্রিন্স আন্দ্রুর দিকে তাকিয়ে পিয়ের বলল, "ওঃ! আচ্ছা, কুতুজভের নিয়োগ সম্পর্কে তুমি কি মনে কর?"

"আমি তো শুধু এই জানি যে তার নিয়োগে আমি খুব খুশি হয়েছি," প্রিন্স আন্দ্রু জবাব দিল।

"আর বার্ক্‌লে স্ত তলি সম্পর্কে তোমার মতামতটাও বল। মস্কোতে তার সম্পর্কে যে কী বলা হচ্ছে তা ঈশ্বরই জানেন···তার সম্পর্কে তুমি কি মনে কর?"

অফিসারদের দেখিয়ে প্রিন্স আন্দ্রু জবাব দিল, "ওদের জিজ্ঞাসা কর।"

সপ্রশ্ন হাসির সঙ্গে পিয়ের তিমোখিনের দিকে তাকাল।

কর্ণেলের দিকে বার বার তাকাতে তাকাতে তিমোখিন ভীরু গলায় বলল, "মহামহিমের নিয়োগের ফলে আমরা আবার আলো দেখতে পাচ্ছি।"

"কি রকম?" পিয়ের শুধাল।

"দেখুন, কেবলমাত্র জ্বালানি-কাঠ ও খড়ের ব্যাপারটাই আপনাকে বলছি। আমরা যখন স্বেন্ত্‌সিয়ানি থেকে হটে আসছিলাম, তখন একটা কঞ্চি, বা একটা খড়ের ডাঁটা, বা কোন কিছুতে হাত দেবার সাহসই আমাদের ছিল না। কি জানেন, আমরা চলে যাচ্ছিলাম, আর সে সব জিনিসই পড়ছিল 'তার' হাতে (রুশরা শত্রুকে 'তার' বলেই উল্লেখ করে); তাই নয় কি ইয়োর এক্সেলেন্সি?" তিমোখিন আবার প্রিন্সের দিকে তাকাল। "সে সাহসই আমাদের ছিল না। ঐ ধরনের কাজের জন্য আমাদের রেজিমেণ্টের দুজন অফিসারকে কোর্ট-মার্শাল করা হয়েছে। কিন্তু মহামহিম যখন সর্বেসর্বা হয়ে এলেন তখন সব ব্যাপারটাই সহজ হয়ে এল। এখন

আমরা আলো দেখতে পাচ্ছি…"

"তাহলে সেটা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল কেন ?"

এ-প্রশ্নের কি উত্তর দেবে বুঝতে না পেরে তিমোখিন বিচলিতভাবে চারদিকে তাকাতে লাগল। সেই একই প্রশ্ন পিয়েরও প্রিন্স আন্‌দ্রুকে করল।

"কেন ? যে দেশকে আমরা শত্রুর হাতে রেখে যাচ্ছি সেটা যাতে নষ্ট হয়ে না যায়," তীব্র ব্যঙ্গের সঙ্গে প্রিন্স আন্‌দ্রু জবাব দিল। "নীতি হিসাবে এটা তো ভালই : একটা দেশ লুণ্ঠিত হবে এবং সৈন্যরা লুটেরা হয়ে যাবে সেটা তো চলতে দেওয়া যায় না। স্মোলেন্‌স্ক—এও তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন যে যেহেতু ফরাসী সেনাবাহিনী ছিল আমাদের চাইতে অনেক বড় তাই তারা হয় তো আমাদের ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে যেতে পারত। কিন্তু এই কথাটা তিনি বুঝতে পারেন নি," নিজের অজ্ঞাতেই প্রিন্স আন্‌দ্রুর কণ্ঠস্বর কর্কশ হয়ে উঠল, "যে এই প্রথম আমরা রাশিয়ার মাটিতে যুদ্ধ করছিলাম, সৈন্যদের মধ্যে সেদিন যে মনোবল গড়ে উঠেছিল তেমনটি আগে কখনও দেখি নি, দু'দিন পর্যন্ত ফরাসীদের আমরা রুখে দিয়েছিলাম, আর সেই সাফল্যের ফলে আমাদের শক্তি দশগুণ বেড়ে গিয়েছিল। তিনি পশ্চাদ-সরণের হুকুম দিলেন, আর আমাদের সব প্রচেষ্টা, সব ক্ষয়-ক্ষতি বিফলে গেল। আমাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার কথা তিনি ভাবেন নি, সাধ্য-মত ভাল করতেই চেষ্টা করেছেন, সবকিছু ভেবেচিন্তেই করেছেন, আর সেই কারণেই তিনি অনুপযুক্ত। এখনও তিনি অনুপযুক্ত, শুধু এই কারণে যে অন্য সব জার্মানের মতই তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ও সঠিকভাবে পরিকল্পনা করেন। কেমন করে যে বোঝাই ? …আচ্ছা, ধর তোমার বাবার একজন জার্মান খানসামা আছে ; লোকটি খানসামা হিসাবে চমৎকার, তোমার বাবার সব প্রয়োজন তোমার চাইতেও ভালভাবে মেটাতে পারে, কাজেই তাকে সে কাজ করতে দেওয়াই সমীচিন। কিন্তু তোমার বাবা যদি মারাত্মক অসুখে পড়েন, তখন খানসামাকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে অনভ্যস্ত হাতে তুমিই তোমার বাবার সেবা করবে এবং একজন কুশলী অপরিচিত লোকের চাইতে তাকে বেশী শান্তি দিতে পারবে। বার্কলের ব্যাপারটাও সেইরকম। রাশিয়া যখন সুস্থ ছিল তখন একজন বিদেশী তার সেবা করতে পারে, একজন চমৎকার মন্ত্রীও হতে পারে ; কিন্তু যেমুহূর্তে রাশিয়া বিপন্ন হয়ে পড়েছে তখন থেকেই তার প্রয়োজন নিজের লোককে। কিন্তু তোমাদের ক্লাবে তাকে বিশ্বাসঘাতক বানানো হচ্ছে ! বিশ্বাসঘাতক বলে তাকে নিন্দা করছে ; আর তার একমাত্র ফল হবে পরবর্তীকালে এই মিথ্যা অভিযোগের জন্য লজ্জিত হয়ে তারাই তাকে বানাবে নায়ক অথবা প্রতিভাধর, আর সেটাই হবে আরও বেশী অন্যায়। তিনি একজন সৎ ও অত্যন্ত নিষ্ঠাবান জার্মান।"

"সকলেই বলে যে তিনি একজন কুশলী সেনাপতি" পিয়ের যোগ করল।

প্রিন্স আনদ্রু বিদ্রূপের সুরে বলল, "'কুশলী সেনাপতি' বলতে কি বোঝায় আমি ঠিক বুঝতে পারি না।"

পিয়ের উত্তরে বলল, "কুশলী সেনাপতি ? কেন, যে ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি আগে দেখতে পায়...এবং প্রতিপক্ষের অভিপ্রায়ও আগে থেকে ধরতে পারে।"

যেন কথাটা নির্ধারিত সত্য এমনইভাবে প্রিন্স আনদ্রু বলে উঠল, "কিন্তু সে তো অসম্ভব।"

পিয়ের সবিস্ময়ে তার দিকে তাকাল।

মন্তব্য করল, "অথচ তারাই বলে যে যুদ্ধ হচ্ছে দাবা খেলার মত।"

প্রিন্স আনদ্রু জবাব দিল, "ঠিক কথা, কিন্তু একটু তফাৎ আছে। দাবা খেলায় একটা চাল নিয়ে তুমি যতক্ষণ খুশি ভাবতে পার, তোমার সময়ের অভাব থাকে না; তাছাড়া, মন্ত্রী সব সময়ই বড়ের চাইতে বেশী শক্তিশালী, আর দুটো বড়ে সব সময়ই একটা বড়ের চাইতে বেশী শক্তিশালী। কিন্তু যুদ্ধের বেলায় একটা ব্যাটেলিয়ন কখনও একটা ডিভিশনের চাইতে বেশী শক্তিশালী, আবার কখনও একটা কোম্পানির চাইতে দুর্বল হতে পারে। সেনাদলের আপেক্ষিক শক্তির কথা আগে থেকে কেউ জানতে পারে না। ...বিশ্বাস কর, সবকিছু যদি কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভর করত, তাহলে আমি সেখানে থেকে ব্যবস্থাই করতাম, কিন্তু তার পরিবর্তে আমি রেজিমেণ্টে চলে এসেছি এই ভদ্রলোকদের সঙ্গে কাজ করতে; আর আমি মনে করি যে কালকের যুদ্ধটা নির্ভর করবে আমাদের উপর, সেই সব লোকদের উপর নয়...সৈন্যসমাবেশ, সমরসজ্জা, এমন কি সৈন্য-সংখ্যার উপরেও সাফল্য নির্ভর করে না, ঘাঁটির উপর তো নয়ই।"

"তাহলে কিসের উপর নির্ভর করে ?"

তিমোখিনকে দেখিয়ে সে বলল, "আমার মধ্যে, ওর মধ্যে, এবং প্রতিটি সৈন্যের মধ্যে যে অনুভূতি কাজ করে তার উপর।"

প্রিন্স আনদ্রু তিমোখিনের দিকে তাকাল; সভয়ে ও একান্ত বিহ্বলতায় সে তার কম্যাণ্ডারের দিকে তাকাল। প্রিন্স আনদ্রু এতক্ষণ ছিল সংযত, স্বল্পবাক; এবার সে উত্তেজিত হয়ে উঠল। সহসা যে চিন্তার স্রোত তার মনে জেগেছে তাকে প্রকাশ না করে সে পারল না।

"যুদ্ধ জয়ের দৃঢ় সংকল্প যারা গ্রহণ করে তারাই যুদ্ধ জয় করে। অস্তার-লিজের যুদ্ধে কেন আমাদের হার হল? ফ্রান্সের ক্ষয়-ক্ষতি আমাদের প্রায় সমানই হয়েছিল, কিন্তু গোড়া থেকেই আমরা বলে আসছিলাম যে আমরা হারতে বসেছি, আর সেই হারই আমাদের হল। আর সেকথা আমরা বলেছিলাম কারণ সেখানে যুদ্ধ করবার মত কিছুই আমাদের ছিল না, যত শীঘ্র সম্ভব যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে আসতেই আমরা চেয়েছিলাম। 'আমরা

হেরে গেছি, অতএব ছুটে পালাও', আমরা ছুটে পালিয়েছি। সন্ধ্যা পর্যন্ত যদি সেকথা আমরা না বলতাম, তাহলে কী না ঘটতে পারত তা ঈশ্বর জানেন। কিন্তু কাল আমরা সেকথা বলব না। তোমরা আমাদের ব্যূহ রচনার কথা বলছ, বলছ যে বাম ব্যূহ দুর্বল, আর দক্ষিণ ব্যূহ বড় বেশী প্রসারিত; সেসবই বাজে কথা; সেরকম কিছুই ঘটে নি। কিন্তু কাল আমাদের কপালে কি আছে? আছে লক্ষ লক্ষ বিচিত্র সম্ভাবনা যেটা নির্ধারিত হবে আমাদের সৈন্য বা তাদের সৈন্যরা পালাবে কি পালাবে না তার দ্বারা; এ-লোক বা সে-লোকের মৃত্যু হবে কি না তার দ্বারা; কিন্তু বর্তমানে যা কিছু করা হচ্ছে সবই তো ছেলেখেলা। আসল কথা হল, যাদের নিয়ে তোমরা সবকিছু ঘুরে দেখে এলে তারা আমাদের কাজের সহায়ক না হয়ে বরং বিঘ্নের সৃষ্টি করছে। তারা সকলেই নিজ নিজ স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত।"

"এই সংকট-মুহূর্তেও?" পিয়ের অনুযোগের সুরে বলল।

"এই সংকট-মুহূর্তেও!" প্রিন্স আন্দ্রু কথাটার পুনরাবৃত্তি করল। "তাদের কাছে এই মুহূর্তটা কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাভূত করে একটা বাড়তি ক্রুশ বা ফিতে পাবার সুযোগ এনে দিয়েছে মাত্র। আর আমার কাছে আগামী কালের অর্থ হল: এক লক্ষ সৈন্যের রুশ বাহিনী এবং এক লক্ষ সৈন্যের ফরাসী বাহিনী রণক্ষেত্রে পরস্পরের মুখোমুখি হবে, দুই লক্ষ সৈন্য যুদ্ধ করবে, এবং যে পক্ষ ন্যূনতম ঝুঁকি নিয়ে অধিকতর তীব্রতার সঙ্গে যুদ্ধ করবে সেই জিতবে। আর তুমি যদি চাও তো আমি বলছি, যাই ঘটুক না কেন, উপরওয়ালারা যতই ভণ্ডুল করুক না কেন, আগামীকালের যুদ্ধে আমরা জিতবই। যাই ঘটুক না কেন, আগামীকাল আমরা জিতবই!"

তিমোখিন বলে উঠল, "ঠিক বলেছেন ইয়োর এক্সেলেন্সি! এটাই সত্য কথা, খাঁটি কথা। আজকের দিনে কে দূরে সরে থাকবে? বিশ্বাস করুন, আমার ব্যাটেলিয়নের সৈন্যরা আজ ভদ্‌কা খাবে না। তারা বলছে, 'ভদ্‌কা খাবার দিন আজ নয়!'"

সকলেই চুপ। অফিসাররা উঠে দাঁড়াল। অ্যাড্‌জুটাণ্টকে চূড়ান্ত নির্দেশ জানিয়ে প্রিন্স আন্দ্রুও তাদের সঙ্গে চালাঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তারা চলে গেলে পিয়ের প্রিন্স আন্দ্রুর দিকে এগিয়ে গেল; তার সঙ্গে নতুন করে আলোচনা শুরু করতে যাবে এমন সময় অদূরে তিনটে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ তাদের কানে এল; সেদিকে তাকিয়ে প্রিন্স আন্দ্রু জনৈক কসাকসহ ওল্‌যোগেন ও ক্লজউইৎজ্‌কে চিনতে পারল। পাশাপাশি ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে যেতে তারা নিজেদের মধ্যে ফরাসীতে যা বলাবলি করছে আপনা থেকেই প্রিন্স আন্দ্রু তা শুনতে পেল:

"রণক্ষেত্রকে ব্যাপকভাবে প্রসারিত করতেই হবে," একজন বলল।

অপরজন বলল, "ঠিক বলেছ; শত্রুপক্ষকে দুর্বল করে দেওয়াটাই একমাত্র লক্ষ্য; এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ক্ষয়-ক্ষতির কথা ভাবলে চলবে না।"

তারা ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলে প্রিন্স আন্দ্রু তর্জন করে বলে উঠল, "রণক্ষেত্রকে ব্যাপকভাবে প্রসারিত করতে হবে! ওই 'প্রসারিত করা'র মধ্যে ছিল আমার বাবা, ছেলে, বোন, বল্ড হিল্‌স্‌। ওর কাছে সবই সমান! এই কথাই তোমাকে বলছিলাম—ওই জার্মান ভদ্রলোকরা কালকের যুদ্ধ জিততে পারবে না, তারা সবকিছু তালগোল পাকিয়ে দেবে, কারণ তাদের জার্মান খুলির মধ্যে তত্ত্ব ছাড়া আর কিছু নেই, আর সে তত্ত্বের মূল্য একটা খালি ডিমের খোলাও নয়; কালকের যুদ্ধে যে বস্তুটির প্রয়োজন, যা তিমোখিনের আছে, তা ওদের হৃদয়ে নেই। ওরা গোটা ইয়োরোপকে 'তার' হাতে সঁপে দিয়ে এখন এসেছে আমাদের শেখাতে। বেড়ে শিক্ষক সব!" তার কণ্ঠস্বর আবার কর্কশ হয়ে উঠল।

পিয়ের শুধাল, "তাহলে তুমি মনে কর যে কালকের যুদ্ধে আমাদের জয় হবে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ," প্রিন্স আন্দ্রু অন্যমনস্কভাবে জবাব দিল। তারপর বলতে শুরু করল, "আমার হাতে ক্ষমতা থাকলে আমি একটা কাজ করতাম, কাউকে বন্দী করতাম না। কেন বন্দী করব? তাতে বীরত্ব প্রকাশ হতে পারে! কিন্তু ফরাসীরা আমার বাড়ি ধ্বংস করেছে, ছুটে চলেছে মস্কো ধ্বংস করতে, আমাকে অপমান করেছে, প্রতিটি মুহূর্ত অপমান করে চলেছে। তারা আমার শত্রু। আমার মতে তারা সকলেই অপরাধী। তিমোখিন এবং গোটা সৈন্যদলও তাই মনে করে। তাদের হত্যা করতে হবে। তিলজিটে যাই বলা হোক না কেন, যেহেতু তারা আমার শত্রু, তাই তারা আমার বন্ধু হতে পারে না।"

চকচকে চোখে প্রিন্স আন্দ্রুর দিকে তাকিয়ে পিয়ের বলল, "ঠিক ঠিক। তোমার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত।"

মোঝায়েস্ক পাহাড়ে এবং সারাটাদিন ধরে যে প্রশ্নটা পিয়েরকে বিব্রত করে তুলছিল এবার যেন সেটা তার কাছে বেশ পরিষ্কার হয়ে উঠেছে; প্রশ্নটার মীমাংসাও সে খুঁজে পেয়েছে। এই যুদ্ধের এবং আসন্ন সংঘর্ষের তাৎপর্য ও গুরুত্ব এবার সে উপলব্ধি করতে পেরেছে। সারাদিন সে যা কিছু দেখেছে, যেতে যেতে নানা জনের মুখে যে অর্থপূর্ণ কঠিনভাব দেখেছে, সেসব কিছুই একটা নতুন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। তার দেখা এইসব লোকদের মধ্যে দেশপ্রেমের যে সুপ্ত উত্তাপ (পদার্থবিদ্যার ভাষায়) রয়েছে তার সন্ধান সে পেয়েছে; আর তার ফলেই বুঝতে পেরেছে কেন তারা সকলেই শান্ত অথচ সহজভাবে মৃত্যুকে বরণ করতে প্রস্তুত হতে পেরেছে।

প্রিন্স আন্দ্রে বলতে লাগল, "কাউকে বন্দী করব না। শুধু তাহলেই গোটা যুদ্ধের চেহারা সম্পূর্ণ পাল্টে যাবে, তার নিষ্ঠুরতাও হ্রাস পাবে। এখন যা চলছে সেটা তো যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা—আর সেটাই জঘন্য। আমরা মহত্ত্ব ও অনুরূপ গুণাবলী নিয়ে খেলা করি। এই মহত্ত্ব ও স্পর্শকাতরতা হচ্ছে সেই মহিলাটির মহত্ত্ব ও স্পর্শকাতরতার মত যিনি একটি গো-বৎসকে মারতে দেখে মূর্ছা যান: তিনি এতই দয়ালু-হৃদয় যে রক্ত দেখতে পারেন না, কিন্তু সেই গো-বৎসের মাংস যখন সস্তিসহকারে পরিবেশন করা হয় তখন বেশ রসিয়ে রসিয়ে খান। তারা তো অনেক কথাই বলে—যুদ্ধের রীতিনীতি, বীরত্ব, সন্ধির পতাকা, দুর্ভাগাদের প্রতি করুণা, কত কি। সবই তো অর্থহীন। এই বীরত্ব ও সন্ধির পতাকা আমি দেখেছি ১৮০৫-এ; তারা আমাদের ধোঁকা দিয়েছে, আমরা তাদের ধোঁকা দিয়েছি। তারা অন্য লোকের ঘরবাড়ি লুঠ করে, নকল টাকার নোট ছড়ায়, আর সবচাইতে যেটা খারাপ আমার সন্তান ও পিতাকে হত্যা করে, এবং তারপরে যুদ্ধের রীতিনীতি ও শত্রুর প্রতি উদারতার বুলি আওড়ায়! কাউকে বন্দী করো না, মার এবং মর। আমার মতই দুঃখ-যন্ত্রণার ভিতর দিয়ে যারা এই সিদ্ধান্তে এসেছে...."

হঠাৎ প্রিন্স আন্দ্রের গলা আটকে গেল। নিঃশব্দে বারকয়েক পায়চারি করল; তার চোখ দুটি চকচক করছে; ঠোঁট কাঁপছে।

"যুদ্ধে যদি এই উদারতার ব্যাপারটা না থাকত, তাহলে একমাত্র তখনই আমরা যুদ্ধে যেতাম যখন আজকের মতই বুঝতাম যে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যাওয়াটাও অবশ্য কর্তব্য। তাহলে পল আইভানভিচ মাইকেল আইভানভিচকে দুঃখ দিয়েছে বলেই একটা যুদ্ধ বেধে যেত না। আর আজকের মতই যুদ্ধ হলে সেটা যুদ্ধই হত! তখন সৈন্যদের সংকল্প হত সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেক্ষেত্রে ওয়েস্টফেলিয়া ও হেসিয়ার যেসব মানুষদের নেপোলিয়ন আজ রণক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে চলেছে তারা তার পিছু পিছু রাশিয়াতে ঢুকত না, আর আমরাও কিছু না জেনেশুনেই অস্ট্রিয়া ও প্রুশিয়াতে যুদ্ধ করতে যেতাম না। যুদ্ধ একটা ভদ্রতার ব্যাপার নয়, যুদ্ধ জীবনের এক ভয়ংকর সত্য; আর সেটাই আমাদের বুঝতে হবে, যুদ্ধ নিয়ে ছেলেখেলা করা চলবে না। কঠোরভাবে, গুরুত্বের সঙ্গে এই ভয়ংকর অনিবার্যতাকে স্বীকার করে নিতে হবে। আসল ব্যাপারটা সেখানেই; মিথ্যার মোহকে ছিঁড়ে ফেল; যুদ্ধটা যুদ্ধই হোক, খেলা নয়। এখন যা চলছে তা তো যুদ্ধ নয়, যেন অলস ও বাকসর্বস্বদের একটা মজার খেলামাত্র। সামরিক চাকরি অত্যন্ত সম্মানজনক পদ।

"কিন্তু যুদ্ধ কি? যুদ্ধে সাফল্যলাভের জন্য কি দরকার? সামরিক লোকদের কাজ কি? যুদ্ধের লক্ষ্যই তো হত্যা; যুদ্ধের পথ হচ্ছে গুপ্তচরবৃত্তি, বিশ্বাসঘাতকতা, একটা দেশের অধিবাসীদের ধ্বংস, সেনাদলের খাদ্যসংস্থানের

জন্য লুট ও চুরি; জালিয়াতি ও মিথ্যাচরণই তো সামরিক কৌশলের অপর নাম। সামরিক লোকদের স্বভাব হচ্ছে স্বাধীনতার অভাব, অর্থাৎ শৃংখলা, আলস্য, অজ্ঞতা, নিষ্ঠুরতা, লাম্পট্য ও মাতলামি। আর এসব সত্ত্বেও তারাই সর্বজনশ্রদ্ধেয় উচ্চতম শ্রেণী। একমাত্র চীনারা ছাড়া আর সব রাজারাই সামরিক পোশাক পরেন; যে লোক যত বেশী মানুষ মারতে পারে সেই পায় সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

"কাল যেমন আমরা মুখোমুখি হব, তেমনি তারাও পরস্পরের মুখোমুখি হয় একে অন্যকে খুন করতে; তারা হাজার হাজার লোককে খুন করে, পঙ্গু করে, তারপর এত এত মানুষ (এমন কি তারা সংখ্যাটাকে বাড়িয়ে বলে) খুন করার জন্য ধন্যবাদজ্ঞাপক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়; যত বেশী মানুষ তারা খুন করবে ততই তাদের কৃতিত্ব বাড়বে এটা ধরে নিয়েই একটা জয়ের কথা ঘোষণা করা হয়। মাথার উপর থেকে ঈশ্বর তাদের কোন্ চোখে দেখেন বা তাদের কথা শোনেন?" প্রিন্স আন্‌দ্রুর কণ্ঠস্বর আরও তীক্ষ্ণ ও কর্কশ হয়ে উঠল। "হায় বন্ধু, ইদানীং বেঁচে থাকাটাই আমার পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠেছে। বুঝতে পারছি যে আমি বড় বেশী বুঝতে শুরু করেছি। পাপ-পুণ্যের জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাওয়া মানুষের পোষায় না। ...যাই হোক, আর বেশী দিন নয়!"

তারপরেই হঠাৎ বলে উঠল, "যাই হোক, তোমার ঘুম পাচ্ছে, আমারও ঘুমের সময় হয়েছে। গোর্কিতে ফিরে যাও।"

ভয়ার্ত, সহৃদয় চোখে তারদিকে তাকিয়ে পিয়ের বলল, "না, না।"

"যাও, যাও। যুদ্ধের আগে ঘুমটা ভাল হওয়া চাই," প্রিন্স আন্‌দ্রু আবার বলল।

তাড়াতাড়ি পিয়েরের কাছে গিয়ে তাকে আলিঙ্গন করে চুমো খেল।

চেঁচিয়ে বলল, "বিদায়, কেটে পড়! আবার আমাদের দেখা হবে কি হবে না..." মুখটা ঘুরিয়ে দ্রুত পায়ে সে চালাঘরে ঢুকে পড়ল।

অন্ধকার হয়ে এসেছে; তাই পিয়ের বুঝতে পারল না প্রিন্স আন্‌দ্রুর মুখে কোন্ ভাব ফুটেছে—ক্রোধের, না মমতার।

নিঃশব্দে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ভাবল, তার পিছু নেবে না চলে যাবে। শেষ পর্যন্ত স্থির করল, "না। সেটা তার ইচ্ছা নয়। আমি জানি, এটাই আমাদের শেষ দেখা।" গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে গোর্কির দিকে ঘোড়া চালিয়ে দিল।

চালাঘরে ঢুকে প্রিন্স আন্‌দ্রু একটা কম্বলের উপর শুয়ে পড়ল, কিন্তু ঘুমোতে পারল না।

চোখ বুজল। কল্পনায় একটার পর একটা ছবি ভেসে উঠল। একটা ছবি নিয়ে আনন্দের সঙ্গে অনেকক্ষণ কাটাল। পিতার্সবুর্গের একটা সন্ধ্যার কথা খুব স্পষ্ট হয়ে মনে পড়ল। প্রাণবন্ত, উত্তেজিত মুখে নাতাশা তাকে

বলেছিল, আগের গ্রীষ্মকালে ব্যাঙের ছাতা কুড়তে গিয়ে কেমন করে সে বনের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছিল। এলোমেলোভাবে সে বলছিল জঙ্গলের গভীরতার কথা, তার অনুভূতির কথা; একজন মৌমাছি-পালকের সঙ্গে দেখা হবার কথা; আর সেসব বলার ফাঁকে ফাঁকে বারবারই বলেছিল: "না, আমি পারছি না, ঠিক মত বলা হচ্ছে না; না, তুমি ঠিক বুঝছ না।" নিজের কথায় নাতাশা নিজেই খুশি হতে পারে নি: সে বুঝতে পারছিল, সেদিন তার মনে যে আবেগময় কাব্যভাব জেগেছিল সেটাকে সে ঠিকমত প্রকাশ করতে পারছে না। উত্তেজনায় লাল হয়ে সে বলেছিল, "না, আমি ঠিকমত বলতে পারছি না। ...বুড়ো মানুষটি এত ভাল ছিল, আর জঙ্গলের ভিতরটা ছিল এত অন্ধকার ...না, ঠিক হচ্ছে না।" প্রিন্স আন্‌দ্রুর মুখে সেদিনকার মতই খুশির হাসি দেখা দিল। ভাবল, "আমি তাকে ঠিক বুঝেছিলাম। শুধু যে বুঝেছিলাম তাই নয়, তার ভিতরকার সেই আত্মিক শক্তি, সেই আন্তরিকতা, আত্মার সেই সংকোচবিহীনতা—তার যে আত্মা দেহের বন্ধনে আবদ্ধ—সেই আত্মাকেই আমি ভালবেসেছিলাম....কত যে ভালবেসেছিলাম আর কত যে সুখী হয়েছিলাম....হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল কেমন করে একদিন সে ভালবাসার অবসান হল। "সেই লোকটার তো সেরকম কিছুর প্রয়োজন ছিল না। সে জিনিস সে তো দেখেও নি, বোঝেও নি। সে লোকটা তার মধ্যে দেখেছিল শুধু একটি সুন্দরী, তাজা যুবতীকে; কিন্তু সে নিজে তো তার সঙ্গে নিজের ভাগ্যকে জড়াতে চায় নি। আর আমি? ....অথচ সেই লোকটা আজও বেঁচে আছে, ফুর্তিতে আছে!"

যেন আগুনের ছ্যাঁকা লেগেছে এমনিভাবে লাফিয়ে উঠে প্রিন্স আন্‌দ্রু চালাঘরটার সামনে পায়চারি করতে শুরু করল।

অধ্যায়—২৬

বরদিনো যুদ্ধের প্রাক্কালে ২৫শে অগস্ট তারিখে ফরাসী সম্রাটের রাজপ্রাসাদের প্রিফেক্ট ম. দ্য বুসে কর্ণেল ফেবিয়েরকে সঙ্গে নিয়ে ভালুভো ঘাঁটিতে নেপোলিয়নের কাছে এসে হাজির হল; প্রথমজন এল প্যারিস থেকে, আর দ্বিতীয়জন মাদ্রিদ থেকে।

দরবারের পোশাকে সজ্জিত ম. দ্য বুসে হুকুম দিল, সম্রাটের জন্য যে বাক্সটা আনা হয়েছে সেটা তার সামনে হাজির করা হোক। নেপোলিয়নের শিবিরের প্রথম ঘরটাতে ঢুকে নেপোলিয়নের এড্‌-ডি-কংদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সে বাক্সটা খুলতে লাগল।

ফেবিয়ের শিবিরে না ঢুকে ফটকে দাঁড়িয়েই পরিচিত সেনাপতিদের সঙ্গে আলাপ করতে লাগল।

সম্রাট নেপোলিয়ন তখনও তার শোবার ঘরেই বেশবাস নিয়ে ব্যস্ত।

ঈষৎ বিরক্তির সঙ্গে কখনও পিঠ, কখনও লোমশ ফোলা বুকটা এগিয়ে দিচ্ছে, আর খানসামা তাকে বুরুশ করছে। আর একটি খানসামা একটা বোতলের মুখে আঙুল রেখে সম্রাটের সারা শরীরে ইউ-ডি-কলোন ছিটিয়ে দিচ্ছে; তার মুখের ভাব দেখে মনে হচ্ছে যেন একমাত্র সেই জানে সম্রাটের শরীরের কোথায় কতটা ইউ-ডি-কলোন ছিটাতে হবে। নেপোলিয়নের মাথার ছোট ছোট চুলগুলি ভেজা, কপালের উপর চেপে বসানো; ফোলা-ফোলা হল্‌দেটে মুখে দৈহিক তৃপ্তির আমেজ। খানসামাকে বলছে, "চালাও, আরও জোরে বুরুশ চালাও!" যে এড্‌-ডি-কংটি গতকালের যুদ্ধে বন্দীদের সংখ্যা জানাতে ঘরে ঢুকেছিল, ফিরে যাওয়ার নির্দেশের অপেক্ষায় সে দরজার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। ভুরু কুঁচকে নেপোলিয়ন তারদিকে তাকাল।

এড্‌-ডি-কং-য়ের কথার পুনরাবৃত্তি করে বলল, "কেউ বন্দী হয় নি! ওদের নির্মূল করতে ওরা আমাদের বাধ্য করছে। রুশ সৈন্যদের কপালই মন্দ। ...জোরে চালাও....আরও জোরে!" পিঠটা কুঁজো করে মোটা গর্দান এগিয়ে দিয়ে বলে উঠল।

তারপর এড্‌-ডি-কং-য়ের দিকে মাথা নেড়ে বলল, "ঠিক আছে। মঁসিয় গু বুসেকে আসতে বল। ফেরিয়েরকেও।"

"ঠিক আছে স্যার," এড্‌-ডি-কং শিবিরের দরজা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। দুই খানসামা দ্রুত হাতে হিজ ম্যাজেস্টির প্রসাধন শেষ করল; রক্ষী-বাহিনীর নীল ইউনিফর্ম পরে সম্রাট দ্রুতপায়ে অভ্যর্থনাকক্ষে ঢুকল।

সম্রাজ্ঞীর কাছ থেকে যে উপহার নিয়ে এসেছে সেগুলিকে দরজার ঠিক সামনে দুটো চেয়ারে সাজিয়ে রাখার কাজেই তখন গু বুসে খুব ব্যস্ত। পোশাক-পরা শেষ করে নেপোলিয়ন এত অপ্রত্যাশিত দ্রুতগতিতে বেরিয়ে এসেছে যে গু বুসে তখনও উপহারগুলি সাজিয়ে শেষ করতে পারে নি।

তাদের কাজকর্ম দেখেই নেপোলিয়ন বুঝতে পারল তারা কি করছে এবং সেকাজ তখনও শেষ হয় নি। তাকে অবাক করে দিয়ে নিজেরা যাতে খুশি হতে পারে সেই সুযোগ থেকে তাদের বঞ্চিত করতে নেপোলিয়নের মন চাইল না; কাজেই গু বুসেকে না দেখতে পাবার ভান করে সে ফেরিয়েরকে কাছে ডাকল এবং ইওরোপের অপর প্রান্তে সালামাংকার যুদ্ধে ফরাসী সেনাদলের বীরত্ব ও আন্তরিকতার কাহিনী শুনতে লাগল নিঃশব্দে ভুরু কুঁচকে। ফেরিয়ারের মনে একটিই চিন্তা—সম্রাটের উপযুক্ত হওয়া, তার মনে একটিই ভয়—তাকে খুশি করতে না পারা। সে যুদ্ধের ফল হয়েছে শোচনীয়। ফেরিয়ারের বিবরণ শুনতে শুনতে নেপোলিয়ন এমন সব মন্তব্য করতে লাগল যেন তার অনুপস্থিতিতে ব্যাপারটা যে অন্যরকম হতে পারে না তা সে জানত। বলল, "সে ক্ষতি আমি মস্কোতে পূরণ করব। ঠিক আছে, পরে আপনার সঙ্গে দেখা হবে।" তারপর গু বুসেকে ডাকল। উপঢৌকন

সাজানো শেষ করে সেগুলোকে চেয়ারের উপর রেখে একটা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে।

দ্য বুসে নীচু হয়ে অভিবাদন জানাল। সেধরনের দরকারি অভিবাদন একমাত্র বুরবনদের আমলের পুরনো কর্মচারিরাই করতে জানে। সে এগিয়ে এসে সম্রাটের হাতে একটা খাম দিল।

নেপোলিয়ন খুশি হয়ে তার কানটা টেনে দিল।

"তুমি খুব তাড়াতাড়ি এসেছ। আমি খুব খুশি হয়েছি। আচ্ছা, প্যারিস কি বলছে?" হঠাৎ তার মুখের কঠোরতা সরে গিয়ে দেখা দিল প্রসন্নতা।

দ্য বুসে জবাব দিল, "স্যার, আপনার অনুপস্থিতিতে সারা প্যারিস দুঃখিত।"

কথাটা মিথ্যা হলেও দ্য বুসে যে এই কথাই বলবে নেপোলিয়ন তা জানত; তবু তার মুখ থেকে কথাটা শুনে সে খুশি হল; আবার তার কান ছুঁয়ে তাকে সম্মানিত করল।

বলল, "তোমাকে এতদূর টেনে এনেছি বলে আমি খুবই দুঃখিত।"

দ্য বুসে উত্তর দিল, "আমি তো আশা করেছিলাম মস্কোর ফটকেই আপনার সঙ্গে দেখা হবে।"

নেপোলিয়ন হাসল; অন্যমনস্কভাবে মাথাটা তুলে ডাইনে তাকাল। জনৈক এড্-ডি-কং এগিয়ে এসে একটা সোনার নস্যদানি তার হাতে দিল।

খোলা নস্যর কৌটোটা নাকের কাছে ধরে বলল, "হ্যাঁ, তোমার ভাগ্য ভাল যে সেটাই ঘটছে। তুমি তো ভ্রমণ করতে ভালবাস, আর তিনদিনের মধ্যেই মস্কো দেখতে পাবে। এসিয়ার সেই রাজধানীটা দেখার আশা তুমি নিশ্চয়ই কর নি। তোমার যাত্রাপথটাও সুখেই কাটবে।"

ভ্রমণ-অনুরাগের এই গুণগান শুনে (যদিও সে নিজে বিষয়টা সম্পর্কে ঠিক অবহিত ছিল না) দ্য বুসে সকৃতজ্ঞচিত্তে মাথা নোয়াল।

কাপড় দিয়ে ঢাকা কোন জিনিসের দিকে পারিষদরা সকলেই তাকিয়ে আছে দেখে নেপোলিয়ন শুধাল, "আরে, এটা কি?"

দ্য বুসে দরবারি কায়দায় অর্ধেকটা ঘুরে কিন্তু সম্রাটের দিকে পিছন না ফিরে দু' পা পিছিয়ে গেল এবং কাপড়টা সরিয়ে দিয়ে বলল, "সম্রাজ্ঞীর কাছ থেকে ইয়োর ম্যাজেস্টির জন্য কিছু উপঢৌকন।"

একখানি প্রতিকৃতি; জেরার্ড কর্তৃক উজ্জ্বল রঙে আঁকা। অস্ট্রীয়ার সম্রাটের কন্যার গর্ভে নেপোলিয়নের যে ছেলে হয়েছে তারই ছবি; যে কারণেই হোক সকলেই ছেলেটিকে "রোমের রাজা" বলে ডাকে।

মাথাভর্তি কোঁকড়া চুল সুন্দর ছেলেটি; চোখে সিস্টাইন ম্যাডোনার আঁকা খৃস্টের দৃষ্টি; লাঠি ও বল নিয়ে ক্রীড়ারত ভঙ্গীতে তাকে আঁকা হয়েছে।

বলটি যেন ভূ-গোলক, আর অন্য হাতের লাঠিটা রাজদণ্ড।

তথাকথিত "রোমের রাজা" কে লাঠি দিয়ে পৃথিবীকে বিদ্ধকারী ভঙ্গিমায় এঁকে শিল্পী কি বোঝাতে চেয়েছে সেটা স্পষ্ট না হলেও প্যারিসে যারা যারা ছবিটা দেখেছে তাদের মত নেপোলিয়নের কাছেও ছবির রূপকার্থটি খুবই পরিষ্কার ও মনের মত বলেই মনে হল।

একটা মনোরম ভঙ্গী করে প্রতিকৃতিটির দিকে আঙুল বাড়িয়ে নেপোলিয়ন বলে উঠল, "রোমের রাজা! ···প্রশংসনীয়!"

ইচ্ছামত মুখেরভাব বদলাবার সহজাত ইতালীয় ক্ষমতার বলে সে ছবিটার আরও কাছে এগিয়ে গিয়ে মুখে একটা বিষণ্ন মমতার ভাব ফুটিয়ে তুলল। সে বুঝতে পেরেছে, এইমুহূর্তে সে যা বলবে বা করবে সেটা ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি লাভ করবে, আর তাই এই মুহূর্তে তার পক্ষে সব চাইতে ভাল হবে রাজকীয় জাঁকজমকের—যে জাঁকজমক তার সন্তানকে দিয়েছে ভূগোলক নিয়ে খেলা করার শক্তি—পরিবর্তে অতি সহজ, সরল পিতৃসুলভ মমতা দেখানো। তার দৃষ্টি ঝাঁপসা হয়ে এল, কিছুটা এগিয়ে ছবিটার সামনে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। তার একটিমাত্র ইঙ্গিতে সকলেই পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, সেখানে রইল শুধু ভাববিহ্বল মহাপুরুষটি।

কিছুক্ষণ বসে থেকে কিছু না বুঝেই সে ছবির সবচাইতে উজ্জ্বল রংয়ের জায়গাটা ছুঁয়ে উঠে দাঁড়াল; দ্য বুসে ও কর্তব্যরত অফিসারকে ডেকে পাঠাল। প্রতিকৃতিটিকে শিবিরের বাইরে নিয়ে যাবার হুকুম হল; শিবিরের চারপাশে মোতায়েন রক্ষীদল যেন তাদের পূজনীয় সম্রাটের পুত্র ও উত্তরাধিকারী "রোমের রাজা"র দর্শন থেকে বঞ্চিত না হয়।

ম. দ্য বুসের সঙ্গে প্রাতরাশে বসেই তারা শুনতে পেল ওল্ড গার্ডের অফিসার ও সৈনিকরা উচ্ছ্বসিত আনন্দে চীৎকার করতে করতে প্রতিকৃতিটি দেখবার জন্য ছুটে যাচ্ছে।

"ভি ভে ল' এম্পেরিয়র! ভি ভে লে রয় দ্য রোম! ভি ভে ল' এম্পেরিয়র!"

প্রাতরাশের পরে দ্য বুসের উপস্থিতিতেই সে সেনাবাহিনীর প্রতি সেদিনকার হুকুমের শ্রুতলিখনটি বলতে লাগল।

কোনরকম সংশোধন ছাড়াই সেকাজটা শেষ করে একবার পড়ে সে বলল, "সংক্ষিপ্ত ও উৎসাহবর্ধক!" হুকুমটা এইরকম:

"সৈন্যগণ, এই যুদ্ধের আশাতেই তোমরা এতদিন ছিলে। তোমাদের উপরেই নির্ভর করছে বিজয়-গৌরব। এ যুদ্ধ আমাদের পক্ষে একান্তভাবে প্রয়োজন; আমাদের যা কিছু দরকার সবই এই যুদ্ধ আমাদের দেবে—আরামদায়ক বাসস্থান এবং দ্রুত দেশে প্রত্যাবর্তন। অস্তারলিজ, ফ্রিডল্যাণ্ড, ভিতেবস্ক্ ও স্মোলেনস্ক-এ যে আচরণ তোমরা করেছ, এখনও তাই করবে।

আমাদের দূরতম প্রজন্মও যেন তোমাদের আজকের সাফল্যকে গর্বের সঙ্গে স্মরণ করতে পারে। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য তারা যেন বলতে পারে: মস্কোর সম্মুখের মহাযুদ্ধে তিনি ছিলেন।"

"মস্কোর সম্মুখে!" নেপোলিয়ন কথাটা আর একবার উচ্চারণ করল, "তারপর ভ্রমণপ্রিয় ম. দ্য বুসেকে অশ্বারোহণে তার সঙ্গী হবার আমন্ত্রণ জানিয়ে সে শিবির থেকে বেরিয়ে গেল।

সম্রাটের সঙ্গী হবার আমন্ত্রণের উত্তরে দ্য বুসে বলল, "ইয়োর ম্যাজেস্টির অনেক দয়া!" তার তখন ঘুম পেয়েছে, ঘোড়ায় চড়তেও সে জানে না, তাই খুব ভয়ও করছে।

কিন্তু নেপোলিয়নের ইসারায় দ্য বুসেকে ঘোড়ায় চাপতেই হল। নেপোলিয়ন শিবির থেকে বেরিয়ে এলে তার ছেলের ছবির সামনে সমবেত রক্ষীদের চীৎকার আরও উচ্চকণ্ঠ হল। নেপোলিয়নের চোখে ভ্রূকুটি দেখা দিল।

রাজকীয় ভঙ্গীতে ছবিটা দেখিয়ে বলল, "ওকে সরিয়ে নিয়ে যাও! যুদ্ধক্ষেত্র দেখবার সময় ওর এখনও হয় নি।"

সম্রাটের কথাগুলি যে তার কাছে কত মূল্যবান সেটা বোঝাবার জন্য দ্য বুসে চোখ বুজে মাথাটা নুইয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

অধ্যায়—২৭

ইতিহাসকারদের কাছ থেকে আমরা শুনেছি, ২৫শে অগস্ট সারাটা দিন নেপোলিয়ন অশ্বপৃষ্ঠেই কাটিয়েছে; গোটা অঞ্চল পরিদর্শন করেছে, মার্শালরা যেসব পরিকল্পনা দাখিল করেছে সেগুলি নিয়ে ভেবেছে, সেনাপতিদের জানিয়েছে ব্যক্তিগত নির্দেশ।

২৪শে তারিখে শেভার্দিনো দুর্গ দখলের ফলে কলোচা নদী বরাবর রুশবাহিনীর সীমান্তটি বিপর্যস্ত হয়ে গেছে, আর তার কতকাংশকে—বামব্যূহটি—পিছিয়ে নেওয়া হয়েছে। সীমান্তের সেই অংশটি পরিখাবেষ্টিত নয়, আর তার সম্মুখস্থ মাঠটি অনেকটা খোলা এবং অন্য জায়গার তুলনায় সমতল। কাজেই সামরিক বা সাধারণ যেকোন লোকের কাছেই এটা স্পষ্ট যে ফরাসীরা সেখান দিয়েই আক্রমণ করবে। স্বভাবতই এটা মনে হতে পারে যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য কোন বিশেষ বিচার-বিবেচনার দরকার ছিল না, সম্রাট বা তার মার্শালদেরও এ নিয়ে বিশেষভাবে মাথা ঘামাবারও দরকার ছিল না, এবং সাধারণ মানুষ নেপোলিয়নকে যে প্রতিভার অধিকারী বলে মনে করে সেরকম কোন বিশেষ মহৎ গুণের প্রয়োজনও সেখানে ছিল না; অথচ যে ইতিহাসকাররা পরবর্তীকালে এই ঘটনার বর্ণনা দিয়েছে, যারা সেইসময় নেপোলিয়নকে ঘিরে ছিল, এমন কি নেপোলিয়ন স্বয়ং কিন্তু অন্য-

রকমটাই মনে করেছিল।

সমতলভূমিতে ঘোড়া চালাতে চালাতে নেপোলিয়ন গম্ভীর নীরবতার সঙ্গে অঞ্চলটা ঘুরে দেখল, কখনও ঘাড় নাড়ল সম্মতিসূচকভাবে, কখনও বা সন্দিগ্ধচিত্তে, এবং যে গুরুগম্ভীর চিন্তাধারাকে অনুসরণ করে সে তার সিদ্ধান্তে উপনীত হল সে সম্পর্কে সঙ্গী সেনাপতিদের কিছুমাত্র না জানিয়ে তাদের শুনিয়ে দিল তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তগুলিকে হুকুমের আকারে।

শেভার্দিনো দুর্গের বিপরীত দিককার অঞ্চলটা ভাল করে পরীক্ষা করে নেপোলিয়ন নীরবে কিছুক্ষণ ভাবল, তারপর কয়েকটা জায়গা দেখিয়ে রুশদের পরিখা খননে বাধা দেবার জন্য আগামীকালের মধ্যে সেখানে দুটো কামানশ্রেণী এবং তার সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় গোলন্দাজ-বাহিনী সন্নিবেশের নির্দেশ দিল।

এইসব নির্দেশাদি দিয়ে সে শিবিরে ফিরে গেল এবং তার শ্রুতিলিপি অনুসারেই যুদ্ধের বিলি-ব্যবস্থার বিবরণ লেখা হল।

যে বিলি-ব্যবস্থার বিবরণ ফরাসী ইতিহাসকাররা লিখেছে মহা উৎসাহে এবং অন্য ইতিহাসকাররা লিখেছে গভীর শ্রদ্ধায় তা হল :

"প্রিন্স দ্য এককৃমূহ্‌ল কর্তৃক অধিকৃত প্রান্তরে রাতের মধ্যেই যে দুটি কামানশ্রেণী স্থাপিত হয়েছে প্রত্যুষেই বিপরীত দিকে অবস্থিত শত্রুপক্ষের দুটি কামানশ্রেণীর উপর তা থেকে গোলা বর্ষণ করা হবে।

"ঠিক একই সঙ্গে গোলন্দাজ বাহিনীর প্রথম কোরের কম্যাণ্ডার জেনারেল পারনেত্তি কাম্পাঁ ডিভিসনের ত্রিশটি কামান এবং দেসায়িকস্‌ ও ক্রিয়াঁৎ ডিভিসনের হাল্কা কামান নিয়ে অগ্রসর হবে, গোলাবর্ষণ করবে এবং নিম্ন-লিখিত শক্তি নিয়ে শত্রুপক্ষের কামানের গোলাবর্ষণকে স্তব্ধ করে দেবে :

২৪ কামান—গোলন্দাজ রক্ষী বাহিনীর
৩০ কামান—কাম্পাঁ ডিভিসনের
ও ৮ কামান—ক্রিয়াঁৎ ও দেসায়িকস্‌ ডিভিশনের
মোট ৬২ কামান

"গোলন্দাজ বাহিনীর তৃতীয় কোরের কম্যাণ্ডার জেনারেল ফুচে তৃতীয় ও অষ্টম কোরের মোট ষোলটি হাল্কা কামানকে রাখবে সেই কামানশ্রেণীর পাশে যা থেকে বাঁ দিকের পরিখা লক্ষ্য করে গোলাবর্ষণ করা হবে এবং যার বিরুদ্ধে তাক করে সাজানো রয়েছে চল্লিশটা কামান।

"গোলন্দাজ রক্ষীবাহিনীর হাল্কা কামানগুলি নিয়ে যেকোন একটি পরিখা-খননকারী দলের বিরুদ্ধে প্রথম হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হবার জন্য জেনারেল সোরবিয়েরকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

"গোলাবর্ষণ চলাকালে প্রিন্স পোনিয়াতোস্কি জঙ্গলের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে গ্রামে পৌঁছে শত্রুর সেনাসমাবেশের মুখটা ঘুরিয়ে দেবে।

"প্রথম রক্ষা-ব্যবস্থাকে দখল করে নেবার জন্য জেনারেল কাম্প্যাঁ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হবে।

"এইভাবে অগ্রসর হবার পরে শত্রুর গতিবিধি অনুসারে নতুন নির্দেশ দেওয়া হবে।

"ডানদিককার কামানের গর্জন শোনার সঙ্গে সঙ্গেই বাম ব্যূহের উপর গোলাবর্ষণ শুরু হবে। দক্ষিণ ব্যূহের উপর আক্রমণ শুরু হতে দেখলেই মোরাঁদ-এর ডিভিসন এবং উপরাজার ডিভিসনের (মুরাত-এর কথা বলা হচ্ছে) নিপুণ গোলন্দাজরা প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ শুরু করে দেবে।

"উপরাজা গ্রামটি (বরদিনো) দখল করবে এবং তিনটে সেতুপথে নদী পেরিয়ে মোরাঁদ ও জেরার্দ ডিভিসনের সমান উচ্চতায় উঠে যাবে; তার নেতৃত্বে ঐ দুটি ডিভিসনও দুর্গটিকে আক্রমণ করবে এবং অবশিষ্ট সেনাদলের সঙ্গে একসারিতে এসে যোগ দেবে।

এসব কিছুই করতে হবে সেনাদলকে যতদূর সম্ভব রিজার্ভে রেখে অত্যন্ত শৃংখলার সঙ্গে।

"মোঝায়েস্ক-এর নিকটবর্তী রাজকীয় শিবির,
৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮১২"

নেপোলিয়নের প্রতিভার প্রতি একান্ত ভীতি পোষণ না করে যদি এইসব অস্পষ্ট ও গোলমেলে বিলি-ব্যবস্থার বিচার করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে নেপোলিয়ন চারটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে চারটি নির্দেশ দিয়েছিল। তার কোনটিই কার্যকর করা হয় নি, করা যেত না।

বরদিনো পার হয়ে যাবার পরে উপরাজাকে কলোচা নদী পর্যন্ত হটিয়ে দেওয়া হল, সে আর অগ্রসর হতে পারল না; মোরাঁদ ও জেরার্দ-এর ডিভিসনগুলিও দুর্গটা দখল করতে পারল না, বরং তাদেরও হটিয়ে দেওয়া হল; অবশ্য যুদ্ধের একেবারে শেষে অশ্বারোহী বাহিনী সেটা দখল করেছিল। (এ ঘটনাটা হয়তো নেপোলিয়ন আগে দেখতেও পায়নি, শোনেওনি।) কাজেই তার বিলি-ব্যবস্থার একটি নির্দেশও কার্যকর হয় নি, করা যেতও না। কিন্তু বিলি-ব্যবস্থার মধ্যেই বলা আছে "এইভাবে যুদ্ধ শুরু হবার পরে শত্রুর গতিবিধি অনুসারে নতুন নির্দেশ দেওয়া হবে"; কাজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে যুদ্ধ চলাকালীন সব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেপোলিয়নই করবে। কিন্তু তা করা হয় নি, করা যেতও না, কারণ গোটা যুদ্ধের সময় নেপোলিয়ন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এত দূরে ছিল যে তার পক্ষে যুদ্ধের গতিবিধি জানাও সম্ভব ছিল না, আর সেইসময়ে তার কোন নির্দেশও কার্যকর করা সম্ভব হয় নি।

অনেক ইতিহাসকার বলে থাকে, নেপ্রোলিয়নের সর্দি লেগেছিল বলেই ফরাসীরা বরদিনোর যুদ্ধ জিততে পারে নি; যদি তার সর্দিটা না হত তাহলে যুদ্ধের আগে এবং যুদ্ধ চলাকালে যেসব হুকুম সে জারি করেছিল তাতে তার প্রতিভার স্পর্শ আরও বেশী করে লাগত, রাশিয়া হেরে যেত, আর পৃথিবীর মুখটাই বদলে যেত। যেসব ইতিহাসকাররা বিশ্বাস করে যে রাশিয়া গড়ে উঠেছিল একটিমাত্র লোকের—মহান পিতরের—ইচ্ছাশক্তিতে, এবং একটি মানুষের-নেপোলিয়নের-ইচ্ছাশক্তিতেই ফ্রান্স প্রজাতন্ত্র থেকে সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছিল এবং ফরাসীবাহিনী রাশিয়াতে গিয়েছিল, যারা বলে যে ২৪শে অগস্ট নেপোলিয়নের নিদারুণ সর্দি লেগেছিল বলেই রাশিয়া স্বীয় শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাদের কথা যুক্তিসম্মত ও বিশ্বাসযোগ্য মনে হতে পারে বটে।

বরদিনোর যুদ্ধ করা না করা যদি নেপোলিয়নের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে থাকে, যদি এটা-ওটা ব্যবস্থাও তার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে থাকে, তাহলে তো স্পষ্টতই তার ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণকারী একটা সর্দিই রাশিয়াকে রক্ষা করেছিল, এবং তদনুসারে যে খানসামাটি ২৪শে তারিখে নেপোলিয়নের ওয়াটারপ্রুফ-বুট জোড়াটা তাকে এনে দিতে ভুলে গিয়েছিল সেই ছিল রাশিয়ার ত্রাণকর্তা। এই চিন্তার ধারা অনুসরণ করলে তো এধরনের সিদ্ধান্ত একেবারেই সন্দেহের অতীত; ভল্‌তেয়ার যখন ঠাট্টা করে বলেছিল যে নবম চার্লসের পেটের গোলমালের জন্যই সেণ্ট বার্থোলোমিউ-র হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল তখন তার সেই সিদ্ধান্তও ছিল অনুরূপভাবেই সন্দেহের অতীত। কিন্তু একথা যারা স্বীকার করে না যে একটি লোকের—প্রথম পিতরের—ইচ্ছায় গড়ে উঠেছিল রাশিয়া, অথবা একটি লোকের—নেপোলিয়নের—ইচ্ছায় গড়ে উঠেছিল ফরাসী সাম্রাজ্য এবং শুরু হয়েছিল রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ, তাদের কাছে এই যুক্তি অসত্য ও বুদ্ধিবিরোধী তো বটেই, উপরন্তু সর্বপ্রকার মানবিক বাস্তবতার বিরোধী। ঐতিহাসিক ঘটনাবলী কিসে ঘটে সে প্রশ্নের আর একটা জবাব হল: মানবিক ঘটনাবলীর গতি নির্ধারিত হয় উপর থেকে—তা নির্ভর করে সেই ঘটনায় অংশগ্রহণকারী প্রতিটি মানুষের সম্মিলিত ইচ্ছার উপরে; এইসব ঘটনার উপর একজন নেপোলিয়নের প্রভাব সম্পূর্ণ বাহ্যিক ও অলীক।

প্রথম দৃষ্টিতে যদিও এটা খুবই বিস্ময়কর মনে হতে পারে যে নবম চার্লসের ইচ্ছানুসারে সেণ্ট বার্থোলোমিউ-র হত্যাকাণ্ডটি ঘটে নি, যদিও সে ঘটনার হুকুমটা সেই দিয়েছিল এবং সে ভেবেছিল যে সেই হুকুমমতই হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছে; আবার এটাও খুব বিস্ময়কর মনে হতে পারে যে নেপোলিয়নের ইচ্ছানুসারে বরদিনোতে আশি হাজার মানুষ খুন হয় নি, যদিও যুদ্ধ শুরু

ও পরিচালনার হুকুমটা সেই দিয়েছিল এবং ভেবেছিল যে তার হুকুমমতই কাজটা করা হয়েছে; এইসব ধারণা যত বিস্ময়করই মনে হোক, তথাপি যে মানবিক মর্যাদাবোধ আমাকে শিখিয়েছে যে আমরা কেউই মানুষ হিসাবে মহান নেপোলিয়ন অপেক্ষা বড় না হলেও ছোট নই সেই মানবিক মর্যাদাবোধই দাবী করছে যে সমস্যাটার এই সমাধানই গ্রহণযোগ্য, আর ঐতিহাসিক গবেষণাও সেটাকেই যথাযথভাবে প্রমাণ করেছে।

বরদিনোর যুদ্ধে নেপোলিয়ন কাউকে লক্ষ্য করে একটা গুলিও ছোঁড়ে নি, একটা মানুষকেও মারে নি। সেকাজ সবটাই করেছে সৈন্যরা। কাজেই সে তো মানুষ মারে নি।

ফরাসী সৈন্যরা যে বরদিনোর যুদ্ধে গিয়েছিল মারতে এবং মরতে সেটা নেপোলিয়নের হুকুমে নয়, নিজেদের ইচ্ছায়। গোটা বাহিনী—ফরাসী, ইতালীয়, পোলিশ ও ওলন্দাজ—সকলেই তখন ক্ষুধার্ত, ছিন্নবস্ত্রপরিহিত, অভিযানে ক্লান্ত; তারা যখন দেখল যে আর একটা বাহিনী মস্কোর পথ অবরোধ করেছে তখন তাদের মনে হল যে সামনে মদ রয়েছে আর সেটা পান করতেই হবে। তখন যদি নেপোলিয়ন তাদের রুশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নিষেধ করত, তাহলে তারা তাকেই হত্যা করে রুশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এগিয়ে যেত, কারণ সেটা ছিল অনিবার্য।

যুদ্ধে পঙ্গুত্ব ও মৃত্যুর ক্ষতিপূরণস্বরূপ তারা পাবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রশংসা-বাণী—নেপোলিয়নের এই ঘোষণা শুনে তারা চীৎকার করে উঠেছিল "ভিভে ল' এম্পেরিয়র!" যে বালকটি খেলনা লাঠি দিয়ে ভূ-গোলককে বিদ্ধ করছে তার ছবি দেখেও তারা একইভাবে চীৎকার করেছিল "ভি ভে, ল' এম্পেরিয়র!" আর তখন তাদের যেকোন অর্থহীন কথা শোনালেই তারা চীৎকার করে বলত, ভিভে ল' এম্পেরিয়র!" "ভিভে ল' এম্পেরিয়র" বলে চীৎকার করতে করতে খাদ্য ও আশ্রয় পাবার আশায় বিজয়ীর বেশে মস্কো প্রবেশের জন্য যুদ্ধ করা ছাড়া তাদের সামনে আর কোন পথ খোলা ছিল না। কাজেই তারা যে তাদেরই সমগোত্রীয় ভাইদের হত্যা করেছিল তার কারণ নেপোলিয়নের হুকুম নয়।

আর সে যুদ্ধের গতিও নেপোলিয়নের নির্দেশে চলে নি, কারণ তার কোন হুকুমই কার্যকর করা হয় নি, আর যুদ্ধ চলাকালে সে জানতও না তার সামনে কি ঘটে চলেছে। কাজেই এই লোকগুলি যেভাবে একে অন্যকে মেরেছে সেটা নেপোলিয়নের ইচ্ছায় স্থির হয় নি, সেটা ঘটেছে তাকে ছাড়াই—যে লক্ষ লক্ষ মানুষ সেই যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল তাদের সকলের ইচ্ছা অনুসারে। শুধু নেপোলিয়নের মনে হয়েছিল যে সবই তার ইচ্ছামত ঘটেছে। কাজেই তার সর্দি হয়েছিল কি হয় নি সে প্রশ্নটার কোন ঐতিহাসিক গুরুত্বই নেই।

অনেক লেখক একথাও বলে থাকেন যে সর্দি লাগার জন্যই তার এ যুদ্ধের

বিলি-ব্যবস্থাগুলি আগেকার যুদ্ধের মত সুপরিকল্পিত হতে পারে নি। এ কথাও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। উপরে যে বন্দোবস্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেটা তো আগেকার এমন অনেক যুদ্ধের বন্দোবস্ত অপেক্ষা অনেক ভাল, যেখানে নেপোলিয়ন জয়লাভ করেছিল। যুদ্ধকালে যেসব হুকুম সে প্রচার করেছে সেগুলো তো আগের সব যুদ্ধের হুকুমের চাইতে খারাপ কিছু নয়, একই রকমের। আসলে এইসব হুকুম ও বন্দোবস্ত যে আগেকার চাইতে খারাপ মনে হয়েছে তার কারণ বরদিনোর যুদ্ধই প্রথম যুদ্ধ যেটা নেপোলিয়ন জিততে পারে নি। যে যুদ্ধে পরাজয় ঘটে সে যুদ্ধের অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত ও চমৎকার বন্দোবস্ত ও হুকুমগুলিও খারাপ বলে মনে হয়, এবং প্রত্যেক সমরবিশেষজ্ঞ পণ্ডিতই গম্ভীরভাবে সেগুলির সমালোচনা করে থাকে; আবার যে যুদ্ধে জয়লাভ ঘটে সে যুদ্ধের অত্যন্ত বাজে বন্দোবস্ত ও হুকুমও খুব ভাল মনে হয়, এবং সেসবের গুণকীর্তন করে পণ্ডিতরা মোটা মোটা বই লিখে ফেলে।

অস্তারলিজ যুদ্ধের বিলি-ব্যবস্থার যে পরিকল্পনা ওয়েরদার রচনা করেছিল সেটা ছিল পূর্ণতার আদর্শস্বরূপ, কিন্তু তবু তার সমালোচনা করা হয়েছিল—তার পূর্ণতা এবং অত্যধিক পুঙ্খানুপুঙ্খতার জন্যই সমালোচনা করা হয়েছিল।

অন্যসব যুদ্ধের মতই, এমন কি তার চাইতে ভালভাবেই, নেপোলিয়ন বরদিনোর যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল। যুদ্ধের অগ্রগতির পক্ষে ক্ষতিকর কিছুই সে করে নি; যুক্তিসঙ্গত মতামতের দিকেই ঝুঁকেছে, কোনরকম গোলমাল সৃষ্টি করে নি, স্ববিরোধী কোন কাজ করে নি, ভয় পায় নি, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায় নি; বরং তার নিজস্ব নিপুণ কুশলতা ও সামরিক অভিজ্ঞতায় শান্ত মর্যাদার সঙ্গে সেনাপতির কাজ পরিচালনা করেছে।

অধ্যায়—২৯

দ্বিতীয়বার সেনাদল পরিদর্শন করে ফিরে এসে নেপোলিয়ন মন্তব্য করল: "দাবার ঘুঁটি সাজানো হয়েছে, কাল খেলা শুরু হবে।"

পঞ্চ-পানীয় পাঠাবার নির্দেশ দিয়ে ছ বুসেকে ডেকে এনে সে প্যারিসের ব্যাপারে এবং সম্রাজ্ঞীর গৃহস্থালিতে কিছু পরিবর্তনের ব্যাপারে তার সঙ্গে কথা বলল। দরবার সংক্রান্ত খুঁটিনাটি ব্যাপারে তার স্মৃতিশক্তির বহর দেখে প্রিফেক্টটি অবাক হয়ে গেল।

পঞ্চ-পানীয়ের দ্বিতীয় গ্লাসটি শেষ করে পরেরদিনের গুরুতর কাজের আগে সে বিশ্রাম নিতে চলে গেল। সে কাজে অতিআগ্রহের ফলে সে ঘুমোতে পারল না; সন্ধ্যার ভিজে আবহাওয়ায় সর্দিটা বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও সজোরে নাক ঝাড়তে ঝাড়তে তিনটের সময় শিবিরের বড় অংশটায় গেল। রুশরা সরে গেছে কিনা প্রশ্ন করায় তাকে বলা হল, শত্রুপক্ষের আগুন একই

জায়গায় আছে।

কর্তব্যরত অ্যাডজুটাণ্ট শিবিরে ঢুকল।

নেপোলিয়ন শুধাল, "আচ্ছা রাপ্, তুমি কি মনে কর আজ আমাদের কাজকর্ম বেশ ভালই চলবে?"

"সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই স্যার," রাপ্ জবাব দিল।

নেপোলিয়ন তার দিকে তাকাল।

রাপ্ আবার বলল "স্মোলেন্স্ক্-এ আপনি দয়া করে আমাকে কি বলেছিলেন তা কি আপনার মনে আছে স্যার? "মদ তৈরি, পান করতেই হবে।"

নেপোলিয়ন ভুরু কুঁচকাল; হাতের উপর মাথা রেখে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল।

হঠাৎ বলে উঠল, "বেচারা সৈন্যরা! স্মোলেন্স্ক্-এর পরে তাদের সংখ্যা অনেক কমে গেছে। সত্যি, ভাগ্য এক বারাঙ্গণা রাপ্। কথাটা আমি আগাগোড়াই বলে এসেছি, এখন অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতে পারছি। কিন্তু রাপ্, রক্ষীবাহিনী তো অটুট আছে?"

"হ্যাঁ স্যার," রাপ্ উত্তর দিল।

নেপোলিয়ন একটা লজেন্স নিয়ে মুখে পুরল, তারপর ঘড়ি দেখল। চোখে ঘুম নেই; এখনও সকাল হয় নি। সময় কাটাবার জন্য এখন আর নতুন করে কোন হুকুম জারি করা অসম্ভব, কারণ সব হুকুমই দেওয়া হয়ে গেছে, এখন সেগুলি তামিল করার পালা।

নেপোলিয়ন রুক্ষ গলায় শুধাল, "রক্ষী রেজিমেণ্টদের কি বিস্কুট ও চাল দেওয়া হয়েছে?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"চালও?"

রাপ্ উত্তরে জানাল যে চাল সম্পর্কে সম্রাটের আদেশ সে জারি করেছে। কিন্তু তার সে হুকুম যে তামিল করা হয়েছে সেটা বিশ্বাস না করে নেপোলিয়ন মাথা নেড়ে অসন্তোষ প্রকাশ করল। পঞ্চ-পানীয় নিয়ে একজন অনুচর ঢুকল। রাপের জন্য আর এক গ্লাস আনতে বলে নিঃশব্দে নিজের গ্লাসে চুমুক দিতে লাগল।

গ্লাসটা শুঁকে বলল, "স্বাদ-গন্ধ কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। এ সর্দি বড়ই ক্লান্তিকর। লোকে ওষুধের কথা বলে—ওষুধে যখন সর্দিই সারে না তখন ওষুধ দিয়ে কি হবে! কর্ভিসার্ট (নেপোলিয়নের বিখ্যাত চিকিৎসক) এই লজেন্সগুলো দিয়েছে, কিন্তু এতেও কোন কাজ হচ্ছে না। ডাক্তাররা রোগ কি সারাবে? কেউ কিছু সারাতে পারে না। আমাদের দেহটাই বাঁচবার যন্ত্র। সেইভাবেই এটাকে গড়া হয়েছে, এর স্বভাবেই আছে বেঁচে থাকার

মন্ত্র। জীবনকে অব্যাহতগতিতে চলতে দাও, সে নিজেই নিজেকে রক্ষা করুক, ওষুধ দিয়ে দেহটাকে পঙ্গু করার চাইতে তাতে অনেক বেশী ফল পাওয়া যাবে। একটা ভাল ঘড়ির মতই আমাদের শরীর একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ঠিকভাবে চলে; ঘড়িওয়ালা সেটাকে খুলতে পারে না, কাঁপা হাতে অন্ধের মত কিছুটা ঠিকঠাক করতে পারে মাত্র···হ্যাঁ, আমাদের শরীর বাঁচবার যন্ত্রস্বরূপ; সেটাই শেষ কথা।"

কোন কিছুর সংজ্ঞা দেওয়াটা নেপোলিয়নের প্রিয় কাজ; অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ সে একটা নতুন সংজ্ঞা দিল।

"তুমি কি জান র‍্যাপ., সমর-কলা কাকে বলে? কোন একটা নির্দিষ্ট মুহূর্তে শত্রুপক্ষ অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী হওয়াই সমর-কলা। আর কিছু নয়।"

র‍্যাপ. জবাব দিল না।

নেপোলিয়ন বলল, "কাল আমাদের লড়তে হবে কুতুজভের সঙ্গে। দেখা যাক! তোমার কি মনে আছে, ব্রাউনাউতে তিনি তিন সপ্তাহ ধরে সৈন্য পরিচালনা করেছিলেন কিন্তু পরিখাগুলি পরিদর্শন করতে একটিবারও ঘোড়ায় চাপেন নি····দেখাই যাক!"

আবার ঘড়ি দেখল। সবে চারটে বাজে। ঘুম পাচ্ছে না। পঞ্চ-পানীয় ফুরিয়ে গেছে। করারও কিছু নেই। উঠল, এদিক ও-দিক হাঁটল, গরম ওভারকোট ও টুপিটা নিয়ে শিবির থেকে বেরিয়ে গেল। রাতটা অন্ধকার, স্যাঁতসেতে, প্রায় অলক্ষ্য একটা ভিজে বাতাস উপর থেকে নেমে আসছে। কাছেই ফরাসী রক্ষীদলের শিবির-আগুন ধিকি-ধিকি জ্বলছে; দূরে রুশদের শিবির-আগুন ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে। আবহাওয়া শান্ত; যার যার ঘাঁটি নিতে অগ্রসরমান ফরাসীসৈন্যদের পোশাকের খস্‌খস্‌ ও পায়ের শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

শিবিরের সামনে হাঁটতে হাঁটতে নেপোলিয়ন আগুনের দিকে তাকাল, কান পেতে সব শব্দ শুনতে লাগল। লোমশ টুপি-পরা যে লম্বা শান্ত্রীটি শিবিরের সামনে পাহারা দিচ্ছিল সম্রাটকে দেখে সে একটা কালো স্তম্ভের মত খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। নেপোলিয়ন তার সামনেই থামল।

শুধাল, "তুমি কোন্ বছর চাকরিতে ঢুকেছ?"

লোকটি জবাব দিল।

"ওহো! তুমি তা হলে পুরনো লোকদের একজন! তোমার রেজিমেণ্ট চাল পেয়েছে কি?"

"পেয়েছে ইয়োর ম্যাজেস্টি।"

নেপোলিয়ন মাথা নেড়ে এগিয়ে গেল।

সাড়ে পাঁচটায় নেপোলিয়ন ঘোড়ায় চেপে শেভার্দিনো গ্রামে গেল।

আলো ফুটেছে। আকাশ পরিষ্কার হচ্ছে। শুধু পূবের আকাশে একখণ্ড মেঘ দেখা যাচ্ছে। সকালের ম্লান আলোয় পরিত্যক্ত শিবির-আগুনগুলো নিভে আসছে।

ডানদিকে কামানের একটিমাত্র গম্ভীর শব্দ প্রতিধ্বনিত হতে হতে চারদিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে মিলিয়ে গেল। কয়েক মিনিট কেটে গেল। কামানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় গর্জনে বাতাস কেঁপে উঠল; তারপরেই ডানদিকে কাছেই গর্জে উঠল চতুর্থ ও পঞ্চমবার।

প্রথম গর্জনের প্রতিধ্বনি থামবার আগেই আরও অনেক কামান গর্জে উঠল; নানা গর্জনের শব্দে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল।

সদলবলে শেভার্দিনো দুর্গে পৌঁছে নেপোলিয়ন ঘোড়া থেকে নামল। খেলা শুরু হয়ে গেছে।

অধ্যায়—৩০

প্রিন্স আন্দ্রুর সঙ্গে দেখা করে গোর্কিতে ফিরে এসে পিয়ের সহিসকে হুকুম করল ঘোড়া তৈরি রাখতে এবং খুব সকালে তাকে ডেকে দিতে। তারপর বেড়ার পিছনে যে কোণটা বরিস তাকে ছেড়ে দিয়েছে সেখানে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে ভালভাবে ঘুম ভাঙবার আগেই অন্য সকলে কুঁড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। ছোট ছোট জানালার কাঁচের পাল্লায় খট্ খট্ শব্দ হচ্ছে, আর সহিস তাকে ঝাঁকুনি দিচ্ছে।

"ইয়োর এক্সেলেন্সি! ইয়োর এক্সেলেন্সি! ইয়োর এক্সেলেন্সি!" পিয়েরের ঘুম ভাঙবার সব আশা ছেড়ে দিয়ে তার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে সহিসটি নাছোড়বান্দার মত তাকে ডাকছে।

জেগে উঠে পিয়ের শুধাল, "কি হল? শুরু হয়ে গেছে? সময় হয়ে গেল?"

বরখাস্ত-সৈনিক সহিসটি বলল, "কামানের গর্জন শুনতে পাচ্ছেন না। ভদ্রলোকরা সকলেই বেরিয়ে গেছেন; প্রশান্ত মহামহিম তো অনেকক্ষণ আগেই ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলেন।"

তাড়াতাড়ি পোশাক পরে পিয়ের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। বাইরে সবকিছুই উজ্জ্বল, তাজা, শিশিরসিক্ত, আনন্দময়। মেঘের আড়াল থেকে সদ্য বেরিয়ে আসা সূর্যের কিরণরাশি ছড়িয়ে পড়েছে রাস্তার ওপারের ছাদের উপর, পথের শিশির-ভেজা ধুলোর উপর, বাড়ির প্রাচীরে, জানালায়, বেড়ায়, এবং সামনে দাঁড়ানো পিয়েরের ঘোড়াগুলোর উপরে। বাইরে কামানের গর্জন আরও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। একজন কসাককে সঙ্গে নিয়ে

জনৈক অ্যাডজুটাণ্ট জোড় কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে গেল।

অ্যাডজুটাণ্ট চেঁচিয়ে বলল, "সময় হয়ে গেছে কাউণ্ট; সময় হয়ে গেছে!"

সহিসকে ঘোড়া নিয়ে পিছনে আসতে বলে পিয়ের পথে নেমে সেই গোল পাহাড়ে গেল যেখান থেকে সে আগেরদিন যুদ্ধক্ষেত্রটাকে দেখেছিল। সেখানে একদল সামরিক লোক জড় হয়েছে, কর্মচারিরা ফরাসীতে বলছে, লাল ফিতে লাগানো সাদা টুপি-পরা কুতুজভের সাদা মাথাটা দেখা যাচ্ছে, তার গলার নীচটা কাঁধের মধ্যে ডুবে গেছে। একটা ছোট দূরবীনের ভিতর দিয়ে সে বড় রাস্তাটার উপর দৃষ্টি রেখেছে।

সিঁড়ি বেয়ে পাহাড়ের উপরে উঠে সামনের দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে তার সৌন্দর্যে পিয়ের মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেল। গোটা অঞ্চল সৈন্যে ঠাসা, কামানের ধোঁয়ার মেঘে আচ্ছন্ন, উজ্জ্বল সূর্যের তির্যক কিরণরাশি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। দৃশ্যাবলীর একেবারে শেষপ্রান্তে অবস্থিত অরণ্যকে মনে হচ্ছে হলুদ-সবুজ মূল্যবান পাথরে খোদাই-করা ছবি; তার আন্দোলিত রেখাটিকে মনে হচ্ছে দিগন্তের প্রেক্ষাপটে একখানি সিলুয়েট; সৈন্যপরিবৃত স্মোলেন্স্ক্ বড় রাস্তাটা ভালুভোর ওপাশে তাকে দ্বিখণ্ডিত করেছে। সম্মুখে, বাঁয়ে, ডাইনে, সর্বত্রই শুধু সৈন্য আর সৈন্য। এসব কিছুই স্পষ্ট, মহনীয়, অপ্রত্যাশিত; কিন্তু পিয়েরের মনকে সবচাইতে বেশী করে আকর্ষণ করল রণক্ষেত্র, বরদিনো, এবং কলোচার দুই তীরবর্তী খাঁড়ির দৃশ্যগুলি।

"পুফ্! —হঠাৎ একটা ঘন গোলাকার ধোঁয়ার মেঘ বেগুনি থেকে ধূসর ও দুধ-সাদা হয়ে দেখা দিল, আর এক সেকেণ্ড পরেই "বুম!" করে একটা গর্জন শোনা গেল।

"পুফ্ পুফ্!" দুটো অনুরূপ মেঘ এসে পরস্পরকে ঠেলা মারল, আর চোখে যা দেখা গেল কানে তারই গর্জন শোনা গেল "বুম্! বুম্!"

পিয়ের প্রথম মেঘটার দিকে তাকাল; একটা ঘন গোল বল যেন; পরমুহূর্তেই তার জায়গায় দেখা দিল ভাসমান ধোঁয়ার বেলুন আর "পুফ্! পুফ্! পুফ্"—প্রথমে তিনটে ও তারপরে চারটে দেখা দিল এবং তাদের প্রত্যেকটা থেকে একই সময়ের ব্যবধানে—"বুম্—বুম্—বুম্!" শব্দে এল তার জবাব। মনে হল, সেই ধোঁয়ার মেঘগুলো কখনও ছুটছে, কখনও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর মাঠ-ঘাট-জঙ্গল আর ঝক্‌ঝকে বেয়নেটগুলো তাদের পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। বাঁদিকে মাঠ ও ঝোপের ভিতর থেকেও ধোঁয়ার বড় বড় বলগুলি অনবরত ছুটে আসছে, আর তাদের পিছন পিছন আসছে গম্ভীর গর্জন; এদিকে আরও কাছে, খাঁড়ি ও জঙ্গল থেকে আসছে গাদা বন্দুকের ছোট ছোট মেঘ; সেগুলি বলের আকার ধরছে না, কিন্তু ছোট ছোট ধ্বনি-প্রতিধ্বনি ঠিকই হচ্ছে। "ট্রাক্-টা-টা-টাট্!" গাদা বন্দুকের অনিয়মিত শব্দ প্রায়ই আসছে, কিন্তু কামান-গর্জনের তুলনায় সেগুলি খুবই দুর্বল।

সেই ধোঁয়া, সেই ঝক্‌ঝকে বেয়নেট, সেই চলাফেরার মধ্যে থাকতে পিয়েরের ভাল লাগছে। নিজের প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে নেবার জন্য সে কুতুজভ ও তার দলবলের দিকে তাকাল। তারাও তার মতই যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে তাকিয়ে আছে; মনে হল, তাদের মনোভাবও তারই অনুরূপ।

"যাও বন্ধু, এগিয়ে যাও·· খৃস্ট তোমার সহায় হোন!" যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চোখ না সরিয়েই কুতুজভ পাশে দাঁড়ানো একজন জেনারেলকে কথাগুলি বলল।

হুকুম শুনে জেনারেলটি পিয়েরের পাশ দিয়ে গোল পাহাড় থেকে নেমে গেল।

সে কোথায় চলেছে এই প্রশ্নের জবাবে জেনারেল কঠিন, ঠাণ্ডা গলায় বলল, "মোহনার দিকে!"

"আমিও সেখানেই যাব," এই কথা ভেবে পিয়ের তার পিছু নিল।

কসাক একটা ঘোড়া এনে দিলে জেনারেল তাতে সওয়ার হল। পিয়ের সহিসের দিকে এগিয়ে গেল; কোন্ ঘোড়াটা সবচাইতে শান্ত জেনে নিয়ে সেটাতে সওয়ার হল, তার ঘাড়ের লোম চেপে ধরে গোড়ালি দুটো ছড়িয়ে ঘোড়ার পেটে চাপ দিতেই সে ছুটতে শুরু করল। পিয়েরের মনে হল তার চশমা বুঝি খুলে পড়বে; কিন্তু তখন আর ঘোড়ার লোম ও হাতের রাশ কোনটাই ছাড়া সম্ভব নয়; জেনারেলের পিছনে সেও জোড় কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। গোল পাহাড়ের উপর থেকে অফিসাররা তাকে দেখে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

অধ্যায়—৩১

যে জেনারেলটিকে পিয়ের অনুসরণ করছিল পাহাড় থেকে নেমে সে হঠাৎ বাঁদিকে ঘুরে গেল; পিয়ের তাকে আর দেখতে পেল না; অগত্যা সে ঘোড়া ছুটিয়ে কিছু পদাতিক সৈন্যের মধ্যে গিয়ে পড়ল। সে চেষ্টা করল তাদের আগে অথবা বাঁয়ে বা ডাইনে দিয়ে চলে যাবে, কিন্তু সব জায়গায়ই সৈন্য আর সৈন্য, আর সকলেই অত্যন্ত ব্যস্ত। সকলেই সেই একই অসন্তুষ্ট, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সাদা টুপি মাথায় এই শক্ত-সমর্থ মানুষটির দিকে তাকাচ্ছে; সকলেই যেন ভয় পাচ্ছে যে এই লোকটি তার ঘোড়ার ক্ষুরের নীচে তাদের মাড়িয়ে চলে যাবে।

একজন চীৎকার করে বলল, "ব্যাটেলিয়নের মাঝখান দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে দিয়েছেন কেন?"

আর একজন তো বন্দুকের কুঁদো দিয়ে তার ঘোড়াকে একটা খোঁচাই দিয়ে বসল; পিয়ের ঘোড়ার পিঠে ঝুঁকে পড়ে সামান্য একটু জায়গা পেয়ে সেই ফাঁক দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল।

সামনেই একটা সেতু; সৈন্যরা সেখান থেকে গুলি চালাচ্ছে। পিয়ের তাদের দিকে এগিয়ে গেল। না জেনেই সে গোর্কি ও বরদিনোর মধ্যবর্তী জায়গায় কলোচা নদীর সেতুর কাছে এসে পড়েছে; বরদিনো দখল করার পরে যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে ফরাসীরা এই সেতুটার উপরেই আক্রমণ চালিয়েছে। পিয়ের দেখল তার সামনেই একটা সেতু, সেতুর দুই পারে এবং মাঠের মধ্যে সৈন্যরা কি যেন করছে; অনবরত গোলাগুলি চলা সত্ত্বেও সে বুঝতেই পারে নি যে এটাই রণক্ষেত্র। হিস্-হিস্ শব্দে অনবরত গুলি ছুটছে, বাঁকা হয়ে গোলা ছুটছে মাথার উপর দিয়ে, কিন্তু তার খেয়ালই নেই; নদীর অপর পারে শত্রুদেরও সে দেখতে পায় নি; আশেপাশে অনেক সৈন্য মাটিতে পড়লেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে নিহত ও আহতদেরও লক্ষ্য করে নি। তার মুখের হাসিটি তখনও লেগেই আছে।

"এই লোকটা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে কেন?" তাকে দেখে কে একজন চেঁচিয়ে বলল।

সৈন্যরা তাকে বলল, "বাঁদিকে যান! ···ডাইনে যান!"

পিয়ের ডানদিকে এগিয়ে গেল, আর অপ্রত্যাশিতভাবে রায়েভ্স্কির একজন পরিচিত অ্যাড্জুটান্টের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। অ্যাড্জুটান্ট ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল, চীৎকার করে কিছু বলতেই যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে চিনতে পেরে মাথাটা নাড়ল।

"আপনি এখানে কেমন করে এলেন?" বলেই সে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

পিয়ের বুঝল এটা তার জায়গা নয়, এখানে তার কিছু করারও নেই, আর পাছে আবার কারও পথ আগলে দেয় এই ভয়ে অ্যাডজুটান্টের পিছনে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

"ওখানে কি হচ্ছে? আমি কি আপনার সঙ্গে যেতে পারি?" সে শুধাল।

"এক মুহূর্ত, এক মুহূর্ত!" বলে অ্যাডজুটান্ট মাঠের ভিতর দাঁড়ানো জনৈক কর্ণেলের কাছে গিয়ে তার হাতে কিছু সংবাদ দিয়ে ফিরে এসে পিয়েরকে বলল, "আপনি এখানে কেন এসেছেন কাউন্ট? এখনও তেমনি কৌতূহলীই আছেন?"

"তা ঠিক," পিয়ের স্বীকার করল।

অ্যাডজুটান্ট ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে এগিয়ে চলল।

"এখানটা তো তবু চলনসই, কিন্তু বাম ব্যূহে ব্যাগ্রেশনের দিকে তারা একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।"

"সত্যি?" পিয়ের বলল। "সেটা কোথায়?"

"আমার সঙ্গে পাহাড়ের উপরে চলুন। সেখান থেকেই সব দেখতে পাব, আর আমাদের কামানশ্রেণীতে অবস্থা এখনও সহ্যের মধ্যেই আছে। যাবেন কি?"

"হ্যাঁ, যাব," বলে সহিসের খোঁজে সে চারদিকে তাকাল।

এতক্ষণে তার নজরে পড়ল আহত সৈন্যরা হয় টলতে টলতে চলেছে, নয় তো তাদের স্ট্রেচারে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কাল যে মাঠের উপর দিয়ে সে ঘোড়া চালিয়ে এসেছে সেখানেও একটি সৈন্য বিসদৃশভাবে চিৎ হয়ে পড়ে আছে।

"ওকে সরিয়ে নিয়ে যায় নি কেন ?" পিয়েরের প্রশ্নটা করতে যাচ্ছিল, কিন্তু অ্যাডজুটাণ্টের মুখের কঠিনভাব দেখে নিজেকে সংযত করল।

সহিসের দেখা না পেয়ে পিয়ের অ্যাডজুটাণ্টের সঙ্গে খাঁড়ির ভিতর দিয়ে রায়েভস্কি দুর্গের দিকে এগিয়ে চলল। তার ঘোড়াটা অনেক পিছিয়ে পড়েছে। সেও ঘোড়ার পিঠে বার বার ঠোক্কর খাচ্ছে।

"মনে হচ্ছে আপনার ঘোড়ায় চড়ার অভ্যাস নেই কাউণ্ট ?" অ্যাডজুটাণ্ট বলল।

পিয়ের বিচলিত গলায় বলল, "ঠিক তা নয়, তবে ঘোড়াটা বড়ই হোঁচট খাচ্ছে।"

"আরে...ঘোড়াটা তো আঘাত পেয়েছে!" অ্যাডজুটাণ্ট বলল। "সামনের পায়ের হাঁটুর উপরে। একটা বুলেট যে তাতে সন্দেহ নেই। গুলির প্রথম অভিষেকের জন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাই কাউণ্ট!"

গোলাগুলির শব্দে কানে তালা লাগবার যোগাড়। তারই ভিতর দিয়ে ষষ্ঠ কোরের ধোঁয়া পেরিয়ে তারা একটা ছোট জঙ্গলে পৌঁছে গেল। সে জায়গাটা শান্ত, ঠাণ্ডা, হেমন্তের আমেজে ভরা। পিয়ের ও অ্যাডজুটাণ্ট ঘোড়া থেকে নেমে পায়ে হেঁটে পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগল।

উপরে উঠে অ্যাডজুটাণ্ট শুধাল, "জেনারেল কি এখানে আছেন ?"

ডানদিকটা দেখিয়ে একজন উত্তর দিল, "একমিনিট আগেও তিনি এখানেই ছিলেন, এইমাত্র ওদিকে গেলেন।"

অ্যাডজুটাণ্ট এমনভাবে পিয়েরের দিকে তাকাল যেন তাকে নিয়ে কি করা যায় সেটা ঠিক বুঝতে পারছে না।

পিয়ের বলল, "আমার জন্য চিন্তা করবেন না। পারলে আমি নিজেই গোল পাহাড়ে উঠে যাব কি ?"

"হ্যাঁ, তাই যান। সেখানে থেকে সবকিছুই দেখতে পাবেন, আর সেখানে বিপদও কম। পরে আপনাকে নিতে আসব।"

পিয়ের কামানশ্রেণীর দিকে চলে গেল, আর অ্যাডজুটাণ্ট ঘোড়া ছেড়ে দিল। তাদের আর দেখা হয় নি; তবে অনেক পরে পিয়ের জানতে পেরেছে যে সেইদিনই তার একটা হাত কাটা গেছে।

যে গোল পাহাড়ে পিয়ের উঠে গেল সেটাই সেই বিখ্যাত পাহাড় যেটাকে পরবর্তীকালে রুশরা বলত "গোল পাহাড় কামানশ্রেণী" অথবা

"রায়েভ্স্কি দুর্গ," আর ফরাসীরা বলত **la grande redoute, la fatale redoute, la redoute du centre**; তাকে ঘিরেই হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে, আর ফরাসীরা তাকেই মনে করে সমস্ত ঘাঁটির চাবিকাঠিস্বরূপ।

এই শিবিরের তিনদিকে পরিখা কাটা হয়েছিল। সেই পরিখার ভিতরে ছিল দশটা কামান, আর মাটির দেয়ালের ভিতরকার ফাঁক দিয়ে সেই কামান থেকে গোলাবর্ষণ করা হচ্ছিল।

গোল পাহাড়ের একই সারিতে দুই দিকে সাজানো অন্য সব কামান থেকেও অনবরত গোলাবর্ষণ করা হচ্ছিল। কামানের পিছনেই দাঁড়িয়ে ছিল পদাতিক বাহিনী। গোলপাহাড় বেয়ে উঠবার সময় পিয়ের ভাবতেই পারে নি যে কয়েকটা পরিখা কেটে যেখান থেকে মাত্র কয়েকটা কামান থেকে গোলাবর্ষণ করা হচ্ছে সেটাই এই যুদ্ধের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান।

বরং যেহেতু সে নিজে সেখানে উপস্থিত হতে পেরেছে ঠিক সেই কারণেই সেই স্থানটিকে তার মনে হয়েছে সবচাইতে কম গুরুত্বপূর্ণ।

পাহাড়ের মাথায় পৌঁছে পিয়ের পরিখার এক প্রান্তে বসে চারদিক দেখতে লাগল; অকারণেই একটা খুশির হাসি ফুটল তার মুখে। কামান থেকে একটার পর একটা গোলাবর্ষণ অনবরত চলেছে; কানে তালা লেগে যাচ্ছে; বারুদের ধোঁয়ায় চারদিক ঢেকে যাচ্ছে।

সাহায্যকারী পদাতিক বাহিনীর মনে বেশ ভয়ের সঞ্চার হলেও একটা পরিখার দ্বারা তাদের থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন যে কয়জন সৈনিক কামান দাগতে অতিমাত্রায় ব্যস্ত তাদের মনে কাজ করছে একটা পারিবারিক প্রীতির উদ্দীপনা।

পিয়েরের সাদা টুপিওয়ালা অসামরিক মূর্তির উপস্থিতিকে প্রথমে তারা ভাল চোখে দেখল না। তার পাশ দিয়ে আসতে-যেতে সৈনিকরা কিছুটা বিস্ময়ে, কিছুটা সভয়ে তার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল। একজন প্রবীণ গোলন্দাজ অফিসার একেবারে শেষপ্রান্তের কামানটির কাজকর্ম দেখবার জন্য পিয়েরের দিকে এগিয়ে এল। তার একটা পা নেই, মুখময় দাগভর্তি। সে কৌতূহলের সঙ্গে পিয়েরের দিকে তাকাল।

একটি গোল-মুখ তরুণ অফিসার সবে ক্যাডেট কলেজ থেকে বেরিয়েছে; এখনও একেবারেই ছেলেমানুষ; দুটি কামান চালাবার ভার পেয়ে সে খুবই গর্বিত।

রুক্ষ স্বরে সে পিয়েরকে বলল, "স্যার, দয়া করে একটু সরে দাঁড়ান। এখানে আপনার থাকা উচিত নয়।"

সৈন্যরাও পিয়েরের দিকে তাকিয়ে আপত্তিসূচকভাবে ঘাড় নাড়তে লাগল। কিন্তু যখন তারা বুঝতে পারল যে সাদাটুপিওয়ালা এই লোকটি

তাদের কোন ক্ষতি করছে না, সলজ্জ হাসিমুখে পরিখার পাশে চুপচাপ বসে আছে, বিনীতভাবে সৈন্যদের পথ ছেড়ে দিচ্ছে, যেন কোন বুলভার্দে হাঁটছে এমনই শান্তভাবে গর্জনমুখর কামানের নীচ দিয়ে হাঁটছে, তখন তাদের সেই বিরূপ মনোভাব ধীরে ধীরে দূর হয়ে তার পরিবর্তে দেখা দিল একধরনের করুণাপরবশ সহানুভূতি যা সৈন্যরা সাধারণতই পোষণ করে তাদের কুকুর, মোরগ, ছাগল ও অন্য সব প্রাণীর প্রতি যারা রেজিমেন্টের সঙ্গেই চলাফেরা করে। সৈন্যরা ক্রমে পিয়েরকে তাদের পরিবারের একজন বলেই মেনে নিল, তাকে একটা ডাক নাম ("আমাদের ভদ্রলোক") দিল, এবং তাকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা-তামাসাও করতে লাগল।

পিয়েরের হাত দুই দূরে একটা গোলা ফাটল ; তার ফলে তার পোশাকে যে ধুলো-মাটি লাগল সেটা ঝাড়তে ঝাড়তে সে চারদিকে তাকাল।

লালমুখ, চওড়া-কাঁধ একটি সৈনিক পিয়েরকে জিজ্ঞাসা করল, "সে কি স্যার, এতেও আপনি ভয় পেলেন না ?" সৈনিকটি একটু হাসল ; দুই পাটি সাদা দাঁত বেরিয়ে পড়ল।

"তাহলে কি আপনি ভয় পেয়েছেন ?" পিয়ের শুধাল।

"তাছাড়া আর কি আশা করতে পারেন ?" সৈনিকটি জবাব দিল। "জানেন তো তিনি বড়ই নিষ্ঠুরা ! তিনি যখন সরবে ধেয়ে আসেন তখন আপনার সব জাড়িজুড়ি উবে যায় ! ভয় না পেয়ে উপায় আছে !" সৈনিকটি হাসতে লাগল।

কয়েকটি সৈনিক পিয়েরের পাশে এসে দাঁড়াল। একজন বলল, "এটা আমাদের মত সৈনিকদের ব্যাপার। কিন্তু একজন ভদ্রলোকের পক্ষে এ আচরণ খুব আশ্চর্য ! একজন ভদ্রলোক বটে !"

সেই সৈনিকদের উদ্দেশ করে তরুণ অফিসারটি বলল, "প্রত্যেকে যার যার জায়গায় !"

গোটা যুদ্ধক্ষেত্র জুড়ে কামানের গর্জন ও বন্দুকের শব্দ ক্রমেই তীব্রতর হচ্ছে ; বিশেষ করে যেখানে ব্যাগ্রেশনের সেনাদল অবস্থিত ; আর পিয়ের যেখানে আছে সে জায়গাটা ধোঁয়ায় এমন ঢেকে গেছে যে কোন কিছুই ভাল করে দেখাই যাচ্ছে না।

দশটা নাগাদ প্রায় বিশ জনকে কামানশ্রেণীর কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ; দুটো কামান ধ্বংস হয়েছে, আর কামানের গোলা আরও বেশী সংখ্যায় এসে পড়ছে, হুশ্-হুশ্ শব্দে চারদিকে বুলেট উড়ছে। কিন্তু কামানশ্রেণীর সৈনিকদের সেদিকে কোন খেয়ালই নেই ; চারদিকে শোনা যাচ্ছে হাসিখুশি ও ঠাট্টা-তামাসার শব্দ।

একটা গোলা শাঁ শাঁ করে এগিয়ে এলে একটি সৈনিক চেঁচিয়ে বলল, "একেবারে তাজা !"

গোলাটা পাশ কাটিয়ে সহায়ক পদাতিকদের মধ্যে পড়ায় আর একজন বলে উঠল, "এদিকে আসে নি! পদাতিক বাহিনীর দিকে গেছে!"

একটা গোলা উপর দিয়ে উড়ে যেতে দেখে একটি চাষী মাথাটা নীচু করায় তাকে ঠাট্টা করে একজন বলে উঠল, "তুমি কি বন্ধুকে অভিবাদন করছ নাকি হে?"

সামনে কি ঘটছে দেখবার জন্য কয়েকজন সৈন্য এসে পরিখার প্রাচীরের পাশে দাঁড়াল।

তারা বলল, "ওরা অগ্রবর্তী দলটাকে সরিয়ে নিয়েছে।"

বুড়ো সার্জেন্টটি চেঁচিয়ে বলল, "নিজেদের কাজে মন দাও গে। তারা যদি সরে গিয়ে থাকে তো বুঝতে হবে পিছনের দিকে তাদের অনেক কাজ রয়েছে।"

সার্জেন্ট একটি সৈনিকের ঘাড় ধরে হাঁটু দিয়ে একটা গুঁতো মারল। অন্য সকলে হো-হো করে হেসে উঠল।

একদিক থেকে চীৎকার শোনা গেল, "পাঁচ নম্বর কামানে যাও। চাকা ঘোরাও।"

"এবার সকলে একসঙ্গে, মাঝিদের মত!" যারা কামানটাকে নাড়াচ্ছিল তাদের উৎফুল্ল কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

লাল-মুখ রসিক লোকটি পিয়েরকে দেখিয়ে দাঁত বের করে বলল, "আমাদের ভদ্রলোকের টুপিটা প্রায় উড়িয়ে দিয়েছিল!" গোলাটা কামানের চাকা ও একটি সৈনিকের পায়ের উপর পড়ায় সে বলে উঠল, "যতসব বাচাল মেয়ে মানুষ!"

আহতদের সরিয়ে নেবার জন্য জনকয়েক অসামরিক লোক মাথা নীচু করে কামানশ্রেণীর মধ্যে ঢুকে পড়ায় তাদের দেখিয়ে হাসতে হাসতে আর একজন বলল, "আরে, এই তো শেয়াল মশাইরা এসে পড়েছে!"

একটি সৈনিকের একটা পা উড়ে গেছে। অসামরিক লোকগুলি তার সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করায় আর একজন হেসে বলল, "আচ্ছা, এখানা তাহলে তোমাদের পছন্দ হচ্ছে না? আঃ, যতসব কাকের দল! তোমরা ভয় পেয়েছ!"

চাষীদের অনুকরণ করে বলল, "এই যে বাছারা⋯ওঃ, ওঃ! এসব ওদের মোটেই পছন্দ নয়।"

পিয়ের লক্ষ্য করল যতবার শিবিরের উপর গোলা এসে পড়ছে, যতবার কেউ হতাহত হচ্ছে, ততই যেন এদের উদ্দীপনা বেড়ে যাচ্ছে।

বজ্রগর্ভ মেঘ যত এগিয়ে আসে তার ভিতরকার আগুনের শিখা যেমন ততই স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়, ঠিক তেমনি এই সব মানুষের অন্তরে লুকানো আগুনের শিখা ক্রমাগত তীব্রতর হয়ে তাদের চোখে-মুখে জ্বল্ জ্বল্ করছে।

পিয়ের এখন আর যুদ্ধক্ষেত্র দেখছে না, সেখানে কি ঘটছে তাতে তার কোন আগ্রহ নেই ; যে আগুন ক্রমেই উজ্জ্বলতর হয়ে জ্বলছে, নিজের আত্মার মধ্যে যার প্রতিফলন সে উপলব্ধি করছে, সমস্ত মন দিয়ে এখন সে তাকেই শুধু দেখছে।

যে পদাতিক সেনাদল কামানশ্রেণীর সম্মুখস্থ ঝোপের মধ্যে কামেংকা ঝর্ণার তীর বরাবর আস্তানা পেতেছিল তারা পশ্চাৎপসরণ করল। পাহাড়ের উপর থেকেই দেখা গেল আহতদের বয়ে নিয়ে তারা দৌড়ে পিছিয়ে যাচ্ছে। একজন জেনারেল সদলবলে কামানশ্রেণীর কাছে এসে কর্ণেলের সঙ্গে কিছু কথা বলে পিয়েরের দিকে ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তাকাল ; গোলাগুলির হাত থেকে কিছুটা রেহাই পাবার জন্য কামানশ্রেণীর পিছন দিককার সাহায্যকারী পদাতিক সৈন্যদের শুয়ে পড়বার হুকুম দিয়ে সেখান থেকে চলে গেল। তার-পরেই কামানশ্রেণীর ডান দিককার পদাতিক সেনাদলের মধ্য থেকে ঢাকের বাজনা ও হুকুমের চীৎকার শোনা গেল ; তারা সামনের দিকে এগিয়ে চলল।

পিয়ের পরিখার দেয়ালের উপর দিয়ে তাকাল ; একটি বিবর্ণ তরুণ অফিসার তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল ; তরবারিটা ঝুলিয়ে পিছনে হাঁটতে হাঁটতে সে অস্বস্তির সঙ্গে চারদিকে তাকাচ্ছে।

পদাতিক সেনাদল ধোঁয়ার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল, কিন্তু তাদের দীর্ঘায়ত চীৎকার ও বন্দুকের শব্দ তখনও শোনা যাচ্ছে। কয়েক মিনিট পরেই আহত সৈনিক ও স্ট্রেচারবাহকরা দলে দলে সেইদিক থেকে আসতে লাগল। কামানের গোলা অর্ধচক্রাকারে ছুটে এসে আরও ঘন ঘন পড়তে লাগল। কয়েকটি সৈনিক এখানে-ওখানে পড়ে আছে ; তাদের এখনও সরানো হয় নি। কামানকে ঘিরে লোকজন দ্রুততর গতিতে ছুটাছুটি করছে। এখন আর কেউ পিয়েরকে দেখছে না। দু' একবার পথের সামনে পড়ায় তাকে ধমক দেওয়া হয়েছে। উর্ধ্বতন অফিসারটি ভ্রূকুটিকুটিল মুখে বড় বড় পা ফেলে একটা কামান থেকে আরেকটা কামানের দিকে ছুটে যাচ্ছে। তরুণ অফিসারটি আগের মতই মুখ লাল করে হুকুম জারি করে চলেছে। সৈন্যরা কামানে বারুদ ভরছে আর সচেষ্ট ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তাদের কাজ করে যাচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে তারা এমনভাবে ছোট ছোট লাফ দিচ্ছে যেন তাদের পায়ের নীচে স্প্রিং লাগানো আছে।

মাথার উপরে ঝড়ো মেঘ দেখা দিল। সকলের মুখে পিয়ের যে অগ্নিশিখা জ্বলতে দেখেছিল সেটা উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল। তরুণ অফিসারটি টুপিতে হাত রেখে উপরওয়ালার দিকে ছুটে গেল।

"স্যার, আমি জানাতে এসেছি যে আর মাত্র আট রাউণ্ড গুলি আছে। আমরা কি গুলি চালিয়েই যাব?" সে শুধাল।

পরিখার দেয়ালের উপর দিয়ে তাকিয়ে উর্ধ্বতন অফিসারটি চীৎকার

করে বলল, "ছর্‌রা গুলি!"

হঠাৎ কি যেন ঘটল; তরুণ অফিসারটি একবার ঢোক গিলেই ডানায় গুলি-খাওয়া পাখির মত উপুড় হয়ে বসে পড়ল। পিয়েরের চোখে সবকিছুই কেমন যেন বিস্ময়কর, গোলমেলে ও কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে উঠল।

একটার পর একটা কামানের গোলা হিস্‌-হিস্‌ শব্দে ছুটে আসছে, আর মাটি, সৈন্য, অথবা কামানের উপরে আছড়ে পড়ছে। পিয়ের আগে কখনও এরকম শব্দ শোনে নি, আর এখন এই শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাচ্ছেন না।

সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে একটা গোলা ঠিক সেখানে পড়ায় কিছুটা মাটি ধ্বসে পড়ল; একটা কালো গোলা তার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে কোন কিছুর উপর আছড়ে পড়ল। কিছু অসামরিক লোক কামানশ্রেণীর দিকে যাচ্ছিল, তারা ছুটে পালাল।

অফিসারটি চীৎকার করে বলল, "সকলেই ছর্‌-রা চালাও!"

একজন সার্জেণ্ট আফসারের কাছে ছুটে এসে ভয়ার্ত গলায় ফিস্‌ফিস্‌ করে জানাল যে গুলি ফুরিয়ে গেছে।

"বদমায়েশের দল! তারা সব কী করছে!" পিয়েরের দিকে ঘুরে অফিসারটি চেঁচিয়ে উঠল।

অফিসারটির মুখ রক্তবর্ণ, ঘর্মাক্ত; কুটিল ভুরুর নীচে চোখ দুটো জ্বলছে।

পিয়েরের উপর থেকে চোখ সরিয়ে সে সৈনিকদের হুকুম দিল, "রিজার্ভ বাহিনীতে চলে যাও, সেখান থেকে গুলি-গোলার বাক্সগুলো নিয়ে এস!"

"আমি যাব," পিয়ের বলল।

তার কথার জবাব না দিয়ে অফিসার বিপরীত দিকে এগিয়ে গেল।

চেঁচিয়ে বলল, "গুলি চালিও না···অপেক্ষা কর!"

যে লোকটি গোলাগুলি আনতে যাচ্ছিল পিয়েরের সঙ্গে তার ধাক্কা লাগল।

"আঃ, স্যার, এটা আপনার জায়গা নয়," বলেই সে ছুটে নেমে গেল।

তরুণ অফিসারটি যেখানে বসেছিল তাকে এড়িয়ে পিয়ের সৈনিকটির পিছনে ছুটে গেল।

একটার পর একটা কামানের গোলা তার সামনে, পিছনে, দুই পাশে পড়তে লাগল। সবুজ রংয়ের গোলা-বারুদের গাড়ির সামনে পৌঁছে হঠাৎ সে নিজেকেই জিজ্ঞাসা করল, "আমি কোথায় চলেছি?" ফিরে যাবে না এগিয়ে যাবে বুঝতে না পেরে সে থেমে গেল। হঠাৎ একটা প্রচণ্ড আঘাত তাকে মাটিতে ফেলে দিল। ঠিক সেইমুহূর্তে একটা আগুনের ঝিলিক তার চোখ ঝলসে দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে কানে তালা-লাগানো একটা গর্জনে তার কান দুটো ঝন্‌ ঝন্‌ করে উঠল।

যখন সম্বিত ফিরে এল তখন দুই হাতে ভর দিয়ে সে মাটিতে বসে আছে;

গোলা-বারুদের গাড়িটা সেখানে নেই; পোড়া ঘাসের উপর ইতস্তত ছড়িয়ে আছে সবুজ পোড়া কাঠ ও ছেঁড়া কাপড়ের স্তূপ। একটা ঘোড়া গাড়ির জোয়ালের ভাঙা টুকরো নিয়েই তার পাশ দিয়ে ছুটে চলে গেল, আর অন্য ঘোড়াটা পিয়েরের মতই মাটিতে পড়ে হৃদয়বিদারক স্বরে একটানা চীৎকার করে চলেছে।

অধ্যায়—৩২

আতংকে দিশেহারা হয়ে লাফিয়ে উঠে পিয়ের ছুটতে ছুটতে কামানশ্রেণীর কাছেই ফিরে গেল; চারদিকের ভয়াবহতার মধ্যে সেটাই যেন একমাত্র আশ্রয়স্থল।

মাটির দেয়ালের আড়ালে ঢুকে দেখল, সেখানে লোকজনরা কি যেন করছে, কিন্তু কামান থেকে গোলা ছোঁড়া হচ্ছে না। এই লোকগুলি কারা সেটা বুঝবার মত সময়ও তার ছিল না। সে দেখল, প্রবীণ অফিসারটি উপুড় হয়ে শুয়ে আছে; যেন নীচের কোন কিছু পরীক্ষা করছে; একটি সৈনিক "ভাইসাব!" বলে চীৎকার করতে করতে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে এবং যারা তার হাত চেপে ধরেছে তাদের কাছ থেকে মুক্তি পেতে চেষ্টা করছে। তাছাড়া আরও এমন কিছু সে দেখল যা সত্যি অদ্ভুত।

কিন্তু এটা বুঝবার সময় তার ছিল না যে কর্ণেলটি যুদ্ধে মারা গেছে, যে সৈনিকটি "ভাই" বলে চেঁচাচ্ছে সে বন্দী হয়েছে, এবং আর একটি সৈনিককে তার চোখের সামনেই বেয়নেটে গেঁথে ফেলা হয়েছে; কারণ সে দুর্গে ঢুকবার আগেই একটি ফ্যাকাসে-মুখ, ঘর্মাক্তদেহ, গুট্‌কো লোক নীল ইউনিফর্ম পরে কি যেন বলতে বলতে তলোয়ার হাতে নিয়ে ছুটে এল। পরস্পরকে দেখবার আগেই তারা দুজনই পূর্ণ গতিতে পাশাপাশি ছুটছিল; সেই সুযোগে পিয়ের হাত বাড়িয়ে সেই লোকটির (একজন ফরাসী অফিসার) কাঁধটা চেপে ধরল এবং অন্য হাতে চেপে ধরল তার গলা। অফিসারও তলোয়ার ফেলে দিয়ে পিয়েরের কলার চেপে ধরল।

কয়েক সেকেণ্ড তারা দুজনই ভয়ার্ত দৃষ্টিতে পরস্পরের অপরিচিত মুখের দিকে তাকিয়ে রইল; তারা কি করেছে এবং পরে কি করবে তা ভেবে দুজনই বিচলিত বোধ করল। দুজনই ভাবতে লাগল: "আমিই কি বন্দী হয়েছি, না কি তাকে বন্দী করেছি?" কিন্তু ভয়ের তাড়নায় পিয়ের ফরাসী অফিসারের গলাটা ক্রমেই এত বেশী শক্ত করে চাপতে লাগল যে তার মনে হতে লাগল যে সেই বন্দী হয়েছে। ফরাসীটি কি যেন বলতে যাচ্ছিল এমন সময় একটা কামানের গোলা তাদের মাথার একেবারে উপর দিয়ে এমন ভয়ংকরভাবে হিস্‌-হিস্‌ শব্দ করে ছুটে গেল আর ফরাসী অফিসারটিও এত তাড়াতাড়ি মাথাটা নামিয়ে নিল যে পিয়েরের মনে হল বুঝি তার মাথাটাই উড়ে

চলে গেল।

পিয়েরও মাথাটা নীচু করে হাত দুটো নামিয়ে নিল। কে কাকে বন্দী করেছে তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে ফরাসীটি সোজা কামানশ্রেণীর দিকে ছুটে গেল, আর পিয়ের নিহত ও আহত সৈনিকদের ডিঙিয়ে উৎরাই বেয়ে ছুটে নেমে গেল; প্রতি পদক্ষেপে তার মনে হল নিহত ও আহতরা যেন তার পা টেনে ধরছে। কিন্তু গোল পাহাড়ের নীচে পৌছবার আগেই রুশ সৈন্যদের একটা বড় দলের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল; খুশিতে চীৎকার করতে করতে বেপরোয়াভাবে হোঁচট খেতে খেতে তারা পাহাড় বেয়ে উঠছে। (রুশ সেনাদলের এই আক্রমণের পূর্ণ কৃতিত্ব দাবী করেছে এর্মোলভ। তার সাহস ও সৌভাগ্যের বলেই একাজ সম্ভব হয়েছে; শোনা যায়, এই আক্রমণের সময় সে নাকি পকেট থেকে বের করে বেশ কয়েকটা সেণ্ট জর্জের ক্রুশ কামান-শ্রেণীর মধ্যে ছুঁড়ে দিয়েছিল, যাতে যে সেখানে আগে পৌছবে সেই সেটা কুড়িয়ে নিতে পারে।)

যে ফরাসীরা কামানশ্রেণী দখল করেছিল তারা পালিয়ে গেল, আর আমাদের সৈন্যরা "হুর্‌-রা" বলে চেঁচাতে চেঁচাতে এতদূর পর্যন্ত তাদের তাড়া করে গেল যে তাদের ডেকে ফেরানো গেল না।

বন্দীদের নীচে নামিয়ে আনা হল; তাদের মধ্যে একজন আহত ফরাসী জেনারেলও আছে; অফিসাররা তাকে ঘিরে ধরল। দলে দলে পিয়েরের পরিচিত ও অপরিচিত রুশ ও ফরাসী আহত সৈনিক বা যন্ত্রণায় বিকৃত মুখে কেউ বা হেঁটে, কেউ বা হামাগুড়ি দিয়ে কামানশ্রেণীর কাছ থেকে নামতে লাগল; অনেককে স্ট্রেচারে করে বয়ে আনা হল। পিয়ের আবার গোল-পাহাড়ের মাথায় উঠে গেল; এক পরিবারের মত যাদের সঙ্গে সে এক ঘণ্টার উপর কাটিয়েছে তাদের একজনকেও সেখানে দেখতে পেল না। যারা মরে পড়ে আছে তাদের সে চেনে না, আবার কয়েকজনকে চিনতেও পারল। তরুণ অফিসারটি রক্তের পুকুরের মধ্যে সেই একইভাবে দেয়ালের এক-প্রান্তে উপুড় হয়ে বসে আছে। লাল-মুখ লোকটি তেমনি খাবি খাচ্ছে, কিন্তু কেউ তাকে বয়ে নিয়ে গেল না।

পিয়ের আবার উৎরাই বেয়ে ছুটে নেমে গেল।

রণক্ষেত্র থেকে আগত একদল স্ট্রেচার-বাহকের দিকে উদ্দেশ্যহীনভাবে এগিয়ে যেতে যেতে সে ভাবল, "এবার ওরা এসব থামাবে, এবার ওরা বুঝবে কি ভয়ংকর কাজ করেছে!"

ধোঁয়ার আবরণের পিছনে সূর্য তখনও মাথার উপরে; কামানের গর্জন ও বন্দুকের শব্দ তখনও থামে নি, বরং ক্লান্ত মানুষ যেমন অবশিষ্ট সব শক্তি নিয়ে একবার আর্তনাদ করে ওঠে ঠিক তেমনি গোলাগুলি যেন বেপরোয়াভাবে আরও বেড়ে গেছে।

একদিকে বরদিনো আর অন্যদিকে ব্যাগ্রেশনের সৈন্য-সীমান্ত—তার মধ্যবর্তী সাত হাজার ফুট জায়গাতেই বরদিনো যুদ্ধের মূল কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ ছিল। তার বাইরে একদিকে উভারভ-এর অশ্বারোহী বাহিনীসহ রুশরা কুচকাওয়াজ করেছিল দুপুরবেলা, আর অন্যদিকে উত্তিৎসার ওপারে পনিয়াতোস্কির একটা সংঘর্ষ হয়েছিল তুচ্‌কভের সঙ্গে; কিন্তু যুদ্ধের মূল কেন্দ্রে যা ঘটেছে তার তুলনায় এসব খুবই বিক্ষিপ্ত ও দুর্বল ঘটনা। দিনের আসল যুদ্ধটা জঙ্গলের পাশের যে খোলা জায়গাটাতে হয়েছে সেটা দুদিক থেকেই বেশ ভালভাবে দেখা যায়, আর যুদ্ধটাও হয়েছে অত্যন্ত সরল ও কৌশলবিহীনভাবে।

দু'পক্ষ থেকে কয়েকশ' কামানের গোলাবর্ষণ দিয়ে যুদ্ধটা শুরু হয়েছিল।

তারপর যুদ্ধক্ষেত্রটা যখন ধোঁয়ায় ঢেকে গেল তখন ডাইনের ফরাসীদের পক্ষ থেকে এগিয়ে এল কাম্পাঁ ও দেসিয়াস্ক-এর সেনাদল, আর বাঁদিক থেকে এগিয়ে এল মুরাৎ-এর সেনাদল।

নেপোলিয়ন দাঁড়িয়েছিল শেভার্দিনো দুর্গে; সেখান থেকে ব্যাগ্রেশনের ঘাঁটির দূরত্ব এক ভার্স্ট, আর বরদিনোর দূরত্ব দুই ভার্স্ট; কাজেই সেখানে যে কি ঘটছে নেপোলিয়ন তা দেখতেই পায় নি, বিশেষত ধোঁয়া আর কুয়াশা মিলে সমস্ত অঞ্চলটাকেই ঢেকে ফেলেছিল। এই ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে কালো কালো কি যেন দেখা যাচ্ছিল,—হয় তো তারা সৈনিক,—মাঝে মাঝে বেয়নেটের ঝিলিকও চোখে পড়ছিল; কিন্তু তারা এগিয়ে চলেছে না স্থির হয়ে আছে, তারা ফরাসী না রুশ, শেভার্দিনো দুর্গ থেকে সেসব কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না।

উজ্জ্বল রোদ ছড়িয়ে সূর্য উঠেছে; চোখের উপর হাত রেখে নেপোলিয়ন ঘাঁটির দিকে তাকিয়েছিল; সূর্যের বাঁকা রশ্মি সোজা এসে পড়ল তার মুখে। সম্মুখে ধোঁয়ার আবরণ ছড়িয়ে পড়ছে; কখনও মনে হচ্ছে ধোঁয়াই এগিয়ে চলেছে, আবার কখনও মনে হচ্ছে সৈন্যরা এগিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে চীৎকার শোনা যাচ্ছে, কিন্তু সেখানে কি যে হচ্ছে তা বলা অসম্ভব।

পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে নেপোলিয়ন একটা ছোট দূরবীনে চোখ রাখল; তার বৃত্তের ভিতর দিয়ে চোখে পড়ল ধোঁয়া আর সৈন্য, কিছু তার নিজের, কিছু রুশদের; কিন্তু পুনরায় যখন খালি চোখে তাকাল তখন আর বুঝতেই পারল না সে যা কিছু দেখছিল তা এখন কোথায়।

পাহাড় থেকে নেমে সেখানেই পায়চারি করতে লাগল।

মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ছে, গোলাগুলির শব্দ শুনছে, আবার একদৃষ্টিতে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে তাকাচ্ছে

যে সমস্ত অ্যাডজুটাণ্টদের সে পাঠিয়েছে তারা এবং তার মার্শালদের আর্দালিরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনবরত ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে আর নেপোলিয়নকে

যুদ্ধের সর্বশেষ বিবরণ দিচ্ছে; কিন্তু সেসব বিবরণই মিথ্যা, কারণ সেই প্রচণ্ড যুদ্ধের মধ্যে কখন কি ঘটছে সেইমুহূর্তে সেটা বলা অসম্ভব; অ্যাডজুটাণ্ট-দের অনেকেই যুদ্ধক্ষেত্রে না গিয়ে অন্যের কাছে যা শুনেছে তাই এসে বলছে; তাছাড়া, একজন অ্যাডজুটাণ্ট যতক্ষণে দুই ভার্স্ট' পথ ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে ততক্ষণে অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে যাচ্ছে এবং যে সংবাদ সে বয়ে আনছে সেটা মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে। সেইভাবে একজন অ্যাডজুটাণ্ট মুরাত-এর কাছ থেকে খবর নিয়ে এল যে বরদিনো দখল করা হয়েছে, আর কলোচা নদীর সেতু ফরাসীদের হাতে এসে পড়েছে। অ্যাডজুটাণ্ট নেপোলিয়নকে জিজ্ঞাসা করল, সৈন্যরা নদী পার হবে কি? নেপোলিয়ন হুকুম দিল, সৈন্যরা শেষ-প্রান্তে সমবেত হয়ে অপেক্ষা করুক। কিন্তু সে হুকুম দেবার আগেই—আসলে অ্যাডজুটাণ্টটি বরদিনো ত্যাগ করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই—রুশরা সেতুটা পুনরায় দখল করে পুড়িয়ে দিয়েছে।

একজন অ্যাড্‌জুটাণ্ট ঘোড়া ছুটিয়ে এসে বিবর্ণ, ভয়ার্ত মুখে জানাল যে তাদের আক্রমণ প্রতিহত হয়েছে, কাম্পাঁ আহত হয়েছে, আর দাভুৎ নিহত হয়েছে; অথচ অ্যাড্‌জুটাণ্টকে যখন এইসব খবর বলা হয়েছিল ঠিক তখনই ফরাসীরা অপর পক্ষের ঘাঁটি আবার দখল করেছে, আর দাভুৎ বেঁচে আছে, তার শরীর সামান্য ছড়ে গেছে মাত্র। এইসব অনির্ভরযোগ্য বিবরণের ভিত্তিতেই নেপোলিয়ন হুকুম জারি করছিল, আর তার ফলে যা হয় হুকুম পাবার আগেই সেকাজটা করা হয়ে গেছে, আর না হয় তো সে হুকুম তামিল করাই সম্ভব হয় নি।

যেসব মার্শাল বা জেনারেলরা যুদ্ধক্ষেত্রের আরও কাছাকাছি ছিল তারাও নেপোলিয়নের মতই নিজেরা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে নি, শুধু মাঝে মধ্যে বন্দুকের আওতার মধ্যে গেছে; তারাও নেপোলিয়নকে জিজ্ঞাসা না করেই কোথায় ও কোনদিকে আক্রমণ চালানো হবে, কোথায় অশ্বারোহী বাহিনী ঘোড়া ছুটিয়ে যাবে, আর কোথায় ছুটে যাবে পদাতিক বাহিনী সে সম্পর্কে হুকুম জারি করেছে। কিন্তু নেপোলিয়নের মতই তাদের হুকুমও কদাচিৎ কার্যকর করা হয়েছে, আর যদি হয়ে থাকে তাও আংশিকভাবে হয়েছে। অধিকাংশক্ষেত্রে হুকুমের বিপরীত ঘটনাই ঘটেছে। যে সৈন্যদের এগিয়ে যেতে বলা হয়েছে ছর্‌রা গুলির মুখে পড়ে তারা পিছু হটেছে; যে সৈন্যদের স্বস্থানে থাকতে বলা হয়েছে তারা অপ্রত্যাশিতভাবে রুশদের সামনে দেখে হঠাৎ হয় ছুটে পিছিয়ে গেছে, নয় তো এগিয়ে গেছে সামনে, আর অশ্বারোহী বাহিনী বিনা হুকুমেই পলায়মান রুশদের পশ্চাদ্ধাবন করেছে। কামানগুলো কখন, কোথায় সরিয়ে নেওয়া হবে, গুলি করবার জন্য কখন পদাতিক বাহিনীকে পাঠানো হবে, আর কখনই বা অশ্বা-রোহীদের পাঠানো হবে রুশ পদাতিক সৈন্যদের পিছু ধাওয়া করতে—এ-

ধরনের সব হুকুমই অফিসাররা যুদ্ধক্ষেত্রের কাছাকাছি থেকে ঘোষণা করেছে—নে, অথবা দাভুৎ, অথবা মুরাতকে জিজ্ঞাসা না করেই—নেপোলিয়নকে জিজ্ঞাসা করার তো কথাই ওঠে না। হুকুম পালন না করার জন্য অথবা নিজেদের ইচ্ছামত কাজ করার জন্য যে বিপদ হতে পারে তাকে তারা মোটেই ভয় করে নি, কারণ যুদ্ধে ঝুঁকি নিতে হয় সবচাইতে প্রিয় বস্তুটির—সেটা নিজের জীবন; কখনও মনে হয় পিছিয়ে যাওয়াই নিরাপদ, আর কখনও মনে হয় এগিয়ে যাওয়াই নিরাপদ; তাই যুদ্ধক্ষেত্রের একেবারে বুকের উপর যারা কর্মরত তারা সেই মুহূর্তের মর্জিমতই কাজ করেছে। অবশ্য বাস্তবক্ষেত্রে এই এগিয়ে যাওয়া অথবা পিছিয়ে যাওয়ার ফলে সেনাবাহিনীর অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন বা উন্নতি ঘটে নি। একের অপরের দিকে ছুটে যাওয়া অথবা ঘোড়া ছুটিয়ে দেওয়ার ফলে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নি; পঙ্গু হওয়া অথবা মৃত্যু ঘটার যে ক্ষতি সেটা ঘটেছে ছুটে-আসা কামানের গোলা আর বন্দুকের গুলিতে। উড়ন্ত গোলা-গুলি যেখানে ছুটছে, যেমুহূর্তে সৈন্যরা সেখান থেকে পালিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে ঊর্ধ্বতন অফিসাররা পিছন থেকে এসে তাদের নতুন করে গড়ে তুলেছে, তাদের মধ্যে শৃংখলা ফিরিয়ে এনেছে, এবং পুনরায় তাদের ফিরিয়ে নিয়ে গেছে যুদ্ধের আগুনের মধ্যে; মৃত্যু-ভয়ের তাড়নায় আবার তারা শৃংখলা ভেঙেছে এবং ভিড়ের প্রেরণায় যে যেদিকে পেরেছে ছুটে গেছে।

অধ্যায়—৩৪

দাভুৎ, নে ও মুরাত—নেপোলিয়নের এই তিন সেনাপতি ছিল যুদ্ধক্ষেত্রের খুব কাছে, অনেকসময় তারা যুদ্ধের মধ্যেও ঢুকেছে; বারবার তারা বড় রকমের সুশৃংখল ও সুগঠিত সেনাদলকে যুদ্ধরত সৈন্যদের সাহায্যার্থে পাঠিয়েছে। কিন্তু আগেকার যুদ্ধগুলিতে যেরকমটা ঘটেছিল এবার ঘটেছে তার বিপরীত ঘটনা; প্রত্যাশামত শত্রুপক্ষের পলায়নের পরিবর্তে এবার সেই সব সুগঠিত সেনাদলই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এসেছে বিশৃংখল, আতংকিত জনতার রূপ নিয়ে। সেনাপতিরা নতুন করে তাদের সংবদ্ধ করেছে, কিন্তু তাদের সংখ্যা ক্রমাগতই হ্রাস পেয়েছে। দিনের মাঝামাঝি সময়ে মুরাত তার অ্যাডজুটান্টকে পাঠাল নেপোলিয়নের কাছে, চেয়ে পাঠাল নতুন সৈন্য-শক্তি।

গোলপাহাড়ের নীচে বসে নেপোলিয়ন পঞ্চ-পানীয়ে চুমুক দিচ্ছে। তখনই মুরাত-এর অ্যাডজুটান্ট ঘোড়া ছুটিয়ে এসে নেপোলিয়নকে আশ্বাস দিল যে হিজ ম্যাজেস্টি যদি তাকে আর এক ডিভিশন সৈন্য পাঠায় তাহলে রুশ বাহিনীকে হটিয়ে দিতে পারবে।

"নতুন সৈন্য ?" রুক্ষ বিস্ময়ে নেপোলিয়ন বলল। অ্যাডজুটান্ট সুদর্শন

তরুণ; মুরাতের মতই লম্বা কোঁকড়া চুল। যেন তার কথাগুলি বুঝতেই পারে নি এমনিভাবে নেপোলিয়ন তার দিকে তাকাল।

সে নিজের মনেই ভাবল, "নতুন সৈন্য! অর্ধেক বাহিনীকে তো ইতি-মধ্যেই একটি দুর্বল, পরিখাবিহীন রুশ সেনাদলের বিরুদ্ধে পাঠানো হয়েছে, তাহলে তাদের নতুন সৈন্য লাগবে কেন?"

কঠোর কণ্ঠে বলল, "নেপলসের রাজাকে গিয়ে বল এখনও দুপুর হয় নি, আর আমার দাবার ছকটাকেও এখনও পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি না। চলে যাও!…"

লম্বা-চুল, সুদর্শন, বালক—অ্যাড্‌জুটাণ্টটি টুপি থেকে হাত না সরিয়েই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল; তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে নরমেধ যজ্ঞাগারে ফিরে গেল।

নেপোলিয়ন উঠে দাঁড়াল। কলাইকুঁর্ত ও বের্থিয়েরকে ডেকে এমন সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করল যার সঙ্গে যুদ্ধের কোন সম্পর্ক নেই।

আলোচনাটা নেপোলিয়ন বেশ উপভোগ করছে; কিন্তু তার মাঝখানেই বের্থিয়েরের চোখে পড়ল, ঘর্মাক্ত ঘোড়ায় চেপে একটি সেনাপতি পাহাড়ের দিকেই এগিয়ে আসছে। লোকটি বেলিয়ার্দ। ঘোড়া থেকে নেমে সে দ্রুত পদক্ষেপে সম্রাটের দিকে এগিয়ে গেল এবং জোর গলায় আর একদল সৈন্য পাঠাবার স্বপক্ষে যুক্তি দেখাতে লাগল। প্রতিশ্রুতি দিল, সম্রাট যদি আর এক ডিভিসন সৈন্য পাঠায় তাহলে রুশদের একেবারে শেষ করে দিতে পারবে।

নেপোলিয়ন কাঁধে ঝাঁকুনি দিল; কোন জবাব না দিয়ে পায়চারি করতে লাগল।

একসময় বেলিয়ার্দের কাছে গিয়ে বলল, "তুমি খুব চটে আছ বেলিয়ার্দ। যুদ্ধের উত্তাপের মধ্যে থেকে ভুল করাটা খুবই সহজ। ফিরে গিয়ে আর একবার ভাল করে দেখ, তারপর আমার কাছে এসো।"

বেলিয়ার্দ দৃষ্টির বাইরে যাবার আগেই রণক্ষেত্রের আর একপ্রান্ত থেকে আর একটি সংবাদবাহক ঘোড়া ছুটিয়ে এসে হাজির হল।

অনবরত বিরক্ত করায় ক্ষুব্ধ হয়ে নেপোলিয়ন বলল, "এই যে, তুমি আবার কি চাও?"

"স্যার, প্রিন্স…" অ্যাড্‌জুটাণ্টটি বলতে শুরু করল।

ক্রুদ্ধ অঙ্গভঙ্গী করে নেপোলিয়ন বলল, "নতুন সৈন্য চান, এই তো?"

অ্যাড্‌জুটাণ্ট সম্মতিসূচকভাবে মাথা নুইয়ে যুদ্ধের সংবাদ বলতে লাগল; সম্রাট তার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে কয়েক পা সরে গেল, থামল, ফিরে এসে বের্থিয়েরকে ডাকল।

দুটি হাত ঈষৎ ফাঁক করে বলল, "রিজার্ভ বাহিনীতে হাত দিতেই হবে। ওখানে কাদের পাঠানো যায় বলতো?" (তার সম্পর্কেই নেপোলিয়ন পরবর্তীকালে বলেছিল 'একটা রাজহাঁসের বাচ্চাকে আমি ঈগল পাখি

বানিয়েছি'।)

সবগুলি ডিভিসন, রেজিমেণ্ট ও ব্যাটেলিয়নের খবর বের্থিয়েরের মুখস্থ; সে বলল, "ক্লাপারেদ্ ডিভিশনকে পাঠান স্যার।"

নেপোলিয়ন ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

অ্যাড্জুটাণ্ট ক্লাপারেদ্ ডিভিসনের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। কয়েক-মিনিট পরেই পাহাড়ের পিছন থেকে "ইয়ং গার্ড" ডিভিসন যাত্রা শুরু করল। নেপোলিয়ন নিঃশব্দে সেইদিকে তাকিয়ে রইল।

হঠাৎ সে বের্থিয়েরকে বলল, "না! ক্লাপারেদ্ ডিভিসনকে পাঠাতে পারি না। ফ্রিয়াঁৎ-এর ডিভিসনকে পাঠাও।"

ক্লাপারেদ-এর বদলে ফ্রিয়াঁৎ-এর ডিভিসনকে পাঠানোর বিশেষ কোন সুবিধাই ছিল না, আর এই পরিবর্তনের ফলে যথেষ্ট বিলম্ব ও অসুবিধারই সৃষ্টি হল, তবু সেই হুকুমই ঠিক ঠিক তামিল করা হল। নেপোলিয়ন খেয়ালই করল না যে সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রে সেই ডাক্তারের ভূমিকায়ই সে অভিনয় করল যে ওষুধ পাল্টাবার ফলে রোগ-নিরাময়কেই বিলম্বিত করে—অথচ এই ভূমিকার কথা সে ভালই জানত এবং তার নিন্দাও করত।

অন্যসব ডিভিসনের মতই ফ্রিয়াঁৎ-এর ডিভিসন ও যুদ্ধক্ষেত্রের ধোঁয়ার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। চারদিক থেকে অ্যাড্জুটাণ্টরা ঘোড়া ছুটিয়ে এসে যেন সলা-পরামর্শ মত একই কথা বলতে লাগল। সকলেই নতুন সৈন্য-সাহায্যের প্রার্থনা জানিয়ে বলতে লাগল যে রুশরা তাদের ঘাঁটিতে অটুট থেকে এমন নারকীয় বোমাবর্ষণ শুরু করেছে যে ফরাসী বাহিনী একেবারে জল হয়ে গলে যাচ্ছে।

শিবিরের একটা টুলে বসে নেপোলিয়ন চিন্তায় ডুবে গেল। ভ্রমণপ্রিয় ম. দ্য বুসে সকাল থেকে না খেয়ে আছে; সম্রাটের কাছে এগিয়ে গিয়ে সশ্রদ্ধভাবে লাঞ্চ খাবার প্রস্তাব করল।

বলল, "আশাকরি এখন জয়লাভের জন্য ইয়োর ম্যাজেস্টিকে অভিনন্দন জানাতে পারি?"

নেপোলিয়ন নীরবে নেতিবাচকভাবে মাথাটা নাড়ল। লাঞ্চের প্রস্তাবে নয়, শুধু জয়লাভের কথাতেই তার আপত্তি ধরে নিয়ে ম. দ্য বুসে সাহস করে পরিহাসের সুরে বলে বসল যে লাঞ্চ হাতের কাছে এলে সেটা গ্রহণ না করার কোন মানেই হয় না।

"চলে যাও এখান থেকে…" হঠাৎ বিষণ্ণ কণ্ঠে কথাটা বলে নেপোলিয়নই সেখান থেকে সরে গেল।

দুঃখ, অনুতাপ ও উচ্ছ্বাসের একটা রহস্যময় হাসি ফুটে উটল ম. দ্য বুসের মুখে; সেও ধীর পায়ে অন্য সেনাপতিদের খোঁজে চলে গেল।

একজন চিরভাগ্যবান জুয়াড়ি যখন বেপরোয়াভাবে টাকা ঢেলে সর্বদা

জিতে যাবার পরে হঠাৎ যখন দেখে যে তার হারের পর হার হচ্ছে তখন তার মনে যে অবসাদ আসে তেমনি অবসাদ দেখা দিয়েছে নেপোলিয়নের মনে।

সেই একই সৈন্য, একই সেনাপতি, একই প্রস্তুতি, একই বিলি-বন্দোবস্ত, নিজেও তো সেই একই মানুষই আছে, বরং সে এখন আগের চাইতে আরও বেশী অভিজ্ঞ ও রণকুশল হয়েছে। এমন কি শত্রুপক্ষ অস্তারলিৎস ও ফ্রিড্‌ল্যাণ্ডে যা ছিল তাই আছে—অথচ কী এক প্রচণ্ড আঘাতে তার ডান হাতটা আজ অলৌকিকভাবে অক্ষম হয়ে পড়েছে।

যেসব পুরনো পদ্ধতি অব্যর্থভাবে জয়যুক্ত হয়েছে: কামান শ্রেণীকে এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত করা, শত্রুর ব্যূহ ভেদ করতে রিজার্ভ বাহিনীর আক্রমণ, "লৌহকঠিন সৈন্যদের দিয়ে অশ্বারোহী বাহিনীর আক্রমণ—এইসব পদ্ধতিই তো প্রয়োগ করা হয়েছে অথচ জয়লাভ করা তো দূরের কথা, চারদিক থেকে শুধু একই সংবাদ আসছে—সেনাপতিরা নিহত ও আহত হয়েছে, নতুন সৈন্য দরকার, রুশসৈন্যকে বিতাড়িত করা অসম্ভব, নিজের সৈন্যরা বিশৃংখল হয়ে পড়ছে।

আগে দুটি কি তিনটি হুকুম দেওয়া হলে, মুখের কয়েকটা কথা বের করলেই মার্শাল ও অ্যাডজুটাণ্টরা ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছে খুশি মুখের অভিনন্দন-বার্তা নিয়ে, শুনিয়েছে জয়লাভের কথা। কত শত্রু বন্দী হয়েছে তার হিসাব, সঙ্গে এনেছে বস্তা-বোঝাই শত্রুপক্ষের ঈগল-চিহ্ন ও পতাকা, কামান ও খাদ্য-ভাণ্ডার আর মুরাত শুধু চেয়েছে মালগাড়ি সংগ্রহ করতে অশ্বারোহী বাহিনী পাঠাবার অনুমতি। লোদি, মারেঙ্গো, আর্কোলা, জেনা, অস্তারলিজ, ওয়াগ্রাম প্রভৃতি সর্বত্র এই একই জিনিস ঘটেছে। কিন্তু এবার তার সৈন্যদের মধ্যে নতুন কিছু ঘটছে।

আক্রমণকারীদল আট ঘণ্টা ধরে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েও যখন জয়লাভ করতে পারে না তখন তার অর্থ যে কি দাঁড়াল সেটা যুদ্ধের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে নেপোলিয়ন ভালই জানে। কে জানে, এখন যেকোন একটা ছোটখাট দুর্ঘটনাই তার ও তার বাহিনীর ধ্বংস ডেকে আনতে পারে।

যখন সে মনে মনে চিন্তা করছে যে এই বিচিত্র রাশিয়া অভিযানে একটা যুদ্ধেও তার জয় হয় নি, দুই মাসের মধ্যে একটা পতাকা, একটা কামান, অথবা একটা সেনাদলও তার দখলে আসে নি, চারদিকের সকলের মুখেই দেখছে একটা চাপা অবসন্নতার ভাব, অনবরত সংবাদ আসছে যে রুশরা এখনও তাদের ঘাঁটি আগলে রেখেছে—তখন দুঃস্বপ্নের মত একটা ভয়ংকর অনুভূতি তাকে চেপে ধরেছে; যেসব দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনার ফলে তার ধ্বংস এগিয়ে আসতে পারে তারাই তার মনকে ঘিরে ধরেছে। রুশরা তার বাম ব্যূহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, তার ব্যূহের কেন্দ্রকে ভেদ করতে পারে,

একটা বিক্ষিপ্ত কামানের গোলা এসে তাকে মেরে ফেলতে পারে। এসবই তো সম্ভব। আগেকার সব যুদ্ধে সে ভাবত শুধু জয়ের নানা সম্ভাবনার কথা, আর এখন দুর্ভাগ্যের অসংখ্য সম্ভাবনা তার সামনে এসে হাজির হচ্ছে, সে সব কিছুই ঘটতে পারে বলেই তার বিশ্বাস। হ্যাঁ, তার অবস্থা এখন সেই মানুষটির মতই যে স্বপ্ন দেখছে, একটা গুণ্ডা তাকে আক্রমণ করতে আসছে, গুণ্ডাটাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে প্রচণ্ড আঘাত হানতে সে হাত তুলেছে, কিন্তু হঠাৎ তার মনে হল যে তার উদ্যত হাতটা যেন একখণ্ড জীর্ণ বস্ত্রের মত অসহায় পঙ্গু হয়ে ঢলে পড়ছে, আর অনিবার্য ধ্বংসের আতংকে তাকে অসহায়ভাবে চেপে ধরেছে।

রুশরা ফরাসী বাহিনীর বামব্যূহের উপর আক্রমণ চালিয়েছে—এই সংবাদ নেপোলিয়নকে আতংকিত করে তুলেছে। হাঁটুর উপর কনুই রেখে মাথা নীচু করে সে পাহাড়ের নীচে একটা টুলের উপর চুপচাপ বসে আছে। বের্থিয়ের এগিয়ে এসে প্রস্তাব করল, প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করতে তাদের একবার সেনাদল পরিদর্শন করতে যাওয়া উচিত।

"কি? কি বললে তুমি?" নেপোলিয়ন শুধাল। "হ্যাঁ, আমার ঘোড়া আনতে বল।"

ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে সে সেমেনভ্স্ক-এর দিকে এগিয়ে গেল।

মাথার উপর থেকে বারুদের ধোঁয়া ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে; পায়ের নীচে রক্তের স্রোতে ভাসছে ঘোড়া ও মানুষ,—কোথাও একক, কোথাও বা স্তূপ হয়ে। এমন একটা ছোট জায়গায় এত বেশী লোকের মৃত্যু অথবা এমন ভয়ংকর দৃশ্য নেপোলিয়ন অথবা তার কোন সেনাপতি আগে কখনও দেখে নি। সেমেনভ্স্ক্-এর উঁচু জায়গাটাতে উঠে ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে নেপোলিয়ন অপরিচিত রংয়ের ইউনিফর্মধারী অনেক সৈন্য দেখতে পেল। তারা রুশ সৈন্য।

এখন আর যুদ্ধ হচ্ছে না: চলেছে এমন এক অবিরাম হত্যাকাণ্ড যাতে ফরাসী বা রুশ কোন পক্ষেরই কোন লাভ নেই। নেপোলিয়ন ঘোড়া থামাল; আবার ডুবে গেল দিবাস্বপ্নের মধ্যে; সে স্বপ্ন ভাঙাল বের্থিয়ের। তার সামনে ও চারদিকে যা ঘটছে তাকে সে থামাতে পারে না, অথচ এ কাণ্ডকারখানা তারই নির্দেশে চলেছে, আর তার উপরেই নির্ভর করছে। এত করেও সাফল্য লাভ করতে না পারায় এই প্রথম তার মনে হল যে, এ ব্যাপারটাই অপ্রয়োজনীয় ও ভয়াবহ।

একজন সেনাপতি নেপোলিয়নের কাছে এগিয়ে এসে সাহস করে প্রস্তাব করল, সে নিজেই যেন "ওল্ড গার্ড্স্"-কে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিচালনা করে নিয়ে যায়। নেও বের্থিয়ার নেপোলিয়নের কাছেই দাঁড়িয়েছিল; সেনা-পতিটির অর্থহীন প্রস্তাব শুনে তারা দৃষ্টি-বিনিময় করল, বিদ্রূপের হাসি

হাসল।

নেপোলিয়ন মাথা নীচু করে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল।

"ফ্রান্স থেকে আটশ' লীগ (১ লীগ=২$\frac{১}{২}$ মাইল) দূরে এসে আমার "গার্ডস্‌"কে ধ্বংস হতে আমি দেব না!" এই কথা বলে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে সে শেভার্দিনোতে ফিরে গেল।

অধ্যায়—৩৫

যে কম্বল-বিছানো বেঞ্চে কুতুজভকে সকালে দেখেছিল পিয়ের, সেখানেই সে বসে আছে; সাদা মাথাটা ঝুলে পড়েছে, ভারী শরীরটা এলিয়ে পড়েছে। নিজে কোন হুকুম দিচ্ছে না, শুধু অপরের কথায় সায় দিচ্ছে, নয় তো আপত্তি জানাচ্ছে।

অনেককে বলছে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই কর"; আবার কাউকে বলছে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, একবার যাও তো বাপু, গিয়ে দেখে এস"; অথবা বলছে, "না, তা করো না; বরং অপেক্ষাই করা হোক!" যেসমস্ত প্রতিবেদন আসছে সেগুলি মন দিয়ে শুনছে; অধীনস্থ লোকরা কোন নির্দেশ চাইলে তাও দিচ্ছে; কিন্তু তার আসল আগ্রহ শোনা কথাগুলির দিকে নয়, অন্য কিছুতে —যারা কথা বলছে তাদের মুখের ভাব ও গলার স্বরের দিকে। বহু বছরের সামরিক অভিজ্ঞতায় সে জেনেছে, পরিণত বয়সের জ্ঞানে সে বুঝেছে, হাজার হাজার মানুষ যেখানে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে সেখানে একজন মানুষের পক্ষে তাদের পরিচালনা করা অসম্ভব; সে জানে, একজন প্রধান সেনাপতির হুকুম, অথবা সৈন্যসমাবেশের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন, বা কামানের সংখ্যাধিক্য ও নরহত্যার সংখ্যা দিয়ে একটা যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারিত হয় না; ফলাফল নির্ধারিত হয় এমন একটা শক্তির দ্বারা যাকে ধরা-ছোঁয়া যায় না, যাকে বলা হয় সেনাদলের মনোভাব, আর কুতুজভ চেষ্টা করে সেই শক্তির উপর নজর রেখে সাধ্যমত তাকে পরিচালিত করতে।

কুতুজভের চেহারায় ফুটে উঠেছে একটা সংহত শান্ত মনোযোগ; তার মুখে ফুটে উঠেছে অতিরিক্ত পরিশ্রমের আভাষ, যেন বৃদ্ধ বয়স ও দুর্বল শরীরের ক্লান্তিকে সহ্য করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠেছে।

এগারোটার সময় খবর এল ফরাসীরা যেসব ঘাঁটি দখল করে নিয়েছিল সেগুলি উদ্ধার করা হয়েছে, কিন্তু প্রিন্স ব্যাগ্রেশন আহত হয়েছে। কুতুজভ আর্তনাদ করে মাথাটা দোলাতে লাগল।

একজন অ্যাডজুটাণ্টকে বলল, "ঘোড়া ছুটিয়ে প্রিন্স পিতর আইভানভিচ-এর (ব্যাগ্রেশন) কাছে চলে যাও, সঠিক খবর নিয়ে এস"। তারপর পাশে দাঁড়ানো উর্তেম্বুর্গের ডিউকের দিকে ফিরে বলল, "ইয়োর হাইনেস দয়া করে 'প্রথম বাহিনী'র দায়িত্ব গ্রহণ করবেন কি?"

ডিউক চলে যাবার কিছুক্ষণ পরেই—সে হয়তো তখনও সেমেনভ্‌স্ক্‌-এ পৌঁছেওনি—তার অ্যাডজুটাণ্ট সেখান থেকে এসে কুতুজভকে জানাল যে ডিউক আরও সৈন্য চেয়ে পাঠিয়েছে।

কুতুজভ মুখটা বেঁকিয়ে দখ্‌তুরভ-এর কাছে খবর পাঠাল সে যেন "প্রথম বাহিনী"র দায়িত্ব গ্রহণ করে, আর ডিউককে অনুরোধ করে পাঠাল সে যেন ফিরে আসে, কারণ এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তাকে ছেড়ে দেওয়া চলে না। আবার যখন খবর এল যে মুরাত বন্দী হয়েছে, আর কর্মচারীরা যখন তাকে অভিনন্দিত করল, তখন কুতুজভ একটু হাসলমাত্র।

বলল, "একটু অপেক্ষা করুন মশাইরা। যুদ্ধে যখন জয় হয়েছে তখন মুরাতের বন্দী হওয়াটা কিছু অসাধারণ ব্যাপার নয়। তথাপি আনন্দ করবার আগে আরও একটু অপেক্ষা করা ভাল।"

কিন্তু সেনাবাহিনীর মধ্যে খবরটা প্রচার করে দেবার জন্য সে একজন অ্যাডজুটাণ্টকে পাঠিয়ে দিল।

কুতুজভ ছিল গোর্কিতে, রুশ ঘাঁটির কেন্দ্রস্থলের নিকটে। আমাদের বামব্যূহের উপর নেপোলিয়নের আক্রমণ অনেকবার প্রতিহত হয়েছে। মধ্যস্থলে ফরাসীরা বরদিনোর ওপারে যেতে পারে নি, আর তাদের বামব্যূহের উপর আক্রমণ হেনে উভারভ-এর অশ্বারোহী বাহিনী ফরাসীদের পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছে।

তিনটে নাগাদ ফরাসীদের আক্রমণ বন্ধ হল। যারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এসেছে আর তার চারপাশে যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের সকলের মুখেই কুতুজভ একটা প্রচণ্ড চাপ লক্ষ্য করল। দিনের সাফল্যে সে খুশি হয়েছে—এ সাফল্য একান্তই আশাতীত; কিন্তু বৃদ্ধ মানুষটির শক্তিতে আর কুলিয়ে উঠছে না। তার মাথাটা বারকয়েক এমনভাবে ঝুলে পড়ল যে মনে হল সে বুঝি পড়ে যাবে। সে ঢুলতে লাগল। ডিনার পরিবেশন করা হল।

এমন সময় অ্যাডজুটাণ্ট-জেনারেল ওল্‌যোগেন এসে হাজির হল। এই লোকটিই প্রিন্স আন্‌দ্রুর পাশ দিয়ে যাবার সময় বলেছিল "রণক্ষেত্রটাকে আরও ছড়িয়ে দেওয়া উচিত"; ব্যাগ্রেশনও এই লোকটিকে অপছন্দ করে। বামব্যূহের অবস্থার কথা জানাতেই সে এসেছে বার্ক্‌লে দ্য তলির কাছ থেকে। আহত সৈনিকদের ছুটে পিছিয়ে যেতে দেখে এবং সেনাবাহিনীর পিছনের দিকে বিশৃংখল অবস্থা দেখে তীক্ষ্ণবুদ্ধি বার্কলে দ্য তলি সবকিছু বিচার করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে যুদ্ধে হার হয়েছে, আর সেই সংবাদ জানাতেই তার প্রিয় অফিসারটিকে পাঠিয়েছে প্রধান সেনাপতির কাছে।

কুতুজভ অনেক কষ্টে একটুকরো সিদ্ধ মুরগির মাংস চিবুচ্ছিল। ভাঁজ-পড়া চোখের পাতার নীচ দিয়ে ঝকঝকে দুটি চোখ মেলে সে ওল্‌যোগেনের দিকে তাকাল।

কোনরকমে টুপির মাথাটা ছুঁয়ে ওল্‌যোগেন উদাসভাবে পা দুটো টান্ টান্ করে আধা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে কুতুজভের দিকে এগিয়ে গেল।

প্রশান্ত মহামহিমের প্রতি কিছুটা ইচ্ছাকৃত ঔদাসীন্য দেখিয়ে ওল্‌যোগেন যেন বোঝাতে চাইছে যে একজন সুশিক্ষিত সামরিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে সে রাশিয়ার লোকদের সুযোগ দিয়েছে যাতে তারা এই অকর্মণ্য বৃদ্ধ লোকটিকে নিয়ে নাচানাচি করতে পারে; আসলে এই বৃদ্ধের সব পরিচয়ই সে রাখে। ওল্‌যোগেন ভাবল, "Der alte Herr (জার্মানরা নিজেদের মধ্যে এই নামেই কুতুজভকে ডাকে) বেশ আরামেই আছে। সাগ্রহে কুতুজভের সামনে রাখা থালাটার দিকে তাকিয়ে বার্ক্‌লের হুকুমমতই বামব্যূহের বিবরণ "এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে" শোনাতে লাগল।

"আমাদের ঘাঁটির সবগুলো প্রান্তই শত্রুপক্ষের হাতে চলে গেছে; সৈন্যের অভাবে তাদের বেদখল করা যাচ্ছে না; সৈন্যরা পালাচ্ছে; তাদের থামানো অসম্ভব।"

কুতুজভ চিবুনো বন্ধ করল; লোকটা কি বলছে বুঝতে না পেরে অবাক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল। "বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির" বিচলিতভাব লক্ষ্য করে ওল্‌যোগেন হেসে বলল, "আমি যা দেখেছি সেটা 'প্রশান্ত মহামহিমের' কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা আমি সঙ্গত মনে করি নি। সৈন্যরা একেবারেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে…"

"আপনি দেখেছেন? আপনি দেখেছেন?…" ভুরু কুঁচকে কুতুজভ চীৎকার করে উঠল। তাড়াতাড়ি উঠে ওল্‌যোগেনের দিকে এগিয়ে গেল।

"আপনার…আপনার এতবড় সাহস…" চীৎকার করতে গিয়ে তার গলা আটকে গেল; কাঁপা হাত তুলে ভয় দেখাবার ভঙ্গী করে বলল, "আমার কাছে একথা বললেন কোন্ সাহসে? এ ব্যাপারে আপনি কিছুই জানেন না। আমার এই কথা জেনারেল বার্ক্‌লেকে গিয়ে বলুন যে তার সংবাদ ভুল; যুদ্ধের সত্যিকারের খবর তার চাইতে আমি ভাল জানি; আমি প্রধান সেনাপতি।"

ওল্‌যোগেন কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কুতুজভ তাকে থামিয়ে দিল।

"বামব্যূহে শত্রুকে প্রতিহত করা হয়েছে, আর দক্ষিণ ব্যূহে তাকে পরাস্ত করা হয়েছে। দেখুন স্যার, আপনি যদি ভুল দেখে থাকেন, তাহলে যা জানেন না তা আমাকে বলবেন না। ভাল মানুষের মত জেনারেল বার্কলের কাছে ফিরে যান, আর তাকে আমার এই দৃঢ় অভিপ্রায় জানিয়ে দিন যে আগামীকাল শত্রুকে আক্রমণ করা হবে।" কঠোর স্বরে কুতুজভ কথাগুলি বলল।

সব চুপ। শুধু শোনা যাচ্ছে বৃদ্ধ সেনাপতির ভারী শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ।

"সর্বত্র তারা প্রতিহত হয়েছে; সেজন্য ধন্যবাদ জানাই ঈশ্বরকে আর

আমার সাহসী সৈন্যদের! শত্রু পরাস্ত হয়েছে, কাল আমরা তাদের তাড়িয়ে দেব রাশিয়ার পবিত্র মাটি থেকে।" বলতে বলতে কুতুজভ ক্রুশ-চিহ্ন আঁকল; তার দুই চোখ জলে ভরে এল।

দুই কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে, ঠোঁট দুটি বেঁকিয়ে ওল্‌যোগেন নীরবে এক পাশে সরে গেল। "বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি"র নির্বোধ আত্মপ্রবঞ্চনা দেখে সে অবাক হয়ে গেছে।

একটি সৌম্য, সুদর্শন জেনারেলকে পাহাড় বেয়ে উঠে আসতে দেখে কুতুজভ বলে উঠল, "এই তো, এই তো এসেছে, আমার নায়ক এসেছে!"

লোকটি রায়েভ্‌স্কি; আজ সারাটাদিন সে কাটিয়েছে বরদিনো যুদ্ধক্ষেত্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে।

রায়েভ্‌স্কি জানাল, আমাদের সৈন্যরা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘাঁটি আগলে রেখেছে; ফরাসীরা আর আক্রমণ করতে সাহস পাচ্ছে না।

তার কথা শুনে কুতুজভ ফরাসীতে বলল, "তাহলে অন্য কারও কারও মত তুমি মনে কর না যে আমাদের পশ্চাদপসরণ করতেই হবে?"

রায়েভ্‌স্কি উত্তর দিল, "ঠিক উল্টো ইয়োর হাইনেস; চূড়ান্ত যুদ্ধের আগে যারা অনমনীয় থাকে তারাই জয়লাভ করে। আর আমার মতে⋯"

কুতুজভ তার অ্যাড্‌জুটাণ্টকে ডাকল, "কেসারভ! এখানে কালকের হুকুমটা লিখে ফেল।" অন্য একজনকে উদ্দেশ করে বলল, "আর তুমি ঘোড়া ছুটিয়ে রণক্ষেত্রে চলে যাও; ঘোষণা করে দাও যে কাল আমরা আক্রমণ করব।"

কুতুজভ যখন রায়েভ্‌স্কির সঙ্গে কথা বলছিল এবং, সেদিনের ঘোষণাটা বলে যাচ্ছিল, তখন ওল্‌যোগেন বার্ক্‌লের কাছ থেকে ফিরে এসে জানাল, জেনারেল বার্ক্‌লে দ্য তলির ইচ্ছা, ফিল্ড-মার্শাল যে হুকুম জারি করেছেন সেটা তাকে লিখিতভাবে জানানো হোক।

ওল্‌যোগেনের দিকে না তাকিয়েই কুতুজভ প্রাক্তন প্রধান সেনাপতির ইচ্ছামত হুকুমটা লিখে দেবার নির্দেশ দিল।

যে রহস্যময় সংজ্ঞাতীত বন্ধন গোটা বাহিনীর মধ্যে একই মনোভাব অক্ষুণ্ণ রাখে, যাকে বলা হয় সেনাবাহিনীর মনোবল, এবং যেটা যুদ্ধের প্রধান শক্তিস্বরূপ, তারই সাহায্যে কুতুজভের কথাগুলি, পরের দিনের যুদ্ধের হুকুম-নামা, সঙ্গে সঙ্গে সেনাবাহিনীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত জানাজানি হয়ে গেল।

কিন্তু সেনাবাহিনীর দূরতম প্রান্ত পর্যন্ত যে একই কথা অথবা একই হুকুম পৌঁছে গেল তা কিন্তু নয়। মুখে মুখে যেকথা নানা প্রান্তে পৌঁছে গেল তার সঙ্গে কুতুজভের কথার কোন মিলই রইল না, কিন্তু তার যা বক্তব্য সেটা সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ল, কারণ তার বক্তব্যটা কোনরকম সুকৌশল হিসাবের

কল নয়, বরং এমন একটা অনুভূতির ব্যাপার যা প্রধান সেনাপতি থেকে আরম্ভ করে প্রতিটি রুশ-এর মনে সমানভাবে বিদ্যমান।

আগামীকাল শত্রুকে আক্রমণ করা হবে একথা জেনে, এবং যেটা তাদের মনের কথা উচ্চতম মহল থেকে তারই সমর্থন শুনতে পেয়ে, ক্লান্ত ও অস্থিরচিত্ত সৈনিকরা নতুন করে সান্ত্বনা পেল, উজ্জীবিত হয়ে উঠল।

অধ্যায়—৩৬

রিজার্ভ বাহিনীর অন্যতম প্রিন্স আন্‌দ্রুর রেজিমেণ্টটি বেলা একটার পর পর্যন্তও সেমেনভ্‌স্ক্‌-এর পিছনে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের মধ্যেও নিষ্ক্রিয় হয়ে অবস্থান করছিল। দু'শ'র বেশী সৈন্যকে হারিয়ে বেলা দুটো নাগাদ সেই রেজিমেণ্টকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল সেমেনভ্‌স্ক ও গোলপাহাড় কামান-শ্রেণীর মধ্যবর্তী একটা পায়ে পায়ে চষে ফেলা যইয়ের ক্ষেতে। সেদিন একটা থেকে দুটোর মধ্যে শত্রুপক্ষের কয়েক শ' কামান থেকে প্রচণ্ডভাবে গোলাবর্ষণ করা হয়েছে, আর হাজার হাজার সৈন্য মারা পড়েছে।

সেই জায়গা থেকে না নড়ে এবং একটিও গুলি না চালিয়ে রেজিমেণ্টের এক-তৃতীয়াংশ সৈন্য মারা গেল। সম্মুখ থেকে, এবং বিশেষ করে ডান দিক থেকে, ধোঁয়ার ভিতর হতে গর্জে উঠছে কামান, আর সেই রহস্যময় ধোঁয়ার রাজ্য থেকে দ্রুত শব্দে ছুটে আসছে কামানের গোলা, আর ধীর গতিতে ছুটে আসছে বন্দুকের গুলি। যেন তাদের একটু বিশ্রাম দেবার জন্যই গোলাগুলি ছুটছে মাথার উপর দিয়ে, কিন্তু কখনও কখনও মাত্র এক মিনিটের মধ্যেই বেশ কয়েকজন সৈন্যকে ছিনিয়ে নিচ্ছে রেজিমেণ্টের ভিতর থেকে, আর আহতদের বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং নিহতদের টেনে সরিয়ে ফেলা হচ্ছে।

রেজিমেণ্টের অন্য সকলের মতই বিবর্ণ, বিষণ্ণ মুখে প্রিন্স আন্‌দ্রু একটা যইক্ষেতের পার্শ্ববর্তী মাঠের শেষ প্রান্তে পায়চারি করছে। মাথাটা নুয়ে পড়েছে, দুটো হাত রেখেছে পিছনের দিকে। তার কিছুই করার নেই, দেবার মত হুকুমও কিছু নেই। সবই চলছে আপনা থেকে। নিহতদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, আহতদের বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সৈনিকরা আরও ঘন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কোন সৈন্য পিছিয়ে পড়লেও সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এগিয়ে আসছে। প্রথমে প্রিন্স আন্‌দ্রু মনে করেছিল যে সৈন্যদের মনে সাহস যোগানো এবং তাদের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা তার কর্তব্য; তাই সে সৈন্যদের সঙ্গে সঙ্গেই হাঁটছিল; কিন্তু অচিরেই সে বুঝতে পারল যে এসবের কোন দরকারই নেই; সৈন্যদের শেখাবার মত কিছুই তার আয়ত্তে নেই। পা টেনে টেনে, ঘাসের বুকে খস্ খস্ শব্দ তুলে, বুটের উপর জমে ওঠা ধুলোর দিকে তাকিয়ে সে মাঠ ধরে হাঁটতে লাগল। আগের দিনের কোন চিন্তাই তার মনে নেই। সে কিছুই ভাবছে না। ক্লান্ত শ্রবণে শুধু শুনছে অবিশ্রাম

শব্দের স্রোত ; অর্ধবৃত্তাকার হিস্-হিস্ শব্দ থেকে বোমার গর্জনকে আলাদা করে চিনতে পারছে। "এই একটা আসছে⋯ঠিক আমাদের দিকেই আসছে। ⋯আবার একটা! আবার! ঠিক আঘাত করেছে।" একটু থেমে সৈন্যদের দিকে তাকাল। "না, উপর দিয়ে চলে গেল। কিন্তু এটা ঠিক আঘাত করেছে। শো-ও-ও ধপ্! তার থেকে পাঁচ পা দূরে পড়ে একটা কামানের গোলা কিছুটা শুকনো ধুলো উড়িয়ে চলে গেল। তার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত নামল। আবার সৈন্যদের দিকে তাকাল। সম্ভবত অনেকের আঘাত লেগেছে—দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়নের কাছে মস্ত বড় ভিড় জমেছে।

সে চেঁচিয়ে বলল, "অ্যাডজুটাণ্ট! ওদের ভিড় করতে নিষেধ কর।"

তার নির্দেশ মত কাজ করে অ্যাডজুটাণ্ট প্রিন্স আন্দ্রুর দিকে এগিয়ে এল। অন্য দিক থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে এল জনৈক ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার।

"ওই দেখ!" একটি ভীত সৈনিক আর্তকণ্ঠে বলে উঠল, আর একটা গোলা দ্রুতবেগে উড়তে নীচের দিকে নেমে আসা পাখির মত প্রায় নিঃশব্দে এসে পড়ল প্রিন্স আন্দ্রুর দুই পা দূরে, ব্যাটেলিয়ন-কম্যাণ্ডারের ঘোড়াটার একেবারে কাছে। ঘোড়াটা নাকের শব্দ করে এমনভাবে লাফিয়ে একপাশে সরে গেল যে মেজরের ছিটকে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। ঘোড়ার ভয় সৈনিকদের মধ্যেও সঞ্চারিত হল।

সপাটে মাটিতে শুয়ে পড়ে অ্যাডজুটাণ্ট চেঁচিয়ে বলল, "শুয়ে পড়!"

প্রিন্স আন্দ্রু ইতস্তত করল। ধূমায়মান গোলাটা তার ও শুয়ে-পড়া অ্যাডজুটাণ্টের মাঝখানে লাট্টুর মত ঘুরতে লাগল।

ঘূর্ণায়মান কালো গোলকটা থেকে যে ধোঁয়া পাক খেয়ে খেয়ে উঠছে সেদিকে তাকিয়ে প্রিন্স আন্দ্রু ভাবল, "এই কি মৃত্যু? আমি মরতে পারি না, মরতে চাই না। জীবনকে আমি ভালবাসি—ভালবাসি এই পৃথিবী, এই ঘাস, এই বাতাস⋯" এইসব ভাবতে ভাবতেই তার মনে পড়ল যে সকলেই তার দিকে তাকিয়ে আছে।

অ্যাডজুটাণ্টকে বলল, "এটা লজ্জার কথা! কি⋯"

তার কথা শেষ হল না। ঠিক সেইমুহূর্তে একই সঙ্গে ভেসে এল একটা বিস্ফোরণের শব্দ, জানালার ভাঙা কাঁচের মত ছিটকে-আসা বোমার টুকরোর হিস্ হিস্ শব্দ, আর দমবন্ধকরা বারুদের গন্ধ; হাত তুলে একপাশে সরে গিয়েই প্রিন্স আন্দ্রু উপুড় হয়ে পড়ে গেল। কয়েকজন অফিসার ছুটে এল। তলপেটের ডান দিক থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে ঘাসের অনেকটা জায়গা লাল করে দিল।

অসামরিক কর্মীরা স্ট্রেচার নিয়ে এসে অফিসারদের পিছনে দাঁড়াল। প্রিন্স আন্দ্রু ঘাসের উপর মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে পড়ে আছে; ঘর্ঘর শব্দে তার নিঃশ্বাস পড়ছে জোরে জোরে।

"অপেক্ষা করছ কিসের জন্ম ? এগিয়ে এস !"

চাষীরা এগিয়ে গিয়ে কাঁধ ও পা ধরে তাকে তুলল ; সে করুণকণ্ঠে আর্তনাদ করতে লাগল ; পরস্পর দৃষ্টি-বিনিময় করে চাষীরা আবার তাকে নামিয়ে দিল।

কে যেন চেঁচিয়ে বলল, "ওকে ধরে তোল ! যা হয় হোক !"

আবার তাকে কাঁধ ধরে তুলে স্ট্রেচারে শুইয়ে দেওয়া হল।

"হা ঈশ্বর !"—অফিসারদের মুখে নানা কথা শোনা গেল।

একজন অ্যাডজুটাণ্ট বলল, "আমার কানের একেবারে পাশ ঘেঁসে বেরিয়ে গেল।"

স্ট্রেচার কাঁধে নিয়ে চাষীরা দ্রুতপায়ে ড্রেসিং-স্টেশনের দিকে এগিয়ে গেল।

"একতালে পা ফেল! আঃ····এই চাষীরা অসমান পা ফেলে চাষীরা হাঁটার দরুণ স্ট্রেচারটা দুলছিল ; তাই তাদের কাঁধের উপর হাতের চাপ দিয়ে একজন অফিসার চেঁচিয়ে তাদের সংযত করল।

সামনের দিককার চাষীটি বলল, "একতালে পা ফেল ফেদর····আমি বলছি ফেদর !"

পিছন থেকে আর একটি চাষী পায়ে পা মিলিয়ে বলল, "এবার ঠিক হয়েছে !"

দিমোথিন ছুটে এসে স্ট্রেচারের দিকে তাকিয়ে কাঁপা গলায় বলে উঠল, "ইয়োর এক্সেলেন্সি ! অ্যাঁ, প্রিন্স !"

প্রিন্স আন্দ্রু চোখ মেলে তারদিকে তাকাল ; আবার তার চোখের পাতা নেমে এল।

অসামরিক কর্মীরা প্রিন্স আন্দ্রুকে জঙ্গলের পাশে অবস্থিত ড্রেসিং-স্টেশনে নিয়ে গেল। বার্চ গাছের জঙ্গলের এক প্রান্তে তিনটে তাঁবু খাটিয়ে ড্রেসিং-স্টেশনটা তৈরি করা হয়েছে। জঙ্গলের মধ্যে অনেক গাড়ি-ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। ঘোড়াগুলো চলমান বালতি থেকে যই খাচ্ছে ; যে দানাগুলো নীচে পড়ছে চড়ুইগুলো উড়ে উড়ে তাই খুটে খুটে খাচ্ছে। রক্তের গন্ধ পেয়ে কিছু কাক বার্চ গাছের মধ্যে উড়তে উড়তে অধৈর্য হয়ে কা-কা করে ডাকছে। তাঁবুর চারদিকে পাঁচ একরের বেশী জমি জুড়ে নানা পোশাকপরা রক্তমাখা সৈনিকরা শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে আছে। আহতদের ঘিরে স্ট্রেচার-বাহক সৈনিকরা বিষণ্ণ মুখে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। অফিসাররা তাদের বৃথাই সরে যেতে বলছে ; তারা দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে আহতদের দিকে তাকিয়ে আছে। তাঁবুর ভিতর থেকে কখনও ভেসে আসছে ক্রুদ্ধ চীৎকার, কখনও যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ। মাঝে মাঝে ড্রেসাররা ছুটে বেরিয়ে আসছে ; কেউ জল আনতে যাচ্ছে, কেউ বা জানাচ্ছে কে তার পরে যাবে। নিজ নিজ

পালার জন্য অপেক্ষমান সৈনিকরা আর্তনাদ করছে, দীর্ঘশ্বাস ফেলছে, কাঁদছে, কাতরাচ্ছে, অভিশাপ দিচ্ছে, আবার ভদ্‌কাও চাইছে। কারও বা বিকার দেখা দিয়েছে। প্রিন্স আন্‌দ্রুর বাহকরা আহত সৈনিকদের ডিঙিয়ে রেজিমেণ্ট-কম্যাণ্ডার হিসাবে তাকে নিয়ে একটা তাঁবুর একেবারে কাছে গিয়ে নির্দেশের অপেক্ষায় থেমে গেল। প্রিন্স আন্‌দ্রু চোখ মেলল; অনেকক্ষণ পর্যন্ত বুঝতেই পারল না চারদিকে কি হচ্ছে। তার মনে পড়ল সেই মাঠ, সেই জঙ্গল, সেই ঘূর্ণায়মান কাল গোলক, আর জীবনের প্রতি সেই আকস্মিক উচ্ছ্বসিত ভালবাসা। তার থেকে দুই পা দূরে গাছের ডালে হেলান দিয়ে মাথায় ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা একজন সুদর্শন, দীর্ঘদেহ নন-কমিশন অফিসার সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করে জোর গলায় কথা বলছে। তার মাথায় ও পায়ে বুলেটের আঘাত লেগেছে। সাগ্রহে তার কথা শুনতে আহত সৈনিক ও স্ট্রেচার-বাহকরা তাকে ঘিরে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে।

জ্বরের জন্য তার চোখ দুটো চকচক করছে; চারদিকে তাকিয়ে সে বলছে, "সেখান থেকে তাকে লাথি মেরে দূর করে দিলাম; স্বয়ং রাজাকেও চেপে ধরেছিলাম! সেইমুহূর্তে যদি রিজার্ভরা পৌঁছে যেত, তাহলে তাদের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকত না হে বাপুরা! আমি সত্যি বলছি…"

অনেক সকলের মতই প্রিন্স আন্‌দ্রুও চকচকে চোখে তার দিকে তাকিয়ে কিছুটা সান্ত্বনা পেল। সে ভাবল, "এখন কি সবই সমান নয়? সেখানেই বা কি হবে, আর এখানেই বা কি ছিল? জীবনকে ছেড়ে যেতে কেন আমি এত অনিচ্ছুক হয়েছিলাম? এই জীবনে এমন কিছু ছিল যা আমি বুঝিনি; এবং এখনও বুঝি না…"

অধ্যায়—৩৭

রক্তমাখা এপ্রন পরে একজন ডাক্তার বেরিয়ে এল। যাতে চুরুটে রক্ত না লাগতে পারে সেইজন্য চুরুটটা ধরা আছে তার এক হাতের বৃদ্ধা ও কনিষ্ঠার ফাঁকে। আহতদের মাথার উপর দিয়ে সে চারদিকে তাকাতে লাগল। আসলে তার একটু বিশ্রাম দরকার। কিছুক্ষণের জন্য ডান দিক থেকে বাঁ দিকে মাথাটাকে ঘুরিয়ে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সে নীচে তাকাল।

জনৈক ড্রেসার প্রিন্স আন্‌দ্রুকে দেখিয়ে দিলে ডাক্তার বলল, "ঠিক আছে, এক্ষুণি"। তারপর লোকজনদের বলল তাকে তাঁবুর ভিতরে নিয়ে যেতে।

অপেক্ষারত আহতদের মধ্যে মৃদু গুঞ্জণ উঠল।

একজন বলে উঠল, "দেখা যাচ্ছে পরপারে যাবার পথেও একমাত্র ভদ্র-জনরাই আগে সুযোগ পাবে!"

প্রিন্স আন্‌দ্রুকে ভিতরে নিয়ে সদ্য ধুয়ে-দেওয়া একটা টেবিলে শুইয়ে দেওয়া হল। তাঁবুর ভিতরে কি আছে প্রিন্স আন্‌দ্রু ভাল করে দেখতে পাচ্ছে

না। চারদিকের করুণ আর্তনাদ, আর নিজের উরু, পাকস্থলী ও পিঠের তীব্র যন্ত্রণার জন্য অন্য কোনদিকে সে মন দিতে পারছে না। সে যা কিছু দেখতে পেল সব মিলেমিশে একাকার হয়ে তার মনে হল নীচু তাঁবুটা যেন রক্তাক্ত উলঙ্গ মানবদেহে ভর্তি হয়ে গেছে। কয়েক সপ্তাহ আগে অগস্ট মাসের এক উত্তপ্ত দিনে ঠিক এই দৃশ্যই সে দেখেছিল স্মোলেনস্ক রোডের পাশে একটা নোংরা পুকুরের মধ্যে।

তাঁবুর মধ্যে তিনটে অপারেশন টেবিল। দুটোতে লোক ছিল, তৃতীয়টাতে প্রিন্স আন্‌দ্রুকে শুইয়ে দেওয়া হল। তার একেবারে কাছের টেবিলে বসে আছে একটি তাতার। পাশে খুলে রাখা ইউনিফর্ম দেখে মনে হল সে একজন কসাক। চারজন সৈনিক তাকে ধরে আছে, আর চশমা চোখে একজন ডাক্তার তার পেশীবহুল বাদামী পিঠে ছুরি চালাচ্ছে।

"উঃ, উঃ, উঃ!" উঁচু চোয়ালের হাড় ও থ্যাবড়া নাকওয়ালা ফোলা মুখটা তুলে সবগুলো সাদা দাঁত বের করে সে অবিরাম আর্তনাদ করছে আর শরীরটাকে এঁকিয়ে-বেঁকিয়ে নাড়ছে। আর একটা টেবিলে একটি লম্বা, ভুঁড়িওয়ালা লোক চিৎ হয়ে পড়ে আছে। তার কোঁকড়া চুল, মুখের রং ও মাথার আকৃতি দেখে তাকে প্রিন্স আন্‌দ্রুর বেশ পরিচিত বলে মনে হল। কয়েকজন ড্রেসার বুকের উপর চাপ দিয়ে তাকে ধরে রেখেছে। দুজন ডাক্তার তার একটা রক্তাক্ত পা নিয়ে কি যেন করছে। তাতারটির কাজ শেষ হলে একটা ওভারকোট দিয়ে তাকে ঢেকে রেখে চশমা-চোখে ডাক্তারটি হাত ধুয়ে প্রিন্স আন্‌দ্রুর কাছে এগিয়ে এল।

প্রিন্স আন্‌দ্রুর মুখের দিকে একবার তাকিয়েই সে দ্রুত পায়ে সরে গেল।

"ওর পোশাক খুলে ফেল! কিসের জন্য দেরি করছ?" ক্রুদ্ধকণ্ঠে সে ড্রেসারদের বলল।

ড্রেসাররা যখন আস্তিন গুটিয়ে অতিক্রুত বোতাম খুলে তার পোশাক খুলতে লাগল তখন প্রিন্স আন্‌দ্রুর চোখের সামনে ভেসে উঠল শৈশবের দূরতম স্মৃতিগুলি। ডাক্তার ঝুঁকে পড়ে তার ক্ষতস্থান পরীক্ষা করে একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। কাকে যেন ইসারায় কি বলল, আর তলপেটের তীব্র যন্ত্রণায় প্রিন্স আন্‌দ্রু জ্ঞান হারাল। যখন জ্ঞান ফিরে এল তখন উরুর ভাঙা হাড়গুলো বের করে ফেলা হয়েছে, ছেঁড়া মাংসটা কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে, ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়ে গেছে। তার চোখে-মুখে জল ছিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রিন্স আন্‌দ্রু চোখ খুলতে ডাক্তার ঝুঁকে পড়ে তাকে নিঃশব্দে চুমো খেয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

অনেক যন্ত্রণা সহ্য করার পরে এখন প্রিন্স আন্‌দ্রুর এমন ভাল লাগছে যে দীর্ঘকাল সেরকম সুখের অনুভূতি তার হাসি। জীবনের সবচাইতে সেরা সুখের মুহূর্তগুলি—বিশেষ করে প্রথম শৈশবের সেই দিনগুলি যখন পোশাক

খুলে তাকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হত, তার উপর ঝুঁকে পড়ে নার্স তাকে ঘুম-পাড়ানি গান শোনাত, আর বালিশে মাথা ডুবিয়ে দিয়ে জীবনটাকে সে বড় বেশী করে ভালবাসত—তার স্মৃতিতে ফিরে এল ; সে স্মৃতি যেন অতীতের নয়, বর্তমানের ঘটনা।

যে আহত লোকটির মাথাটা প্রিন্স আন্‌দ্রুর পরিচিত বলে মনে হয়েছিল এবার ডাক্তাররা তাকে নিয়ে পড়ল : তুলে ধরে তারা তাকে শান্ত করতে চেষ্টা করছে।

"আমাকে ওটা দেখান···ওঃ, উঃ···ওঃ ! উঃ !" তার ভয়ার্ত আর্তনাদ ও চাপা কান্না কানে এল।

সে কান্নার শব্দ শুনে প্রিন্স আন্‌দ্রুরও কান্না পেল। অগৌরবে তার মৃত্যু হচ্ছে বলে, অথবা জীবনকে ছেড়ে যেতে তার কষ্ট হচ্ছে বলে, অথবা শৈশবের স্মৃতিগুলি ফিরে এসেছে বলে, অথবা সে যন্ত্রণা ভোগ করছে, অন্যরা যন্ত্রণা ভোগ করছে, আর এই মানুষটি এমন করুণভাবে আর্তনাদ করছে বলে, —কারণ যাই হোক না কেন তারও ইচ্ছা হল শিশুর মত একটু কাঁদতে।

জমাট রক্তমাখা বুট-পরা কাটা পাটা সেই আহত লোকটিকে দেখানো হল।

"ওঃ ! ওঃ, উঃ !" সে মেয়েমানুষের মত ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

পাশে দাঁড়ানো ডাক্তারটি চলে গেল।

প্রিন্স আন্‌দ্রু নিজের মনেই বলল, "হাঁ ঈশ্বর ! এসব কি ? কেন সে এখানে এল ?"

এইমাত্র যে লোকটির পা কেটে বাদ দেওয়া হল তাকে সে চিনতে পেরেছে। লোকটি আনাতোল কুরাগিন। সকলে কোলে তুলে নিয়ে তাকে এক গ্লাস জল খাওয়াতে চাইছে, কিন্তু তার ফুলে-ওঠা কাঁপা ঠোঁট জলে চুমুক দিতে পারছে না। আনাতোল যন্ত্রণায় ফুঁপিয়ে কাঁদছে। "হ্যাঁ, সেই তো বটে ! হাঁ, এই লোকটির সঙ্গে আমার সম্পর্কে বড়ই ঘনিষ্ঠ, বড়ই বেদনার। কিন্তু আমার শৈশবের সঙ্গে, আমার জীবনের সঙ্গে লোকটির কিসের সম্পর্ক ?" নিজেকে প্রশ্ন করে সে কোন জবাব পেল না। সহসা একটা অপ্রত্যাশিত নতুন স্মৃতি শৈশবের আনন্দময় ভালবাসার রাজ্য থেকে তার সামনে এসে হাজির হল। ১৮১০-এ একটা বল-নাচের আসরে প্রথম যেদিন নাতাশাকে দেখেছিল সেদিনের কথা মনে পড়ল। এতক্ষণে তার মনে পড়ল, এই যে লোকটি অশ্রুপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে তার সঙ্গে কিসের সম্পর্কে সে বাঁধা। সবকিছুই তার মনে পড়ে গেল, আর লোকটির প্রতি উচ্ছ্বসিত করুণায় ও ভালবাসায় তার মনটা ভরে গেল।

প্রিন্স আন্‌দ্রু নিজেকে আর সংযত রাখতে পারল না ; পার্শ্ববর্তী লোকটির জন্য, নিজের জন্য, নিজের ও অন্য সকলের ভুলের জন্য তার দুই চোখ জলে

ভরে উঠল।

"সহমর্মিতা, ভাইয়ের প্রতি ভালবাসা, যারা আমাদের ভালবাসে আর যারা আমাদের ঘৃণা করে তাদের প্রতি ভালবাসা, শত্রুকে ভালবাসা; হ্যাঁ, যে ভালবাসার কথা ঈশ্বর পৃথিবীতে প্রচার করেছেন আর প্রিন্সেস মারি আমাকে শিখিয়েছে অথচ আমি বুঝিনি—সেই ভালবাসার জন্যই জীবনকে ছেড়ে যেতে আমি দুঃখবোধ করেছি, বেঁচে থাকলে সেটাই হবে আমার অবলম্বন। কিন্তু এখন যে অনেক দেরি হয়ে গেছে। তা আমি জানি!"

অধ্যায়—৩৮

নিহত ও আহতদের দেহে সমাকীর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়ংকর দৃশ্য, ব্যক্তিগত-ভাবে পরিচিত জনবিশেক সেনাপতির নিহত বা আহত হবার সংবাদ এবং নিজের একদা শক্তিমান বাহুর অক্ষমতার চেতনা—সবকিছু মিলিয়ে নেপোলিয়নের উপর একটা অপ্রত্যাশিত চাপ সৃষ্টি হয়েছে; অথচ সাধারণত নিহত ও আহতদের দেখতে তার ভালই লাগে; তার বিচারে তাতে মনের শক্তি-পরীক্ষা হয়। মনের যে শক্তিকে সে তার কৃতিত্ব ও মহত্বের আকর বলে মনে করে, আজ কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়ংকর রূপটা তার সেই মনোবলকেইপর্যুদস্ত করে তুলেছে। দ্রুতগতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে সে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে শেভার্দিনো গোলপাহাড়ে ফিরে গেল, বিবর্ণ, ফোলা, ক্যাকাসে মুখে একটা টুলের উপর বসে পড়ল; চোখ দুটি আবছা, নাকটা লাল, কণ্ঠস্বর কর্কশ; চোখ নীচু করে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কান পেতে শুনছে গোলাগুলির শব্দ। বেদনার্ত অবসন্নতায় সে নিজের কাজের পরিণতির জন্যই অপেক্ষা করছে; এ কাজের সেই হোতা, অথচ তার গতিরোধ করতে সে অক্ষম। জীবনের যে কৃত্রিম অপচ্ছায়াকে সে এতকাল সেবা করে এসেছে, মুহূর্তের জন্য হলেও একটা ব্যক্তিগত মানবিক অনুভূতি তার জায়গা দখল করে নিল। যুদ্ধক্ষেত্রে যে যন্ত্রণা ও মৃত্যুকে সে প্রত্যক্ষ করেছে, নিজের মধ্যেই তাকে যেন অনুভব করল। মাথার ও বুকের উপর যে বোঝা চেপে আছে তা যেন নিজের যন্ত্রণা ও মৃত্যুর সম্ভাবনাকেই স্মরণ করিয়ে দিল। সেইমুহূর্তে মস্কো, বা জয়, বা গৌরব—কোন কিছুই সে কামনা করল না (আরও গৌরবের কী প্রয়োজন তার আছে?) তার একমাত্র কামনা বিশ্রাম, প্রশান্তি ও মুক্তি।

একটি অ্যাডজুটাণ্ট এসে খবর দিল, তার হুকুমমত দু'শ' কামান থেকে একযোগে রুশদের উপর গোলাবর্ষণ করা হচ্ছে, কিন্তু তবু তারা ঘাঁটি আগলে রেখেছে।

অ্যাডজুটাণ্ট বলল, "আমাদের গোলা বর্ষণে কাটা ফসলের মত ওরা সারি সারি ঢলে পড়ছে, কিন্তু তবু লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।"

"আরও মৃত্যু তারা চায়!" নেপোলিয়ন কর্কশ গলায় বলল।

কথাটা শুনতে না পেয়ে অ্যাডজুটাণ্ট বলল, "স্যার?"

ভুরু কুঁচকে নেপোলিয়ন বলল, "আরও মৃত্যু তারা চায়! তাই তারা পাবে!

যারা এই ঘটনাবলীর অংশীদার তাদের মধ্যে এব্যাপারে যার দায়িত্ব সবচাইতে বেশী সেই মানুষটির মন ও বিবেক যে শুধু এই দিনটিতে ও এই সময়েই অন্ধকারে ঢেকে গেল তা কিন্তু নয়। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সে বুঝতে পারে নি সত্য, শিব ও সুন্দর কাকে বলে, বুঝতে পারে নি কি তার এইসব কাজের তাৎপর্য যা একান্তভাবে সত্য ও শিবের বিপরীত, যা সর্বপ্রকার মানবিকতা থেকে এতদূরে অবস্থিত যে তার তাৎপর্য সে কোনদিন উপলব্ধি করতে পারে নি। অর্ধেক পৃথিবীর দ্বারা প্রশংসিত স্বীয় কর্মধারাকে সে কখনও অস্বীকার করতে পারে নি, আর তাই সত্য, শিব ও মানবতাকেই সে অস্বীকার করেছে।

নিহত ও পঙ্গু মানুষের দেহে আকীর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যেতে যেতে শুধু সেই একটি দিনই সে হিসাব করে নি যে তাদের মধ্যে প্রতি একজন ফরাসীর জন্য কতজন রুশ সেখানে পড়ে আছে, এবং মাত্র সেই একটি দিনই এই হিসাবের মধ্যে মিথ্যা করে আনন্দের কারণ খুঁজতে চেষ্টা করে নি যে প্রতি একজন ফরাসীর বিনিময়ে পাঁচজন রুশ সেখানে পড়ে আছে। শুধু সেই একটি দিনই সে প্যারিসে লিখিত চিঠিতে বলে নি যে "যুদ্ধক্ষেত্রটি অপূর্ব," কারণ সেখানে পড়ে আছে হাজার হাজার মৃতদেহ; কিন্তু সেণ্ট হেলেনা দ্বীপের শান্ত নির্জনতার মধ্যে সে যখন স্থির করল যে জীবনে যেসব মহৎ কর্ম সে করেছে তার বিবরণ লিখেই সে অবসরের দিনগুলি কাটিয়ে দেবে, তখনও সে লিখেছে:

"এই রুশ যুদ্ধের হওয়া উচিত ছিল আধুনিক কালের সব চাইতে জনপ্রিয় যুদ্ধ: এ যুদ্ধ শুভবুদ্ধির যুদ্ধ; সত্যিকারের স্বার্থ, শান্তি ও সকলের নিরাপত্তার যুদ্ধ; এ যুদ্ধ ছিল সম্পূর্ণ শান্তিকামী ও রক্ষণশীল।

"এ যুদ্ধ একটি মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য যুদ্ধ; অনিশ্চয়তার অবসান ও নিরাপত্তার সূচনার যুদ্ধ। সকলের কল্যাণ ও সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ একটি নতুন দিগন্ত উদ্ঘাটিত হতে চলেছিল। ইওরোপীয় ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; বাকি ছিল শুধু তাকে সংগঠিত করে তোলা।

"এইসব বৃহৎ লক্ষ্যকে পূর্ণ করে, সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠা করে, আমার নিজস্ব 'কংগ্রেস' ও 'পবিত্র মৈত্রী' গড়ে ওঠা উচিত ছিল। কিন্তু সে ভাবনা-চিন্তাগুলি আমার কাছ থেকে চুরি করা হল। বৃহৎ রাষ্ট্র-কর্ণধারদের সেই পুনর্মিলন সভায় এক পরিবারের মত আমরা আমাদের স্বার্থ নিয়ে আলোচনা করতাম এবং মনিবের কাছে করণিকের মত তার বিবরণ জনগণের কাছে পেশ করতাম।

"বস্তুত, এইভাবে ইওরোপ একটা জাতি হিসাবে গড়ে উঠত, এবং যে-কোন মানুষ যেকোনস্থানে বেড়াতে বের হলে একই পিতৃভূমিতে বাস করার অনুভূতি লাভ করত। আমি অবশ্যই দাবী করতাম যেসব নদীতে পথ চলবার অধিকার সকলকে দেওয়া হোক, সব সমুদ্র আসুক সকলের অধিকারে, আর এখন থেকে সব বিরাট সেনাবাহিনীকে রাষ্ট্রপ্রধানদের রক্ষীতে পরিণত করা হোক।

"সেই মহান, শক্তিমান, চমৎকার, শান্তিময় ও গৌরবময় পিতৃভূমির কেন্দ্রস্বরূপ ফ্রান্সে ফিরে গিয়ে আমি ঘোষণা করতাম যে তার সীমান্ত চিরঅপরিবর্তনীয়; সব ভবিষ্যৎ যুদ্ধই সম্পূর্ণরূপে আত্মরক্ষামূলক, সবরকম ক্ষমতাবিস্তার জাতীয়তাবিরোধী। সাম্রাজ্যের আসনে বসাতাম আমার ছেলেকে, আমার একনায়কত্বের সূচনা হত।

"প্যারিস হয়ে উঠত পৃথিবীর রাজধানী, আর ফরাসী জাতি হত সকল জাতির ঈর্ষার বস্তু।

"তারপর আমার ছেলের রাজকীয় শিক্ষানবীশীর আমলে সম্রাজ্ঞীকে সঙ্গে নিয়ে আমার অবসরকাল, আমার বার্ধক্যকে কাটাতাম নিজেদের ঘোড়ায় চেপে সত্যিকারের গ্রাম্য দম্পতির মত, ধীরে সুস্থে ঘুরে বেড়াতাম সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে, শুনতাম সকলের অভাব-অভিযোগ, তার প্রতিকার করতাম, সর্ব দিকে ও সর্বত্র গড়ে তুলতাম বড় বড় বেসরকারী অট্টালিকা, নানা কল্যাণ-ব্যবস্থা।"

নরহত্যাকারীর বিষণ্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া যার বিধি-নির্দিষ্ট নিয়তি সেই নেপোলিয়নও নিজেকে বুঝিয়েছিল যে মানুষের কল্যাণই ছিল তার সব কাজের লক্ষ্য, লক্ষ লক্ষ মানুষের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের অধিকার ছিল তার হাতে, আর সেই ক্ষমতার বলে সে তাদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে পারত আশীর্বাদ ও কল্যাণ।

রুশ যুদ্ধ সম্পর্কে সে আরও লিখেছে: "যে চার লক্ষ মানুষ ভিশ্চুলা নদী অতিক্রম করেছিল তাদের মধ্যে অর্ধেক ছিল অস্ট্রীয়া, প্রাশিয়া, স্যাকসন, পোল্যাণ্ড, ব্যাভেরিয়া, উর্তেমবুর্গ, মেক্লেন্‌বুর্গ, স্পেন, ইতালি ও নেপ্‌ল্‌সের মানুষ। সঠিক বলতে গেলে রাজকীয় সেনাবাহিনীর এক-তৃতীয়াংশ সৈন্য এসেছিল হল্যাণ্ড, বেল্‌জিয়াম, রাইন নদীর সীমান্ত অঞ্চল, পিড্‌মণ্ট, সুইজারল্যাণ্ড, জেনেভা, তাস্কান, রোম, বত্রিশতম সামরিক ডিভিসন, ব্রেমেন, হাম্‌বুর্গ প্রভৃতি দেশ থেকে; তাদের মধ্যে ফরাসী ভাষায় কথা বলত বড় জোর এক লক্ষ চল্লিশ হাজার মানুষ। প্রকৃতপক্ষে রাশিয়া অভিযানে ফ্রান্স হারিয়েছে পঞ্চাশ হাজারেরও কম সৈন্য; আর ভিল্‌না থেকে মস্কোতে পশ্চাদ-পসরণের পথে বিভিন্ন যুদ্ধে রুশ বাহিনী হারিয়েছে তার চার গুণেরও বেশী সৈন্য; মস্কো পুড়িয়ে দেওয়ার ফলে এক লক্ষ রুশ বনে-জঙ্গলে প্রাণ হারিয়েছে

শীতে ও খাদ্যাভাবে ; শেষ পর্যন্ত, মস্কো থেকে ওভার পর্যন্ত যেতে আবহাওয়ার প্রচণ্ডতায়ও রুশ বাহিনীর অনেক ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে ; ফলে ভিল্‌না পর্যন্ত পৌছতে তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল মাত্র পঞ্চাশ হাজার, আর কালিশ্‌-এ আঠারো হাজারেরও কম।"

নেপোলিয়ন কল্পনা করেছিল যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে এই যুদ্ধটা তার ইচ্ছাতেই হয়েছিল, আর সে যুদ্ধের ভয়াবহতা তার অন্তরকে মোটেই বিচলিত করে নি। যা কিছু ঘটেছে তার সব দায়িত্বই সে সাহসের সঙ্গে গ্রহণ করেছে ; তার অন্ধকারাচ্ছন্ন মন এই বিশ্বাসের মধ্যেই যুক্তি খুঁজে পেয়েছে যে লক্ষ লক্ষ মানুষ যারা সেই যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে তাদের মধ্যে হেসে এবং ব্যাভেরিয়ার তুলনায় ফ্রান্সের মানুষ ছিল সংখ্যায় অল্প।

অধ্যায়—৩৯

নানা বিচিত্র ভঙ্গীতে ও বিচিত্র ইউনিফর্মে হাজার হাজার মানুষ দাভিদভ-পরিবার ও রাজকীয় ভূমিদাসদের মালিকানাভুক্ত সেইসব উপত্যকায় ও প্রান্তরে মরে পড়ে আছে যেখানে শত শত বৎসর ধরে বরদিনো, গোর্কি, শেভার্দিনো ও সেমেনভ্‌স্ক্‌-এর চাষীরা ফসল কেটে ঘরে তুলেছে, গরু-ঘোড়া চড়িয়েছে। বিভিন্ন ড্রেসিং-স্টেশনকে ঘিরে প্রায় তিন একর জমির ঘাস ও মাটি রক্তে ভিজে গেছে। বিভিন্ন অস্ত্রধারী আহত ও অনাহত মানুষ ভয়ার্ত মুখে দলে দলে নিজেদের টেনে নিয়ে গেল—কেউ একটা সেনাদল থেকে ফিরে গেল মোঝায়েস্ক্‌-এ, কেউ বা অন্য দল থেকে ফিরে গেল ভালুভো-তে। অন্যরা ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত অবস্থায় অফিসারদের নির্দেশে এগিয়ে গেল সামনে। অন্যরা ঘাঁটি আগলে গোলাগুলি চালাতে লাগল।

যে রণক্ষেত্র ছিল প্রভাত সূর্যে ঝলসিত বেয়নেটের ঝিকিমিকি ও ধোঁয়ার খণ্ড মেঘের ঝল্‌কানিতে সুন্দর, সেখানে এখন ছড়িয়ে আছে ভেজা কুয়াশা ও ধোঁয়া, আর সোরা ও রক্তের একটা বিচিত্র গন্ধ। মেঘ জমল, ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে লাগল মৃত ও আহতদের উপর, ভয়ার্ত, ক্লান্ত ও সন্দিগ্ধ মানুষ-গুলোর উপর ; যেন বলতে চাইল : "যথেষ্ট হয়েছে ! যথেষ্ট ! এবার বন্ধ কর ....নতুন করে ভাব ! কি করছ তোমরা ?"

খাদ্য ও বিশ্রামের অভাবে পীড়িত উভয় পক্ষের সৈন্যদের মনেই যেন এখন সন্দেহ জেগেছে—এখনও তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে এই হানাহানি করেই চলবে কি না ; প্রত্যেকের মুখেই স্পষ্ট দ্বিধার ভাব ; প্রত্যেকের অন্তরে একই প্রশ্ন : "কিসের জন্য, কার জন্য আমি অপরকে মারব আর নিজে মরব ? .... তোমরা যাকে খুশি মারতে পার, কিন্তু আমি আর ওকাজ করতে চাই না।" সন্ধ্যা নাগাদ এই চিন্তা সকলের মনেই দানা বেঁধে উঠল। যেকোন মুহূর্তে এইসব মানুষরা নিজেদের কাজে নিজেরাই আতংকিত হয়ে উঠতে পারে,

সবকিছু ছেড়ে দিয়ে যেকোন দিকে চলে যেতে পারে।

কিন্তু হায়, যদিও যুদ্ধের শেষের দিকে সৈন্যরা নিজেদের কাজকে নিজেরাই ভয় করতে লাগল, সেখান থেকে সরে যেতে পারলে তারা সুখীই হত, তবু একটা দুর্বোধ্য, রহস্যজনক শক্তি তাদের চালাতে লাগল, তখনও তারা কামান-বন্দুক নিয়ে তৈরি হল, গুলি-বারুদ ভরল, নিশানা ঠিক করল, আগুন ধরাল; অথচ প্রতি তিনজন গোলন্দাজের মাত্র একজন বেঁচে আছে, তারা চলছে টলতে টলতে আর ক্লান্তিতে হাঁপাচ্ছে, ঘামে, রক্তে ও বারুদে তাদের সারা শরীর ছেয়ে গেছে। আগের মতই দ্রুতগতিতে ও নিষ্ঠুরতার সঙ্গে দুই পক্ষ থেকেই কামানের গোলা ছুটছে, মানুষের দেহ বিধ্বস্ত হচ্ছে, আর যে ভয়ংকর কাজটি পরিচালিত হচ্ছে কোন মানুষের ইচ্ছায় নয়, মানুষের ভাগ্য-নিয়ন্তা ঈশ্বরের ইচ্ছায়, সে কাজ সমানে এগিয়ে চলেছে।

সেই সময় রুশ বাহিনীর বিশৃংখল পশ্চাৎ ভাগটা দেখলেই যে কেউ বলে দিতে পারত যে ফরাসীরা আর একটু কর্মতৎপর হলেই রুশ বাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে; আবার ফরাসী বাহিনীর পশ্চাৎভাগটা দেখলেও যে কেউ বলে দিতে পারত যে রুশরা আর একটু কর্মতৎপর হলেই ফরাসীরা ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু ফরাসী বা রুশ কোন পক্ষই তৎপর হল না, যুদ্ধের আগুন ধিকি ধিকি করেই জ্বলতে লাগল।

রুশরা সে চেষ্টা করল না কারণ তারা ফরাসীদের আক্রমণ করে নি। যুদ্ধের সূচনায় তারা মস্কোর পথ অবরোধ করে দাঁড়িয়েছিল, এবং এখন যুদ্ধের শেষ লগ্নেও তারা সেই একই কাজ করে চলেছে। কিন্তু ফরাসীদের ঘাঁটি থেকে তাড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যও যদি রুশদের থাকত, তাহলেও তারা একবার শেষ চেষ্টা করতে পারত না, কারণ গোটা রুশবাহিনী তখন ভেঙে পড়েছে, যুদ্ধের ফলে তাদের একটা অংশও অক্ষত নেই, আর নিজেদের ঘাঁটি আগলে রাখলেও তাদের অর্ধেক সৈন্যকে তারা হারিয়েছে।

আর ফরাসীরা—তাদের মনে ছিল পনেরো বছর ধরে শুধু জয়লাভের স্মৃতি, নেপোলিয়নের অপরাজেয়তায় ছিল তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস, তারা জানত যে যুদ্ধক্ষেত্রের একটা অংশ তাদের দখলে এসেছে, তারা হারিয়েছে মোট সৈন্যসংখ্যার মাত্র এক-চতুর্থাংশ এবং বিশ হাজার সৈন্যের রক্ষীবাহিনী সম্পূর্ণ অটুট আছে—তাই তারা অনায়াসেই সে চেষ্টাটা করতে পারত। রুশ বাহিনীকে তাদের ঘাঁটি থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্যই ফরাসীরা তাদের আক্রমণ করেছিল; কাজেই সে চেষ্টা করাই তাদের উচিত ছিল, কারণ রুশরা যতক্ষণ মস্কোর পথ অবরোধ করে রাখতে পারবে ততক্ষণ ফরাসীদের উদ্দেশ্য সফল হবে না, তাদের সব চেষ্টা, সব ক্ষয়-ক্ষতি বিফলে যাবে। কিন্তু ফরাসীরা সে চেষ্টা করল না। অনেক ইতিহাসকার বলে থাকেন, নেপোলিয়ন যদি শুধু তার "ওল্ড গার্ডস্" কে কাজে লাগাত তাহলেই সে যুদ্ধ

জয় করতে পারত। কিন্তু নেপোলিয়ন তার "গার্ডস"কে ব্যবহার করলে কি হত সেকথা বলা আর হেমন্তকালটা বসন্ত কাল হলে কি হত সেকথা বলা তো একই ব্যাপার। কিন্তু তা হয় নি; ইচ্ছা ছিল না বলে যে নেপোলিয়ন তার "গার্ডস্"কে যুদ্ধে নামায় নি তা তো নয়, আসলে সেটা করা যায় নি। ফরাসীবাহিনীর সব সেনাপতি, কর্মচারি ও সৈনিকরাই জানত যে তা করা যাবে না, কারণ সৈন্যদের ভগ্নমনোবলই তা করতে দিত না।

নিজের শক্তিমান বাহুটা অক্ষম, পঙ্গু হয়ে যাওয়ার দুঃস্বপ্ন যে শুধু নেপোলিয়নই দেখেছিল তা নয়, যে শত্রুপক্ষ অর্ধেক সৈন্য হারাবার পরেও যুদ্ধের একেবারে শেষ লগ্নেও তার সূচনাকালের মতই একই ভয়াবহ মূর্তিতে নিজ ঘাঁটিতে দাঁড়িয়ে আছে, তার নিজের বাহিনীর সব সেনাপতি ও সৈনিকের মনেও পূর্বেকার সব যুদ্ধের অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও সেই একই আতংকের অনুভূতি বাসা বেঁধে ছিল। আক্রমণকারী ফরাসী বাহিনীর নৈতিক শক্তি তখন ফুরিয়ে গেছে। বরদিনোর রণক্ষেত্রে রুশবাহিনী সেই জয়লাভ করে নি যার নাম একটি যষ্ঠিখণ্ডের মাথায় বাঁধা পতাকা নামক কতকগুলো বস্তুকে দখল করা এবং যে মাটির উপর সৈন্যরা দাঁড়িয়ে ছিল এবং এখনও দাঁড়িয়ে আছে তাকে দখল করা; কিন্তু যে নৈতিক জয়লাভের ফলে শত্রুপক্ষের মনে এই দৃঢ় ধারণা জন্মে যে প্রতিপক্ষ নৈতিক শক্তিতে তার চাইতে অধিক বলীয়ান এবং সে নিজে অনেক বেশী অক্ষম সেই নৈতিক জয় রুশদের করায়ত্ত হয়েছে। আক্রমণের মুখে মারাত্মকভাবে আহত একটা ক্রুদ্ধ জন্তুর মতই ফরাসী আক্রমণকারীরা তখন বুঝতে পেরেছে যে ধ্বংস অনিবার্য হলেও এখন আর থামা চলবে না; রুশবাহিনীর অবস্থাও তথৈবচ; অর্ধেক সৈন্য হারিয়ে তাদেরও আর পিছু হটা চলে না। ফরাসীবাহিনী যে গতিবেগ সঞ্চয় করেছে তার প্রেরণাতেই তারা এখনও মস্কোর দিকে এগিয়ে যেতে পারে, কিন্তু সেখানে পৌছে রুশদের পক্ষ থেকে কোনরকম প্রচেষ্টা ছাড়াই তাদের মরতে হবে বরদিনো যুদ্ধের মারাত্মক ক্ষতস্থান থেকে রক্তক্ষরণের ফলে। তাই বরদিনো যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ নেপোলিয়ন অর্থহীনভাবে মস্কো থেকে পালিয়ে গেল, স্মোলেন্স্ক রোড ধরে পশ্চাদপসরণ করল, তার পাঁচ লক্ষ সৈন্য ধ্বংস হয়ে গেল, নেপোলিয়নশাসিত ফ্রান্সের পতন হল; সর্বপ্রথম বরদিনোতেই অধিকতর মনোবলসম্পন্ন একটি প্রতিপক্ষের হাত তার উপর চেপে বসল।

॥ দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত ॥

সংগ্রাম ও শান্তি

তৃতীয় খণ্ড

একাদশপর্ব

অধ্যায়—১

গতির পরিপূর্ণ ধারাবাহিকতা মানুষের পক্ষে বোধগম্য নয়। গতির যেকোন নিয়ম মানুষের কাছে তখনই বোধগম্য হয়ে ওঠে যখন গতির যে-কোন একটা নির্বাচিত অংশকে বেছে নিয়ে সেটাকে সে জানতে চেষ্টা করে। প্রাচীন মানুষদের একটা সুপরিচিত ধাঁধা প্রচলিত আছে যে, একটা কচ্ছপ অপেক্ষা দশ গুণ দ্রুতগতিতে ছুটতে পারা সত্ত্বেও আকিলিস কখনও সেই কচ্ছপটাকে অনুসরণ করে তাকে ধরে ফেলতে পারবে না। আকিলিস যতক্ষণে তার ও কচ্ছপটার মাঝখানের ব্যবধানটাকে পার হবে ততক্ষণে কচ্ছপটা আরও দশ ভাগের একভাগ দূরত্ব এগিয়ে যাবে: আকিলিস যতক্ষণে সেই দশম ভাগটি পার হবে ততক্ষণে কচ্ছপটা এগিয়ে যাবে আরও একশ ভাগের এক ভাগ, এবং এইভাবে অনন্তকাল ধরেই ব্যবধানটা থেকেই যাবে। প্রাচীনকালের মানুষদের কাছে এ সমস্যাটা ছিল সমাধানের অতীত। আকিলিস যে কোন দিন কচ্ছপটাকে ধরতে পারবে না এই অবাস্তব সিদ্ধান্তের কারণটা নিম্নরূপ: গতিকে ইচ্ছাকৃতভাবে কতকগুলি খণ্ড খণ্ড অংশে ভাগ করে দেখা হত, অথচ আকিলিস ও কচ্ছপ দুজনের গতিই আসলে ধারাবাহিক ও নিরবচ্ছিন্ন।

গতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশকে নিয়ে আমরা সমস্যার একটা সমাধানের কাছাকাছি যেতে পারি মাত্র, কখনও সেখানে পৌঁছতে পারি না। যখন আমরা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রতমের ধারণা, একদশমাংশের সমানুপাতিক জ্যামিতিক হ্রাস-বৃদ্ধির ধারণা, এবং অনন্ত পর্যন্ত সেই হ্রাস-বৃদ্ধির যোগফলের ধারণা করতে পারব তখনই এ সমস্যার সমাধানও আমরা পেয়ে যাব।

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রতমকে নিয়ে আলোচনার কৌশল অর্জন করার ফলে গণিত-শাস্ত্রের একটি আধুনিক শাখা এখন গতিসংক্রান্ত এমন সব জটিল সমস্যার সমাধান করতে পারে যাকে একদিন সমাধানের অতীত বলে মনে করা হত।

প্রাচীনকালে অজ্ঞাত গণিতশাস্ত্রের এই আধুনিক শাখা গতিসংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনার সময় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রতমের ধারণাকে স্বীকার করে, সমর্থন করে গতির পরিপূর্ণ ধারাবাহিকতাকে এবং তার ফলে ধারাবাহিক গতির আলোচনা না করে গতির স্বতন্ত্র অংশ নিয়ে আলোচনা করার দরুণ যে অনিবার্য ভুলকে মানুষ এড়িয়ে চলতে পারে না তাকে সংশোধন করতে সক্ষম হয়েছে।

ঐতিহাসিক অগ্রগতির নিয়মকে খুঁজতে গিয়েও সেই একই ব্যাপার ঘটে। অসংখ্য মানুষের ইচ্ছা থেকে উদ্ভুত মানবতার গতিপথও ধারাবাহিক ও নিরবচ্ছিন্ন।

এই ধারাবাহিক অগ্রগতির নিয়মকে জানাই ইতিহাসের লক্ষ্য। সকল মানুষের ইচ্ছার যোগফল থেকে উদ্ভুত সেইসব নিয়মকে জানবার চেষ্টায় মানুষের মন কতকগুলি ইচ্ছাকৃত, বিচ্ছিন্ন একককে ধরে নেয়। ইতিহাসের প্রথম পদ্ধতিই হল ধারাবাহিক ঘটনাবলী থেকে একটি নির্বাচিত অংশকে বেছে নিয়ে অন্য ঘটনা থেকে আলাদা করে তাকে বিচার করা, যদিও ঘটনার সূচনা বলে কিছু নেই, থাকতে পারে না, কারণ একটা ঘটনা নিরবিচ্ছিন্নভাবে অপর একটি ঘটনা থেকেই প্রবাহিত হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি হল কোন একজন মানুষের—রাজা অথবা সেনাপতির—কার্যাবলীকে বহু মানুষের ইচ্ছার যোগফলের সমান বলে বিবেচনা করা; অথচ যেকোন একটি ঐতিহাসিক ব্যক্তির কাজের ভিতর দিয়ে বহু মানুষের ইচ্ছার যোগফল কখনও প্রকাশিত হয় না।

সত্যের কাছাকাছি পৌঁছবার চেষ্টায় ইতিহাস-বিজ্ঞান ক্রমাগত ছোট ছোট একককে নিয়ে পরীক্ষা করে। কিন্তু সে এককটি যত ছোটই হোক, আমরা মনে করি যে একটি একককে অন্যগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিচার করা, অথবা কোন ঘটনার সূচনা আছে বলে ধরে নেওয়া, অথবা এ কথা বলা যেকোন একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপের ভিতর দিয়ে বহু মানুষের ইচ্ছা প্রকাশিত হয়—আসলে এসবই মিথ্যা।

ইতিহাসের যেকোন সিদ্ধান্তকে ধুলায় লুটিয়ে দিতে কোনরকম কঠিন বিচার-বিবেচনার প্রয়োজন হয় না। যেকোন একটি বড় একককে বেছে নিয়ে আলোচনা করাই যথেষ্ট।

পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রতম একককে গ্রহণ করলে এবং তাদের সংগঠিত করে তোলার কৌশলটি অধিগত করতে পারলেই আমার ইতিহাসের নিয়মে পৌঁছতে পারব বলে আশা করতে পারি।

ইওরোপে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পনেরটি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষের এক অসাধারণ আন্দোলন নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। মানুষ তাদের চিরাচরিত

কাজকর্ম ছেড়ে দিয়েছে, ইওরোপের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে গেছে, পরস্পরকে লুঠ করেছে ও হত্যা করেছে, কখনও জয়লাভ করেছে আবার নিরাশায় ডুবে গেছে, আর বেশ কয়েক বছর ধরে জীবনের গতিটাই পাল্টে গেছে, একটা ব্যাপক গতি কখনও দ্রুত হয়েছে, কখনও হয়েছে মন্থর। এই আন্দোলনের কারণ কি, কোন্ নিয়মে এটা পরিচালিত হয়েছে? সে প্রশ্ন জেগেছে মানুষের মনে।

এ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে ইতিহাসকাররা আমাদের সামনে তুলে ধরেছে প্যারিস নগরীর একটি ভবনের কয়েক ডজন মানুষের বাণী ও কার্যাবলী, আর সেই বাণী ও কার্যাবলীর নাম দিয়েছে "বিপ্লব"; তারপর তারা আমাদের দিয়েছে স্বয়ং নেপোলিয়নের এবং তার সমর্থক ও বিরোধী কিছু মানুষের বিস্তারিত জীবনী; আর অন্যদের উপর এইসব মানুষের প্রভাবের কথা শুনিয়ে আমাদের বলেছে: এই কারণেই এই আন্দোলন ঘটেছে, এবং এগুলিই তার কারণ।

কিন্তু মানুষের মন শুধু যে এ ব্যাখ্যাকে বিশ্বাস করতে চায় নি তাই নয়, বরং পরিষ্কার বলে দিয়েছে যে এ ব্যাখ্যা ভ্রান্ত, কারণ এখানে একটি দুর্বলতর ঘটনাকে একটি অধিকতর শক্তিশালী ঘটনার কারণ বলে ধরা হয়েছে। বহু মানুষের ইচ্ছা থেকেই জন্ম নিয়েছে নেপোলিয়ন ও বিপ্লব, আর সেই মানবিক ইচ্ছার যোগফলই প্রথমে তাদের সহ্য করেছে এবং পরে তাদের ধ্বংস করেছে।

ইতিহাসে লেখা হয়েছে, "যখনই কোন বিজয়-অভিযান হয়েছে, তখনই দেখা দিয়েছে দিগ্বিজয়ী; যখনই কোন রাজ্যে কোন বিপ্লব ঘটেছে, তখনই মহাপুরুষরা দেখা দিয়েছে।" কিন্তু মানুষের বিচার-বুদ্ধি বলে, একথা ঠিক যে যখনই দিগ্বিজয়ীরা দেখা দেয় তখনই যুদ্ধ হয়ে থাকে, কিন্তু তাতে একথা প্রমাণ হয় না যে বিজয়ী বীররাই যুদ্ধ ঘটায় এবং কোন একটি মানুষের ব্যক্তিগত ক্রিয়াকলাপের মধ্যে যুদ্ধের নিয়মগুলি খুঁজে পাওয়া যাবে। আমি যখনই আমার ঘড়ির দিকে তাকাই আর তার কাঁটাটা থাকে দশটার ঘরে, তখনই পার্শ্ববর্তী গির্জার ঘণ্টা শুনতে পাই; কিন্তু তার থেকে আমি এটা ধরে নিতে পারি না যে যেহেতু ঘড়ির কাঁটা দশটার ঘরে গেলেই ঘণ্টাটা বাজতে শুরু করে, সেই হেতু ঘড়ির কাঁটার অবস্থানের ফলেই ঘণ্টাটা বাজে।

যখনই একটা যন্ত্র-যানকে চলতে দেখি তখনই একটা হুইস্‌ল্ শুনতে পাই এবং দেখতে পাই যে ভাল্‌ভগুলো খুলছে আর চাকাগুলি ঘুরছে; কিন্তু তাই বলে আমি অনুমান করতে পারি না যে হুইস্‌লের শব্দ ও চাকার ঘূর্ণনই এঞ্জিনটার চলার কারণ।

চাষীরা বলে থাকে, ওক-গাছে ফুল ফোটে বলেই শেষ বসন্তে ঠাণ্ডা বাতাস বয়, আর বাস্তবক্ষেত্রেও ওক গাছে ফুল ফুটতে শুরু করলেই বসন্ত-

কালের ঠাণ্ডা বাতাস বইতে থাকে। কিন্তু ওককুঁড়িরা পাপড়ি মেললেই কেন যে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করে তা না জানলেও আমি কিন্তু চাষীদের সঙ্গে একমত নই যে ওক-কুঁড়িদের ফুটে ওঠাই ঠাণ্ডা বাতাসের কারণ। জীবনের অন্য সব ঘটনার মতই সেখানেও আমি দেখতে পাই ঘটনার আকস্মিক যোগাযোগমাত্র। ঘড়ির কাঁটা, ইঞ্জিনের ভাল্‌ভ্‌ ও চাকা, এবং ওক গাছের দিকে যত সতর্কতার সঙ্গেই দৃষ্টিপাত করি না কেন, কোন-মতেই কিন্তু ঘণ্টা বাজবার, ইঞ্জিন চলবার ও বসন্ত-বাতাস বইবার কারণকে আবিষ্কার করতে পারব না। সেটা করতে হলে আমার দৃষ্টিকোণকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে আমাকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে অংকুরের, ঘণ্টার ও বাতাসের গতির নিয়মকে। ইতিহাসকেও তাই করতে হবে। আর সেইদিকেই প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

ইতিহাসের নিয়মকে জানতে হলে আমাদের পর্যবেক্ষণের বিষয়বস্তুকে সম্পূর্ণ পাল্টাতে হবে, রাজা, মন্ত্রী ও সেনাপতিদের ছেড়ে আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে হবে সেইসব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ের দিকে যা জনসাধারণকে অনু-প্রাণিত করে। এই পথে ইতিহাসের নিয়মকে বুঝবার পথে মানুষ কতদূর অগ্রসর হতে পারবে তা কেউ বলতে পারে না; কিন্তু একথা ঠিক যে একমাত্র এই পথেই ইতিহাসের নিয়ম আবিষ্কারের সম্ভাবনা রয়েছে; এবং রাজা, সেনাপতি ও মন্ত্রীদের কার্য-কলাপের বর্ণনায় এবং সে সম্পর্কে তাদের ভাবনা-চিন্তার কথা বলতে ইতিহাসকাররা যতটা মানসিক প্রচেষ্টা নিয়োগ করেছে তার লক্ষ ভাগের এক ভাগও এইদিকে প্রয়োগ করা হয় নি।

অধ্যায়—২

ইওরোপের একডজন দেশের সৈন্যদল রাশিয়াকে লক্ষ্য করে ছুটে এসেছে। তারা স্মোলেন্‌স্ক্‌-এ পৌঁছবার আগে পর্যন্ত এবং পরে স্মোলেন্‌স্ক্‌ থেকে বরদিনো পর্যন্ত রুশ বাহিনী ও জনগণ ওরকম সংঘর্ষকে এড়িয়েই চলছে। ফরাসী বাহিনী তাদের লক্ষ্য মস্কোর দিকে এগিয়ে চলেছে, একটা পতনশীল বস্তু যত পৃথিবীর দিকে নেমে আসে ততই তার গতিবেগ যেরকম বেড়ে যায়, সেই রকম ফরাসী বাহিনীও যতই তাদের লক্ষ্যস্থলের দিকে এগিয়েছে ততই তাদের গতিবেগ বেড়েছে। পিছনে পড়ে আছে ক্ষুধায় কাতর একটি শত্রু-দেশের হাজার ভার্স্ট জমি, সম্মুখে লক্ষ্যস্থল থেকে তাদের দূরে সরিয়ে রেখেছে মাত্র কয়েক ভার্স্ট জমি। নেপোলিয়নের সেনাদলের প্রতিটি সৈনিক সেকথা উপলব্ধি করছে, আর নিজের আবেগেই অভিযান এগিয়ে চলেছে।

রুশবাহিনী যত পিছিয়ে যাচ্ছে, শত্রুপক্ষের মনে ঘৃণার আগুন ততই তীব্র হিংস্রতায় জলে উঠছে; এরা যত পিছিয়ে যাচ্ছে, ওদের সৈন্যসংখ্যা

তত বাড়ছে তত বেশী সংহত হচ্ছে। সংঘর্ষ বাঁধল বরদিনোতে। কোন দলই ছত্রভঙ্গ হয় নি, কিন্তু অধিকতর গতিবেগসমন্বিত কোন গোলকের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে অপর গোলকটি যেরকম অনিবার্যভাবে ছিটকে ফিরে আসে, ঠিক তেমনিভাবেই সংঘর্ষের সঙ্গে সঙ্গেই রুশবাহিনী পশ্চাদপসরণ করল; আর ওদিকে সংঘর্ষের ফলে সব শক্তি নিঃশেষিত হওয়া সত্ত্বেও সেই গতিবেগের টানেই অভিযানের গোলকটি ও সেই একই অনিবার্যতায় বেশ কিছুদুর এগিয়ে গেল।

রুশরা মস্কো থেকেও আশি মাইল পিছিয়ে গেল, আর ফরাসীরা মস্কো পৌছে সেখানেই থেমে গেল। তারপর পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে একটি যুদ্ধও হয় নি। ফরাসীরা একটুও নড়ল না। মারাত্মক আহত রক্তাক্ত জন্তু যে রকম ক্ষতস্থান চাটতে থাকে, ঠিক সেইভাবে তারা পাঁচটি সপ্তাহ মস্কোতে চুপচাপ কাটিয়ে দিল; তারপর কোন নতুন কারণ ছাড়াই হঠাৎ পালাতে শুরু করল: কালুগা রোড পর্যন্ত ছুটে গেল এবং কোনরকম গুরুতর যুদ্ধ ছাড়াই অধিকতর গুরুতর গতিতে ফিরে গেল স্মোলেন্‌স্ক্‌-এ, স্মোলেন্‌স্ক্‌ ছাড়িয়ে, বেরেজিনা ছাড়িয়ে, ভিল্‌না ছাড়িয়ে, আরও অনেক দূরে।

২৬শে অগস্ট সন্ধ্যায় কুতুজভ ও রুশবাহিনী ঠিক ঠিক বুঝতে পারল যে বরদিনোর যুদ্ধে তাদের জয় হয়েছে। সেই সংবাদই কুতুজভ সম্রাটকে পাঠাল। শত্রুকে একেবারে খতম করতে সে নতুন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে সেনাদলকে নির্দেশ দিল; কাউকে ঠকাবার জন্য সে একাজ করে নি, কিন্তু এই যুদ্ধে যোগদানকারী অন্য সকলের মতই সেও জানত যে শত্রুপক্ষ পরাস্ত হয়েছে।

কিন্তু সেদিন সারা সন্ধ্যায় এবং পরের দিন একের পর এক অশ্রুতপূর্ব ক্ষতির সংবাদ আসতে লাগল; খবর এল যে অর্ধেক সৈন্য নষ্ট হয়েছে; কাজেই নতুন করে যুদ্ধ করা একেবারেই অসম্ভব।

যতক্ষণ পর্যন্ত না আরও সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে, আহতদের একজায়গায় করা হচ্ছে, নতুন করে রসদ সরবরাহ করা হচ্ছে, নিহতদের সংখ্যানিরূপিত হচ্ছে, নিহত অফিসারদের জায়গায় নতুন অফিসার নিয়োগ করা হচ্ছে, এবং সৈনিকদের উপযুক্ত খাদ্য ও ঘুমের ব্যবস্থা হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করা অসম্ভব। এদিকে যুদ্ধের ঠিক পরদিন সকালেই ফরাসীবাহিনী নিজের গতিবেগের তাগিদেই রুশবাহিনীর দিকে এগিয়ে গেল, কুতুজভের মনেও আক্রমণের ইচ্ছা জাগল, আর গোটা বাহিনীরও সেই একই ইচ্ছা। কিন্তু একটা আক্রমণের জন্য ইচ্ছাটাই তো যথেষ্ট নয়, আক্রমণ করতে হলে তার সম্ভাবনাটা অন্তত থাকা চাই, কিন্তু সেই সম্ভাবনা তখন ছিল না। একটি দিনের পশ্চাদপসরণ স্থগিত রাখা তখন অসম্ভব, ঠিক সেই একইভাবে তার পরেরদিন এবং তৃতীয় দিনও পশ্চাদপসরণ স্থগিত রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ল, এবং শেষ পর্যন্ত ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে সেনাবাহিনী যখন মস্কোর

কাছাকাছি পৌঁছল, তখনও সেনাদলের সর্বস্তরের মনোবল যতই শক্ত থাকুক ঘটনার চাপে তাকে মস্কো ছাড়িয়ে সরে যেতে হল। সেনাদল আরও একটা দিন পিছু হটে মস্কোকে শত্রুর হাতে ফেলে সরে গেল।

যে সমস্ত লোক ভাবতে অভ্যস্ত যে অভিযান ও যুদ্ধের নক্সা সেনাপতিরাই তৈরি করে থাকে—যেমন পড়ার ঘরে একটা মানচিত্র সামনে নিয়ে আমরাও কল্পনা করতে পারি একজন সেনাপতি এ-যুদ্ধ অথবা সে-যুদ্ধের কি ব্যবস্থা করবে—তাদের সামনে কিন্তু এই প্রশ্নগুলি দেখা দেয়: পশ্চাদপসরণের কালে কুতুজভ এটা বা ওটা করল না কেন? ফিলিতে পৌঁছবার আগেই কেন সে একটা ঘাঁটি স্থাপন করল না? মস্কোকে ফেলে রেখে কেন সে সঙ্গে সঙ্গেই কালুগা রোড ধরে হটে গেল না? ইত্যাদি। সেরকম ভাবতে অভ্যস্ত লোকরা ভুলে যায়, অথবা জানেই না, যে একজন প্রধান সেনাপতির কর্মধারা কতকগুলি অনিবার্য পরিস্থিতির দ্বারা সীমিত। আমরা মনে করি যে কোন একটি বিশেষ ঘটনা থেকেই একজন প্রধান সেনাপতির কাজ শুরু হয়, কিন্তু সেটা ঠিক নয়। প্রধান সেনাপতিকে সবসময়ই থাকতে হয় নিয়ত পরিবর্তনশীল একটি ঘটনাস্রোতের মাঝখানে, কাজেই কোন একটি মুহূর্তের ঘটনা পরিপূর্ণ তাৎপর্যকে সে ধরতে পারে না। প্রতিমুহূর্তে আমাদের অগোচরে ঘটনাটির রূপ বদলায়, আর সেই পরিবর্তনশীল ঘটনাস্রোতের মাঝখানে প্রতিটি মুহূর্তে প্রধান সেনাপতিকে কাটাতে হয় ষড়যন্ত্র, দুশ্চিন্তা, জরুরী অবস্থা, কর্তৃপক্ষ, পরিকল্পনা, ভীতি-প্রদর্শন ও প্রবঞ্চনার এক জটিল আবর্তের মধ্যে; পরস্পরবিরোধী অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর তাকে অনবরত দিতে হয়।

সামরিক পণ্ডিতরা বলে থাকেন, ফিলি পৌঁছবার আগেই তার সেনাদলকে কালুগা রোডে সরিয়ে নেওয়াই কুতুজভের উচিত ছিল; কেউ নাকি সেরকম প্রস্তাবও তার কাছে করেছিল। কিন্তু একজন প্রধান সেনাপতির কাছে তো একটি মাত্র প্রস্তাব থাকে না, থাকে ডজনখানেক প্রস্তাব; বিশেষ করে কোন সংকট-কালে তো কথাই নেই। আবার সেসব প্রস্তাবও সমর-কৌশলের দিক থেকে পরস্পরবিরোধীই হয়ে থাকে।

মনে হতে পারে যে সেই সব প্রস্তাবের ভিতর থেকে একটি বেছে নেওয়াই প্রধান সেনাপতির কাজ। কিন্তু তাও সে করতে পারে না। ঘটনা ও সময় তো বসে থাকে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ২৮শে তারিখে তাকে বলা হল যে কালুগা রোড পার হয়ে যাওয়া হোক, কিন্তু ঠিক সেইমুহূর্তে একজন অ্যাডজুটাণ্ট মিলরাদভিচ থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে জানতে চাইল, সে ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে না পিছু হটে যাবে। সেইমুহূর্তেই তাকে একটা জবাব দিতে হবে। আর পশ্চাদপসরণের নির্দেশ দেওয়া মানেই কালুগা রোড পার হয়ে সরে যাওয়া। সেই অ্যাডজুটাণ্টের পরেই রসদ-সরবরাহ-অধ্যক্ষ এসে শুধাল,

খাদ্য-ভাণ্ডারকেও সঙ্গে নেওয়া হবে কিনা ; হাসপাতালের প্রধান এসে জানতে চাইল, আহতদের কোথায় রাখা হবে ; সংবাদবাহক পিতার্সবুর্গ থেকে সম্রাটের যে চিঠি নিয়ে এল তাতে দেখা গেল মস্কো ছেড়ে যাওয়া অসম্ভব ; প্রধান সেনাপতির যে প্রতিদ্বন্দ্বীটি সব সময় তাকে প্যাঁচে ফেলতে চেষ্টা করছে (মাত্র একটি নয়, সেরকম লোক বেশ কয়েকজন আছে) সে এমন একটা নতুন পরিকল্পনা এনে হাজির করল যেটা কালুগা রোডের দিকে যাবার সম্পূর্ণ বিপরীত ; তাছাড়া নিজের শক্তি বজায় রাখার জন্য প্রধান সেনাপতির নিজেরও তো আহার-নিদ্রার প্রয়োজন আছে। আছে আরও হরেক রকম ঝামেলা। একজন মাননীয় সেনাপতি এসে পুরস্কার-বিতরণের ব্যাপারে তাকে উপেক্ষা করা হয়েছে বলে নালিশ জানাল, জেলার অধিবাসীরা তাদের জন্য রক্ষা-ব্যবস্থার আবেদন করল, স্থানীয় অঞ্চল পরিদর্শন করে এসে জনৈক ইন্সপেক্টর যে প্রতিবেদন পেশ করল সেটা পূর্ববর্তী আর এক অফিসারের প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ বিপরীত ; আর পর্যবেক্ষণরত গুপ্তচর কয়েদি ও সেনাপতি এসে শত্রুপক্ষের সেনাদলের অবস্থানের ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ দাখিল করল। একজন প্রধান সেনাপতির কাজের সমালোচনা করার সময় সাধারণ মানুষ এইসব অনিবার্য পরিস্থিতিকে ভুল বোঝে, অথবা ভুলেই যায়। তাই তারা বলতে পারে যে ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে প্রধান সেনাপতি স্বাধীনভাবেই স্থির করতে পারত মস্কো ত্যাগ করে যাওয়া হবে, না তাকে রক্ষা করা হবে। অথচ মস্কো থেকে চার মাইলেরও কম দূরত্বে অবস্থিত রুশ বাহিনীর সামনে সে-রকম কোন প্রশ্নই ছিল না। সে প্রশ্নের মীমাংসা হল কখন? দ্রিসাতে, স্মোলেন্স্ক-এ, সব চাইতে স্পষ্টভাবে ২৪শে অগস্ট শেভার্দিনোতে আর ২৪শে তারিখে বরদিনোতে এবং বরদিনো থেকে ফিলিতে পশ্চাদপসরণের কালে প্রতিটি দিনে, প্রতিটি ঘণ্টায় ও প্রতিটি মিনিটে।

অধ্যায়—৩

কুতুজভ এর্মোলভকে পাঠিয়েছিল ঘাঁটি পরিদর্শনে ; সে যখন ফিরে এসে ফিল্ড-মার্শালকে জানাল যে মস্কোর আগে সেখানে যুদ্ধ করা অসম্ভব, তাদের পশ্চাদপসরণ করতেই হবে, তখন কুতুজভ নীরবে তার দিকে তাকাল।

"তোমার হাতটা দাও তো," বলে তার নাড়ি দেখে কুতুজভ বলল, "তুমি তো সুস্থ নও হে। কি বলছ ভাল করে ভেবে দেখ।"

বিনা যুদ্ধে মস্কো থেকে পিছু হটে যাবার সম্ভাবনাকে কুতুজভ মেনে নিতে পারল না।

মস্কোর দর্গমিলভ ফটক থেকে চার মাইল দূরবর্তী পক্লোনি পাহাড়ের উপর কুতুজভ গাড়ি থেকে নেমে রাস্তার পাশে একটা বেঞ্চিতে বসে পড়ল।

সেনাপতিদের এক বড় দল তাকে ঘিরে ধরল; মস্কো থেকে এসে কাউণ্ট রস্তপ্‌চিন তাদের সঙ্গে যোগ দিল। দলে দলে ভাগ হয়ে তারা বর্তমান পরিস্থিতির সুবিধা ও অসুবিধা, সেনাদলের অবস্থা, বিভিন্ন পরিকল্পনা, মস্কোর অবস্থা, এবং সাধারণভাবে যুদ্ধসংক্রান্ত সমস্যাদি নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। যদিও এই উদ্দেশ্যে তাদের ডাকা হয় নি, যদিও কোন সভাও ডাকা হয় নি, তবু তাদের সকলেরই এটাকে একটা সমর-পরিষদ বলেই মনে হল। সবকিছু নিয়েই প্রকাশ্য আলোচনা চলল। কেউ কোন ব্যক্তিগত সংবাদ দিলে বা চাইলে তা ফিস্‌ ফিস্‌ করে শেষ করেই আবার সাধারণ আলোচনায় ফিরে গেল। কারও মুখে তামাশার কথা নেই, উচ্চহাসি নেই, এমন কি মৃদু হাসিও নেই। অবস্থানুযায়ী সকলেই বেশ গম্ভীর। আলোচনার সময় বিভিন্ন দল প্রধান সেনাপতির বেঞ্চিটার কাছাকাছিই রইল, যাতে সব কথা সে শুনতে পায়। প্রধান সেনাপতিও মন দিয়ে তাদের কথা শুনতে লাগল, মাঝে মাঝে তাদের কথাগুলি আবার বলতে বলল, কিন্তু নিজে কোন আলোচনায় অংশ নিল না, অথবা কোন মতামতও প্রকাশ করল না।····কুতুজভের মুখের ভাব ক্রমেই গম্ভীর ও বিষণ্ণ হয়ে উঠতে লাগল। এইসব আলোচনা থেকে একটা কথাই তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল: একেবারে আক্ষরিক অর্থেই মস্কো রক্ষা করা অসম্ভব; অর্থাৎ কোন বুদ্ধিহীন সেনাপতি যদি যুদ্ধের হুকুম দেয় তাহলে গোলমালের সৃষ্টি হবে, কিন্তু যুদ্ধ হবে না। যুদ্ধে জয়লাভ করা অসম্ভব জেনেও সেনাপতি কেমন করে তাদের সৈন্যদের যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যাবে? যদিও বেনিংসেন তখনও মস্কো রক্ষার পক্ষপাতী এবং অন্যরা তাই নিয়ে আলোচনা করছে, তবু সমস্যাটা বিরোধ ও ষড়যন্ত্রের একটা ওজুহাত ছাড়া আর কিছুই নয়। কুতুজভ সেটা ভালই জানে।

বেনিংসেন রুশ দেশপ্রেমের প্রকাশ হিসাবে তখনও মস্কো রক্ষার জন্য পীড়াপীড়ি করছে। তার উদ্দেশ্যটা কিন্তু কুতুজভের কাছে দিনের আলোর মত পরিষ্কার: প্রতিরোধব্যবস্থা যদি ব্যর্থ হয় তাহলে বিনা যুদ্ধে সেনাবাহিনীকে স্প্যারো হিলস্‌ পর্যন্ত নিয়ে আসার সব দোষ কুতুজভের মাথায় চাপিয়ে দেবে; যদি সফল হয় তাহলে কৃতিত্বটা সে নিজেই দাবী করবে; আর যদি যুদ্ধটা একেবারেই না হয় তাহলে মস্কো ছেড়ে যাবার অপরাধ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখবে। কিন্তু সে ষড়যন্ত্রের কথা এখন বুড়ো মানুষটির মনে স্থান পেল না। একটিমাত্র ভয়ংকর প্রশ্নই তার মনকে আচ্ছন্ন করে আছে, কিন্তু কারও কাছ থেকেই সে প্রশ্নের জবাব সে শুনতে পায় নি। তার প্রশ্নটি হল: "সত্যি কি আমিই নেপোলিয়নকে মস্কো আসতে দিয়েছি, কিন্তু সে কখন? কখন সে সিদ্ধান্ত নিলাম? গতকাল যখন প্লাতভকে পিছু হটবার হুকুম দিয়েছিলাম তখন কি? অথবা আগের দিন সন্ধ্যায় যখন বেনিংসেনকে হুকুম জারি করতে বলে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তখন? নাকি আরও

আগে? …এই ভয়ংকর ব্যাপারটা কখন স্থির হয়েছিল। মস্কো ছেড়ে চলে যেতেই হবে। সেনাবাহিনীকে পিছু হঠতে হবেই। আর সে হুকুম দিতেই হবে।” কিন্তু এই ভয়ংকর হুকুম দেওয়া তো সেনাবাহিনীর অধিনায়কত্ব থেকে পদত্যাগ করারই সামিল। কিন্তু তাতো করা যায় না। তার দৃঢ় বিশ্বাস একমাত্র সেই পারবে রাশিয়াকে রক্ষা করতে, আর তাই সম্রাটের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং জনগণের ইচ্ছায় তাকে প্রধান সেনাপতি মনোনীত করা হয়েছে। তার দৃঢ় বিশ্বাস, এই কঠিন পরিস্থিতিতে একমাত্র সেই পারে সেনাবাহিনীকে পরিচালনার দায়িত্ব নিতে এবং সারা বিশ্বে একমাত্র সেই পারে নির্ভয়ে অপরাজেয় নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে; আর তাই সেই হুকুমটা জারি করার কথা ভাবতেই সে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু একটা কিছু তো করতেই হবে, আর তার চারদিকের আলোচনা যেরকম নিরঙ্কুশ হয়ে উঠছে তাতে এখনই এসব থামাতে হবে।

কয়েকজন জাঁদরেল সেনাপতিকে সে কাছে ডাকল।

“ভাল হোক মন্দ হোক আমার মাথাটাকে নিজের উপরেই নির্ভর করতে হবে।” বেঞ্চি থেকে উঠে এই কথা বলে সে ফিলির দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল; সেখানেই তার গাড়ি অপেক্ষা করছে।

অধ্যায়—৪

আন্‌দ্রু সাভস্তিয়ানভ-এর কুঁড়ে ঘরের একটা অপেক্ষাকৃত ভাল ও বড় অংশে দুটোর সময় সমর-পরিষদের সভা বসল। বস্তু বড় চাষী-পরিবারের পুরুষ, নারী ও বাচ্চারা বারান্দার ওপারে পিছনের ঘরটাতে ভিড় করল। শুধু আন্‌দ্রুর ছয় বছরের নাতনি—প্রশান্ত মহামহিম নিজেই যার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়েছে এবং চা খাবার সময় যাকে একটুকরো চিনিও দিয়েছে—সেই মলাশা রইল বড় ঘরটার ইঁটের উনুনের উপর। উনুনটার উপর থেকেই মলাশা সলজ্জ আনন্দের সঙ্গে সেনাপতিদের মুখ, ইউনিফর্ম ও নানারকম সম্মান-ভূষণের দিকে তাকাতে লাগল; তারা সকলেই ঘরের কোণে দেবমূর্তির নীচে চওড়া বেঞ্চিগুলোতে বসেছে। আর “বুড়ো দাদু” স্বয়ং—মলাশা মনে মনে কুতুজভকে ওই নামেই ডাকে—আলাদা হয়ে বসেছে উনুনের পিছনে অন্ধকারের মধ্যে। একটা ভাঁজ-করা হাতল-চেয়ারে সে একেবারে ডুবে বসেছে, অনবরত গলা ঝাড়ছে, আর বোতাম-খোলা কলারটা টানছে। যারা ঘরে ঢুকছে তারাই একে একে ফিল্ড-মার্শালের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে; সে কারও হাতটা চেপে ধরছে, আবার কারও দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ছে। তার অ্যাডজুটান্ট কেসারভ কুতুজভের সামনেকার জানালার পর্দাটা সরিয়ে দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু সে রেগে হাতটা নাড়াতেই কেসারভ বুঝতে পারল প্রশান্ত মহামহিম চান যে তার মুখটা দেখা যাক।

একে একে সভায় হাজির হল এর্মোলভ, কেসারভ, ও তল্; সকলের সামনে বসেছে বার্কলে দ্য তলি। তার গলায় ঝুলছে সেণ্ট জর্জের ক্রস্; মুখটা ম্লান ও অসুস্থ; দু'দিন যাবৎ জ্বর হচ্ছে; এখানে শীতে কাঁপছে। তার পাশেই উভারভ ও ছোটখাট দখ্‌তুরভ। অপরদিকে বসে আছে কাউণ্ট অস্তারম্যানতলস্তয়; নিজের চিন্তায়ই মগ্ন। রায়েভ্‌স্কি একবার কুতুজভের দিকে একবার দরজার দিকে অধৈর্য হয়ে তাকাচ্ছে। কনভ্‌নিংসিন-এর একটা নরম ধূর্ত হাসি। তার চোখের দিকে তাকিয়ে ছোট্ট মলাশার মুখেও হাসি দেখা দিল।

সকলেই বেনিংসেনের জন্য অপেক্ষা করছে। ঘাঁটি পরিদর্শনের অজুহাতে সে আচ্ছা খানাটা শেষ করতে ব্যস্ত রয়েছে। চারটে থেকে ছ'টা পর্যন্ত সকলে তার জন্য অপেক্ষা করল; কোনরকম আলোচনা শুরু হল না।

বেনিংসেন কুড়ে ঘরে ঢুকলে তবে কুতুজভ তার কোণটা ছেড়ে টেবিলের কাছে এগিয়ে এল, কিন্তু পাছে মোমবাতির আলো মুখে পড়ে তাই বেশী কাছে এল না।

একটি প্রশ্ন দিয়েই বেনিংসেন পরিষদের সভা শুরু করল: "আমরা কি বিনা যুদ্ধে রাশিয়ার প্রাচীন ও পবিত্র রাজধানী ছেড়ে যাব, না কি তাকে রক্ষা করব?" অনেকক্ষণ সকলেই চুপচাপ। সকলেরই মুখ ভ্রূকুটিকুটিল; শুধু কুতুজভের ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ ও কাশির দমক সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছে। সকলের চোখই তার উপর নিবদ্ধ। মলাশাও "বুড়ো দাদু"র দিকে তাকাল।

বেনিংসেনের কথাগুলির ক্রুদ্ধ প্রতিধ্বনি করে হঠাৎ সে বলে উঠল, "রাশিয়ার প্রাচীন ও পবিত্র রাজধানী! আপনার অনুমতি নিয়ে আমি বলতে চাই ইয়োর এক্সেলেন্সি যে একজন রুশের কাছে এ প্রশ্নের কোন অর্থই নেই। (শরীরটাকে সে সামনের দিকে একটু ঝুঁকিয়ে দিল।) এ প্রশ্ন তোলাই যেতে পারে না, এটা অর্থহীন। যে প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনার জন্য এই ভদ্রলোকদের এখানে ডেকেছি সেটা সামরিক প্রশ্ন। রাশিয়াকে রক্ষা করার প্রশ্ন। বিনা যুদ্ধে মস্কো ছেড়ে দেওয়াই ভাল, না কি একটা যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে সেনাবাহিনী এবং মস্কো দুটোই হারাবার ঝুঁকি নেওয়া ভাল? সেই প্রশ্ন সম্পর্কে আমি আপনার অভিমত চাই।" কুতুজভ আবার চেয়ারে ডুবে গেল।

আলোচনা শুরু হল। বেনিংসেন তখন ভাবে নি যে খেলায় তার হার হয়েছে। ফিলিতে একটা আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ যে অসম্ভব বার্কলে ও অন্যান্য-দের এই অভিমত স্বীকার করে নিয়েও রুশ দেশপ্রেম ও মস্কো-প্রীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে সে প্রস্তাব করল, রাতারাতি সৈন্যদের ডান দিক থেকে বাঁ দিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হোক, আর পরদিন ফরাসীদের দক্ষিণ ব্যূহকে আক্রমণ করা হোক। দেখা দিল মত-বিরোধ; স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক যুক্তি দেখানো হল। সবকিছু দেখে শুনে মলাশা কিন্তু পরিষদ কথাটার একটা ভিন্ন

অর্থই বুঝল। তার মনে হল এটা যেন "বুড়ো দাদু" ও "লম্বাকোট" এর (অর্থাৎ বেনিংসেনের) মধ্যে একটা ব্যক্তিগত ঝগড়ামাত্র। কথা বলতে বলতে তারা পরস্পরের প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠছে; অবশ্য মনে মনে সে "বুড়ো দাদু"র পক্ষেই রইল।

কুতুজভ বলল, "ভদ্রজন, কাউণ্টের এই পরিকল্পনা আমি সমর্থন করতে পারি না। শত্রুপক্ষের খুব কাছাকাছি থেকে সৈন্য পরিচালনা করাটা সব-সময়ই বিপজ্জনক; সামরিক ইতিহাসে এই মতের সমর্থন মিলবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ····" দৃষ্টান্তের খোঁজে কুতুজভ একটু থেমে কিছু ভাবল; তারপর বেনিংসেনের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বলল, "হ্যাঁ হয়েছে; ফ্রিড্‌ল্যাণ্ডের যুদ্ধের কথাই ধরা যাক; কাউণ্টের নিশ্চয় স্মরণ আছে যে সে যুদ্ধটা···যে পুরোপুরি সফল হয় নি তার একমাত্র কারণ আমাদের সৈন্যকে নতুন করে সাজানো হয়েছিল শত্রুপক্ষের বড় বেশী নিকটে····"

তারপর ক্ষণিকের নীরবতা; কিন্তু সকলেরই মনে হল সে নীরবতা বড়ই দীর্ঘ।

আলোচনা নতুন করে শুরু হল, কিন্তু মাঝে মাঝেই থেমে গেল; সকলেই বুঝল যে আর বেশী কিছু বলার নেই।

একটা বিরতির সময় যেন কথা বলার জন্য প্রস্তুত হতেই কুতুজভ বড় করে একটা শ্বাস টানল। সকলে তার দিকে তাকাল।

"দেখুন ভদ্রজন, দেখছি যে ভাঙা বাসনপত্রের দাম আমাকেই দিতে হবে।" কথাটা বলে সে ধীরে ধীরে চেয়ার থেকে উঠে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। "ভদ্রজন, আপনাদের অভিমত শুনলাম। আপনারা কেউ কেউ আমার সঙ্গে একমত হবেন না। কিন্তু আমার সরকার ও আমার দেশ আমাকে যে কর্তৃত্ব দিয়েছে তার বলে আমি পশ্চাদপসরণের হুকুম দিলাম।"

একথার পরে যে গাম্ভীর্য ও নীরবতার সঙ্গে সেনাপতিরা সেখান থেকে সরে পড়তে লাগল তা দেখে মনে হল যেন একটা শোকযাত্রা শেষ হয়েছে।

মলাশা অনেকক্ষণ থেকেই রাতের খাবারের জন্য অপেক্ষা করছিল; উনুনের পিছন দিক দিয়ে সতর্কভাবে নেমে সেনাপতিদের পায়ের ফাঁক দিয়ে গলে সে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সেনাপতিদের বিদায় দিয়ে টেবিলের উপর কনুই দুটো রেখে কুতুজভ অনেকক্ষণ বসে রইল; তার মনে সেই একই ভয়ংকর চিন্তা: "কখন, কখন মস্কো ছেড়ে যাওয়াটা অনিবার্য হয়ে উঠল? এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটা কখন নেওয়া হল? এজন্য কে দোষী?"

অনেক রাতে অ্যাডজুটাণ্ট শ্নিদার এলে তাকে বলল, "আমি তো এটা আশা করি নি; এরকম যে ঘটবে তা তো ভাবি নি।"

"আপনার একটু বিশ্রাম নেওয়া উচিত প্রশান্ত মহামহিম," শ্নিদার বলল।

"কিন্তু না! তুর্কীদের মত এখনও যে তাদের ঘোড়ার মাংস খাওয়াটা বাকি আছে!" মোটা মুঠি দিয়ে টেবিলের উপর সজোরে আঘাত করে কুতুজভ সোচ্চারে বলে উঠল। "তাই তাদের খেতে হবে, শুধু যদি····"

অধ্যায়—৫

ঠিক সেই সময়ে বিনাযুদ্ধে পশ্চাদপসরণের চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিতে, অর্থাৎ মস্কো থেকে লোকাপসরণ ও মস্কো-দহন যখন চলছে সেই ঘটনার মূল উস্কানিদাতা হয়েও রস্তপ্‌চিনের আচরণ কিন্তু তখন চলেছে কুতুজভ থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত পথে।

বরদিনোর যুদ্ধের পরে বিনাযুদ্ধে মস্কো থেকে সৈন্য অপসারণ যেমন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল, ঠিক ততখানি অনিবার্য হয়ে উঠেছিল মস্কো পরিত্যাগ ও মস্কো-দহন।

কোনরকম যুক্তি দিয়ে নয়, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে এবং আমাদের পিতৃপুরুষের মধ্যে যে অনুভূতি নিহিত রয়েছে তার অনুপ্রেরণাতেই প্রতিটি রুশ এটা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারত।

মস্কোতে যা ঘটেছে স্মোলেন্‌স্ক্‌ থেকে শুরু করে রাশিয়ার সব শহরে ও গ্রামেও তাই ঘটেছে, অথচ রস্তপ্‌চিন তার ইস্তাহার নিয়ে কোথাও যুদ্ধে নামে নি। নিরাসক্তভাবেই সাধারণ মানুষ শত্রুর জন্য অপেক্ষা করেছে, কোনরকম হাঙ্গামা করে নি বা পরস্পর খেয়োখেয়ি করে নি, সংকট-মুহূর্তেও ভাগ্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। শত্রু কাছাকাছি এসে পড়লেই ধনীরা বিষয়-সম্পত্তি ফেলে পালিয়েছে আর গরীবরা সেখানেই থেকে গেছে এবং যা কিছু ছিল সব পুড়িয়ে দিয়েছে, ধ্বংস করেছে।

এটাই যে ঘটবে, চিরকালই ঘটবে, প্রতিটি রুশ মানুষের মনে সেই ধারণাই ছিল এবং আজও আছে। এই চেতনা এবং মস্কো বেদখল হবার একটা আশংকা ১৮১২ সালের মস্কোর রুশ সমাজের মনে ছিল। জুলাইতে এবং অগস্টের শুরুতে যারা মস্কো ছেড়ে চলে গিয়েছিল তারাই প্রমাণ করেছে যে এরকম একটা আশংকা তাদের ছিল।

তাদের বলা হয়েছিল, "বিপদ থেকে পালিয়ে যাওয়া লজ্জার ব্যাপার; একমাত্র ভীরুরাই মস্কো থেকে পালাচ্ছে।" রস্তপ্‌চিন তার সৈন্যদের বুঝিয়েছে যে মস্কো ছেড়ে যাওয়াটা লজ্জার ব্যাপার। ভীরু বদনাম নিতে তারা লজ্জা বোধ করত, মস্কো ছেড়ে যেতে তারা লজ্জা পেত, তবু তারা মস্কো ছেড়ে গিয়েছিল কারণ তারা জানত যে তাছাড়া উপায় নেই। কেন তারা গেল? একথা মনে করা অসম্ভব যে বিজিত দেশসমূহে নেপোলিয়ন যে ত্রাসের সঞ্চার করেছে তার বিবরণ শুনিয়ে রস্তপ্‌চিন তার সৈন্যদের ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। সর্বপ্রথম যারা মস্কো ছেড়ে চলে গিয়েছিল তারা সকলেই শিক্ষিত

ও ধনী মানুষ; তারা তো ভাল করেই জানত যে ভিয়েনা ও বার্লিন এখনও অক্ষতই রয়েছে, নেপোলিয়নের দখলে থাকার সময় সেখানকার অধিবাসীরা তো মনোহর ফরাসীদের সঙ্গে মিলেমিশে বেশ মনের সুখেই দিন কাটিয়েছে; রুশরা, বিশেষ করে রুশ মহিলারা তো তখন ফরাসীদের খুবই পছন্দ করত।

তারা চলে গিয়েছিল কারণ মস্কোতে ফরাসী শাসন চললে অবস্থা ভাল হবে কি মন্দ হবে সে প্রশ্নই তাদের মনে আসে নি। ফরাসী শাসনাধীনে থাকার প্রশ্নই ওঠে না, সেটাই তো সবচাইতে শোচনীয় অবস্থা। বরদিনোর যুদ্ধের আগেই তারা চলে গিয়েছিল, যুদ্ধের পরে তো তাদের গতি আরও বেড়ে গিয়েছিল, যদিও রস্তপ্‌চিন মস্কো রক্ষার আহ্বান জানিয়ে ঘোষণা করেছিল যে আইবেরীয় ঈশ্বর-জননীর অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন দেবমূর্তিকে সঙ্গে নিয়েই যুদ্ধযাত্রা করা হবে, এমন একটা বেলুন আকাশে ওড়ানো হবে যা ফরাসীদের ধ্বংস করে ফেলবে; এছাড়া আরও অনেক আজেবাজে কথাই তার ইস্তাহারে লেখা হয়েছিল। তারা জানত যুদ্ধ যা করবার সৈন্যরাই করবে; আর তারা যদি সফল না হয় তাহলে তরুণী মহিলাদের ও গৃহ-ভৃত্যদের মস্কোর তিন পাহাড়ে নিয়ে গিয়ে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে লড়াই করালে তাতে কোন লাভ হবে না; কাজেই তাদের সব বিষয়সম্পত্তি শত্রুর হাতে ফেলে যেতে যত দুঃখই হোক, যেতে তাদের হবেই। এত বড় একটা সম্পদশালী নগরীকে ধ্বংস হবার জন্য শত্রুর হাতে ফেলে যাবার ভয়ংকর তাৎপর্যের কথা তারা একবারও ভাবল না, কারণ কাঠের অট্টালিকায় সমৃদ্ধ এত বড় একটা নগরী শত্রুর হাতে পরিত্যক্ত হলে তাকে তো অতি অবশ্যই পুড়িয়ে ফেলা হবে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিচার-বিবেচনা মতই চলে গেল, অথচ তারা চলে গিয়েছিল বলেই এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটতে পেরেছিল যেটা চিরকালের মত রুশ জনগণের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরবের স্মারক হয়ে থাকবে। পাছে কাউণ্ট রস্তপ্‌চিনের হুকুমে আটকা পড়ে যেতে হয় এই ভয়ে যে মহিলাটি জুন মাসেই তার নিগ্রো দাসদাসী ও নারী-ভাঁড়দের সঙ্গে নিয়ে এই ভেবে মস্কো থেকে তার সরাতভ জমিদারিতে চলে গিয়েছিল যে সে তো নেপোলিয়নের চাকরানি নয়, আসলে কিন্তু সেই মহিলাটিই সত্যি সত্যি এমন একটা মহৎ কর্ম করেছিল যার ফলে বেঁচে গিয়েছিল সারা রাশিয়া দেশটা। আর কাউণ্ট রস্তপ্‌চিন তো এই যারা মস্কো ছেড়ে যাচ্ছে তাদের ঠাট্টা করছে, আবার নিজেই সরকারী আপিস সরিয়ে নিচ্ছে; একবার যত রাজ্যের মাতালদের ধরে এনে তাদের হাতে তুলে দিচ্ছে যত সব অকেজো অস্ত্রশস্ত্র, আবার দেবমূর্তিসহ শোভাযাত্রা বের করছে, নয় তো ফাদার অগাস্তিনকে দেবমূর্তি এবং সন্তদের স্মৃতি-চিহ্ন সরাতে নিষেধ করছে; মস্কোর সব ব্যক্তিগত গাড়ি আটক করে যে বেলুনটা লেপ্‌পিচ্‌ তৈরি করছে একশ' ছত্রিশটা গাড়িতে করে সেটাকে বয়ে আনছে; কখনও বা মস্কোতে আগুন ধরিয়ে

দেবার ইঙ্গিত করে বলছে যে সে তার নিজের বাড়িতে আগুন ধরিয়েছে; কখনও বা তার অনাথ আশ্রমটি ধ্বংস করার জন্য তীব্র নিন্দা করে ফরাসীদের কাছে চিঠি লিখছে; আবার কখনও মস্কো পুড়িয়ে দেবে বলে বড়াই করে পরক্ষণেই সে কাজের নিন্দা করছে; কখনও হুকুম দিচ্ছে সব গুপ্তচরদের তার কাছে এনে হাজির করা হোক, আবার কখনও সেকাজ করার জন্য লোকজনদের তিরস্কার করছে; একবার সব ফরাসী অধিবাসীদের মস্কো থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে, আবার মস্কোতে গোটা ফরাসী উপনিবেশের কেন্দ্রমণি মাদাম অবার্ত চামেকে থাকবার অনুমতি দিচ্ছে, কিন্তু পরক্ষণেই শ্রদ্ধেয় প্রবীণ পোস্ট-মাস্টার ক্লিউচারভেকে বিনা দোষে গ্রেপ্তার করে নির্বাসিত করার হুকুম দিচ্ছে; এই ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য লোকজনদের তিন পাহাড়ে সমবেত করছে, আবার একটি লোককে খুন করবার জন্য তাদের হাতে তুলে দিয়ে পিছনের ফটক দিয়ে নিজেই সরে পড়ছে; একবার ঘোষণা করছে যে মস্কোর পতন হলে সেও আর বেঁচে থাকবে না, আবার যুদ্ধের ব্যাপারে তার নিজের মনোভাব নিয়ে অ্যাল্‌বামে কবিতা লিখছে ফরাসী ভাষায় ("জন্মেছিলাম তাতার হয়ে,/হতে চেয়েছিলাম রোমান,/ফরাসীরা আমাকে বলত বর্বর,/আর রুশরা—জর্জেস্‌ দাঁদ"—(জর্জেস্‌ দাঁদ মলিয়েরের নাটকের একটি প্রধান চরিত্র)—কি যে ঘটছে তার কিছুই এই লোকটি বুঝত না, সে শুধু চাইত এমন কিছু করতে যাতে লোককে অবাক করে দেওয়া যায়, চাইত দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ কোন বীরত্বপূর্ণ কাজ করতে; ছোট ছেলের মতই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনিবার্য ঘটনা নিয়ে ছেলেখেলা করতে—মস্কো ত্যাগ করে তাকে জ্বালিয়ে দিতে—আর সর্বদা চেষ্টা করত তার দুর্বল হাতে জনমতের প্রচণ্ড স্রোতকে কখনও দ্রুততর করতে, আবার কখনও আটকে দিতে, অথচ নিজেই ভেসে যেত সেই স্রোতের টানে।

অধ্যায়—৬

দরবারের সঙ্গে ভিল্‌না থেকে পিতার্সবুর্গে ফিরে হেলেন খুবই কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়ল। পিতার্সবুর্গে থাকতে সাম্রাজ্যের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত জনৈক গণ্যমান্য ব্যক্তির বিশেষ অনুগ্রহ সে পেত। ভিল্‌নাতে থাকার সময় একজন তরুণ বিদেশী প্রিন্সের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। সে যখন পিতার্সবুর্গে ফিরে এল তখন সেই গণ্যমান্য ব্যক্তিটি এবং প্রিন্স দুজনই সেখানে উপস্থিত, আর দুজনই নিজ নিজ অধিকারে অটল। হেলেনের সামনে দেখা দিল নতুন সমস্যা—কাউকে আঘাত না দিয়ে কেমন করে দুজনের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখা যায়।

অন্য যেকোন নারীর পক্ষে যেটা কঠিন, এমন কি অসম্ভব বলে মনে হতে পারত কাউণ্টেস বেজুখভা কিন্তু তাতে মোটেই বিচলিত বোধ করল না;

অত্যন্ত চতুরা নারী হিসাবে তার যে খ্যাতি আছে সেটা অকারণে নয়। সে যদি লুকোছাপা করত, অথবা কৌশলে এই অসুবিধাজনক অবস্থা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে চাইত, তাহলে পরোক্ষে নিজের দোষ স্বীকার করে সে নিজেরই বিপদ ডেকে আনত। কিন্তু যে কোন মহাপুরুষের মতই হেলেনও খুশিমত কাজ করতে পারে; তাই সে এমন একটা ভাব দেখাতে শুরু করল যেন সে ঠিক কাজই করছে, আর দোষ যা কিছু তা অন্যরা করছে।

তরুণী বিদেশীটি যেদিন প্রথম তাকে তিরস্কার করল সেইদিনই সুন্দর মাথাটি তুলে একটুখানি ঘুরে দৃঢ়স্বরে বলল:

"পুরুষের উপযুক্ত কথাই বটে—যেমন স্বার্থপর, তেমনই নিষ্ঠুর! অন্য কিছু আমি আশাও করি নি। একটি নারী আপনার জন্য নিজেকে বিসর্জন দিয়েছে, কষ্ট ভোগ করছে, আর এই তার পুরস্কার! আমার অনুরাগ ও বন্ধুত্বের জবাবদিহি দাবী করবার কি অধিকার আপনার আছে মঁসিয়? সেই মানুষটি আমার কাছে বাবার চাইতেও বেশী!"

প্রিন্স কি যেন বলতে যাচ্ছিল, হেলেন তাকে বাধা দিল।

বলল, "দেখুন, হতে পারে তিনি পিতৃসুলভ মনোভাব ছাড়াও আমার প্রতি অন্য কোন মনোভাব পোষণ করেন, কিন্তু সেজন্য তো তার সামনে আমার বাড়ির দরজাটা বন্ধ করে দিতে পারি না। আমি তো পুরুষ নই যে অকৃতজ্ঞতা দিয়ে দয়ার ঋণ শোধ করব! একটা কথা জেনে রাখুন মঁসিয়, আমার অন্তরে যেসব গভীর কথা আছে তার জন্য একমাত্র ঈশ্বর ও বিবেকের কাছেই আমি জবাবদিহি করে থাকি," আকাশের দিকে চোখ রেখে নিজের সুন্দর, উদ্ধত বুকের উপর হাত রেখে সে কথা শেষ করল।

"কিন্তু ঈশ্বরের দোহাই, আপনি আমার কথাটাও শুনুন।"

"আমাকে বিয়ে কর, আমি তোমার দাস হয়ে থাকব!"

"কিন্তু সে তো অসম্ভব!"

"আমাকে বিয়ে করে আপনি নিজেকে ছোট করতে পারেন না, আপনি···" হেলেন কেঁদে ফেলল।

প্রিন্স তাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করল, কিন্তু হেলেন হতবুদ্ধির মত কাঁদতে কাঁদতে বলল যে তার বিয়ের পথে তো কোন বাধা থাকতে পারে না, এরকম ঘটনা তো আগেও ঘটেছে (তৎকালে এরকম ঘটনা খুব কমই ছিল, কিন্তু সে নেপোলিয়ন ও আরও কয়েকজন পদস্থ লোকের নাম করল), সে কখনও তার স্বামীর স্ত্রী হতে পারে নি, তাকে একেবারে বলি দেওয়া হয়েছে।

প্রায় বশংবদ হয়েই প্রিন্স বলল, "কিন্তু আইন, ধর্ম···"

"আইন, ধর্ম···এই ব্যবস্থাটাই যদি তারা না করতে পারে তাহলে কিসের জন্য তাদের আবিষ্কার করা হয়েছে?" হেলেন বলল।

এইরকম একটা সহজ কথা তার মনে আসে নি দেখে প্রিন্স অবাক হয়ে

গেল; যীশু সমিতির পবিত্র দাদাদের কাছে সে পরামর্শ চাইল; তাদের সঙ্গে তার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল।

কয়েকদিন পরে হেলেন তার স্টোন আইল্যাণ্ডের পল্লীভবনে যে চমৎকার ভোজ-উৎসবের আয়োজন করল সেখানে এসে হাজির হল মঁসিয় দ্য যোবার্ত। যৌবনোত্তর এই মনোরম মানুষটির মাথাভর্তি বরফ-সাদা চুল, চোখ দুটি উজ্জল কালো, পরনে ভ্রমণের পোশাক। আলোকিত বাগানে বাজনা শুনতে শুনতে যেস্যুইট ভদ্রলোকটি হেলেনকে বোঝাল ঈশ্বরের প্রতি, খৃস্টের প্রতি, পবিত্র অন্তরের প্রতি ভালবাসার কথা, এবং এ জগতে ও পরলোকে একমাত্র ক্যাথলিক ধর্ম যে সান্ত্বনা দিতে পারে তার কথা। হেলেন অভিভূত হল, একাধিকবার তার চোখে এবং মঁসিয় দ্য যোবার্তের চোখে জল এল, তাদের গলা কাঁপতে লাগল। এমন সময় নৃত্য-সঙ্গীটি এসে পড়ায় হেলেনের ভবিষ্যৎ বিবেক-রক্ষকের সঙ্গে আলোচনায় ছেদ পড়ল; কিন্তু পরদিন সন্ধ্যায় মঁসিয় দ্য যোবার্ত আবার এল হেলেনের সঙ্গে নিভৃতে দেখা করতে, এবং তারপরে প্রায়ই আসতে লাগল।

একদিন সে কাউন্টেসকে একটা রোমান ক্যাথলিক গির্জায় নিয়ে গেল; সেখানে সে বেদীর সামনে নতজানু হয়ে বসল। মধ্যবয়সী মনোরম ফরাসী ভদ্রলোকটি তার মাথায় হাত রাখল, আর—পরবর্তীকালে হেলেনই বলেছে —তার মনে হল একটা মৃদু হাওয়া যেন তার অন্তরকে স্পর্শ করল। তাকে বলা হল যে এটাই মহতী করুণা।

তারপরে একজন লম্বা ফ্রক-পরা পাদ্রিকে তার কাছে আনা হল। তার কাছে হেলেন সব অপরাধের কথা বলল, আর পাদরিও তাকে সব পাপ থেকে মুক্তি দিল। কয়েকদিন পরেই হেলেন জেনে খুশি হল যে আসল ক্যাথলিক গির্জায় তাকে ভর্তি করে নেওয়া হয়েছে, আর কয়েকদিনের মধ্যেই পোপ স্বয়ং তার কথা শুনতে পাবে এবং তাকে একটা বিশেষ দলিল পাঠিয়ে দেবে।

কিন্তু চাতুরির খেলায় যেমন সর্বদাই ঘটে থাকে যে একজন বোকাও চতুরতর লোকের উপর টেক্কা মারে, তেমনই হেলেনও বুঝতে পারল যে এসব কিছুরই প্রধান উদ্দেশ্য হল তাকে ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত করে যেস্যুইট প্রতিষ্ঠান সমূহের জন্য অর্থ আদায় করা, আর তাই সেও জিদ ধরে বসল যে টাকা পয়সা দেবার আগেই স্বামীর কাছ থেকে তাকে মুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি নেওয়া হোক। তার মতে, মানুষের কামনা-বাসনাকে পরিতুষ্ট করে কতকগুলি সম্পত্তি রক্ষা করাই হল সব ধর্মের লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যকে মনে রেখেই একদা তার ধর্ম-পিতার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে সে প্রশ্ন করে বসল, তার বিয়েটা তার পক্ষে কতটা বাধ্যতামূলক?

গোধূলির আলোয় তারা দুজন বসে ছিল বৈঠকখানার জানালার ধারে।

জানালা দিয়ে ভেসে আসছে ফুলের গন্ধ। হেলেন যে সাদা পোশাকটি পরে আছে তার ভিতর দিয়ে তার কাঁধ ও বুক স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ভাল ভাল খাওয়া-পরার ফলে পাদরিটির চেহারা বেশ গোলগাল, চিবুকটি পরিষ্কার করে কামানো, মনোরম কঠিন মুখ, দুখানি সাদা হাত হাঁটুর উপর ভাঁজ করা; সে হেলেনের খুব কাছাকাছি বসেছে, ঠোঁটে ফুটে উঠেছে সূক্ষ্ম হাসির রেখা, শান্ত ও সানন্দ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে হেলেনের রূপ, আর আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে নিজের মতামত বোঝাতে বোঝাতে মাঝে মাঝেই তার মুখের দিকে তাকাচ্ছে। হেলেনও একটা অস্বস্তিকর হাসির সঙ্গে তাকিয়ে আছে তার কোঁকড়া চুল ও পরিষ্কার করে কামানো ফোলা-ফোলা ঈষৎ কৃষ্ণাভ থুত্‌নির দিকে, আর প্রতিমুহূর্তেই আশা করছে যে আলোচনাটা একটা নতুন মোড় নেবে। কিন্তু সঙ্গিনীটির রূপ-সুধা পান করতে থাকলেও পাদরিটি কিন্তু নিজের আলোচনার মধ্যেই ডুবে রইল।

সেসব কথা শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে হেলেন হঠাৎ মোহময়ী হাসি হেসে বলে উঠল: "কিন্তু আমি মনে করি, একটি মিথ্যা ধর্ম যে বন্ধন আমার উপর আরোপ করেছিল সৎ ধর্মকে বরণ করার পরে তা আর আমাকে বেঁধে রাখতে পারে না।"

এইভাবে কলম্বাসের ডিমের মত সরলতার সঙ্গে ব্যাপারটাকে তার সামনে উপস্থিত করায় হেলেনের বিবেক-রক্ষকটি অবাক হয়ে গেল। ছাত্রীটির এই অপ্রত্যাশিত দ্রুত উন্নতি দেখে সে খুশি হল, কিন্তু অনেক পরিশ্রম করে বিতর্কের যে সৌধটি সে গড়ে তুলেছে তাকেও পরিত্যাগ করতে পারল না।

"আগে আমাদের পরস্পরকে বুঝতে দিন কাউন্টেস," হেসে কথাটা বলে পাদরি আবার তার মানসকন্যার যুক্তিকে খণ্ডন করতে শুরু করল।

অধ্যায়—৭

হেলেন বুঝতে পারল, যাজকীয় দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্নটা খুবই সরল ও সহজ; তার পরিচালকরা যে অসুবিধার সৃষ্টি করছে তার একমাত্র কারণ অযাজকীয় কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটাকে কিভাবে নেবে সেবিষয়ে তাদের মনে সংশয় আছে।

তাই সে স্থির করল, এব্যাপারে সমাজের উপর মহলের মনোভাবটা প্রস্তুত করা প্রয়োজন। বয়স্ক গণ্যমান্য লোকটির মনে ঈর্ষা জাগাতে সে অপর প্রণয়প্রার্থীকে যেকথা বলেছে সেই কথাই তাকেও বলল, অর্থাৎ সে তাকেও বোঝাল যে হেলেনের উপর যদি কোন অধিকার পেতে হয় তাহলে তাকে বিয়ে করতেই হবে। যে নারীর স্বামী এখনও বেঁচে আছে তার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব শুনে তরুণতর প্রণয়প্রার্থীর মতই এই গণ্যমান্য ব্যক্তিটিও প্রথমে খুবই হকচকিয়ে গেল, কিন্তু হেলেন যত দৃঢ়তার সঙ্গে তাকে বোঝাল যে ব্যাপারটা

যেকোন কুমারী মেয়েকে বিয়ে করার মতই সরল ও স্বাভাবিক তখন সেও কিছুটা প্রভাবিত হল। হেলেন যদি তিলমাত্র ইতস্তত ভাব, লজ্জা, বা গোপনীয়তার লক্ষণ দেখাত তাহলেই তার ঘুঁটি কেঁচে যেত; কিন্তু গোপনীয়তা বা লজ্জার কোনরকম লক্ষণ না দেখিয়ে সে পিতার্সবুর্গময় তার বন্ধুদের বলে বেড়াতে লাগল যে প্রিন্স ও গণ্যমান্য ব্যক্তিটি উভয়েই তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছে, কিন্তু সে দুজনকেই ভালবাসে বলে কারও মনে আঘাত দিতে ভয় পাচ্ছে।

ফলে সঙ্গে সঙ্গে পিতার্সবুর্গময় যে গুজবটা ছড়াল সেটা হেলেনের স্বামীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের কথা নয়, কথাটা হল হতভাগিনী সুন্দরী হেলেন সন্দেহের দোলায় দুলছে যে দুজনের মধ্যে কাকে তার বিয়ে করা উচিত। কাজটা মোটেই সম্ভবপর কিনা সেটা আর এখন কোন সমস্যা নয়, একমাত্র সমস্যা হচ্ছে কোন্ বিয়েটা অধিক বাঞ্ছনীয় এবং আদালত সেটাকে কি চোখে দেখবে। এক স্বামী জীবিত থাকতে পুনর্বিবাহ ভাল কি মন্দ তা নিয়ে সাধারণ মানুষ কোন আলোচনাতেই গেল না; তারা বলতে লাগল, "তোমার—আমার চাইতে জ্ঞানী-গুণী লোকরা" নিশ্চয়ই সে ব্যাপারের একটা মীমাংশা করে ফেলেছে, কাজেই এখন সে সিদ্ধান্তের ভাল-মন্দ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা মানেই নিজের নির্বুদ্ধিতা এবং সমাজে বসবাসের অনুপযুক্ততা প্রকাশ করা।

একমাত্র মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্না আখসিমভাই সরাসরি একটা বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করে বসল। ভদ্রমহিলা পিতার্সবুর্গে এসেছে তার এক ছেলের সঙ্গে দেখা করতে। একটা বল-নাচের আসরে হেলেনকে দেখতে পেয়ে তাকে ঘরের ঠিক মাঝখানে থামিয়ে সে রুক্ষস্বরে বলে উঠল: "আজকাল দেখছি জীবিত পুরুষের স্ত্রীরাও আবার বিয়ে করছে! আপনি হয়তো ভাবছেন যে একটা নতুন কিছু করলেন। কিন্তু একথা লোকে অনেক আগেই ভেবেছে। সব বেশ্যালয়েই একাজ চলে।" কথাক'টি বলেই মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্না ভয়-দেখানো ভঙ্গীতে হাতের আস্তিন গুটিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সকলে মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্নাকে ভয় করলেও পিতার্সবুর্গে তাকে একটি ভাঁড় বলেই মনে করা হয়। কাজেই সকলে তার কথা শুনলেও বিশেষ কোন গুরুত্ব দিল না।

মেয়ের সঙ্গে দেখা হলেই প্রিন্স ভাসিলি তাকে বলে: "হেলেন, তোমাকে একটা কথা বলার আছে"; তাকে এককোণে টেনে নিয়ে যায়। "কিছু কিছু কথা আমার কানে এসেছে…বুঝতেই পারছ। দেখ সোনা, তোমার ভাল শুনলে তোমার বাবার মনটা যে আনন্দে নেচে ওঠে তা তো তুমি জান …অনেক কষ্ট তুমি পেয়েছ…কিন্তু সোনা, নিজের মনের সঙ্গেই বোঝাপড়া

করে নিও। এইটুকুই আমার বলার কথা।" নিজের আবেগকে গোপন রেখে মেয়ের গালে গাল রেখে প্রিন্স ভাসিলি সেখান থেকে সরে গেল।

বিলিবিন হেলেনের সেইসব পুরুষ বন্ধুদের একজন যারা কখনও প্রেমিক হতে চায় নি। একটা ছোট ঘরোয়া বৈঠকে সে একদিন তার মতামতটা হেলেনকে শুনিয়ে দিল।

হেলেন বলল, "শোন বিলিবিন," সাদা আংটি-পরা আঙুলগুলি দিয়ে সে বিলিবিনের কোটের আস্তিন স্পর্শ করল। "বোনের মত ভেবেই আমাকে বলে দাও, আমার কি করা উচিত। দুজনের কাকে?"

চোখের পাতায় ভাঁজ ফেলে বিলিবিন একটু চিন্তা করল; তার ঠোঁটে হাসি ফুটল।

বলল, "তুমি তো জান এবিষয়ে আমি একেবারে অপ্রস্তুত নই। সত্যিকারের বন্ধু হিসাবে তোমার এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি অনেক—অনেক ভেবেছি। কি জান, তুমি যদি প্রিন্সকে বিয়ে কর," সে একটি আঙুল বেঁকাল, "তাহলে অপরটিকে বিয়ে করার সুযোগ চিরদিনের মত হারাবে; তাছাড়া, আদালতকেও অসন্তুষ্ট করবে। কিন্তু তুমি যদি বুড়ো কাউণ্টটিকে বিয়ে কর তাহলে তার শেষের দিনগুলিকে তুমি সুখী করতে পারবে, এবং সেই মহাযানের বিধবা হলেও "প্রিন্স আর তোমাকে বিয়ে করবে না।" বিলিবিন তার কপালটা ঘসতে লাগল।

আনন্দে উচ্ছল হয়ে পুনরায় তার আস্তিনটা ছুঁয়ে হেলেন বলল, "এই তো সত্যিকারের বন্ধুর কথা! কিন্তু তুমি তো জান, আমি দুজনকেই ভালবাসি, কাউকে কষ্ট দিতে চাই না। তাদের দুজনের সুখের জন্য আমি জীবন দিতেও প্রস্তুত।"

সেক্ষেত্রে তো তার আর কিছু করার নেই এমনি ভঙ্গীতে বিলিবিন দুই কাঁধে ঝাঁকুনি দিল।

"মহীয়সী নারী! সোজা কথায় বললে তো এই কথাই বলতে হয়। এ দেখছি একই সঙ্গে তিনজনকেই বিয়ে করতে চায়।" সে ভাবল।

স্পষ্ট কথা বলার খ্যাতি বিলিবিনের আছে। সে প্রশ্ন করল, "কিন্তু আমাকে বল দেখি, তোমার স্বামী ব্যাপারটাকে কি চোখে দেখবে? সে কি এতে রাজী হবে?"

হেলেন বলল, "ওঃ, সে আমাকে কত ভালবাসে! আমার জন্য সে সব করবে।"

"এমন কি তোমার সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদও করবে?" বিলিবিন রসিকতা করে শুধাল।

হেলেন হেসে উঠল।

আর একটি মানুষ এই প্রস্তাবিত বিয়ের যুক্তিবত্তায় সন্দেহ প্রকাশ

করল ; সে হেলেনের মা প্রিন্সেস কুরাগিনা। বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং স্বামী বেঁচে থাকতে পুনর্বিবাহের সম্ভাবনা সম্পর্কে সে জনৈক রুশ পুরোহিতের পরামর্শ চাইল। পুরোহিত জানাল যে সেটা অসম্ভব এবং ধর্ম-পুস্তকের একটা অংশ দেখিয়ে দিল যেখানে স্বামী বর্তমানে পুনর্বিবাহকে পরিষ্কার নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

এই সব অখণ্ডনীয় যুক্তিতে সুসজ্জিত হয়ে প্রিন্সেস কুরাগিনা একদিন খুব সকালে মেয়ের কাছে গিয়ে হাজির হল।

মনোযোগ দিয়ে মার আপত্তিগুলো শুনে নিয়ে হেলেন ব্যঙ্গের হাসি হেসে ফেলল।

বুড়ি প্রিন্সেস বলল, "কিন্তু এখানে তো পরিষ্কার বলা আছে: 'বিবাহ-বিচ্ছিন্নাকে যে বিয়ে করবে…".

হেলেন এবার রুশ ছেড়ে ফরাসী ভাষায় বলে উঠল, "আঃ মামন, বাজে কথা বলো না! তুমি কিচ্ছু বোঝ না। আমার অনেকরকম দায়-দায়িত্ব আছে।"

"কিন্তু সোনা…"

"আঃ মামণি, কেন যে তুমি বুঝতে পারছ না, যে পবিত্র পিতার সবরকম বিধান দেবার অধিকার আছে…"

ঠিক সেইসময় হেলেনের জনৈক সহচরী এসে জানাল, হিজ হাইনেস নাচ-ঘরে এসেছে, তার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

"না, তাকে বলে দাও তার সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই না ; তিনি তার কথা রাখেন নি, তাই আমি তার উপর প্রচণ্ড চটে গছি।"

"কাউন্টেস, সব পাপেরই তো মার্জনা আছে," ঘরে ঢুকতে ঢুকতে সুকেশ এক যুবক ঘরে ঢুকল ; তার মুখ ও নাক দুইই লম্বা।

বুড়ি প্রিন্সেস সসম্মানে উঠে অভিবাদন করল। যুবকটি কিন্তু তার দিকে নজরই দিল না। মেয়ের দিকে মাথা নেড়ে প্রিন্সেস ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

"হ্যাঁ, মেয়ে তাহলে ঠিকই বলেছে," বুড়ি প্রিন্সেস মনে মনে বলল। হিজ হাইনেসের আবির্ভাবেই তার সব বিশ্বাস উধাও হয়ে গেল। "মেয়েই ঠিক, কিন্তু আমাদের যে যৌবন আর ফিরে আসবে না সেই যৌবনকালে আমরা কেন একথা জানলাম না? অথচ কথাটা কত সহজ।" ভাবতে ভাবতে বুড়ি প্রিন্সেস গাড়িতে উঠে বসল।

অগস্টের গোড়ার দিকেই হেলেনের ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল ; স্বামীকে একখানা চিঠি লিখে জানিয়ে দিল—সে স্থির করেছে এন. এন. কে বিয়ে করবে, সত্যধর্মকে অবলম্বন করেছে, আর তাই অনুরোধ জানাচ্ছে বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলি যেন সুসম্পন্ন করা হয় ;

পত্রবাহকই সব ব্যাপারটা তাকে বুঝিয়ে বলবে।

"বন্ধু আমার, ঈশ্বরের কথা প্রার্থনা করি তাঁর পবিত্র ও শক্তিমান আশ্রয় তিনি তোমাকে দান করুন—তোমার বন্ধু হেলেন।"

এই চিঠি যখন পিয়েরের বাড়িতে পৌছল সে তখন বরদিনোর যুদ্ধক্ষেত্রে।

অধ্যায়—৮

বরদিনোর যুদ্ধের শেষের দিকে দ্বিতীয়বার রায়েভ্‌স্কি কামানশ্রেণী থেকে নেমে এসে পিয়ের একদল সৈন্যের সঙ্গে একটা নালার ভিতর দিয়ে এগিয়ে ড্রেসিং-স্টেশনে পৌছল এবং সেখানকার রক্তাক্ত অবস্থা দেখে ও আর্তনাদ-চীৎকার শুনে চলার গতি বাড়িয়ে দিয়ে একদল সৈন্যের দঙ্গলের মধ্যে আটকে গেল।

এখন তার মনের একমাত্র বাসনা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সারাদিনের এই মর্মন্তুদ অনুভূতি থেকে বেরিয়ে জীবনের সাধারণ পরিবেশে ফিরে যাওয়া এবং ঘরে ঢুকে নিজের বিছানায় চুপচাপ শুয়ে থাকা। তার মনে হল, একমাত্র জীবনের স্বাভাবিক পরিবেশে ফিরে গেলেই সে নিজেকে এবং সারাদিন যা দেখেছে ও অনুভব করেছে তাকে বুঝতে পারবে। কিন্তু সে স্বাভাবিক পরিবেশ তো কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়।

যদিও যেপথ ধরে সে চলেছে সেখানে গোলাগুলির হিস্-হিস্ শব্দটা নেই; কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের পরিবেশই চারদিকে ছড়িয়ে আছে। সেই একই যন্ত্রণা, ক্লান্তি, মাঝে মাঝেই অদ্ভুত নিরাসক্ত সব মুখ, একই রক্ত, একই সৈনিকদের ওভারকোট, একই গোলাগুলির শব্দ, দূরাগত হলেও এখনও তারা ত্রাসের সৃষ্টি করে, আর তাছাড়া সেই একই দুর্গন্ধ বাতাস ও ধুলো।

মোঝাইস্ক রোড ধরে মাইল দুই হেঁটে পিয়ের পথের পাশে বসে পড়ল।

গোধূলি নেমে এসেছে; কামানের শব্দ দূরে মিলিয়ে গেছে। কনুইয়ে ভর দিয়ে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে চলমান ছায়ার দিকে তাকিয়ে পিয়ের অনেকক্ষণ শুয়ে থাকল। সর্বক্ষণই সে কল্পনা করছে যেন একটা কামানের গোলা প্রচণ্ড শব্দ করে তার দিকে ছুটে আসছে, আর সঙ্গে সঙ্গে সে শিউরে উঠে বসছে। কতক্ষণ যে এইভাবে কাটল তা সে জানে না। মাঝ রাতে তিনটি সৈনিক কিছু জ্বালানি কাঠ এনে তার পাশে বসে আগুন জ্বালাতে শুরু করল।

পিয়েরের দিকে আড়-চোখে তাকিয়ে সৈনিক তিনটি আগুন জ্বালিয়ে একটা লোহার পাত্র তার উপর বসিয়ে দিল এবং কিছু শুকনো পাউরুটি ছিঁড়ে পাত্রের মধ্যে ফেলে দিয়ে তাতে কয়েক ফোঁটা জল ঢেলে দিল। সেই চটচটে খাবারের মধুর গন্ধ ধোঁয়ার গন্ধের সঙ্গে মিশে গেল। পিয়ের উঠে বসে নিঃশ্বাস ছাড়ল। তার দিকে না তাকিয়েই সৈনিক তিনজন খেতে খেতে

গল্প করতে লাগল।

হঠাৎ তাদের একজন পিয়েরকে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কে বলুন তো?" সে যেন বলতে চাইল: "আপনি খেতে চাইলে কিছুটা খাদ্য আপনাকে দিতে পারি, শুধু আপনি একজন সৎলোক কি না সেটা আমাদের জানা দরকার।"

সামাজিক দিক থেকে সৈনিকদের যতটা কাছাকাছি আসা যায় যাতে তারা তাকে ভাল করে বুঝতে পারে সেই চেষ্টা করাই দরকার মনে করে পিয়ের বলল, "আমি, আমি""আমি একজন অসামরিক অফিসার, তবে আমার লোকজনরা এখানে নেই। যুদ্ধক্ষেত্রে এসে আমি তাদের হারিয়ে ফেলেছি।"

"তাই তো! একটি সৈনিক বলল।

অন্য একজন মাথা নাড়ল।

"একটু জাবনা খাবেন না কি?" বলে প্রথম সৈনিক একটা কাঠের চামচ পরিষ্কার করে মুছে পিয়েরের হাতে দিল।

আগুনের পাশে বসে সেই জাবনা খেতে খেতে পিয়েরের মনে হল আজ পর্যন্ত যত খাবার সে খেয়েছে এটাই তার মধ্যে সবচাইতে স্বাদু। সে লোভীর মত উপুড় হয়ে খেতে লাগল। আগুনের আলো পড়েছে তার মুখে। সৈন্যরা নীরবে তার দিকে তাকাল।

একজন বলল, "আপনি কোথায় যাবেন? আমাদের বলুন!"

"মোঝাইস্ক-এ।"

"আপনি একজন ভদ্রলোক, তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"আপনার নাম?"

"পিতর কিরিলিচ।"

"ঠিক আছে পিতর কিরিলিচ, আমাদের সঙ্গে আসুন, আমরাই আপনাকে সেখানে নিয়ে যাব।"

ঘুটঘুটি অন্ধকারের মধ্যে সৈন্যরা পিয়েরকে সঙ্গে নিয়ে মোঝাইস্ক-এর দিকে হাঁটতে লাগল।

মোঝাইস্ক-এর কাছাকাছি পৌঁছে খাড়া পাহাড় বেয়ে শহরে উঠবার মুখেই মোরগ ডাকতে শুরু করল। তার সরাইখানাটা যে পাহাড়ের নীচে এবং সে যে সেটা পার হয়ে এসেছে সেকথা বেমালুম ভুলে গিয়ে পিয়ের সৈন্যদের সঙ্গেই উপরে উঠতে লাগল। তার মনের ভুলো অবস্থাটা তখন এতই বেড়ে গেছে যে মাঝপথে তার সহিসের সঙ্গে দেখা না হলে সরাইখানার কথাটা তার মনেই পড়ত না। পিয়েরের সাদা টুপি দেখেই সহিস তাকে অন্ধকারেও চিনতে পারল।

বলে উঠল, "ইয়োর এক্সেলেন্সি! আরে, আমরা তো আপনার আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম! আপনি হেঁটে যাচ্ছেন কেন? আর যাচ্ছেনই বা কোথায়?"

"তাই তো!" পিয়ের বলল।

সৈনিকরা থেমে গেল।

একজন বলল, "আপনার লোকদের তাহলে পেয়ে গেছেন? আচ্ছা, তাহলে বিদায় পিতর কিরিলিচ—তাই তো?"

আর একজনও সেই কথাই বলল, "বিদায় পিতর কিরিলিচ।"

"বিদায়।" বলে পিয়ের সহিসকে নিয়ে সরাইখানার দিকে পা বাড়াল।

"ওদের কিছু দেওয়া উচিত," এইকথা ভেবে সে পকেটে হাত দিল। কিন্তু ভিতর থেকে কে যেন বলল, "না, না দেওয়াই ভাল।"

সরাইখানায় একটা ঘরও পাওয়া গেল না; সবগুলিই ভর্তি। পিয়ের উঠোনে নেমে গেল; আপাদমস্তক ঢেকে গাড়ির মধ্যেই শুয়ে পড়ল।

অধ্যায়—৯

বালিশে মাথা রাখতে না রাখতেই পিয়ের ঘুমিয়ে পড়ল; কিন্তু হঠাৎ যেন বাস্তবেই ঘটছে এমনই স্পষ্টভাবেই তার কানে এল কামানের বুম্-বুম্-বুম্, অর্ধবৃত্তাকার গোলার শিস, আর্তনাদ ও চীৎকার, নাকে লাগল রক্ত ও বারুদের গন্ধ, আর আতংক ও মৃত্যু-ভয় তাকে চেপে ধরল। সভয়ে চোখ খুলে জোব্বার ভিতর থেকে মাথাটা বের করল। উঠোনটা চুপচাপ। শুধু কে একজন আর্দালি কাদার ভিতর দিয়ে ফটক পার হয়ে এসে সরাইওয়ালার সঙ্গে কি যেন কথা বলল। তার উঠে বসার শব্দে চমকিত হয়ে কয়েকটা পায়রা পিয়েরের মাথার উপর থেকে উড়ে গেল। দুটো চালাঘরের কালো ছাদের মাঝখান দিয়ে পরিষ্কার তারা ভরা আকাশটা দেখা যাচ্ছে।

আবার মাথাটা ঢেকে সে ভাবল, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সেসব কিছুই নেই। হায়রে, ভয় কী ভয়ংকর চিজ, আর কী রকম লজ্জাজনকভাবে আমি তার কাছে ধরা দিলাম! কিন্তু তারা…তারা তো সারাক্ষণই ধীর, স্থির ছিল… শেষ পর্যন্ত….।"

পিয়েরের মনে তারা মানে সেইসব সৈন্যরা যারা কামানশ্রেণীতে কর্মরত ছিল, যারা তাকে আহার্য দিয়েছে। তারা, পূর্বে অপরিচিত সেইসব সৈন্যদের মুখ স্পষ্ট হয়ে তার সামনে ভেসে উঠল।

ঘুমিয়ে পড়তে পড়তেই পিয়ের ভাবতে লাগল: "যদি সৈনিক হতাম, স্রেফ একজন সৈনিক! সম্পূর্ণভাবে সকলের সঙ্গে মিশে যাওয়া, তাদের মতই চিন্তা-ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হওয়া। কিন্তু আমার বাইরের মানুষটার এই অকারণ খোলসটা, এই শয়তানী বোঝাটা ঝেড়ে ফেলব কেমন করে? একসময় ছিল

যখন এসবই করতে পারতাম। বাবার কাছ থেকে পালিয়ে যেতে পারতাম। অথবা দলখভের সঙ্গে দ্বৈতযুদ্ধের পরে আমাকে সৈনিকের কাজ দিয়ে পাঠানোও হতে পারত।" পুরনো দিনের অনেক স্মৃতি তার মনের মধ্যে ভিড় করে এল।

"ঘোড়ার সাজ পরানোর সময় হয়েছে ইয়োর এক্সেলেন্সি! ইয়োর এক্সেলেন্সি! এখনই ঘোড়ার সাজ পরাতে হবে। সময় হয়ে গেছে ইয়োর এক্সেলেন্সি!...."

সহিস তাকে ডাকছে। সূর্যের আলো এসে পড়েছে পিয়েরের মুখে। সরাইখানার নোংরা উঠোনটার দিকে সে তাকাল। মাঝখানে পাম্পের কাছে সৈনিকরা তাদের শুটকো ঘোড়াগুলোকে জল খাওয়াচ্ছে, গাড়িগুলো ফটক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। বিরক্ত হয়ে মুখটা ঘুরিয়ে চোখ বুজে সে আবার গাড়ির মধ্যেই বসে পড়ল। "না, এসব আমি চাই না, এসব দেখতে ও বুঝতেও চাই না। স্বপ্নে যে দেখেছিলাম তাকে আমি বুঝতে চাই। আর এক সেকেণ্ড স্বপ্নটা চলতে থাকলেই তো সব বুঝতে পারতাম।"

সহিস, কোচয়ান ও সরাইওয়ালা এসে পিয়েরকে বলল, একজন অফিসার খবর এনেছে যে ফরাসীরা মোঝায়েস্ক-এর কাছে পৌঁছে গেছে, আর আমাদের সৈন্যরা সেখান থেকে সরে যাচ্ছে।

পিয়ের উঠল; ঘোড়ার সাজ পরিয়ে পথে তাকে তুলে নিতে বলে সে পায়ে হেঁটে শহরের পথে বেরিয়ে পড়ল।

প্রায় দশ হাজার আহতকে পিছনে ফেলে সৈন্যরা এগিয়ে চলেছে। সব বাড়ির উঠোনে আহত সৈন্য, জানালায় আহত সৈন্য, রাস্তাভর্তি আহত সৈন্য। কিছু গাড়িতে আহতদের নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হয়েছে; পথে পথে সেই-সব গাড়িকে ঘিরে শোনা যাচ্ছে চেঁচামেচি, শাপশাপান্ত, আর ঘুসোঘুসি। নিজের গাড়িটা এসে পড়ায় একজন পরিচিত আহত জেনারেলকে গাড়িতে তুলে নিয়ে পিয়ের মস্কোর পথ ধরল। পথেই পিয়ের শুনতে পেল তার শ্যালক আনাতোল ও প্রিন্স আন্দ্রুর মৃত্যু-সংবাদ।

অধ্যায়—১০

৩০শে অগস্ট পিয়ের মস্কো পৌঁছল। নগরের ফটকের কাছেই দেখা হল কাউন্ট রস্তপ্‌চিনের অ্যাডজুটাণ্টের সঙ্গে।

অ্যাডজুটাণ্ট বলল, "আমরা তো সর্বত্র আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। কাউণ্ট আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। তার ইচ্ছা, একটা গুরুতর কাজের ব্যাপারে আপনি অবিলম্বে তার সঙ্গে দেখা করুন।"

বাড়িতে না গিয়ে সেখান থেকেই একটা গাড়ি নিয়ে পিয়ের সোজা চলে গেল মস্কোর প্রধান সেনাপতির সঙ্গে দেখা করতে।

কাউণ্ট রস্তপ্‌চিন সেইদিন সকালেই তার সকোল্‌নিকির গ্রীষ্মাবাস থেকে মস্কো ফিরেছে। বাড়ির প্রথম ঘরটা এবং অভ্যর্থনা-ঘরটা সরকারী কর্মচারিতে ভর্তি। ভাসিলচিকভ ও প্লাতভ ইতিমধ্যেই কাউণ্টের সঙ্গে দেখা করে তাকে বুঝিয়েছে যে মস্কো রক্ষা করা অসম্ভব, তাকে শত্রুর হাতে ছেড়ে দিতেই হবে। যদিও মস্কোর অধিবাসীদের কাছে সংবাদটা গোপন রাখা হয়েছে, তবু অফিসাররা—বিভিন্ন সরকারী বিভাগের প্রধানরা—জানে যে অচিরেই মস্কো শত্রুর হাতে পড়বে, কাউণ্ট রস্তপ্‌চিন নিজেও তা জানে; শুধু নিজ নিজ বিভাগের কি ব্যবস্থা তারা করবে সে সম্পর্কে ব্যক্তিগত দায়-দায়িত্ব এড়াবার জন্যই তারা শাসনকর্তার কাছে এসেছে।

পিয়ের অভ্যর্থনা-ঘরে ঢুকতেই একজন সামরিক বার্তাবহ রস্তপ্‌চিনের ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

নানাবিধ প্রশ্নের জবাবে হাত নেড়ে মাত্র একটা হতাশা-ব্যঞ্জক ভঙ্গী করে সে ঘরটা পার হয়ে গেল।

অভ্যর্থনা-ঘরে বসে পিয়ের ক্লান্ত চোখে বৃদ্ধ ও তরুণ, সামরিক ও অসামরিক, সব অফিসারদেরই দেখতে লাগল। দেখে মনে হল, তারা সকলেই অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত। পিয়ের একটা দলের দিকে এগিয়ে গেল। তাদের একজনকে সে চেনে। পিয়েরকে অভ্যর্থনা জানিয়ে তারা আবার গল্প করতে লাগল।

"তাদের যদি এখন বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে পরে ফিরিয়ে আনা হয় তাতে তো কোন ক্ষতি হবে না, কিন্তু এখন যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে কেউ কিছু বলতে পারে না।"

হাতের একটা ছাপানো কাগজ দেখিয়ে আর একজন বলল, "কিন্তু এতে কি লিখেছে সেটা দেখ....."

"ওটা অন্য ব্যাপার। ওটা জনসাধারণের জন্য দরকার," প্রথম জন বলল।

"ওটা কি?" পিয়ের শুধাল।

"ওঃ, এটা একটা নতুন ইস্তাহার।"

পিয়ের সেটা নিয়ে পড়তে লাগল।

"প্রশান্ত মহামহিম (কুতুজভ) তার দিকে অগ্রসরমান সেনাদলের সঙ্গে যোগ দিতে মোঝায়েস্ক-এর ভিতর দিয়ে এগিয়ে এমন একটা জায়গায় শক্ত ঘাঁটি গেড়েছেন যেখানে শত্রুপক্ষ তাকে শীঘ্র আক্রমণ করতে পারবে না। এখান থেকে আটচল্লিশটি কামান ও গোলাবারুদ তাকে পাঠানো হয়েছে; প্রশান্ত মহামহিম বলেছেন শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও তিনি মস্কোকে রক্ষা করবেন, এমন কি পথে পথে যুদ্ধ করতেও তিনি প্রস্তুত। ভাইসব, আদালত বন্ধ হয়ে গেলেও আপনারা বিচলিত হবেন না; শৃঙ্খলার সঙ্গে কাজ করতে হবে; শয়তানদের সঙ্গে শয়তানী ব্যবহারই আমরা করব। সময় হলে শহর

ও গ্রামের সব ছেলেদেরই আমার দরকার হবে, দু' একদিন আগেই আমি ডাক পাঠাব, কিন্তু এখনই তাদের দরকার হচ্ছে না। তাই আমি চুপ করে আছি। সেদিন একটা কুড়ুলও দরকার হবে, একটা বর্শাও কাজে লাগবে, কিন্তু সবচাইতে ভাল একটা তিন-ফলা ত্রিশূল : একটা ফরাসী এক আঁটি জইয়ের চাইতে বেশী ভারী নয়। কাল ডিনারের পরে ঈশ্বর-জননীর আইবেরীয় মূর্তি নিয়ে আমি ক্যাথারিন হাসপাতালে আহতদের কাছে যাব, সেখানে তাদের জন্য সংগ্রহ করব আশীর্বাদী জল। সেই জল তাদের দ্রুত আরোগ্যলাভ করতে সাহায্য করবে। আমি নিজেও এখন ভাল আছি; একটা চোখে ঘা হয়েছিল, কিন্তু এখন দুই চোখেই দেখতে পাচ্ছি।"

পিয়ের বলল, "কিন্তু সৈন্যরা আমাকে বলেছে যে শহরে যুদ্ধ করা অসম্ভব; অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে...."

"বটেই তো! আমরাও তো সেই কথাই বলছিলাম।" প্রথম বক্তা বলল।

পিয়ের শুধাল, "আমার একটা চোখে ঘা হয়েছিল, এখন দুই চোখেই দেখতে পাচ্ছি—একথার মানে কি?"

অ্যাডজুটাণ্ট হেসে বলল, "কাউণ্টের চোখে আঞ্জনি হয়েছিল; আমি যখন তাকে বললাম যে লোকজনরা ব্যাপারটা জানতে চাইছে তখন তিনি খুবই বিচলিত হয়ে পড়লেন। ভাল কথা কাউণ্ট," হঠাৎ একটু হেসে সে পিয়েরকে বলল, "আমরা শুনেছি আপনার একটা পারিবারিক গোলযোগ দেখা দিয়েছে, কাউণ্টেস মানে আপনার স্ত্রী…"

পিয়ের নিরাসক্ত গলায় বলল, "আমি কিছু শুনি নি; কিন্তু আপনারা কি শুনেছেন?"

"দেখুন, মানুষ তো অনেক সময় অনেক কিছু বানিয়েও বলে। আমি যা শুনেছি তাই বলছি।"

"কিন্তু আপনি কি শুনেছেন?"

সেই একই হাসি হেসে অ্যাডজুটাণ্ট বলল, "দেখুন, লোকে বলছে, কাউণ্টেস, মানে আপনার স্ত্রী নাকি বিদেশে পাড়ি দিচ্ছেন। আমি অবশ্য আশাকরি যে কথাটা একদম বাজে…"

অন্যমনস্কভাবে চারদিকে তাকিয়ে পিয়ের বলল, "হয়তো তাই। আচ্ছা, ওই লোকটি কে?" একটি বেঁটে বুড়ো লোককে দেখিয়ে সে বলল। লোকটির পরনে একটা পরিষ্কার নীল রঙের চাষীদের ওভারকোট, বরফ-সাদা লম্বা দাড়ি ও ভুরু, লালচে মুখ।

"ওই লোকটি? ও তো একজন ব্যবসায়ী, মানে ওই তো রেস্তোরাঁওয়ালা ভেরেশ্‌চাগিন। সেই ইস্তাহারের ঘটনাটা আপনি হয় তো শুনেছেন।"

বৃদ্ধ লোকটির কঠিন শান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বিশ্বাসঘাতকতার কোন

লক্ষণ সেখানে আছে কি না দেখে পিয়ের বলল, "ওঃ, তাহলে এই সেই ভেরেশ্‌চাগিন!"

অ্যাডজুটান্ট বলল, "না, এ লোকটি সে নয়; যে ইস্তাহারটি লিখেছিল এ তার বাবা। যুবকটি এখন কারাগারে; মনে হয় তার কপালে দুঃখ আছে।"

তারকাপরিহিত একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক এবং গলায় ক্রুশ ঝোলানো একজন জার্মান অফিসার বক্তার দিকে এগিয়ে এল।

অ্যাডজুটান্ট বলল, "জানেন তো, ব্যাপারটা খুবই গোলমেলে। ইস্তাহারটি প্রকাশিত হয় দু'মাস আগে। কাউন্টকে খবরও দেওয়া হয়। তিনি তদন্তের আদেশ দেন। এখানে গেব্রিয়েল আইভানভিচ তদন্ত করেন। ইস্তাহারটি ঠিক তেষট্টি জনের হাত ঘুরেছে। তিনি একজনকে শুধালেন, 'আপনি এটা কার কাছে পেলেন?' 'অমুকের কাছ থেকে।' তিনি আর একজনের কাছে গেলেন। 'আপনি কার কাছে পেলেন?' এইভাবে শেষ পর্যন্ত তিনি পৌঁছে গেলেন একজন অর্ধশিক্ষিত ব্যবসায়ী ভেরেশ্‌চাগিনের কাছে।" অ্যাডজুটান্ট হেসে ফেলল। "তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'তোমাকে এটা কে দিয়েছে?' আসলে কিন্তু সে যে ওটা কার কাছ থেকে পেয়েছে সেটা আমরা জানতাম। পোস্টমাস্টার ছাড়া আর কার কাছে পাবে? কিন্তু তাদের মধ্যে'ও একটা বোঝাপড়া ছিল। সে জবাব দিল: 'কারও কাছ থেকে নয়; আমি নিজেই লিখেছি।' তারা তাকে ভয় দেখাল। জেরা করল, কিন্তু তার এক কথা: 'আমি নিজেই লিখেছি।' কাউন্টকে সেই কথাই বলা হল। তিনি লোকটিকে ডেকে পাঠালেন। 'এ ইস্তাহার তুমি কার কাছে পেয়েছ?' 'আমি নিজেই লিখেছি।' দেখুন, কাউন্টকে তো আপনারা চেনেন," গর্বের হাসি হেসে অ্যাডজুটান্ট বলতে লাগল, "তিনি ভয়ংকর রেগে গেলেন,—আর লোকটির ধৃষ্টতা, মিথ্যাচার, ও একগুঁয়েমির কথা একবার ভাবুন তো।"

পিয়ের বলল, "কাউন্ট চেয়েছিলেন সে বলুক যে ক্ল্যুচারেভ-এর কাছে পেয়েছে? আমি তো তাই জানি!"

অ্যাডজুটান্ট হতাশ হয়ে বলল, "মোটেই না। এছাড়া আরও অনেক পাপকর্মের কৈফিয়ৎ ক্ল্যুচারেভের দেবার ছিল, আর সেই কারণেই তার নির্বাসন হয়েছে। কিন্তু আসল কথা হল কাউন্ট বড়ই বিব্রত হলেন। বললেনও 'তুমি নিজে কি করে এটা লিখতে পারলে?' টেবিলের উপর থেকে তিনি হাম্বুর্গ গেজেটখানা তুলে নিলেন। 'এই তো সেটা! তুমি নিজে এটা লেখ নি, অনুবাদ করেছ মাত্র, আর জঘন্য অনুবাদ করেছ, কারণ তুমি ফরাসী ভাষাটাও জান না, মূর্খ কোথাকার!' আর কি মনে করছেন? লোকটি বলল, 'না, আমি অন্য কোন কাগজপত্র দেখি নি, নিজেই এটা লিখেছি।' আর সেখানেই ইতি ঘটল। কাউন্ট তার বাবাকে ডেকে আনলেন, কিন্তু যুবকটি একতিল নড়ল না। যতদূর মনে হয় তাকে বিচারের জন্য পাঠানো

হয় এবং কঠোর পরিশ্রমের শাস্তি হয়। এখন বাবা এসেছে তার হয়ে উমেদারি করতে। কিন্তু ছেলেটা আসলে অকর্মার ধাড়ি! এ ধরনের ব্যবসায়ীর ছেলে যেরকম হয়ে থাকে—নারীঘাতক ফুলবাবুটি। কোথায় কতকগুলি বক্তৃতা শুনেই ভেবে নিয়েছে যে শয়তানও তার সমকক্ষ নয়। ছোকরা ওইরকমই বটে। এখানে স্টোনব্রীজ-এর পাশে তার বাবা একটা খাবারের দোকান চালায়। জানেন তো, সেখানে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের একটা বড় মূর্তি আঁকা আছে; তাঁর এক হাতে রাজদণ্ড, আর অন্য হাতে একটি গোলক। তারপর, কয়েকদিনের জন্য সেই দেবমূর্তিটিকে নিয়ে বাড়ি নিয়ে এল, আর এনে কি করল জানেন? একটা বদমায়েশ চিত্রকরকে খুঁজে পেতে নিয়ে এল…

অধ্যায়—১১

এই নতুন কাহিনীর মাঝখানে প্রধান সেনাপতির কাছ থেকে পিয়েরের ডাক এল।

সে যখন ঘরে ঢুকল কাউণ্ট রস্তপ্‌চিন তখন মুখটা কুঁচকে হাত দিয়ে কপাল ও চোখ ঘর্ষছিল। একটি বেঁটে লোক কি যেন বলছিল, কিন্তু পিয়ের ঘরে ঢুকতেই সে কথা থামিয়ে বেরিয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে রস্তপ্‌চিন বলে উঠল, "এই যে মহাবীর, কেমন আছ? তোমার সাহসিকতার কথা আমরা শুনেছি। কিন্তু সেকথা নয়। নিজেদের মধ্যেই বলছি বাপু, তুমি কি ভ্রাতৃসংঘের লোক?" পিয়ের চুপ করে রইল। "আমি সঠিক খবরই রাখি বন্ধু, কিন্তু এও জানি ভ্রাতৃসংঘে তো কত লোকই যায়, আর যারা মানুষকে বাঁচাবার নামে রাশিয়াকে ধ্বংস করতে চায় আশা-করি তুমি তাদের দলের নও।"

"হ্যাঁ, আমি ভ্রাতৃসংঘী," পিয়ের জবাব দিল।

"তাহলেই ব্যাপারটা বোঝ হে বাপু! আশাকরি তুমি জান যে মেসার্স স্পেরান্‌স্কি ও ম্যাগ্‌নিৎস্কিকে যথাস্থানে পাঠানো হয়েছে। মিঃ ক্ল্যুচারভেরও সেই দশাই হয়েছে। অন্য যারা সলোমনের মন্দির গড়ার ওজুহাতে পিতৃভূমির মন্দিরকে ধ্বংস করতে চেয়েছে তাদেরও সেই একই দশা হয়েছে। এসব কাজের স্বপক্ষে যে যথেষ্ট যুক্তি আছে তা তুমি নিশ্চয় বোঝ, আর ক্ষতিকর লোক না হলে পোস্টমাস্টারটিকে আমি নির্বাসনে পাঠাতাম না। এখন আমি জানতে পেরেছি যে তার শহর ছেড়ে যাবার ব্যাপারে তোমার গাড়িটা তুমি তাকে ধার দিয়েছ এবং নিরাপদ আশ্রয়ে রাখার জন্য তার কাগজপত্র-গুলিও নিয়েছ। আমি তোমাকে ভালবাসি, তোমার কোন ক্ষতি হোক তা আমি চাই না; আর—যেহেতু তুমি আমার অর্ধেক বয়সের ছেলে—তাই বাবার মতই তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি এধরনের লোকের সঙ্গে সব সম্পর্ক

ছিন্ন করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে চলে যাও।"

"কিন্তু ক্ল্যুচারভ অন্যায়টা কি করেছে কাউণ্ট ?" পিয়ের জিজ্ঞাসা করল।

রস্তপ্‌চিন চেঁচিয়ে বলল, "সেটা আমার জানবার কথা, কিন্তু তোমার প্রশ্ন করবার কথা নয়।"

রস্তপ্‌চিনের দিকে না তাকিয়েই পিয়ের বলল, "নেপোলিয়নের ইস্তাহার প্রচারের অভিযোগ আনা হয়েছে তার বিরুদ্ধে, কিন্তু কাজটা যে সেই করেছে তাতো প্রমাণ হয় নি। আর ভেরেশ্‌চাগিন···"

"তাই নাকি ?" হঠাৎ ভুরু কুঁচকে রস্তপ্‌চিন চেঁচিয়ে বলল। "ভেরেশ্‌চাগিন একটা দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক; তার উপযুক্ত শাস্তি সে পাবে। কিন্তু আমার কাজের সমালোচনা করার জন্য আমি তোমাকে ডাকি নি, ডেকেছি পরামর্শ দিতে—ইচ্ছা করলে আদেশও বলতে পার। আমার অনুরোধ, তুমি শহর ছেড়ে চলে যাও, ক্ল্যুচারেভর মত লোকদের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন কর। যেকোন লোকের মাথার পোকা আমি বের করে দেবই"—হঠাৎ তার খেয়াল হল যে বিনা দোষেই সে বেজুকভকে ধমকাচ্ছে; তাই বন্ধুর মত পিয়েরের হাতখানা হাতে নিয়ে বলল, "একটা চরম বিপর্যয়ের মুখে আমরা দাঁড়িয়েছি; যাদের নিয়ে আমাকে কাজ করতে হয় তাদের প্রতি ভদ্রতা দেখাবার মত সময় আমার নেই। আমার মাথার মধ্যে ঘূর্ণিঝড় চলছে। আচ্ছা বাপু, বলতো, ব্যক্তিগতভাবে তুমি কি করছ ?"

চোখ না তুলে, অথবা মুখের চিন্তিত ভাবটা না বদলেই, পিয়ের জবাব দিল, "কেন, কিছুই করছি না।"

কাউণ্টের চোখে ভ্রূকুটি।

"বন্ধু হিসাবে একটা উপদেশ দিচ্ছি বাপু। যত তাড়াতাড়ি পার কেটে পড়। এছাড়া আমার আর কিছু বলার নেই। শুনবার মত কান যার আছে সেই তো সুখী। বিদায়। ওহো, ভাল কথা," দরজার দিকে তাকিয়ে পিয়েরকে চেঁচিয়ে বলল "একথা কি সত্যি যে কাউণ্টেস যীশু সমিতির পবিত্র পিতাদের খপ্পরে পড়েছেন ?"

পিয়ের জবাব দিল না, ঘর থেকে চলে গেল; এত রুষ্ট ও ক্রুদ্ধ সে আগে কখনও হয় নি।

যখন বাড়ি ফিরল তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। সেদিন সন্ধ্যায় জন-আষ্টেক লোক তার সঙ্গে দেখা করতে এল; একজন কমিটির সেক্রেটারি, তার ব্যাটেলিয়নের একজন কর্ণেল, তার নায়েব ও আরও কিছু খাতক। সকলেই কোন না কোন কাজ নিয়ে তার কাছে এসেছে। কিন্তু কোন কথাই পিয়েরের ভাল লাগছে না, ভাল করে বুঝতেও পারছে না, শুধু তাদের হাত এড়াবার জন্যই কোনরকমে জবাব দিতে লাগল। সকলে চলে গেলে যখন একলা

হল তখন স্ত্রীর চিঠিটা খুলে পড়ল।

"তারা, কামানশ্রেণীর সৈন্যরা, প্রিন্স আন্দ্রু নিহত...সেই বুড়ো মানুষটি ...সরলতাই ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ। কষ্টভোগ করাও দরকার...সব কিছুর অর্থ...প্রস্তুত থাকতে হবে...আমার স্ত্রী বিয়ে করতে যাচ্ছে...ভুলতে হবে, বুঝতে হবে..." পোশাক না ছেড়েই সে বিছানায় শুয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই নায়েব এসে খবর দিল, কাউণ্ট রস্তপ্‌চিনের বিশেষ দূত হিসাবে একজন পুলিশ অফিসার এসে জানতে চাইছে, কাউণ্ট বেজুখভ শহর ছেড়ে চলে গেছে কি না, অথবা যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে কি না।

নানা কাজে ডজনখানেক লোক বৈঠকখানায় পিয়েরের জন্য অপেক্ষা করছে। তাড়াতাড়ি পোশাক পরে তাদের সঙ্গে দেখা করতে না গিয়ে পিয়ের পিছনের বারান্দা দিয়ে ফটক পেরিয়ে বেরিয়ে গেল।

সেইসময় থেকে মস্কোর ধ্বংস শেষ হওয়া পর্যন্ত বেজুখভ পরিবারের লোকজনরা অনেক খোঁজখবর করেও পিয়েরকে আর কখনও দেখতে পেল না, বা সে কোথায় আছে তাও জানতে পারল না।

অধ্যায়—১২

১লা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অর্থাৎ শত্রুপক্ষ শহরে ঢোকার আগে পর্যন্ত রস্তভরা মস্কোতেই রইল।

অবলেন্‌স্কির কসাক রেজিমেণ্টে যোগ দিয়ে পেত্‌য়া বেলায়া জারকভ-এর উদ্দেশে যাত্রা করার পর থেকেই কাউণ্টেসের মনে ভয় ধরল। জনৈক পরিচিতের তার দুই ছেলেই যুদ্ধে গেছে, দুজনই তার আশ্রয় থেকে দূরে চলে গেছে, আজ হোক কাল হোক তিন ছেলের মতই তারা দুজনই বা যে কোন একজন মারা যেতে পারে—এই চিন্তা সেই গ্রীষ্মকালেই সর্বপ্রথম নিষ্ঠুর সত্যের মত তার মনে এল। সে নিকলাসকে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করল, নিজেই পেত্‌য়ার কাছে চলে,যেতে চাইল, বা পিতার্স্‌বুর্গের কাছাকাছি কোথাও তার জন্য একটা চাকরির চেষ্টা করল, কিন্তু কোনটাই সম্ভব হল না। কাউণ্টেস রাতে ঘুমতে পারে না, অথবা ঘুমলেও স্বপ্ন দেখে তার ছেলেরা মরে পড়ে আছে। অনেক সলা-পরামর্শ ও আলাপ-আলোচনার পরে কাউণ্ট তাকে শান্ত করার একটা উপায় বের করল। পেতয়াকে অবলেন্‌স্কির রেজিমেণ্ট থেকে বদলি করিয়ে মস্কোর কাছে ট্রেনিংরত বেজুখভের রেজিমেণ্টে আনার ব্যবস্থা করল। সামরিক চাকরিতে থাকলেও এই বদলির ফলে কাউণ্টেসের মনে এইটুকু সান্ত্বনা থাকবে যে তার একটি ছেলে অন্তত তার পক্ষছায়ায় থাকবে এবং এখান থেকে তার যুদ্ধে যোগদান করার সম্ভাবনাটা অনেক কম।

পেত্য়ার ফিরে আসার সময় যতই কাছে আসতে লাগল কাউণ্টেস ততই অস্থির হয়ে উঠল। তার কেবলই মনে হতে লাগল যে এত সুখ তার কপালে সইবে না। সোনিয়া, প্রিয় নাতাশা, এমন কি স্বামী কাছে এলেও সে বিরক্ত হয়। ভাবে, "তাদের দিয়ে আমি কি করব? পেত্য়া ছাড়া অন্য কাউকে আমি চাই না।"

অগস্টের শেষ দিকে রস্তভরা নিকলাসের একটা চিঠি পেল। ঘোড়া কিনতে ভরোনেজ প্রদেশে গিয়ে সেখান থেকেই সে চিঠি লিখেছে। কিন্তু চিঠি পেয়েও কাউণ্টেসের অস্থিরতা গেল না। একটি ছেলে এখন বিপদমুক্ত হয়েছে জেনে পেত্য়ার জন্য তার উদ্বেগ আরও বেড়ে গেছে।

২০শে অগস্ট নাগাদ রস্তভদের পরিচিত প্রায় সকলেই মস্কো ছেড়ে চলে গেল; সকলে অনেক পীড়াপীড়ি করা সত্ত্বেও তার সোনা-মাণিক পেত্য়া ফিরে না আসা পর্যন্ত কাউণ্টেস কিছুতেই মস্কো ছেড়ে যেতে রাজী হল না। সে এল ২৮শে অগস্ট। যে গভীর মমতায় মা তাকে কাছে টেনে নিল তাতে ষোল বছরের অফিসার খুশি হল না। ছেলেকে বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখার বাসনা গোপন করে রাখলেও পেত্য়া মার মনের কথা বুঝতে পারল এবং পাছে সে নিজেও আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, পাছে তার আচরণে 'মেয়েলিপনা' প্রকাশ পায়, এই আশংকায় সে মাকে এড়িয়ে চলতে লাগল, এবং যে ক'টা দিন মস্কোতে থাকল সে সময়টা নাতাশাকে নিয়েই কাটাতে লাগল; নাতাশার প্রতি চিরদিনই একটা প্রায় প্রেমিকসুলভ ভ্রাতৃস্নেহ সে পোষণ করত।

কাউণ্টের চিরাচরিত অব্যবস্থার ফলে ২৮শে তারিখে তাদের যাত্রার কোন আয়োজনই করা হয় নি। সংসারের মালপত্র বয়ে নেবার জন্য রিয়াজান ও মস্কোর জমিদারি থেকে যেসব গাড়ি আসার কথা তারা ৩০শে তারিখের আগে এসে পৌঁছল না।

২৮শে থেকে ৩১শে পর্যন্ত সারা মস্কো হৈ-হল্লায় তোলপাড় হয়ে উঠল। প্রতিদিন হাজার হাজার আহত সৈন্যকে বরদিনো থেকে দরগমিলভ ফটক দিয়ে এনে মস্কোর নানা অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হতে লাগল, আর হাজার হাজার গাড়ি অধিবাসীদের ও তাদের মালপত্র নিয়ে অন্য সব ফটক দিয়ে মস্কো থেকে বেরিয়ে যেতে লাগল। রস্তপ্চিনের ইস্তাহার সত্ত্বেও, সেগুলির জন্যই হোক অথবা ছাড়াই হোক, পরস্পরবিরোধী বিস্ময়কর সব গুজব শহরময় ছড়াতে লাগল। কেউ বলছে, কাউকে শহর ছেড়ে যেতে দেওয়া হবে না; আবার কেউ বলছে, সব দেবমূর্তিগুলিকে গির্জা থেকে বের করে আনা হয়েছে। এবং সকলকেই মস্কো ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়েছে। কেউ বলছে, বরদিনোর পরে আর একটা যুদ্ধ হয়েছে এবং সেখানে ফরাসীরা হটে গেছে; আবার কেউ বলছে উল্টো কথা—রুশবাহিনী ধ্বংস হয়ে গেছে।

কিন্তু গুজব যাই রটুক, একটা কথা সকলেই বুঝতে পেরেছে যে মস্কো ছেড়ে যেতেই হবে; কাজেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরে গিয়ে নিজ নিজ জিনিসপত্র বাঁচাবার চেষ্টা করাই কর্তব্য।

মস্কো দখলের আগের তিনটে দিন রস্তভ পরিবারের সকলেই নানা কাজে ব্যস্ত থাকল। পরিবারের কর্তা কাউণ্ট ইলিয়া রস্তভ অনবরত শহরময় ঘুরে সবরকম গুজব সংগ্রহ করে এনে বাড়ি ফিরে তাড়াতাড়ি যাত্রার আয়োজন শেষ করার হুকুম চালাতে লাগল।

কাউণ্টেস মালপত্র বাঁধাছাঁদা করা দেখছে, সবকিছুতেই খুঁতখুঁত করছে, সবসময় পেত্‌য়ার পিছন পিছন ঘুরছে, আর সে সর্বদা নাতাশার সঙ্গে থাকছে দেখে ঈর্ষায় জলছে। কাজের কাজ যা সেটুকু করছে সোনিয়া। কিন্তু ইদানীং সে'ও খুব বিষণ্ণ ও চুপচাপ হয়ে গেছে। নিকলাসের চিঠিতে প্রিন্সেস মারির সঙ্গে তার দেখা হওয়ার সংবাদ পড়ে কাউণ্টেস সোনিয়ার সামনেই খুশিমনে বলেছিল যে প্রিন্সেস ও নিকলাসের এই দেখা-সাক্ষাতে করুণাময় ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ দেখা যাচ্ছে।

কাউণ্টেস বলেছিল, "নাতাশার সঙ্গে বলকন্‌স্কির বিয়ের প্রস্তাবে আমি কোনদিনই খুশি হই নি; আমি সবসময়ই চেয়েছি নিকলাস প্রিন্সেসকে বিয়ে করুক, আর আমি এও জানতাম যে সেটাই ঘটবে। তাহলে কী ভালই না হয়!"

সোনিয়া বোঝে যে সেটাই ঠিক: নিকলাস একটি ধনবতী মহিলাকে বিয়ে করলে তবেই রস্তভদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটতে পারে, আর সেদিক থেকে প্রিন্সেসই যোগ্য পাত্রী। কিন্তু তার পক্ষে ব্যাপার বড়ই তিক্ত। তবু নিজের সব দুঃখ কষ্ট সত্ত্বেও সারাদিন সেই যাত্রার উদ্যোগ-আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে। কাউণ্ট আর কাউণ্টেস তো হুকুম করেই খালাস। পেত্‌য়া ও নাতাশা তো সারাদিন ছুটোছুটি করেই বেড়াচ্ছে; কাজে সাহায্য করার বদলে তারা বরং বাঁধার সৃষ্টি করছে। মনে মনে তারা দুজনই খুব খুশি। তাদের খুশির একটা বড় কারণ যুদ্ধটা মস্কোর দিকে এগিয়ে আসছে, শহরের ফটকে-ফটকেই যুদ্ধ হবে, সকলকেই অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া হচ্ছে, সকলেই পালাচ্ছে —কোথাও না কোথাও চলে যাচ্ছে; মোটকথা একটা অসাধারণ কিছু ঘটতে যাচ্ছে, আর সেটা সব সময়ই উত্তেজক, বিশেষতঃ যুবক-যুবতীদের কাছে।

অধ্যায়—১৩

৩১শে অগস্ট শনিবার রস্তভদের বাড়ির সে এক লণ্ডভণ্ড অবস্থা। দরজাগুলো হাট করে খোলা, আসবাবপত্র হয় বের করে নেওয়া হচ্ছে নয়তো এ-ঘর থেকে ও-ঘর করা হচ্ছে, আয়না ও ছবিগুলো সব নামিয়ে ফেলা হয়েছে। ঘরময় ট্রাংক ভর্তি, খড়, প্যাকিং-এর কাগজ ও দড়ি ইতস্তত ছড়ানো। চাষী

ও গৃহ-ভৃত্যারা মালপত্র নিয়ে ভারী কার্পেটের উপর দিয়ে থপ্‌থপ্‌ করে হাঁটছে। উঠোনে চাষীদের গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে; কতকগুলি উঁচু করে বোঝাই হয়ে দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়ে গেছে, কতকগুলি এখনও খালি।

কাউণ্ট সকালেই বেরিয়ে গেছে। হৈ-হট্টগোলে কাউণ্টেসের মাথা ধরেছে; ভিনিগারের পট্টি মাথায় লাগিয়ে সে নতুন বসবার ঘরে শুয়ে আছে। পেত্‌য়া বাড়ি নেই; বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেছে; তার সঙ্গে একযোগে অসামরিক বিভাগ থেকে সোজা সামরিক বিভাগে বদলির জন্য চেষ্টা করছে। সোনিয়া নাচঘরে কাঁচের ও চীনে মাটির বাসনপত্র প্যাক করার তদারকি করছে। চারদিকে ছড়ানো পোশাক, ফিতে ও স্কার্ফের মধ্যে একটা পুরনো বল-নাচের পোশাক হাতে নিয়ে নাতাশা মেঝেতে বসে আছে।

সকলেই কাজে ব্যস্ত অথচ সে নিজে কিছুই করছে না—এতে নাতাশা লজ্জা বোধ করছে; সকাল থেকে বারকয়েক কাজ করতে চেষ্টাও করেছে, কিন্তু তাতে মন দিতে পারে নি, আর সমস্ত মন দিয়ে সাধ্যমত কাজ করতে না পারলে কোন কাজ করা তার পক্ষে সম্ভবই নয়। চীনামাটির বাসন বাঁধা-ছাঁদার সময় সে কিছুক্ষণ সোনিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে তাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করল, কিন্তু একটু পরেই সে চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে। পুরনো পোশাক ও ফিতেগুলি দাসীদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে প্রথমটায় বেশ মজাই লাগল, কিন্তু সেকাজটা শেষ হয়ে গেলে তার আর কাজে উৎসাহ রইল না।

"দুনিয়াশা, তুমি সব গুছিয়ে বেঁধে ফেল! কি বল সোনা?" দুনিয়াশা রাজী হতেই নাতাশা মেঝের উপর বসে পড়ে পুরনো বল-নাচের পোশাকটা হাতে নিয়ে এমন একটা দিবাস্বপ্নের মধ্যে ডুবে গেল যার সঙ্গে তার বর্তমান চিন্তাধারার সঙ্গে কোন সম্পর্কই নেই। পাশের ঘরে দাসীদের কথাবার্তায় তার দিবাস্বপ্ন ভেঙে গেল, তারা সকলেই বারান্দায় ছুটে যাচ্ছে। নাতাশা উঠে জানালা দিয়ে তাকাল। আহত মানুষে বোঝাই গাড়ির একটা লম্বা সারি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে।

দোকানী, বুড়ি নার্স, রাঁধুনি, কোচয়ান, পরিচারক, গাড়োয়ান ও খানসামার দল ফটকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আহতদের দেখছে।

একখানা পরিষ্কার ছোট রুমাল মাথার উপর ফেলে দুই হাতে তার দুটো কোণ ধরে নাতাশা রাস্তায় নেমে গেল।

আগেকার গৃহকর্ত্রী মাভ্রা কুজ্‌মিনিচ্‌না ভিড় ঠেলে বাকলের মাদুরে তৈরি ছইওয়ালা একটা গাড়ির কাছে গিয়ে ভিতরে শায়িত একটি বিবর্ণ তরুণ অফিসারের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। নাতাশা কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে সলজ্জভাবে থেমে গেল এবং তার কথাগুলি মন দিয়ে শুনতে লাগল; রুমালটা তখনও তার হাতেই ধরা আছে।

সে তখন বলছে, "তাহলে মস্কোতে আপনার কেউ নেই? কোন একটা বাড়িতে থাকতে পারলেই আপনার পক্ষে ভাল হয়···ধরুন আমাদের বাড়িতে ....বাড়ির লোকরা চলে যাচ্ছেন।"

অফিসারটি ক্ষীণ গলায় বলল, "সে অনুমতি মিলবে কি না জানি না। ঐ আমাদের কম্যাণ্ডিং অফিসার আসছেন, তাকে জিজ্ঞাসা করুন," বলে সে একজন মজবুত গড়নের মেজরকে দেখিয়ে দিল।

ভয়ার্ত চোখে আহত অফিসারটির দিকে তাকিয়ে নাতাশা তৎক্ষণাৎ মেজরের দিকে এগিয়ে গেল।

শুধাল, "আহত লোকরা কি আমাদের বাড়িতে থাকতে পারে?"

মেজর একটু হেসে টুপিতে হাত রাখল।

চোখ কুঁচকে হেসে বলল, "আপনি কোন্‌টিকে চান মাদ্‌ময়জেল?"

নাতাশা শান্তভাবে প্রশ্নটারই পুনরাবৃত্তি করল; তার মুখের গম্ভীরভাব ও চালচলন দেখে মেজরের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, একটু ভেবে নিয়ে ইতিবাচক জবাব দিল।

বলল, "হ্যাঁ, কেন পারবে না? নিশ্চয় থাকতে পারে।"

ঘাড়টা ঈষৎ কাৎ করে নাতাশা দ্রুতপায়ে মাভ্রা কুজ্‌মিনিচ্‌নার কাছে ফিরে গিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, "ওরা থাকতে পারে। উনি বললেন থাকতে পারে!"

যে গাড়িতে অফিসারটি শুয়েছিল সেটাকে রস্তভদের উঠোনে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। বাকি গাড়িগুলোকে প্রোভার্স্কায়া স্ট্রীটের অধিবাসীদের আমন্ত্রণে হয় তাদের উঠোনে ঢুকিয়ে দেওয়া হল, নয়তো তাদের ফটকের সামনে থামিয়ে দেওয়া হল। দৈনন্দিন জীবনের রুটিন-বাঁধা কাজের বাইরে নতুন লোকদের নিয়ে একটা কিছু করার সুযোগ পেয়ে নাতাশা খুব খুশি। সে ও মাভ্রা কুজ্‌মিনিচ্‌না দুজনে মিলে যত পারল তত বেশী আহত সৈনিকদের তাদের উঠোনে নিয়ে আসতে চেষ্টা করল।

মাভ্রা কুজ্‌মিনিচ্‌না বলল, "আপনার বাবাকে কিন্তু বলা উচিত।"

"ওসব কথা রাখুন। অসুবিধার কি আছে? একটা দিনের জন্য আমরা বৈঠকখানায় চলে যেতে পারি। আমাদের বাড়ির অর্ধেকটাই ওরা পেতে পারে।"

"কিন্তু ভাল করে ভেবে দেখুন। এদের যদি একটা কোণের অংশে চাকরদের ঘরে অথবা নার্সদের ঘরেও রাখি, তাহলেও তো অনুমতির দরকার।"

"বেশ তো, আমি অনুমতি আনছি।"

নাতাশা ছুটে বাড়ির ভিতর চলে গেল। বৈঠকখানার আধখোলা দরজা দিয়ে পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকল। ঘরটা ভিনিগার ও হফ্‌ম্যান ড্রপ-এর গন্ধে ভর্তি।

"মামণি কি ঘুমিয়েছ?"

"আরে, ঘুম আবার কোথায়?"—ঝিমুনি কাটিয়ে জেগে উঠে কাউণ্টেস বলল।

মায়ের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে নিজের মুখটা তার মুখের কাছাকাছি নিয়ে নাতাশা বলল, "লক্ষ্মী মামণি! আমি দুঃখিত, তুমি আমাকে ক্ষমা কর, একাজ আর কখনও করব না। তোমার ঘুমটাই ভাঙিয়ে দিলাম! মাভ্রা কুজ্‌মিনিচ্‌না আমাকে পাঠিয়ে দিল: ওরা কয়েকজন আহত অফিসারকে এখানে নিয়ে এসেছে। তুমি কি তাদের থাকতে দেবে? কোথাও তাদের যাবার জায়গা নেই। আমি জানতাম তুমি তাদের থাকতে দেবে…" এক নিঃশ্বাসে সে কথাগুলি শেষ করল।

"কোন্ অফিসার? কাদের নিয়ে এসেছে? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।" কাউণ্টেস বলল।

নাতাশা হেসে উঠল; কাউণ্টেসের মুখেও মৃদু হাসি।

"আমি জানতাম তুমি অনুমতি দেবে…তাহলে ওদের বলি গে," মাকে চুমো খেয়ে নাতাশা দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

হল-এ বাবার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কাউণ্ট খারাপ খবর নিয়ে এসেছে। বিরক্তিভরা গলায় বলল, "আমাদের বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে! ক্লাব বন্ধ হয়ে গেছে; পুলিশও চলে যাচ্ছে।"

"বাপি, কয়েকজন আহত লোককে আমি বাড়িতে ডেকে এনেছি—ঠিক করি নি বাপি?" নাতাশা বলল।

কাউণ্ট অন্যমনস্কভাবেই জবাব দিল, "তা তো বটেই। কিন্তু সেটা তো কথা নয়। ও সব আজেবাজে কাজে মন দেবার সময় এখন নয়, গোছগাছে হাত লাগাও, কাল আমাদের যেতেই হবে, অবশ্য যেতে হবে!…"

বড় নায়েব ও চাকরবাকরদেরও কাউণ্ট সেই একই হুকুম দিল।

ডিনারের সময় বাড়িতে ফিরে পেত্‌য়া বাইরে যেসব খবর শুনে এসেছে তাই বলল। ক্রেমলিন-এ সকলকে অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া হচ্ছে; যদিও রস্তপ্‌চিনের ইস্তাহারে বলা হয়েছে যে দু' তিনদিন আগেই সকলকে ডাক দেওয়া হবে তবু ইতিমধ্যেই হুকুম জারি হয়ে গেছে যে সকলকেই সশস্ত্র হয়ে আগামীকাল তিন পাহাড়ে সমবেত হতে হবে; সেখানে একটা বড় রকমের যুদ্ধ হবে।

ছেলের আগ্রহে উত্তেজিত মুখের দিকে তাকিয়ে কাউণ্টেসের বুক কেঁপে উঠল। সে বুঝল, এখন যদি ছেলেকে যুদ্ধে না যাওয়ার কথা বলা হয় তাহলে সে সৈনিক, মর্যাদা, পিতৃভূমি প্রভৃতি এমন সব অর্থহীন, পুরুষসুলভ, একগুঁয়ে কথা বলতে শুরু করবে যার প্রতিবাদ করা যায় না; কাজেই তার আগেই যাত্রার আয়োজন শেষ করে পেত্‌য়াকে তাদের দেখাশুনা করার দায়িত্ব দিয়ে সঙ্গে নিয়ে যাবার আশায় কাউণ্টেস তার কথার কোন জবাব দিল না; ডিনারের পরেই কাউণ্টকে একপাশে ডেকে নিয়ে চোখের জল ফেলে তাকে

মিনতি করল, অতিক্রুত, সম্ভব হলে সেই রাতেই যেন তাদের সকলকে এখান থেকে চলে যেতে না পারলে আতংকেই সে মারা যাবে। এখন যে সে সব কিছুতেই ভয় পাচ্ছে সেকথা লুকোবার কোন চেষ্টাই সে করল না।

অধ্যায়—১৪

মাদাম শোস তার মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে বাইরে গিয়েছিল। মিয়াস্-নিৎস্কি স্ট্রীটে একটা মদের দোকানে সে যা দেখে এসেছে সে বিবরণ শুনে কাউণ্টেসের ভয় আরও বেড়ে গেল। সেই রাস্তা দিয়ে ফিরবার সময় দোকানের সামনে মাতালদের হৈ-হুল্লোড়ের জন্য সে পথ দিয়ে হাঁটতে পারে নি। একটা গাড়ি নিয়ে গলির পথ ধরে বাড়ি ফিরেছে। গাড়ির চালক তাকে বলেছে, সরকারী হুকুম পেয়ে লোকজনরা মদের দোকানের পিপে ভেঙে মদ গিলছে।

ডিনারের পরে রস্তভ পরিবারের সকলেই মহা উৎসাহে জিনিসপত্র বাঁধা-ছাঁদার কাজে লেগে পড়ল। বুড়ো কাউণ্টও হঠাৎ কাজে লেগে গেল। সে একবার উঠোন থেকে ঘরে ঢুকছে, আবার ঘর থেকে উঠোনে নামছে, আর সারাক্ষণ এলোমেলো হুকুম চালাচ্ছে আর দাপাদাপি করছে। পেত্‌য়া উঠোনের কাজের তদারকি করছে। কাউণ্টের এলোমেলো হুকুমদারীর ফলে সোনিয়ার মাথাই গুলিয়ে গেছে, সে যে কি করবে তাই বুঝতে পারছে না। চাকরবাকররা ঘরে ও উঠোনে ছুটোছুটি করছে আর তর্কাতর্কি করছে। নাতাশা সব দেখেশুনে কাজে হাত লাগাল।

কাউণ্ট অনেক মূল্যবান বুটীদার ফরাসী পর্দা ও পারসিক কার্পেট দিয়ে ঘর সাজিয়েছিল। নাতাশা কাজে নেমেই দেখল নাচঘরে দুটো বাক্স খোলা পড়ে আছে; একটা বাসনপত্রে প্রায় ভর্তি, আর একটাতে বোঝাই করা হয়েছে কার্পেট। এখন টেবিলের উপর অনেক জিনিস পড়ে আছে এবং ভাঁড়ার ঘর থেকে আরও জিনিস আনা হচ্ছে। ফলে চাকরদের আরও একটা বাক্স আনতে পাঠানো হয়েছে।

নাতাশা বলল, "সোনিয়া, একটু সবুর কর—এই দুটো বাক্সেই সব ভরা যাবে।"

"পারবেন না মিস, আমরা চেষ্টা করে দেখছি," খানসামার সহকারীটি বলল।

"না, এক মিনিট সবুর কর।"

নাতাশা দ্রুত হাতে কাগজে মোড়া ডিস-প্লেটগুলো বাক্সের ভিতর থেকে বের করতে লাগল।

বলল, "ডিসগুলো কার্পেটের সঙ্গে এখানে যাবে।"

"সে কি! শুধু কার্পেটগুলোকে তিনটে বাক্সে ধরাতে পারাই তো মহা-

ভাগ্যের কথা," খানসামার সহকারীটি বলল।

"আঃ, দয়া করে থাম!" নাতাশা দ্রুত হাতে অত্যন্ত কৌশলের সঙ্গে জিনিসগুলো সাজাতে শুরু করল। এগুলোর কোন দরকার নেই, কিছু কিয়েভ-এর থালা সে একপাশে সরিয়ে রাখল। "এগুলো—হ্যাঁ, এগুলো কার্পেটের মধ্যেই যাবে," চীনে মাটির স্যাক্সনি ডিসগুলি দেখিয়ে বলল।

সোনিয়া তিরস্কারের সুরে বলল, "ছাড় তো নাতাশা! আমরাই সব প্যাক করছি!"

কিন্তু নাতাশা তার কথা শুনল না। সবকিছু বের করে নতুন করে প্যাক করতে বসল; স্থির করল, কমদামী রুশ কার্পেট ও অপ্রয়োজনীয় চীনে মাটির বাসনগুলি মোটেই নেবে না। বাক্স থেকে সব জিনিস বের করে তারা যখন নতুন করে প্যাক করতে শুরু করল তখন সস্তা দামের জিনিসপত্রগুলো প্রায় সব বাদ দিয়ে দেখা গেল যে মূল্যবান জিনসগুলো প্রায় সবই দুটো বাক্সেই ধরে গেল। শুধু কার্পেটের বাক্সের ডালাটা কিছুতেই পড়ছে না। আরও কিছু জিনিস হয় তো বাদ দেওয়া যেত, কিন্তু নাতাশা নিজের ইচ্ছা মতই কাজ করতে লাগল। জিনিসগুলো নতুন করে সাজিয়ে—বসিয়ে পেত্‌য়া ও খানসামার সহকারীকে বলল ডালাটাকে চেপে ধরতে। নিজেও সাধ্যমত চাপ দিতে লাগল।

সোনিয়া বলল, "যথেষ্ট হয়েছে নাতাশা। দেখছি তোমার কথাই ঠিক, কিন্তু উপর থেকে আর একটা জিনিস বের করে নিলেই তো হয়।"

"না, কিছুই বের করব না!" নাতাশা চেঁচিয়ে বলল। একহাতে ঘর্মাক্ত মুখের উপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে অন্য হাতে কার্পেটগুলোকে চেপে ধরে বলল, "এবার চাপ দাও পেত্‌য়া! চাপ দাও ভাসিলিচ, জোরে চাপ দাও!"

কার্পেটগুলো একটু বসে গেল, আর ডালাটাও বন্ধ হল। নাতাশা খুশিতে হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, তার চোখ দুটি জলে ভরে গেল। কিন্তু মুহূর্তমাত্র। সে আবার নতুন করে কাজে হাত দিল, আর এবার সকলেই তার উপর পুরোপুরি ভরসা পেল। এমন কি কাউন্টকে যখন বলা হল যে নাতাশা তার অনেক হুকুম বাতিল করে দিয়েছে তখনও সে মোটেই রাগ করল না।

কিন্তু সকলে মিলে অনেক রাত পর্যন্ত যথেষ্ট খেটেও সব জিনিস প্যাক করে শেষ করা গেল না। কাউন্টেস আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে, আর কাউন্টও পরদিন সকাল পর্যন্ত যাত্রা স্থগিত রেখে শুতে চলে গেল।

সোনিয়া ও নাতাশা পোশাক না ছেড়ে বসার ঘরেই ঘুমিয়ে পড়ল।

সেই রাতেই পোভার্স্কায়ার পথ ধরে আরও একটি আহত লোককে নিয়ে আসা হল। মাভ্রা কুজ্‌মিনিচ্‌না ফটকেই দাঁড়িয়েছিল; সেই তাকে রস্তভদের

বাড়ির উঠোনে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করল। মাভ্রা কুজ্‌মিনিচ্‌নার মনে হল সে একটি জাঁদরেল লোক। একটা ভাল ঢাকা গাড়িতে করে তাকে আনা হয়েছে; তার শরীরটা আগাগোড়া এপ্রন দিয়ে ঢাকা। চালকের বক্সের পাশে বসেছিল একটি সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ পরিচারক। গাড়ির পিছন পিছন এল একজন ডাক্তার ও দুটি সৈনিক।

বুড়ি গৃহকর্ত্রী বুড়ো পরিচারকটিকে বলল, "দয়া করে এখানে আসুন। মনিবরা চলে যাচ্ছেন, কাজেই পুরো বাড়িটাই খালি হয়ে যাবে।"

বুড়ো লোকটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "বেশ তো তাই হোক। ওকে যে জীবিত অবস্থায় বাড়িতে নিয়ে যেতে পারব সে আশা আর করি না! মস্কোতে আমাদের নিজেদের একটা বাড়ি আছে, কিন্তু সেটা তো এখান থেকে অনেক দূর, আর সে বাড়িতে এখন কেউই নেই।"

মাভ্রা কুজ্‌মিনিচ্‌না বলল, "দয়া করে ভিতরে আসুন, আমার মনিবের বাড়িতে সবকিছুই পাবেন। ···উনি কি খুবই অসুস্থ?"

পরিচারকটি হতাশার ভঙ্গী করল।

"ওকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারব বলে আর আশা নেই! ডাক্তার ডাকতে হবে!"

বুড়ো বক্স থেকে নেমে পিছনের গাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল।

ডাক্তার বলল, "ঠিক আছে।"

বুড়ো আবার তাদের গাড়িতে ফিরে এল; ভিতরে তাকিয়ে হতাশভাবে ঘাড় নাড়ল, কোচয়ানকে উঠোনে ঢুকতে বলে মাভ্রা কুজ্‌মিনিচ্‌নার পাশে দাঁড়াল।

বুড়ি বলল, "হা প্রভু যীশুখৃস্ট।"

আহত লোকটিকে বাড়ির ভিতরে নিয়ে যেতে বলল। "মনিবরা কোনরকম আপত্তি করবেন না···"

আহত লোকটিকে দোতলায় তোলা যাবে না। কাজেই নীচের যে ঘরটা মাদাম শোসকে দেওয়া হয়েছে সেখানেই তাকে তোলা হল।

আহত লোকটি প্রিন্স আন্‌দ্রু বলকন্‌স্কি।

অধ্যায়—১৫

মস্কোর শেষের দিনটি এসে পড়ল। হেমন্তের একটি উজ্জ্বল রবিবার। প্রতি রবিবারের মতই সর্বত্র গির্জায় ঘণ্টা বাজত। শহরের কপালে কি যে আসছে তা এখনও কেউ বুঝতে পারছে না।

শুধু দুটো জিনিস থেকে মস্কোর সামাজিক অবস্থাটার হদিস পাওয়া যাচ্ছে—দরিদ্র জনসাধারণ আর জিনিসপত্রের দাম। কারখানার শ্রমিক, গৃহ-ভৃত্য ও চাষীদের একটা মস্ত বড় দল—কিছু অফিসার, ধর্মীয় মহাবিদ্যা-

লয়ের ছাত্র ও ভদ্রলোকও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে—খুব সকালেই তিন পাহাড়ে চলে গেছে। সেখানে তারা রস্তপ্‌চিনের জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল, কিন্তু সে এল না; তখন তাদের দৃঢ় ধারণা হল যে মস্কো পরিত্যাগ করা হবে, আর তারাও শহরের নানা মদের দোকানে ও খাবার দোকানে ছড়িয়ে পড়ল। সেদিনকার দ্রব্যমূল্য থেকেও অবস্থাটা বোঝা গেল। অস্ত্রশস্ত্র, সোনা, ও গাড়ি-ঘোড়ার দাম বাড়ছে, আর নোটের মূল্যবান ও নাগরিক প্রয়োজনের জিনিসপত্রের দাম ক্রমাগত কমছে; ফলে দুপুর নাগাদ দেখা গেল, কাপড় ইত্যাদি মূল্যবান জিনিস গাড়িভর্তি করে নিয়ে গিয়ে তার বিনিময়ে দাম পেল গাড়ি ভাড়ার অর্ধেক; ওদিকে চাষীদের ঘোড়া প্রতি ভাড়া উঠল পাঁচ শ' রুবল, আর আসবাবপত্র, আয়না ও ব্রোঞ্জের জিনিস বিনামূল্যে বিলিয়ে দেওয়া হতে লাগল।

রস্তভদের সেকেলে বাড়িতে কিন্তু সাবেকি জীবনযাত্রা ভেঙে পড়ার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। শুধু দেখা গেল, ভূমিদাসদের মস্তবড় দলের মধ্যে তিনজন রাতারাতি উধাও হয়ে গেল, কিন্তু কোন কিছু চুরি হয় নি; আর জমিদারি থেকে যে ত্রিশখানা চাষীদের গাড়ি এসেছিল সেগুলোর দাম অত্যন্ত বেড়ে গেল।

সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে কাউণ্ট ইলিয়া রস্তভ আস্তে পা ফেলে শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সবে ভোরের দিকে কাউণ্টেস একটু ঘুমিয়েছে; পাছে তার ঘুম ভেঙে যায় তাই এই সতর্কতা। লিলাক-রঙের ড্রেসিং-গাউন পরে কাউণ্ট বারান্দায় এসে দাঁড়াল। মালবোঝাই গাড়িগুলো উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে। যাত্রী-গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে সামনের ফটকে। বড় নায়েব বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটি বুড়ো আর্দালি ও হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা একজন তরুণ অফিসারের সঙ্গে কথা বলছে। কাউণ্টকে দেখতে পেয়ে বড় নায়েব অর্থপূর্ণ কঠোর অঙ্গভঙ্গী করে তাদের দুজনকেই চলে যেতে বলল।

"আরে ভাসিলিচ, সব প্রস্তুত তো?" কাউণ্ট শুধাল; তারপর টাক মাথায় টোকা দিতে দিতে খুশিমনে অফিসার ও আর্দালিটির দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। (কাউণ্ট নতুন নতুন মুখ দেখতে ভালবাসে।)

"এক্ষুণি ঘোড়া যুত্‌তে পারি ইয়োর এক্সেলেন্সি।"

"আচ্ছা, ঠিক আছে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় কাউণ্টেসের ঘুম ভাঙলেই আমরা যাত্রা করব।" অফিসারটির দিকে ফিরে বলল, "কি ব্যাপার মশায়? আপনারা কি আমার বাড়িতেই আছেন না কি?"

অফিসারটি আরও কাছে এগিয়ে গেল; হঠাৎ তার মুখটা লাল হয়ে উঠল।

"কাউণ্ট, আপনি যদি দয়া করে···ঈশ্বরের দোহাই, আপনার গাড়ির এক-কোণে আমাকে একটু জায়গা দেন। আমার সঙ্গে জিনিসপত্র কিছু নেই···

একটা বোঝাই গাড়িতে যেতে পারলে আমি সুস্থ থাকতে পারব⋯"

অফিসারের কথা শেষ হবার আগেই তার আর্দালিও মনিবের হয়ে ওই একই অনুরোধ জানাল।

কাউণ্ট তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "নিশ্চয়, নিশ্চয়! আমি খুশি হব, খুব খুশি হব! ভাচিলিচ, একটা ব্যবস্থা কর তো। দু' একটা গাড়ির মাল নামিয়ে ফেল। আরে, তাতে আর কি হল⋯যা কিছু দরকার করে ফেল।"

কাউণ্ট একবার চারদিকে তাকাল। উঠোনে, ফটকে, বাড়ির বাইরের অংশের জানালায় আহত অফিসার ও তাদের আর্দালিদের ভিড়। সকলেই কাউণ্টের দিকে তাকিয়ে আছে, বারান্দার দিকে এগিয়ে আসছে।

বড় নায়েব বলল, "গ্যালারিতে চলে আসুন ইয়োর এক্সেলেন্সি। এবার বলুন, ছবিগুলোর কি করা হবে?"

আহতদের মধ্যে যারা গাড়িতে যেতে চায় তাদের যেন ফিরিয়ে দেওয়া না হয় এই কথা বলতে বলতেই কাউণ্ট বড় নায়েবের সঙ্গে বাড়ির ভিতরে চলে গেল।

পাছে তার কথা কেউ শুনে ফেলে এই ভয়ে কাউণ্ট গলা নামিয়ে বলল, "আরে, কোন অসুবিধা নেই, কিছু জিনিস নামিয়ে নিলেই হবে।"

নটার সময় কাউণ্টেসের ঘুম ভাঙল; তার পুরনো সহচরী মাত্রিনা তিমোফীভ্না এসে জানাল, মাদাম শোস খুব রেগে গেছে, কারণ তার ট্রাংকটা গাড়ি থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর কাউণ্টের হুকুমমত আহত সৈন্যদের জায়গা করে দিতে গাড়িতে বোঝাই করা অনেক মালপত্র নামিয়ে ফেলা হচ্ছে। কাউণ্টেস স্বামীকে ডেকে পাঠাল।

"এসব কি শুনছি গো? শুনলাম গাড়ি থেকে সব মাল নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে?"

"কি জান সোনা, তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম⋯প্রিয় কাউণ্টেস⋯একজন অফিসার এসে আহতদের জন্য কয়েকটা গাড়ি চাইলেন। যাই বল, আমাদের যা জিনিসপত্র তা তো আবার কিনে নেওয়া যাবে, কিন্তু আহতদের ফেলে গেলে তাদের কি দশা হবে সেটা ভেবে দেখ! ⋯সত্যি তো, আমাদেরই উঠোনে—আর আমরাই তাদের ডেকে এনেছি, তাদের মধ্যে অফিসাররাও আছেন⋯বুঝতেই তো পারছ গো⋯তাই আমি মনে করি যে তাদের তুলে নেওয়া হোক⋯তাড়াতাড়ির কি আছে?"

টাকাপয়সার ব্যাপারে কাউণ্ট সবসময়ই ভয়ে ভয়ে কথা বলে থাকে। ওদিকে কাউণ্টেসও সব সময়ই এ ধরনের ভীরু-ভীরু কথার প্রতিবাদ করে থাকে; এটাকে সে তার কর্তব্য বলেই মনে করে।

কাউণ্টেস বলল: "শোন কাউণ্ট, তুমি এমন বন্দোবস্তই করেছ যে বাড়িটার জন্য আমরা কিছুই পাচ্ছি না, আর এখন তুমি কি না আমাদের—

তোমার ছেলেমেয়েদের সব সম্পত্তি ফেলে দিতে চাইছ! তুমি তো নিজেই বলেছ যে আমাদের বাড়িতে যা জিনিসপত্র আছে তার দাম লাখ রুবল। এতে আমার মত নেই, মোটেই মত নেই! তোমার যা খুশি কর! আহতদের দেখাশোনা করার দায়িত্ব সরকারের; সেটা তারাও জানে। লোপুখিনদের বাড়ির দিকে চেয়ে দেখ, দু' দিন আগেই সে বাড়ি থেকে সবাইকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। অন্য সকলে তাই তো করে। আর আমরাই বোকার মত কাজ করি। আমাকে তুমি দয়া দেখাতে না পার, কিন্তু ছেলেমেয়েদের প্রতি কিছুটা সদয় হও।"

হতাশভাবে দুই হাত ঘুরিয়ে কাউণ্ট কোন কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তার পিছন পিছন এসে নাতাশা বলল, "তুমি এসব কি করছ বাপি?"

"কিচ্ছু না! তা দিয়ে তোমার কি দরকার?" কাউণ্ট রেগে বলল।

নাতাশা বলল, "কিন্তু আমি শুনেছি। মামণি আপত্তি করছে কেন?"

"তা দিয়ে তোমার কি দরকার?" কাউণ্ট চেঁচিয়ে উঠল।

নাতাশা জানালা পর্যন্ত এগিয়ে এসে ভাবতে লাগল।

"বাপি! বের্গ আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসছে," জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে সে বলল।

অধ্যায়—১৬

রস্তভদের জামাই বের্গ এর মধ্যেই কর্ণেল হয়েছে; ভ্লাদিমির ও আন্না সম্মান-পদক ঝুলিয়েছে; এখনও দ্বিতীয় বাহিনীর প্রথম ডিভিসনের সহকারী কম্যাণ্ডারের প্রধান কর্মচারির সহকারীর নির্ঝঞ্ঝাট ও সুখের চাকরিতেই কাজ করে চলেছে।

১লা সেপ্টেম্বর সে সেনাদল থেকে মস্কো এসেছে।

মস্কোতে তার কোন কাজ ছিল না; কিন্তু যখন দেখল যে সকলেই ছুটি নিয়ে কোন না কোন কাজে মস্কো যাচ্ছে, তখন সেও পারিবারিক ও গৃহস্থালির কারণে ছুটি চাওয়াটা দরকার বোধ করল।

কোন রাজপুত্রের মত সুদৃশ্য দুটো ঘোড়ায় টানা নিজের ফিটফাট ছোট গাড়িটা হাঁকিয়ে বের্গ শ্বশুরবাড়ি এসে হাজির হল। উঠোনের গাড়িগুলোকে ভাল করে দেখতে দেখতে বারান্দায় পৌছে একখানা পরিষ্কার রুমাল পকেট থেকে বের করে তাতে একটা গিঁট দিল।

বাইরের ঘর থেকে অধৈর্য হয়ে পা ফেলে বৈঠকখানায় ঢুকে সে কাউণ্টকে আলিঙ্গন করল, নাতাশা ও সোনিয়ার হাতে চুমো খেল এবং তাড়াতাড়ি "মামণির" স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করল।

কাউণ্ট বলল, "যা দিনকাল পড়েছে তার মধ্যে আবার স্বাস্থ্য? এবার

তোমার খবর বল। সেনাদল কি পশ্চাদপসরণ করবে, না কি আর একটা যুদ্ধ হবে?"

বের্গ বলল, "আমাদের পিতৃভূমির কপালে যে কি আছে তা একমাত্র সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই জানেন বাপি। সেনাদল তো বীরত্বে টগবগ করছে, আর নেতারা সমর-পরিষদের বৈঠকে বসেছেন। কি যে হবে তা কেউ জানে না। কিন্তু মোটামুটিভাবে আপনাকে বলতে পারি বাপি, রুশবাহিনী যে বীরত্বের মনোভাব, যে প্রাচীনকালের শৌর্যবীর্যের স্বাক্ষর রেখেছে ২৬ তারিখেরযুদ্ধে—কোন ভাষায় তার বর্ণনা করা যায় না। আপনাকে বলছি বাপি (একজন জেনারেলের নকল করে বের্গ নিজের বুকে করাঘাত করল, যদিও সেটা করা উচিত ছিল "রুশবাহিনী" কথাটা বলার সময়), খোলাখুলিই বলছি যে আমরা সেনাপতিরা প্রায় কিছুই করি নি, বরং তাদের প্রাচীনকালের শৌর্য প্রদর্শনের বেলায় বাধা দিতে পর্যন্ত পারি নি। আপনাকে নিশ্চয় করে বলতে পারি, সেনাদলের সম্মুখে থেকে জেনারেল বার্কলে দ্য তলি সর্বত্রই নিজের জীবনকে বিপন্ন করেছেন। আমাদের সেনাদলের ঘাঁটি ছিল একটা পাহাড়ের পাশে। ভাবতে পারেন!"

সেই দিনগুলিতে শোনা যেসব কাহিনী তার মনে ছিল বের্গ সে সবগুলিই একে একে বলে গেল। নাতাশা একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে সে একটু বিচলিত বোধ করল।

একটু হেসে বলতে লাগল, "সবকিছু মিলিয়ে রুশ যোদ্ধারা যে বীরত্ব দেখিয়েছে তা যেমন কল্পনাতীত, তেমনই বর্ণনাতীত! রাশিয়া আজ মস্কোতে নেই, তার আসন পাতা রয়েছে তার বীর পুত্রদের অন্তরে! তাই নয় কি বাপি?"

ঠিক সেইসময় কাউণ্টেস ঘরে ঢুকল; তার চোখে মুখে ক্লান্তি ও বিরক্তির ছাপ। বের্গ লাফিয়ে উঠে কাউণ্টেসের হাতে চুমো খেল, তার স্বাস্থ্যের খোঁজ-খবর নিল, মাথা নেড়ে সহানুভূতি প্রকাশ করে তার পাশেই দাঁড়িয়ে রইল।

"সত্যি বলছি মামণি, রাশিয়ার প্রতিটি মানুষের পক্ষে আজ বড়ই দুর্দিন, বড়ই কষ্টের দিন। কিন্তু আপনি এত উৎকণ্ঠিত হচ্ছেন কেন? এখান থেকে যাবার মত অনেক সময় হাতে পাবেন...."

স্বামীর দিকে ঘুরে কাউণ্টেস বলল, "চাকরবাকরগুলো যে কি করছে বুঝি না। এইমাত্র বলল, এখনও কিছু তৈরি হয় নি। দেখাশুনা করবার মত একজন লোক তো চাই। এ সময় মিতেংকা থাকলে কত ভাল হত। কাজ যেন আর শেষ হতে চাইছে না।"

কাউণ্ট কি যেন বলতে গিয়েও থেমে গেল। চেয়ার ছেড়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

ঠিক সেই মুহূর্তে সম্ভবত নাকটা ঝাড়বার জন্যই বের্গ রুমালটা বের করল। গিঁটটা চোখে পড়তেই অর্থপূর্ণভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে কি যেন ভাবল।

বলল, "আপনার কাছে একটা অনুগ্রহ ভিক্ষা করছি বাপি।"

"হুম্‌....." বলে কাউণ্ট থেমে গেল।

বের্গ হেসে বলল, "এইমাত্র ইউসুপভ-এর বাড়ির পাশ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে আসছিলাম, এমন সময় আমার পরিচিত একটি নায়েব ছুটে এসে জানতে চাইল, আমি কিছু জিনিস কিনব কি না। কৌতূহলবশত ভিতরে ঢুকে দেখলাম একটা ছোট সুন্দর কাবার্ড ও একটা ড্রেসিং-টেবিল। আপনি তো জানেন ভেরার ওরকম একটা কার্বার্ডের খুব শখ, আর এই নিয়ে আমরা কত ঝগড়া পর্যন্ত করেছি। আর জিনিসটা কী সুন্দর। একটা চোরা ইংলিশ টানা পর্যন্ত আছে! ভেরা অনেক দিন থেকে এরকম একটা জিনিস চাইছে। কি জানেন, আমি ওকে বেশ অবাক করে দিতে চাই। আমার উঠোনে তো অনেক গাড়ি দেখলাম। ওর একটা আমাকে দিন, লোকটিকে ভাল টাকাই দেব, আর..."

কাউণ্ট ভুরু কুঁচকে কাশল।

"কাউণ্টেসকে বল, আমি কোন হুকুম দেই না।"

বের্গ বলল, "অসুবিধা হলে থাক; শুধু ভেরার জন্যই জিনিসটা নিতে চেয়েছিলাম।"

"আঃ, উচ্ছন্নে যাও, তোমরা সবাই উচ্ছন্নে যাও!....." বুড়ো কাউণ্ট চেঁচিয়ে উঠল। "আমার মাথার ভিতরটা ঘুরছে।"

কাউণ্ট ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কাউণ্টেস কাঁদতে শুরু করল।

"সত্যি মামণি! বড়ই দুর্দিন।" বের্গ বলল।

বাবার সঙ্গে সঙ্গে নাতাশাও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল; তারপর কি করবে বুঝতে না পেরে প্রথমে তাকে অনুসরণ করে পরে ছুটে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল।

পেত্‌য়া ছিল বারান্দায়; যেসব চাকর মস্কো ছেড়ে চলে যাচ্ছে সে তাদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে দিচ্ছে। বোঝাই গাড়িগুলো তখনও উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে। একটার দড়িগুলো খুলে ফেলা হয়েছে, আর আর্দালির সহায়তায় একজন অফিসার সেই গাড়িটা বেয়ে উঠছে।

পেত্‌য়া নাতাশাকে শুধাল, "ব্যাপার কি বল তো?"

নাতাশা বুঝল, বাবা-মা কি নিয়ে ঝগড়া করছে সেটাই সে জানতে চাইছে। কোন কথা বলল না।

পেত্‌য়াই বলল, "বাপি সবগুলো গাড়িই আহতদের জন্য দিতে চাইছে। আর তাই নিয়েই ঝগড়া। ভাসিলিচ আমাকে বলেছে। আমি মনে করি....।"

নাতাশা হঠাৎ রেগে গিয়ে চীৎকার করে বলে উঠল, "আমি মনে করি

এটা এত ভয়ংকর, এত ঘৃণ্য, এত···কি বলব জানি না। আমরা কি জঘণ্য জার্মান ?"

চাপা কান্নার আবেগে তার গলা আটকে গেল ; পাছে রাগটা ধরা পড়ে যায় তাই সে মুখ ঘুরিয়ে ছুটে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল।

কাউণ্টেসের পাশে বসে বের্গ তাকে পরমাত্মীয়ের মত সান্ত্বনা দিচ্ছে। কাউণ্ট পাইপ হাতে নিয়ে ঘরময় পায়চারি করছে। এমন সময় ক্রোধে মুখটা বিকৃত করে নাতাশা ঝড়ের মত ঘরে ঢুকে দ্রুতপায়ে মার দিকে এগিয়ে গেল।

আর্তকণ্ঠে বলল, "এ তো ভয়ংকর ! এ তো ঘৃণ্য ! এরকম হুকুম তুমি দিতে পার না।"

ভীত, বিব্রত চোখে বের্গ ও কাউণ্টেস তার দিকে তাকাল। জানালায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে কাউণ্ট কান পাতল।

নাতাশা চেঁচিয়ে বলল, "মামণি, এ অসম্ভব ; উঠোনে কী হচ্ছে নিজে গিয়ে দেখে এস ! তাদের ফেলে রেখে যাওয়া হবে !····"

"তোমার হল কি ? কাদের কথা বলছ ? কি চাও তুমি ?"

"কেন, আহত লোকগুলো ! এ তো অসম্ভব মামণি ! এ তো দানবীয় কাজ। ····না, লক্ষ্মী মামণি, এ হতে পারে না। আমাকে ক্ষমা কর লক্ষ্মী মামণি···কিছু বাড়তি জিনিস সঙ্গে গেল কিনা তাতে কি যায় আসে ? ····একবার শুধু দেখে এস উঠোনে কি হচ্ছে···মামণি ! ···এ অসম্ভব !···"

মুখ না ফিরিয়ে জানালার পাশে দাঁড়িয়েই কাউণ্ট সব শুনছে। হঠাৎ নাক ঝেড়ে সে মুখটা জানালার আরও কাছে সরিয়ে নিল।

কাউণ্টেস মেয়ের দিকে তাকাল, মুখটা মায়ের জন্য লজ্জায় আনত, ক্রোধে উচ্ছ্বসিত ; স্বামী কেন যে মুখ না ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাও বুঝতে পারল ; বিব্রত চোখে চারদিকে তাকাল।

কিন্তু হাল না ছেড়েই বলল, "আঃ তোমাদের যা খুশি কর ! আমি কি কাউকে বাধা দিচ্ছি ?"

"মামণি, লক্ষ্মীটি, আমাকে ক্ষমা কর।"

কিন্তু কাউণ্টেস মেয়েকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে স্বামীর দিকে এগিয়ে গেল।

"ওগো, যা ভাল মনে কর তাই বলে দাও····তুমি তো জান এসব আমি ঠিক বুঝি না," চোখ নীচু করে কাউণ্টেস বলল।

"ডিমরা····ডিমরা এখন মুরগিদের শেখাচ্ছে····" কাউণ্ট বিড়বিড় করে বলল ; খুশিতে তার চোখে জল এসে গেছে ; সে স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরল। আর স্ত্রীও সলজ্জ দৃষ্টি লুকোবার জন্য তার বুকে মাথা রাখল।

"বাপি ! মামণি ! আমি কি ওদিকটা দেখব ? কি বল ?" নাতাশা শুধাল "এখনও দরকারী জিনিসপত্র প্রায় সবই আমরা সঙ্গে নিতে পারব।"

কাউণ্ট সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ল, আর নাতাশা হরিণীর মত চকিত চরণে নাচঘর ও বাইরের ঘর পেরিয়ে সোজা উঠোনে নেমে গেল।

চাকরবাকররা নাতাশাকে ঘিরে ধরল, কিন্তু তার অদ্ভুত হুকুম বিশ্বাসই করতে পারল না। শেষ পর্যন্ত কাউণ্ট নিজে এসে স্ত্রীর নামে ঘোষণা করে দিল যে সবগুলি গাড়ি আহতদের জন্য ছেড়ে দিতে হবে, আর ট্রাংক-গুলোকে ভাঁড়ার ঘরে ফিরিয়ে নিতে হবে।

যেন এই কাজটি আরও আগে না করার প্রায়শ্চিত্ত হিসাবেই বাড়ির সব-গুলো মানুষই একযোগে আহতদের গাড়িতে তুলে দেবার নতুন কর্তব্যটি পালন করতে সাগ্রহে এগিয়ে এল। আহতরা নিজেদের টানতে টানতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বিবর্ণ অথচ খুশিমুখে গাড়ির চারদিকে জড় হতে লাগল। গাড়ি পাওয়া যাচ্ছে এই খবর ছড়িয়ে পড়ায় আশপাশের বাড়ি থেকেও আহতরা বেরিয়ে এসে রস্তভদের উঠোনে জমা হতে লাগল। অনেকে বলল, মালপত্র নামাবার দরকার নেই, তারা সেগুলির উপরে বসেই যেতে পারবে। কিন্তু মাল নামাবার কাজ একবার শুরু হয়ে যাওয়ায় আর থামানো গেল না।

নায়েব বলল, "আমরা আরও চারজনকে নিতে পারি। তারা আমার গাড়িতেই যাবে, নইলে তাদের দশা কি হবে?"

কাউণ্টেস বলল, "আমার পোশাকের গাড়িটা ওদের দিয়ে দাও। ছনিয়াশা আমার সঙ্গে বড় গাড়িতেই যেতে পারবে।"

পোশাকের গাড়িটাকে খালি করে ছু' দরজা পরের বাড়ির সামনে সেটাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল সেখানকার আহতদের তুলে নিতে। চাকরসমেত গোটা বাড়িটাই খুশিতে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। নাতাশার মন এত বেশী খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে যে তেমনটি অনেকদিন হয় নি।

একটা ট্রাংককে গাড়ির পিছনের পাদানিতে বসিয়ে দেবার চেষ্টায় চাকররা বলল, "এটাকে কিসের সঙ্গে বাঁধব? অন্তত একটা গাড়ি রেখে দিতেই হবে।"

"এতে কি আছে?" নাতাশা শুধাল।

"কাউণ্টের বইপত্র।"

"ছেড়ে দাও, ভাসিলিচ ওটা তুলে রাখবে। ওটার দরকার নেই।"

ফিটনটা যাত্রীতে ভর্তি হয়ে গেছে; কাউণ্ট পিতর বসবার জায়গা পাবে কিনা সন্দেহ।

নাতাশা চেঁচিয়ে বলল, "বক্সের উপরে। তুমি বক্সের উপর বসবে পেত্‌য়া, পারবে না?"

সোনিয়াও সারাক্ষণ কাজে ব্যস্ত, কিন্তু তার কাজের লক্ষ্য নাতাশার চাইতে আলাদা। যেসব জিনিস ফেলে যাওয়া হচ্ছে সেগুলি গুছিয়ে রেখে

কাউণ্টেসের নির্দেশমত সে তার একটা ফর্দ তৈরি করছে; যথাসম্ভব বেশী জিনিস সঙ্গে নিতেই সে চেষ্টা করছে।

অধ্যায়—১৭

বিকেল তুটোর আগেই রস্তভদের চারখানা গাড়ি পুরো ভর্তি হয়ে সামনের দরজায় এসে দাঁড়াল। একটার পর একটা গাড়ি আহতদের নিয়ে উঠোন থেকে বেরিয়ে যেতে লাগল।

যে কালেচ্-গাড়িতে প্রিন্স আন্দ্রুকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেটা সামনের বারান্দার পাশ দিয়ে যাবার সময় সোনিয়ার নজর সেদিকে গেল। ফটকে দাঁড়ানো মস্ত বড় উঁচু গাড়িটাতে সোনিয়া তখন একটি দাসীকে নিয়ে কাউণ্টেসের জন্য একটা আসন পাতার আয়োজন করছিল।

গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বের করে সে জিজ্ঞাসা করল, "ওটা কার কালেচ্?"

দাসী জবাব দিল, "সে কি, আপনি জানেন না মিস? উনিই তো আহত প্রিন্স; আমাদের বাড়িতেই রাত কাটিয়েছেন, আর আমাদের সঙ্গেই যাচ্ছেন।"

"কিন্তু তিনি কে? তার নাম কি?"

"তিনিই তো আমাদের—প্রিন্স বল্কন্স্কি স্বয়ং।" একটা নিঃশ্বাস ফেলে দাসী বলল, "সকলে বলছে তিনি মারা যাবেন।"

গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নেমে সোনিয়া ছুটে কাউণ্টেসের কাছে গেল। শাল ও ওড়না পরে যাত্রার জন্য তৈরি হয়ে ক্লান্ত দেহে কাউণ্টেস ঘরের মধ্যেই পায়চারি করছে। যাত্রার আগে সকলে বন্ধ ঘরের মধ্যে সমবেত হয়ে নীরবে একবার প্রার্থনা করবে—এটাই রীতি। কাউণ্টেস সেইজন্যই অপেক্ষা করছে। নাতাশা ঘরে নেই।

সোনিয়া বলল, "মামণি, মারাত্মক আহত হয়ে প্রিন্স আন্দ্রু এখানেই আছেন। তিনি আমাদের সঙ্গেই যাচ্ছেন।"

কাউণ্টেস হতাশ ভঙ্গীতে তাকাল; সোনিয়ার হাতটা চেপে ধরে চারদিক দেখল।

"নাতাশা?" সে অস্ফুট স্বরে বলল।

এইমুহূর্তে তাদের কাছে এই সংবাদের একটিই মাত্র তাৎপর্য। নাতাশাকে তারা চেনে; এ খবর তার কানে গেলে যে কি ঘটবে সেই ভয়েই এই লোকটির প্রতি তাদের তুজনের সহানুভূতিতেই ভাটা পড়ল।

সোনিয়া বলল, "নাতাশা এখনও জানে না, কিন্তু তিনি আমাদের সঙ্গেই যাচ্ছেন।"

"তুমি বলছ সে মরতে বসেছে?"

সোনিয়া মাথা নাড়ল।

সোনিয়াকে জড়িয়ে ধরে কাউণ্টেস কেঁদে উঠল।

ভাবল, "ঈশ্বর যে কখন কি করেন তা আমাদের বুদ্ধির অগোচর।" সর্বশক্তিমানের অদৃশ্য হাত ক্রমেই যেন ঘটনাবলীর ভিতর দিয়ে প্রত্যক্ষগোচর হয়ে উঠছে।

উত্তেজিত মুখে ঘরে ঢুকে নাতাশা শুধাল, "আচ্ছা মামণি, সবই তো প্রস্তুত। ব্যাপার কি?"

কাউণ্টেস বলল, "কিছু না তো। সব প্রস্তুত হয়ে থাকলে এবার আমরা যাত্রা করি।"

নিজের মুখের উত্তেজনা লুকোবার জন্য কাউণ্টেস ওড়না দিয়ে মুখটা ঢেকে দিল। সোনিয়া নাতাশাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেল।

নাতাশা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল।

"ব্যাপার কি? কি হয়েছে?"

"কিছু না…না…"

সহজ বুদ্ধিতে একটা কিছু আঁচ করে নাতাশা বলল, "আমার পক্ষে খুব খারাপ কিছু কি? সেটা কি?"

সোনিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল, কোন জবাব দিল না। কাউণ্ট, পেত্য়া, মাদাম শোস, মাভ্রা কুজ্‌মিনিচ্‌না ও ভাসিলিচ বৈঠকখানায় ঢুকে দরজাগুলো বন্ধ করে দিল। তারপর সকলে বসে পড়ে কিছুক্ষণ নীরবে কাটাল; কেউ কারও দিকে তাকাল না।

প্রথমে উঠে দাঁড়াল কাউণ্ট; দেবমূর্তির সামনে ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। অন্য সকলেও তাই করল। তারপর কাউণ্ট মাভ্রা কুজ্‌মিনিচ্‌না ও ভাচিলিচকে আলিঙ্গন করল; তারা দুজন মস্কোতেই থেকে যাচ্ছে; তারা যখন তার হাত ধরে কাঁধে চুমো খেল কাউণ্ট তখন আলতোভাবে তাদের পিঠ চাপড়ে দিয়ে কিছু সান্ত্বনা ও স্নেহের বাণী শোনাল। ভজনালয়ে ঢুকে কাউণ্টেস দেখল দেয়ালে ঝোলানো একটি দেবমূর্তির সামনে সোনিয়া নতজানু হয়ে বসে আছে।

পেত্য়া যেসব লোকদের তরবারি ও ছুরি দিয়েছিল তারা উঁচু বুটের মধ্যে ট্রাউজার গুঁজে দিয়ে, কোমরবন্ধগুলো শক্ত করে এঁটে যারা এখানেই থেকে যাচ্ছে তাদের কাছ থেকে একে একে বিদায় নিতে শুরু করেছে।

কোথাও যাবার আগে যেমন হয়ে থাকে, অনেককিছুই ভুল হয়েছে বা ভুল জায়গায় রাখা হয়েছে; কাউণ্টেসকে গাড়িতে তুলে দেবার জন্য দুটি চাকর গাড়ির পাদানির দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে; আর দাসীরা ছুটাছুটি করে টুকিটাকি জিনিস নিয়ে একবার গাড়ি, কালেচ্‌ ও ফিটনের দিকে ছুটে

আসছে, আবার বাড়ির ভিতরে যাচ্ছে।

কাউণ্টেস বলল, "ওরা সব সময় সবকিছু ভুলে যাবে। তুমি কি জান না যে এভাবে আমি বসতে পারি না ?"

দুনিয়াশা কোন কথা না বলে দাঁতে দাঁত চেপে ক্ষুব্ধ মুখে গাড়ির মধ্যে ঢুকে আসনটাকে নতুন করে পাততে লাগল।

মাথা নেড়ে কাউণ্ট বলল, "আঃ, চাকরগুলোও হয়েছে বটে !"

বুড়ো কোচয়ান এফিম বক্সে সোজা হয়ে বসে আছে; চারদিকে কি হচ্ছে না হচ্ছে একবার তাকিয়েও দেখছে না। কাউণ্টেস একমাত্র তাকেই ভরসা করে নিজের গাড়িটা চালাতে দেয়। ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতায় সে জানে যে "ঈশ্বরের নাম নিয়ে গাড়ি ছেড়ে দাও !" এ হুকুম আসতে এখনও দেরি আছে; সে জানে, হুকুম হবার পরেও আরও দু' একবার গাড়ি থামাতে হবে, ভুল করে ফেলে-আসা কিছু জিনিসপত্র আনতে আবার তারা বাড়ির ভিতর ঢুকবে এবং তারপরেও আবার তাকে থামিয়ে কাউণ্টেস জানালা দিয়ে মুখ বের করে ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে পাহাড় থেকে নামবার সময় তাকে খুব সতর্কভাবে গাড়ি চালাতে বলবে। এসবই তার জানা; তাই ঘোড়া-গুলোর চাইতেও বেশী ধৈর্যের সঙ্গে সে অপেক্ষা করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সকলে উঠে বসল, গাড়ির সিঁড়িগুলো ভাঁজ করে তুলে দেওয়া হল, দরজা বন্ধ করা হল, একজনকে পাঠানো হল একটা বক্স আনতে, আর কাউণ্টেস মাথা বের করে যা বলার ছিল তাই বলল। এফিম ইচ্ছা করেই টুপিটা তুলে ক্রুশ-চিহ্ন আঁকতে লাগল। সহিস ও অন্য চাকররাও তাই করল। টুপিটা মাথায় বসিয়ে এফিম বলল, "ঈশ্বরের নাম নিয়ে যাত্রা কর। শুরু কর !" ঘোড়াগুলো নড়ে উঠল, গাড়ির চাকায় শব্দ হল, গাড়িটা দুলে উঠল। সহিস চলতি গাড়িতে লাফিয়ে উঠল; একটা ঝাঁকুনি খেয়ে উঠোন পেরিয়ে গাড়িটা অসমান রাস্তায় পড়ল; অন্য গাড়িগুলো দুলতে দুলতে পিছু নিল; গাড়ির একটা শোভাযাত্রা পথ ধরে এগিয়ে চলল। বাড়ির উল্টো দিকের গির্জার পাশ দিয়ে যাবার সময় গাড়ি, কালেচ্‌ ও ফিটনের সব যাত্রীরাই ক্রুশ-চিহ্ন আঁকল। যারা মস্কোতেই থেকে গেল তারা যাত্রীদের বিদায় জানাতে গাড়িগুলোর দুই পাশে হাঁটতে লাগল।

কাউণ্টেসের পাশে বসে পরিত্যক্ত, বিক্ষুব্ধ মস্কোর অপস্রিয়মান দেয়াল-গুলির দিকে তাকিয়ে নাতাশার মনে আনন্দের যে অনুভূতি জাগল এর আগে সেরকম অনুভূতি তার জীবনে কদাচিৎ এসেছে। মাঝে মাঝে গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে একবার পিছনে তাকাচ্ছে, একবার সামনে সারি-বদ্ধ আহতদের দিকে তাকাচ্ছে। সেই সারির একেবারে সামনে আছে প্রিন্স আন্দ্রুর দুই-তালা কালেচ্‌-গাড়িটা। সে গাড়ির মধ্যে কে আছে তা সে জানে না, কিন্তু যতবার সারির দিকে তাকাচ্ছে ততবারই ওই কালেচ্‌টা

তার চোখে পড়ছে। সে জানে যে গাড়িটা তার সামনেই আছে।

কুদ্রিনোতে অনুরূপ আরও কয়েকটি গাড়ির শোভাযাত্রা এল নিকিৎস্কি, প্রেস্নিয়া ও পদ্নেভিন্স্ক স্ট্রীট থেকে। সদভায়া স্ট্রীট ধরে এগোবার সময় সবগুলো যাত্রী-গাড়ি ও মালগাড়ি দুটো সারি বেঁধে পাশাপাশি এগিয়ে চলল।

সুখারেভ জলের গম্বুজটা ঘুরে যাবার সময় নাতাশা হঠাৎ সানন্দ বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠল:

"আরে! মামণি, সোনিয়া, দেখ, তিনি যাচ্ছেন!"

"কে? কে?"

"দেখ! হ্যাঁ, সত্যি বলছি, ঐ তো বেজুখভ!" কোচয়ানের লম্বা কোট পরিহিত একটি দীর্ঘকায় লোককে দেখিয়ে নাতাশা বলল। লোকটির চালচলন দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে ছদ্মবেশে চলেছে। সঙ্গে ফ্রীজ-কোট পরা একটি ক্যাকাসে-মুখ, দাড়িবিহীন বুড়ো লোক।

নাতাশা বলল, "হ্যাঁ, ঠিক বেজুখভ; কোচয়ানের কোট গায়ে, সঙ্গে একটি অদ্ভুত-দর্শন বুড়ো। সত্যি, তাকিয়ে দেখ!"

"না, সে নয়। কী বাজে বকছ?"

নাতাশা চেঁচিয়ে বলল, "মামণি, আমার মাথাটা বাজি, নির্ঘাৎ সে! আমি নিশ্চিত বলতে পারি। থাম, থাম!" সে কোচয়ানকে লক্ষ্য করে বলল।

কিন্তু কোচয়ান থামতে পারল না, কারণ মেশ্চান্স্কি স্ট্রীট থেকে আরও অনেক গাড়ি এসে পড়ল, আর তারা সকলেই রস্তভদের রাস্তা আটকে না থেকে এগিয়ে যেতে বলল।

যদিও এখন লোকটি আরও দূরে চলে গেছে তবু রস্তভরা সকলেই পিয়েরকে —বা হুবহু তার মত দেখতে একটি লোককে—দেখতে পেল; একটা কোচোয়ানের কোট গায়ে চড়িয়ে মাথাটা নীচু করে গম্ভীর মুখে হেঁটে চলেছে; পাশে একটি ছোটখাট দাড়িহীন বুড়ো মানুষ; দেখে মনে হয় পরিচারক। বুড়ো লোকটি খেয়াল করল যে গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বের করে কে যেন তাদের দিকে তাকিয়ে আছে; সশ্রদ্ধভাবে পিয়েরের কনুই ছুঁয়ে তাকে কি যেন বলে গাড়িটা দেখাল। পিয়ের চিন্তায় ডুবে ছিল, প্রথমে তার কথা বুঝতে পারল না। পরে বুড়োর নির্দেশমত গাড়িটার দিকে তাকিয়ে নাতাশাকে চিনতে পারল এবং প্রথম আবেগের টানেই দ্রুতপায়ে গাড়িটার দিকে এগিয়ে এল। কিন্তু ডজনখানেক পা ফেলার পরেই কিছু মনে পড়ায় থেমে গেল।

নাতাশার মুখটা রহস্যময় মমতায় জ্বল্‌জ্বল্ করতে লাগল।

পিয়েরের দিকে হাত বাড়িয়ে সে চেঁচিয়ে বলল, "পিতর, কিরিলভিচ, এখানে এস! আমরা তাকে চিনতে পেরেছি! কী আশ্চর্য! ...আপনি

এখানে কি করছেন? আপনার এরকম চেহারা হয়েছে কেন?"

চলমান গাড়ি থেকেই নাতাশা হাত বাড়িয়ে দিল। গাড়ির পাশে হাঁটতে হাঁটতেই সে হাতটায় চুমো খেল।

বিস্মিত ও সহানুভূতিপূর্ণ সুরে কাউণ্টেস বলল, "ব্যাপার কি কাউণ্ট?"

"কি? কি? কেন? এসব প্রশ্ন করবেন না," বলে পিয়ের নাতাশার দিকে মুখ ফেরাল; তার আনন্দে রক্তিম মুখখানি দেখে সে মুগ্ধ হয়ে গেল।

"আপনি তাহলে মস্কোতেই আছেন?"

পিয়ের ইতস্তত করল।

"মস্কোতে? হ্যাঁ, মস্কোতে। বিদায়!"

নাতাশা বলে উঠল, "হায়, আমি যদি পুরুষ মানুষ হতাম! তাহলে ঠিক ওর সঙ্গে থেকে যেতাম। কী চমৎকার! মামণি, যদি রাজী হও তো আমি থেকে যাই।"

নাতাশার দিকে তাকিয়ে পিয়ের কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু কাউণ্টেস তাকে বাধা দিল।

"শুনেছি, আপনি যুদ্ধে গিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ, গিয়েছিলাম," পিয়ের জবাব দিল। "কাল আর একটা যুদ্ধ হবে…" নাতাশা তাকে বাধা দিল।

"কিন্তু আপনার কি হয়েছে কাউণ্ট? আপনি যে একেবারেই বদলে গেছেন।…"

"আঃ, কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না, কিচ্ছু না! আমি নিজেই জানি না। কাল…কিন্তু না! বিদায়, বিদায়! …বড়ই খারাপ সময় চলেছে!" সে ফুটপাতে পা বাড়িয়ে দিল।

নাতাশা অনেকক্ষণ জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রইল; একটা রহস্যময় খুশির হাসিতে তার মুখটা ঝলমলিয়ে উঠল।

অধ্যায়—১৮

বাড়ি ছেড়ে আসার পর থেকে শেষের দুটো দিন পিয়ের তার উপকারী মৃত বাজ্‌দীপ-এর খালি বাড়িতেই বাস করছে। ব্যাপারটা এইভাবে ঘটেছে।

মস্কোতে ফিরে আসার পরে এবং কাউণ্ট রস্তপ্‌চিনের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখন কিছুক্ষণ সে বুঝতেই পারল না সে কোথায় আছে এবং তাকে কি করতে হবে। যখন তাকে জানানো হল যে অভ্যর্থনা-ঘরে যারা তার জন্য অপেক্ষা করছে তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে একটি ফরাসী ভদ্রলোক, আর সে তার স্ত্রী কাউণ্টেস হেলেনের কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে এসেছে, তখন সহসা একটা বিশৃঙ্খলা ও হতাশারভাব তাকে একেবারে পেয়ে বসল। তার মনে হল, সব শেষ হয়ে গেছে, সবকিছু ভেঙে গুঁড়িয়ে

যাচ্ছে, কেউ ঠিক নয় বা কেউ ভুল নয়, ভবিষ্যতের কোন আশা নেই, আর এ পরিস্থিতির হাত থেকেও পরিত্রাণ নেই। অস্বাভাবিকভাবে হেসে বিড় বিড় করে কি যেন বলল, প্রথমে হতাশ হয়ে একটা সোফায় বসে পড়ল, তার-পর উঠে অভ্যর্থনা-ঘরের দরজার কাছে গিয়ে একটা ফোঁকড়ের ভিতর দিয়ে উঁকি দিল, এবং দুই হাত ঘোরাতে ঘোরাতে এসে একটা বই তুলে নিল। বড় নায়েব দ্বিতীয়বার ঘরে ঢুকে বলল, যে ফরাসী লোকটি কাউণ্টেসের চিঠি নিয়ে এসেছে সে একমিনিটের জন্য হলেও একবার দেখা করতে খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, আর বাজ্‌দীভ-এর বিধবা পত্নীর কাছ থেকে আগত একজন জানাচ্ছে, যেহেতু বিধবাটি গ্রামে ফিরে যাচ্ছে তাই পিয়ের যেন তার স্বামীর বইগুলোর ভার বুঝে নেয়।

পিয়ের বলল, "ও, হ্যাঁ, একমিনিট সবুর কর····না, থাক। ····গিয়ে বল, আমি এখনই যাচ্ছি।"

কিন্তু লোকটি বেরিয়ে যেতেই পিয়ের টেবিল থেকে টুপিটা নিয়ে অন্য দরজা দিয়ে পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বারান্দায় কেউ ছিল না। গোটা বারান্দাটা পেরিয়ে সিঁড়ি পর্যন্ত চলে গেল এবং ভুরু কুঁচকে দুই হাতে কপালটা ঘসে প্রথম চাতাল পর্যন্ত নেমে গেল। হলের দারোয়ান সামনের দরজাতেই দাঁড়িয়েছিল। পিয়ের যে চাতালে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে একটা দ্বিতীয় সিঁড়ি নেমে গেছে পিছনের ফটকে। সেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে সে উঠোনে চলে গেল। কেউ তাকে দেখতে পায় নি। কিন্তু সেখানে কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়েছিল; পিয়ের ফটকের বাইরে পা দিতেই কোচয়ান ও দারোয়ান তাকে দেখে টুপি তুলল। পিয়ের যখন বুঝতে পারল যে সে ধরা পড়ে গেছে তখন সে উট পাখির মত ব্যবহার করে বসল: উট পাখি যেমন অন্যের নজর এড়াতে ঝোপের মধ্যে মাথা গুঁজে দেয়, পিয়েরও তেমনি মাথাটা নুইয়ে দ্রুত পা ফেলে রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল।

সেদিন যেসব কাজ পিয়েরের হাতে ছিল তার মধ্যে যোসেফ বাজ্‌দীভ-এর বই ও কাগজপত্রের সুরাহা করাটাই তার কাছে সবচাইতে দরকারী বলে মনে হল।

একটা গাড়ি ভাড়া করে চালককে বলল "প্যাট্রিয়ার্কস্ পণ্ড"-এ যেতে; বাজ্‌দীভ-এর বিধবা পত্নী সেখানেই থাকে।

বোঝাই গাড়িগুলো সারি বেঁধে চারদিক থেকে অনবরত মস্কো থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। সে দৃশ্য দেখতে দেখতে আর জোড়াতালি-মারা পুরনো গাড়ি থেকে তার মোটা শরীরটা যাতে ছিটকে না পড়ে সেদিকে খেয়াল রেখে পিয়ের স্কুল-পালানো ছেলের মত খুশির মেজাজে চালকের সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

লোকটি বলল, ক্রেমলিনে আজ সব্বাইকে অস্ত্র দেওয়া হচ্ছে, কাল

প্রত্যেককে পাঠিয়ে দেওয়া হবে তিন পাহাড় ফটকের ওপারে, সেখানে একটা প্রচণ্ড লড়াই হবে।

"প্যাট্রিয়ার্কস্ পন্ড"-এ পৌঁছে পিয়ের বাজ্‌দীভের বাড়িটা খুঁজে নিল। অনেকদিন এখানে আসা হয় নি। ফটকের দিকে এগিয়ে গেল। ঢোকার শব্দে গেরাসিম বেরিয়ে এল। পাঁচ বছর আগে তর্ঝ্‌ক-এ এই ফ্যাকাসে দাড়িহীন বুড়ো লোকটাকেই সে যোসেফ বাজ্‌দীভ-এর সঙ্গে দেখেছিল।

"বাড়ি আছেন?" পিয়ের শুধাল।

"যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে তার ফলে সোফিয়া দানিলভনা বাচ্চাদের নিয়ে তর্ঝ্‌ক জমিদারিতে চলে গেছেন ইয়োর এক্সেলেন্সি।"

"আমাকে ভিতরে যেতেই হবে, বইগুলো একবার দেখতে চাই", পিয়ের বলল।

"দয়া করে ভিতরে আসুন। আমার স্বর্গত মনিবের ভাই মকার আলেক্সি-ভিচ এখানেই আছেন, কিন্তু আপনি তো জানেন তার অবস্থাও খুব দুর্বল," বুড়ো চাকরটি বলল।

পিয়ের জানে যোসেফ বাজ্‌দীভ-এর আধাপাগল ভাই মকার আলেক্সি-ভিচ একটি পাঁড় মাতাল।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি। ভিতরে চল....." বলে পিয়ের বাড়ির ভিতর ঢুকল।

একটি লাল নাক, টাক মাথা, লম্বা বুড়ো লোক বাইরের ঘরে দাঁড়িয়েছিল। তার পরনে ড্রেসিং-গাউন, পায়ে উঁচু রবারের জুতো। পিয়েরকে দেখে রাগে বিড়বিড় করতে করতে সে বারান্দা ধরে চলে গেল।

গেরাসিম বলল, "একসময় খুব চালাক-চতুর লোক ছিলেন, কিন্তু ইয়োর অনার তো দেখতেই পাচ্ছেন যে এখন বড়ই দুর্বল হয়ে পড়েছেন। আপনি কি পড়ার ঘরে যাবেন?" পিয়ের মাথা নাড়ল। ঘরটা যেমন সিল-মারা ছিল তেমনই আছে। সোফিয়া দানিলভ্‌না বলে গেছেন, আপনার কাছ থেকে কেউ এলে তাকে যেন বইগুলো দিয়ে দেই।"

উপকারীর জীবদ্দশায় এই বিষণ্ণ পড়ার ঘরটাতে দুরুদুরু বুকে পিয়ের অনেকবার ঢুকেছে। যোসেফ বাজ্‌দীভ-এর মৃত্যুর পরে কারও হাত না পড়ায় ধূলোময়লাতে ঘরটা আরও বিষণ্ণ দেখাচ্ছে।

একটা জানালা খুলে দিয়ে গেরাসিম পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পিয়ের চারদিক ঘুরে দেখল, যে কাবার্ডে হাতে-লেখা পুঁথিগুলি থাকে সেদিকে গেল এবং যে গ্রন্থগুলি একদিন ছিল সংঘের পবিত্রতমবস্তু সেগুলি বের করে নিল। ধূলি-মলিন লেখার টেবিলে বসে পাণ্ডুলিপিগুলি সামনে মেলে ধরল, আবার বন্ধ করল, একপাশে সরিয়ে রাখল, তারপর দুই হাতের মধ্যে মাথাটা রেখে ধ্যানে ডুবে গেল।

গেরাসিম বারকয়েক সতর্কভাবে ঘরে এল ; প্রত্যেকবারই পিয়েরকে সেই একই ভঙ্গীতে বসে থাকতে দেখল।

দু' ঘণ্টার বেশী পার হয়ে গেল। পিয়েরের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য গেরাসিম সাহস করে দরজার কাছে একটু শব্দ করল ; কিন্তু পিয়ের তা শুনতে পেল না।

"কোচয়ানকে কি ছেড়ে দেব ইয়োর অনার ?"

"ওঃ, হ্যাঁ !" ধ্যানভেঙে ত্বরিতে উঠে পিয়ের বলল। তারপর গেরাসিমের কোটের একটা বোতাম ধরে অশ্রুভেজা, রহস্যময় চোখে বুড়ো লোকটির দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি বলছি কি, কাল যে একটা যুদ্ধ হবে তা কি তুমি জান ?

"সেইরকমই শুনেছি," লোকটি জবাব দিল।

"আমার অনুরোধ, আমি কে সেকথা কাউকে বলোনা, আর আমি যা বলছি তাই কর।"

গেরাসিম বলল, "ঠিক আছে ইয়োর এক্সেলেন্সি। আপনি কিছু খাবেন কি ?"

"না, কিন্তু একটা জিনিস আমি চাই। পরিষ্কার জামা-কাপড় আর একটা পিস্তল," অপ্রত্যাশিতভাবে মুখটা লাল করে পিয়ের বলল।

একমুহূর্ত ভেবে গেরাসিম বলল, "তাই হবে ইয়োর এক্সেলেন্সি।"

সারাটাদিন পিয়ের একাকি সেই পড়ার ঘরেই কাটাল। গেরাসিম শুনতে পেল সে অস্থিরভাবে ঘরময় পায়চারি করছে আর আপন মনেই কথা বলছে। সেই ঘরের বিছানাতেই রাতটাও কাটাল।

এ বাড়িতে অনেক বিচিত্র ঘটনা ঘটতে গেরাসিম দেখেছে ; তাই পিয়ের এ বাড়িতে থাকাতেও সে বিস্মিত হল না, বরং একজন লোক পেয়ে খুশিই হল। সেদিন সন্ধ্যায়ই বিনা প্রশ্নে সে পিয়েরের জন্য একটা কোচয়ানের কোট ও টুপি এনে দিল এবং কথা দিল যে পিস্তলটা পরেরদিন যোগাড় করে দেবে। সন্ধ্যাবেলা মকার আলেক্সিভিচ তার উঁচু রবারের জুতো পরে দরজা পর্যন্ত এসে করুণ চোখে পিয়েরের দিকে তাকাল। কিন্তু পিয়ের তার দিকে চোখ ফেরাতেই ড্রেসিং-গাউনে শরীরটা ঢেকে লাজুক অথচ ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে দ্রুত সেখান থেকে চলে গেল। গেরাসিমের এনে দেওয়া কোটটাকে উত্তাপের সাহায্যে জীবাণুমুক্ত করে সেটাকে গায়ে চাপিয়ে পিয়ের যখন বুড়োকে সঙ্গে নিয়ে সুখারেভ মার্কেটে যাচ্ছিল পিস্তল কিনতে তখনই তার সঙ্গে রস্তভদের দেখা হয়ে যায়।

অধ্যায়—১৯

মস্কোর ভিতর দিয়ে রিয়াজান রোডে পশ্চাদপসরণের কুতুজভের হুকুম-নামাটা জারী করা হল ১লা সেপ্টেম্বর রাতে।

প্রথম সেনাদল সঙ্গে সঙ্গেই যাত্রা করল; সারারাত কোনরকম তাড়া-হুড়া না করে তারা ধীরেসুস্থে পিছিয়ে চলল। অবশ্য ভোরবেলা দরগমিলভ সেতুর নিকটবর্তী শহরের কাছে পৌছে তারা দেখতে পেল, তাদের সামনে দলে দলে সৈন্য ভিড় করে সেতু পার হচ্ছে, বিপরীত দিক থেকে উঠে এসে রাজপথ ও গলি আটকে দিচ্ছে, আবার পিছন দিক থেকে অসংখ্য সৈন্য অকারণ তাড়াহুড়ায় ও আতঙ্কে তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। তারা সেতুর দিকে, সেতুর উপরে এবং নানা খাঁড়ি ও নৌকোর দিকে ছুটে যাচ্ছে। স্বয়ং কুতুজভ ঘুরপথে গাড়ি হাঁকিয়ে মস্কোর অপর দিকে পৌছে গেছে।

২রা সেপ্টেম্বর সকাল নাগাদ বাহিনীর একমাত্র পিছনের অংশটাই রয়ে গেল দরগামিলভের উপকণ্ঠস্থ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। মূল বাহিনী তখন মস্কোর অপর দিকে অথবা মস্কো ছাড়িয়ে চলে গেছে।

ঠিক সেই সময় ২রা সেপ্টেম্বর সকাল দশটায় পক্‌লোনি পাহাড়ের উপর সৈন্যপরিবৃত অবস্থায় দাঁড়িয়ে সম্মুখে প্রসারিত প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে আছে। ২৬শে অগস্ট থেকে ২রা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, অর্থাৎ বরদিনোর যুদ্ধ থেকে ফরাসী বাহিনীর মস্কোতে প্রবেশ পর্যন্ত একটা উত্তেজনাপূর্ণ স্মরণীয় সপ্তাহ ধরে দেখা দিয়েছে সেই অপ্রত্যাশিত হেমন্তের আবহাওয়া যা হঠাৎ এসে সকলকে অবাক করে দেয়, যখন সূর্য নেমে এসে বসন্তকালের চাইতে বেশী উত্তাপ ছড়ায়, যখন বিরল পরিষ্কার আবহাওয়ায় সবকিছু ঝল্‌মল্‌ করে চোখকে ধাঁধিয়ে দেয়, যখন হেমন্তের সুরভিত বাতাস শ্বাস টেনে হৃদপিণ্ড শক্তিশালী ও তাজা হয়ে ওঠে, যখন রাতগুলি পর্যন্ত আতপ্ত হয়ে ওঠে, যখন সেই অন্ধকারে আতপ্ত রাতে সোনালী তারারা অনবরত আকাশ থেকে খসে পড়ে আমাদের চকিত ও আনন্দিত করে তোলে।

২রা সেপ্টেম্বর সকাল দশটাতেও সেই একই আবহাওয়া চলেছে।

সকালের উজ্জ্বলতায় যাদুর স্পর্শ। পক্‌লোনি পাহাড় থেকে দেখা যাচ্ছে, মস্কো তার নদী, বাগান ও গির্জা নিয়ে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত; তার বুকে যেন বয়ে চলেছে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা; সূর্যের আলোয় তার গম্বুজগুলো তারার মত ঝলমল করছে।

বিশিষ্ট স্থাপত্যকীর্তিসমন্বিত এই বিচিত্র শহরটির দিকে তাকিয়ে নেপো-লিয়নের মন সেই ঈর্ষাতুর অস্বস্তিকর কৌতূহলে ভরে উঠল যা মানুষ বোধ করে একটা অজ্ঞাতপূর্ব বিপরীত জীবনধারার স্বাদ পেলে। শহরটি যেন তার নিজস্ব জীবনযাত্রার তাগিদে বেঁচে আছে। অনেক দূর থেকেও যে অস্পষ্ট লক্ষণ দেখে মৃত ও জীবিতের পার্থক্য বোঝা যায়, তা দেখেই পক্‌লোনি পাহাড়ে দাঁড়িয়ে নেপোলিয়ন এই শহরটির প্রাণ-স্পন্দনকে অনুভব করতে পারল; একটি সুন্দর মহান দেশের শ্বাস-প্রশ্বাস যেন তার নাড়িতে স্পন্দিত হতে লাগল।

মস্কোর দিকে তাকিয়ে প্রতিটি রুশই তাকে মা বলে মনে করে; নগর-জননী হিসাবে তার তাৎপর্য ধরতে না পারলেও মস্কোর এই নারী-চরিত্র প্রতিটি বিদেশীর চোখেও ধরা পড়ে; নেপোলিয়নের চোখেও পড়ল।

"ঐ তো সেই অসংখ্য গির্জাশোভিত এসিয়ার শহর মস্কো! শেষ পর্যন্ত তাহলে এলাম সেই বিখ্যাত শহরে! সময় হয়েছে নিকট এবার।" ফরাসীতে কথাগুলি বলে নেপোলিয়ন ঘোড়া থেকে নামল; মস্কোর একখানা মানচিত্র সামনে খুলে ধরবার হুকুম দিয়ে দোভাষী লেরয়ে ছ ইদেভিল্‌কে ডেকে পাঠাল।

"যে শহরকে শত্রু দখল করেছে সে তো মানহারা কুমারীর মত," সে ভাবল (স্মোলেনস্ক-এ কথাটা সেতুচ্‌কভকে বলেছিল)। সেই দৃষ্টিতেই সে এই অদৃষ্টপূর্ব প্রাচ্য সুন্দরীর দিকে তাকিয়ে রইল। তার দীর্ঘদিনের অপ্রাপনীয় বাসনা যে শেষ পর্যন্ত পূর্ণ হয়েছে সেকথা ভেবে তার অবাক লাগছে। সকালের পরিষ্কার আলোয় একবার শহরকে দেখছে, একবার মানচিত্রের দিকে তাকাচ্ছে, তার খুঁটিনাটি বিচার করছে, আর তাকে পাবার নিশ্চিত আশ্বাসে মনটা উত্তেজনায় ও ভয়ে দুলে উঠছে।

সে ভাবতে লাগল: "এর কি অন্যথা হতে পারত? এই তো রাজধানী আমার পায়ের তলে পড়ে আছে। কোথায় এখন আলেক্সান্দার, আর কিই বা তিনি ভাবছেন? একটা আশ্চর্য সুন্দর মহান নগরী, আর একটা আশ্চর্য ও মহান মুহূর্ত! কোন্ আলোয় আমি তাদের কাছে দেখা দেব!" নিজের সৈন্যদের কথা মনে করে সে ভাবল, "এই তো সেই নারী, এইসব দুর্বল-হৃদয় মানুষদের পুরস্কার। আমার মুখের একটি কথা, আমার হাতের একটি ইসারা, সঙ্গে সঙ্গে জারদের এই প্রাচীন শহর ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু আমার ক্ষমা তো বিজিতের মাথায় নেমে আসবার জন্য সদাই প্রস্তুত। আমাকে উদার হতে হবে, সত্যিকারের মহৎ হতে হবে। কিন্তু না, আমি মস্কোতে এসে গেছি এটা সত্য হতে পারে না," হঠাৎ তার মনে হল কথাটা। "কিন্তু ওই তো সে আমার পায়ের কাছে পড়ে আছে, তার সোনালী গম্বুজ ও ক্রুশগুলি সূর্যের আলোয় ঝিকমিক করছে। কিন্তু আমি তাঁকে মুক্তি দেব। বর্বরতা ও স্বেচ্ছাচারের প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভের গায়ে আমি উৎকীর্ণ করে যাব ন্যায় ও করুণার মহান বাণী। এটাই আলেক্সান্দারকে সবচাইতে বেশী ব্যথা দেবে, তাকে আমি চিনি। (নেপোলিয়নের ধারণা যা কিছু ঘটছে নিজের এবং আলেক্সান্দারের মধ্যে ব্যক্তিগত সংঘর্ষই তার প্রধান তাৎপর্য) ক্রেমলিনের মাথায় দাঁড়িয়ে—হ্যাঁ ঐ তো ক্রেমলিন—আমি তাদের দেব সঠিক বিধান, তাদের শিখিয়ে দেব সভ্যতার প্রকৃত অর্থ, এমন ব্যবস্থা করব যাতে বয়াররা (জারের প্রধান সহকারীর দল) বংশ বংশ ধরে তাদের বিজেতাকে ভাল-বাসার সঙ্গে স্মরণ করে। প্রতিনিধি-দলকে বলব, যুদ্ধ আমি চাই নি, কোন-

দিনই চাই না ; আমি যুদ্ধ করেছি শুধু তাদের রাজদরবারের ভ্রান্ত নীতির বিরুদ্ধে ; আলেক্সান্দারকে আমি ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি ; মস্কোতে আমার নিজের এবং আমার জনগণের উপযুক্ত শর্তে সন্ধির প্রস্তাব আমি মেনে নেব। যুদ্ধের সৌভাগ্যকে একজন সম্মানিত নৃপতিকে অসম্মান দেখাবার কাজে লাগাতে আমি চাইনা। তাদের ডেকে বলব, 'বয়ারগণ, আমি যুদ্ধ চাই না, চাই আমার প্রজাবৃন্দের শান্তি ও কল্যাণ।' যাই হোক, আমি জানি তাদের উপস্থিতি আমাকে অনুপ্রাণিত করবে, যেমন সব সময়ই করে থাকি তাদের সঙ্গেও সেইভাবেই কথা বলব : স্পষ্টভাবে, প্রভাব বিস্তার করে, মহত্ত্বের সঙ্গে। কিন্তু আমি মস্কোতে পৌঁচেছি—এ কি সত্য হতে পারে ? হ্যাঁ, ওই তো সে পড়ে আছে।"

"বয়ারদের আমার সামনে হাজির কর," দলের লোকদের বলল।

ঝক্‌ঝকে পোশাক পরা একজন জেনারেল সঙ্গে সঙ্গে বয়ারদের আনতে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

দু' ঘণ্টা কেটে গেল। নেপোলিয়ন খাওয়া শেষ করে পক্‌লোনি পাহাড়ের উপর সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রতিনিধিদলের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। বয়ারদের কাছে যে ভাষণটি দেবে কল্পনাও সেটা স্পষ্ট রূপ পেয়ে গেছে। নেপোলিয়নের ধারণামতে সে ভাষণ মর্যাদা ও মহত্ত্বে পরিপূর্ণ।

মস্কোর প্রতি যে উদারতা দেখাবে বলে সে স্থির করেছে তার দ্বারা সে নিজেই অভিভূত হয়ে পড়েছে। জারদের প্রাসাদে অনুষ্ঠিত যে সমাবেশে রাশিয়ার এবং তার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ একত্র মিলিত হবে কল্পনায় তার দিন-ক্ষণ পর্যন্ত সে স্থির করে ফেলেছে। মনে মনে এমন একজন শাসনকর্তা নিয়োগ করেছে যে জনগণের হৃদয় জয় করবে। মস্কোতে অনেক দাতব্য প্রতিষ্ঠান আছে জেনে সে মনে মনে স্থির করেছে যে সে সবগুলিতেই সে করুণা বিতরণ করবে। আফ্রিকাতে সে যেমন আরবদের মত মস্তকাবরণ পরে মসজিদে গিয়ে বসেছিল, তেমনই মস্কোতেও সে জারদের মতই সকলের উপকার করবে। এবং শেষ পর্যন্ত রুশদের অন্তরকে স্পর্শ করার উদ্দেশ্যে সে স্থির করল যে এইসব প্রতিষ্ঠানের গায়ে সে বড় বড় অক্ষরে খোদাই করে দেবে : 'এই প্রতিষ্ঠানকে আমার আদরের মায়ের নামে উৎসর্গ করা হইল।' অথবা শুধু লেখা হবে : Maison de la Mere (মাতৃ সদন)। কিন্তু আমি কি সত্যি মস্কোতে এসেছি ? হ্যাঁ, ওই তো সে আমার সামনে পড়ে আছে। কিন্তু শহর থেকে প্রতিনিধিদল আসতে এত বিলম্ব হচ্ছে কেন ?" সে অবাক হল।

ইতিমধ্যে তার দলবলের পিছন দিকে জেনারেল ও মার্শালদের মধ্যে ফিস্‌ ফিস্‌ করে একটা উত্তেজিত আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। প্রতিনিধিদলকে নিয়ে আসতে যারা গিয়েছিল তারা এই সংবাদ নিয়ে ফিরে এসেছে যে মস্কো এখন জনশূন্য, প্রত্যেকেই মস্কো ছেড়ে চলে গেছে। যারা আলোচনা করছে

তাদের মুখ বিবর্ণ ও বিচলিত। অধিবাসীরা মস্কো ত্যাগ করে চলে গেছে এ সংবাদে তারা শঙ্কিত নয়, তাদের শঙ্কা হচ্ছে সম্রাটের মর্যাদাকে হাস্যকর করে না তুলে কেমন করে তাকে বলা হবে যে বৃথাই সে এতক্ষণ বয়ারদের জন্য অপেক্ষা করে আছে : মস্কোতে এখন পাঁড় মাতাল ছাড়া আর কেউ নেই। কেউ বলল, কোনরকম একটা প্রতিনিধিদল খাড়া করা হোক; আবার অন্যরা তাতে আপত্তি করে বলল, আগে সাবধানে সুকৌশলে সম্রাটকে তৈরি করে নিয়ে তারপর সত্য কথাই বলা হোক।

"তাকে বলতে তো হবেই। কিন্তু ভদ্রজনরা⋯⋯"

অবস্থাটা আরও ঘোরালো হয়ে উঠেছে কারণ বড় বড় পরিকল্পনার কথা ভাবতে ভাবতে সম্রাট প্রসারিত মানচিত্রের পাশে ধৈর্যের সঙ্গে পায়চারি করছে এবং উজ্জ্বল গর্বের হাসি হেসে কপালের উপর হাত তুলে বারবার মস্কোর রাস্তার দিকে তাকাচ্ছে।

"কিন্তু এ যে অসম্ভব," দলের লোকরা কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে উঠল; কিন্তু "এটা হাস্যকর" এই আসল কথাটা সাহস করে বলতে পারল না।

শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ প্রতীক্ষায় ক্লান্ত হয়ে সম্রাট তার অভিনেতাসুলভ স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশেই বুঝতে পারল যে অত্যন্ত বেশীক্ষণ বিলম্বিত হওয়ার ফলে সেই মহান মুহূর্তটি তার মহত্ত্বকে হারিয়ে ফেলেছে; সঙ্গে সঙ্গে সে হাত তুলে একটা ইঙ্গিত করল। তারপরেই শোনা গেল কামানের একটা সংকেত-ধ্বনি, আর মস্কোর বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে থাকা সৈন্যরা তিভের, কালুগা ও দরগমিলভ ফটক দিয়ে শহরে ঢুকতে শুরু করল। পরস্পরের সঙ্গে রেশারেশি করে দ্রুত, আরও দ্রুত তারা জোড় কদমে বা দুল্‌কি চালে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল, অশ্বক্ষুর থেকে উত্থিত ধোঁয়ায় নিজেরাই ঢেকে গেল, সকলের কান-ফাটানো সম্মিলিত কোলাহলে বাতাস ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

সৈন্যদের গতির টানে নেপোলিয়নও তাদের সঙ্গে দরগমিলভ ফটক পর্যন্ত গিয়ে থামল, ঘোড়া থেকে নেমে কামের-কোলেজ্‌স্কি প্রাচীরের পাশে অনেকক্ষণ পায়চারি করল প্রতিনিধিদলের প্রতীক্ষায়।

অধ্যায়—২০

ইতিমধ্যে মস্কো হয়ে গেছে। কিছু লোক তখনও আছে, হয়তো আগেকার জনসংখ্যার পঞ্চাশ ভাগের একভাগ; তবু ফাঁকা। রানী-মৌমাছিহীন একটা মুমূর্ষ মৌচাক যে অর্থে ফাঁকা।

ভাসা-ভাসা চোখে অন্য যেকোন মৌচাকের মত জীবন্ত দেখালেও রানী-মৌমাছিহীন মৌচাকে কোন জীবন থাকে না।

জীবন্ত মৌচাকের মতই রানীহীন মৌচাক ঘিরেও মৌমাছিরা চক্রাকারে ঘোরে মধ্যাহ্ন সূর্যের উত্তপ্ত রোদ গায়ে মেখে; অন্য মৌচাকের মতই দূর থেকে

মধুর গন্ধ পাওয়া যায়, মৌমাছিরা ভিতরে-বাহিরে একইভাবে উড়তে থাকে। কিন্তু ভাল করে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে চাকে তখন আর জীবন নেই। মৌমাছিরা ঠিক আগের মত ওড়ে না, মৌমাছি-পালকের নাকেও আগের মত গন্ধ আসে না। মৌমাছি-পালক যখন রুগ্ন মৌচাকের দেয়ালে টোকা দেয় তখন আগে যেমন মুহূর্তের মধ্যে হাজার হাজার মৌমাছি তলপেটকে ভয়ংকরভাবে সংকুচিত করে একসুরে গুঞ্জন করে উঠত, পাখনার দ্রুত ঝটপটানিতে একটা বায়বীয় জীবন্ত শব্দ তুলত, তার পরিবর্তে পরিত্যক্ত মৌচাক থেকে শোনা যায় শুধু বিভিন্ন অংশ থেকে আসা একটা অসংলগ্ন ভোঁ-ভোঁ শব্দ। শান্ত্রী-মৌমাছিরা যেভাবে তলপেটটা তুলে বিপদ-সংকেত জানাত এবং মৌচাকটিকে রক্ষায় জীবন দিতে প্রস্তুত হত এখন আর সেটা দেখা যাবে না। ফুটন্ত জলের মত স্পন্দিত কর্মব্যস্ততার পরিমিত শান্ত শব্দের পরিবর্তে এখন শোনা যাবে নানা বিশৃংখল বেসুরো শব্দ। মৌচাকের ভিতরে ও বাইরে লম্বা কালো দস্যু-মৌমাছিগুলি মধুতে মাখামাখি হয়ে ভীরু ধীর গতিতে উড়ে বেড়ায়। তারা হুল ফোটায় না, ভয়ে কুঁকড়ে সরে যায়। আগে একমাত্র মধুবাহী মৌমাছিরাই চাকের ভিতরে ঢুকত, বেরিয়ে আসত শূন্য দেহে, আর এখন তারা বেরিয়ে আসছে মধু বোঝাই হয়ে। আগে থাকত একটা পরিষ্কার চটচটে মেঝে, সেখানে বইত মৌমাছিদের পাখার হাওয়া, আর এখন মেঝেতে ছড়িয়ে আছে মোমের টুকরো, বিষ্ঠা, মুমূর্ষু, মৌমাছিরা কোনরকমে পা নাড়ছে, আর মরা মৌমাছিগুলোকেও সরিয়ে দেওয়া হয় নি।

মৌমাছি-পালক চাকের উপরের অংশটা খুলে ভিতরটা পরীক্ষা করে দেখে। মধুচক্রের প্রতিটি খোপ মোম দিয়ে ভর্তি করার কাজে ব্যস্ত থাকা মৌমাছির পরিবর্তে এখন সে দেখতে পায় শুধু মধুচক্রের একটা জটিল সুকৌশল গঠন, কিন্তু আগেকার পবিত্রতার স্পর্শ তাতে নেই। সবই উপেক্ষিত, পচা। কালো কালো দস্যু-মৌমাছিগুলি দ্রুতপায়ে চোরের মত মধুচক্রের উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিচ্ছে, আর ছোট ছোট গৃহিণী-মৌমাছিগুলি নিরুৎসাহভাবে বিকৃত দেহ নিয়ে ধীরে ধীরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, দস্যুগুলোকে তাড়াবার কোন চেষ্টাই করছে না; যেন জীবনের সব বোধ, সব বাসনাই হারিয়ে ফেলেছে। মৌমাছি-পালক মধ্যেকার দুটো বেড়া ফাঁক করে জীবকোষগুলোকে পরীক্ষা করে। আগে যেখানে পিঠে পিঠ লাগিয়ে হাজার হাজার মৌমাছি কালো বৃত্ত রচনা করে রাখত যেন জন্মের গভীর রহস্যকে ঢেকে রাখবার জন্যই, এখন সেখানে সে দেখে শুধু কয়েক শ' নিস্তেজ, নিরুৎসাহ মৌমাছির ঘুমন্ত খোলস। নিজেদের অজ্ঞাতেই তারা প্রায় মরতে বসেছে; যে আশ্রয়কে তারা এতদিন রক্ষা করেছে, এখন আর যার কোন অস্তিত্বই নেই, তারই উপরে তারা বসে আছে। তাদের গায়ে ধ্বংস ও মৃত্যুর গন্ধ। শুধু কয়েকটা মৌমাছি এখনও নড়ছে, উঠছে,

শত্রুর হাতের উপর বসবার জন্য কোনক্রমে উড়ছে, শেষবারের মত হুল ফুটিয়ে মরবার ইচ্ছাটা পর্যন্ত হারিয়ে গেছে ; বাকিগুলো সব মরে গেছে, মাছের আঁসের মত ঝরে পড়ছে। মৌমাছি-পালক চাকটা বন্ধ করে, তার উপর একটা খড়ির দাগ কাটে, তারপর সময়মত ভিতর থেকে সবকিছু বের করে এনে আগুনে পুড়িয়ে ফেলে।

মস্কো যখন ঠিক সেইরকম ফাঁকা তখনই ক্লান্ত বিষণ্ণ নেপোলিয়ন কামের-কোলেজ্‌স্কি প্রাচীরের সামনে পায়চারি করতে করতে প্রতিনিধিদলের জন্য অপেক্ষা করছে ; নেহাৎই আনুষ্ঠানিক ব্যাপার হলেও তার বিবেচনায় এই সৌজন্য রক্ষা করে চলা প্রয়োজন।

মস্কোর কোণে কোণে তখনও কিছু লোক উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে ; তারা যে কি করছে সেটা না বুঝেই পুরনো অভ্যাসবশত ঘোরাফেরা করছে।

অনেক বিচার-বিবেচনার পরে নেপোলিয়নকে যখন জানানো হল যে মস্কো জনশূন্য, তখন সে সংবাদদাতার দিকে একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েই সরে গেল এবং নীরবে পায়চারি করতে লাগল।

"আমার গাড়ি!" হাঁক দিল।

কর্তব্যরত এড-ডি-কংয়ের পাশে বসে নেপোলিয়ন শহরতলীর দিকে গাড়ি চালিয়ে দিল। নিজের মনেই বলল, "মস্কো পরিত্যক্ত! কী অবিশ্বাস্য ঘটনা!"

শহরে না ঢুকে সে দরগমিলভ শহরতলীর একটা সরাইখানায় উঠল।

নাটকীয় ঘটনাটি আর ঘটল না।

অধ্যায়—২১

রাত দুটো থেকে বিকেল পর্যন্ত রুশ সৈন্যরা মস্কোর উপর দিয়ে পিছিয়ে যেতে লাগল ; আহত সৈন্য ও অবশিষ্ট অধিবাসীদের সঙ্গে নিয়ে গেল।

সৈন্যদের চলাচলের সবচাইতে বেশী চাপ পড়ল স্টোন, মস্কভা ও ইয়াউজা সেতুর উপর।

সৈন্যরা যখন দু'দলে ভাগ হয়ে ক্রেম্‌লিনকে ঘুরে যাচ্ছিল, মস্কভা ও স্টোন সেতুর উপর ভিড় করছিল, তখন বহুসংখ্যক সৈন্য সেই ভিড় ও জান-জটের সুযোগ নিয়ে সেইসব সেতুর উপর থেকে পিছিয়ে এসে নিঃশব্দে চুপি চুপি সরে পড়ল এবং "সুন্দরী ভাসিলি" গির্জার পাশ দিয়ে ও বরভিৎস্কি ফটকের নীচ দিয়ে পাহাড় বেয়ে উঠে রেড স্কোয়ারে ফিরে গেল ; সহজাত প্রবৃত্তিই যেন তাদের বলে দিল, সেখানে গেলে তারা সহজেই এমন সব জিনিস হাতাতে পারবে যা তাদের নয়। সস্তা নীলামে যেসব লোক ভিড় করে তারা এসে বাজারের অলিগলি সব ভরে ফেলেছে ; কিন্তু কেন নীলাম-ওয়ালা গলা ছেড়ে খদ্দেরদের সাদর আহ্বান জানাচ্ছে না ; কোন ফেরিওয়ালা

সেখানে নেই, নেই ক্রয়েচ্ছু মেয়েদের ভিড়; শুধু ইউনিফর্ম ও ওভারকোট পরা সৈন্যরাই ভিড় করেছে; তাদের হাতে কিন্তু বন্দুক নেই; খালি হাতে তারা নীরবে বাজারে ঢুকছে আর নানারকম বাণ্ডিল হাতে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। ব্যবসায়ী ও তাদের সহকারীরা বিমূঢ়ভাবে ইতস্তত চলাফেরা করছে। একবার দোকানের তালা খুলছে, আবার লাগাচ্ছে, আর সহকারীদের সহায়তায় যতটা পারছে মালপত্র সরিয়ে নিচ্ছে। বাজারের সামনে স্কোয়ারের মধ্যে ভেরীবাদকরা জমায়েতের বাজনা বাজাচ্ছে, কিন্তু তা শুনে সৈন্যরা তাদের দিকে এগিয়ে না গিয়ে বরং আরও দূরে সরে যাচ্ছে। দোকানে ও গলিতে সৈন্যদের মধ্যে এমন কিছু লোক দেখা যাচ্ছে যাদের পরনে ধূসর কোট, মাথা কামানো (জেল থেকে ছাড়া পাওয়া বন্দীর দল)। দুজন অফিসার ইলিংকা স্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। একজনের ইউনিফর্মের উপর চাদর জড়ানো, একটা শুটকো গাঢ় ধূসর রঙের ঘোড়ায় আসীন; অপরজনের গায়ে ওভার কোট, রাস্তায় দণ্ডায়মান। তৃতীয় একজন অফিসার ঘোড়া ছুটিয়ে সেখানে এল।

"জেনারেল হুকুম দিয়েছেন, এই মুহূর্তে সব্বাইকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে। এ যে অসহ্য! অর্ধেক সৈন্য সরে পড়েছে।"

বন্দুকবিহীন তিনজন পদাতিক সৈন্য ওভারকোটের তলাটা উঁচু করে তুলে বাজারের গলিতে কেটে পরছিল; তাদের দেখে অফিসারটি চেঁচিয়ে বলল, "তোমরা কোথায় যাচ্ছ? ...কোথায়? ...থামো, রাস্কেলের দল!"

অপর অফিসার বলল, "কিন্তু ওদের আপনি থামাবেন কেমন করে? ওদের তো একত্রে পাওয়াই যাচ্ছে না। অন্যরা পথ আটকাবার আগেই সেনাবাহিনীকে এগিয়ে যেতে হবে।"

"কিন্তু এগিয়ে যাবে কেমন করে? ওরা তো ওখানে আটকে গেছে, সেতুর উপর যেন খোঁটা গেড়েছে, মোটেই নড়ছে না। বাকিরা যাতে পালাতে না পারে সেজন্য তাদের ঘেরাও করা দরকার নয় কি?"

সিনিয়র অফিসার চেঁচিয়ে বলল, "চলে আসুন, ওখানে যান, ওদের তাড়িয়ে দিন!"

চাদর জড়ানো অফিসারটি ঘোড়া থেকে নেমে একজন ভেরীবাদককে ডেকে তাকে নিয়ে ঢাকা বারান্দায় চলে গেল। কয়েকটি সৈনিক দল বেঁধে ছুট দিল। নাকের কাছে গালের উপর লাল তিলওয়ালা একটি দোকানী হাত দোলাতে দোলাতে তারদিকে এগিয়ে এল।

বলল, "ইয়োর অনার! দয়া করে আমাদের বাঁচান! ছোটখাট জিনিস খোয়া গেলে আমরা কিছু মনে করি না, আপনারা যা খুশি নিতে পারেন—তাতে আমরা খুশিই হব! ...এমন একজন সম্মানিত ভদ্রলোকের জন্য একটুকরো কাপড় আমি এক্ষুণি এনে দিচ্ছি, দরকার হলে দুটো

টুকরোও খুশি হয়েই দেব। অবস্থাটা তো বুঝতেই পারছি: কিন্তু এসব কী হচ্ছে—এ যে স্রেফ ডাকাতি; আপনি কি দয়া করে কিছু পাহারা বসাতে পারেন না যাতে আমরা অন্ততঃ দোকানগুলো বন্ধ করতে পারি…"

কয়েকজন দোকানী অফিসারকে ঘিরে দাঁড়াল।

কড়া চেহারার একজন রেগে বলল, "আঃ, কী বোকার মত বকছ। মাথাটাই যখন কাটা যাচ্ছে তখন কি কেউ চুলের লাগি কাঁদে। দয়া করে ভিতরে আসুন ইয়োর অনার!"

শুটকো লোকটি চেঁচিয়ে বলল, "বকবকই বটে! এখানে আমার তিনটে দোকানে লাখ রুবল দামের মালপত্র আছে। সৈন্যরা চলে গেলে কি সেসব বাঁচানো যাবে? আর মানুষগুলোও হয়েছে বটে! 'ঈশ্বরের মার দুনিয়ার বার।"

প্রথম দোকানী অভিনন্দন জানিয়ে বলল, "ভিতরে আসুন ইয়োর অনার!"

অফিসারটি বিব্রত বোধ করতে লাগল; তার মুখে ইতস্ততভাব।

"এটা আমার কাজ নয়," বলেই সে তাড়াতাড়ি গলিতে পা বাড়াল।

একটা খোলা দোকানের ভিতর থেকে ঘুসোঘুসি ও গালাগালির শব্দ শোনা গেল। অফিসারটি সেখানে আসা মাত্রই মাথা কামানো ধূসর কোট পরা একটি লোককে সজোরে ধাক্কা দিয়ে বাইরে ফেলে দেওয়া হল।

লোকটি ডিগবাজী খেয়ে ব্যবসায়ী ও অফিসারটির মাঝখান দিয়ে ছুটে চলে গেল। দোকানের মধ্যে যেসব সৈন্য ছিল অফিসারটি তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঠিক সেইমুহূর্তে মস্ক্‌ভা সেতুর উপরকার প্রচণ্ড ভিড়ের ভিতর থেকে একটা ভয়ংকর আর্তনাদ ভেসে এল, আর অফিসারটি ছুটে স্কোয়ারের ভিতরে ঢুকল।

"কি হল? কি হল?" সে শুধাল, কিন্তু তার সহকর্মীটি ততক্ষণে "সুন্দরী ভাসিলি"র পাশকাটিয়ে আর্তনাদ লক্ষ্য করে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছে।

অফিসারটিও ঘোড়ায় চেপে তার পিছু নিল। সেতুর উপর পৌঁছে দেখতে পেল দুটো কামান দাঁড়িয়ে আছে, পদাতিক সৈন্যরা সেতু পার হচ্ছে, কয়েকটা গাড়ি উল্টে গেছে, আর কতক সৈন্যরা ভয় পেয়েছে, কতক হাসছে। কামানের পাশে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে; তাতে ঘোড়া জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। গলায় কলার পরানো চারটে কুকুর চাকা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িটা উঁচু করে বোঝাই করা হয়েছে, আর উল্টো করে বসানো একটা বাচ্চাদের চেয়ারের পাশে বসে একটি চাষা স্ত্রীলোক মর্মভেদী চীৎকার করছে। সহকর্মী-অফিসাররা জানাল, জেনারেল এর্মালভ এখানে পৌঁছে যখন জানতে পারল যে সৈন্যরা দোকানে দোকানে ঢুকে পড়েছে, আর নাগরিকরা সেতুর উপরে জট পাকিয়ে ফেলেছে, তখন সে হুকুম দেয় যে

সেতুকে লক্ষ্য করে গুলি চালাবার ভান করে কামান দুটোকে সেইদিকে তাক করে বসানো হোক, আর তার ফলেই ভিড়ের লোকজন ও স্ত্রীলোকটি আর্তনাদ শুরু করে দিয়েছে। ভিড়ের লোকরা ধাক্কাধাক্কি করে, গাড়ি উল্টে ফেলে বেপরোয়াভাবে চীৎকার করতে করতে সেতুর মুখটা ফাঁকা করে দিয়েছে, আর তাই সৈন্যরা এখন সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে।

অধ্যায়—২২

ইতিমধ্যে শহর জনশূন্য হয়ে গেছে। রাস্তায় লোকজন নেই বললেই চলে। সব ফটক ও দোকানপাটই বন্ধ; শুধু শুঁড়িখানাগুলো ঘিরে এখানে-ওখানে কিছু চেঁচামেচি ও মাতলামির গান শোনা যাচ্ছে। পথে কোন গাড়ি নেই। পায়ের শব্দও কদাচিৎ কানে আসে। পোভাঁস্কায়া নিস্তব্ধ ও জনহীন। রস্তভদের বাড়ির প্রকাণ্ড উঠোনে পড়ে আছে শুধু খড়ের স্তূপ আর ঘোড়ার গোবর; একটা মানুষও চোখে পড়ছে না। বাড়ির মস্তবড় বৈঠকখানায় জিনিসপত্র সবই আছে, কিন্তু মানুষ আছে মাত্র দুটি। উঠোনের দারোয়ান ইগ্‌নাৎ আর ভাসিলিচের নাতি ছোকরা-চাকর মিশ্‌কা; ঠাকুর্দার সঙ্গে সেও মস্কোতে থেকে গেছে। মিশ্‌কা ক্ল্যাভি কর্ডটা খুলে এক আঙুল দিয়ে সেটাকে ঠুকছে। ইগ্‌নাৎ দুই হাত আড়াআড়িভাবে বুকের উপর রেখে বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে খুশিতে হাসছে।

হঠাৎ দুই হাতে কিবোর্ডে ঠেকা দিতে দিতে ছেলেটা বলে উঠল, "খুব চমৎকার, কি বল ইগ্‌নাৎ খুড়ো?"

আয়নায় নিজের দন্তবিকাশ দেখে বিস্মিত ইগ্‌নাৎ বলল, "কী আশ্চর্য!"

মাভ্রা কুজ্‌মিনিচ্‌না নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে বলে উঠল "বেয়াদপি! বেয়াদপি! মোটা জালাটা কী রকম দাঁত বের করেছে দেখ! তুমি কি এই জন্যই এখানে আছ? ওদিকে কিচ্ছু পরিষ্কার করা হয় নি, আর ভাসিলিচ খেটে খেটে মারা গেল। একটু সবুর কর!"

বেল্টটা ঠিক করতে করতে চোখ নীচু করে ইগ্‌নাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ছেলেটি বলল, "আমি খুব আস্তে আস্তেই বাজাচ্ছিলাম মাসি।"

হাত তুলে মারের ভয় দেখিয়ে মাভ্রা কুজ্‌মিনিচ্‌না বলল, "তোমাকেও আস্তে আস্তেই কিছু দেব, বাঁদর কোথাকার! যাও, ঠাকুর্দার জন্য সামোভারটা গরম কর গে।"

মাভ্রা কুজ্‌মিনিচ্‌না ক্ল্যাভিকর্ডের ধুলো ঝেড়ে সেটা বন্ধ করল; দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে প্রধান দরজায় তালা লাগিয়ে দিল।

উঠোনে নেমে একটু থেমে ভাবতে লাগল এখন কোথায় যাবে—চাকরদের ঘরে গিয়ে ভাচিলিচের সঙ্গে চা খাবে, না কি ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে সেটাকে

একটু গোছগাছ করবে।

শান্ত রাজপথে দ্রুত পায়ের শব্দ শোনা গেল। কে যেন ফটকে এসে থামল। সিটকিনির শব্দ হল, কে যেন সেটা খুলবার চেষ্টা করছে।

মাভ্রা কুজ্‌মিনিচ্‌না ফটকের দিকে এগিয়ে গেল।

"কি চাই?"

"কাউণ্ট—কাউণ্ট ইলিয়া অন্দ্রিভিচ রস্তভ।"

"কিন্তু আপনি কে?"

"একজন অফিসার, তার সঙ্গে দেখা করতে চাই, নম্র, মার্জিত রুশ গলায় জবাব এল।

মাভ্রা কুজ্‌মিনিচ্‌না ফটক খুলে দিল। আঠারো বছর বয়সের একটি অফিসার উঠোনে ঢুকল; রস্তভদের মতই গোল তার মুখের আদল।

মাভ্রা কুজ্‌মিনিচ্‌না সাদরে বলল, "তারা তো চলে গেছেন স্যার। কাল সন্ধ্যাবেলায় চলে গেছেন।"

তরুণ অফিসারটি ঢুকবে কি ঢুকবে না ইতস্তত করে জিভ দিয়ে চুক-চুক শব্দ করল।

বলল, "আঃ, বড়ই মুস্কিল হল! আমার গতকালই আসা উচিত ছিল। কী দুঃখের কথা!"

এদিকে মাভ্রা কুজ্‌মিনিচ্‌না ছেলেটির মুখের রস্তভ পরিবারের আদল, তারা ছেঁড়া কোট ও ছেঁড়া বুটের দিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল।

বলল, "কাউণ্টের সঙ্গে কি জন্য দেখা করতে চাইছেন?"

"দেখুন, মানে⋯কোন লাভ নেই! বিরক্ত স্বরে কথাটা বলে চলে যাবার জন্যই সে ফটকে হাত দিল।

ইতস্তত করে আবার থামল।

তারপর হঠাৎ বলে উঠল, "দেখুন, আমি কাউণ্টের একজন আত্মীয়; তিনি আমার প্রতি খুব সদয়। দেখতেই তো পাচ্ছেন আমার জামা-জুতো সবই শতচ্ছিন্ন, হাতেও টাকা নেই, তাই কাউণ্টের কাছে এসেছিলাম কিছু⋯"

মাভ্রা কুজমিনিচ্‌না তাকে কথা শেষ করতে দিল না।

"একমিনিট অপেক্ষা করুন স্যার! ক্ষণিকমাত্র", সে বলল।

অফিসারটি ফটকের হাতল থেকে হাতটা সরিয়ে নিতেই সে পিছনের উঠোন দিয়ে চাকরদের ঘরের দিকে চলে গেল।

উঠোনে হাঁটতে হাঁটতে অফিসারটি নিজের ছেঁড়া বুট জোড়ার দিকে তাকিয়ে মাথা নীচু করে ঈষৎ হাসল। ভাবল, "কী দুঃখ যে খুড়োমশায়ের সঙ্গে দেখা হল না! এই বৃদ্ধটিও কী ভাল। উনি ছুটে গেলেন কোথায়? আমার রেজিমেণ্ট তো এতক্ষণে রঘোঝ্‌স্কি ফটকের কাছে পৌঁছে গেছে;

রেজিমেণ্টকে ধরবার সোজা পথটাই বা কেমন করে খুঁজে পাব ?” ঠিক সেই-সময় একখানা পাকানো ডোরা-কাটা রুমাল হাতে নিয়ে মাভ্রা কুজ্‌মিনিচ্‌না এসে হাজির হল। কয়েক পা দূরে থাকতেই রুমালের পাক খুলে একখানা পঁচিশ রুবলের সাদা নোট বের করে তাড়াতাড়ি সেটা তার হাতে গুঁজে দিল।

“হিজ এক্সেলেন্সি বাড়ি থাকলে অবশ্য আত্মীয় হিসাবে তিনি""কিন্তু এ অবস্থায়…”

মাভ্রা কুজ্‌মিনিচ্‌নার মুখ লাল হয়ে উঠল। অফিসারটি আপত্তি না করে নীরবে নোটটা নিয়ে তাকে ধন্যবাদ দিল।

মাভ্রা কুজ্‌মিনিচ্‌না ত্রুটিস্বীকারের ভঙ্গীতে আবার বলল, “কাউণ্ট যদি বাড়ি থাকতেন…খৃস্ট আপনার সহায় হোন স্যার! ঈশ্বর আপনাকে রক্ষা করুন!” সে মাথাটা নোয়াল; অফিসারটি বেরিয়ে গেল।

মাথা দুলিয়ে খুশিতে হাসতে হাসতে অফিসারটি পরিত্যক্ত পথ বেয়ে দ্রুত হাঁটতে লাগল যাতে ইয়াউজা সেতুতেই তার রেজিমেণ্টকে ধরতে পারে।

কিন্তু মাভ্রা কুজ্‌মিনিচ্‌না অশ্রুভেজা চোখে বেশ কিছুক্ষণ ফটকেই দাঁড়িয়ে রইল; অজ্ঞাত তরুণ অফিসারটির প্রতি মাতৃস্নেহ ও করুণার অপ্রত্যাশিত প্রবাহে তার বুকটা ভরে উঠেছে; বিষণ্ণ অন্তরে সে মাথাটা দোলাতে লাগল।

অধ্যায়—২৩

বরবার্কার উপরে অবস্থিত একটা অসমাপ্ত বাড়ির একতলার মদের দোকান থেকে মাতালদের হৈ-হল্লা ও গান ভেসে আসছে। একটা ছোট নোংরা ঘরের টেবিলের চার পাশে বেঞ্চিতে বসে আছে জনাদশেক কারখানার মজুর। আবছা দৃষ্টি ও হাঁ-করা মুখে ঘর্মাক্ত অবস্থায় তারা বেশ কষ্ট করে একটা না একটা গান করে চলেছে। সে গানে কোন তাল-লয় নেই, গাইতে বেশ কষ্টও হচ্ছে, গান গাওয়ার জন্যই যে গাইছে তাও নয়, তারা যে মাতাল হয়ে বেশ মৌজে আছে সেটা দেখাতেই গান করছে। পরিষ্কার নীল কোটপরা একটি লম্বা সুকেশ ছেলে অন্য সকলের উপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। ঠোঁট দুটো পাতলা, চাপা ও বাঁকা না হলে এবং চোখ দুটো স্থির ও বিষণ্ণ না হলে সুন্দর খাড়া নাকের জন্য তার মুখটা বেশ ভালই দেখাত। একটা কিছু বলার জন্যই সে উঠে দাঁড়িয়েছে; কনুই পর্যন্ত আস্তিন গুটিয়ে সকলের মাথার উপর দিয়ে সাদা হাতটা ঘোরাচ্ছে; নোংরা আঙুলগুলোকে অস্বাভাবিকভাবে ছড়িয়ে দিয়েছে। কোটের আস্তিনটা বারবার নেমে যাচ্ছে, আর সেও বাঁ হাত দিয়ে সেটাকে বার বার গুটিয়ে নিচ্ছে, যেন যে পেশীবহুল হাতটা সে ঘোরাচ্ছে সেটা খোলা থাকা খুবই দরকারী। গানের ফাঁকে ফাঁকেই বারান্দায় ও ফটকে চীৎকার, লড়াই ও ঘুসোঘুসির শব্দ শোনা

যাচ্ছে। লম্বা ছেলেটি হাত নাড়তে লাগল।

হঠাৎ সে বলে উঠল, "এসব থামাও! ওখানে লড়াই চলেছে বাছা-ধনরা!" তারপর আস্তিন গোটাতে গোটাতেই বাইরের ফটকে চলে গেল।

কারখানার মজুররা তার পিছু নিল; লম্বা ছেলেটার নেতৃত্বে এই লোক-গুলি সকালেই মদের দোকানে ঢুকে মদ খাচ্ছিল; কারখানা থেকে কিছু চামড়া নিয়ে এসেছিল, আর তার বদলেই তাদের সকলকে মদ দেওয়া হচ্ছিল। এদিকে নিকটবর্তী কামারশাল থেকে একদল কামার শুঁড়িখানায় হৈ-হট্টগোল শুনে ওরা দোকানের দরজা ভেঙে ঢুকেছে ভেবে তারাও জোর করে ঢুকতে চাইল, আর তাই নিয়ে ফটকে দুই দলের মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে গেছে।

দোকানের মালিক দরজার কাছেই একটা কামারকে মারছিল; মজুররা এসে পড়তে কামারটা মালিকের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সপাটে পথের উপর পড়ে গেল।

আর একটি কামার বুক দিয়ে মালিককে ঠেলে দরজা দিয়ে ঢুকতে চেষ্টা করল।

আস্তিন-গুটানো ছেলেটা কামারের মুখে এক ঘুসি মেরে চীৎকার করে বলল, "ওরা আমাদের সঙ্গে লড়তে এসেছে হে!"

সেইসময় প্রথম কামারটি উঠে নিজের ছড়ে-যাওয়া মুখটাকে আঙুল দিয়ে আঁচড়ে রক্ত বের করে কান্নাভরা গলায় চীৎকার করে বলল:

"পুলিশ! খুন! ···একটা লোককে ওরা খুন করেছে!"

কাছাকাছি আর একটা ফটক দিয়ে বেরিয়ে এসে একটি স্ত্রীলোক চেঁচাতে শুরু করল, "হায় কপাল!..." একটা লোককে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে—খুন করেছে!····"

রক্তাক্ত কামারটিকে ঘিরে ভিড় জমে গেল।

দোকানের মালিককে ডেকে একজন বলল, "মানুষের অনেক কিছু তো লুঠ করেছ—তাদের শেষ শার্টটা পর্যন্ত নিয়েছ। ওরে চোর, একটা মানুষকে কেন খুন করেছিস?"

লম্বা ছেলেটা একবার দোকানীর দিকে, একবার কামারের দিকে তাকিয়ে যেন ভাবতে লাগল এবার কার সঙ্গে লড়বে।

হঠাৎ দোকানীর দিকে ফিরে বলল, "এই খুনী! ওকে বেঁধে ফেল বাছারা!"

যে লোকগুলি এগিয়ে এসেছিল তাদের ঠেলে সরিয়ে দিয়ে এবং মাথার টুপিটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দোকানের মালিক চেঁচিয়ে বলল, "আমাকে তো বাঁধতে চাইবেই!"

যেন তার এই কাজের একটা রহস্যময় ক্ষতিকর তাৎপর্য আছে এই কথা

ভেবে মজুররা ইতস্তত করে থেমে গেল।

"আইনের খবর আমি ভালই জানি স্যাঙাৎরা! ব্যাপারটাকে পুলিশের ক্যাপ্টেনের কাছে নিয়ে যাব। তার কাছে আমি যেতে পারব না ভেবেছ? আজকালকার দিনে ডাকাতি করার অধিকার কারও নেই!" টুপিটা তুলে নিয়ে মদের দোকানী বলল।

"তাহলে চলে এস! তাহলে চলে এস!" মদের দোকানী ও লম্বা ছেলেটা পরপর কথাটা বলল। দুজন একসঙ্গে পথে নামল।

রক্তমাখা কামারটিও চলল তাদের পাশে। চেঁচিয়ে কথা বলতে বলতে কারখানার মজুররাও তাদের পিছু পিছু চলল।

মরসিকার মোড়ে জুতো তৈরির সাইনবোর্ড ঝোলানো বন্ধ-জানালা একটা বড় বাড়ির বিপরীত দিকে জনা বিশেক শুকনো, ক্লান্ত, বিষণ্ণ-মুখ মুচি ওভারল ও ছেঁড়া লম্বা কোট পরে দাঁড়িয়েছিল।

একটি শুট্‌কো মজুর ভুরু কুঁচকে পাতলা দাড়ি দুলিয়ে বলছে, "তার তো উচিত লোকদের প্রাপ্য ঠিকমত দেওয়া। কিন্তু সে আমাদের রক্ত চুষে খেয়েছে, আর এখন ভাবছে আমাদের তাড়াতে পারলেই বাঁচে। সপ্তাহ ভরে আমাদের ভুল বুঝিয়েছে, আর আজ আমাদের এই সংকটের মধ্যে ফেলে সটকে পড়েছে।"

রক্তমাখা লোকটিসহ ভিড়কে দেখে মুচিরা কথা থামিয়ে সাগ্রহ কৌতূহলে চলমান ভিড়ের সঙ্গে মিশে গেল।

"এরা সব কোথায় চলেছে?"

"কেন, নিশ্চয় পুলিশের কাছে!"

"আমি বলছি, আমাদের যে মেরেছে সেটা কি সত্যি?"

"তোমার কি মনে হয়? ওরা কি বলছে তাই শোন।"

অনেক প্রশ্ন ও উত্তর শোনা গেল। বর্ধিত ভিড়ের সুযোগ নিয়ে শুঁড়িখানার মালিক পিছনে কেটে পড়ে দোকানে ফিরে গেল।

শত্রু যে সরে পড়েছে সেটা লক্ষ্য না করে লম্বা যুবকটি খোলা হাতটা ঘোরাতে ঘোরাতে অনবরত বকতে লাগল। তাকে ঘিরেই সকলে ভিড় করে চলল।

"সরকারকে শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে, আইন চালাতে হবে, সরকার তো আছেই সেইজন্যে। ভালমানুষ খৃস্টানরা, আমি ঠিক বলি নি?" প্রায় অদৃশ্য হাসি হেসে যুবকটি বলল। "সে ভেবেছে সরকার বলে কিছু নেই! সরকার ছাড়া কখনও চলে? সরকার না থাকলে তো সকলেই আমাদের লুঠ করত।"

ভিড়ের ভিতর থেকে অনেকে বলে উঠল, "কি বাজে কথা বলছ? তারা কি এইভাবে মস্কো ছেড়ে দেবে? তারা ঠাট্টা করে কি বলল, আর তাই

তুমি বিশ্বাস করলে! প্রচুর সৈন্য কি যাচ্ছে না? সত্যি কি তাকে (নেপোলিয়নকে) আসতে দেবে! সরকার কি এইজন্যেই আছে। বরং জনসাধারণ কি বলছে তাই শোন।"

চীনা-টাউনের প্রাচীরের পাশে একটা ছোট দল পশমী কোট-পরা একটি লোককে ঘিরে ভিড় করেছে। লোকটির হাতে একটা কাগজ।

"সম্রাটের আদেশ-পত্র, সম্রাটের আদেশ-পত্র পড়া হচ্ছে!" ভিড়ের ভিতর থেকে অনেকের গলা শোনা গেল। সকলে পাঠকের দিকে ছুটতে শুরু করল।

পশমী কোট পরা লোকটি ৩১শে অগস্ট তারিখের ইস্তাহার পড়ছে। চারদিক থেকে লোককে ভিড় করে আসতে দেখে লোকটি কিছুটা বিচলিত বোধ করল, কিন্তু লম্বা ছেলেটি ভিড় ঠেলে তার কাছে হাজির হয়ে পড়ার দাবী জানাতে সে কাঁপা গলায় ইস্তাহারটা গোড়া থেকে পড়তে লাগল।

"কাল ভোরেই আমি প্রশান্ত মহামহিমের কাছে যাব, (বিজয়ীর হাসি হেসে ভুরু কুঁচকে লম্বা ছেলেটা বলল "প্রশান্ত মহামহিম") এই শয়তানদের সমূলে বিনাশ করতে তার সঙ্গে পরামর্শ করব, কাজ করব, সেনাবাহিনীকে সাহায্য করব। তাদের ধ্বংস করার কাজে আমরাও অংশগ্রহণ করব, এইসব অতিথিদের জাহান্নামে পাঠাব। ডিনারের সময় ফিরে এসেই কাজ শুরু করব। এই শয়তানদের একেবারে তচনচ করে ছাড়ব।"

শেষের কথাগুলি যখন পড়া হল তখন চারদিক একেবারে নিস্তব্ধ। লম্বা ছেলেটি বিষণ্নভাবে মাথাটা নুইয়ে রেখেছে। স্পষ্ট বোঝা গেল যে শেষের অংশটা কেউই বুঝতে পারে নি। বিশেষ করে "ডিনারের সময় ফিরে এসে" কথাটায় পাঠক ও শ্রোতা সকলেই অসন্তুষ্ট হয়েছে। এসব সাধারণ কথা তো যেকেউ বলতে পারে, একজন উচ্চতম কর্তৃপক্ষের ইস্তাহারে একথা থাকা উচিত হয় নি।

সকলেই নিরাশ হয়ে চুপ করে রইল। লম্বা যুবকটি ঠোঁট নাড়তে নাড়তে এ-পাশে ও-পাশে দুলতে লাগল।

"ওকে জিজ্ঞাসা করা উচিত···ওই তো তিনি স্বয়ং!" ···"ঠিক, ওকেই জিজ্ঞাসা করা হোক!" "কেন করব না? উনি সব বুঝিয়ে বলবেন"···হঠাৎ ভিড়ের পিছন দিক দেখে এই ধরনের নানা কথা কানে এল। দুই দল অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে পুলিশ-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট স্কোয়ারের দিকে যাচ্ছিল; সকলেরই দৃষ্টি গেল তার গাড়ির উপর।

কাউণ্ট রস্তপ্‌চিনের হুকুম পুলিশ-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সকালেই গিয়েছিল বজরা পুড়িয়ে দিতে; সেই ব্যাপারে বহু টাকা পকেটস্থ করেই সে ফিরছে। একদল লোককে এগিয়ে আসতে দেখে সে কোচয়ানকে গাড়ি থামাতে বলল।

লোকদের উদ্দেশ্যে চীৎকার করে বলল, "এরা সব কারা?"

কোন জবাব না পেয়ে আবার চীৎকার করে বলল, "এরা সব কারা ?"

পশমী কোট পরা দোকানী জবাব দিল, "ইয়োর অনার, হাইয়েস্ট এক্সেলেন্সি কাউণ্টের ঘোষণা মতে এরা জীবন পণ করে দেশের সেবা করতে চায় ; এটা কোনরকম দাঙ্গাহাঙ্গামা নয়, কিন্তু যেহেতু হাইয়েস্ট এক্সেলেন্সি বলেছেন…"

পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলল, "কাউণ্ট তো চলে যান নি, এখানেই আছেন ; তোমাদের সম্পর্কেও একটা ঘোষণা প্রচার করা হবে। …চালাও !" কোচয়ানকে হুকুম দিল।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কথাগুলি যারা শুনতে পেল লোকজন এসে তাদের চারদিকে ভিড় করল ; চলমান গাড়িটার দিকে তাকাল।

সেইমুহূর্তে পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টও শংকিত দৃষ্টিতে চারদিকে তাকিয়ে কোচয়ানকে কি যেন বলল। ঘোড়াগুলো গতি বাড়িয়ে দিল।

লম্বা যুবকটি চেঁচিয়ে বলল, "সব ফাঁকিবাজী হে ! ওর পিছু নাও ! ওকে যেতে দিও না হে বাছারা ! আমাদের প্রশ্নের জবাব দিয়ে তবে চলে যাক। ওকে ধর !" চীৎকার করতে করতে সকলে গাড়িটার পিছনে ছুটতে লাগল।

উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতে বলতে ভিড়ের লোকজন পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে অনুসরণ করে লুবিয়াংকা স্ট্রীটের দিকে চলল।

ভিড়ের মধ্যে নানা কণ্ঠস্বরে বারবারই উচ্চারিত হতে লাগল, "ঐ দেখ, ভদ্রলোক আর ব্যবসায়ীরা ভেগেছে, আর আমাদের রেখে গেছে মরতে। ওরা কি মনে করে আমরা কুকুরের দল ?"

অধ্যায়—২৪

১লা সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় কুতুজভের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে কাউণ্ট রস্তপ্‌চিন মর্মাহত ও ক্ষুব্ধ হয়ে মস্কোতে ফিরে গেল ; তার কারণ সমর পরিষদে তাকে আমন্ত্রণ করা হয় নি এবং শহর রক্ষার যে প্রস্তাব সে দিয়েছিল কুতুজভ তাকেও আমল দেয় নি। তাছাড়া, শিবিরে এসে সে যখন বুঝল যে শহরের শান্ত ভাব ও দেশপ্রেমের উত্তেজনাকে শুধু যে গৌণ ব্যাপার বলে মনে করা হচ্ছে তাই নয়, মনে করা হচ্ছে সম্পূর্ণ অবান্তর ও গুরুত্বহীন ব্যাপার বলে, তখন তার বিস্ময়ের সীমা রইল না। এইসব দেখেশুনে বিচলিত, আহত ও বিস্মিত হয়ে রস্তপ্‌চিন মস্কো ফিরে এল। নৈশাহারের পরে পোশাক না ছেড়েই সে একটা সোফায় শুয়ে পড়ল ; মাঝরাতের ঠিক পরেই জনৈক সংবাদবাহক কুতুজভের একটা চিঠি নিয়ে এসে তার ঘুম ভাঙাল। চিঠিতে কাউণ্টকে অনুরোধ করা হয়েছে, যেহেতু সেনাবাহিনী মস্কো ছাড়িয়ে রিয়াজান রোডের দিকে পিছিয়ে যাচ্ছে সেইজন্য পুলিশ অফিসারদের সেখানে পাঠিয়ে দেয়। রস্তপ্‌চিনের কাছে এটা কোন খবরই নয়। মস্কো পরিত্যক্ত

হবে সেকথা সে যে আগেরদিন পক্‌লোনি পাহাড়ের উপর কুতুজভের সঙ্গে সাক্ষাতের পরেই জানতে পেরেছে তাই শুধু নয়, কথাটা সে জেনেছে বরদিনো যুদ্ধের পর থেকেই, কারণ সে যুদ্ধের পর থেকে সেনাপতিরা যে যখন মস্কো এসেছে সকলেই একবাক্যে বলেছে যে আর একটা যুদ্ধ করা একেবারেই অসম্ভব; তাছাড়া তখন থেকেই প্রতি রাত্রে সব সরকারী সম্পত্তি সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং রস্তপ্‌চিনের নিজের অনুমতিক্রমেই অর্ধেক বাসিন্দা মস্কো ছেড়ে চলে গেছে। তথাপি রাতের বেলা সুখনিদ্রাটুকু ভেঙে দিয়ে সে খবরটা একটা সাধারণ চিঠির আকারে কুতুজভের হুকুমসহ আমায় সে বিস্মিত ও বিরক্ত করেছে।

পরবর্তীকালে নিজের স্মৃতিকথায় এই সময়কার কার্যাবলী ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সে বারবার বলেছে যে দুটি মাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয়দ্বারা সে তখন পরিচালিত হয়েছে: মস্কোতে শান্তি বজায় রাখা এবং অধিবাসীদের চলে যাওয়া ত্বরান্বিত করা। এই দুটি উদ্দেশ্যকে স্বীকার করে নিলে রস্তপ্‌চিনের তৎকালীন সব কাজকর্মই নিন্দার অতীত বলে মনে হবে। "পবিত্র স্মৃতিচিহ্নসমূহ, অস্ত্রশস্ত্র, কামান-বন্দুক; গোলা-বারুদ ও শস্য-ভাণ্ডার কেন সরিয়ে ফেলা হয় নি? কেন হাজার হাজার অধিবাসীকে ঠকিয়ে বিশ্বাস করানো হয়েছিল যে মস্কোকে শত্রুর হাতে তুলে দেওয়া হবে না—তাদের সর্বনাশ করা হবে না।" কাউণ্ট রস্তপ্‌চিনের কৈফিয়ৎ, "শহরের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে।" ···"সরকারী আপিসগুলো থেকে বস্তা-বস্তা অকেজো কাগজপত্র, আর লেপ্‌পিসের বেলুন ও অন্যান্য জিনিসপত্র কেন সরানো হয়েছিল?" রস্তপ্‌চিনের কৈফিয়ৎ, "শহরকে ফাঁকা করে রেখে যেতে।" জন-শান্তি বিপন্ন—একথা মেনে নিলে যেকোন কাজেরই সমর্থন মেলে।

ত্রাসের রাজত্বের সব ভয়াবহতার একমাত্র ভিত্তি জনগণের শান্তি বিধানের কামনা।

তাহলে ১৮১২ সালে মস্কোর শান্তি বিঘ্নিত হবার ভয় কাউণ্ট রস্তপ্‌চিনের মনে এসেছিল কেন? শহরে একটা বিদ্রোহ দেখা দেবার সম্ভাবনার কথা ভাববার কি কারণ ছিল? অধিবাসীরা মস্কো ছেড়ে চলে যাচ্ছিল, আর পশ্চাদপসরণকারী সৈন্যরা এসে সে স্থান পূর্ণ করছিল। তার ফলে সাধারণ মানুষ দাঙ্গা বাঁধাবে কেন?

শত্রু যখন একটা শহরে ঢোকে তখন মস্কোতে অথবা রাশিয়ার অন্য কোন জায়গায় কখনও গণ-অভ্যুত্থানের মত কোন ঘটনা ঘটে নি। ১লা ও ২রা সেপ্টেম্বর তারিখেও দশ হাজারের বেশী মানুষ মস্কোতে ছিল, কিন্তু শাসনকর্তার নির্দেশে তার বাড়ির সামনে সমবেত কিছু লোকের উচ্ছৃংখলতা ছাড়া আর কোথাও কিছু ঘটে নি। একথা তো খুবই পরিষ্কার যে বরদিনোর যুদ্ধের পরে মস্কো পরিত্যাগ করা যখন নিশ্চিত হয়ে উঠেছিল, অন্ততপক্ষে তার

সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, তখন অস্ত্রশস্ত্র বিলিয়ে এবং ইস্তাহার বিলি করে জনসাধারণকে উত্তেজিত না করে রস্তপ্‌চিন যদি পবিত্র স্মৃতি-চিহ্ন, গোলা-বারুদ, অস্ত্রশস্ত্র ও টাকাপয়সা সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করত এবং লোকজনদের খোলাখুলি বলে দিত যে শহরটাকে পরিত্যাগ করা হবে, তাহলে জনসাধারণের মধ্যে একটা গোলযোগের আশংকা করার কারণ অনেক কমে যেত।

দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হলেও রস্তপ্‌চিন ছিল আশাবাদী ও আবেগপ্রবণ; সব সময় উর্ধ্বতম শাসকমহলেই সে চলাফেরা করত; যাদের পরিচালক বলে সে নিজেকে ভাবত সেই জনসাধারণের সঙ্গে তার সম্যক পরিচয় ছিল না। যদিও সে জানত যে দুর্দিন আসছে, তবু একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও সে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করত না যে মস্কোকে ছেড়ে যেতে হবে, আর তাই সেজন্য সে প্রস্তুতও ছিল না। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই অধিবাসীরা মস্কো ছেড়ে গেল। সরকারী আপিসগুলো সরিয়ে দেওয়া হল কর্মচারিদের দাবীতে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাউণ্টকে সে দাবী মেনে নিতে হয়েছিল। তীব্র কল্পনা-বিলাসী মানুষের বেলায় যেমনটি হয়ে থাকে, মস্কো ছেড়ে চলে যেতে হবে এ-কথাটা অনেকদিন আগে থেকেই জানলেও রস্তপ্‌চিন সেটা জানত বুদ্ধি দিয়ে, কিন্তু অন্তরে তা বিশ্বাস করত না, আর তাই এই নতুন পরিস্থিতির জন্য কোন মানসিক প্রস্তুতিও সে নেয় নি।

তার যতকিছু কাজকর্ম (কার্যক্ষেত্রে তা কতদূর ফলপ্রসূ হয়েছিল সেটা অন্য প্রশ্ন) সব কিছুরই লক্ষ্য ছিল জনগণের মনে দেশাত্মবোধক ফরাসী-বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলা।

কিন্তু ঘটনাবলী যখন প্রকৃত ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল, যখন ফরাসী-বিদ্বেষের বুলিতে আর কুললো না, এমন একটা যুদ্ধের ভিতর দিয়ে সে বিদ্বেষকে প্রকাশ করাও সম্ভব হল না, মস্কোর একমাত্র প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে আত্মবিশ্বাসের যখন আর কোন দামই রইল না, যখন সব মানুষ এককাট্টা হয়ে সবকিছু ছেড়ে স্রোতের মত মস্কো ছেড়ে যেতে লাগল এবং সেই নেতিবাচক কাজের ভিতর দিয়েই তাদের জাতীয়তাবোধের প্রমাণ রাখল, তখন জননেতার যে ভূমিকা রস্তপ্‌চিন বেছে নিয়েছিল অকস্মাৎ সেটা একেবারেই অর্থহীন হয়ে দেখা দিল। অপ্রত্যাশিতভাবে নিজেকে বড়ই হাস্যকর, দুর্বল ও নিঃসঙ্গ মনে হল; পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে গেল যেন।

ঘুম থেকে জেগে উঠে কুতুজভের সেই অনুতাপ, অবশ্য-পালনীয় চিঠি পেয়ে সে আরও বেশী বিরক্ত হয়ে উঠল। যেসব সরকারী সম্পত্তি বিশেষ-ভাবে তার হেফাজতে রাখা আছে সেসবই এখনও মস্কোতেই রয়েছে; সে-সবকিছু সরিয়ে নিয়ে যাওয়া এখন আর সম্ভব নয়।

"এরজন্য কে দায়ী? কে এই সংকট ডেকে এনেছে?" রস্তপ্‌চিন স্মৃতি-

মন্থন শুরু করল। "নিশ্চয় আমি নই। আমি তো তৈরি হয়েই ছিলাম। মস্কো ছিল আমার হাতের মুঠোয়। আর তারা কি না তার এই হাল করে ছাড়ল! যত সব পাষণ্ড! বিশ্বাসঘাতক! কাদের যে সে পাষণ্ড ও বিশ্বাস-ঘাতক বলল তা সে নিজেই ভাল করে জানে না।

মস্কোর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যেসব লোক তার কাছে এসেছিল, রস্তপ্‌চিন সারারাত তাদের জন্য হুকুম জারি করল। যারা তার কাছাকাছি থাকে তারা কোনদিন কাউণ্টকে এত বিষণ্ণ ও বিরক্ত দেখে নি।

"ইয়োর এক্সেলেন্সি, রেজিস্ট্রার বিভাগের ডিরেক্টর খবর পাঠিয়েছেন··· পরিষদ থেকে, সেনেট থেকে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, ফাউণ্ডলিং হাসপাতাল থেকে, সহযোগী বিশপের কাছ থেকে লোক এসেছে···খবরের জন্য···ফায়ার ব্রিগেড সম্পর্কে আপনার কি নির্দেশ? কারা-শাসনকর্তার কাছ থেকে··· পাগলা গারদের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছ থেকে···সারারাত এই ধরনের ঘোষণা কাউণ্টের কাছে অনবরত আসতে লাগল।

এই সবরকম প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত ও ক্রুদ্ধ জবাবে সে শুধু জানাল, এখন আর তার হুকুমের কোন দরকার নেই, তার সব সযত্নরচিত পরিকল্পনা এবার অন্য কেউ নষ্ট করে ফেলেছে। এখন যা কিছু ঘটবে তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব সেই এক-জনকেই বহন করতে হবে।

রেজিস্ট্রার বিভাগের প্রশ্নের জবাবে সে বলল, "আঃ, সেই মাথা-মোটা লোকটাকে বলে দাও, তার সব দলিলপত্র রক্ষা করতে তাকেই এখানে থাকতে হবে। ফায়ার ব্রিগেড সম্পর্কে বোকার মত প্রশ্ন করছ কেন? তাদের সঙ্গে তো ঘোড়া আছে, তারা ভ্‌লাদিমির চলে যাক; ঘোড়াগুলো যেন ফরাসীদের হাতে না পড়ে।"

"ইয়োর এক্সেলেন্সি, পাগলা গারদের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এসেছেন: তাকে কি হুকুম দেবেন?"

"আমার হুকুম? তারা চলে যাক। বাস। ···আর পাগলদের শহরে ছেড়ে দেওয়া হোক। যখন পাগলরাই আমাদের সৈন্যদের চালাচ্ছে, তখন নিশ্চয় ঈশ্বরের এই ইচ্ছা যে অন্য পাগলদের মুক্তি দেওয়া হোক।"

কারাগারের দণ্ডিত বন্দীদের সম্পর্কে একটা প্রশ্নের উত্তরে রস্তপ্‌চিন রেগে শাসনকর্তাকে বলল:

"আপনি কি আশা করেন তাদের পাহারা দেবার জন্য আপনাকে আমি দুই ব্যাটেলিয়ন সৈন্য দেব? সৈন্য পাব কোথায়? তাদের ছেড়ে দিন, বাস, মিটে গেল!"

"ইয়োর এক্সেলেন্সি, কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দী আছেন, মেশ্‌কভ, ভেরেশ্‌চাগিন...."

"ভেরেশ্‌চাগিন! তাকে এখনও ফাঁসি দেওয়া হয় নি?" রস্তপ্‌চিন

চেঁচিয়ে উঠল। "তাকে আমার কাছে নিয়ে এস!"

অধ্যায়—২৫

সকাল নটা নাগাদ মস্কোর ভিতর দিয়ে সৈন্যদের চলাচল শুরু হয়ে গেল। তখন থেকে আর কেউ নির্দেশের জন্য কাউণ্টের কাছে এল না। যারা যেতে পারল নিজের থেকেই চলে গেল, আর যারা থেকে গেল তারাও নিজেরাই কর্তব্য স্থির করল।

সকোল্‌নিকি যাবার জন্য গাড়ি আনতে বলে কাউণ্ট পড়ার ঘরে গিয়ে দুই হাত জোড় করে বিষণ্ণ, বিবর্ণ মুখে চুপচাপ বসে রইল।

দেশ যখন শান্ত ও গোলযোগহীন থাকে তখন প্রত্যেক শাসকই ভাবে যে একমাত্র তার চেষ্টাতেই তার শাসনাধীন লোকগুলি চলাফেরা করে, আর এই অপরিহার্যতার চেতনার মধ্যেই সব শাসক তার সব চেষ্টা ও শ্রমের প্রধান পুরস্কার খুঁজে পায়। ইতিহাসের সমুদ্র যখন শান্ত থাকে তখন শাসক-কর্তৃপক্ষ তার ভঙ্গুর নৌকোখানিকে একটা আঁকড়ার সাহায্যে জল-জাহাজের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে নিজে চলতে থাকে আর স্বাভাবিকভাবেই কল্পনা করে যে তার চেষ্টাতেই জাহাজখানা চলছে। কিন্তু যেই ঝড় ওঠে, সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হয়, জাহাজ চলতে থাকে, তখন আর সে ভ্রান্তি ধারণা থাকা সম্ভব নয়। জাহাজ তখন নিজের প্রচণ্ড গতিতেই এগিয়ে চলে, নৌকোর আঁকড়াটা আর সেই চলমান জাহাজ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই শাসক আর শাসক থাকে না। শক্তির উৎস থাকে না, সে হয়ে যায় একটি তুচ্ছ, অকর্মণ্য, দুর্বল মানুষ।

রস্তপ্‌চিনেরও তাই মনে হচ্ছে, আর সেইজন্যই সে আরও চটে গেছে।

যে পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে জনতা থামিয়েছিল সে যখন রস্তপ্‌চিনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল ঠিক তখনই একজন অ্যাডজুটাণ্ট এসে খবর দিল যে ঘোড়ার সাজ পরানো হয়েছে। দুজনের মুখই বিবর্ণ; তার নির্দেশ মতই কাজ করা হয়েছে এ-সংবাদ জানিয়ে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কাউণ্টকে খবর দিল যে অনেক লোক তার উঠোনে ভিড় করেছে; তারা দেখা করতে চায়।

একটি কথাও না বলে রস্তপ্‌চিন উঠে তাড়াতাড়ি পা ফেলে তার বিলাস-বহুল বৈঠকখানায় ঢুকে ব্যাল্‌কনির দরজার কাছে গেল, হাতলে হাত রাখল, আবার ছেড়ে দিল, তারপর জানালার ধারে গেল; সেখান থেকে বাইরের জনতাকে আরও ভালভাবে দেখা যায়। লম্বা ছেলেটি সকলের সামনে দাঁড়িয়ে হাত ঘোরাচ্ছে, আর কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে কি যেন বলছে। রক্ত-মাখা কামারটি বিষণ্ণ মুখে পাশে দাঁড়িয়ে আছে। বন্ধ জানালার ভিতর দিয়ে বহুকণ্ঠের গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেল।

জানালার কাছ থেকে ফিরে এসে রস্তপ্‌চিন বলল, "আমার ঘোড়া কি হাজির ?"

"হাজির ইয়োর এক্সেলেন্সি," অ্যাড্‌জুটাণ্ট বলল।

রস্তপ্‌চিন আবার ব্যালকনির দরজায় গেল।

"কিন্তু ওরা কি চায় ?" পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে জিজ্ঞাসা করল।

"ইয়োর এক্সেলেন্সি, ওরা বলছে যে আপনার হুকুমমত ওরা ফরাসীদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য তৈরি হয়েছে, আর তাই ওরা বিশ্বাসঘাতকতার কথা কি যেন বলছে। জনতা খুবই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে ইয়োর এক্সেলেন্সি—আমি কোন-রকমে ওদের হাত এড়িয়ে চলে এসেছি। ইয়োর এক্সেলেন্সি, আমার পরামর্শ যদি শোনেন তো বলি...."

"আপনি যেতে পারেন। কি করতে হবে সেকথা বলার জন্য আপনাকে দরকার হবে না!" রস্তপ্‌চিন সক্রোধে বলল।

জনতার দিকে চোখ রেখে সে ব্যালকনির দরজায় দাঁড়িয়ে রইল।

এসব কিছুর জন্য যে লোকটি দায়ী তার বিরুদ্ধে অবরুদ্ধ ক্রোধে সে ভাবতে লাগল, "তারাই তো রাশিয়ার এই হাল করেছে! আমার এই হাল করেছে!" ভিড়ের দিকে তাকিয়ে ভাবল, "ওই এক উচ্ছৃংখল জনতা, সমাজের আবর্জনা: তাদের বোকামির জন্যই ওরা মাথা তুলতে পেরেছে! ওরা একটা শিকার খুঁজছে।" একথাটা তার মনে হল কারণ সে নিজেই এমন একটি শিকার খুঁজছে যার উপর মনের ঝালটা মেটানো যায়।

"গাড়ি কি হাজির ?" সে আবার শুধাল।

"হ্যাঁ ইয়োর এক্সেলেন্সি। ভেরেশ্‌চাগিন সম্পর্কে আপনার কি হুকুম ? সে তো বারান্দায় অপেক্ষা করছে," অ্যাডজুটাণ্ট বলল।

যেন এক অপ্রত্যাশিত স্মৃতির আঘাতে রস্তপ্‌চিন বলে উঠল, "আঃ!"

তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দৃঢ় পদক্ষেপে সে বাইরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সব কথা থেমে গেল, মাথার সব টুপি নেমে গেল, সব চোখ পড়ল কাউণ্টের উপর।

কাউণ্ট হঠাৎই উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল, "শুভ সকাল বাছারা! তোমরা এখানে এসেছ বলে ধন্যবাদ। একমুহূর্তের মধ্যেই আমি তোমাদের কাছে যাচ্ছি, কিন্তু আগে শয়তানদের সঙ্গে ফয়সালা করতে হবে। যে শয়তানরা মস্কোর সর্বনাশ করেছে তাদের শাস্তি দিতেই হবে। আমার জন্য অপেক্ষা করে থাক।"

তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে সরে গিয়ে কাউণ্ট সশব্দে পাল্লাটা বন্ধ করে দিল।

ভিড়ের মধ্যে সমর্থন ও সন্তোষের একটা গুঞ্জন বয়ে গেল। "তিনি শয়তানদের সঙ্গে একটা ফয়সালা করবেনই, তোমরা দেখে নিও। আর তোমরা বলছ যে ফরাসীরা…আইন কাকে বলে সেটা তিনিই তোমাদের

দেখিয়ে দেবেন।" তারা এমনভাবে কথা বলতে লাগল যেন এই লোকটির উপর ভরসা না রাখার জন্য একে অন্যকে তিরস্কার করছে।

কয়েক মিনিট পরে একজন অফিসার দ্রুতপায়ে সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে কি যেন হুকুম করল, আর অশ্বারোহীর দল সারি দিয়ে দাঁড়াল। জনতা সাগ্রহে ব্যালকনি থেকে বারান্দার দিকে এগিয়ে গেল। ক্রুদ্ধ, দ্রুত পা ফেলে রস্তপ্‌চিন সেখানে বেরিয়ে এসে এমনভাবে চারদিকে তাকাতে লাগল যেন কাউকে খুঁজছে।

"কোথায় সে ?" সে খোঁজ করল। বলতে বলতেই সে দেখতে পেল একটি যুবক বাড়িটার মোড় ঘুরে দুই দল অশ্বারোহীর মাঝখান দিয়ে এগিয়ে আসছে। তার ঘাড়টা সরু ও লম্বা, অর্ধেক কামানো মাথায় আবার ছোট ছোট চুল গজিয়েছে। যুবকটির পরনে শেয়ালের লোমের পাড়বসানো নীল কাপড়ের ছেঁড়া জামা, একদিন হয়তো সেটা সৌখীন ছিল, শনপাটের নোংরা কয়েদীর ট্রাউজার, আর পাতলা, নোংরা ছেঁড়া বুট। দুটি দুর্বল পায়ে ভারী শেকল বাঁধা, যার ফলে তার চলতে কষ্ট হচ্ছে।

"আঃ!" বলে রস্তপ্‌চিন তাড়াতাড়ি যুবকটির দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বারান্দার একেবারে নীচের সিঁড়িটা দেখিয়ে বলল, "ওকে এখানে নিয়ে এস।"

শিকলের ঝন্ ঝন্ শব্দ তুলে যুবকটি নির্দেশিত জায়গার দিকে এগিয়ে গেল। কোটের কলারটা গলায় চেপে বসায় একটা আঙুল দিয়ে সেটাকে ঠেলে ধরে ঘাড়টাকে দু'বার এদিক-ওদিকে ঘোরাল, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, কাজে অনভ্যস্ত হাত দুটি জোড় করে বিনীতভাবে দাঁড়াল।

কয়েক সেকেণ্ড সব চুপ। শুধু পিছনের সারির যে লোকগুলো সেই একটি জায়গার দিকে এগিয়ে আসতে চাপ দিচ্ছে তাদের দীর্ঘশ্বাস, আর্তনাদ ও পা ফেলার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

যুবকটি যতক্ষণ সিঁড়িতে তার নির্দিষ্ট জায়গায় না এল ততক্ষণ পর্যন্ত রস্তপ্‌-চিন ভুরু কুঁচকে এক হাতে মুখটা মুছতে মুছতে দাঁড়িয়ে রইল।

কণ্ঠস্বরে একটা ধাতব শব্দ তুলে বলল, "বাছারা! এই লোকটি, এই ভেরেশ্‌চাগিনই সেই শয়তান যার কৃতকর্মের ফলে মস্কো আজ ধ্বংস হতে বসেছে।"

লোমের পট্টি দেওয়া কোট পরা যুবকটি একটু ঝুঁকে বিনীত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে; আঙুলগুলো সামনের দিকে একত্র করা। মাথাটা অর্ধেক কামানোর ফলে বিকৃতদর্শন শীর্ণ তরুণ মুখখানি অসহায়ভাবে ঝুলে পড়েছে। কাউণ্টের প্রথম কথাগুলি শুনেই সে ধীরে ধীরে মাথা তুলে তারদিকে তাকাল; যেন কিছু বলতে চাইল, অথবা অন্তত তার চোখে চোখ রাখতে চাইল। যুবকটির লম্বা সরু গলার একটা শিরা দড়ির মত ফুলে উঠে কানের

কাছে নীল হয়ে গেল ; হঠাৎ তার মুখটা লাল হয়ে উঠল।

সকলের দৃষ্টি তার উপর নিবদ্ধ। সেও জনতার দিকে তাকাল ; তাদের মুখের ভাব দেখে কিছুটা আশান্বিত হয়ে একটুকরো ভীরু, বিষণ্ণ হাসি ফুটল তার মুখে ; মাথাটা নীচু করে সিঁড়িতে পা দিল।

"সে জারের প্রতি, তার দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, বোনা-পার্তের দলে ভিড়েছে। একমাত্র সেই রাশিয়ার নামে কলংক লেপন করেছে, মস্কোকে ধ্বংস করেছে," কর্কশ, জোরালো গলায় কথাগুলি বলে রস্তপ্‌চিন হঠাৎ ভেরেশচাগিনের দিকে তাকাল ; তখনও সে একই বিনীত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে। সে দৃশ্য দেখে জ্বলে উঠে রস্তপ্‌চিন হাত তুলে জনতাকে সম্বোধন করে চীৎকার করে বলে উঠল :

"ওকে নিয়ে তোমরা যা ভাল মনে কর তাই কর ! ওকে তোমাদের হাতেই তুলে দিলাম !"

জনতা নিশ্চুপ ; ক্রমেই একে অন্যের আরও কাছে ঘেঁসে দাঁড়াল। এই-ভাবে পরস্পর ঠেলাঠেলি করা, এই রুদ্ধ বাতাসে শ্বাস টানা, একটুও নড়াচড়া করবার জায়গা না পেয়ে একটা অজ্ঞাত, দুর্বোধ্য ও ভয়ংকর কিছুর জন্য অপেক্ষা করা ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠছে। যারা সামনে দাঁড়িয়ে আছে, যারা সবকিছু দেখেছে ও শুনেছে, তারা সর্বশক্তি প্রয়োগ করে চোখ ও মুখ বিস্ফারিত করে দাঁড়িয়ে আছে, আর যারা পিছন থেকে এগিয়ে আসতে চেষ্টা করছে তাদের ঠেলে রাখছে।

রস্তপ্‌চিন চীৎকার করে বলল, "ওকে মার ! ···বিশ্বাসঘাতকের মৃত্যু হোক, রাশিয়ার নামে সে যেন আর কলংক লেপন করতে না পারে ! ওকে কেটে ফেল। আমি হুকুম দিচ্ছি।"

যত না মুখের কথায় তার চাইতে বেশী রস্তপ্‌চিনের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনে জনতা আর্তনাদ করে ঢেউয়ের মত এগিয়ে গিয়েও আবার থেমে গেল।

সেই ক্ষণিক নিস্তব্ধতার মাঝখানে ভেরেশ্‌চাগিন ভীরু অথচ নাটকীয় স্বরে বলে উঠল, "কাউণ্ট ! আমাদের দুজনের মাথার উপরে একই আকাশ·····" মাথাটা তুলল ; সরু গলার মোটা শিরাটা আবারও রক্তে ভরে উঠল ; মুখের উপর অতিদ্রুত রঙের ছোপ পড়ে আবার মিলিয়ে গেল।

যা বলতে চেয়েছিল তা বলা হল না।

ভেরেশ্‌চাগিনের মতই বিবর্ণ মুখে রস্তপ্‌চিন চীৎকার করে বলল, "ওকে কেটে ফেল ! আমি হুকুম দিচ্ছি।"

নিজের তরবারি কোষমুক্ত করে অশ্বারোহী অফিসার চেঁচিয়ে বলল, "তরবারি খোল !"

জনতার মধ্যে আবার একটা ঢেউ উঠল ; সে ঢেউ প্রথম সারিতে পৌঁছে তাকে বারান্দার প্রথম ধাপে পৌঁছে দিল। লম্বা যুবকটি মুখে প্রস্তরকঠিন ভাব

ফুটিয়ে হাত তুলে ভেরেশ্‌চাগিনের পাশে দাঁড়াল।

অশ্বারোহী অফিসার ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, "ওকে তরবারির আঘাত হান!"

ক্রোধে বিকৃত মুখ একটি সৈন্য তার তরবারির ভোঁতাদিক দিয়ে ভেরেশ্‌-চাগিনের মাথায় আঘাত করল।

কেন যে তাকে এভাবে আঘাত করা হল সেটা বুঝতে না পেরে ভীরু বিস্ময়ে ভীত দৃষ্টিতে চারদিকে তাকিয়ে ভেরেশ্‌চাগিন "আঃ!" বলে চীৎকার করে উঠল। ভিড়ের মধ্যেও অনুরূপ সবিস্ময়ে আর্তনাদ ও আতংক ছড়িয়ে পড়ল। বিষন্ন গলায় কে যেন বলে উঠল "হায় প্রভু!"

বিস্ময়সূচক শব্দটা মুখ থেকে বেরিয়ে যাবার পরেই ভেরেশ্‌চাগিন যন্ত্রণায় কাতর হয়ে আর্তনাদ করে উঠল, আর সেই আর্তনাদ হল মারাত্মক। মানুষের অনুভূতির যে প্রাচীর এতক্ষণ জনতাকে সংযত রেখেছিল এবার চরম সীমায় পৌঁছে সেটা ভেঙে পড়ল। অপরাধ শুরু হয়েছিল, এবার তাকে সম্পূর্ণ করতে হবে। তিরস্কারের যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ জনতার ভয়ংকর ক্রুদ্ধ গর্জনের তলে ডুবে গেল। সপ্তম ও সর্বশেষ আঘাত যেভাবে একটা জাহাজকে চুরমার করে দেয়, তেমনই অপ্রতিহত শেষ ঢেউটি পিছন থেকে ধেয়ে এসে প্রথম সারির উপর আছড়ে পড়ল, তাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেল, ডুবিয়ে দিল। অশ্বারোহী সৈনিকটি আবার আঘাত হানতে উদ্যত হল। ভেরেশ্‌চাগিন আতঙ্কে আর্তনাদ করে দুই হাতে মাথাটা ঢেকে ভিড়ের দিকে ছুটে গেল। লম্বা যুবকটির সঙ্গে ধাক্কা খেতেই সেও দুইহাতে তার সরু গলাটা চেপে ধরে বেপরোয়া ভঙ্গীতে চীৎকার করে উঠে তাকে নিয়েই অগ্রসরমান জনতার পায়ের নীচে পড়ে গেল।

কেউ ভেরেশ্‌চাগিনকে আঘাত করল, তার পোশাক ছিঁড়ে ফেলল, কেউ বা ঝাঁপিয়ে পড়ল লম্বা যুবকটির উপর। যারা পায়ের নীচে চাপা পড়ল আর যারা লম্বা ছেলেটাকে রক্ষা করতে চেষ্টা করল তাদের মিলিত আর্তনাদে জনতার রোষবহ্নি আরও প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। রক্তাপ্লুত যুবকটিকে তাদের হাত থেকে ছাড়িয়ে নেবার আগেই ক্রুদ্ধ জনতা মারতে মারতে তাকে প্রায় মেরে ফেলবার উপক্রম করে ফেলেছে। আরব্ধ কাজটাকে অতিক্রত শেষ করার চেষ্টা সত্ত্বেও যারা ভেরেশ্‌চাগিনকে আঘাত করছে, গলা টিপে ধরছে, টানা-হেঁচড়া করছে তারা তাকে একেবারে শেষ করতে পারল না, কারণ ভিড়ের লোকজন চারদিক থেকে চাপ সৃষ্টি করে মাঝখানে এমনভাবে জমাট বেঁধে গেছে যে তারা না পারছে তাকে মেরে ফেলতে, না পারছে তাকে ছেড়ে দিতে।

"আরে, একটা কুড়ুল দিয়ে মার! ....বিশ্বাসঘাতক, খৃস্টকে বেচে দিয়েছে ....এখনও প্রাণে বেঁচে আছে...নাছোড়বান্দা....ঠিক দাওয়াই দেওয়া হয়েছে।

কষ্ট না দিলে চোর শায়েস্তা হয় না। টাজি চালাও! ···সে কি—তবু বেঁচে আছে?"

আক্রান্ত যুবকটি যখন লড়াইতে ক্ষান্ত দিল, তার চীৎকার যখন একটা একটানা লম্বা মৃত্যু-গোঙানিতে পরিণত হল, তখনই ধরাশায়ী রক্তাক্ত দেহটার চারপাশ থেকে ভিড় সরে যেতে লাগল। প্রত্যেকেই একবার এগিয়ে এসে নিজেদের কৃতকর্মের ফল দেখে ভয়ে, বিস্ময়ে ও ধিক্কারে পিছিয়ে যেতে লাগল।

"হে প্রভু! মানুষ কি আজ বন্যপশু হয়ে গেছে! কেমন করে ও এখনও বেঁচে আছে?" ভিড়ের মধ্যে নানা কণ্ঠস্বর শোনা যেতে লাগল। "আর একেবারেই ছেলেমানুষ···নিশ্চয় কোন ব্যবসায়ীর ছেলে। কী মানুষ সব! ···আর তারা বলছে ও সঠিক লোক নয়···কেমন করে নয়? ···হে প্রভু! ঐ তো আরও একজনকে মেরেছে—সকলেই বলছে তার প্রায় হয়ে এসেছে ···হায়রে মানুষ ···তাদের কি পাপের ভয় নেই? ···" সেই একই জনতা এখন যন্ত্রণাদীর্ণ ক্ষোভের সঙ্গে মৃতদেহটার দিকে তাকিয়ে বলছে; লোকটির সরু গলাটা অর্ধেক কেটে ফেলা হয়েছে; কালসিটে-পড়া মুখটা রক্তে ও ধূলোয় মাখামাখি।

একজন কষ্টসহিষ্ণু পুলিশ অফিসার হিজ এক্সেলেন্সির বাড়ির উঠোনে একটা মৃতদেহ পড়ে থাকা ভাল দেখায় না বিবেচনা করে অশ্বারোহী সৈনিকদের সেটাকে সরিয়ে ফেলতে বলল। দুজন অশ্বারোহী সৈনিক বিকৃত ঠ্যাং ধরে মাটির উপর দিয়ে টানতে টানতে মৃতদেহটাকে নিয়ে গেল। রক্তাক্ত, ধূলি-কলংকিত, আধা-কামানো মাথা ও লম্বা গলাটা মাটির উপর দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেল। জনতা আতঙ্কে চোখ ফিরিয়ে নিল।

যেমুহূর্তে ভেরেশ্‌চাগিন মাটিতে পড়ে গেল এবং জনতা বর্বর উল্লাসে তাকে ঘিরে ধরল তখন সহসা রস্তপ্‌চিনের মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল; পিছনের ফটকে যেখানে তারজন্য গাড়ি দাঁড়িয়েছিল সেদিকে না গিয়ে কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে সেসব না বুঝেই মাথা নীচু করে দ্রুত পা ফেলে সে বারান্দা ধরে একতলার ঘরগুলোর দিকে যেতে লাগল। কাউন্টের মুখ সাদা হয়ে গেছে, নীচের চোয়ালের তীব্র কাঁপুনিকে কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না।

"এই পথে ইয়োর এক্সেলেন্সি···ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন?···দয়া করে এই দিকে···" পিছন থেকে একটা ভয়ার্ত কম্পিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

কাউন্ট রস্তপ্‌চিন কোন জবাব দিতে পারল না, বাধ্য ছেলের মত মুখ ঘুরিয়ে নির্দেশিত পথে এগিয়ে গেল। পিছনের ফটকে দাঁড়িয়েছিল তার কালিচে-গাড়ি। ভিড়ের লোকদের উন্মাদ কণ্ঠস্বর তখনও শোনা যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি আসনে বসে কোচয়ানকে বলল, সকোল্‌নিকিতে তার পল্লী-ভবনের দিকে গাড়ি চালাতে।

মিয়াস্‌নিৎস্কি স্ট্রীটে পৌঁছে যখন উন্মত্ত জনতার চীৎকার আর শোনা গেল

না তখন কাউণ্টের অনুশোচনা শুরু হল। অধীনস্থ কর্মচারিদের সামনে যে উত্তেজনা ও ভীতি সে প্রকাশ করেছে সেকথা মনে করে সে দুঃখিত হল। ফরাসীতে নিজেকেই বলতে লাগল, "হাঙ্গামাকারী জনতা কী ভয়ংকর—বিরক্তিকর। তারা যেন নেকড়ে বাঘ, মাংস না খেলে তাদের তৃপ্তি হয় না। 'কাউণ্ট! আমাদের দুজনেরই মাথার উপরে আছেন একই ঈশ্বর!' —ভেরেশ্‌চাগিনের কথাগুলি হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল, আর একটা অসন্তুষ্টির স্রোত তার শিরদাঁড়া বেয়ে নামতে লাগল। কিন্তু এটা তার ক্ষণিকের অনুভূতিমাত্র; কাউণ্ট রস্তপ্‌চিনের মুখে দেখা দিল আত্ম-নিন্দার হাসি। ভাবল, "আমার তো অন্য কর্তব্যও ছিল। জনগণকে তো শান্ত করতে হবে। জনকল্যাণের জন্য আরও অনেকে প্রাণ দিয়েছে—এখনও দিচ্ছে। ···আমি যদি শুধুমাত্র থিয়োডোর ভাসিলিয়েভিচ হতাম তাহলে আমার কর্মধারা হত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, কিন্তু প্রধান সেনাপতি হিসাবে আমার জীবন ও মর্যাদা রক্ষা করা কর্তব্য।"

গাড়ির নরম গদীতে বসে ঈষৎ দুলতে দুলতে এবং জনতার সেই ভয়ঙ্কর হল্লা আর কানে না আসাতে রস্তপ্‌চিনের শরীরটা ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল, আর সেইসঙ্গে মনটাকেও শান্ত করে তুলবার উপযুক্ত করার কাজে ব্যাপৃত হল।

সে যা করেছে তারজন্য নিজের বিচার-বুদ্ধি তাকে দোষী তো করলই না, বরং একটি অপরাধীকে শাস্তি দেবার এবং সেইসঙ্গে উন্মত্ত জনতাকে শান্ত করবার এমন একটা সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পেরেছে বলে আত্ম-তুষ্টিতে তার মন ভরে উঠল।

ভেরেশ্‌চাগিনকে বিচারে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, রস্তপ্‌চিন ভাবতে লাগল (যদিও সেনেট তাকে কঠোর সশ্রম দণ্ডমাত্র দিয়েছিল) "সে তো একটি বিশ্বাসঘাতক, গুপ্তচর। আমি তো তাকে বিনা শাস্তিতে ছেড়ে দিতে পারি না, তাই একঢিলে দুই পাখি মেরেছি: ক্ষিপ্ত জনতাকে শান্ত করতে তাদের হাতে একটি শিকার তুলে দিয়েছি, আর সেইসঙ্গে একজন দুষ্কৃত-কারীকে শাস্তি দিয়েছি।"

দেশের বাড়িতে পৌঁছে গৃহস্থালীর ব্যাপারে নানান নির্দেশাদি দিতে শুরু করে কাউণ্ট সম্পূর্ণ শান্ত হয়ে গেল।

আধঘণ্টা পরেই দ্রুতগামী অশ্বচালিত গাড়িতে চেপে সকোলনিকির মাঠের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে তার মনে অতীতকে নিয়ে কোন চিন্তাই এল না, এখন তার চিন্তা শুধু যা ঘটবে তাকে নিয়ে। সে শুনেছে কুতুজভ এখন ইয়াউজা সেতুতে আছে; তাই সেখানেই সে চলেছে। কুতুজভের ধোকা-বাজির জন্য তাকে যে ক্রুদ্ধ, হুল-ফোটানো কথাগুলি শোনাবে সেটাই মনে মনে আওড়াচ্ছে। সেই বুড়ো শেয়ালকে সে বুঝিয়ে দেবে, শহর পরিত্যাগ

করে যে দুর্গতিকে সে ডেকে এনেছে, যেভাবে রাশিয়ার সর্বনাশ ঘটিয়েছে তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব পড়বে তারই বাহাত্তুরে বুড়ো মাথায় উপর। কুতুজভ যা যা বলবে মনে মনে সেগুলি ভাবতেই রস্তপ্‌চিন রাগে গাড়ির মধ্যেই মুখ ফিরিয়ে কঠোর দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল।

সকোল্‌নিকির মাঠও পরিত্যক্ত। শুধু একেবারে শেষ প্রান্তে অতিথিশালা ও পাগলাগারদের সামনে সাদা পোশাকপরা কিছু লোক দেখা যাচ্ছে, আর তাদের মতই আরও কিছু লোক মাঠে হাঁটতে হাঁটতে যার যার মত চীৎকার করছে, হাত-পা নাড়ছে।

তাদের মধ্যে একজন কাউন্ট রস্তপ্‌চিনের গাড়িচলার পথটা পার হবার জন্য সেইদিকেই ছুটে আসছে। এইসব ছাড়া-পাওয়া পাগলগুলোকে বিশেষ করে যে পাগলটা তাদের দিকে দৌড়ে আসছে তাকে দেখে স্বয়ং কাউন্ট, তার কোচয়ান ও অশ্বারোহী সৈনিকরা আতংকে ও কৌতূহলে সেইদিকে তাকাতে লাগল।

ঝোলা ড্রেসিং-গাউন পরে লম্বা সরু পা ফেলে এপাশ-ওপাশ দুলতে দুলতে পাগলাটা সবেগে ছুটছে, তার দৃষ্টি রস্তপ্‌চিনের উপর নিবদ্ধ, কর্কশ গলায় চীৎকার করতে করতে সে ইসারায় তাকে থামতে বলছে। পাগলটার গম্ভীর, বিষণ্ণ মুখটা শুকনো ও হলুদে, মুখে অসমান দাড়ি, চোখের জাফরান-হলুদ সাদা অংশের মধ্যে উজ্জল কালো মণি দুটো নীচের পাতার কাছে অস্থির-ভাবে ঘুরছে।

"থাম! ঘোড়া থামাও, আমি বলছি," তীক্ষ্ণ স্বরে সে চীৎকার করে উঠল; হাত-পা নেড়ে প্রতিটি কথার উপর অতিরিক্ত জোর দিয়ে সে অনবরত চেঁচাতে লাগল।

কালিচে-গাড়িটাকে ধরে ফেলে সে তার পাশে পাশে দৌড়তে লাগল।

"তিনবার তারা আমাকে খুন করেছে, তিনবার আমি মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে উঠেছি। তারা আমাকে পাথর ছুঁড়ে মেরেছে, ক্রুশে বিদ্ধ করেছে... আমি আবির্ভূত হবই...হবই...হবই। তারা আমার দেহটাকে ছিঁড়েছে। ঈশ্বরের রাজ্যের পতন ঘটানো হবে। তিনবার আমি তার পতন ঘটাব, আবার তিনবার তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করব!" ক্রমেই গলা চড়াতে চড়াতে সে চেঁচাতে লাগল।

জনতা যখন ভেরেশ্‌চাগিনকে ঘিরে ধরেছিল তখনকার মতই কাউন্ট রস্তপ্‌চিনের মুখটা হঠাৎ সাদা হয়ে গেল। মুখ ঘুরিয়ে নিল। কাঁপা গলায় কোচয়ানকে বলল, "চালাও...আরও জোর!" কালিচে-গাড়িটা যত দ্রুত সম্ভব উড়ে চলল, কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত পাগলাটার হতাশ আর্তকণ্ঠ তার কানে বাজতে লাগল, ক্রমেই দূর হতে দূরে অস্পষ্টতর হয়ে এল; তার চোখের

সামনে আর কিছু নেই, শুধু ভাসতে লাগল লোমের পটি বসানো কোট পরা "সেই বিশ্বাসঘাতকের" বিস্মিত, ভয়ার্ত, রক্তাক্ত মুখটা।

এই মানসিক ছবিটা এত টাটকা যে রস্তপ্‌চিনের মনে হল সেটা বুঝি তার বুকের মধ্যে কেটে বসেছে, সেখানে রক্ত ঝরাচ্ছে। এইমুহূর্তে তার স্পষ্ট মনে হল, সেই স্মৃতির রক্তাক্ত চিহ্ন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যাবে না, বরং সেই ভয়ঙ্কর স্মৃতি জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তীব্রতর নিষ্ঠুরতায় ও বেদনায় তার বুকের মধ্যে বাসা বেঁধে থাকবে। নিজের কথাগুলি এখনও তার কানে বাজছে: "ওকে কেটে ফেল। আমি হুকুম দিচ্ছি!"····

সে ভাবল, "এ কথাগুলি কেন বলেছিলাম? হঠাৎই বলে ফেলেছি···· বলার কোন দরকার ছিল না। তাহলে তো কিছুই ঘটত না।" যে অশ্বারোহী সৈনিকটি আঘাত করেছিল তার ভীত, ক্রুদ্ধ মুখটা সে যেন দেখতে পেল; লোমের পটি দেওয়া কোট-পরা ছেলেটির সেই নীরব, ভীরু তিরস্কারের দৃষ্টিটা যেন তার দিকেই পড়ে আছে।" কিন্তু আমি তো নিজের জন্য একাজ করি নি। একাজ করতে আমি বাধ্য হয়েছিলাম····ক্ষিপ্ত জনতা, বিশ্বাসঘাতক, জনকল্যাণ," সে ভাবতে লাগল।

সৈন্যরা তখনও ইয়াউজা সেতুতে ভিড় করে আছে। দিনটা গরম। সেতুর পাশে একটা বেঞ্চিতে বসে কুতুজভ হাতের চাবুকটা দিয়ে বালির উপর আঁকিবুকি টানছে, এমন সময় একটা কালিচে সশব্দে এসে হাজির হল। টুপিতে পালক লাগানো, জেনারেলের ইউনিফর্মধারী একটি লোক কুতুজভের সামনে হাজির হয়ে ফরাসীতে কি যেন বলল। লোকটি কাউণ্ট রস্তপ্‌চিন। কুতুজভকে বলল, সে এসেছে কারণ রাজধানী মস্কো আর নেই, সেখানে আছে শুধু সৈন্যরা।

"প্রশান্ত মহামহিম যদি আমাকে না বলতেন যে আর একটা যুদ্ধ না করে তিনি মস্কো পরিত্যাগ করবেন না, তাহলে সমস্ত ব্যাপারটাই অন্যরকম হত; এসব ঘটতই না," সে বলল।

সে যা বলছে তার অর্থ বুঝতে না পেরে কুতুজভ এমনভাবে রস্তপ্‌চিনের দিকে তাকাল যেন এইমুহূর্তে লোকটির মুখে কি লেখা আছে সেটা পড়বার চেষ্টাই সে করছে। রস্তপ্‌চিন বিচলিত হয়ে চুপ করল। ঈষৎ মাথা নেড়ে স্থিরনিবদ্ধ দৃষ্টি রস্তপ্‌চিনের মুখের উপর থেকে না সরিয়েই কুতুজভ ধীরে ধীরে নীচু গলায় বলতে লাগল:

"না! একটা যুদ্ধ ছাড়া আমি মস্কো পরিত্যাগ করব না!"

এই কথাগুলি বলার সময় কুতুজভ মনে মনে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কিছু ভাবছিল অথবা ইচ্ছা করেই সে কথাগুলি বলল; রস্তপ্‌চিন কিন্তু আর কোন কথা না বলেই দ্রুত সেখান থেকে চলে গেল। আর কী আশ্চর্য কথা, মস্কোর শাসন-

কর্তা গর্বোদ্ধত কাউন্ট রস্তপ্‌চিন একটা কসাক চাবুক হাতে নিয়ে সেতুর কাছে গিয়ে হাজির হল এবং পথ-অবরোধকারী গাড়িগুলোকে হটিয়ে দিতে সমানে চীৎকার করতে লাগল।

অধ্যায়—২৬

বিকেল চারটে নাগাদ মুরাত-এর সৈন্যরা মস্কোতে ঢুকতে শুরু করল। সকলের আগে অশ্বপৃষ্ঠে উর্তেমবের্গ হুজারদের একটা দল, তাদের পিছনে অসংখ্য দলবল নিয়ে নেপল্‌স্‌-এর রাজা স্বয়ং।

আর্বাত স্ট্রীটের মাঝামাঝি সেণ্ট নিকলাসের অলৌকিক দেবমূর্তির গির্জার কাছে পৌঁছে মুরাত থামল; সে ক্রেমলিন দুর্গের অবস্থা জানবার জন্য যে অগ্রবর্তী সেনাদলকে পাঠানো হয়েছে তাদের খবরের জন্যই সে অপেক্ষা করতে লাগল।

যারা মস্কোতেই থেকে গেছে তাদের একটা দল মুরাতের চারপাশে ভিড় করল। পালক ও সোনার পোশাকে সজ্জিত লম্বা-চুল এই বিচিত্র সেনাপতিটিকে দেখে তারা বিস্ময়বিমূঢ়ভাবে তার দিকে তাকাতে লাগল।

নীচুগলায় তাদের বলতে শোনা গেল, "ইনিই কি ওদের জার না কি? তা লোকটি মন্দ নয়!"

একজন অশ্বারোহী দোভাষী তাদের দিকে এগিয়ে গেল।

"মাথার টুপি খুলে ফেল....সব টুপি খুলে ফেল।" ভিড়ের মধ্যে একজনের মুখ থেকে আরেকজনের মুখে মুখে কথাটা ফিরতে লাগল। দোভাষী বুড়ো দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করল ক্রেমলিন অনেক দূরে কি না। অনভ্যস্ত পোলিশ উচ্চারণে বিব্রত দরোয়ান বুঝতেই পারল না যে দোভাষী রুশ ভাষাতেই কথা বলছে; তার কথা কিছুই বুঝতে না পেরে সে ভিড়ের মধ্যে সরে পড়ল।

মুরাত দোভাষীর কাছে এগিয়ে এসে বলল, ওদের জিজ্ঞাসা কর রুশ-সৈন্যরা কোথায় আছে। একজন রুশ কথাটা বুঝতে পারল, আর সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই একযোগে দোভাষীর প্রশ্নের জবাব দিতে লাগল। অগ্রবর্তী সেনাদল থেকে ফিরে এসে একজন ফরাসী অফিসার জানাল, দুর্গের ফটকে অবরোধ সৃষ্টি করা হয়েছে, আর সম্ভবত সেখানে একদল সৈন্য লুকিয়ে ওৎ পেতে আছে।

"ভাল কথা!" বলে মুরাত দলের একজনের দিকে ফিরে হুকুম দিল, ফটকের উপর গোলাবর্ষণের জন্য চারটে হাল্কা কামান সেইদিকে নিয়ে যাওয়া হোক।

মুরাতের পিছন পিছন কামানগুলি এগিয়ে চলল; আর্বাত পর্যন্ত পৌঁছে গেল। ভজ্‌দ্‌ভিঝেংকা স্ট্রীটের শেষ প্রান্তে পৌঁছে তারা থেমে গেল;

স্কোয়ারের মধ্যে সৈন্য সমাবেশ করল। কয়েকজন ফরাসী অফিসার কামান বসানোর কাজের তত্বাবধান করতে করতে ছোট দুরবীনে চোখ লাগিয়ে ক্রেমলিনকে দেখতে লাগল।

ক্রেমলিনে সান্ধ্য-উপাসনার ঘণ্টা বাজছে; সে শব্দ শুনে ফরাসীরা সচকিত হয়ে উঠল; তারা ধরে নিল ওটা সৈন্যদের প্রতি সংকেত-ধ্বনি। কয়েকজন পদাতিক সৈনিক কুতাফিয়েভ ফটকের দিকে ছুটে গেল। সেখানে কড়িকাঠ ও কাঠের পর্দা বসানো হয়েছে, আর অফিসার ও সৈন্যরা সেদিকে ছুটে যেতেই ফটকের নীচ থেকে দুটো বন্দুকের গুলি ছোঁড়া হল। কামানের পাশে দণ্ডায়মান একজন সেনাপতি অফিসারকে কিছু নির্দেশ দিতেই সে আবার তার সৈন্যদের নিয়ে সেখানে ছুটে গেল।

ফটক থেকে আরও তিনটে গুলির শব্দ এল।

একটা গুলি লাগল জনৈক ফরাসী সৈনিকের পায়ে, আর পর্দার পিছন থেকে কয়েকটি গলার অদ্ভুত শব্দ ভেসে এল। সঙ্গে সঙ্গে যেন কোন হুকুম এসেছে এমনিভাবে ফরাসী সেনাপতি, অফিসার ও সৈনিকদের মুখের আনন্দ প্রশান্তির পরিবর্তে দেখা দিল সংগ্রাম ও কষ্ট সহ্য করার সংহত প্রস্তুতির দৃঢ়তা। মার্শাল থেকে সাধারণ সৈনিক পর্যন্ত প্রত্যেকের কাছেই এ জায়গাটা আর ভজ্‌দ্‌ভিঝেংকা, বা মথাভায়া, বা কুতাফিয়েভ স্ট্রীট, অথবা ত্রয়স্তা ফটক নয়, এটা একটা নতুন রণক্ষেত্র যা হয় তো অচিরেই রক্তক্ষয়ী হয়ে দেখা দেবে। সকলেই সেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। ফটক থেকে ভেসে আসা চীৎকার থেমে গেল। কামানগুলো এগিয়ে চলল, গোলন্দাজ সৈনিকরা মশালের ছাই ঝেড়ে ফেলল, একজন অফিসার হুকুম দিল: "কামান দাগ!" তারপরই শোনা গেল দুটো গোলা ছুটে আসার শোঁ-শোঁ শব্দ। গোলা দুটি আছড়ে পড়ল ফটকের পাথরে ও কাঠের কড়ি ও পর্দার উপর; স্কোয়ারের উপর দেখা দিল দুটো ধোঁয়ার কুণ্ডলী।

সেই গোলার শব্দের প্রতিধ্বনি পাথরে-গড়া ক্রেমলিনের মাথার উপর থেকে মিলিয়ে যাওয়ার কয়েকমুহূর্ত পরেই ফরাসীরা তাদের মাথার উপরে একটা বিচিত্র শব্দ শুনতে পেল। হাজার হাজার কাক প্রাচীরের উপর দিয়ে উড়ে এসে বাতাসে পাক খেতে লাগল, আর কর্কশ গলায় ডাকতে ডাকতে সশব্দে পাখা ঝাপ্‌টাতে লাগল। সেই শব্দের সঙ্গে মিশে ফটক থেকে ভেসে এল একটি মাত্র মানুষের চীৎকার, এবং ধোঁয়ার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল চাষীর কোট-পরা খোলা মাথার একটি মূর্তি। একটা বন্দুক বাগিয়ে ধরে সে ফরাসীদের দিকে তাক করল। ফরাসী অফিসার আর একবার হুকুম দিল, "কামান দাগ!" আর একই সঙ্গে শোনা গেল একটা বন্দুকের ও দুটো কামানের শব্দ। ফটকটা আবার ধোঁয়ায় ঢেকে গেল।

পর্দার ওপাশে কিছুই নড়ছে না; ফরাসী পদাতিক সৈন্য ও অফিসাররা

ফটকের দিকে এগিয়ে গেল। ফটকের পথের উপর তিনজন আহত হয়ে ও চারজন মরে পড়ে আছে। চাষীর কোট-পরা দুটি লোক প্রাচীরের নীচ থেকে জ্‌নামেংকার দিকে ছুটে গেল।

"এসব সরিয়ে ফেল!" কড়িকাঠ ও মৃতদেহগুলি দেখিয়ে একজন অফিসার হুকুম করল, আর ফরাসী সৈন্যরা আহতদের পাঠিয়ে দিয়ে মৃতদেহগুলিকে আলিসার উপর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

এই লোকগুলি কারা তা কেউ জানল না। "ওদের সরিয়ে ফেল!" ওদের সম্পর্কে শুধু এইটুকুই বলা হল। আর আলিসার উপর দিয়ে তাদের ছুঁড়ে ফেলা হল, এবং পরে যাতে দুর্গন্ধ ছড়াতে না পারে সেজন্য পরে সেখান থেকেও সরিয়ে দেওয়া হল। একমাত্র থিয়ের্সই তাদের স্মৃতির প্রতি কয়েকটি উচ্ছ্বসিত পংক্তি উৎসর্গ করেছে: "এই হতভাগ্যরা পবিত্র দুর্গ দখল করেছিল, অস্ত্রাগার থেকে নিজেরাই বন্দুক সংগ্রহ করে ফরাসীদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছিল। তাদের অনেকেই তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল; ক্রেমলিনকে মুক্ত করা হয়েছিল তাদের উপস্থিতি থেকে।"

মুরাতকে জানানো হল, রাস্তা পরিষ্কার। ফরাসীরা ফটকের ভিতর ঢুকে পড়ল, সেনেট স্কোয়ারে তাঁবু খাটাল। সেনেট ভবনের জানালা দিয়ে সৈনিকরা জ্বালানির জন্য চেয়ার ছুঁড়ে ফেলতে লাগল স্কোয়ারের মধ্যে, আর তাই দিয়ে সেখানে আগুন জ্বালানো হল।

অন্য সেনাদলগুলি ক্রেমলিনের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে মরসেকা, লুবিয়াংকা ও পক্রোভ্‌কা স্ট্রীট বরাবর শিবির ফেলল। অন্যরা আস্তানা পাতল ভজ্‌দ্‌ভিঝেংকা, নিকোল্‌স্কি ও তিভারস্কয় স্ট্রীটে। কোন বাড়ির মালিককে খুঁজে না পাওয়ায় শহরের স্বাভাবিক ব্যবস্থামত ফরাসীদের কোথাও অধিবাসীদের কাঁধে চাপানো গেল না; সকলেই তাঁবুতে বাসা বাঁধল।

ফরাসীরা ছিন্নবাস, ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত, এবং মূল সংখ্যার তিনভাগের একভাগে পরিণত হলেও সুন্দর শোভাযাত্রা সহকারেই মস্কোতে প্রবেশ করল। সেনাদল শ্রান্ত ও ক্ষীণবল, তবু সংগ্রামশীল ও ভয়ংকর। কিন্তু বিভিন্ন আস্তানায় চলে যাবার আগে পর্যন্তই তারা ছিল সৈনিক। কিন্তু যে মুহূর্তে বিভিন্ন রেজিমেণ্টের সৈন্যরা ঐশ্বর্যবানদের পরিত্যক্ত বাড়িগুলিতে ছড়িয়ে পড়ল তখন থেকেই সেনাবাহিনী কোথায় হারিয়ে গেল, তার জায়গায় দেখা দিল এমন কিছু জীব যারা পরিচয়হীন, না নাগরিক না সৈন্য, তাদের বলা চলে লুঠেরার দল। পাঁচ সপ্তাহ পরে সেই মানুষগুলিই যখন মস্কো ছেড়ে চলে গেল তখন আর তারা একটা সেনাদল হয়ে গড়ে উঠতে পারল না। তারা তখন একদল উচ্ছৃংখল লুঠেরা, যার কাছে যা মূল্যবান বা দরকারী মনে হল সেই জিনিসই হাতিয়ে নিয়ে তারা চলে গেল। মস্কো ছেড়ে যাবার সময় কারও লক্ষ্যই আর জয় করা নয়, তাদের একমাত্র লক্ষ্য যে যা

পেয়েছে সেটাকে হাতে রাখা। একটা বাঁদর যেমন সরু গলা কলসির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে মুঠোভর্তি বাদাম পেয়ে সেগুলো হারাবার ভয়ে কিছুতেই মুঠি খোলে না এবং মারা যায়, সেইরকম ফরাসীরা যখন মস্কো ছেড়ে গেল তখন তাদেরও মৃত্যু অনিবার্য হয়ে উঠল, কারণ লুঠের মাল সঙ্গে নিয়েই তারা চলল, আর যা তারা চুরি করেছে তা ফেলে যাওয়াও বাঁদরের বাদাম ফেলে যাওয়ার মতই অসম্ভব। প্রতিটি রেজিমেণ্ট মস্কোর একটা অঞ্চলে ঢুকবার দশ মিনিট পরেই একটি সৈনিক বা অফিসারের আর পাত্তা পাওয়া গেল না। সামরিক ইউনিফর্ম ও চটের বুটপরা লোকগুলিকে দেখা গেল এঘর থেকে ও-ঘরে হেসে হেসে হেঁটে বেড়াচ্ছে। মদের ঘরে এবং ভাঁড়ার ঘরেও সকলকে খাবারদাবার নিয়ে ব্যস্ত দেখা গেল, কেউবা ভাঙছে গাড়ি-ঘরের তালা। কেউ বা আস্তাবলের দরজা, কেউ বা রান্নাঘরে আগুন জ্বালিয়ে আস্তিন গুটিয়ে ময়দা মাখছে, রুটি সেঁকছে, আবার মেয়েদের ও বাচ্চাদের কখনও ভয় দেখাচ্ছে, কখনও তাদের নিয়ে মজা করছে, আদর করছে। দোকান ও বাড়িগুলোতে এধরনের মানুষ অনেক আছে,—কিন্তু একটিও সৈনিক কোথাও নেই।

ফরাসী কমাণ্ডাররা হুকুমের পর হুকুম জারি করল, সৈন্যদের শহরে ছড়িয়ে পড়া নিষিদ্ধ করা হল, অধিবাসীদের উপর অত্যাচার—উৎপীড়ন অথবা লুঠতরাজ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হল, সেই সন্ধ্যায় সৈন্যদের নাম-ডাকবার কথাও ঘোষণা করা হল। কিন্তু এতসব ব্যবস্থা সত্ত্বেও যেসব মানুষ একটু আগে পর্যন্তও ছিল একটা সেনাদল তারাই প্রচুর আরাম ও জিনিসপত্র সমন্বিত ঐশ্বর্যশালী পরিত্যক্ত শহরটার বুকে জলস্রোতের মত ছড়িয়ে পড়ল। একদল ক্ষুধার্ত গরু-মোষ যখন ফসলহীন মাঠ পার হয় তখন তাদের সহজেই বাগে রাখা যায়, কিন্তু যেই তারা একটা ফসলভরা মাঠে পৌঁছয় অমনি তারা হাতের বাইরে চলে যায়, ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ে; ফরাসী সৈন্যরা সেইভাবেই সমৃদ্ধ শহরটার বুকে ছড়িয়ে পড়ল।

মস্কোর অধিবাসীরা কেউ নেই; জল যেরকম বালির ভিতর দিয়ে চুঁইয়ে নীচে পড়ে, সৈন্যরাও সেইরকম ক্রেমলিন থেকে বেরিয়ে দুর্বার গতিতে শহরের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। একটা অশ্বারোহী সেনাদল কোন ব্যবসায়ীর বাড়িতে ঢুকে সেখানে ঘোড়া রাখবার মত যথেষ্ট ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও অন্য আর একটা বাড়িতে গিয়ে ঢুকল। কারণ সেটাকে আরও একটু ভাল বলে মনে হল। অনেকেই কয়েকটা বাড়ি দখল করে নিয়ে খড়ি দিয়ে তাদের নাম লিখে রাখল, আর তাই নিয়ে অন্য দলের সঙ্গে ঝগড়া করল, এমন কি লড়াই পর্যন্ত করল। বাসস্থান ঠিক করার আগেই সৈন্যরা শহর দেখতে পথে বেরিয়ে পড়ল; যখন শুনল যে সবকিছুই পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে তখন তারা সেইসব জায়গার উদ্দেশ্যে ছুটল যেখানে মূল্যবান জিনিস-

পত্র মিলবে। অফিসাররা ছুটল সৈন্যদের বাধা দিতে, কিন্তু তারাও সেই একই কাজে লেগে গেল। সামান্য কিছু অধিবাসী যারা মস্কোতেই ছিল তারা লুঠের হাত থেকে বাঁচবার জন্য কমাণ্ডিং অফিসারদের নিজ নিজ বাড়িতে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এল। প্রচুর ঐশ্বর্য; তার কোন সীমা নেই; ফরাসীরা যেসব অঞ্চল দখল করেছে তার চারপাশে রয়েছে আরও কত অনাবিষ্কৃত বেদখল অঞ্চল; তারা ভাবল সেখানে হয়তো আরও ধনরত্ন পাওয়া যাবে। মস্কো যেন ক্রমেই সেনাদলকে পাকে পাকে বেশী করে ঘিরে ধরল। শুকনো মাটিতে যখন জল ঢালা হয় তখন জল ও মাটি দুইই অদৃশ্য হয়ে যায়, দেখা দেয় কাদা; ঠিক সেইরকম একটা সমৃদ্ধ পরিত্যক্ত শহরে ক্ষুধার্ত সেনাদলের প্রবেশের ফলে দেখা দিল অগ্নিকাণ্ড ও লুঠতরাজ; সেনাদল ও সমৃদ্ধ শহর দুইই ধ্বংস হল।

ফরাসীরা বলে, রস্তপ্‌চিনের হিংস্র দেশপ্রেমই মস্কোর অগ্নিকাণ্ডের জন্য দায়ী, রুশরা বলে দায়ী ফরাসীদের বর্বরতা। আসলে কিন্তু কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে দায়ী করে মস্কোর অগ্নিকাণ্ডকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। মস্কোকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, কারণ সেখানকার যে অবস্থা হয়েছিল তাতে একশ' ত্রিশটি নিম্নমানের অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্র থাকুক আর নাই থাকুক, কাঠের তৈরি যেকোন শহরই পুড়তে বাধ্য। খড়কুটোর স্তূপের উপর কয়েক দিন ধরে অনবরত আগুনের ফুল্‌কি পড়লে সেটা যেমন পুড়তে বাধ্য ঠিক তেমনই পরিত্যক্ত মস্কোর অগ্নিদগ্ধ হওয়াও ছিল অনিবার্য। বাড়ির মালিকরা যখন বাড়িতে বাস করে এবং একটা পুলিশ বাহিনী উপস্থিত থাকে তখনও যে কাঠের তৈরি শহরে অগ্নিকাণ্ড ছাড়া একটা দিনও কাটে না, সেই শহরের অধিবাসীরা যখন ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে গেছে, সেসব দখল করেছে সৈন্যরা, তারা পাইপ টানছে, সেনেট ভবনের চেয়ার দিয়ে সেনেট স্কোয়ারেই আগুন জ্বালাচ্ছে, দিনে দুবার করে খানা পাকাচ্ছে। তখন কি সে শহরে আগুন না লেগে পারে। রস্তপ্‌চিনের হিংস্র দেশপ্রেম এবং ফরাসীদের বর্বরতাকে এব্যাপারে দোষ দিয়ে কোন লাভ নেই। মস্কোতে আগুন লাগিয়েছিল সৈন্যদের পাইপ, রান্নাঘরের ও শিবিরের আগুন, আর পরের বাড়ি দখল করেছিল যে শত্রু সৈন্যরা তাদের অসতর্কতা। গৃহদাহের ঘটনা যদি ঘটেও থাকে তবু সেটাকেই কারণ বলে ধরা চলে না, কারণ গৃহদাহের কোন ঘটনা না ঘটলেও মস্কো অগ্নিদগ্ধ হতই।

ফরাসীদের পক্ষে রস্তপ্‌চিনের হিংস্রতাকে দায়ী করা এবং রুশদের পক্ষে শয়তান বোনাপার্তকে দায়ী করা যতই লোভনীয় হোক, একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে অগ্নিকাণ্ডের সেরকম কোন প্রত্যক্ষ কারণ ছিল না, কারণ মালিকরা যখন কোন গ্রাম, কারখানা, বা বাড়ি ছেড়ে যায় এবং অপরিচিত লোকদের সেখানে বাস করতে ও নিজ রান্না করতে দেওয়া হয়,

তখন সেই গ্রাম, কারখানা বা বাড়িতে যেমন আগুন লাগতে বাধ্য, তেমনই মস্কোর অগ্নিকাণ্ডও ছিল অনিবার্য। একথা সত্য যে অধিবাসীরাই মস্কোকে পুড়িয়েছিল, কিন্তু পুড়িয়েছিল সেই অধিবাসীরা যারা মস্কো ছেড়ে চলে গিয়েছিল, মস্কোতে যারা তখনও ছিল তারা নয়। বার্লিন, ভিয়েনা, এবং অন্যসব শহরের মত শত্রুকবলিত মস্কো যে অক্ষুণ্ণ থাকল না তার সহজ কারণ তার অধিবাসীরা শহরকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল, শহরে থেকে তারা রুটি ও নুন দিয়ে ফরাসীদের অভ্যর্থনা করে নি, শহরের চাবি তাদের হাতে তুলে দেয় নি।

অধ্যায়—২৭

মস্কোর জীবনযাত্রার সঙ্গে মিলেমিশে ফরাসীরা একসময় এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছল যেখানে ২রা সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় পিয়ের নিজেও বাস করছিল।

অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে একান্ত নির্জনে দুটো দিন কাটাবার পরে পিয়েরের মনের অবস্থা তখন প্রায় পাগলামির পর্যায়ে গিয়ে পৌঁচেছে। একটিমাত্র চিন্তাই তাকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই চিন্তাটি কখন কিভাবে তার মাথায় ঢুকেছে তা সে জানে না, কিন্তু অতীতের কিছুই তার মনে নেই, বর্তমানের কথাও কিছুই সে বোঝে না, যা কিছু দেখে আর যা কিছু শোনে সবই তার কাছে স্বপ্ন বলে মনে হয়।

জীবনের দাবীর যে জটিল জালে সে বাঁধা পড়েছে, বর্তমান অবস্থায় যার হাত থেকে সে নিজেকে মুক্ত করতে পারছে না, তার কবল থেকে পালাবার জন্যই সে বাড়ি ছেড়েছে। যোসেফ আলেক্সিভিচের বাড়িতে সে এসেছিল স্বর্গত মানুষটির বই ও কাগজপত্রের বিলি–ব্যবস্থা করার অছিলায়, কিন্তু আসলে সে এসেছিল জীবনের গোলযোগের কবল থেকে শান্তির সন্ধানে, কারণ তার মনে যোসেফ আলেক্সিভিচের স্মৃতি যে শাশ্বত, গম্ভীর, শান্ত চিন্তার সঙ্গে জড়িত সেটা তার নিজের তৎকালীন অশান্ত জীবনের সম্পূর্ণ বিপরীত। সে তখন খুঁজছিল একটি শান্ত আশ্রয়, সেই আশ্রয়ই সে পেয়ে গেল যোসেফ আলেক্সিভিচের পড়ার ঘরে। পড়ার ঘরের মৃত্যুশীতল নিস্তব্ধতার মধ্যে সে যখন ধূলিমলিন লেখার টেবিলের উপর কনুই রেখে বসে থাকে তখনই একের পর এক বিগত কয়েকদিনের স্মৃতি, বিশেষ করে বরদিনো যুদ্ধের স্মৃতি—কল্পনায় তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে, আর সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে বড়ই তুচ্ছ ও অর্থহীন বলে মনে হয়। গেরাসিম যখন তাকে দিবাস্বপ্ন থেকে জাগিয়ে তুলল তখনই তার মনে হল যে জনসাধারণ কর্তৃক মস্কোকে রক্ষার যে পরিকল্পনা করা হয়েছে তাতে সেও অংশ নেবে। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই সে গেরাসিমকে বলল তাকে একটা চাষীর কোট ও একটা

পিস্তল যোগাড় করে দিতে। তাকে আরও জানাল যে নিজের নাম গোপন করে সে যোসেফ আলেক্সিভিচের বাড়িতেই থাকবে।

তারপর মস্কো রক্ষার কাজে জনসাধারণের সঙ্গে যোগ দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে কোটটা কিনবার পরেই যখন রস্তভ্‌দের সঙ্গে পিয়েরের দেখা হয়ে গেল এবং নাতাশা তাকে বলল: "আপনি কি মস্কোতেই আছেন ?...কী চমৎকার!" তখনই চকিতে তার মনে হল যে সত্যি তো, মস্কো যদি বেদখল হয়েও যায় তবু তার পক্ষে এখানে থেকে নিয়তিনির্দিষ্ট কাজে আত্মনিয়োগ করাই তো সবচাইতে ভাল কাজ।

কোন কিছুতেই পিছ-পা হবেনা এই ধারণা নিয়েই পরদিন সে তিনপাহাড় ফটকে গেল। কিন্তু সেখান থেকে বাড়িতে ফিরে যখন তার মনে স্পষ্ট ধারণা হল যে মস্কোকে রক্ষা করার চেষ্টা করা হবে না তখনই হঠাৎ তার মনে হল, যেকাজকে আগে সে একটা সম্ভাবনামাত্র বলে মনে করেছিল সেটাই এখন হয়ে উঠেছে একান্ত প্রয়োজনীয় ও অনিবার্য। নাম ভাড়িয়ে তাকে মস্কোতে থাকতেই হবে, নেপোলিয়নের সঙ্গে দেখা করে তাকে হত্যা করতে হবে, হয় নিজে মরবে আর না হয় সারা ইওরোপের সব দুঃখের অবসান করবে—তার ধারণা একমাত্র নেপোলিয়নের জন্যই ইওরোপের এত দুঃখ।

১৮০৯ সালে একটি জার্মান ছাত্র যখন ভিয়েনাতে নেপোলিয়নের প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিল তার বিস্তারিত বিবরণ সবই পিয়ের জানে। সে জানে যে ছাত্রটিকে গুলি করে মারা হয়েছিল। নিজের পরিকল্পনা মত কাজ করতে হলে নিজের জীবনের যে ঝুঁকি নিতে হবে সেই চিন্তাই তাকে আরও বেশী উত্তেজিত করে তুলল।

দুটি প্রবল অনুভূতি দুর্বার বেগে পিয়েরকে এই উদ্দেশ্যের দিকে টানছে। প্রথম অনুভূতিটি হচ্ছে—সকলের আসন্ন বিপদের মুখে ত্যাগ ও কষ্ট ভোগের প্রয়োজনীয়তা; এই একই অনুভূতি তাকে ২৫শে তারিখে টেনেনিয়ে গিয়েছিল মোঝায়েস্ক-এ, আর সেখান থেকে যুদ্ধের একেবারে ঘন আবর্তের মাঝখানে, এবং এখনও তাকে নিজের বাড়ি থেকে বের করে এনেছে, চিরাভ্যস্ত বিলাস ও আরামের পরিবর্তে তাকে শুতে দিয়েছে শক্ত সোফায় আর খেতে দিচ্ছে গেরাসিমের সঙ্গে একই খাদ্য। অপর অনুভূতিটি হচ্ছে যা কিছু গতানুগতিক, কৃত্রিম ও মানবিক—যাকে অধিকাংশ মানুষ জাগতিক পরমার্থ বলে মনে করে—তার প্রতি রুশ মনের স্বাভাবিক অস্পষ্ট বিরাগ।

এদিকে আজ যদি সে অন্য সকলের মত মস্কো ছেড়ে চলে যায় তাহলে তার বাড়ি থেকে পলায়ন, এই চাষীর কোট, এই পিস্তল, রস্তভদের কথা, তার ঘোষণা যে সে মস্কোতেই থাকবে,—সবই যে অর্থহীন হয়ে পড়বে; শুধু তাই নয়, সবই হবে ঘৃণার্হ ও হাস্যকর, আর সেটাই পিয়েরের পক্ষে অসহ্য।

যেমন হয়ে থাকে, পিয়েরের শারীরিক অবস্থা ও তার মানসিক অবস্থার

সঙ্গে তাল মিলিয়েছে। অনভ্যস্ত মোটা খাবার, ক'দিনের অনবরত ভদ্‌কা পান, মদ ও চুরুটের অভাব, নোংরা পোশাক, শয্যাবিহীন ছোট সোফায় প্রায় নিদ্রাহীন দুটি রাত যাপন—সব কিছু মিলে তাকে এমন একটা উত্তেজনার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে যেটা পাগলামিরই নামান্তর।

দুপুর দুটো বাজে। ফরাসীরা মস্কোতে ঢুকে পড়েছে। পিয়ের তা জানে, তবু কাজের পথে না গিয়ে সে শুধু মনে মনে তার পরিকল্পনার বিস্তারিত বিবরণ নিয়েই চিন্তা করছে। কল্পনায় আঘাত হানবার কথা অথবা নেপোলিয়নের মৃত্যুর কথা যত না ভাবছে তার চাইতে অনেক বেশী করে, অসাধারণ স্পষ্টতা ও বিষণ্ণ আনন্দের সঙ্গে কল্পনা করছে নিজের ধ্বংস ও বীরত্বপূর্ণ কষ্টসহিষ্ণুতার কথা।

ভাবছে, "হ্যাঁ, একাকি, সকলের জন্য, আমি হয় একাজ করব, নয় তো মরব। হ্যাঁ, এগিয়ে যাব···তারপর সহসা···পিস্তল, না ছুরি? ···একই কথা! বলব, 'আমি নই, বিধাতার হাতই তোমাকে শাস্তি দিল।' সে কল্পনা করল, নেপোলিয়নকে মারবার সময় এই কথাগুলি তাকে বলবে। "এবার আমাকে ধর, মৃত্যুদণ্ড দাও!" মাথাটা নুইয়ে বিষণ্ণ অথচ কঠিন মুখে সে নিজেকেই বলতে লাগল।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পিয়ের যখন এইভাবে নিজের সঙ্গেই কথা বলছিল তখন পড়ার ঘরের দরজা খুলে দ্বারপথে দেখা দিল মকার আলেক্সিভিচের মূর্তি; আগে সে ছিল কত ভীরু, কিন্তু এখন সম্পূর্ণ বদলে গেছে।

ড্রেসিং-গাউনটা বাঁধা হয় নি, মুখটা রক্তিম ও বিকৃত। মনে হয় মদ খেয়েছে। পিয়েরকে দেখে প্রথমে কিছুটা বিচলিত হল, কিন্তু পিয়েরের মুখের বিমূঢ় ভাব লক্ষ্য করে সঙ্গে সঙ্গে সাহস ফিরে পেল; স্খলিত পায়ে ঘরের মাঝখানে এগিয়ে গেল।

দৃঢ় কর্কশ গলায় বলল, "ওরা ভয় পেয়েছে। আমি বলছি, আমি আত্মসমর্পণ করব না, আমি বলছি···ঠিক বলি নি স্যার?"

সে থামল; হঠাৎ টেবিলের পিস্তলটা চোখে পড়ায় অপ্রত্যাশিত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সেটা তুলে নিয়ে ছুটে বারান্দায় চলে গেল।

গেরাসিম ও দরোয়ান মকার আলেক্সিভিচের পিছন পিছনই এসেছিল; তারা তাকে থামিয়ে পিস্তলটা কেড়ে নিতে চেষ্টা করল। বারান্দায় বেরিয়ে এসে পিয়ের এই আধপাগল বুড়ো লোকটার দিকে করুণা ও বিরক্তির দৃষ্টিতে তাকাল। মকার আলেক্সিভিচ ভুরু কুঁচকে পিস্তলটা আঁকড়ে ধরে কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে উঠল; তার মাথায় নিশ্চয় কোন বীরত্বপূর্ণ কাজের ছবি ঢুকেছে।

"অস্ত্র নাও! আটক কর! না, এটা তোমরা পাবে না।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে। ভাল মানুষের মত—দয়া করুন স্যার, ওসব যেতে দিন! দয়া করে…" কনুই দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে মকার আলেক্সিভিচকে দরজার দিকে নিয়ে যেতে যেতে গেরাসিম বলতে লাগল।

"কে তুমি? বোনাপার্ত!…" মকার আলেক্সিভিচ চেঁচিয়ে বলল।

"কথাটা ঠিক হল না স্যার। দয়া করে আপনার ঘরে চলুন, বিশ্রাম নিন। পিস্তলটা আমাকে দিন।"

"সরে যা হীন ক্রীতদাস! আমাকে ছুঁস না! এটা দেখছিস?" মকার আলেক্সিভিচ পিস্তলটা ঘুরিয়ে বলল।

গেরাসিম ফিসফিস করে দরোয়ানকে বলল, "ধরে ফেল!"

তারা দুজনে মকার আলেক্সিভিচের হাত ধরে টানতে টানতে দরজার দিকে নিয়ে চলল।

একটা ধ্বস্তাধ্বস্তির বিশৃংখল শব্দ ও একটা কর্কশ মাতালের কণ্ঠস্বরে বারান্দাটা ভরে উঠেছে।

সহসা আরও একটা শব্দ, একটা মর্মভেদী নারীকণ্ঠের আর্তনাদ ধ্বনিত হল, আর রাঁধুনিটি ছুটে বারান্দায় বেরিয়ে এল।

"তারা এসে পড়েছে! হা ভগবান! হে প্রভু, তারা চারজন, অশ্বারোহী!" রাঁধুনি চেঁচিয়ে বলল।

গেরাসিম ও দরোয়ান মকার আলেক্সিভিচকে ছেড়ে দিল; নিস্তব্ধ বারান্দায় শোনা যেতে লাগল সামনের দরজায় কয়েকটি হাতের খট্‌খট্‌ শব্দ।

অধ্যায়—২৮

পিয়ের স্থির করেছে যতদিন তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয় ততদিন নিজের পরিচয় গোপন রাখবে এবং সে যে ফরাসী জানে সেটাও প্রকাশ করবে না। ফরাসীরা ঢোকামাত্রই যাতে লুকিয়ে পড়তে পারে সেজন্য সে আধখোলা দরজার পাশেই দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু ফরাসীরা ঢোকার পরেও পিয়ের সরে গেল না—একটা দুর্বার কৌতূহল তাকে সেখানেই আটকে রাখল।

তারা দুজন এসেছে। একজন অফিসার—দীর্ঘদেহ, সুদর্শন, সৈনিকসুলভ চেহারা—অপরজন সম্ভবত আর্দালি, রোদে পোড়া, বেঁটে, সরু, তোবড়ানো গাল, ভাবলেশহীন মুখ। একটা লাঠিতে ভর দিয়ে ঈষৎ খুঁড়িয়ে অফিসারটি সামনে এগিয়ে এল। কয়েক পা এগিয়ে থামল, বুঝল যে বাসাটা ভালই, ফটকে দাঁড়ানো সৈন্যদের দিকে ফিরে চড়া গলায় ঘোড়াগুলো রাখবার হুকুম দিল। তারপর এক ঝট্‌কায় কনুইটা তুলে গোঁফে তা দিল, আস্তে টুপিটা স্পর্শ করল।

চারদিকে তাকিয়ে হেসে ফরাসীতে বলল, "সকলকে জানাই শুভদিন।"

কেউ কোন জবাব দিল না।

অফিসারটি গেরাসিমকে শুধাল, "তোমার মনিব বাড়িতে আছে?"

ভীত সপ্রশ্ন চোখে গেরাসিম অফিসারের দিকে তাকিয়ে রইল।

করুণার হাসি হেসে অফিসার বলল, "বাসা, বাসা, বাসাবাড়ি! ফরাসীরা ভালমানুষ। আরে, হল কি! দেখ, আমাদের চটিও না হে বুড়ো!" ভয়ার্ত নিঃশব্দ গেরাসিমের কাঁধে চাপড় দিয়ে সে বলল। "আচ্ছা, এ বাড়িতে কি কেউ ফরাসী বলতে পারে না?" চারদিকে তাকিয়ে পিয়েরের চোখে চোখ পড়তে সে আবার ফরাসীতে প্রশ্ন করল। পিয়ের দরজা থেকে সরে গেল।

অফিসার পুনরায় গেরাসিমের দিকে ঘুরে ঘরগুলি দেখাতে বলল।

"মনিব বাড়ি নেই—বুঝতে পারছি না····আমাকে, আপনি····" কথাগুলিকে বোধগম্য করার জন্য আরও বিকৃত করে গেরাসিম বলল।

ফরাসী অফিসারটি গেরাসিমের নাকের কাছে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে হেসে হেসে জানাল যে সেও তার কথা বুঝতে পারছে না, তারপর খোঁড়াতে খোঁড়াতে পিয়েরের দিকে এগিয়ে গেল। পিয়েরের ইচ্ছা সরে গিয়ে লুকিয়ে পড়বে, কিন্তু সেইমুহূর্তে সে দেখতে পেল মকার আলেক্সিভিচ পিস্তলটা হাতে নিয়ে রান্নাঘরের খোলা দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। পাগলের মত ধূর্ত চোখে ফরাসী লোকটির দিকে তাকিয়ে মকার আলেক্সিভিচ পিস্তল তুলে তার দিকেই তাক করল।

ঘোড়া টিপবার চেষ্টা করে মাতাল লোকটি চীৎকার করে উঠল, "ওদের খতম কর!" সে চীৎকার শুনে অফিসারটি ঘুরে দাঁড়াল, আর ঠিক সেই মুহূর্তে পিয়ের মাতালটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। পিয়ের যখন পিস্তলে হাত রেখে সেটা চেপে ধরল, তখনই মকার আলেক্সিভিচও বন্দুকের ঘোড়ার উপর আঙুল রাখল। কানে তালা লাগানো একটা শব্দ হল, কালো ধোঁয়ায় সবকিছু ঢেকে গেল। ফরাসী লোকটি বিবর্ণ মুখে দরজার দিকে ছুটে গেল।

ফরাসী ভাষার জ্ঞান লুকিয়ে রাখার ইচ্ছা ভুলে গিয়ে পিয়ের পিস্তলটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অফিসারের দিকে ছুটে গেল এবং তার সঙ্গে ফরাসীতেই কথা বলল।

"আপনি আঘাত পান নি তো?"

"মনে তো হয় না।" দেয়ালের ভাঙা পলস্তরা দেখিয়ে বলল, "কিন্তু ভাগ্যগুণে আজ খুব বেঁচে গিয়েছি। লোকটি কে?" কঠোর দৃষ্টিতে পিয়েরের দিকে তাকিয়ে অফিসারটি বলল।

নিজের অভিসন্ধির কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে পিয়ের তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "সত্যি, যা ঘটে গেল সেজন্য আমি হতাশ হয়ে পড়েছি। লোকটি এক হতভাগ্য পাগল; ও যে কি করেছে তা নিজেই জানে না।"

অফিসারটি মকার আলেক্সিভিচের কাছে গিয়ে তার কলারটা চেপে ধরল।

মকার আলেক্সিভিচ হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে; দেয়ালে হেলান দিয়ে এমনভাবে ঢুলছে যেন এখনই ঘুমিয়ে পড়বে।

তাকে ছেড়ে দিয়ে ফরাসীটি বলল, "গুণ্ডা! এর দাম তোমাকে দিতে হবে। আমরা ফরাসীরা জয়লাভের পরে দয়া দেখাই, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকদের আমরা ক্ষমা করি না।" তার চোখে বিষণ্ণ মর্যাদার অভিব্যক্তি।

পিয়ের ফরাসীতেই তাকে বার বার অনুরোধ জানাল, অক্ষম মাতালটাকে যেন শাস্তি না দেওয়া হয়। মুখে সেই একই বিষণ্ণতার আভাষ এনে ফরাসীটি নীরবে তার কথাগুলি শুনল, তারপর হঠাৎ হেসে পিয়েরের দিকে মুখ ফেরাল। একটা অতি নাটকীয় ভদ্রতার প্রকাশ ফুটে উঠল তার মুখে; সে হাতটা বাড়িয়ে দিল।

বলল, "আপনি আমার জীবন রক্ষা করেছেন। আপনি ফরাসী?"

একজন ফরাসীর পক্ষে এ অনুমান সন্দেহাতীত। একমাত্র ফরাসীর পক্ষেই কোন মহৎ কাজ করা সম্ভব, আর তার জীবন—১৩শ লাইট রেজিমেণ্টের ক্যাপ্টেন ম. রাম্বালের জীবন—রক্ষা করা নিঃসন্দেহে একটা মহৎ কাজ।

কিন্তু সিদ্ধান্তটি এবং তার উপর প্রতিষ্ঠিত অফিসারের দৃঢ় ধারণাটি যতই সন্দেহাতীত হোক, তার এই ভুল ভাঙিয়ে দেওয়া দরকারী বলেই পিয়েরের মনে হল।

সে তাড়াতাড়ি বলল, "আমি একজন রুশ।"

"ফু, ফু, ফু। ও কথা অন্যদের বলবেন," তার নাকের কাছে আঙুল ঘুরিয়ে অফিসারটি হেসে বলল। "অচিরেই আপনি আমাকে সব কথা বলবেন। একজন সহযোগীর সঙ্গে দেখা হয়ে খুব খুশি হলাম। আচ্ছা, এই লোকটাকে নিয়ে কি করা যায় বলুন তো?" ভাইয়ের মত পিয়েরকে সম্বোধন করে বলল।

শেষ প্রশ্নের জবাবে আর একবার মকার আলেক্সিভিচের পরিচয় দিয়ে পিয়ের জানাল, তাদের আসার ঠিক আগেই এই পাগলা বুড়োটা গুলিভরা পিস্তলটা হাতিয়ে নেয়, তার কাছ থেকে সেটা' ছিনিয়ে নেবার সময় তারা পায় নি; কাজেই একাজের জন্য অফিসার যেন তাকে শাস্তি না দেয়।

ফরাসীটি বুক ফুলিয়ে দুই হাতে একটা গম্ভীর অঙ্গভঙ্গী করল।

"আপনি আমার জীবন রক্ষা করেছেন। আপনি একজন ফরাসী। আপনি বলছেন ওকে ক্ষমা করতে? আপনার প্রার্থনা মঞ্জুর। লোকটাকে এখান থেকে নিয়ে যাও।" তাড়াতাড়ি সোৎসাহে কথাগুলি বলে পিয়েরের হাত ধরে তাকে নিয়ে অফিসার ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

গুলির শব্দ শুনে সৈন্যরা উঠোন থেকে বারান্দায় ছুটে এসেছে; কি হয়েছে শুনে নিয়ে তারা অপরাধীকে শাস্তি দিতে উদ্যত হল, কিন্তু অফিসার

কড়াগলায় তাদের বাধা দিল।

"দরকার হলেই তোমাদের ডাকা হবে," সে বলল।

সৈন্যরা বেরিয়ে গেল। আর্দালিটি ইতিমধ্যেই রান্নাঘরে ঢুকেছিল। সেখান থেকে ফিরে এসে বলল, "ক্যাপ্টেন, রান্নাঘরে ঝোল ও পাঁঠার ঠ্যাং আছে। আপনাকে খেতে দেব কি?"

"হ্যাঁ, আর কিছু মদ," ক্যাপ্টেন জবাব দিল।

অধ্যায়—২৯

ফরাসী অফিসার যখন পিয়েরকে নিয়ে ঘরে ঢুকল তখন পিয়ের আবার ভাবল, সে যে ফরাসী নয়—সেটা তাকে নিশ্চিত করে বলে দেওয়া তার কর্তব্য, কিন্তু অফিসার তার কথায় কানই দিল না। লোকটি এত বিনয়ী, ভদ্র, ভাল মানুষ, এবং তার প্রাণরক্ষা করার জন্য পিয়েরের প্রতি এমন আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ যে পিয়ের তার কথা না রেখে পারল না, তার সঙ্গে গিয়ে বৈঠকখানায় বসল। পিয়ের যখন বার বার বলতে লাগল যে সে ফরাসী নয়, তখন ক্যাপ্টেন খুব অবাক হয়ে গেল; এত বড় একটা সুখ্যাতিকে মানুষ কেমন করে অগ্রাহ্য করতে পারে তা সে বুঝতেই পারল না; যাহোক, সে কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, পিয়ের যদি একান্তই রুশ পরিচয়ে থাকতে চায় তো তাই থাকুক, কিন্তু তার প্রাণ রক্ষার জন্য সে পিয়েরের প্রতি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবে।

পিয়েরের ভাল অথচ নোংরা পোশাক এবং তার আঙুলের আংটির দিকে তাকিয়ে অফিসার বলল, "ফরাসীই হোন আর ছদ্মবেশী রুশ প্রিন্সই হোন, আপনার জন্যই আমি জীবনে বেঁচে আছি, আর তাই আপনার কাছে বন্ধুত্বের প্রস্তাব করছি। অপমান কিংবা উপকার, একজন ফরাসী কোনদিন এর কোনটাই ভোলে না। আপনি আমার বন্ধু হোন। এই আমার একমাত্র বলার কথা।"

অফিসারের কণ্ঠস্বরে, তার মুখের ভাবে ও ভঙ্গীতে এমন সৎস্বভাব ও আভিজাত্য প্রকাশ পেল যে তার হাসির জবাবে ঈষৎ হেসে পিয়ের নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিল।

"৭ই সেপ্টেম্বরের যুদ্ধের জন্য মহাবীর পদকপ্রাপ্ত, ১৩শ লাইট রেজিমেণ্টের ক্যাপ্টেন রাম্বেল," সে আত্মপরিচয় ঘোষণা করল; গোঁফের নীচেকার ঠোঁটদুটি আত্মতুষ্টির অপ্রতিরোধ্য হাসিতে বেঁকে গেল। "এবার আপনি দয়া করে বলবেন কি, একটা পাগলের বুলেট শরীরে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে থাকার পরিবর্তে কার সঙ্গে এমন মধুর আলাপনের সৌভাগ্য আমার হয়েছে?"

পিয়ের জবাবে জানাল, নিজের নামটা সে তাকে বলতে পারছে না;

তারপর মুখ লাল করে একটা নাম খুঁজে নেবার এবং নামটা লুকোবার কারণ সম্পর্কে একটা কিছু বলবার চেষ্টা করতেই ফরাসীটি তাড়াতাড়ি তাকে বাধা দিল।

"আহা, ঠিক আছে! আপনার কারণ আমি বুঝতে পেরেছি। আপনি একজন অফিসার...হয় তো উধ্বর্তন অফিসার। আমাদের বিরুদ্ধে আপনি অস্ত্র ধরেছেন। সেটা আমার দেখার কথা নয়। আমার জীবনের জন্য আমি আপনার কাছে ঋণী। সেটাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আপনার সেবায় আমি সদাপ্রস্তুত। আপনি কি ভদ্র শ্রেণীর?" গলায় একটা প্রশ্নের সুর এনে সেকথা শেষ করল। পিয়ের মাথা নীচু করল। "আপনার নামটি যদি বলেন। আর কিছুই জানতে চাই না। মঁসিয় পিয়ের....চমৎকার! শুধু ওইটুকুই জানতে চাই।"

যখন মাংস ও ওমলেট পরিবেশন করা হল, সামোভার ও ভদ্কা আনা হল, আর সেই সঙ্গে খানিকটা মদ, তখন রাম্বেল পিয়েরকে ডিনারে আমন্ত্রণ জানাল, আর নিজে একটি স্বাস্থ্যবান ক্ষুধার্ত লোকের মত অতিদ্রুত গোগ্রাসে গিলতে লাগল; শক্ত দাঁত দিয়ে চিবুতে চিবুতে অনবরত ঠোঁট চাটতে চাটতে বার বার বলতে লাগল—"চমৎকার! সুস্বাদু!" তার মুখটা লাল হয়ে উঠল, ঘাম ঝরতে লাগল। পিয়েরও ক্ষুধার্ত, সানন্দে ডিনারে যোগ দিল। আর্দালি মোড়েল একটা গরম জলের পাত্র এনে এক বোতল ক্লারেট তার মধ্যে বসিয়ে দিল। পরিতৃপ্তিসহকারে পান-ভোজনের ফলে ক্যাপ্টেন আরও ফূর্তিবাজ হয়ে সারাক্ষণ বক্ বক্ করতে লাগল।

"প্রিয় মঁসিয় পিয়ের, ঐ পাগলাটার হাত থেকে আমাকে বাঁচাবার জন্য আমার কাছে একটা প্রতিশ্রুত মোমবাতি আপনার প্রাপ্য হয়েছে....কি জানেন, আমার দেহে ইতিমধ্যেই অনেক বুলেট ঢুকেছে। এখানে একটা ঢুকেছে ওয়াগ্রামে (সে পার্শ্বদেশ স্পর্শ করল) আর দ্বিতীয়টা স্মোলেনস্ক—এ" —গালের ক্ষতটা দেখাল—"আর এই যে পাটা দেখছেন একেবারেই নড়তে-চড়তে চায় না, এটা ঢুকেছে ৭ই তারিখের লা মস্কোয়ার মহাযুদ্ধে (* ফরাসীরা বরদিনোর যুদ্ধকে বলত 'লা মস্কোয়া')। পবিত্র ঈশ্বর! সে এক চমৎকার ব্যাপার! সেই গোলাগুলির প্রবল বন্যা একটা দেখার মত দৃশ্য। সত্যি বলছি, সেখানে আপনারা আমাদের মহামুস্কিলে ফেলেছিলেন। সে যুদ্ধের জন্য আপনারা গর্ব করতে পারেন। আর আমার কথা যদি বলেন, যদিও সেখান থেকেই আমি কাশিটা বাঁধিয়েছি, তবু সেখানে আরও একবার যেতে আমি প্রস্তুত। সেদৃশ্য যারা দেখে নি তাদের জন্য আমার করুণা হয়।"

"আমি সেখানে ছিলাম," পিয়ের বলল।

"বাঃ, সত্যি? তাহলে তো আরও ভাল! সত্যি, আপনারা সাহসী শত্রু বটে। আমার পাইপের দোহাই, বড় দুর্গটা থেকে লড়াই ভালই

হয়েছিল," ফরাসীটি বলতে লাগল। "তার জন্য আমাকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। তিনবার সেখানে হানা দিয়েছিলাম—আমি যে এখানে বসে আছি এটা যেমন সত্য। সেটাও তেমনই সত্য। তিনবার আমরা কামানের সামনে হাজির হলাম, আর তিনবারই কার্ডবোর্ডের মূর্তির মত পিছু হটে গেলাম। সত্যি, সে বড়ই সুন্দর মঁসিয় পিয়ের! ঈশ্বর সাক্ষী, আপনাদের বোমারুরা খুব ভাল। ছ'বার আমি তাদের খুব কাছে থেকে দেখেছি। চমৎকার লোক! আমাদের 'নেপল্‌সের রাজা' তো সবই জানেন, তিনিও বলে উঠলেন 'সাবাস'! হা, হা! তাহলে আপনিও আমাদের মতই একজন সৈনিক।" একটু থেমে সে হেসে বলল। "খুব ভাল কথা, আরও ভাল কথা মঁসিয় পিয়ের! যুদ্ধে ভয়ংকর....নারী ঘটিত ব্যাপারে...মহাবীর (সে চোখ টিপে হাসল), এই তো ফরাসীদের পরিচয় মঁসিয় পিয়ের, তাই নয় কি?"

ক্যাপ্টেন এতই সরল ও আমুদে মানুষ, এবং নিজেকে নিয়ে এতই তুষ্ট যে খুশি মনে তার দিকে তাকিয়ে পিয়েরও বুঝি চোখ টিপল। সম্ভবত "মহাবীর" কথাটা থেকেই মস্কোর কথা ক্যাপ্টেনের মনে পড়ে গেল।

"ভাল কথা, দয়া করে বলুন তো, মেয়েরা সবাই মস্কো ছেড়ে চলে গেছে একথা কি সত্যি? অদ্ভুত কথা তো! এখানে থাকতে তাদের কিসের ভয়?"

"রুশরা প্যারিসে প্রবেশ করলে কি ফরাসী মহিলারা প্যারিস ছেড়ে চলে যেতেন না?" পিয়ের শুধাল।

"হা, হা, হা!" পিয়েরের কাঁধ চাপড়ে দিয়ে ফরাসীটি মুচ্‌কি হেসে বলল। "কথার মত কথা বটে! প্যারিস?... কিন্তু প্যারিস প্যারিস..."

"প্যারিস—পৃথিবীর রাজধানী," পিয়ের তার কথাটা শেষ করে দিল।

ক্যাপ্টেন পিয়েরের দিকে তাকাল। কথার মাঝখানে থেমে গিয়ে চোখে হাসি ফুটিয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকাটা তার অভ্যাস।

"দেখুন, আপনি যদি না বলে দিতেন যে আপনি রুশ তাহলে আমি বাজি ধরে বলতাম যে আপনি একজন প্যারিসীয়! আপনার মধ্যে সেই জিনিসটি আছে...সেটা যে কি তা ঠিক জানি না, তবে সেই...." গুণের কথাটা বলে সে আবার নিঃশব্দে পিয়েরের দিকে তাকিয়ে রইল।

পিয়ের বলল, "আমি প্যারিসে গিয়েছি। সেখানে তিন বছর কাটিয়েছি।"

"তা বটে, দেখলেই সেটা বোঝা যায়। প্যারিস! যেলোক প্যারিসকে চেনে না সে তো বর্বর। দুই লীগ দূর থেকেও একজন প্যারিসীয়কে দেখে আপনি বলে দিতে পারেন। প্যারিস হচ্ছে তাল্‌মা, লা দুচেনয়, পোতিয়ের, সর্বোন, রাজপথ।" আগের কথার তুলনায় পরের কথাগুলি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে দেখে সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল: "পৃথিবীতে মাত্র একটি প্যারিসই

আছে। প্যারিসে কাটিয়েও আপনি রুশই রয়ে গেছেন। দেখুন সেজন্য আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা একটুও কমে নি!"

পেটে কিছুটা মদ পড়েছে, নানা দুশ্চিন্তায় অনেকগুলি দিনও কেটেছে, তাই এই আমুদে স্বভাবের লোকটির সঙ্গে কথা বলতে পিয়েরের ভালই লাগছে।

"মহিলাদের কথাতেই যাওয়া যাক—শুনেছি তারা খুবই মনোরমা। ফরাসী বাহিনী মস্কোতে এসেছে বলেই তাদের তৃণভূমিতে গিয়ে মাথা গুঁজে থাকতে হবে, এটা বড়ই দুঃখের কথা। মেয়েরা কী সুযোগই না হারালেন! আপনাদের চাষীরা, অবশ্য তাদের কথা আলাদা, কিন্তু আপনাদের মত সভ্য মানুষদের তো আমাদের ভালভাবেই জানা উচিত। ভিয়েনা, বার্লিন, মাদ্রিদ, নেপল্‌স্‌, রোম, ওয়ারস, পৃথিবীর সবগুলি রাজধানী আমরা দখল করেছি...সকলে আমাদের ভয় করে, কিন্তু ভালবাসে। যারা জানে তাদের কাছে আমরা লোক ভাল। তারপর সম্রাট···" এখানে পিয়ের তাকে বাধা দিল।

"সম্রাট," পিয়ের আর একবার কথাটা উচ্চারণ করল, সহসা তার মুখটা বিষণ্ণ ও বিব্রত হয়ে উঠল, "সম্রাটও কি···?"

"সম্রাট? তিনি তো উদারতা, করুণা, ন্যায়, শৃংখলা, প্রতিভার প্রতিমূর্তি —এই তো সম্রাটের পরিচয়! আমি রাম্বেল একথা বলছি···স্থির জানবেন, আট বছর আগে আমি ছিলাম তার শত্রু। আমার বাবা ছিলেন বিদেশ থেকে আগত একজন কাউন্ট।···কিন্তু এই মানুষটি আমাকে জয় করেছেন। তিনি আমাকে হাত করে ফেলেছেন। যে জাঁকজমক ও গৌরব দিয়ে তিনি ফ্রান্সকে মুড়ে দিয়েছেন সেদৃশ্য তো আমি ভুলতে পারি না। যখন বুঝতে পারলাম তিনি কি চান—যখন দেখলাম যে তিনি আমাদের জন্য একটা ফুলের বিছানা পাতার আয়োজন করছেন। তখন নিজেকে বললাম: 'এই তো রাজা,' আর তার সেবায় আত্মনিয়োগ করলাম! বুঝেছেন! হ্যাঁ প্রিয় বন্ধু, অতীত-বর্তমান সর্বযুগের তিনি শ্রেষ্ঠ পুরুষ।"

অপরাধীর ভঙ্গীতে তাকিয়ে পিয়ের তো-তো করে বলল, "তিনি কি মস্কো এসেছেন?"

ফরাসীটি তার অপরাধীসুলভ মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল।

"না, তিনি কাল আসবেন," বলে সে আবার নিজের কথায় ফিরে গেল।

কটকে কিছু লোকের চেঁচামেচিতে তাদের কথায় বাধা পড়ল। মোরেল এসে জানাল, কিছু উর্তেম্‌বের্গ হুজার এসে এ-বাড়ির উঠোনে ঘোড়া রাখতে চাইছে। এই গোলযোগটি দেখা দিয়েছে তার কারণ ফরাসীতে তাদের যা বলা হয়েছে হুজাররা তা বুঝতে পারে নি।

ক্যাপ্টেন তাদের বড় সার্জেন্টকে ডেকে এনে কড়া গলায় জিজ্ঞাসা করল, সে কোন্ রেজিমেন্টের লোক, তার কম্যাণ্ডিং অফিসার কে, আর কোন্ অধিকারে পূর্বেই দখল-করা একটা বাসা বেদখল করতে সে এসেছে। জার্মানটি ফরাসী ভাষা যৎসামান্য জানে; প্রথম দুটি প্রশ্নের জবাবে রেজিমেণ্টের নাম ও কম্যাণ্ডিং অফিসারের নাম বলে দিল, কিন্তু তৃতীয় প্রশ্নটি ঠিক-ঠিক বুঝতে না পেরে নিজের জার্মান ভাষার সঙ্গে ভাঙা-ভাঙা ফরাসী মিশিয়ে বলল যে সে তার রেজিমেণ্টের কোয়ার্টার-মাস্টার, আর তার কম্যাণ্ডারই একটার পর একটা বাড়ি দখল করার হুকুম দিয়েছে। পিয়ের জার্মান ভাষা জানে; সে জার্মানটির কথা ভাষান্তর করে ক্যাপ্টেনকে শোনাল, আর ক্যাপ্টেনের জবাব জার্মান ভাষায় উটেম্‌বের্গ হুজারকে শুনিয়ে দিল। প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পেরে জার্মানটি নতি স্বীকার করে তার সৈন্যদের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গেল। ক্যাপ্টেন বারান্দায় বেরিয়ে হাঁক দিয়ে কিছু হুকুম জারি করল।

ঘরে ফিরে এসে দেখল দুই হাতের মধ্যে মাথা রেখে পিয়ের সেই একই জায়গায় বসে আছে। তার মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন। সেইমুহূর্তে সত্যি সে যন্ত্রণাক্লিষ্ট। ক্যাপ্টেন বেরিয়ে গেলে সে যখন ঘরের মধ্যে একা, তখন হঠাৎ সে যেন নিজেকে ফিরে পেল, নিজের অবস্থা বুঝতে পারল। মস্কো বেদখল হয়েছে, আনন্দিত বিজয়ী পক্ষ মস্কোর প্রভু হয়ে বসেছে এবং তার উপর মাতব্বরী করছে, আসল কথা সেটা নয়। সে অবস্থাটাও বেদনাদায়ক, তবু এই মুহূর্তে পিয়েরের যন্ত্রণার কারণ সেটা নয়। নিজের দুর্বলতার বোধই তাকে কষ্ট দিচ্ছে। যে 'গভীর বিষণ্ণতার মধ্যে তার বিগত দিনগুলি কেটেছে, তার পরিকল্পনামত কাজ হাসিল করার পক্ষে যে বিষণ্ণতা একান্ত প্রয়োজন, কয়েকপাত্র মদ আর এই সৎস্বভাবের মানুষটির সঙ্গে আলোচনা তার মন থেকে সেই বিষণ্ণতাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। পিস্তল, ছুরি ও চাষীর কোট প্রস্তুত। পরদিনই নেপোলিয়ন শহরে ঢুকবে। পিয়ের এখনও মনে করে যে এই দুষ্কৃতকারীকে হত্যা করা দরকার, করা উচিত, কিন্তু এখন তার মনে হচ্ছে যে সেকাজ সে করতে পারবে না। কেন তা সে জানে না, কিন্তু কেমন একটা আভাষ সে পেয়েছে যে অভিপ্রায় মত কাজটি সে করবে না। এই দুর্বলতা স্বীকার করতে তার বাঁধছে, কিন্তু অস্পষ্টভাবে বুঝতে পারছে যে এই দুর্বলতাকে জয় করতে সে পারবে না; প্রতিহিংসা, হত্যা ও আত্মোৎসর্গের যে মানসিক বিষণ্ণতা তাকে পেয়ে বসেছিল, প্রথম মানুষটির সঙ্গে সাক্ষাৎ-কারের ফলেই তা ধুলোর মত মিলিয়ে গেছে।

ঈষৎ খোঁড়াতে খোঁড়াতে একটা শিস দিতে দিতে ক্যাপ্টেন ঘরের মধ্যে ঢুকল।

ফরাসী লোকটির যে বকবকানি শুনে এতক্ষণ সে মজা পাচ্ছিল, এখন

তাতে তার বিরক্তি দেখা দিল। তার শিস, চালচলনে, গোঁফে চাড়া দেবার ভঙ্গী, সবই আপত্তিকর মনে হতে লাগল। "আমি এখনই চলে যাব, তার সঙ্গে আর একটি কথাও বলব না," পিয়ের ভাবল। একথা ভাবলেও সে কিন্তু সেখানেই বসে রইল। একটা আশ্চর্য দুর্বলতা তাকে যেন সেখানে বেঁধে রেখেছে; উঠে চলে যেতে চাইল, কিন্তু পারল না।

অপরদিকে ক্যাপ্টেন তখন খুব খুশি। দু'বার সে ঘরময় পায়চারি করল। যেন কোন চিন্তায় বেশ মজা পেয়েছে এমনিভাবে চোখ দুটি চকচক করছে, গোঁফটা হাসিতে বেঁকে যাচ্ছে।

হঠাৎ সে বলে উঠল, "ঐ উর্তেম্‌বের্গারদের কর্ণেলটি খুব মজার লোক। লোকটি জার্মান, কিন্তু তবু বেশ ভাল লোক। ...কিন্তু জার্মান তো।" পিয়েরের দিকে মুখ করে বসে বলল, "ভাল কথা, আপনি তাহলে জার্মান ভাষা জানেন?"

পিয়ের নীরবে তার দিকে তাকাল।

"আচ্ছা, 'আশ্রয়'-এর জার্মান প্রতিশব্দ কি?"

পিয়ের বলল, "আশ্রয়? ওটার জার্মান প্রতিশব্দ unterkunft."

"কিভাবে কথাটা উচ্চারণ করেন?" সন্দিগ্ধ গলায় ক্যাপ্টেন তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করল।

"Unterkunft," পিয়ের পুনরায় বলল।

"ওন্তেরকফ," বলে হাসি-হাসি চোখে ক্যাপ্টেন কয়েক সেকেণ্ড পিয়েরের দিকে তাকিয়ে রইল। "এই জার্মানরা পাক্কা বুদ্ধু, আপনিও কি তাই মনে করেন না মঁসিয় পিয়ের?"

তারপরেই খুশি মনে বলল, "আচ্ছা, বরং এই মস্কো বোর্দ্‌' আর এক বোতল নেওয়া যাক। শরীরটা গরম করতে মোরেল আর একটা ছোট বোতল অবশ্যই দেবে। মোরেল!" সে হাঁক দিল।

মোরেল একটা মোমবাতি ও মদের বোতল এনে দিল। মোমবাতির আলোয় পিয়েরের দিকে তাকিয়ে তার মুখের বিপর্যস্ত ভাব দেখে ক্যাপ্টেন বিস্মিত হল। আন্তরিক সহানুভূতির সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে রাম্বেল তার উপর ঝুঁকে দাঁড়াল।

পিয়েরের হাতটা ছুঁয়ে বলল, "এই যে, আমরা এখনও বিষন্ন। আমি কি আপনাকে বিচলিত করেছি? না, সত্যি আমার বিরুদ্ধে আপনার কিছু বলার আছে কি? হয়তো বর্তমান পরিস্থিতিই এরজন্য দায়ী।"

পিয়ের জবাব দিল না, সাদর দৃষ্টিতে ফরাসীটির চোখে চোখ রাখল; তার সহানুভূতিপূর্ণ চাউনি তাকে খুশি করেছে।

"সত্যি বলতে কি, আমার ঋণের কথা না তুলেও বলতে পারি, আপনাকে আমি বন্ধু বলেই মনে করি। আপনার জন্য কি করতে পারি বলুন? এটা

জীবন-মরণের সম্পর্ক। বুকে হাত রেখে একথা বলছি," বুকে আঘাত করে সে বলল।

"আপনাকে ধন্যবাদ," পিয়ের বলল।

তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ক্যাপ্টেনের মুখটা হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

"সেক্ষেত্রে আমাদের বন্ধুত্বের জন্য পান করছি," খুশিমনে দুটি গ্লাসে মদ ঢেলে সে চেঁচিয়ে বলল।

পিয়ের একটা গ্লাস হাতে নিয়ে সেটা খালি করে ফেলল। রাম্বেলও তার গ্লাসটা খালি করে আবার পিয়েরের হাতে চাপ দিল; টেবিলের উপর কনুই রেখে বিষণ্ণ ভঙ্গীতে বসে রইল।

তারপর বলতে শুরু করল, "হ্যাঁ প্রিয় বন্ধু, ভাগ্যের এমনি খেয়ালীপনা। কে বলতে পারত যে আমি একদিন সৈনিক হব, বোনাপার্তের অধীনে একটা অশ্বারোহী বাহিনীর ক্যাপ্টেন হব? অথচ আমি তারই সঙ্গে মস্কো এসেছি। আপনাকে বলা দরকার বন্ধু যে আমাদের বংশ ফ্রান্সের অন্যতম প্রাচীন বংশ।"

ফরাসীসুলভ সহজ, সরল, দিলখোলাভাবে ক্যাপ্টেন পিয়েরকে শোনাল তার পূর্বপুরুষ, তার শৈশব, যৌবন ও পরিণত জীবনের কথা, তার আত্মীয়-স্বজন এবং আর্থিক ও পারিবারিক অবস্থার কথা।

"কিন্তু এসবই তো জীবনের পরিবেশ, আসল কথা তো ভালবাসা—ভালবাসা। ঠিক বলি নি মঁসিয় পিয়ের?" ক্রমেই সে উত্তেজিত হয়ে উঠছে। "আর এক গ্লাস দেব?"

পিয়ের আবারও গ্লাসটা খালি করে তৃতীয়বার ভরে নিল।

চকচকে চোখে পিয়েরের দিকে তাকিয়ে ক্যাপ্টেন তার ভালবাসার কাহিনী বলতে শুরু করল, "আঃ, নারী, নারী!"

অফিসারটির সুদর্শন আত্মতৃপ্ত মুখ দেখে এবং যে সাগ্রহ উৎসাহ নিয়ে সে নারীঘটিত ব্যাপার বলতে শুরু করল তা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে এধরনের ব্যাপারের কিছু ঘাটতি ছিল না। ভালবাসার যে ইন্দ্রিয়জ বৈশিষ্ট্য-কে ফরাসীরা ভালবাসার বিশেষ আকর্ষণ ও কাব্যময়তা বলে মনে করে যদিও তার কোন অভাব রাম্বেলের ভালবাসার গল্পগুলিতে ছিল না, তবু তার কাহিনীকে এমন দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে সে বলতে লাগল যেন একমাত্র সেই ভালবাসার অভিজ্ঞতা লাভ করেছে এবং তার আকর্ষণকে অনুভব করেছে। তাছাড়া, এমন আকর্ষণীয় করে সে নারীর বর্ণনা দিতে লাগল যে পিয়ের আগ্রহের সঙ্গেই তার সব কথা শুনতে লাগল।

একটা কথা পরিষ্কার—যে প্রেম ফরাসীদের এত প্রিয় সেটা একদিকে যেমন সেই নীচ, সরল অনুভূতি নয় যা একসময় পিয়ের তার স্ত্রীর প্রতি অনুভব

করত, আবার অন্যদিকে সেই রোমান্টিক ভালবাসাও নয় যা সে নাতাশার বেলায় অনুভব করেছে; যে প্রেমকে ফরাসীরা পূজা করে তা হচ্ছে প্রধানত নারীর প্রতি একটা অস্বাভাবিক সম্পর্ক এবং পরস্পরবিরোধী অনুভূতির এমন একটা সঙ্গম যা প্রেমকে করে তোলে মোহময়।

তাই ক্যাপ্টেন অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে পঁয়ত্রিশ বছর বয়স্কা মার্কুইস-পত্নীর প্রতি ভালবাসার কাহিনী বলল। আবার তারই নিষ্পাপ ষোড়শী কন্যার প্রতি ভাবাসার কাহিনীও শোনাল। মাতা ও কন্যার মধ্যে উদারতার দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত যেভাবে মা নিজে ত্যাগ স্বীকার করে মেয়েকে তার সঙ্গে বিয়ে দিল সেকথা দূর অতীতের স্মৃতি হলেও আজও তা ক্যাপ্টেনকে শিহরিত করে তুলল। তারপর সে এমন একটি ঘটনা বলল যেখানে স্বামী নিয়েছিল প্রেমিকের ভূমিকা আর সে—অর্থাৎ প্রেমিক—নিয়েছিল স্বামীর ভূমিকা; তাছাড়া যে জার্মেনিতে "আশ্রয়" কে বলে Unter kunft এবং যেখানে স্বামীরা খায় "সোরক্রোত্" (বাঁধাকপির ঝোল) আর তরুণীরা হয় "অতি সুন্দরী" সেই দেশের স্মৃতি থেকে বেশ কয়েকটি মজার গল্পও শোনাল।

অবশেষে দ্রুত অঙ্গভঙ্গী সহকারে জ্বলজ্বলে মুখে পোল্যাণ্ডের সেই সাম্প্রতিক কাহিনীটি সে বলে গেল যা আজও ক্যাপ্টেনের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে: সে জনৈক পোলের জীবন রক্ষা করলে সেই পোল নিজে যুদ্ধের চাকরি নিয়ে চলে যাবার সময় মোহময়ী স্ত্রীকে রেখে গেল তারই আশ্রয়ে। ক্যাপ্টেনের সুখের অন্ত নেই, মোহিনী পোলিশ মহিলা তার সঙ্গেই পালিয়ে যেতে চাইল, কিন্তু উদারতার অনুপ্রেরণায় ক্যাপ্টেন স্ত্রীকে স্বামীর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলল: "আমি আপনার জীবন রক্ষা করেছি, এবার আপনার সম্মান রক্ষা করলাম!" কথাগুলি বলে ক্যাপ্টেন চোখ মুছল, একবার কেঁপে উঠল, যেন এই মর্মস্পর্শী স্মৃতির ফলে তার মনে যে দুর্বলতা জেগেছে তাকেই দূর করে দিল।

একটু রাত হলে মদের প্রভাবে প্রায়ই যেমনটি হয়ে থাকে, পিয়ের বেশ মনোযোগ দিয়ে ক্যাপ্টেনের কাহিনীগুলি শুনল, সবই বুঝতেও পারল, আর কেন কে জানে সহসা নিজের স্মৃতিগুলো একের পর এক তার মনের সামনে ভিড় করে এল। এইসব ভালবাসার গল্প শুনতে শুনতে অপ্রত্যাশিতভাবে নাতাশার প্রতি ভালবাসার কথা তার মনে পড়ে গেল; কল্পনায় সেই ভালবাসার ছবিগুলোকে সে রাম্বেলের কাহিনীর সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে লাগল। ভালবাসা ও কর্তব্যের সংঘাতের কাহিনী শুনতে শুনতে পিয়ের যেন চোখের সামনে দেখতে পেল সুখারেভ জল-গম্বুজের নীচে প্রেমিকার সঙ্গে তার শেষ সাক্ষাতের বিস্তারিত দৃশ্যাবলী। সাক্ষাতের সময়ে কিন্তু তার মনে কোন প্রভাব পড়ে নি,—সেসব কথা সে একবারও মনে করে নি। অথচ এখন তার মনে হচ্ছে সেই সাক্ষাতের মধ্যে অত্যন্ত গুরুতর ও কাব্যময়

কিছু ছিল।

"পিতর কিরিলভিচ, এখানে আসুন! আমরা আপনাকেচিনতে পেরেছি", এই মুহূর্তে যেন সেই কথাগুলি সে শুনতে পাচ্ছে, চোখের সামনে তাকে দেখতে পাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছে তার চোখ, তার হাসি, তার ভ্রমণসঙ্গী ওড়না, তার একগুচ্ছ কুন্তল"""তার মনে হল এসব কিছুই যেন বিষণ্ণতা দিয়ে মোড়া।

মোহিনী পোলিশ মহিলার কাহিনী শেষ করে ক্যাপ্টেন জানতে চাইল, প্রেমের জন্য ত্যাগস্বীকার এবং প্রকৃত স্বামীর ঈর্ষার কোন অভিজ্ঞতা কোনদিন পিয়েরের হয়েছে কি না।

এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পিয়ের মাথাটা তুলল, নিজের মনের কথা প্রকাশ করবার একটা প্রয়োজনীয়তা বোধ করল। বলতে লাগল, নারীর প্রতি ভালবাসাকে সে বোঝে স্বতন্ত্রভাবে। বলল, সারাজীবন যে একটিমাত্র নারীকেই ভালবেসেছে এবং এখনও ভালবাসে, আর সে নারী কখনও তার হবে না।

ক্যাপ্টেন বলল, "Tiens !"

পিয়ের তখন বুঝিয়ে বলল, এই নারীকে সে প্রথম জীবনেই ভালবাসত, কিন্তু তখন সে তার কথা ভাবতেও সাহস করত না, কারণ সে নারী তখন ছিল খুবই ছোট, আর সে নিজেও তখন ছিল নামগোত্রহীন এক অবৈধ সন্তান। তারপর বংশ-মর্যাদা ও সম্পত্তি লাভের পরেও তার কথা ভাবতে সাহস করল না, কারণ তাকে সে বড় বেশী ভালবাসত, তাকে স্থান দিয়েছিল পৃথিবীর সব কিছুর উপরে, বিশেষ করে নিজেরও উপরে।

এই পর্যন্ত বলে পিয়ের ক্যাপ্টেনকে শুধাল, ব্যাপারটা সে বুঝতে পেরেছে কি না।

ক্যাপ্টেন এমন একটা ভঙ্গী করল যার অর্থ—সে বুঝুক আর নাই বুঝুক, পিয়ের তার কাহিনী চালিয়ে যাক।

"আধ্যাত্মিক প্রেম, মেঘের মত…" সে তো-তো করে বলল।

মদের প্রভাবে হোক, অথবা খোলাখুলি বলার ঝোঁকে হোক, বা এই লোকটি যে তার কাহিনীর নায়ক-নায়িকাদের জানে না এবং কোনদিন জানবেও না এই চিন্তার ফলেই হোক, অথবা এসব কিছু মিলিয়েই হোক, একটা কিছু পিয়েরের জিভকে খুলে দিয়েছে। বহু দূরে দৃষ্টিকে প্রসারিত করে সে তার জীবনের সমগ্র কাহিনী বলতে লাগল: তার বিয়ে, তার ঘনিষ্ঠতম বন্ধুর প্রতি নাতাশার ভালবাসা, তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, এবং তার সঙ্গে তার নিজের সরল সম্পর্কের কথা। রাম্বেলের নানা প্রশ্নের জবাবে যেকথা প্রথম লুকিয়েছিল তাও বলে ফেলল—নিজের পদমর্যাদা, এমন কি নামটা পর্যন্ত।

পিয়েরের কাহিনীর মধ্যে যা ক্যাপ্টেনকে সব চাইতে বেশী মুগ্ধ করল তা

হল—পিয়ের খুব ধনী, মস্কোতে তার দুটো প্রাসাদোপম বাড়ি আছে, সে সব কিছু ছেড়েছে কিন্তু শহর ছাড়ে নি, নাম ও বাসস্থান লুকিয়ে সেখানেই থেকে গেছে।

অনেক রাত হলে দুজন একসঙ্গে পথে বেড়িয়ে এল। রাতটা আতপ্ত ও হাল্কা। পক্রোভ্‌কার উপরে বাঁ দিকের বাড়িটায় আগুন জ্বলছে—মস্কোতে এই প্রথম আগুনের সূত্রপাত। ডানদিকে আকাশের বুকে কাস্তের মত ক্ষীয়মান চাঁদ, তার বিপরীতদিকে ঝুলে পড়েছে সেই উজ্জ্বল ধূমকেতুটি যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে পিয়েরের অন্তরের ভালবাসা। গেরাসিম, রাঁধুনি ও দুটি ফরাসী সৈনিক ফটকে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের হাসি, দুটি ভিন্ন ভাষায় পরস্পরের কাছে দুর্বোধ্য ভাষায় তাদের কথাবার্তা কানে আসছে। শহরের আলোর আভার দিকে তারা তাকিয়ে আছে।

এত বড় শহরে অনেক দূরের একটিমাত্র ছোটখাট অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে ভয়ের কিছু থাকতে পারে না।

অনেক উপরের নক্ষত্রখচিত আকাশ, চাঁদ, ধূমকেতু ও আগুনের আভার দিকে তাকিয়ে পিয়েরের মন আনন্দের আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। "এই তো, এই তো ভাল, এর বেশী আর কি চাই?" সে ভাবল। সহসা নিজের অভিপ্রায়ের কথা মনে পড়ায় তার মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করে উঠল, এত দুর্বল লাগল যে পড়ে যাওয়া থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য সে বেড়াটার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল।

নতুন বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় না নিয়েই অস্থির পদক্ষেপে ফটক ছেড়ে নিজের ঘরে চলে গেল; সোফায় শুয়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল।

অধ্যায়—৩০

২রা সেপ্টেম্বর যে প্রথম অগ্নিকাণ্ডটি শুরু হল পলাতক মস্কোবাসীরা এবং পশ্চাদপসরণকারী সৈনিকরা ভিন্ন ভিন্ন পথ থেকে বিভিন্ন মনোভাব নিয়ে সেটা দেখতে দেখতে চলল।

রস্তভ পরিবার সে রাতটা কাটাল মস্কোর চোদ্দ মাইল দূরবর্তী মিতিশ্‌চিতে। ১লা সেপ্টেম্বর এত দেরি করে তারা যাত্রা করল, গাড়ি-ঘোড়া ও সৈন্যরা এমনভাবে পথঘাট আটকে রেখেছে, এতবেশী জিনিসপত্র ভুল করে ফেলে আসার দরুণ চাকরদের আবার ফেরৎ পাঠাতে হল, তারা স্থির করল মস্কো থেকে তিন মাইল দূরের একটা জায়গায় রাত কাটাবে। পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল দেরিতে, আর পথেও বারবার এমন বিলম্ব ঘটতে লাগল যে তারা মাত্র বড় মিতিশ্‌চি পর্যন্তই পৌঁছতে পারল। সেদিন সন্ধ্যা দশটায় রস্তভ পরিবারের লোকজন এবং তাদের সঙ্গে ভ্রমণরত আহতদের সেই বড় গ্রামটার উঠোনে ও বাড়িতে আশ্রয় দেওয়া হল। রস্তভ পরিবারের

চাকর ও কোচয়ান এবং আহত অফিসারদের আর্দালিরা মনিবদের সেবা-শুশ্রূষা শেষ করে রাতের খাবার খেল, ঘোড়াগুলোকে দানাপানি দিল, তারপর বারান্দায় বেরিয়ে এল।

পার্শ্ববর্তী একটা কুটিরে ভাঙা কব্জি নিয়ে শুয়েছিল রায়েভ্স্কির অ্যাড্জুটান্ট। তীব্র যন্ত্রণায় সে করুণস্বরে অনবরত আর্তনাদ করছে; হেমন্ত রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে সে আর্তনাদ ভয়ংকর হয়ে বাজতে লাগল। প্রথম রাতটা সে রস্তভদের সঙ্গে একই উঠোনে কাটিয়েছে। কাউণ্টেস বলল, তার কাতরানির শব্দে সে চোখের পাতা বুজতে পারে নি। তাই আহত লোকটির কাছ থেকে দূরে থাকবার জন্য কাউণ্টেস মিতিশ্চিতে আরও খারাপ একটা কুটিরে উঠে গেল।

রাতের অন্ধকারে একটি চাকরের নজড়ে পড়ল, বারান্দার সামনে দাঁড়ানো একটা উঁচু গাড়ির মাথার উপরে আর একটা আগুনের আভা দেখা যাচ্ছে। একটা আভা অনেক আগে থেকেই চোখে পড়ছিল; সকলেই জানত ছোট মিতশ্চি পুড়ছে—মামোনভের কসাকরা সেখানে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

"দেখ, দেখ ভাইসব, ওই আর একটা আগুন!" জনৈক আর্দালি বলে উঠল।

সকলেরই দৃষ্টি সেই আগুনের দিকে পড়ল।

"কিন্তু ওরা তো বলল মামোনভের কসাকরা ছোট মিতিশ্চিতে আগুন লাগিয়েছে।"

"কিন্তু ওটা তো মিতিশ্চি নয়, সেখান থেকে অনেক দূরে।"

"দেখ, দেখ, মনে হচ্ছে ওটা নির্ঘাৎ মস্কো!"

যারা দেখছিল তাদের দুজন ঘুরে গাড়ির অপর পাশে গিয়ে পাদানিতে বসে পড়ল।

"এটা তো আরও খানিকটা বাঁদিকে; আরে, ছোট মিতিশ্চি তো ওই দূরে, এটা তো ঠিক তার বিপরীত দিকে।"

আরও কয়েকজন এসে প্রথম দুজনের সঙ্গে যোগ দিল।

একজন বলল, "কি রকম জ্বলছে দেখ। আগুনটা লেগেছে মস্কোতে, হয় সুশ্চেভ্স্কি নয় তো রঘোঝ্স্কি অঞ্চলে।"

একথার কোন জবাব কেউ দিল না; বেশ কিছু সময় সকলেই নীরবে অনেক দূরের সেই দ্বিতীয় অগ্নিকাণ্ডের লেলিহান শিখার দিকে তাকিয়ে রইল।

কাউণ্টের খানসামা বুড়ো দানিয়েল তেরেন্তিচ সেখানে এসে মিশ্কাকে লক্ষ্য করে চেঁচিয়ে উঠল।

"হা করে কি দেখছ অকর্মার ধাড়ি⋯? কাউণ্ট তো ডাকতে পারেন, আর সেখানে কেউ নেই; যাও, পোশাক-পত্তরগুলো গুছিয়ে নাও।"

মিশ্‌কা বলল, "আমি তো ছুটে এসেছি জল নিতে।"

জনৈক পরিচারক বলল, "তুমি কি মনে কর দানিয়েল তেরেন্তিচ? আগুনটা মস্কোতে বলে মনে হচ্ছে না?"

দানিয়েল তেরেন্তিচ জবাব দিল না। আবার অনেকক্ষণ পর্যন্ত সবলেই চুপচাপ। আগুনের আভা ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে, কখনও উঠছে কখনও পড়ছে, ক্রমেই দূর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

আর একজন বলল, "ঈশ্বর দয়া করুন···কী বাতাস, আর সবই তো শুকনো··· ।"

"ওদিকে দেখ! কী কাণ্ডকারখানাই চলছে। হে প্রভু! ঐ যে দেখতে পাচ্ছ কাকগুলিও উড়ে পালাচ্ছে। প্রভু পাপীদের করুণা করুন!"

"ওরা আগুন নিভিয়ে ফেলবে। কোন ভয় নেই!"

"কে নেভাবে?" এতক্ষণ চুপ করে থেকে এবার দানিয়েল তেরেন্তিচ বলল। তার কণ্ঠস্বর শান্ত, বিবেচক। "ভাইসব, ওই তো মস্কো···জননী মস্কো, তার সাদা···" তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল; শোনা গেল একটি বৃদ্ধের চাপা কান্না।

ঐ আগুনের আভার তাৎপর্য বুঝবার জন্য তারা সকলেই যেন এরজন্যই অপেক্ষা করে ছিল। দীর্ঘশ্বাস, প্রার্থনার বাণী, আর কাউণ্টের বুড়ো খানসামার চাপা কান্না শোনা যেতে লাগল।

অধ্যায়—৩১

কুটিরে ফিরে গিয়ে খানসামা কাউণ্টকে জানাল, মস্কো জ্বলছে। ড্রেসিং-গাউনটা গায়ে চড়িয়ে কাউণ্ট বাইরে গেল দেখতে। সোনিয়া ও মাদাম শোস্‌ তখনও পোশাক ছাড়ে নি; তারাও সঙ্গে গেল। শুধু নাতাশা ও কাউণ্টেস ঘরে রইল। পেত্‌য়া পরিবারের সঙ্গে নেই; সে এখন রেজিমেণ্টের সঙ্গে ত্রয়েত্সার পথে।

মস্কোতে আগুন জ্বলছে শুনে কাউণ্টেস কাঁদতে শুরু করল। নাতাশা বিবর্ণ মুখে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বেঞ্চিতেই বসে রইল, বাবার কথায় কানই দিল না। তিনটে বাড়ি দূরে অ্যাডজুটাণ্টের অবিশ্রাম আর্তনাদই সে শুনছে।

শীতার্ত, ভীত হয়ে উঠোন থেকে ফিরে এসে সোনিয়া বলল, "ওঃ, কী ভয়ঙ্কর। আগুনের আভা এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে মনে হচ্ছে গোটা মস্কোই পুড়বে! নাতাশা, চেয়ে দেখ! এখন জানালা থেকেই দেখতে পাবে।"

কিন্তু নাতাশা এমনভাবে তার দিকে তাকাল যেন কিছুই বুঝতে পারে নি; ঘরের কোণের স্টোভটার দিকেই তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। যে কারণেই হোক সোনিয়া সকালেই নাতাশাকে বলে দিয়েছে যে প্রিন্স আন্‌দ্রু আহত অবস্থায়

তাদের সঙ্গেই যাচ্ছে; সেই থেকেই নাতাশা কেমন যেন অর্ধচেতন অবস্থায় আছে। ওদিকে কাউন্টেস সোনিয়ার উপর ভীষণ রেগে গেছে। সোনিয়া কাঁদতে কাঁদতে তার কাছে ক্ষমা চেয়েছে এবং যেন সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতেই এখন সে দিদির প্রতি অখণ্ড মনোযোগ দিচ্ছে।

সে বলল, "দেখ নাতাশা, কী ভয়ঙ্করভাবে আগুন জ্বলছে!"

"কি জ্বলছে?" নাতাশা শুধাল। "ওঃ, হ্যাঁ, মস্কো।"

সোনিয়া পাছে দুঃখ পায় তাই সে জানালার দিকে মুখটা ফেরাল, এমনভাবে মুখটা বাড়াল যে কিছুই দেখতে পেল না, তারপর আবার আগের মতই বসে পড়ল।

"কিন্তু তুমি তো কিছুই দেখলে না!"

"হ্যাঁ, ঠিক দেখেছি," নাতাশা জবাব দিল।

কাউন্টেস ও সোনিয়া দুজনই বুঝতে পারল যে এখন নাতাশার কাছে মস্কো, বা মস্কোর অগ্নিকাণ্ড, বা অন্য কোন কিছুরই কোন গুরুত্ব নেই।

কাউন্ট ফিরে এসে বেড়ার ওপাশে শুয়ে পড়ল। কাউন্টেস মেয়ের কাছে এগিয়ে গেল, তার অসুখ করলে যেরকম করে থাকে সেইভাবে হাতের পিঠটা দিয়ে নাতাশার মাথাটা স্পর্শ করল, জ্বর হয়েছে কি না বুঝবার জন্য তার কপালে ঠোঁট ছোঁয়াল, শেষ পর্যন্ত তাকে চুমো খেল।

বলল, "তুমি যে ঠাণ্ডা হয়ে গেছ। তোমার সারা শরীর কাঁপছে। তুমি বরং শুয়ে পড় গে।"

"শুয়ে পড়ব? ঠিক আছে, শুয়ে পড়ব। এখনই শুয়ে পড়ব," নাতাশা বলল।

গুরুতর আহত অবস্থায় প্রিন্স আন্দ্রু তাদের দলের সঙ্গেই যাচ্ছে—সকালে একথা শোনার পরেই নাতাশার মনে অনেক প্রশ্ন জেগেছিল: সে কোথায় যাচ্ছিল? কেমন করে আহত হল? আঘাত কি গুরুতর? সে কি তাকে একবার দেখতে পারে না? কিন্তু তাকে যখন বলা হল যে সে প্রিন্স আন্দ্রুকে দেখতে পাবে না, তার আঘাত গুরুতর, কিন্তু জীবনের কোন আশংকা নেই, তখন সে প্রশ্ন করা ছেড়ে দিল, কথা বলা বন্ধ করল; অপরের কোন কথাতেই তার বিশ্বাস নেই; তার ধারণা হল সে যত যাই বলুক ওই একই জবাব তাকে শুনতে হবে। সারা পথ সে গাড়ির এক কোণে চোখ বড় বড় করে নিশ্চুপ হয়ে বসে রইল। মনে মনে সে একটা মতলব আঁটছে, একটা কিছু করার সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে, অথবা নিয়ে ফেলেছে। কাউন্টেস মেয়ের হাবভাব ভালই জানে; কিন্তু তার মতলবটা যে কি সেটা না জানায় আরও শঙ্কিত হয়ে যন্ত্রণা পেতে লাগল।

"নাতাশা, লক্ষ্মী মেয়ে, পোশাক ছেড়ে ফেল; আমার বিছানায়ই শুয়ে পড়।"

খাটে কেবল কাউন্টেসের জন্যই বিছানা পাতা হয়েছে। মাদাম শোস্

দুটি মেয়েকে নিয়ে মেঝেতে খড়ের উপর শোবে।

"না মামণি, আমি এখানে মেঝেতেই শোব," বিরক্ত হয়ে জবাব দিয়ে নাতাশা জানালার কাছে গিয়ে সেটা খুলে দিল। খোলা জানালা দিয়ে অ্যাডজুটাণ্টটির আর্তনাদ আরও স্পষ্ট হয়ে কানে আসছে। রাতের ঠাণ্ডা বাতাসে সে মাথাটা বাড়িয়ে দিল। কাউণ্টেস দেখল, তার সরু গলাটা চাপা কান্নার আবেগে কাঁপছে, জানালার ফ্রেমের উপর দপ্‌ দপ্‌ করছে। নাতাশা জানে এ আর্তনাদ প্রিন্স আন্দ্রুর নয়; সে আছে তাদের একই উঠোনের মধ্যে বারান্দার ওপাশের একটা ঘরের একাংশে। কিন্তু এই অবিশ্রাম ভয়ঙ্কর আর্তনাদ শুনে তার কান্না পাচ্ছে। কাউণ্টেস ও সোনিয়া দৃষ্টি-বিনিময় করল।

আস্তে নাতাশার কাঁধে হাত রেখে কাউণ্টেস বলল, "শুয়ে পড় লক্ষ্মীটি; শুয়ে পড় সোনা। এস, শোবে এস।"

"ওঃ, হ্যাঁ····এখনই শুয়ে পড়ব," বলে নাতাশা তাড়াতাড়ি পোশাক ছাড়তে লাগল।

পোশাক ছেড়ে ড্রেসিং-জ্যাকেটটা পরে মেঝের বিছানায় বসে সে চুল বাঁধতে লাগল। অভ্যস্ত আঙুল চালিয়ে চুল বাঁধা শেষ করে সে খড়ের উপর পাতা চাদরের উপর শুয়ে পড়ল দরজার দিকটাতে।

সোনিয়া বলল, "নাতাশা, তুমি বরং মাঝখানে শোও।"

নাতাশা বলল, "আমি এখানেই থাকব। তুমি শুয়ে পড়।" সে বালিশে মুখ ঢাকল।

কাউণ্টেস, মাদাম শোস্‌ এবং সোনিয়াও তাড়াতাড়ি পোশাক ছেড়ে শুয়ে পড়ল। দেবমূর্তির সামনেকার বাতিটাই ঘরের একমাত্র আলো। কিন্তু উঠোনে এসে পড়েছে মাইল দেড়েক দূরের ছোট মিতিশ্‌চির আগুনের আলো; মামোনভের কসাকরা পথের উপর যে মদের আড্ডা বসিয়েছে সেখান থেকে ভেসে আসছে লোকজনের হল্লার শব্দ; অ্যাডজুটাণ্টের অবিশ্রাম আর্তনাদ তখনও শোনা যাচ্ছে।

চুপচাপ শুয়ে থেকে নাতাশা ঘরের ভিতর-বাইরের সব শব্দই শুনতে লাগল। মার প্রার্থনা, দীর্ঘশ্বাস ও বিছানায় নড়াচড়ার শব্দ, মাদাম শোসের পরিচিত নাকডাকার শিস, আর সোনিয়ার মৃদু নিঃশ্বাস। কাউণ্টেস একবার নাতাশাকে ডাকল। নাতাশা সাড়া দিল না।

"মনে হচ্ছে ও ঘুমিয়ে পড়েছে মামণি," সোনিয়া বলল।

একটু চুপ করে থেকে কাউণ্টেস আবার কথা বলল; এবার কেউ সাড়া দিল না।

তার একটু পরেই নাতাশার মার স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পেল। তার ছোট খালি পাটা লেপের ভিতর থেকে বেরিয়ে খালি মেঝেতে

ঠাণ্ডা হয়ে আসছে, তবু নাতাশা একটুও নড়ল না।

যেন সকলের উপর জয়লাভের উৎসব পালন করতে দেয়ালের ফাটলের ভিতর থেকে একটা ঝিঁঝিঁ পোকা ডেকে উঠল। অনেক দূরে একটা কাক ডাকল, কাছে আর একটা কাক তাতে সাড়া দিল। মদের আড্ডার হৈচৈ থেমে গেছে, শুধু অ্যাডজুটান্টের আর্তনাদ এখনও শোনা যাচ্ছে। নাতাশা উঠে বসল।

"সোনিয়া, ঘুমিয়েছ? মামণি?" সে ফিস্‌ফিস্ করে বলল। কেউ সাড়া দিল না। নাতাশা সাবধানে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল, ক্রুশ চিহ্ন আঁকল, ঠাণ্ডা নোংরা মেঝেতে পা ফেলে সাবধানে হাঁটতে লাগল। বিড়ালছানার মত পা টিপে টিপে দরজার কাছে গিয়ে ঠাণ্ডা হাতলটা চেপে ধরল।

দরজা খুলে চৌকাঠ পেরিয়ে বারান্দার ঠাণ্ডা মাটির মেঝেতে পা ফেলল। বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেশ আরাম লাগছে। একটি ঘুমন্ত লোকের গায়ে পা লাগতেই সে তাকে ডিঙিয়ে গেল; কুটিরের যে অংশে প্রিন্স আন্‌দ্রু শুয়ে আছে সেদিককার দরজাটা খুলল। অন্ধকার। ঘরের এক কোণে বিছানায় কে যেন শুয়ে আছে; পাশের বেঞ্চিটার উপর একটা লম্বা ফিতেওয়ালা চর্বি-বাতি ধিকিধিকি জ্বলছে।

সেদিন সকালে যেমুহূর্তে সে শুনেছে যে আহত প্রিন্স আন্‌দ্রু সেখানেই আছে তখনই সে স্থির করেছে তাকে দেখতে যাবে। কেন যাবে তা সে জানে না, তাকে দেখলে নিজে কষ্ট পাবে তাও জানে, তবু তার মনে হয়েছে যে দেখা করা দরকার।

রাতে তার সঙ্গে দেখা করার আশা নিয়েই সে সারাটা দিন কাটিয়েছে। কিন্তু সেইমুহূর্তটি যখন সমাগত তখন তার মন আশংকায় ভরে উঠেছে—না জানি কি দেখবে। কি ভাবে সে পঙ্গু হয়েছে? কতটা অক্ষত আছে? তার অবস্থাও কি অবিরাম আর্তনাদকারী অ্যাডজুটান্টের মত? হ্যাঁ। ঠিক সেই রকমই হবে। কল্পনায় সে যেন তাকে মূর্তিমান আর্তনাদরূপেই দেখতে পেল। একটা দুর্বার আবেগে সামনে এগিয়ে গেল। অতি সাবধানে এক পা এক পা করে এগিয়ে ছোট ঘরটার মাঝখানে পৌঁছে গেল। ঘরে একটা তল্পিও রয়েছে। আর একটি লোক—তিমোখিন—দেবমূর্তির নীচে বেঞ্চিটার এক কোণে শুয়ে আছে। অন্য দুজন—ডাক্তার ও খানসামা—শুয়ে আছে মেঝেতে।

উঠে বসে খানসামা ফিসফিস করে কি যেন বলল। আহত পায়ের ব্যথায় তিমোখিন জেগেই ছিল; সাদা সেমিজ, ড্রেসিং-জ্যাকেট ও রাত-টুপি পরা একটি মেয়ের বিচিত্র ছায়ামূর্তি দেখে সে হা করে তাকিয়ে রইল। খানসামা ঘুম-ঘুম ভয়ার্ত গলায় বলে উঠল, "তুমি কি চাও? ব্যাপার কি?" তখন নাতাশা দ্রুতপায়ে এক কোণে শুয়ে থাকা বস্তুটির দিকে এগিয়ে গেল। তাকে

দেখতে মোটেই মানুষের মত নয়, তবু সে তাকে দেখবেই। খানসামাকে পার হয়ে এগিয়ে গিয়ে মোমবাতির আলোয় সে স্পষ্ট দেখতে পেল দুই হাত লেপের বাইরে রেখে প্রিন্স আন্‌দ্রুই শুয়ে আছে—ঠিক যেরকমটি সে তাকে অনেকবার দেখেছে।

সে আগেকার মতই আছে, কিন্তু তার মুখের জ্বরতপ্ত বর্ণ, তার দিকে উচ্ছ্বাসের সঙ্গে ফেরানো চোখের ঝিকিমিকি দৃষ্টি, বিশেষ করে শিশুর মত নরম গলা তার মধ্যে এমন একটা নিষ্পাপ শিশুসুলভ ভাব ফুটিয়ে তুলেছে যা সে আগে কখনও দেখে নি। প্রিন্স আন্‌দ্রুর কাছে এগিয়ে গিয়ে যৌবন-সুলভ দ্রুত ও নমনীয় ভঙ্গীতে তার সামনে নতজানু হল।

প্রিন্স আন্‌দ্রু হেসে তার দিকে ছাতাটা বাড়িয়ে দিল।

অধ্যায়—৩২

বারদিনোর প্রান্তরে একটা অ্যাম্বুলেন্স ঘাঁটিতে আশ্রয় পাবার পরে প্রিন্স আন্‌দ্রুর সাতটা দিন কেটে গেছে। ডাক্তাররা বলেছিল, জ্বর-জ্বর ভাব ও আঘাতপ্রাপ্ত পাকস্থলীর প্রদাহের ফলে তার মৃত্যু নিশ্চিত, কিন্তু সপ্তম দিনে সে বেশ মৌজ করে চা ও পাউরুটি খেল, আর ডাক্তারও দেখল যে তার শরীরের উত্তাপ নেমে গেছে। সকালেই তার জ্ঞানও ফিরে এসেছে। মস্কো ছাড়বার পরে প্রথম রাতটা বেশ গরমই ছিল, আর সেও ছিল একটা কালিচে-গাড়িতে কিন্তু মিতিশচিতে পৌছে আহত লোকটি নিজেই বলল, তাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে একটু চা খেতে দেওয়া হোক। কুটির স্থানান্তরের দরুণ যন্ত্রণায় সে আবার আর্তনাদ করতে লাগল; জ্ঞানও হারাল। শিবির-শয্যায় শুইয়ে দেবার পরে অনেকক্ষণ সে চোখ বুজে চুপচাপ পড়ে রইল। তারপর চোখ মেলে ধীরে ধীরে বলল: "আমার চা?" প্রাত্যহিক জীবনের এই তুচ্ছ কথাটা তার মনে আছে দেখে ডাক্তার অবাক হয়ে গেল। প্রিন্স আন্‌দ্রুর নাড়ি দেখে অবস্থার উন্নতি হয়েছে বুঝতে পেরে ডাক্তার যেমন বিস্মিত হল, তেমনই অসন্তুষ্টও হল। অসন্তুষ্টির কারণ অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে, রোগী যদি এখন মারা না যায় তাহলে পরে আরও অনেক বেশী কষ্ট পেয়ে মরবে। প্রিন্স আন্‌দ্রুর রেজিমেণ্টের লাল-নাক মেজর তিমোখিন মস্কোতেই তার সঙ্গে মিলিত হয়েছে; বরদিনোর যুদ্ধে একটা পা আহত হওয়ায় সেও প্রিন্স আন্‌দ্রুর সঙ্গেই চলেছে। তাদের সঙ্গে আছে একটি ডাক্তার, প্রিন্স আন্‌দ্রুর খানাসামা তার কোচয়ান ও দুটি আর্দালি।

প্রিন্স আন্‌দ্রুকে একটু চা দেওয়া হল। সাগ্রহে সেটা খেয়ে সে জ্বরো চোখে সামনের দিকে তাকাল; যেন কোন কিছু মনে করতে ও বুঝতে চেষ্টা করছে।

"আর চাই না। তিমোখিন কি এখানে আছেন?" সে শুধাল।

তিমোখিন বেঞ্চিটা ধরে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এল।

"আমি এখানেই আছি ইয়োর এক্সেলেন্সি।"

"আপনার ঘাটা কেমন আছে?"

"আমার স্যার? ভাল আছে। আপনার অবস্থা কেমন?"

প্রিন্স আন্দ্রু আবার কি যেন মনে করতে চেষ্টা করল।

"একটা বই কি পাওয়া যাবে না?" সে শুধাল।

"কি বই?"

"সুভাষিতাবলী। আমার কাছে নেই।"

ডাক্তার তাকে কথা দিল, একটা বই যোগাড় করে দেবে; তারপর সে কেমন আছে জানতে চাইল। প্রিন্স আন্দ্রু অনিচ্ছা সত্ত্বেও যথাযথভাবে সব প্রশ্নের জবাব দিল; তারপর একটা তাকিয়া দিতে বলল, কারণ বিছানায় শুয়ে সে আরাম পাচ্ছে না, কষ্ট বোধ হচ্ছে। যে আলখাল্লাটা দিয়ে তার শরীর ঢাকা ছিল ডাক্তার ও খানসামা সেটাকে তুলে দিল; ক্ষতস্থান থেকে বেরিয়ে আসা পচা মাংসের দুর্গন্ধে মুখ বিকৃত করে তারা সেই ভয়ংকর জায়গাটা পরীক্ষা করতে লাগল। ডাক্তার খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে ড্রেসিংটা বদলে দিতে গিয়ে আহত লোকটিকে পাশ ফিরিয়ে দিল, আর তাতেই যন্ত্রণায় কাতর হয়ে আর্তনাদ করতে করতে সে আবার অজ্ঞান হয়ে প্রলাপ বকতে শুরু করল। বার বার বলতে লাগল, বইটা এনে তার বিছানার নীচে রাখা হোক।

বলল, "তাতে আপনাদের অসুবিধাটা কোথায়? বইটা আমার সঙ্গে নেই। দয়া করে একখানা বই এনে মুহূর্তের জন্য বিছানার নীচে রেখে দিন," সে করুণ সুরে অনুরোধ জানাল।

ডাক্তার হাত ধুতে বারান্দায় চলে গেল।

খানসামা তার হাতে জল ঢেলে দিল। সেই সময় ডাক্তার তাকে বলল, "তোমাদের তো বিবেক বলে কিছু নেই। একমুহূর্ত আমি নজর রাখি নি··· এ যে কী যন্ত্রণা জান তো; উনি যে কি করে সহ্য করছেন ভেবে পাই না।"

খানসামা বলল, "প্রভু যীশু খৃস্টের দোহাই, বিছানার নীচে কিছু রাখা হোক!"

মিতিশ্‌চিতে কালিচে-গাড়িটা থামবার পরে প্রিন্স আন্দ্রু যখন তাকে কুটিরে নিয়ে যেতে বলল, তখনই সে প্রথম বুঝতে পারল সে কোথায় আছে, তার কি হয়েছে, সে আঘাত পেয়েছে এবং কেমন করে পেয়েছে। কুটিরে নিয়ে যাবার সময় সে আবার যন্ত্রণায় জ্ঞান হারায়; পুনরায় জ্ঞান ফিরে পাবার পরে চা খেতে খেতে সব কথা তার নতুন করে মনে পড়ে গেল। একটা নতুন ধরনের চিন্তা এসে তার মনে সুখের ভরসা যোগাল। মনে হল, সুখের একটা নতুন উৎস সে খুঁজে পেয়েছে, আর সে সুখ

"সুভাষিতাবলী"র সঙ্গে জড়িত। সেইজন্যই একখানা বই সে চেয়েছে। পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দেবার সময় আবার সব গোলমাল হয়ে গেল। তৃতীয় বারের মত যখন জ্ঞান ফিরে পেল তখন চারদিকে রাতের নিস্তব্ধতা। কাছাকাছি সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে। বারান্দা থেকে একটা ঝিঁ ঝিঁ ডেকে উঠল; রাস্তায় কে যেন চেঁচিয়ে গান করছে; টেবিলে, দেবমূর্তির উপরে ও দেয়ালে আরশুলাগুলো খস্‌খস্‌ করে চলাফেরা করছে; বিছানার মাথার কাছে এবং পাশের মোমবাতিটাকে ঘিরে একটা বড় মাছি ফর্‌ফর্‌ করে উড়ছে; মোমবাতির পলতেটা পুড়ে গিয়ে ব্যাঙের ছাতার আকার নিয়েছে।

তার মনের অবস্থাটা মোটেই স্বাভাবিক নয়। একটি সুস্থ মানুষ সাধারণত একই সঙ্গে অসংখ্য বিষয় ভাবতে পারে, অনুভব করতে পারে, স্মরণ করতে পারে; কিন্তু দরকার হলে একটি চিন্তাধারাকে বেছে নিয়ে সমস্ত মনোযোগকে তার উপর নিবদ্ধ করার ক্ষমতাও সে রাখে। একটি সুস্থ মানুষ গভীরতম চিন্তাভাবনা থেকে বেরিয়ে এসে একজন আগন্তুকের সঙ্গে দু' একটা ভদ্রতার কথা বলে আবার নিজের চিন্তায় ফিরে যেতে পারে। কিন্তু সে ব্যাপারে প্রিন্স আন্‌দ্রুর মনটা স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। তার মনের সব ক্ষমতাই আগের চাইতে বেশী সক্রিয় ও পরিচ্ছন্ন, কিন্তু সে ক্ষমতা কাজ করে তার ইচ্ছার বাইরে। একই সঙ্গে বহু বিচিত্র বিষয় নিয়ে সে ভাবতে পারে; কিন্তু কাজ করতে করতেই সহসা একটা অপ্রত্যাশিত ধারণা এমনভাবে তার মনে বাসা বাঁধে যে সেটাকে সরিয়ে দেবার কোন শক্তিই তার থাকে না।

নিস্তব্ধ কুটিরের আধো অন্ধকারে শুয়ে জ্বরতপ্ত বিস্ফারিত চোখ মেলে সামনের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে সে ভাবতে লাগল, "হ্যাঁ, এমন একটা নতুন সুখ আমার কাছে প্রকাশ পেয়েছে যা থেকে মানুষকে বঞ্চিত রাখা যায় না। সে সুখের আসন জড়বস্তুর বাইরে, সে সুখ একমাত্র আত্মার, সে সুখ ভালবাসার। সব মানুষই তাকে বুঝতে পারে, কিন্তু তাকে সম্যক ধারণা করা, তার ব্যবস্থা করা একমাত্র ঈশ্বরের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু ঈশ্বরই বা কিভাবে সে বিধানের প্রয়োগ করলেন? আর কেনই বা ঈশ্বর-পুত্র…?"

সহসা তার চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল, প্রিন্স আন্‌দ্রু শুনতে পেল (সেটা বাস্তব না স্বপ্ন তা সে জানে না) একটা মৃদু ফিস্‌ ফিস্‌ স্বর অনবরত তালে তালে বলছে "পিতি-পিতি-পিতি," তারপর "তি-তি", তারপর আবার "পিতি-পিতি-পিতি", এবং আবার "তি-তি"। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল, মুখের উপর, ঠিক মাঝখানটাতে সেই ফিস্‌-ফিস্‌ শব্দের তালে তালে অতি সূক্ষ্ম সূচ ও ভাঙা কুঁচি দিয়ে একটা আশ্চর্য বায়বীয় কিছু গড়ে উঠেছে। মনে হল তাকে খুব সাবধানে থাকতে হবে যাতে এই বায়বীয় জিনিসটা ভেঙে না পড়ে; কিন্তু তবু সেটা ভেঙে যেতে লাগল এবং সেই তালবদ্ধ শব্দের

সঙ্গে সঙ্গে আবার ধীরে ধীরে গড়ে উঠল ; প্রিন্স আন্‌দ্রু নিজের মনেই বলতে লাগল—"সেটা বড় হচ্ছে, বড় হচ্ছে, ছড়িয়ে পড়ছে, বড় হচ্ছে।" সেই ফিসফিসানি শুনতে শুনতে এবং সূচীশিল্পের গলা জিনিসটাকে দেখতে দেখতে সে চকিতে আরও দেখতে পেল মোমবাতিটাকে ঘিরে একটা লাল আলোর বৃত্ত, শুনতে পেল আরশোলাদের ফর্‌ফর্‌ শব্দ, এবং তার বালিশে মুখের উপর উড়ন্ত একটা মাছির গুণগুনানি। মাছিটা যতবার মুখের উপর পড়ছে ততবার সেখানটায় জ্বালা করছে, অথচ কী আশ্চর্য, মাছিটা সেই বায়বীয় জিনিসটাকে আঘাত করা সত্ত্বেও সেটা ভেঙে যাচ্ছে না। কিন্তু এসব ছাড়া আরও একটা বড় ব্যাপার সেখানে ছিল। দরজার কাছে একটা সাদামত কিছু—একটা স্ফিন্‌ক্স্‌-এর মূর্তি ; সেটাও তাকে পীড়া দিতে লাগল।

সে ভাবল, "ওইতো টেবিলের উপর আমার শার্টটা, ওই তো আমার পা দুটো, ওই তো দরজা, কিন্তু ওটা অনবরত বড় হচ্ছে কেন, ছড়িয়ে পড়ছে কেন, আর কেনই বা 'পিতি-পিতি-পিতি' আর 'তি-তি', আর 'পিতি-পিতি-পিতি'···? যথেষ্ট হয়েছে, দয়া করে চলে যাও!" যন্ত্রণাকাতর গলায় প্রিন্স আন্‌দ্রু কাকে যেন মিনতি জানাল। আর সহসা চিন্তা ও অনুভূতিগুলি আবার তার মনের উপরে ভেসে উঠল বিশেষ স্পষ্টতায় ও শক্তিতে।

পরিষ্কারভাবে সে আবার ভাবল, "হ্যাঁ—ভালবাসা। কিন্তু সে ভালবাসা নয় যা ভালবাসে কোন কিছুর জন্য, গুণের জন্য, উদ্দেশ্যের জন্য, আর অন্য কোন কারণের জন্য, কিন্তু সেই ভালবাসা যা আমি—মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে—প্রথম জেনেছি যখন আমার শত্রুকে দেখেও তাকে ভালবেসেছি। সেই ভালবাসার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে যা আত্মারই একান্ত সত্ত্বা, যার কোন পাত্রের দরকার হয় না। সেই আনন্দের অনুভূতি আমি আবার লাভ করেছি। প্রতিবেশীকে ভালবাসা, শত্রুকে ভালবাসা, সব কিছুকে ভালবাসা, তার সব আত্মপ্রকাশের মধ্যে ঈশ্বরকে ভালবাসা। প্রিয়জনকে তুমি ভালবাসতে পার মানবিক ভালবাসা দিয়ে, কিন্তু শত্রুকে ভালবাসা যায় একমাত্র ঐশ্বরিক ভালবাসা দিয়ে। তাই তো শত্রুকে ভালবেসে এত আনন্দ আমি পেয়েছি। তার কি হয়েছে? সে কি বেঁচে আছে···?"

"মানবিক ভালবাসার ক্ষেত্রে ভালবাসা থেকে ঘৃণায় যাওয়া যায়, কিন্তু ঐশ্বরিক ভালবাসার পরিবর্তন নেই। না, মৃত্যু বা অন্য কিছুই তাকে ধ্বংস করতে পারে না। সেটাই তো আত্মার মূল ধর্ম। অথচ এ জীবনে কত মানুষকেই না ঘৃণা করেছি? আর যত ভালবেসেছি ও ঘৃণা করেছি তাকে যত আর কাউকে নয়।" সঙ্গে সঙ্গে নাতাশার ছবি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল তার সামনে। নাতাশার অনুভূতি, তার যন্ত্রণা, তার লজ্জা, তার অনুতাপ সবই সে বুঝতে পারল। এই প্রথম সে বুঝতে পারল নাতাশাকে প্রত্যাখ্যান

করার নিষ্ঠুরতা, তার সঙ্গে বিরোধের নিষ্ঠুরতা। "যদি আর একটিবার তার সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হত! শুধু একবার, সেই দুটি চোখের দিকে তাকিয়ে যদি বলতে পারতাম....."

"পিতি-পিতি-পিতি, তি-তি, পিতি-পিতি-পিতি বুম্!" মাছিটা উড়ছে ....আর সহসা তার মন চলে গেল আর এক জগতে—বাস্তব ও বিকারের এক জগতে যেখানে ঘটে চলেছে একটি বিশেষ ঘটনা। সেই জগতে একটা কিছু এখনও গড়ে উঠছে, ভেঙে পড়ছে না, একটা কিছু ক্রমেই বড় হচ্ছে, লাল বৃত্তসহ মোমবাতিটা এখনও জ্বলছে, দরজার কাছে সেই শার্টের মত স্ফিন্‌ক্স্‌টা পড়ে আছে: কিন্তু এসব কিছু ছাড়া আরও একটা কিছুর ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ হল, এক ঝলক তাজা বাতাস ঘরে ঢুকল, আর দরজায় দেখা দিল আর একটি নতুন সাদা স্ফিন্‌ক্স্‌। আর যে নাতাশার কথা সে এইমাত্র ভাবছিল তারই বিবর্ণ মুখ ও চকচকে চোখ বসানো এই নতুন স্ফিন্‌ক্স্‌-এর মূর্তিতে।

কল্পনা থেকে সেই মুখটাকে সরিয়ে দেবার চেষ্টায় প্রিন্স আন্‌দ্রু ভাবল, "ওঃ, এই অবিরাম বিকার কী যন্ত্রণাদায়ক।" কিন্তু সে মুখ বাস্তব রূপ নিয়ে থেকেই গেল, আরও কাছে এগিয়ে এল। সেই বিচিত্র মুখখানি তার একেবারে সামনে। নিজের বুদ্ধিকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় প্রিন্স আন্‌দ্রু সব শক্তি একত্র করল, একটু সরে গেল, আর সহসা তার কানে কি যেন বেজে উঠল, চোখের উপর নেমে এল আবছায়া, জলে ডুবন্ত মানুষের মত সে চেতনা হারাল। যখন সম্বিত ফিরে পেল তখন নাতাশা, সেই জীবন্ত নাতাশা যাকে সে সবার চাইতে ভালবাসতে চেয়েছে তার নবলব্ধ পবিত্র ঐশ্বরিক ভালবাসা দিয়ে, সেই নাতাশা তার সামনে নতজানু হয়ে আছে। সে বুঝল এ নাতাশা প্রকৃতই জীবন্ত; সে বিস্মিত হল না, বরং সুখী হল। নতজানু হয়ে নিশ্চল-ভাবে বসে ভয়ার্ত দুটি চোখ তার মুখের উপর রেখে নাতাশা কোনক্রমে কান্না চেপে রেখেছে। তার মুখ বিবর্ণ, কঠিন। শুধু নীচের দিকটা কাঁপছে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে প্রিন্স আন্‌দ্রু হাসল; হাতটা বাড়িয়ে দিল।

"তুমি?" সে বলল। "কী ভাগ্য!"

নতজানু অবস্থাতেই নাতাশা দ্রুত অথচ সাবধানে তার আরও কাছে এগিয়ে গেল, সযত্নে তার হাতটা টেনে নিল, ঝুঁকে পড়ে আল্‌তো করে ঠোঁট দুটি ছুঁইয়ে হাতের উপর চুমো খেল।

মাথা তুলে তার দিকে তাকিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, "আমাকে ক্ষমা কর! আমাকে ক্ষমা কর!"

"আমি তোমাকে ভালবাসি," প্রিন্স আন্‌দ্রু বলল।

"ক্ষমা...!"

"কিসের ক্ষমা?" প্রিন্স আন্‌দ্রু শুধাল।

"আমি যা ক-রে-ছি তার জন্য আমাকে ক্ষমা কর!" প্রায় অশ্রুত ভাঙা-ভাঙা গলায় নাতাশা বলল; কোন রকমে ঠোঁট ছুঁইয়ে তার হাতে চুমো খেতে লাগল।

নাতাশার মুখটা তুলে ধরে তার চোখে চোখ রেখে প্রিন্স আন্‌দ্রু বলল, "তোমাকে আমি আগের চাইতে আরও বেশী ভালবাসি।"

আনন্দের অশ্রুভরা দুটি চোখ তুলে ভীরু দৃষ্টিতে নাতাশা প্রিন্স আন্‌দ্রুর দিকে তাকাল। তার শীর্ণ বিবর্ণ মুখ, ফোলা ঠোঁট দুটি বড়ই সাধারণ—দেখলে ভয় করে। কিন্তু প্রিন্স আন্‌দ্রু তা দেখল না, সে দেখল তার সুন্দর দুটি চকচকে চোখ। পিছন থেকে অনেকের কণ্ঠস্বর দুজনই শুনতে পেল।

খানসামা পিতর জেগে উঠে ডাক্তারকে জাগিয়েছে। পায়ের ব্যথার জন্য তিমোখিন মোটেই ঘুমোয় নি; বেঞ্চির উপর গুটিশুটি মেরে শুয়ে একটা চাদর দিয়ে শরীরটাকে ঢেকে সে অনেকক্ষণ ধরেই সব কিছু দেখছিল।

বিছানা থেকে উঠে ডাক্তার বলল, "এটা কি? দয়া করে চলে যান মাদাম!"

সেইমুহূর্তে একটি দাসী এসে দরজায় টোকা দিল; মেয়েকে না দেখতে পেয়ে কাউণ্টেস তাকে পাঠিয়েছে।

সদ্য ঘুম ভেঙে ওঠা স্বপ্নাচ্ছন্ন রোগীর মত নাতাশা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল; ঘরে ফিরে নিজের বিছানায় উপুড় হয়ে কাঁদতে লাগল।

সেদিন থেকে রস্তভদের অবশিষ্ট ভ্রমণকালে প্রতিটি বিরামস্থলে এবং যেখানেই তারা রাত কাটিয়েছে, নাতাশা কখনও আহত বল্কন্‌স্কির কাছছাড়া হয় নি; আর ডাক্তারকেও স্বীকার করতে হয়েছে যে একটি তরুণীর কাছ থেকে এতটা মানসিক দৃঢ়তা অথবা একটি আহত মানুষকে সেবা করবার এতটা নিপুণতা সে আশা করে নি।

পথের মধ্যেই প্রিন্স আন্‌দ্রু যদি তার মেয়ের হাতের উপরেই মারা যায়—ডাক্তারের কথামত তা তো সহজেই ঘটতে পারে—কাউণ্টেসের কাছে সেটা যত ভয়াবহই মনে হোক না কেন, তবু সে নাতাশাকে বাধা দিতে পারল না। যদিও আহত মানুষটি ও নাতাশার মধ্যে এখন যে ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছে তাতে সকলেরই মনে হল যে প্রিন্স আন্‌দ্রু সেরে উঠলে তাদের বিয়ের প্রস্তাবটি নতুন করে তোলা হবে, তবু কেউই মুখে সেকথা বলল না—নাতাশা ও প্রিন্স আন্‌দ্রু তো নয়ই: জীবন-মৃত্যুর যে অমীমাংসিত প্রশ্নটি তখন শুধু বল্কন্‌স্কির মাথার উপরে নয়, সারা রাশিয়ার উপরেই ঝুলে আছে, সেটাই এখন অন্য সব বিচার-বিবেচনার পথকে রোধ করে দাঁড়িয়েছে।

৩রা সেপ্টেম্বর অনেক দেরিতে পিয়েরের ঘুম ভাঙল। মাথাটা ধরে আছে, পোশাক না ছেড়েই যে বিছানায় শুয়েছিল সেটা বড়ই অস্বস্তিকর লাগছে, আগেরদিন একটা লজ্জাজনক কাজ করার অস্পষ্ট চেতনা মনের মধ্যে বাসা বেঁধে আছে। সেই লজ্জাজনক কাজটা ক্যাপ্টেন রাম্বেলের সঙ্গে গতকালের আলোচনা।

ঘড়িতে এগারোটা বাজে, কিন্তু বাইরেটা বেশ অন্ধকার মনে হচ্ছে। পিয়ের উঠে চোখ মুছল; কুঁদোতে খোদাই-করা যে পিস্তলটা গেরাসিম লেখার টেবিলে রেখে গেছে সেটা চোখে পড়তেই পিয়েরের মনে পড়ে গেল সে কোথায় আছে, আর সেইদিনই তার ভাগ্যে কি আছে।

"আমার কি অনেক দেরি হয়ে যায় নি?" সে ভাবল। "হয় তো সে দুপুরের আগে মস্কোতে ঢুকবে না।"

ভবিষ্যতের চিন্তায় মাথা না ঘামিয়ে সে তাড়াতাড়ি কাজে লেগে গেল।

পোশাক ঠিক করে পিস্তলটা নিয়ে বেরিয়ে যাবে, এমন সময় এই প্রথম তার মনে হল যে এভাবে পিস্তলটা হাতে নিয়ে রাজপথ ধরে সে চলতে পারে না। এত বড় একটা পিস্তলকে কোটের নীচে লুকিয়ে রাখাও শক্ত। সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে এটাকে বেল্টের নীচে অথবা বগলের নীচে লুকিয়ে রেখেও চলা সম্ভব নয়। তাছাড়া এটা থেকে গুলি ছোঁড়া হয়ে গেছে, নতুন করে গুলি ভরার আর সময় হয়ে ওঠে নি। "ঠিক আছে, ছুরিতেই কাজ চলবে," নিজের মনেই বলল, যদিও পরিকল্পনা করার সময় সে একাধিকবার স্থির করেছে যে ১৮০৯ সালে একটা ছুরি নিয়ে নেপোলিয়নকে হত্যা করার চেষ্টা করেই ছাত্রটি মস্তবড় ভুল করেছিল। তবু পিয়ের তাড়াতাড়িতে পিস্তলের সঙ্গে সবুজের খাপে ভরা একটা খাঁজ-কাটা ভোঁতা ছুরিও সঙ্গে নিল। পিস্তলের সঙ্গে ছুরিটাও সে কিনেছিল সুখারেভ বাজার থেকে। সেটাকে ওয়েস্টকোটের নীচে লুকিয়ে রাখল।

কোটের উপর একটা কটিবন্ধ বেঁধে টুপিটাকে কপালের উপর টেনে দিয়ে কোনরকম শব্দ না করে ক্যাপ্টেনকে এড়িয়ে বারান্দাটা পার হয়ে পিয়ের রাস্তায় পা দিল।

আগের সন্ধ্যায় যে অগ্নিকাণ্ডকে সে উদাসীন চোখে তাকিয়ে দেখেছে আজ রাতে সেটা অনেক বড় হয়ে উঠেছে। মস্কোর বিভিন্ন স্থান আগুনে পুড়েছে। নদীর ওপারে ক্যারেজ রোর দালানগুলো, বাজার ও পোভার্স্ক'য়, মস্ক্‌ভা নদীর উপরকার বজরা আর দরগমিলভ সেতুর পার্শ্বস্থ কাঠের গোলা—সব জ্বলছে।

পিয়ের গলিপথ ধরে পোভার্স্ক'য় গেল, সেখান থেকে গেল আর্বাতে অবস্থিত সেণ্ট নিকলাস গির্জায়; অনেক আগেই সে স্থির করেছে ওখানেই কাজটা সমাধা করা উচিত। অধিকাংশ বাড়িরই ফটকে তালা, খড়খড়ি

তোলা। রাজপথ ও গলি জনশূন্য। মাঝে মাঝে কিছু রুশকে দেখতে পেল ; তাদের মুখে উৎকণ্ঠা ও ভয়। কিছু ফরাসী সৈন্য রাস্তার মাঝখান দিয়ে এমনভাবে চলেছে যেন এটা শহর নয়, সেনা-শিবির। রুশ ও ফরাসী সকলেই পিয়েরকে দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছে। তার উচ্চতা ও মজবুত চেহারা ছাড়াও তার মুখে ও সারা দেহে এমন একটা বিচিত্র যন্ত্রণার ভাব ফুটে উঠেছে যে রুশরা তার দিকে তাকিয়ে ভাবছে সে কোন্ জাতের মানুষ। ফরাসীরা অবাকচোখে তাকে দেখছে কারণ অন্য রুশরা যেখানে ফরাসীদের দেখছে ভয় ও কৌতুহলের সঙ্গে, সেখানে পিয়ের তাদের একেবারেই আমল দিচ্ছে না। একটা বাড়ির ফটকে তিনজন ফরাসী রুশদের কি যেন বুঝিয়ে বলছে, কিন্তু তারা কিছুই বুঝতে পারছে না দেখে ফরাসীরা পিয়েরকে থামিয়ে জানতে চাইলো সে ফরাসী জানে কি না।

পিয়ের মাথা নেড়ে চলে গেল। চারদিকে যা কিছু ঘটছে তার দিকে না আছে তার কান, না আছে তার দৃষ্টি। নিজের সংকল্পকে মনের মধ্যে বয়ে নিয়ে সে সভয়ে দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চলল। কিন্তু উদ্দেশ্য সাধন করা তার কপালে নেই। পথে আর কোন বাধা না পেলেও তার অভিপ্রায় সফল করা যেত না, কারণ দরগমিলভ শহরতলি থেকে ক্রেমলিন যাবার পথে নেপোলিয়ন চার ঘণ্টারও বেশী সময় আগে আর্বাত পার হয়ে গেছে ; এখন সে অত্যন্ত বিষণ্ণ মনে ক্রেমলিনের রাজকীয় পাঠকক্ষে বসে অগ্নিনির্বাপন ও লুঠতরাজ বন্ধ করা এবং অধিবাসীদের আশ্বস্ত করার ব্যাপারে অবিলম্বে যে সব ব্যবস্থা নেওয়া দরকার তৎসংক্রান্ত বিস্তারিত ও সঠিক হুকুম জারি করছে। কিন্তু পিয়ের এসব কিছুই জানে না : নিজের আসন্ন কর্তব্যের মধ্যেই সে ডুবে আছে ; তার একমাত্র দুশ্চিন্তা পাছে চরম মুহূর্তে দুর্বলতা এসে তাকে ঘিরে ধরে এবং তার আত্মমর্যাদা হারিয়ে যায়।

কোন কিছু না শুনলে ও না দেখলেও সহজাত প্রবৃত্তিতেই সে পথ চিনে এগিয়ে চলল ; পোভার্স্কয়ের গলি পথে যেতে সে কোনরকম ভুল করল না।

সেই রাস্তা ধরে যত এগোচ্ছে ততই ধোঁয়া ঘনতর হচ্ছে—আগুনের তাপ পর্যন্ত তার গায়ে লাগছে। মাঝে মাঝে বাড়ির ছাদ থেকে আগুনের লেলিহান জিহ্বা উঠতে দেখা যাচ্ছে। যদিও বুঝতে পারছে যে তার চারদিকে অস্বাভাবিক কিছু ঘটছে, তবু সে যে অগ্নিকাণ্ডের দিকেই এগিয়ে চলেছে সেটা পিয়ের বুঝতে পারে নি। একদিকে পোভার্স্কয় আর অন্যদিকে প্রিন্স গ্রুজিন্স্কির বাড়ির বাগান সংলগ্ন একটা প্রশস্ত খোলা জায়গার ভিতরকার ফুটপাত ধরে যেতে যেতে হঠাৎ পিয়ের শুনতে পেল খুব কাছেই একটি স্ত্রীলোক অসহায়ভাবে কাঁদছে। স্বপ্নোত্থিতের মত পিয়ের মাথাটা তুলল।

পথের পাশে ধুলো ঢাকা শুকনো ঘাসের উপর নানারকম গৃহস্থালির জিনিসপত্র স্তূপীকৃত হয়ে আছে : পালকের বিছানা, সামোভার, দেবমূর্তি,

ট্রাংক, কত কি। ট্রাংকের পাশে একটি শুকনো চেহারার স্ত্রীলোক মাটিতে বসে আছে; স্ত্রীলোকটি বয়স্কা, উপরের পাটির দাঁতগুলো উঁচু, পড়নে কালো জোব্বা ও টুপি। কি যেন বলতে বলতে চাপা কান্নার আবেগে তার শরীরটা দুলছে। দশ ও বারো বছরের দুটি মেয়ে নোংরা খাটো ফ্রক ও জোব্বা পরে ভয়ার্ত, বিমূঢ় মুখে মার দিকে তাকিয়ে আছে। বছর সাতেকের ছোট ছেলেটি অন্য কারও ওভার কোট ও বড় মাপের একটা টুপি পরে বুড়ি নার্সের কোলে চড়ে চীৎকার করছে। একটা নোংরা দাসী খালি পায়ে ট্রাংকের উপর বসে আছে। স্ত্রীলোকটির স্বামীর পরনে সরকারী কর্মচারির পোশাক, বাঁকানো গোঁফ, মাথায় চৌকো টুপি; ভাবলেশহীন মুখে ট্রাংকগুলো সরিয়ে তার ভিতর থেকে পোশাকপত্র টেনে বের করছে।

পিয়েরকে দেখামাত্রই স্ত্রীলোকটি তার পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ল।

"ভাল মানুষরা, ভাল খৃস্টানরা, আমাকে বাঁচান, আমাকে সাহায্য করুন, প্রিয় বন্ধুরা...যে কেউ আমাদের সাহায্য করুন...." চাপা কান্নার ফাঁকে ফাঁকে সে বিড়বিড় করে বলতে লাগল। আমার মেয়ে...আমার মেয়ে! আমার ছোট যে পড়ে রইল। আগুনে পুড়ে গেল! উঃ! এইজন্যই কি তাকে মানুষ করলাম....উঃ!"

নীচু গলায় স্বামী বলল, "কেঁদ না মারি নিকলায়েভ্‌না! নিশ্চয় দিদি তাকে নিয়ে গেছে, নইলে সে যাবে কোথায়?"

হঠাৎ কান্না থামিয়ে স্ত্রীলোকটি সক্রোধে গর্জে উঠল, "রাক্ষস! পাষণ্ড! তোমার তো হৃদয় বলে কিছু নেই, নিজের সন্তানের জন্যও কোন মমতা নেই। অন্য পুরুষ হলে তাকে আগুনের ভিতর থেকে উদ্ধার করে আনত। কিন্তু এ তো রাক্ষস, মানুষ নয়, বাপও নয়!" চাপা কান্নার ফাঁকে সে পিয়েরকে ডেকে বলল, "আপনি তো স্যার একজন সম্মানিত লোক। আশেপাশে আগুন লাগল, আমার বাড়ির দিকে ধাওয়া করল, দাসী চেঁচিয়ে উঠল 'আগুন!' আর আমরা জিনিসপত্র গুছাতে গেলাম। যে অবস্থায় ছিলাম সেইভাবেই বেরিয়ে এলাম...এই তো মাত্র সঙ্গে আনতে পেরেছি....দেবমূর্তি, আমার যৌতুকের বিছানা, আর সবই তো গেছে! বাচ্চাদের ধরে নিয়ে এলাম। কিন্তু কাতিকে আনতে পারলাম না! উঃ! হে প্রভু!...." আবার সে ফোঁপাতে শুরু করল। "আমার বাছা, আমার সোনা! পুড়ে গেল! পুড়ে গেল!"

"কিন্তু তাকে কোথায় ফেলে এসেছেন?" পিয়ের শুধাল।

তার দৃপ্ত মুখ দেখে স্ত্রীলোকটির মনে হল, এ হয় তো তাকে সাহায্য করতে পারে।

পা ধরে চেঁচিয়ে বলল, "ওঃ, প্রিয় মহাশয়! আমার রক্ষাকর্তা, আমার বুকটাকে শান্ত করুন!...আনিস্কা, এই মেয়েটা, যা না, ওকে পথটা দেখিয়ে

দে !" রেগে হা করে দীর্ঘ দাঁতের পাটি বের করে সে চেঁচিয়ে দাসীটিকে বলল।

পিয়ের তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "আমাকে রাস্তাটা দেখিয়ে দাও, দেখিয়ে দাও,...আমি ঠিক করে দেব।"

নোংরা দাসীটি ট্রাংক থেকে নেমে চুল ঠিক করে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে খালি পায়ে পথ দেখিয়ে চলল। পিয়েরের মনে হল, গভীর মূর্ছার পরে সে যেন আবার বেঁচে উঠেছে। মাথাটা খাড়া করল, জীবনের আলোয় দুই চোখ জ্বলতে লাগল, দ্রুত পায়ে দাসীকে অনুসরণ করে পোভার্স্ক'য়তে পৌঁছে গেল। কালো ধোঁয়ার মেঘে সারাটা রাস্তা ঢেকে গেছে। সেই মেঘের ফাঁকে ফাঁকে আগুনের জিহ্বা উঁকি মারছে। অনেক লোক জড় হয়েছে অগ্নিকাণ্ডের সামনে। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে জনৈক ফরাসী জেনারেল চার পাশের লোকজনদের কি যেন বলছে। দাসীকে সঙ্গে নিয়ে পিয়ের জেনারেলের দিকে এগিয়ে গেল, কিন্তু ফরাসী সৈনিকরা তাকে বাধা দিল।

"ওদিকে যেতে পারবেন না," একজন বলল।

মেয়েটি বলল, "এদিকে আসুন খুড়ো। গলি ধরে নিকুলিন্সকে পাশ কাটিয়ে আমরা চলে যাব।"

পিয়ের মুখ ঘুরিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে দাসীর সঙ্গে ছুটতে লাগল। মেয়েটি ছুটো রাস্তা পার হয়ে বাঁদিকে একটা গলিতে ঢুকল; তিনটে বাড়ি পেরিয়ে ডানদিকের একটা উঠোনে ঢুকল।

"এই তো কাছেই", বলে মেয়েটি দৌড়ে উঠোন পার হয়ে কাঠের বেড়ার ফটকটা খুলে ফেলল। সেখানে দাঁড়িয়েই বাড়িটার ছোট কাঠের অংশটা আঙুল দিয়ে দেখাল; সেটা তখন দাউ-দাউ করে জ্বলছে। একটা দিক ভেঙে পড়েছে, অপর দিকটা জ্বলছে, জানালার ফাঁকে ও ছাদের ভিতর দিয়ে আগুনের শিখা বেরিয়ে আসছে।

বেড়ার ফটক দিয়ে ঢুকতে গিয়ে গরম বাতাস গায়ে লাগতে পিয়ের আপনা থেকেই থেমে গেল।

"কোন্‌টা? তোমাদের বাড়ি কোন্‌টা?" সে শুধাল।

একটা দিক দেখিয়ে মেয়েটি আর্তনাদ করে বলল, "উঃ! ঐ তো, ঐ তো আমাদের বাসা। হায় সোনা, তুমি পুড়ে মরলে! কাতি, সোনা-মানিক আমার! উঃ!"

পিয়ের সেদিকটায় ছুটে গেল, কিন্তু আগুনের হল্কার জন্য এগোতে না পেরে ঘুরে বড় বাড়িটার সামনের দিকে চলে গেল। সে বাড়ির ছাদের নীচটা শুধু জ্বলছে আর একদল ফরাসী সেখানে ভিড় করেছে। লোকগুলি কি করছে সেটা প্রথমে পিয়ের বুঝতে পারে নি; কিন্তু যখন সে দেখল একজন ফরাসী ভোঁতা তলোয়ার দিয়ে একটি চাষীকে আঘাত করছে আর তার কাছ থেকে

একটা শেয়ালের লোমের কোট ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করছে, তখনই সে বুঝল যে সেখানে লুঠতরাজ চলছে ; কিন্তু তা নিয়ে ভাববার মত সময় তার নেই।

দেয়াল ও ছাদ ভেঙে পড়ার শব্দ, আগুনের শিখার হিস্‌-হিস্‌ শব্দ, উত্তেজিত জনতার চেঁচামেচি ও আগুনের কুণ্ডলি—সব কিছু মিলিয়ে পিয়েরের মনে একটা উদ্দীপনার সৃষ্টি হল। বাসাটার অন্যদিকে ছুটে গিয়ে ভিতরে ঢুকবার মুখেই মাথার উপরে অনেকের চীৎকার শুনতে পেল, আর তখনই একটা ভারি জিনিস হুড়মুড় করে তার পাশেই এসে পড়ল।

পিয়ের মুখ তুলে দেখল, বড় বাড়িটার জানালায় কয়েকজন ফরাসী দাঁড়িয়ে আছে। তারাই ধাতুর জিনিসপত্র ভর্তি একটা দেরাজ এই মাত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। নীচে দাঁড়ানো অপর কয়েকজন ফরাসী দেরাজটার দিকে এগিয়ে গেল।

পিয়েরকে দেখিয়ে তাদের একজন বলে উঠল, "এই লোকটা কি চায় ?"

পিয়ের চীৎকার করে বলল, "ওই বাড়িতে একটি শিশু আছে ? তোমরা কি একটি শিশুকে দেখেছ ?"

"কি বলছে লোকটা ? এগিয়ে চল !" কয়েকজন বলল ; পাছে পিয়ের দেরাজের কিছু প্লেট ও ব্রোঞ্জের জিনিস চেয়ে বসে এই ভয়ে একটি সৈনিক সদর্পে তার দিকে এগিয়ে এল।

উপর থেকে একজন ফরাসী চেঁচিয়ে বলল, "একটি শিশু ? বাগানে কার যেন কান্না শুনেছি। এ লোকটি নিশ্চয় সেই বাচ্চাটাকেই খুঁজছে। যাই হোক না কেন, তোমাকে তো মানুষের মত আচরণ করতে হবে⋯⋯"

"কোথায় সে ? কোথায় ?" পিয়ের বলল।

বাড়ির পিছন দিককার বাগানটা দেখিয়ে ফরাসীটি জানালা থেকে চেঁচিয়ে বলল, "ওখানে ! ওখানে ! একটু অপেক্ষা কর—আমি নেমে আসছি।"

দু' এক মিনিট পরেই কালো চোখ ও গালে তিল একটি ফরাসী সত্যি সত্যি একতলার জানালা দিয়ে লাফিয়ে নেমে এল এবং পিয়েরের কাঁধটা চেপে ধরে বাগানের দিকে ছুটে গেল।

সহকর্মীদের ডেকে বলল, "তোমরা সকলেই তাড়াতাড়ি নেমে এস। ক্রমেই গরম বাড়ছে।"

বাড়ির পিছনে কাঁকর বিছানো পথে পৌঁছে ফরাসীটি পিয়েরের হাত ধরে টেনে দেখিয়ে দিল, কাঁকর বিছানো গোলাকার জায়গায় আসনের নীচে গোলাপী পোশাক পরা একটি তিন বছরের মেয়ে শুয়ে আছে।

"ওই তোমার শিশু ! আরে, এ যে একটা মেয়ে, তাহলে তো আরও ভাল !" ফরাসীটি বলল। "বিদায় হে মোটা ! আমাদেরও মানুষের মতই ব্যবহার করতে হয় ; কি জান, আমরা সকলেই তো মরণশীল।" কথা-গুলি বলে লোকটি তার সহকর্মীদের দিকে ছুটে গেল।

আনন্দে রুদ্ধশ্বাস পিয়ের ছুটে গিয়ে ছোট মেয়েটিকে কোলে তুলে নিতে গেল। কিন্তু একজন অপরিচিত মানুষকে দেখে রুগ্ন, গলা ফোলা মেয়েটি চীৎকার করে ছুটতে আরম্ভ করল। পিয়ের অবশ্য তাকে ধরে কোলে তুলে নিল। মেয়েটি বেপরোয়াভাবে চেঁচাতে চেঁচাতে পিয়েরের হাত থেকে ছাড়া পাবার জন্য তাকে আঁচড়াতে-কামড়াতে শুরু করে দিল। কোন নোংরা জন্তুকে ছোঁবার মতই পিয়েরের মনে আতংক ও বিরক্তি দেখা দিল। তবু মেয়েটিকে ছুঁড়ে ফেলে না দিয়ে তাকে নিয়ে বড় বাড়িটার দিকে ছুটে গেল। অবশ্য যেপথে সে এসেছিল এখন সেপথে ফিরে যাওয়া অসম্ভব; দাসী অনিস্কা সঙ্গে নেই; করুণা ও বিরক্তির মিশ্র অনুভূতিতে ক্রন্দনরত ভেজা মেয়েটিকে যথাসম্ভব আদরের সঙ্গে বুকে চেপে ধরে পিয়ের আর একটা পথের খোঁজে বাগানের ভিতর দিয়ে ছুটতে লাগল।

অধ্যায়—৩৪

নানা উঠোন ও গলি দিয়ে ছুটতে ছুটতে ছোট বোঝাটি নিয়ে পিয়ের পোভার্স্ক'য়ের এক কোণে অবস্থিত গ্রুজিন্স্কি বাগানে ফিরে এল। প্রথমে সে জায়গাটা চিনতেই পারে নি, কারণ বিভিন্ন বাড়ি থেকে টেনে বের করা মালপত্রে ও লোকজনের ভিড়ে জায়গাটা এখন ভিড়ে ভিড়াক্কার। মাল-পত্রসহ অনেক রুশ পরিবার ছাড়া বিচিত্র পোশাক পরা কিছু ফরাসী সৈন্যও সেখানে ভিড় করেছে। পিয়ের তাদের দিকে ফিরেও চাইল না। মেয়েটিকে যার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি অন্য কাউকে বাঁচাতে যাবার জন্য সেই সরকারী কর্মচারির পরিবারটিকেই সে খুঁজতে লাগল। এখনও তার অনেক কিছু করার আছে, আর সেটা তাড়াতাড়িই করতে হবে। আগুনের তাপে ও ছুটে আসার জন্য তার মুখটা লাল হয়ে উঠেছে; এইমুহূর্তে তার মধ্যে যেন ফিরে এসেছে যৌবনের শক্তি, উদ্দীপনা ও সংকল্পের দৃঢ়তা। মেয়েটি এখন শান্ত হয়েছে; ছোট ছোট হাত দিয়ে পিয়েরের কোটটা চেপে ধরে একটা ছোট বন্য পশুর মত চারদিকে তাকাচ্ছে। পিয়ের মাঝে মাঝে হেসে তার দিকে তাকাচ্ছে। তার মনে হচ্ছে, সেই ভয়ার্ত, রুগ্ন ছোট মুখখানিতে সে যেন একটা সকরুণ নিষ্পাপ কিছু দেখতে পাচ্ছে।

সরকারী কর্মচারি অথবা তার স্ত্রীকে কোথাও খুঁজে পেল না। বড় বড় পা ফেলে ভিড়ের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে সে সকলেরই মুখটা ভাল করে দেখতে লাগল। আপনা থেকেই একটি জর্জীয় বা আর্মেনীয় পরিবারের দিকে তার নজর গেল। পরিবারে মোট তিনটি মানুষ; একটি অতীব সৌম্যদর্শন প্রাচ্য দেশীয় বৃদ্ধ; পরনে কাপড়ে-ঢাকা ভেড়ার চামড়ার নতুন কোট ও নতুন বুট; অনুরূপ চেহারার একটি বৃদ্ধা ও একটি যুবতী। যুবতীটির কালো বাঁকা ভুরু,

লম্বা, সুন্দর, ভাবলেশহীন মুখে অসাধারণ উজ্জ্বলতা। পিয়েরের মনে হল সে যেন প্রাচ্য সৌন্দর্যের পরিপূর্ণতার প্রতিচ্ছবি। খোলা জায়গায় ইতস্তত ছড়ানো জিনিসপত্র ও লোকজনের মাঝখানে দামী সাটিনের জোব্বা ও উজ্জ্বল লিলাক রঙের শাল পরে সে বসে আছে; দেখে মনে হচ্ছে যেন একটি সুন্দর, সতেজ স্পষ্টতই বিদেশী গাছকে এনে বরফের বুকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে। স্পষ্টতই নিজের রূপ সম্পর্কে সে সচেতন, এবং সেজন্য ভীতও বটে। তার মুখটা পিয়েরের বড় ভাল লাগল, বেড়ার পাশ দিয়ে দ্রুত পায়ে যেতে যেতে ও বার কয়েক সে তার দিকে ফিরে তাকাল। বেড়ার ধারে পৌঁছেও যাদের খুঁজছে তাদের না পেয়ে সে থেমে চারদিকে তাকাল।

মেয়েটি কোলে থাকায় সকলেরই দৃষ্টি পড়ছে তার উপর। একদল কৃশ নরনারী তার চারদিকে ভিড় করে দাঁড়াল।

তারা শুধাল, "আপনার কি কেউ হারিয়েছে? আপনি তো একজন ভদ্রশ্রেণীর লোক, তাই না? এটি কার মেয়ে?"

জবাবে পিয়ের ব্যাপারটা খুলে বলে জানতে চাইল তারা কেউ সেই স্ত্রীলোকটিকে চেনে কি না।

একটি বুড়ো ডিয়েকন বলল, "আরে, নিশ্চয় আন্‌ফেরভরা হবে। প্রভুর অনেক দয়া, প্রভুর অনেক দয়া!"

একটি স্ত্রীলোক বলল, "আন্‌ফেরভরা? না। তারা তো সকলেই চলে গেছে। এটি নিশ্চয় মারি নিকলায়েভ্‌না অথবা আইভানভদের মেয়ে হবে!"

একজন গৃহ-ভৃত্য বলল, "উনি বলছেন একটি 'স্ত্রীলোক', কিন্তু মারি নিকলায়েভ্‌না তো একটি মহিলা।"

পিয়ের বলল, "তোমরা তাকে চেন? শুট্‌কো চেহারা, লম্বা দাঁত।"

"নিশ্চয় মারি নিকলায়েভ্‌না! ওই নেকড়ের দল যখন ঝাঁপিয়ে পড়ল তখন তারা বাগানের ভিতরে চলে এসেছিল," ফরাসী সৈন্যদের দেখিয়ে স্ত্রীলোকটি বলল।

"হে প্রভু, দয়া কর!" ডিয়েকন বলল।

"ওদিকে চলে যান, ওরা সেখানেই আছে। নিশ্চয় সে। সে তো অনবরত হা-হুতাশ করছে আর কাঁদছে।" স্ত্রীলোকটি বলতে লাগল। "নিশ্চয় সেই হবে। এই যে, এদিকে!"

কিন্তু তার কথা পিয়েরের কানে গেল না। কয়েক পা দূরে যে কাণ্ডটা ঘটছে কয়েক সেকেণ্ড ধরে সেটাই সে দেখছে। সেই আর্মেনীয় পরিবার ও দুটি ফরাসী সৈনিককেই সে দেখছে। সৈনিকদের একজন ছোটখাট, চটপটে, পরনের নীলকোটটা কোমড়ের কাছে দড়ি দিয়ে বাঁধা, মাথায় রাত-টুপি, খালি পা। অপর জনের চেহারাটাই বিশেষ করে পিয়েরের নজরে পড়েছে;

লোকটি লম্বা, লিকলিকে, গোল কাঁধ, ভাল চুল, ধীর গতি, আর মুখে একটা বোকা-বোকা ভাব। পরনে মেয়েদের ঢিলে পশমী ঘাঘরা, নীল ট্রাউজার ও বড়, ছেঁড়া চটের বুট। খালি পা, ছোটখাট, নীলকোট পরা ফরাসীটি আর্মেনীয়দের কাছে গিয়ে কি যেন বলেই বুড়ো মানুষটির পা চেপে ধরল, আর সেও সঙ্গে সঙ্গে বুট জোড়া খুলতে শুরু করল। পশমী ঘাঘরাপরা অপর ফরাসীটি সুন্দরী আর্মেনীয় মেয়েটির সামনে দাঁড়িয়ে দুই হাত পকেটে ঢুকিয়ে নীরব ও নিশ্চলভাবে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

হঠাৎ বাচ্চাকে সেই স্ত্রীলোকটির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে পিয়ের বলল, "এই যে, মেয়েটিকে নাও! ওর বাপ-মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিও!" ক্রন্দনরতা মেয়েটিকে মাটিতে নামিয়ে রেখে পিয়ের আবার সেই ফরাসী সৈনিক ও আর্মেনীয় পরিবারের দিকে ফিরে তাকাল।

বুড়ো লোকটি ইতিমধ্যেই খালি পা হয়ে বসে আছে। ছোটখাট ফরাসীটি দ্বিতীয় বুটটা হাতিয়ে নিয়ে দুটো বুটে ঠোকাঠুকি করছে। বুড়ো লোকটি কান্নায় ভাঙা গলায় কি যেন বলছে, কিন্তু পিয়ের একনজর সেদিকে তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল; তার সমস্ত মনোযোগ তখন পশমী ঘাঘরাপরা ফরাসীটির উপর নিবদ্ধ; সে তখন ঈষৎ দুলতে দুলতে যুবতীটির আরও কাছে এগিয়ে গেছে। পকেট থেকে হাত দুটি বের করে মেয়েটির গলা চেপে ধরেছে।

আর্মেনীয় সুন্দরীটি তখনও নিশ্চল হয়ে একই ভঙ্গীতে বসে আছে; চোখের দীর্ঘ পাতা দুটি নেমে এসেছে; যেন সৈনিকটি তাকে নিয়ে কি করছে তা সে দেখছেও না, বুঝছেও না।

পিয়ের তাদের কাছে ছুটে যেতেই পশমী ঘাঘরাপরা লম্বা লুঠেরাটা আর্মেনীয় যুবতীর গলার নেকলেস ধরে টান দিয়েছে, আর যুবতীটি গলাটা চেপে ধরে তারস্বরে চীৎকার করছে।

ঘাড় ধরে সৈনিকটিকে একপাশে ঠেলে দিয়ে পিয়ের কর্কশ গলায় বলে উঠল, "মেয়েটিকে ছেড়ে দাও!"

সৈনিকটি মাটিতে পড়েই উঠে দৌড়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু তার বন্ধুটি বুটজোড়া ফেলে দিয়ে তলোয়ার বের করে রুদ্র মূর্তিতে পিয়েরের দিকে এগিয়ে গেল।

চীৎকার করে বলল, "এদিকে তাকাও, একটিও বাজে কথা নয়!"

পিয়ের তখন এত রেগে গেছে যে সে সব কিছু ভুলে গেল, তার শক্তি যেন দশগুণ বেড়ে গেল। খালি পা ফরাসীটির দিকে ধেয়ে গিয়ে সে তলোয়ার তুলবার আগেই একঘুসিতে তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে ঘুসির পর ঘুসি চালাতে লাগল। ভিড়ের ভিতর থেকে তার সহর্ষ জয়ধ্বনি উঠল, আর ঠিক সেই মুহূর্তে ফরাসী উহ্‌লানদের একটি অশ্বারোহীপাহারা-বাহিনী মোড় ঘুরে সেখানে এসে হাজির হল। উহ্‌লানরা জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে পিয়ের

ও ফরাসী সৈনিকটিকে ঘিরে দাঁড়াল। তারপর কি হল কিছুই পিয়েরের মনে নেই। শুধু মনে আছে, সে যেন কাকে মারল, আর নিজেও তার হাতে মার খেল, এবং শেষ পর্যন্ত তার হাত দুটি বেঁধে ফেলা হল, এবং একদঙ্গল ফরাসী সৈনিক তাকে ঘিরে ধরে তার শরীরটা খুঁজে খুঁজে দেখছে।

"লেফ্‌টেন্যাণ্ট-এর কাছে একখানা ছুরি আছে," সর্বপ্রথম এই কথাগুলিই পিয়ের বুঝতে পারল।

"অ্যাঁ, একটা অস্ত্র ?" এই কথা বলে অফিসার খালি পা সৈনিকটির দিকে মুখ ফেরাল; তাকেও পিয়েরের সঙ্গেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। "ঠিক আছে, তোমার যা বক্তব্য তা সামরিক আদালতেই বলো।" সে পিয়েরের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। "তুমি ফরাসী বলতে পার ?"

রক্তবর্ণ চোখ তুলে পিয়ের চারদিকে তাকাল, কোন জবাব দিল না। তার মুখটা নিশ্চয় ভয়ংকর দেখাচ্ছে কারণ অফিসার ফিস্‌ ফিস্‌ করে কিছু বলতেই আরও চারজন উহ্‌লান দল ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে পিয়েরের দুই পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল।

পিয়েরের বেশ কিছুটা দূরে থেকে অফিসার আবার শুধাল, "তুমি ফরাসী বলতে পার ?....দোভাষীকে ডাক।"

অসামরিক রুশ পোশাক পরা একটি ছোট-খাট মানুষ সেনাদলের ভিতর থেকে ঘোড়ায় চড়ে সামনে এগিয়ে এল। তার পোশাক ও কথা বলার ভঙ্গী দেখে পিয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাকে চিনতে পারল—লোকটি মস্কোর কোন দোকা-নের ফরাসী দোকানদার।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পিয়েরকে লক্ষ্য করে দোভাষী বলল, "একে তো দেখে সাধারণ লোক বলে মনে হচ্ছে না।"

"আরে, একে তো দেখতে অবিকল ঘর জ্বালানিয়া লোকেরই মত। ওকে জিজ্ঞাসা কর ও কে।"

বাজে রুশ ভাষায় লোকটি শুধাল, "আপনি কে ? বড় কর্তার প্রশ্নের জবাব দিন।"

পিয়ের হঠাৎ ফরাসীতেই জবাব দিল, "আমি কে তা আপনাকে বলব না। আমি আপনার বন্দী—নিয়ে চলুন।"

অফিসার ভ্রূকুটি করে তো-তো করে বলল, "ও, ও! বেশ, তাহলে অগ্রসর হও।"

উহ্‌লানদের ঘিরে একটা ভিড় জমে উঠেছে। পিয়েরের একেবারে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে একটি চাষী স্ত্রীলোক, সঙ্গে একটি ছোট মেয়ে। সৈন্যরা সদলে রওনা হলে সে সামনে এগিয়ে গেল।

বলল, "ওরা আপনাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে বাবা ? কিন্তু এই ছোট মেয়েটা, এই ছোট মেয়েটা যদি তার না হয় তাহলে একে নিয়ে আমি কি

করব ?"

"ওই স্ত্রীলোকটি কি চায় ?" অফিসার জানতে চাইল।

পিয়ের যেন নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। যে ছোট মেয়েটিকে সে উদ্ধার করেছে তাকে দেখে তার বড়ই আনন্দ হল।

সে অস্ফুট গলায় বলল, "ও কি চায় ?" ও আমার মেয়েটিকে নিয়ে এসেছে; এইমাত্র তাকে আমি আগুনের হাত থেকে বাঁচিয়েছি।...বিদায়! এই উদ্দেশ্যহীন, মিথ্যা কথাটা কেমন করে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল তা বুঝতে না পেরে সে বিজয়ীর দৃঢ় পদক্ষেপে ফরাসী সৈন্যদের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে চলল।

লুঠতরাজ থামাবার জন্য এবং বিশেষ করে যারা এই অগ্নিকাণ্ডের নায়ক— জনসাধারণের মতে তাদের বেশীর ভাগই সেদিন এসেছিল ঊর্ধ্বতন ফরাসী অফিসারদের ভিতর থেকেই—তাদের ধরবার জন্য দুরোস্‌নেল-এর হুকুমে মস্কোর বিভিন্ন রাস্তায় যেসব প্রহরীদল পাঠানো হয়েছিল, এই ফরাসী প্রহরীদল তাদেরই একটি। অনেক রাস্তায় ঘুরে ঘুরে প্রহরীদল সন্দেহক্রমে আরও পাঁচজন রুশকে গ্রেপ্তার করল: একটি ছোট দোকানদার, দুটি ছাত্র, একজন চাষী ও একজন গৃহ-ভৃত্য; তাছাড়া কিছু লুঠেরাও ছিল। কিন্তু এইসব নানা ধরনের সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের মধ্যে পিয়েরকেই ধরে নেওয়া হয়েছিল সবার চাইতে সন্দেহভাজন বলে। সেইরাতে তাদের সকলকে যখন নিয়ে আসা হল জুবভ প্রাচীরের উপরে অবস্থিত সেই বড় বাড়িটাতে যেটাকে রক্ষীনিবাস রূপে ব্যবহার করা হয়েছিল। তখন কড়া পাহারায় পিয়েরকে রাখা হল সকলের থেকে আলাদা করে।

দ্বাদশ পর্ব

অধ্যায়—১

সেইসময় পিতার্সবুর্গের উপরমহলে ফরাসী রুমিয়ান্‌ত্‌সেভ, জারপত্নী মারিয়া ফীদরভ্‌না ও অন্যদের দলের মধ্যে একটা জটিল সংঘাত ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, আর দরবার মহলের অলস মানুষদের গুনগুনানিতে সেটা চাপা পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু পিতার্সবুর্গের শান্ত, বিলাসবহুল জীবন কেবলমাত্র বাস্তব জীবনের অপচ্ছায়া ও চিন্তা নিয়েই ব্যস্ত: সে জীবন তার পুরনো পথ ধরেই চলেছে; ফলে রুশ জনগণের বিপদ ও কঠিন অবস্থার কথা তাদের বোঝানো খুবই শক্ত। সেখানে চলেছে সেই একই অভ্যর্থনা-সভা ও বলনাচের আসর, ফরাসী থিয়েটার, রাজদরবারকে ঘিরে সেই স্বার্থ, চাকরি ও ষড়যন্ত্রের খেলা। কেবলমাত্র একেবারে উচ্চতম মহলে বাস্তব অবস্থার অসুবিধা-

গুলি স্মরণ করবার চেষ্টা হচ্ছে। এই কঠিন পরিস্থিতিতে দুই সম্রাজ্ঞীর ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহারের নানা গল্প সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। সম্রাজ্ঞী মারিয়ার একমাত্র চিন্তা তার পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা নানা দাতব্য ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কল্যাণ; সে নির্দেশ দিয়েছে, ঐসব প্রতিষ্ঠানকে কাজানে সরিয়ে নিতে হবে, আর তাদের জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদাও হয়ে গেছে। অবশ্য সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথকে যখন জিজ্ঞাসা করা হল তার কি নির্দেশ, তখন স্বভাবসিদ্ধ রুশ দেশপ্রেমের অনুপ্রেরণায় সে জবাব দিল, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান-গুলি সম্পর্কে কোন নির্দেশ সে দেবে না, কারণ সেটা রাষ্ট্রের ব্যাপার, তবে ব্যক্তিগতভাবে তার কথা হল—সে পিতার্সবুর্গ ছাড়বে একেবারে সকলের শেষে।

২৬শে অগস্ট, ঠিক বরদিনো যুদ্ধের দিনে, আন্না পাভ্‌লভ্‌নার বাড়িতে একটা সান্ধ্যসম্মিলনীর আয়োজন করা হয়েছে। মহাত্মা সের্গেইয়ের একটি দেবমূর্তি সম্রাটকে পাঠাবার সঙ্গে সঙ্গে মহামান্য বিশপ তাকে যে চিঠিখানি লিখেছে সেটা পাঠ করাই ঐ সম্মিলনীর প্রধান অনুষ্ঠান। বক্তা হিসাবে প্রিন্স ভাসিলির খ্যাতি আছে; চিঠিটা সেই পড়বে। আন্না পাভ্‌লভ্‌নার সান্ধ্য বৈঠকে এধরনের পাঠের একটা রাজনৈতিক তাৎপর্য সব সময়ই থাকে। সে আশা করছে সেদিন সন্ধ্যায় কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকবে; ফরাসী থিয়েটার দেখার জন্য তাদের লজ্জায় ফেলে তাদের মনে দেশাত্ম-বোধকে জাগিয়ে তুলতে হবে। ইতিমধ্যেই অনেকে হাজির হয়েছে, কিন্তু যাদের উপস্থিতি সে আশা করছে তারা সকলে এসে না পৌঁছায় আন্না পাভ্‌লভ্‌না পাঠ শুরু করতে না দিয়ে একটা সাধারণ আলোচনা শুরু করে দিয়েছে।

পিতার্সবুর্গে সেদিনকার বড় খবর কাউণ্টেস বেজুখভার অসুখ। কয়েকদিন আগে সে অপ্রত্যাশিতভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে; সাধারণত যেসব বৈঠকের মধ্যমণি হয়ে সে বিরাজ করে সে রকমের বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানে সে হাজির হতে পারে নি, কারও সঙ্গে নাকি দেখাও করছে না, এবং পিতার্সবুর্গের যে-সব নামী ডাক্তাররা সাধারণত তার চিকিৎসা করে তাদের বদলে জনৈক ইতালীয় ডাক্তার একটা নতুন অসাধারণ পদ্ধতিতে তার চিকিৎসা করছে।

সকলে ভাল করেই জানে যে একই সঙ্গে দুই স্বামীকে বিয়ে করার অসুবিধার ফলেই এই মনোহারিণী কাউণ্টেসটি অসুস্থ হয়ে পড়েছে, আর ইতালীয় ডাক্তারটির চিকিৎসাই হচ্ছে সেই অসুবিধা দূর করা; কিন্তু আন্না পাভ্‌লভ্‌নার সম্মুখে সেকথা বলার, এমন কি সেকথা জানার ভাব দেখা-বার সাহসও কারও নেই।

"সকলেই বলছে বেচারী কাউণ্টেস খুব অসুস্থ। ডাক্তার বলছে তার এনৃজায়না পেক্টরিস হয়েছে।"

"এন্‌জায়না? ওঃ, সে যে ভয়ানক অসুখ!"

"সকলে বলছে, এন্‌জায়নাকে ধন্যবাদ, দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে এবার মিলন ঘটেছে....।" মহাখুশির সঙ্গে সকলে "এন্‌জায়না" কথাটা বার বার উচ্চারণ করতে লাগল।

"সকলে বলছে, বুড়ো কাউণ্টের অবস্থা শোচনীয়। ডাক্তার যখন বলল যে রোগীর অবস্থা বিপজ্জনক তখন সে শিশুর মত কেঁদেছে।"

"ওঃ, কী ভয়ঙ্কর ক্ষতিই না হবে; তিনি তো একটি মনোহারিণী স্ত্রীরত্ন।"

ঠিক সেইসময় সেখানে হাজির হয়ে আন্না পাভ্‌লভ্‌না বলল, "আপনারা বেচারী কাউণ্টেসের কথা বলছেন? খবর নিতে আমি লোক পাঠিয়েছিলাম, শুনলাম এখন কিছুটা ভাল। ওঃ, তিনি তো অবশ্যই পৃথিবীর মধ্যে সকলের চাইতে মনোরমা নারী। আমরা ভিন্ন দলের লোক, কিন্তু তাই বলে যে প্রশংসা তার প্রাপ্য তা তো জানাতেই হবে। তার ভাগ্যই খারাপ।"

বিখ্যাত ডাক্তারদের না ডেকে একজন হাতুড়ে দিয়ে তার চিকিৎসা করানো হচ্ছে বলে একটি অনভিজ্ঞ যুবক বিস্ময় প্রকাশ করল। আন্না পাভ্‌-লভ্‌না সঙ্গে সঙ্গে তিক্ত কণ্ঠে বলে উঠল, "আপনি হয় তো আমার চাইতে ভাল খবর রাখেন, কিন্তু খুব নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে আমি জেনেছি যে এই ডাক্তারটি খুব জ্ঞানী ও গুণী। তিনি স্পেনের রাণীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক।"

এইভাবে যুবকটিকে বিধ্বস্ত করে দিয়ে আন্না পাভ্‌লভ্‌না আর একটা দলের কাছে এগিয়ে গেল। সেখানে বিলিবিন অস্ট্রীয়দের নিয়ে কথা বলছে আর একটা "রসিকতার" জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

"পেত্রপল-এর বীর" উইৎগেন্‌স্তিন ফরাসীদের কাছ থেকে যেসব অস্ট্রীয় পতাকা হস্তগত করেছিল সেগুলি ভিয়েনায় পাঠাবার সময় তার সঙ্গে যে কূটনৈতিক চিঠিটি পাঠানো হয়েছিল তার উল্লেখ করে বিলিবিন বলল, "আমি তো মনে করি চিঠির মন্তব্যটি মজাদার।"

"কি? সেটা কি?" আন্না পাভ্‌লভ্‌না শুধাল।

নিজের লেখা সেই কূটনৈতিক চিঠির আসল বয়ানটিই সে বলে দিল।

"সম্রাট এই অস্ট্রীয় পতাকাগুলি ফেরৎ পাঠাচ্ছেন; বিপথে যাওয়া বন্ধুত্ব-পূর্ণ পতাকাগুলিকে ভুল পথের উপর পাওয়া গিয়েছিল," কথাগুলি শেষ করার পরে বিলিবিনের কুঞ্চিত ভুরু আবার সমান হয়ে গেল।

"চমৎকার! চমৎকার!" প্রিন্স ভাসিলি মন্তব্য করল।

প্রিন্স হিপোলিত অপ্রত্যাশিতভাবে উঁচু গলায় বলল, "ওয়ারস যাবার পথ বোধ হয়।" কথাটার অর্থ বুঝতে না পেরে সকলেই তার দিকে তাকাল। প্রিন্স হিপোলিতও পুলকিত বিস্ময়ে চারদিকে তাকাল। নিজের কথাগুলির অর্থ সে নিজেও ভাল করে জানে না। কূটনৈতিক চাকরি-জীবনে যে অনেকবার

লক্ষ্য করেছে যে এই ধরনের আকস্মিক উক্তিকে সকলেই বুদ্ধির পরিচায়ক বলে মনে করে। যাই হোক, এই সময় আন্না পাভ্‌লভ্‌না যার জন্য অপেক্ষা করে আছে সেই দেশাত্মবোধ-হীন লোকটি ঘরে ঢুকল, আর সেও হেসে প্রিন্স হিপোলিতের দিকে একটা আঙুল নেড়ে প্রিন্স ভাসিলিকে টেবিলের কাছে ডেকে নিয়ে গেল; তার হাতে দুটো মোমবাতি ও পাণ্ডুলিপিটা দিয়ে পাঠ শুরু করতে বলল। সকলেই নীরব হয়ে গেল।

প্রিন্স ভাসিলি পড়তে লাগল: "মহামান্য রাষ্ট্রপ্রধান ও সম্রাট! মা যে-ভাবে আকুল সন্তানদের কোলে টেনে নেন, আমাদের প্রাচীন রাজধানী, নব জেরুজালেম মস্কোও সেইভাবে বরণ করছে তার খৃস্টকে"—"তার" কথাটাকে সে বিশেষ জোর দিয়ে পড়ল—"এবং কুয়াশার আবরণের ভিতর দিয়ে আপনার শাসনকালের উজ্জ্বল গৌরব প্রত্যক্ষ করে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় গেয়ে উঠেছে, "হোসান্না; যিনি আসছেন তিনিই ধন্য!"

প্রিন্স ভাসিলি শেষের কথাগুলি উচ্চারণ করল অশ্রুপূর্ণ স্বরে।

বিলিবিন মনোযোগ দিয়ে তার নখগুলি পরীক্ষা করতে লাগল। অন্য অনেককে দেখে মনে হল তারা যেন ভয় পেয়েছে। আন্না পাভ্‌লভ্‌না পরবর্তী কথাগুলিকে ফিস্‌ফিস্‌ করে আগাম বলে দিল: "ফ্রান্সের সীমান্ত হতে আগত সাহসী ও উদ্ধত গোলিয়াত...."

প্রিন্স ভাসিলি পড়তে লাগল।

"ফ্রান্সের সীমান্ত হতে আগত সাহসী ও উদ্ধত গোলিয়াত মৃত্যুবাহী ত্রাস দিয়ে রাশিয়াকে ঢেকে দিক; রুশ ডেভিডের হাতের গুল্‌তি স্বরূপ বিনীত বিশ্বাস সহসা আঘাত করবে তার রক্ত পিপাসু গর্বোদ্ধত শিরে। ঈশ্বরের সেবক এবং প্রাচীনকালে আমাদের দেশের দুর্দিনের ত্রাণকর্তা মহাত্মা সের্গেইর দেবমূর্তিটি ইয়োর ইম্পিরিয়াল ম্যাজেস্টির হাতে অর্পণ করা হল। ঈশ্বরের কাছে আমার এই একান্ত প্রার্থনা, সর্বশক্তিমান যেন এই ন্যায়বান জাতির মাথা উঁচু রাখেন, করুণা করে ইয়োর ম্যাজেস্টির মনোবাসনা পূর্ণ করেন।"

"কী জোর! কী রচনা ভঙ্গী!" পাঠক ও লেখক দুয়েরই প্রশংসা-বাক্য উচ্চারিত হতে লাগল।

এই পাঠ শুনে উৎসাহিত হয়ে আন্না পাভ্‌লভ্‌নার অতিথিরা অনেকক্ষণ ধরে পিতৃভূমির অবস্থা নিয়ে আলোচনা করল এবং কয়েকদিনের মধ্যেই যে যুদ্ধ হবে তার ফলাফল নিয়ে নানারকম অনুমান করতে লাগল।

আন্না পাভ্‌লভ্‌না বলল, "ঠিক দেখবেন, আগামী কাল সম্রাটের জন্ম-দিনেই আমরা খবর পাব। আমার মনের পূর্বাভাষ কিন্তু অনুকূল!"

অধ্যায়—২

আন্না পাভ্‌লভ্‌নার পূর্বাভাষ বাস্তবে রূপায়িত হল। পরদিন সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষ্যে প্রাসাদ-গির্জায় যে প্রার্থনা-অনুষ্ঠান ছিল সেখানে প্রিন্স বল্‌কন্‌স্কিকে গির্জার বাইরে ডেকে এনে প্রিন্স কুতুজভের একটা চিঠি দেওয়া হল। যুদ্ধের দিনেই ততারিনভা থেকে কুতুজভ একটা প্রতিবেদন পাঠিয়েছে। লিখেছে, রুশ সৈন্যরা এক পাও হটে যায় নি, আমাদের চাইতে ফরাসীদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে অনেক বেশী, আর পুরো তথ্য সংগ্রহ না করেই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তাড়াতাড়িতে সে এই চিঠি লিখছে। বোঝাই যাচ্ছে যে জয়লাভ হবেই। সঙ্গে সঙ্গে গির্জা ছেড়ে চলে আসার আগেই সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ জানানো হল তাঁর সহায়তা ও জয়লাভের জন্য।

আন্না পাভ্‌লভ্‌নার মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছে। সারা সকাল শহরের বুকে একটা সানন্দ উৎসবের হাওয়া বইতে লাগল। সকলেই বিশ্বাস করল যে জয় সম্পূর্ণ হয়েছে, কেউ কেউ নেপোলিয়নের গ্রেপ্তার হওয়া, তার সিংহাসনচ্যুতি এবং ফ্রান্সের নতুন শাসনকর্তা মনোনয়নের কথাও বলতে লাগল।

দরবারের সভাসদদের এই খুশির দুটি কারণ—সম্রাটের জন্মদিনে পাওয়া সংবাদ এবং জয়লাভের ঘটনা। এ যেন একটা সার্থক পরিকল্পনাপ্রসূত বিস্ময়। কুতুজভের প্রতিবেদনে রুশ ক্ষয়-ক্ষতিরও উল্লেখ ছিল; ছিল তুচ্‌কভ্‌, ব্যাগ্রেশন ও কুতাসভ-এর নাম। অবশ্য পিতার্সবুর্গ মহলে এই দুঃখজনক ব্যাপারটার একটি মাত্র ঘটনাকে কেন্দ্র করেই আলোচনা চলতে লাগল: সেটা কুতাসভ-এর মৃত্যু। প্রত্যেকে তাকে চিনত, সম্রাট তাকে পছন্দ করত, সে ছিল বয়সে নবীন ও আকর্ষণীয়। সেদিন প্রত্যেকের মুখে একটি কথাই শোনা গেল:

"কী আশ্চর্য যোগাযোগ! ঠিক প্রার্থনা-অনুষ্ঠানের সময়েই। কিন্তু কুতাসভ কী ক্ষতিটাই না করে গেল। কত যে দুঃখ পেয়েছি!"

ভবিষ্যদ্বক্তার গর্ব নিয়ে ভাসিলি বলল, "কুতুজভ সম্পর্কে আপনাদের আমি কি বলেছিলাম? আমি আগাগোড়াই বলে এসেছি যে সেই একমাত্র লোক যে নেপোলিয়নকে পরাস্ত করতে সক্ষম।"

কিন্তু পরের দিন সেনাদল থেকে কোন সংবাদ এল না। জনসাধারণের মনে উদ্বেগ দেখা দিল। উৎকণ্ঠায় সম্রাটের দুঃখ বাড়তে লাগল; দুঃখ বাড়ল সভাসদদেরও।

"সম্রাটের অবস্থাটা একবার কল্পনা করুন!" তারা বলাবলি করতে লাগল; আর আগের দিনের মত কুতুজভের প্রশংসায় পঞ্চমুখ না হয়ে সম্রাটের এই উৎকণ্ঠার জন্য তাকেই দোষী করল। প্রিন্স ভাসিলিও সেদিন কুতুজভকে নিয়ে গর্ব প্রকাশ করতে পারল না; প্রধান সেনাপতির প্রসঙ্গ উঠলেই চুপ করে থাকল। সন্ধ্যার দিকে আর একটা ভয়ঙ্কর সংবাদ এই উৎকণ্ঠার সঙ্গে যুক্ত হল। সেই ভয়ঙ্কর অসুখেই কাউণ্টেস হেলেন বেজুখভা হঠাৎ মারা গেছে।

বড় বড় জনসমাবেশে সরকারীভাবে সকলেই বলল যে অ্যান্‌জায়না পেক্টো-রিসের আক্রমণেই কাউণ্টেস বেজুখভার মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু ঘনিষ্ঠ মহলে বিস্তারিত আলোচনা চলতে লাগল যে স্পেনের রাণীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক বিশেষ ফল পাবার জন্য একটি বিশেষ ওষুধ অল্প মাত্রায় খেতে দিয়েছিল; কিন্তু বুড়ো কাউণ্ট তাকে সন্দেহ করত বলে এবং স্বামী তার চিঠির কোন জবাব দিত না বলে (হতভাগ্য, দুশ্চরিত্র পিয়ের) যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়ে হেলেন হঠাৎ সেই ওষুধটা বেশী মাত্রায় খেয়ে ফেলে এবং তার ফলেই কোনরকম চিকিৎসার আগেই তীব্র যন্ত্রণায় তার মৃত্যু হয়েছে। আরও বলা হচ্ছে, প্রিন্স ভাসিলি ও বুড়ো কাউণ্ট ইতালীয় ডাক্তারটির উপর ক্ষেপে গিয়েছিল, কিন্তু ডাক্তার হতভাগিনী মৃতার এমন সব চিঠি তাদের দেখিয়েছে যে তারা আর এ নিয়ে কোনরকম উচ্চবাচ্য করে নি।

তিনটি দুঃখজনক ঘটনা নিয়েই সর্বত্র আলোচনা চলতে লাগল: সম্রাট কোন সংবাদ পাচ্ছে না, কুতুজভের মৃত্যু হয়েছে, আর হেলেন শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে।

কুতুজভের প্রতিবেদনের পরবর্তী তৃতীয় দিনে একজন গ্রাম্য ভদ্রলোক মস্কো থেকে এসে পৌঁছলে ফরাসীদের কাছে মস্কোর আত্মসমর্পণের খবর শহরময় রটে গেল। অবস্থা ভয়ঙ্কর! সম্রাটের কী অবস্থা! কুতুজভ বিশ্বাস-ঘাতক; মেয়ের মৃত্যু উপলক্ষ্যে যারাই প্রিন্স ভাসিলির সঙ্গে দেখা করতে আসছে তাদের কাছেই পূর্বেকার কুতুজভের প্রশংসার কথা ভুলে গিয়ে তার সম্পর্কে সে বলতে লাগল, একটি অন্ধ, অকর্মণ্য বৃদ্ধের কাছ থেকে এছাড়া অন্য কিছু আশা করাই অসম্ভব ছিল।

"আমি শুধু এই ভেবে অবাক হই যে এরকম একটা লোকের হাতে রাশিয়ার ভাগ্যকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।"

যতক্ষণ পর্যন্ত সংবাদটা বেসরকারী স্তরে ছিল ততক্ষণ তবু তাকে সন্দেহ করার একটা সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু পরদিন কাউণ্ট রস্তপ্‌চিনের কাছ থেকে এই চিঠি পাওয়া গেল:

"প্রিন্স কুতুজভের অ্যাড্জুটাণ্ট আমাকে যে চিঠিটা এনে দিয়েছে তাতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন—পুলিশ অফিসাররা যেন সেনাদলকে রিয়াজন রোড ধরে পরিচালিত করেন। তিনি লিখেছেন, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে তিনি মস্কো পরিত্যাগ করে যাচ্ছেন। মহাশয়! কুতুজভের কাজের ফলে রাজধানীর ও আপনার সাম্রাজ্যের ভাগ্য নির্ণীত হয়ে গেল! যে নগর রাশিয়ার শ্রেষ্ঠত্বের কেন্দ্রভূমি, যে নগরে আপনার পিতৃপুরুষের ভস্ম সমাহিত হয়ে আছে, সেই নগর পরিত্যাগের সংবাদ শুনে সারা রাশিয়া শিউরে উঠবে। আমি সেনা-বাহিনীকেই অনুসরণ করব। সব কিছুই সরিয়ে দিয়েছি; এখন পিতৃভূমির ভাগ্যের জন্য অশ্রুজলই আমার একমাত্র সম্বল।"

এই চিঠি পেয়ে সম্রাট নিম্নলিখিত আদেশসহ প্রিন্স বল্‌কন্‌স্কিকে কুতুজভের কাছে পাঠাল :

"প্রিন্স মাইকেল ইলারিয়োনভিচ! ২১ শে অগস্টের পরে আপনার কাছ থেকে আর কোন চিঠি পাই নি, অথচ ১লা সেপ্টেম্বর ইয়ারোস্লাভ্‌ল্‌-এর মারফৎ মস্কোর প্রধান সেনাপতির কাছ থেকে এই দুঃখজনক সংবাদ আমি পেয়েছি যে আপনি সসৈন্যে মস্কো পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই সংবাদের কি প্রতিক্রিয়া আমার উপর হয়েছে তা আপনি নিজেই কল্পনা করতে পারেন; আপনার নীরবতা আমার বিস্ময়কে আরওবাড়িয়ে তুলেছে। সেনাবাহিনীর বর্তমান পরিস্থিতি এবং যে কারণে এই দুঃখজনক সিদ্ধান্ত নিতে আপনি অনুপ্রাণিত হয়েছেন সে সম্পর্কে আপনার বক্তব্য শুনবার জন্য অ্যাডজুটাণ্ট-জেনারেল প্রিন্স বল্‌কন্‌স্কিকে দিয়ে এই চিঠি পাঠালাম।"

অধ্যায়—৩

মস্কো পরিত্যাগের ন'দিন পরে সেই ঘটনার সরকারী ঘোষণাপত্র নিয়ে কুতুজভের এক দূত পিতার্সবুর্গে এসে পৌঁছল। ওই ফরাসী দূত মিচদ রুশ ভাষা জানত না; নিজের সম্পর্কে সে বলত, বিদেশী হলেও সে মনে-প্রাণে রুশ।

স্টোন দ্বীপের রাজপ্রাসাদের পাঠকক্ষে সম্রাট সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গে দেখা করল। অভিযানের আগে মিচদ কখনও মস্কো দেখে নি, সে রুশ ভাষাও জানে না, তথাপি প্রদগ্ধ মস্কোর আগুনের শিখায় সারা পথ এসে মহামান্য সম্রাটকে মস্কোর ভস্মীভূত হবার কথা জানাতে সে খুবই বিচলিত হয়ে পড়ল। তার বিষণ্ণ মুখ দেখেই সম্রাট শুধাল, "আপনি কি কোন খারাপ সংবাদ এনেছেন কর্ণেল?"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ নীচু করে মিচদ বলল, "খুব খারাপ খবর মহাশয়। মস্কো পরিত্যক্ত হয়েছে।"

'সম্রাটের মুখ হঠাৎ রক্তবর্ণ হয়ে উঠল; সে সঙ্গে সঙ্গে শুধাল, "তারা কি বিনা যুদ্ধে আমার রাজধানী ছেড়ে এসেছে?"

মিচদ সসম্মানে কুতুজভের বাণীটিই তার কাছে প্রকাশ করল : মস্কোতে যুদ্ধ করা ছিল অসম্ভব; সেনাবাহিনী ও মস্কো দুটোকেই হারানো অথবা শুধু মস্কোকে হারানো—মাত্র এই দুটি বিকল্পই সামনে ছিল, আর ফিল্ড-মার্শাল দ্বিতীয়টি বেছে নিয়েছে।

মিচদের দিকে না তাকিয়েই সম্রাট নীরবে তার কথা শুনল।

জানতে চাইল, "ফরাসীরা কি নগরে প্রবেশ করেছে?"

"হ্যাঁ মহাশয়, মস্কো এখন ভস্মে পরিণত হয়েছে। আমি যখন মস্কো ছেড়ে আসি তখন সারা নগর জ্বলছে," দৃঢ়কণ্ঠে মিচদ জবাব দিল, কিন্তু তারপরেই

সম্রাটের দিকে তাকিয়ে সে কৃতকর্মের জন্য ভীত হয়ে পড়ল।

সম্রাট শ্বাস টানছে দ্রুত, অতি দ্রুত, তার নীচের ঠোঁটটি কাঁপছে, দুটি নীল চোখ সঙ্গে সঙ্গে জলে ভরে উঠেছে।

কিন্তু সে মুহূর্তের ঘটনা। হঠাৎ তার চোখ ভ্রূকুটিকুটিল হয়ে উঠল, যেন এই দুর্বলতা প্রকাশের জন্য নিজেকেই দোষী করছে। মাথা তুলে দৃঢ়স্বরে মিচদকে বলল :

"যা কিছু ঘটছে তা থেকেই বুঝতে পারছি কর্ণেল যে আমাদের প্রভূত ত্যাগ স্বীকার করানোই বিধাতার ইচ্ছা।....সর্বব্যাপারে তাঁর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করতে আমি প্রস্তুত: কিন্তু মিচদ, আমাকে বলুন, তাদের চোখের সামনে যখন আমার প্রাচীন রাজধানী বিনা যুদ্ধে পরিত্যক্ত হল তখন সেনাদলকে আপনি কি অবস্থায় দেখে এলেন? কোন সাহসের অভাব কি আপনি লক্ষ্য করেছেন?...."

মিচদ যখন দেখল যে মহামান্য নৃপতি শান্ত হয়েছে, তখন সেও শান্ত হল, কিন্তু সম্রাটের সোজাসুজি প্রশ্নের যে সোজাসুজি জবাব দেওয়া দরকার তার জন্য তখনই নিজেকে প্রস্তুত করতে পারল না।

সময় কাটাবার জন্য প্রশ্ন করল, "মহাশয়, একজন রাজভক্ত সৈনিকের পক্ষে উপযুক্তভাবে খোলাখুলি কথা বলবার অনুমতি কি আমাকে দেবেন?"

সম্রাট জবাব দিল, "সবসময় আমি তাই চাই কর্ণেল। আমার কাছে কিছুই লুকোবেন না, প্রকৃত অবস্থাটা আমি জানতে চাই।"

মনে মনে একটা সদুত্তর তৈরি করে ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসি ফুটিয়ে মিচদ বলল, "মহাশয়, আমি যখন সেনাদলকে ছেড়ে চলে আসি তখন প্রধানতম ব্যক্তি থেকে নিম্নতম সৈনিকটি পর্যন্ত প্রত্যেককেই দেখেছি এক বেপরোয়া, যন্ত্রণাদীর্ণ আতংকে...."

কঠোর ভ্রূভঙ্গীসহকারে সম্রাট তাকে বাধা দিল, "সে কি? দুর্ভাগ্য কি আমার রুশ সেনাদলের মনোবলও ভেঙে দেবে?...কখনও না।"

নিজের তৈরি-করা কথাগুলি বলার জন্য মিচদ এই সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিল।

সসম্ভ্রমে বলল, "মহাশয়, আপনার সরল হৃদয়ের বশে পাছে আপনি সন্ধি করতে সম্মত হন এটাই তাদের একমাত্র ভয়।" রুশ জাতির এই প্রতিনিধিটি সগর্বে ঘোষণা করল, "যুদ্ধের জন্য এবং তারা যে আপনার প্রতি কত অনুরক্ত নিজেদের জীবন দিয়ে সেটা প্রমাণ করবার জন্য তাদের বুকের মধ্যে আগুন জ্বলছে..."

"আঃ।" পরম নিশ্চিন্ত হয়ে দু'চোখে মমতার আলো ফুটিয়ে সম্রাট মিচদের কাঁধটা চাপড়ে দিল। "আপনি আমাকে বড়ই স্বস্তি দিলেন কর্ণেল।"

মাথা নীচু করে সম্রাট কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

তারপরেই সোজা হয়ে বসে মিচদকে উদ্দেশ করে রাজকীয় ভঙ্গীতে বলল, "বেশ, তাহলে সেনাদলে ফিরে যান; যেখানেই যাবেন সেখানেই আমার সাহসী সৈনিক ও ভাল মানুষ প্রজাদের বলবেন, যখন আর একটি সৈনিকও অবশিষ্ট থাকবে না তখন আমি স্বয়ং আমার প্রিয় অভিজাত সম্প্রদায় ও চাষীদের নেতৃত্ব দেব, আমার সাম্রাজ্যের শেষ শক্তিটুকুকেও কাজে লাগাব।" ক্রমাগত উজ্জীবিত হয়ে সম্রাট বলতে লাগল, "আমার দেশ যে এখনও আমাকে কী দিতে পারে সে ধারণা শত্রুর নেই।" আবেগোচ্ছল সুন্দর চোখ দুটি আকাশের দিকে তুলে বলল, "কিন্তু বিধাতার যদি এই বিধান হয় যে আমার পিতৃ-পুরুষের সিংহাসনে আমার বংশধররা আর বসবে না, তাহলে আমার যথাসর্বস্ব নিঃশেষ করে দিয়ে এতদূর পর্যন্ত দাড়ি গজিয়ে (বুকের অর্ধেকটা পর্যন্ত দেখাল) আমার দীনতম প্রজার সঙ্গে একসাথে বসে শুধু আলু খাব, তবু আমার দেশের এবং আমার প্রিয় মানুষদের অসম্মানে স্বাক্ষর করব না।"

উত্তেজিত কণ্ঠে এই কথাগুলি বলে বুঝি বা নিজ চোখের উদগত অশ্রুকে মিচদের কাছ থেকে লুকোবার জন্যই সম্রাট সহসা মুখটা ঘুরিয়ে ঘরের এক কোণে চলে গেল। কয়েক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে সম্রাট মিচদের কাছে ফিরে গেল এবং তার কনুইএর নীচে ধরে প্রবল বেগে ঝাঁকুনি দিতে লাগল। সম্রাটের সুদর্শন মুখখানি লাল হয়ে উঠেছে; দৃঢ় সংকল্পে ও ক্রোধে চোখ দুটি জ্বলছে।

"কর্ণেল মিচদ, আজ যা বললাম সেকথা ভুলে যাবেন না, হয় তো একদিন আনন্দের সঙ্গে কথাগুলি আমরা স্মরণ করতে পারব....হয় নেপোলিয়ন, না হয় আমি," বুকে হাত দিয়ে সম্রাট বলল "দুজন এক সঙ্গে আর আমরা রাজত্ব করতে পারি না। তাকে আমি চিনতে পেরেছি; সে আমাকে আর ঠকাতে পারবে না..."

ভুরু কুঁচকে সম্রাট থামল।

এইসব কথা শুনে এবং সম্রাটের চোখে দৃঢ় সংকল্পের আভাষ দেখে মিচদ —বিদেশী হলেও যে মনে-প্রাণে রুশ—সেই মহামুহূর্তটিতে অনুভব করল যে কথাগুলি তাকে সম্মোহিত করেছে, এবং যে রুশ জাতির প্রতিভূ বলে সে নিজেকে মনে করে তাদের এবং নিজের মনোভাবকে নিম্নোক্ত ভাষায় প্রকাশ করল:

"মহাশয়! এই মুহূর্তে ইয়োর ম্যাজেস্টি স্বাক্ষর করলেন জাতির গৌরব ও ইওরোপের মুক্তির দলিলে!"

মাথাটা কাত করে সম্রাট তাকে বিদায় দিল।

অধ্যায়—৪

আমরা যারা সেই সব দিনগুলিতে বেঁচে ছিলাম না তাদের পক্ষে এটা

কল্পনা করা স্বাভাবিক যে অর্ধেক রাশিয়া যখন বিজিত হয়েছে, তার অধিবাসীরা যখন দূর দূর দেশে পালিয়ে যাচ্ছে, পিতৃভূমি রক্ষার জন্য যখন একটার পর একটা বাধ্যতামূলক সেনাদল গড়ে তোলা হচ্ছে, তখন উচ্চতম থেকে নিম্নতম মর্যাদার সমস্ত রুশ অধিবাসী নিজেদের বির্সজন দিচ্ছে, পিতৃভূমিকে রক্ষা করছে, আর না হয় তো তার পতনে চোখের জল ফেলছে। সে সময়কার কাহিনী ও বিবরণে ব্যতিক্রমবিহীনভাবে শুধুমাত্র রুশদের আত্ম-ত্যাগ, দেশাত্মবোধ, হতাশা, দুঃখ, বীরত্বের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থাটা সেরকম ছিল না। আমাদের কাছে সেইরকমই মনে হয় কারণ আমরা শুধু দেখি তৎকালীন ঐতিহাসিক স্বার্থ, সমকালীন মানুষের যেসব ব্যক্তিগত স্বার্থ ছিল সেদিকে নজর দেই না। অথচ বাস্তবক্ষেত্রে সেই মুহূর্তের ব্যক্তিগত স্বার্থগুলি সাধারণ স্বার্থকে এত বেশী মাত্রায় ছাড়িয়ে যায় যে তার ফলে সাধারণ স্বার্থগুলিকে আমরা না পারি বুঝতে, না পারি দেখতে। তৎকালীন অধিকাংশ মানুষই ঘটনার সাধারণ অগ্রগতির দিকে দৃষ্টি না দিয়ে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারাই পরিচালিত হয়েছে, আর তৎকালে তাদের কার্যকলাপই ছিল সবচাইতে দরকারি।

যারা সাধারণ ঘটনাপ্রবাহকে বুঝতে এবং আত্মত্যাগ ও বীরত্বের সঙ্গে তাতে অংশ নিতে চেষ্টা করল, তারা সব কিছুকেই দেখল উল্টো করে, আর সাধারণের ভালর জন্য যা কিছু করল সবই অদরকারি ও নির্বোধের কাজ হয়ে দেখা দিল—যেমন পিয়ের ও মমোনভএর রেজিমেন্টগুলি রুশ গ্রামগুলিতে লুঠতরাজ চালাল, আর তরুণীরা ঘরে ঘরে যেসব ব্যাণ্ডেজ তৈরি করল তা কোনদিন আহতদের কাছে পৌঁছল না, ইত্যাদি। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে জ্ঞান-বৃক্ষের ফলভক্ষণের উপর যে নিষেধাজ্ঞা প্রচলিত আছে সেটাই বিশেষভাবে প্রযোজ্য। একমাত্র অচেতন কাজকর্মগুলিই ফলপ্রসূ হয়, আর যে মানুষ ঐতিহাসিক ঘটনায় অংশ গ্রহণ করে সে কদাপি তার তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারে। সে চেষ্টা করলেও তা ব্যর্থ হয়।

তৎকালীন রাশিয়ার ঘটনাবলীর সঙ্গে যে মানুষ যত বেশী ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়েছিল তার তাৎপর্য সে তত কম বুঝেছে। পিতার্সবুর্গে এবং মস্কো থেকে অনেক দূরবর্তী প্রদেশগুলিতে মহিলা ও অসামরিক ইউনিফর্মধারী ভদ্রজনরা রাশিয়া ও তার রাজধানীর জন্য চোখের জল ফলল, আত্মত্যাগের কথা বলল; কিন্তু যে সেনাবাহিনী মস্কো ছেড়ে চলে গিয়েছিল তারা মস্কো নিয়ে কথাবার্তা বা চিন্তা ভাবনা থোরাই করেছিল; মস্কোর অগ্নিদগ্ধ ধ্বংসাবশেষ আবার যখন তাদের দৃষ্টিগোচর হল তখন ফরাসীদের উপর প্রতিশোধ নেবার প্রতিজ্ঞা কেউ নিল না, বরং তারা শুধু ভেবেছিল নিজেদের বেতন, বাসস্থান, মদবিক্রিকারিণী মাত্রিস্কা, ও অন্য সব অনুরূপ কথা।

যুদ্ধের চাকরিতে লিপ্ত হবার পরে নিকলাস রস্তভও দেশরক্ষার কাজে

ঘনিষ্ঠভাবে দীর্ঘদিন ধরে অংশ নিল, কিন্তু তার মনে আত্মত্যাগের কোন উদ্দেশ্য না থাকায় রাশিয়ার ঘটনাবলীকে সে দেখেছে নৈরাশ্যহীনভাবে, আর তা নিয়ে সে নিজে কোনরকম মাথাও ঘামায় নি। তার বক্তব্য, মাথা ঘামাবার জন্য তো কুতুজভ ও অন্যরাই রয়েছে।

এইরকম মানসিক অবস্থার মধ্যেই সে জানতে পারল যে তার ডিভিসনের জন্য ঘোড়া কিনতে তাকে ভরোনেঝ পাঠানো হবে। খবর পেয়ে যুদ্ধে যোগ দিতে না পারার জন্য কোনরকম দুঃখ তো তার হলই না, বরং সে খুব খুশিই হল; আর সেকথা সে গোপনও করল না।

বরদিনোর যুদ্ধের কয়েকদিন আগে প্রয়োজনীয় টাকাপয়সা ও ক্ষমতাপত্র হাতে পেয়ে কয়েকজন হুজারকে আগাম পাঠিয়ে দিয়ে নিজে ডাক-ঘোড়ার সঙ্গে ভরোনেঝ, যাত্রা করল।

সেনাদল কর্তৃক অশ্বাদি পশুর খাদ্যসংগ্রহের কার্যকলাপ, খাদ্যবাহী ট্রেনের চলাচল ও হাসপাতালসমাকীর্ণ অঞ্চল থেকে দূরে চলে যেতে পারার কী অপার আনন্দ যে নিকলাস পেল তা শুধু সেই বুঝবে যার নিজের সে অভিজ্ঞতা হয়েছে —অর্থাৎ একাদিক্রমে কয়েকটা মাস যাকে কাটাতে হয়েছে অভিযান ও যুদ্ধের পরিবেশের মধ্যে। সৈন্য, মালগাড়ি ও শিবিরের নোংরা পরিবেশ থেকে মুক্ত হয়ে সে যখন গ্রামের মধ্যে পৌঁছে গেল, দেখতে পেল চাষী স্ত্রী-পুরুষ, ভদ্র লোকদের পল্লীভবন, মাঠে মাঠে গরু-মোষ চড়ছে, ডাক-ঘরে স্টেশন-মাস্টাররা ঘুমচ্ছে, তখন তার এত আনন্দ হল যেন এসব বস্তু সে এই প্রথম দেখছে। অনেক সময় পর্যন্ত যা তাকে বিশেষভাবে বিস্মিত ও আনন্দিত করল তা হল—স্বাস্থ্যবতী তরুণীদের পিছনে ডজন-ডজন অফিসার এখানে ঘুর-ঘুর করছে না; বরং একজন অফিসার পথে যেতে যেতে তাদের সঙ্গে হাসি-তামাশা করায় তারা বেশ খুশিই হচ্ছে।

খুব খুশি মনে রাতের বেলা নিকলাস ভরোনেঝ-এর একটা হোটেলে উঠল, শিবির-জীবনে অনেকদিন যেসব জিনিস পায় নি তার হুকুম দিল, এবং পরদিন পরিষ্কার করে কামিয়ে অনেকদিন পরে পুরো ইউনিফর্ম পরে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে গেল।

বেসামরিক বাহিনীর কম্যাণ্ডার একজন বৃদ্ধ জেনারেল; নিজের সামরিক খেতাব ও পদমর্যাদায় খুব খুশি। বেশ গুরু-গম্ভীর ভঙ্গীতে সে নিকলাসের কাছ থেকে যুদ্ধের খবরাখবর জেনে নিল। নিকলাসও খোস মেজাজে ছিল বলে তার এই ব্যবহারে সেও বেশ মজাই পেল।

সেখান থেকে সে গেল শাসনকর্তার কাছে। লোকটি ছোটখাট, সরল, অমায়িক। নিকলাসকে একটা আস্তাবলের খবর দিল, শহরের একজন অশ্ব-ব্যবসায়ী ও শহর থেকে চৌদ্দ মাইল দূরের জনৈক ঘোড়ার মালিক জোত-দারের নাম বলে দিল এবং সর্বপ্রকারে তাকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিল।

বিদায় দেবার সময় শাসনকর্তা বলল, "আপনি কাউণ্ট ইলিয়া রস্তভের ছেলে? আমার স্ত্রী আপনার মার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। প্রতি বৃহস্পতি-বার আমরা সকলে মিলিত হই—আজই তো বৃহস্পতিবার, কাজেই দয়া করে এসে আমাদের সঙ্গে মিলিত হবেন।"

সেখান থেকে ফিরেই ডাক-ঘোড়া ভাড়া করে, স্কোয়াড্রন কোয়ার্টার মাস্টারকে সঙ্গে নিয়ে নিকলাস চৌদ্দ মাইল দূরের জোতদার ভদ্রলোকের বাড়ির দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

জোতদার ভদ্রলোক অবিবাহিত, প্রাক্তন অশ্বারোহী সৈনিক, অশ্বানুরাগী, ক্রীড়াবিদ; বেশ কিছু একশ' বছরের পুরনো ব্র্যাণ্ডি ও কিছু পুরনো হাঙ্গেরীয় মদের মালিক।

সামান্য কথাবার্তার পরেই নিকলাস ছ'হাজার রুবল দামে সতেরোটি বাছাই ঘোড়া কিনে ফেলল। আহারাদির পরে একটু বেশী মাত্রায় হাঙ্গেরীয় মদ পেটে ঢেলে নিকলাস বিদায় নিল। এর মধ্যেই লোকটির সঙ্গে তার বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। বিদায়ের আগে পরস্পরকে চুমো খেয়ে নিকলাস সেই শোচনীয় রাস্তায় গাড়ি ছুটিয়ে দিল। কোচয়ানকে বার বার তাগাদা দিতে লাগল যাতে যথাসময়ে শাসনকর্তার মজলিসে পৌছনো যায়।

পোশাক ছেড়ে, মাথায় জল ঢেলে, আতর মেখে, নিকলাস যখন শাসন-কর্তার বাড়িতে পৌছল তখন বেশ দেরি হয়ে গেছে; ঢুকতে ঢুকতেই বলল, "একেবারে না আসার চাইতে দেরিতে আসাও ভাল।"

বলনাচের আসর নয়, নাচের কথা ঘোষণাও করা হয় নি, কিন্তু সকলেই জানে যে ক্যাথারিন পেত্রভ্‌না ক্ল্যাভিকর্ডে ভাল্‌স্‌ ও একোসাস বাজাবে, নাচও হবে; তাই সকলেই সেজন্য তৈরি হয়েই এসেছে।

১৮১২ সালের মফঃস্বলের জীবনযাত্রা যথাপূর্বভাবেই চলেছে; শুধু তফাতের মধ্যে মস্কো থেকে অনেক সম্পন্ন পরিবার সেখানে চলে আসায় জীবনযাত্রা অধিকতর প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠেছে এবং রাশিয়ার অন্য সব জায়গার মতই একটা বিশেষ রকমের বেপরোয়া "যাহা বাহান্ন তাহা তিপ্পান্ন ভাব" দেখা দিয়েছে; ফলে সাধারণ কথাবার্তায় আবহাওয়া ও কুশল-বিনিময়ের পরিবর্তে স্থান পেয়েছে মস্কো, সেনাদল ও নেপোলিয়ন।

ভরোনেঝের সেরা মানুষরাই শাসনকর্তার বাড়িতে জমায়েত হয়েছে।

হুজার ইউনিফর্মে সজ্জিত হয়ে চারদিকে আতর ও মদের সুগন্ধ ছড়িয়ে যেমুহূর্তে নিকলাস ঘরে ঢুকল এবং মুখে উচ্চারণ করল "একেবারে না আসার চাইতে বিলম্বে আসাও ভাল" আর অন্য অনেকের মুখে কথাটার পুনরাবৃত্তি হল, সঙ্গে সঙ্গেই সকলে তাকে ঘিরে ধরল; সকলেরই দৃষ্টি তার উপর। নিকলাসের মন বলল, এখানে এসে যথাযোগ্য স্থানটি সে পেয়েছে—সকলেরই প্রিয়পাত্র হয়েছে: দীর্ঘ কৃচ্ছ্রসাধনের পরে এ পরিস্থিতি বড়ই মনোরম,

একেবারে নেশা ধরিয়ে দেবার মত। ডাক-ঘাঁটিতে, সরাইখানায়, জোত-দারের ঘরে—সর্বত্রই কুমারীরা তাকে দর্শন করে কৃতার্থ হয়েছে; এখানে শাসনকর্তার মজলিসেও বিবাহিত ও অবিবাহিত অসংখ্য সুন্দরী তরুণী তার একটুখানি চোখের চাওয়ার জন্য অপেক্ষা করে আছে। প্রথম দিনেই নারী ও বালিকারা তার সঙ্গে হাসি-খেলায় মেতেছে, আর এই সুদর্শন বেপরোয়া হুজার যুবকটিকে কেমন করে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করা যায় তাই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। তাদের মধ্যে শাসনকর্তার স্ত্রীও একজন; সে তো প্রথম থেকেই রস্তভকে নিকট আত্মীয় হিসাবে গ্রহণ করে তাকে "নিকলাস" বলে ডাকতে শুরু করেছে।

সত্যি সত্যি ক্যাথারিন পেত্রভ্‌না ভাল্‌স্‌ ও একোসাস বাজাল এবং নাচও চলল। সে নাচে অংশ নিয়ে নিকলাস তার সাবলীল দেহভঙ্গীতে মফঃস্বল শহরটিকে আরও বেশী মুগ্ধ করে ফেলল। এমন কি নিকলাস নিজেও সে রাতে নিজের নাচ দেখে নিজেই অবাক হয়ে গেল। এত ভাল তো সে মস্কোতেও কোন দিন নাচে নি।

সারা সন্ধ্যা নিকলাসের মনোযোগ কেড়ে নিল একটি নীলনয়না, মোটা-সোটা, মনোরমা সুন্দরী; মফঃস্বলের জনৈক পদস্থ অফিসারের স্ত্রী। অপর লোকের সব স্ত্রীরাই যুবকদের জন্য সৃষ্ট হয়েছে—খুশি-খুশি যুবক-মনের এই সরল প্রত্যয়ের বশেই রস্তভ কখনও সেই মহিলাটির সঙ্গ ছাড়ল না, আর তার স্বামীর সঙ্গে এমন ভাব জমিয়ে তুলল যে মুখে না বললেও তারা দুজনেই বুঝতে পেরেছে যে নিকলাস ও এই মহিলাটির মধ্যে ভাবটা বেশ জমবে। স্বামীটি কিন্তু মোটেই এ প্রত্যয়ের অংশীদার হল না; অতীব বিষণ্ণভাবেই সে রস্তভের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগল। কিন্তু নিকলাসের দিলখোলা ব্যবহার এতই বাঁধ-ভাঙা হয়ে দেখা দিল যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে বারকয়েক নিক-লাসের হাসি-তামাশায় যোগ দিতে হল। সন্ধ্যার শেষের দিকে অবশ্য স্ত্রীর মুখ যতই রক্তিম ও উচ্ছ্বসিত হতে লাগল স্বামীটির মুখ ততই বিষণ্ণ ও গম্ভীর হতে থাকল; যেন তাদের দুজনের জন্য একটা নির্দিষ্ট প্রাণ-শক্তির বরাদ্দ আছে, আর তাই স্ত্রীর প্রাণ-শক্তি যত বাড়তে থাকে, স্বামীর প্রাণ-শক্তি ততই হ্রাস পায়।

অধ্যায়—৫

নিকলাস একটা হাতল-চেয়ারে ঈষৎ ঝুঁকে বসেছে সুন্দরী মহিলার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে; মুখের হাসিটি অক্ষুণ্ণ রেখে মহিলাটির পৌরাণিক যুগসুলভ স্তুতি-ভাষণে মুখর হয়ে উঠেছে।

'আঁটো রাইডিং-ব্রীচেস পরা পা দুটিকে নাচাতে নাচাতে আতরের গন্ধ ছড়িয়ে নিকলাস জানাল, এই ভরোমেঝের একটি মহিলাকে নিয়ে পালিয়ে

যাবার তার বড় সাধ।

"কোন্ মহিলা?"

"মহিলা মনোরমা, স্বর্গীয়া। চোখ দুটি নীল, মুখখানি প্রবাল ও হস্তিদন্তের মিশ্রণ, আর ডায়ানার দেহসৌষ্ঠব....।"

স্বামীটি এগিয়ে এসে বিষণ্ণকণ্ঠে জানতে চাইল, সে কি বিষয়ে কথা বলছে।

"আরে, নিকিতা আইভানিচ!" সবিনয়ে উঠে দাঁড়িয়ে নিকলাস চেঁচিয়ে বলল; তারপর যেন নিকিতা আইভানিচকে তার ঠাট্টার অংশীদার করার বাসনায়ই তাকে জানাল যে একটি সুন্দরী মহিলাকে নিয়ে সে পালিয়ে যাবে।

দুজনই হেসে উঠল—স্বামী বিষণ্ণভাবে, স্ত্রী খুশিতে। শাসনকর্তার ভালমানুষ স্ত্রীটি অসম্মতিসূচক দৃষ্টি নিয়ে এগিয়ে এল।

"আন্না ইগ্‌নাত্‌য়েভনা তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন নিকলাস। চলে এস। তুমি তো জান, তোমাকে নামধরে ডাকবার অধিকার তুমিই আমাকে দিয়েছ।"

"তা তো বটেই মাসি। কিন্তু তিনিটি কে?"

"আন্না ইগ্‌নাত্‌য়েভ্‌না মাল্‌ভিন্ত্‌সেভা। তার কোন্ বোন-ঝিকে তুমি নাকি বাঁচিয়েছ....মনে করতে পার কি?"

"আমি তো অনেককেই বাঁচিয়েছি!" নিকলাস বলল।

"তার বোন-ঝির নাম প্রিন্সেস বল্‌কন্‌স্কয়া। সেও মাসির সঙ্গে ভরোনেঝ এসেছে। ও হো! তোমার মুখটা দেখছি লাল হয়ে উঠেছে। সেকি, তুমি কি তাহলে..."

"দাঁড়ান! দয়া করে ওভাবে কথা বলবেন না মাসি!"

"ঠিক আছে ঠিক আছে!....আঃ, আচ্ছা মানুষ বটে তুমি!"

শাসনকর্তার স্ত্রী তাকে একটি লম্বা, মজবুত গড়নের বৃদ্ধা মহিলার কাছে নিয়ে হাজির করল। মহিলাটির মাথায় নীল ওড়না, শহরের গণ্যমান্যদের সঙ্গে সবে তাস খেলা শেষ করেছে। ইনিই মাল্‌ভিন্ত্‌সেভা, প্রিন্সেস মারির মাসি; ধনবতী নিঃসন্তান বিধবা, ভরোনেঝেই থাকে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তাস খেলার হিসাবনিকাশ করছিল। যে জেনারেলটি তার কাছ থেকে অনেক টাকা জিতে নিয়েছে তাকে তিরস্কার করতে করতেই সে চোখ তুলে কড়া চোখে তাকাল।

নিকলাসের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "খুব খুশি হলাম বাবা, দয়া করে বাড়িতে এসে দেখা করো।"

প্রিন্সেস মারি, তার স্বর্গত পিতা ও প্রিন্স আন্‌দ্রুর খোঁজ খবর নেবার পরে আর একবার নিকলাসকে তার বাড়িতে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে মহিলাটি

তাকে ছেড়ে দিল।

মাল্‌ভিন্ত্‌সেভার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিকলাস আবার নাচে যোগ-দিতেই যাচ্ছিল, এমন সময় শাসনকর্তার স্ত্রীটি এসে তার আস্তিনে হাত রেখে বলল যে তার সঙ্গে সে কিছু কথা বলতে চায়; তারপর তাকে নিয়ে বসার ঘরে ঢুকতেই সেখানে অন্য যারা ছিল তারা বেরিয়ে গেল।

মমতাভরা ছোট মুখখানিতে গাম্ভীর্যের ভাব এনে শাসনকর্তার স্ত্রী বলতে শুরু করল, "তুমি কি জান বাবা যে সেই হবে তোমার উপযুক্ত পাত্রী: ব্যবস্থা করে ফেলব কি?"

"আপনি কি বলতে চাইছেন মাসি?" নিকলাস শুধাল।

প্রিন্সেসের সঙ্গে তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করে দেব। ক্যাথারিন পেত্রভ্‌না অবশ্য লিলির কথাই বলছে, কিন্তু আমি বলেছি, না—প্রিন্সেস! ব্যবস্থা করে ফেলি, কি বল? আমি জানি, তোমার মা এজন্য আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হবে। সত্যি, মেয়েটি খুবই মনোরমা! আর একেবারে সাদাসিদেও নয়।"

"মোটেই না," নিকলাস সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল। কি বলছে সেটা না বুঝেই বলে উঠল, "তবে কি জানেন মাসি, একজন সৈনিক হিসাবে নিজেকে কারও উপর চাপিয়ে দিতেও চাই না, আবার ফিরিয়ে দিতেও চাইনা।"

"ঠিক আছে; মনে রেখ যে এটা তামাসা নয়!"

"মোটেই না!"

"ঠিক, ঠিক," যেন নিজের মনেই শাসনকর্তার স্ত্রী বলল। "কিন্তু বাবা, একটা কথা, আর যাই হোক ওই সুন্দরীটির প্রতি তুমি বড় বেশী মনোযোগ দিচ্ছ। সত্যি, স্বামীটির জন্য দুঃখ হয়..."

সরল মনে নিকলাস বলল, "না, না, ওর সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব হয়েছে।" তার মাথায় এটা ঢুকল না যে তার কাছে যেটা মজার খেলা অন্যের কাছে সেটা মজার ব্যাপার নাও হতে পারে।

আহারের সময় হঠাৎ নিকলাসের মনে হল, "শাসনকর্তার স্ত্রীকে কী সব বাজে কথা বলে দিলাম। তিনি হয়তো সত্যি সত্যি বিয়ের ব্যবস্থা করে বসবেন...আর সোনিয়া....?" বিদায় নেবার সময় শাসনকর্তার স্ত্রী যখন আর একবার হেসে বলল, "তাহলে মনে থাকে যেন!" তখন নিকলাস তাকে একপাশে ডেকে নিয়ে গেল।

"দেখুন, সত্যি কথা বলতে কি মাসি..."

"কি ব্যাপার বাবা? এস, এখানেই বসা যাক।"

সহসা নিকলাসের মনে হল, এই অপরিচিতা নারীটির কাছে তার অত্যন্ত গোপন কথাগুলি (যা সে তার মা, বোন, বা বন্ধুর কাছেও বলে নি,) বলা দরকার। পরবর্তীকালে এই ঘটনাটি মনে পড়লেই সেভাবে নেহাৎ খেয়ালের বশেই সে খোলাখুলিভাবে কথাগুলি বলেছিল: অথচ সেই দিলখোলা

মনের উচ্ছ্বাস ও আরও কিছু তুচ্ছ ঘটনা মিলে তার ও তার পরিবারের সকলের উপর একটা প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিল।

"কি জানেন মাসি, মামণির অনেক দিনের ইচ্ছা যে আমি একটি ধনবতী উত্তরাধিকারিণীকে বিয়ে করি, কিন্তু টাকার জন্য বিয়ে করার ব্যাপারটাই আমার কাছে ঘৃণার্হ বলে মনে হয়।"

"আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি," শাসনকর্তার স্ত্রী বলল।

"কিন্তু প্রিন্সেস বল্‌কন্‌স্কয়ার ব্যাপারটা আলাদা। সত্য কথাই আপনাকে বলব। প্রথমত, আমি তাকে খুব পছন্দ করি, তার প্রতি আকর্ষণ বোধ করি; তার উপরে এই পরিস্থিতিতে এমন অদ্ভুতভাবে তার সঙ্গে দেখা হবার পরে আমার তো প্রায়ই মনে হয়েছে: 'এটাই নিয়তি।' বিশেষ করে যদি মনে রাখেন যে মামণি অনেকদিন থেকেই এটা ভাবছে; কিন্তু আগে তো কখনও তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি; যেভাবেই হোক না কেন দেখাসাক্ষাৎটা ঘটে ওঠে নি। যতদিন পর্যন্ত আমার বোনের সঙ্গে তার দাদার বিয়ের কথা ছিল ততদিন অবশ্য তাকে বিয়ে করার কথা ভাবার কোন প্রশ্নই ছিল না। আর কী আশ্চর্য, নাতাশার বিয়েটা ভেঙে যাওয়া মাত্রই তার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল...আর সব কিছুই....কাজেই বুঝতেই পারছেন....আপনাকে ছাড়া আর কাউকে একথা বলি নি, কোনদিন বলবও না।"

শাসনকর্তার স্ত্রী সকৃতজ্ঞভাবে তার কনুইটা চেপে ধরল।

"আমার জ্ঞাতি বোন সোনিয়াকে আপনি জানেন? আমি তাকে ভালবাসি, বিয়ে করব বলে কথা দিয়েছি, বিয়ে করবও...কাজেই বুঝতেই পারছেন এ বিয়ের কোন প্রশ্নই....—" মুখ লাল করে নিকলাস অসংলগ্নভাবে কথাগুলি বলল।

"এটা কী রকম দৃষ্টিভঙ্গী বাবা! তুমি তো জান সোনিয়া নিঃসম্বল, আর তুমি নিজেই বলছ যে তোমার বাবার অবস্থা খুবই খারাপ। আর তোমার মা? এযে হবে তার মৃত্যুর সামিল। এই গেল এক দিক। আর সোনিয়ার জীবনটাই বা কি রকম হবে—যদি তার হৃদয় বলে কোন পদার্থ থাকে? তোমার মা হতাশায় ভেঙে পড়বে, তোমরা সকলে সর্বস্বান্ত হবে....না বাবা, তোমার ও সোনিয়ার এটা বোঝা উচিত।"

নিকলাস চুপ করে রইল। যুক্তিগুলো শুনতে তার ভাল লাগল।

একটু চুপ করে থেকে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "যেকোন অবস্থায়ই এটা অসম্ভব মাসি। তাছাড়া, প্রিন্সেসই কি আমাকে গ্রহণ করবে? আরও কথা, এখন তো তার শোকের সময়। এ সময় কি ওসব কথা ভাবা যায়!"

শাসনকর্তার স্ত্রী জবাব দিল, "কিন্তু তুমি কি ভাবছ যে আমি এখনই তোমার বিয়ে দিচ্ছি? সব কাজেরই তো একটা সঠিক সময় আছে।"

তার হাতটায় চুমো খেয়ে বলল, "কী ভাল ঘটকী আপনি মাসি...."

অধ্যায়—৬

রস্তভের সঙ্গে দেখা হবার পরে মস্কো পৌঁছে প্রিন্স মারি দেখল তার ভাই-পো এবং তাঁর শিক্ষক সেখানেই আছে, আর প্রিন্স আন্দ্রুর একটা চিঠি পেল যাতে কিভাবে তার মাসি মাল্‌ভিন্ত্‌সেভার সঙ্গে ভরোনেঝে দেখা করা যাবে সেই নির্দেশ জানানো হয়েছে।

প্রলোভনের সামিল যে অনুভূতি বাবার অসুখের সময় তাকে যন্ত্রণা দিয়েছে, তার মৃত্যুর পর থেকে, বিশেষ করে রস্তভের সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে যাত্রার আয়োজন, দাদার জন্য উৎকণ্ঠা, নতুন বাড়িতে সংসার পাতা, নতুন লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা, এবং ভাই-পোর লেখাপড়ার দিকে নজর রাখা, প্রভৃতি নানা কাজে সে অনুভূতি যেন চাপাই পড়ে গিয়েছিল। এখন শান্ত পরিবেশে একটি মাস কাটাবার পরে সে আবার নতুন করে বাবাকে হারাবার দুঃখ এবং তার সঙ্গে জড়িত রাশিয়ার সর্বনাশের বেদনা অনুভব করছে। আপনজন বলতে তার তো এখন একমাত্র দাদাই অবশিষ্ট আছে; তাই তার বিপদের আশংকায় সে এখন অনবরত উত্তেজনা ও যন্ত্রণা বোধ করছে। সে যে ভাই-পোটির লেখাপড়া ভালভাবে চালাতে পারছে না তা নিয়েও তার দুশ্চিন্তার অবধি নেই—তথাপি অন্তরের গভীরে সে এখন শান্তি পেয়েছে—রস্তভের সঙ্গে সাক্ষাতের ফলে যেসব ব্যক্তিগত স্বপ্ন ও বাসনা তার মধ্যে জেগে উঠছিল তাদের স্তব্ধ করে দিতে পারার চেতনা থেকেই সে শান্তির উদ্ভব।

শাসনকর্তার স্ত্রী পরদিনই মাল্‌ভিন্ত্‌সেভার কাছে গিয়ে হাজির হল এবং মাসির সঙ্গে তার পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা শেষ করে বলল, যদিও বর্তমান পরিস্থিতিতে আনুষ্ঠানিক বাকদানের কথা ভাবাও যায় না, তবু দুটি যুবক-যুবতীকে এমনভাবে কাছাকাছি আনা দরকার যাতে তারা পরস্পরকে বুঝতে পারে। মাল্‌ভিন্ত্‌সেভা সম্মতি জানালে শাসনকর্তার স্ত্রী মারির সামনেই রস্তভের কথা বলতে শুরু করে দিল; তার প্রশংসা করল, প্রিন্সেস মারির নাম উল্লেখ করামাত্রই যে তার মুখটা লাল হয়ে উঠেছিল সেকথাও বলল। প্রিন্সেস মারির মনে কিন্তু আনন্দের বদলে দেখা দিল বিষাদ—তার মনের শান্তি নষ্ট হল, নতুন করে দেখা দিল বাসনা, সন্দেহ, আত্ম-ধিক্কার ও আশা।

রস্তভ আসার আগের দুটি দিন প্রিন্সেস মারি অবিরাম ভাবতে লাগল, সে এলে তার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করবে। একবার ভাবল সে যখন মাসির সঙ্গে দেখা করবে তখন সে নিজে বৈঠকখানায় যাবেই না, কারণ এই শোকের সময় কোন অতিথির সঙ্গে দেখা করা তার পক্ষে উচিত হবে না; আবার ভাবল, সে মানুষটি তারজন্য যা করেছে তার পরে সেটা তার প্রতি খুবই রূঢ় আচরণ হবে।

কিন্তু রবিবারে গির্জা থেকে আসার পরে পরিচারক যখন বৈঠকখানায়

এসে জানাল যে কাউণ্ট রস্তভ এসেছে, তখন প্রিন্সেস মোটেই বিচলিত বোধ করল না, শুধু তার গালে লাগল একটু রঙের ছোঁয়া, চোখ দুটি খুশিতে ঝলমল করে উঠল।

রস্তভ ঘরে ঢুকলে প্রিন্সেস একমুহূর্তের জন্য চোখ দুটি নামিয়ে নিল যাতে অতিথি মাসির সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পায়; তারপরেই নিকলাস তার দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই সে মাথাটা তুলে চকচকে চোখে তার দিকে তাকাল। মর্যাদা ও কমনীয় তার সঙ্গে মুখে খুশির হাসি ফুটিয়ে সে অর্ধেক উঠে দাঁড়াল, সুন্দর হাতখানি বাড়িয়ে দিল, আর এমন স্বরে কথা বলতে লাগল যাতে এই প্রথম লাগল নারীত্বের প্রথম স্পন্দন। মাদ্‌ময়জেল বুরিয়েঁ অবাক বিস্ময়ে প্রিন্সেস মারির দিকে তাকাল। সে নিজে প্রেমকলায় যথেষ্ট পারদর্শিনী, তবু যে পুরুষকে আকর্ষণ করতে চায় তার সঙ্গে দেখা হলে সে নিজেও এর চাইতে ভালভাবে ব্যাপারটাকে সামাল দিতে পারত না।

"হয় কালো রংটা তাকে বিশেষভাবে মানায়, অথবা আমার অজান্তেই সে প্রভূত উন্নতি করে ফেলেছে!" মাদ্‌ময়জেল বুরিয়েঁ ভাবল।

সেই মুহূর্তে প্রিন্সেস মারির যদি চিন্তা করার ক্ষমতা থাকত তাহলে নিজের এই পরিবর্তন লক্ষ্য করে সে হয় তো মাদ্‌ময়জেল বুরিয়েঁ অপেক্ষাও বেশী আশ্চর্য হত। সেই পরিচিত প্রিয় মুখখানিকে চেনামাত্রই একটা নতুন জীবনী-শক্তি যেন তাকে পেয়ে বসল, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাকে কথা বলতে ও কাজ করতে বাধ্য করল। রস্তভ ঘরে ঢুকতেই তার মুখটা সহসা বদলে গেল। যেন একটা খোদাই-করা চিত্রিত লণ্ঠনের আলো হঠাৎ জেলে দেওয়া হল, আর সহসা যা কিছু এতক্ষণ ছিল অন্ধকার, স্থূল ও অর্থহীন, তাই প্রকাশ পেল অপ্রত্যাশিত ও উল্লেখযোগ্য সৌন্দর্যে। যে পবিত্র, আত্মিক ও আন্তরিক বেদনার ভিতর দিয়ে এতকাল সে চলে এসেছে তা যেন এই প্রথম বাইরে প্রকাশ পেল।

রস্তভের চোখেও এসবই স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ল, যেন সেও তার সারা জন্মের চেনা। রস্তভের মনে হল, যে মানুষটি তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে তার পরিচিত অন্য সকলের চাইতে স্বতন্ত্র ও ভাল, এমন কি তার নিজের চাইতেও ভাল।

কথাবার্তা যা হল তা খুবই সরল ও সাধারণ। যুদ্ধ নিয়ে কথা হল, আর অন্য সকলের মতই তা নিয়ে নিজেদের দুঃখকে তারা অযথা বাড়িয়ে বলল; তাদের শেষ দেখা, শাসনকর্তার স্ত্রী, নিকলাসের আত্মীয় স্বজন এবং প্রিন্সেস মারির কথা নিয়েও তারা আলোচনা করল।

আলোচনার ফাঁকে একসময় নিকলাস প্রিন্স আন্দ্রুর ছোট্ট ছেলেটির দিকে নজর দিল, তাকে আদর করে জানতে চাইল সে একজন হুজার হতে চায় কিনা। ছেলেটিকে হাঁটুর উপর বসিয়ে তার সঙ্গে খেলা করতে করতে

প্রিন্সেস মারির দিকে তাকাল। যে শিশুটিকে সে ভালবাসে তাকে ভালবাসার মানুষটির কোলে দেখে প্রিন্সেস মারি সুখী, ভীরু চোখে সেইদিকে তাকিয়ে রইল। নিকলাসও সেটা বুঝতে পেরে খুশিতে লাল হয়ে খেলার ছলে শিশুটিকে চুমো খেতে লাগল।

শোকের সময় চলছে বলে প্রিন্সেস মারি সমাজে বের হয় না, আর নিকলাসও পুনরায় তার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়াটা উচিত বলে মনে করছে না; অবশ্য গভর্ণরের স্ত্রী তার ঘটকালির কাজ চালিয়েই যাচ্ছে; প্রিন্সেস মারির স্তুতি-বাক্যগুলি পৌছে দিচ্ছে নিকলাসের কানে, আর তার স্তুতি-বাক্য পৌছে দিচ্ছে প্রিন্সেসের কানে, আর নিকলাসকে বার বার বলছে বিয়ের কথা ঘোষণা করতে। সেজন্য মাস-অনুষ্ঠানের আগে বিশপের বাড়িতে দুজনের সাক্ষাতের একটা ব্যবস্থা করল।

রস্তভ শাসনকর্তার স্ত্রীকে বলল সে প্রিন্সেস মারিকে বিয়ের কথা কিছু বলবে না, কিন্তু সেখানে যাবে।

তিল্‌সিটে যেমন সকলে যা ঠিক বলে মনে করেছে তাতে রস্তভ কোনরকম সন্দেহ প্রকাশ করে নি, এখানেও তেমনই সে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির হাতেই নিজেকে ছেড়ে দিল, যদিও সে দুর্বার শক্তি যে তাকে কোথায় নিয়ে যাবে তাও সে জানে না। সে জানে, সোনিয়াকে কথা দেবার পরে প্রিন্সেস মারির কাছে মনের কথা প্রকাশ করাটা হবে খুবই নীচ কাজ। সে আরও জানে যে কোনরকম নীচ কাজ সে কদাপি করবে না। কিন্তু সেই সঙ্গে সে একথাও জানে (অন্তত মনেপ্রাণে অনুভব করে) যে পরিপার্শ্বিক অবস্থার হাতে এবং যারা তাকে চালাচ্ছে তাদের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে সে কোন অন্যায় করছে না, বরং খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছে—জীবনে যত কিছু কাজ করেছে সে সব কিছুর চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

প্রিন্সেস মারির সঙ্গে সাক্ষাতের পরে তার বহিরঙ্গ জীবন আগের পথেই চলতে থাকলেও আগে তার যা কিছু ভাল লাগত এখন আর তা ভাল লাগে না; প্রায়ই সে প্রিন্সেসের কথাই ভাবে। কিন্তু আগে আগে যুবতী মহিলাদের সম্পর্কে, এমন কি একসময় অত্যন্ত উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সোনিয়া সম্পর্কেও সে যে ভাবে ভাবনা চিন্তা করত, প্রিন্সেস মারি সম্পর্কে চিন্তাটা ঠিক সেরকম নয়। ঐ সব যুবতীদের সে দেখতে যেমন সব সৎ অন্তঃকরণের যুবকরা দেখে থাকে; অর্থাৎ তাদের দেখতে সম্ভাবিত স্ত্রীরূপে, কল্পনায় তাদের মানিয়ে নিত বিবাহিত জীবনের পরিবেশের সঙ্গে: সাদা ড্রেসিং-গাউন, চায়ের টেবিলে স্ত্রী, স্ত্রীর গাড়ি, বাচ্চারা, মামণি, বাপি, তাদের সঙ্গে স্ত্রীর সম্পর্ক, ইত্যাদি—আর ভবিষ্যতের সেইসব ছবি তাকে আনন্দ দিত। কিন্তু যে প্রিন্সেস মারির সঙ্গে সকলে তার বিয়ে দিতে চেষ্টা করছে তাকে ভবিষ্যৎ বিবাহিত জীবনের ছবির সঙ্গে সে মোটেই জড়াতে পারছে না। সে চেষ্টা করলেও ছবিগুলি হয়ে উঠছে

সামঞ্জস্যবিহীন ও মিথ্যা। তা দেখে সে ভয় পায়।

অধ্যায়—৭

বরদিনোর যুদ্ধের সংবাদ এবং নিহত ও আহতদের ব্যাপারে আমাদের ক্ষয়-ক্ষতির ভয়াবহ সংবাদ, আর তার চাইতেও ভয়ংকর মস্কো পরিত্যাগের সংবাদ ভরোনেঝ-এ পৌঁছল সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি। প্রিন্সেস মারি দাদার আহত হবার সংবাদ জেনেছে গেজেট থেকে; কিন্তু তার সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট খবর জানতে না পেরে প্রিন্স আন্‌দ্রুর খোঁজে নিজেই যাত্রা করার জন্য তৈরি হয়েছে।

বরদিনোর যুদ্ধ এবং মস্কো পরিত্যাগের খবর শুনে রস্তভের মনে হতাশা, ক্রোধ, প্রতিহিংসার বাসনা, অথবা কোনরকম অনুভূতিই জাগল না; শুধু ভরোনেঝের যা কিছু সবই তার কাছে একঘেয়ে ও বিরক্তিকর হয়ে উঠল; লজ্জা ও অকর্মন্যতার একটা অস্পষ্ট অনুভূতি তাকে পেয়ে বসল। সব আলোচনাই তার কাছে আন্তরিকতাবিহীন বলে মনে হতে লাগল; কেমন করে সব কিছুর বিচার করবে তাও সে জানে না; তার মনে হল, একমাত্র রেজিমেণ্টে ফিরে গেলেই সব কিছু আবার তার কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠবে। ঘোড়া কেনার ব্যাপারে তাড়াহুড়া শুরু করে দিল, এবং অকারণেই চাকর ও স্কোয়াড্রন কোয়ার্টার মাস্টারের উপর রাগারাগি করতে লাগল।

তার যাত্রার কয়েকদিন আগে রুশদের জয়লাভ উপলক্ষ্যে ভজনালয়ে একটা বিশেষ ধন্যবাদজ্ঞাপক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হল। নিকলাসও সেখানে উপস্থিত ছিল। শাসনকর্তার কিছুটা পিছনে দাঁড়িয়ে সে নানান বিষয় চিন্তা করছিল। অনুষ্ঠান শেষ হলে শাসনকর্তার স্ত্রী তাকে ইসারায় ডাকল।

মাথা নেড়ে বিপরীতদিকে দাঁড়ানো মহিলাটিকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "প্রিন্সেসকে দেখেছ?"

নিকলাস সঙ্গে সঙ্গে প্রিন্সেস মারিকে চিনতে পারল; অবগুণ্ঠনের আড়ালে তার রেখাচিত্র দেখে যতটা নয় তার চাঁইতে বেশী তার উদ্বেগ, ভীরুতা ও করুণার ভাব দেখে। প্রিন্সেস মারি নিজের চিন্তায়ই ডুবে ছিল; গির্জা থেকে যাবার আগে শেষবারের মত সে ক্রুশ-চিহ্ন আঁকল।

নিকলাস অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকাল। আগে যে মুখ সে দেখেছে সেই একই মুখ, সেই একই পরিশীলিত আত্মিক সাধনার প্রকাশ, কিন্তু এখন সেই মুখ সম্পূর্ণ অন্যভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। সে মুখে দুঃখ, প্রার্থনা ও আশার এক সকরুণ প্রকাশ। নিকলাস নিজের থেকেই তার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল যে তার দুঃখের কথা সে শুনেছে, আর সর্বান্তঃকরণে তাকে সহানুভূতি জানাচ্ছে। তার কণ্ঠস্বর শোনার সঙ্গে সঙ্গেই প্রিন্সেস

মারির মুখে যেন একটা উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠে তার দুঃখ ও আনন্দ দুইকেই উজ্জ্বল করে তুলল।

রস্তভ বলল, "আপনাকে একটা কথা বলার ছিল প্রিন্সেস। আপনার দাদা প্রিন্স আন্দ্রু নিকলায়েভিচ যদি বেঁচে না থাকত তাহলে সে খবর সঙ্গে সঙ্গে গেজেটে ঘোষণা করা হত, কারণ সে একজন কর্ণেল।"

তার কথা সম্যক বুঝতে না পারলেও তার মুখের সক্ষেদ সহানুভূতির প্রকাশ লক্ষ্য করে প্রিন্সেস মারি রস্তভের দিকে তাকাল।

নিকলাস বলতে লাগল, "এমন অনেক ঘটনার কথা আমি জানি যেখানে বোমার একটা টুকরোর আঘাত (গেজেটে বলা হয়েছে গোলা) হয় সঙ্গে সঙ্গে মারাত্মক হয়েছে, অথবা খুবই তুচ্ছ হয়েছে। আমরা তো ভালটাই আশা করব; আমি নিশ্চিত জানি...."

প্রিন্সেস মারি তার কথায় বাধা দিল।

"ওঃ, সে যে কী ভয়ংকর..." আবেগের আতিশয্যে সেকথা শেষ করতে পারল না; সাবলীল ভঙ্গীতে মাথাটা নীচু করে পরে সকৃতজ্ঞ চোখে তার দিকে তাকিয়ে প্রিন্সেস মারি মাসির সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সেদিন সন্ধ্যায় নিকলাস বাইরে বের হল না; ঘোড়া-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে হিসাবপত্র মেটাবার জন্য ঘরেই থাকল। সেকাজ যখন শেষ হয় তখন যতটা রাত হয়েছে তাতে না বাইরে যাওয়া চলে, না ঘুমতে যাওয়া চলে; অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘরময় পায়চারি করতে করতে সে নিজের জীবনের কথাই ভাবতে লাগল; অথচ একাজটা সে কদাচিৎ করে থাকে।

স্মোলেন্স্ক্ প্রদেশে যখন প্রিন্সেস মারিকে দেখেছিল তখন তাকে রস্তভের খুব ভাল লেগেছিল। এখন ভেরোনেঝ-এ দেখা হবার পর তার প্রভাব যে প্রীতিপ্রদ হয়েছে তাই নয়, সেটা বেশ শক্তিশালী হয়েই দেখা দিয়েছে। এখানে তার মধ্যে যে বিশেষ নৈতিক সৌন্দর্য নিকলাস দেখতে পেয়েছে তাতে সে মুগ্ধ হয়েছে। অবশ্য সে এখন যাত্রার আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত; তাই তার সঙ্গে পুনরায় দেখা হবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বলে দুঃখ প্রকাশ করার কথাটা তার মাথায়ই আসে নি। কিন্তু সেদিন গির্জায় তার সাক্ষাৎটা নিকলাসের মনে এত গভীর দাগ কেটেছে যে তার মানসিক শান্তির পক্ষে সেটা বাঞ্ছনীয় নয়। সেই ম্লান, বিষণ্ণ, পরিশীলিত মুখ, সেই উজ্জ্বল দৃষ্টি, সেই শান্ত শোভন ভঙ্গিমা, আর বিশেষ করে তার সারা অঙ্গে ফুটে ওঠা গভীর বেদনা তাকে উদ্বেলিত ও সহানুভূতিশীল করে তুলেছে। পুরুষ মানুষের মধ্যে উচ্চতর আধ্যাত্মিক জীবনের প্রকাশকে সে সহ্য করতে পারে না (সেইজন্যই প্রিন্স আন্দ্রু কে তার পছন্দ নয়), তাকে সে দার্শনিকতা ও স্বপ্নালুতা বলে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উল্লেখ করে থাকে, কিন্তু সেই একই দুঃখ যখন প্রিন্সেস মারির ক্ষেত্রে তার কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত একটি গোটা আধ্যাত্ম

জগৎকে প্রকাশ করে দিল তখন সেটাই এক অনিবার্য আকর্ষণ হয়ে দেখা দিল।

নিজের মনেই বলল, "সে এক আশ্চর্য নারী। সত্যিকারের দেবদূত! কেন আজ আমি স্বাধীন নই? সোনিয়াকে নিয়ে এত তাড়াহুড়া করেছিলাম কেন?" আপনা থেকেই দুজনের তুলনা জাগল তার মনে: একজনের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার তিলমাত্র নেই, আর অপরজনের মধ্যে আছে তার প্রাচুর্য—এই আধ্যাত্মিকতার সম্পদ নিজের মধ্যে নেই বলেই সেটা তার কাছে আরও বেশী মূল্যবান। আজ যদি সে স্বাধীন থাকত তাহলে কি ঘটতে পারত সেই ছবিটাই তার সামনে দেখা দিল। প্রিন্সেসের কাছে সে বিয়ের প্রস্তাব করতে পারত, সেই হতে পারত তার স্ত্রী। কিন্তু না, সে কল্পনাও আজ সে করতে পারে না। সে ভয় পেল, মনের সামনে কোন স্পষ্ট ছবিই ফোটাতে পারল না। অনেকদিন আগেই সোনিয়াকে নিয়ে ভবিষ্যৎ জীবনের একটা ছবি সে দেখেছে; সে ছবি স্পষ্ট ও সরল, কারণ সোনিয়াকে সে ভাল করে চেনে, কিন্তু প্রিন্সেস মারিকে নিয়ে ভবিষ্যতের ছবি দেখা অসম্ভব, কারণ তাকে সে চেনে না, শুধুই ভালবাসে।

সোনিয়াকে নিয়ে দিবাস্বপ্ন দেখার মধ্যে একটা মজা আছে, একটা ফুর্তির ব্যাপার আছে, কিন্তু প্রিন্সেস মারিকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা সব সময়ই শক্ত, কিছুটা ভীতিপ্রদ।

সে ভাবতে লাগল, "আহা কী তার প্রার্থনার ধরন! তার সমস্ত অন্তর যেন সেই প্রার্থনার মধ্যে ডুবে যায়। হ্যাঁ, সেই প্রার্থনাই তো পাহাড় টলাতে পারে; আমার নিশ্চিত বিশ্বাস তার প্রার্থনার উত্তর সে পাবে।" হঠাৎ তার মনে হল, "আমি যা চাই তার জন্য প্রার্থনা করছি না কেন? আমি কি চাই? স্বাধীন হতে, সোনিয়ার হাত থেকে মুক্তি পেতে....তিনি তো ঠিকই বলেছেন," শাসনকর্তার স্ত্রীর কথাগুলি মনে পড়ে গেল: "সোনিয়াকে বিয়ে করলে তার ফলে দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছুই জুটবে না। গোলমাল, মামণির দুঃখ....সম্পত্তি নিয়ে অসুবিধা....গোলমাল, ভয়ংকর গোলমাল! তাছাড়া তাকে আমি ভালবাসি না—যেমন ভালবাসা উচিত। হে ঈশ্বর! এই ভয়ংকর, জটিল পরিস্থিতি থেকে আমাকে উদ্ধার কর!" সহসা সে প্রার্থনা করতে শুরু করল। "হ্যাঁ, প্রার্থনা পাহাড় টলাতে পারে, কিন্তু বিশ্বাস থাকা চাই, ছেলেবেলায় নাতাশা ও আমি যে প্রার্থনা করতাম তা নয়, বরফ যেন চিনি হয়ে যায়—আর সত্যি তাই হয়েছে কিনা দেখতে আমরা উঠোনে ছুটে যেতাম। না, কোন তুচ্ছ জিনিসের জন্য এখন আমি প্রার্থনা করছি না।" পাইপটা এক কোণে রেখে দুই হাত জোড় করে সে দেবমূর্তির সামনে বসল। প্রিন্সেস মারির স্মৃতিতে বিগলিত হয়ে অনেক দিন পরে সে প্রার্থনা করতে লাগল। তার চোখ জলে ভরে উঠল, গলা আটকে গেল, আর তখনই দরজা খুলে লাভ্রুশ্‌কা ঘরে ঢুকল কিছু কাগজপত্র নিয়ে।

হঠাৎ নিজের মনোভাব পাল্টে ফেলে নিকলাস চীৎকার করে উঠল, "বোকার ডিম! না ডাকতেই ঘরে ঢুকেছ কেন?"

ঘুম-ঘুম গলায় লাভ্রুশ্‌কা বলল, "শাসনকর্তার কাছ থেকে একজন লোক এসেছে একটা চিঠি নিয়ে।"

"আচ্ছা, ঠিক আছে ধন্যবাদ। তুমি যেতে পার!"

নিকলাস চিঠি দুটো নিল; একটা মার চিঠি, অপরটা সোনিয়ার। হাতের লেখা দেখে চিনতে পেরে প্রথমে সে সোনিয়ার চিঠিটাই খুলল। কয়েক লাইন পড়তেই তার মুখটা ম্লান হয়ে গেল, ভয়ে ও আনন্দে চোখ বড় বড় হয়ে উঠল।

"না, এ সম্ভব নয়!" সে চেঁচিয়ে বলে উঠল।

বসে থাকতে পারল না, চিঠিটা হাতে নিয়ে পড়তে পড়তে পায়চারি করতে লাগল। চোখ তুলে তাকাল, আবার পড়ল, আবার, ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দুই কাঁধ সোজা করল, হাঁ করে দুই হাত টান-টান করল, দুই চোখে স্থির দৃষ্টি। ঈশ্বর তার কথা শুনবে এই বিশ্বাস নিয়ে এইমাত্র যা প্রার্থনা করেছে তাই ঘটেছে; কিন্তু নিকলাস এতদূর বিস্মিত হয়েছে যেন এটা অসাধারণ ও অপ্রত্যাশিত, আর যেহেতু এত তাড়াতাড়ি এটা ঘটেছে যাতে প্রমাণ হয় যে এটা ঈশ্বরের নির্দেশে ঘটে নি, ঘটেছে ঘটনার সাধারণ যোগাযোগের ফলে।

যে বন্ধন নিকলাসকে শৃংখলিত করে রেখেছিল, যার হাত থেকে মুক্তির কোন সম্ভাবনাই ছিল না বলে তার ধারণা, সোনিয়ার এই অপ্রত্যাশিত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত চিঠি তাকে সেই বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়েছে। সে লিখেছে, রস্তভ পরিবারের মস্কোর প্রায় সব সম্পত্তির ক্ষতি হওয়ার মত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার কথা, নিকলাস যাতে প্রিন্সেস বলকন্‌স্কয়াকে বিয়ে করে সেই মর্মে কাউন্টেসের উপর্যুপরি ঘোষণার কথা এবং ইদানীংকালে নিকলাসের নীরবতা ও উদাসীনতার কথা—এইসব কিছুর ফলেই সে স্থির করেছে সব প্রতিশ্রুতি থেকে মুক্তি দিয়ে সে নিকলাসকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা এনে দেবে।

সে লিখেছে, "যে পরিবার আমার প্রতি এত ভাল ব্যবহার করেছে আমিই তার দুঃখ বা বিরোধের কারণ হব, এ চিন্তাও আমার পক্ষে বেদনাদায়ক। যাদের আমি ভালবাসি তাদের সুখ ছাড়া আমার ভালবাসার অন্য কোন লক্ষ্য নেই; সুতরাং নিকলাস, আমার মিনতি নিজেকে তুমি স্বাধীন বলে বিবেচনা করো; স্থির জেনো, যাই ঘটুক না কেন তোমাকে এত ভালবাসা আর কেউ দিতে পারবে না যা দিয়েছে

তোমার সোনিয়া।"

দুটো চিঠিই এসেছে ত্রয়ৎসা থেকে। কাউন্টেসের চিঠিতে আছে মস্কোতে তাদের শেষের দিনগুলি, তাদের যাত্রা এবং তাদের সমস্ত সম্পত্তি ধ্বংস

হওয়ার বিবরণ। চিঠিতে কাউণ্টেস আরও জানিয়েছে, আহত অবস্থায় প্রিন্স আন্দ্রু তাদের সঙ্গেই পথ চলেছে; তার অবস্থা খুবই সংকটজনক ছিল, কিন্তু ডাক্তার এখন আশা দিয়েছে। সোনিয়া ও নাতাশাই তার সেবা করেছে।

পরদিন মার চিঠি নিয়ে নিকলাস প্রিন্সেস মারির সঙ্গে দেখা করতে গেল। "নাতাশা তার সেবা করেছে" এ কথাটার অর্থ কি হতে পারে তা নিয়ে দুজনের কেউই একটা কথাও বলেনি, কিন্তু এই চিঠিটাকে ধন্যবাদ, নিকলাস হঠাৎই প্রিন্সেসের পরম আত্মীয়ের মত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল।

পরদিন প্রিন্সেস মারির ইয়ারোস্লাভ্‌ল্ যাত্রার প্রাক্কালে নিকলাস তাকে বিদায় জানাল, আর তার কয়েক দিন পরেই রেজিমেণ্টে যোগ দিতে যাত্রা করল।

অধ্যায়—৮

নিকলাসের প্রার্থনার উত্তরে ত্রয়ৎসা থেকে লিখিত সোনিয়ার যে চিঠিটা এসেছে তার গোড়াকার কথাটা এই: কোন ধনবতী উত্তরাধিকারিণীর সঙ্গে নিকলাসের বিয়ে দেবার চিন্তাটা কাউণ্টেসকে ক্রমেই বেশী করে চেপে ধরেছে। সে জানে যে সোনিয়াই সে পথের প্রধান বাধা, আর তাই কাউণ্টেসের বাড়িতে সোনিয়ার জীবন ক্রমেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, বিশেষ করে বোগুচারভোতে প্রিন্সেস মারির সঙ্গে নিকলাসের দেখা হয়েছে এই মর্মে তার চিঠি পাবার পর থেকে অবস্থাটা চরমে উঠেছে। সোনিয়ার প্রতি অসম্মানকর বা নিষ্ঠুর উক্তি করতে পারার কোন সুযোগই কাউণ্টেস ছেড়ে দেয় না।

কিন্তু মস্কো ছেড়ে আসার কয়েকদিন আগে নানান ঘটনায় বিচলিত ও উত্তেজিত হয়ে কাউণ্টেস সোনিয়াকে কাছে ডাকল; কোন রকম বকাবকি না করে এবং দাবী না জানিয়ে সাশ্রুনেত্রে তাকে মিনতি জানাল, এই পরিবার তার জন্য যা কিছু করেছে তার প্রতিদানে সে যেন স্বীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে নিকলাসের সঙ্গে বিবাহসম্পর্কিত সব বন্ধন ছিন্ন করে ফেলে।

"যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমাকে এই কথা না দিচ্ছ ততক্ষণ আমি শান্তি পাব না।"

সোনিয়া হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল; কাঁদতে কাঁদতেই জবাব দিল যে সে সব কিছু করতে রাজী, সব কিছুর জন্য প্রস্তুত, কিন্তু কোন কথা দিল না, কি করবে তা নিজেই স্থির করতে পারল না। যে পরিবার তাকে লালন-পালন করে বড় করে তুলেছে তার জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে তো হবেই। অপরের জন্য ত্যাগ স্বীকারই তো সোনিয়ার অভ্যাস। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত যখনই আত্ম-ত্যাগের কোন কাজ সে করেছে তখনই এই সুখের চেতনা তার

মনে জেগেছে যে এই কাজের ফলে সে নিজের চোখে এবং অপরের চোখে আরও বড় হয়ে উঠবে, আর তাকে নিকলাসের আরও যোগ্য করে তুলবে; পৃথিবীর অন্য সব কিছুর চাইতে সে যে নিকলাসকে বেশী ভালবাসে। কিন্তু এখন এরা যে তাকে সেই বস্তুটিকেই বিসর্জন দিতে বলছে যা তার সব আত্ম-বিসর্জনের একমাত্র পুরস্কার, তার জীবনের একমাত্র অর্থ। আর এই প্রথম সেই পরিবারটির প্রতি তিক্ততায় তার মন ভরে উঠল যারা তাকে আশ্রয় দিয়েছিল শুধু একদিন অনেক বেশী যন্ত্রণা দেবার জন্য; নাতাশার প্রতিও ঈর্ষা জাগল তার মনে; এই মেয়েটি কোনদিন কারও জন্য কোন কিছু ত্যাগ না করেও সকলের ভালবাসাই পেয়ে এসেছে। আর এই প্রথম সোনিয়া অনুভব করল যে নিকলাসের প্রতি তার পবিত্র, শান্ত ভালবাসার ভিতর থেকে জেগে উঠেছে এমন একটি উচ্ছ্বসিত আবেগ যা নীতি, পুণ্য ও ধর্মের চেয়েও শক্তিশালী। সেই আবেগের প্রভাবে সোনিয়া কাউন্টেসকে এড়িয়ে চলতে লাগল, স্থির করল যতদিন নিকলাসের সঙ্গে দেখা না হয় ততদিন অপেক্ষা করবে; উদ্দেশ্য তাকে মুক্তি দেওয়া নয়, বরং দেখা হলেই তাকে চিরদিনের মত নিজের সঙ্গে বেঁধে ফেলা।

মস্কোতে শেষের কয়েকটা দিন রস্তভ পরিবারে এমন হট্টগোল ও ভয়ের আবহাওয়া চলল যে সোনিয়ার মনের বিষণ্ণ চিন্তাগুলো চাপা পড়ে গেল। নানা কাজকর্মের মধ্যে ডুবে থাকতে পেরে সে খুশিই হল। কিন্তু যখন সে তাদের বাড়িতে প্রিন্স আন্দ্রুর উপস্থিতির কথা শুনল তখন এই সানন্দ অনুভূতি তাকে পেয়ে বসল যে নিকলাসের কাছ থেকে তার দূরে সরে যাওয়াটা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়। সে জানত, নাতাশা প্রিন্স আন্দ্রু ছাড়া আর কাউকে ভালবাসে না, তার ভালবাসায় কখনও ইতি ঘটে নি। সে জানত, এই ভয়ংকর পরিস্থিতিতে পুনরায় একত্র হলে আবার তারা পরস্পরের প্রেমে পড়বে, আর সে অবস্থায় নিকলাস আর প্রিন্সেস মারিকে বিয়ে করতে পারবে না, কারণ সেটা সামাজিক বিধিতে নিষিদ্ধ। শেষের কয়েকটা দিন এবং তাদের যাত্রার প্রথম কয়েকটা দিন এই চিন্তায়ই সোনিয়া উল্লসিত হয়ে উঠল যে স্বয়ং বিধাতা তার ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছে।

পথে রস্তভ পরিবার একটা পুরো দিনের জন্য প্রথম যাত্রা বিরতি করল ত্রয়ৎসা মঠে।

মঠের অতিথিশালায় তিনটে বড় ঘর তাদের ছেড়ে দেওয়া হল; তার একটাতে প্রিন্স আন্দ্রুকে থাকতে দেওয়া হল। আহত লোকটির অবস্থা সেদিন অনেকটা ভাল; নাতাশা তার কাছেই বসেছিল। পাশের ঘরে কাউন্ট ও কাউন্টেস সসম্মানে মঠাধিপতির সঙ্গে কথা বলছে; পূর্বপরিচিত মঠের কল্যাণকামী হিসাবেই মঠাধিপতি তাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। প্রিন্স আন্দ্রু ও নাতাশার মধ্যে কি কথাবার্তা হচ্ছে তা জানবার কৌতূহলে

সোনিয়াও সেখানে হাজির হয়েছে। দরজার ভিতর দিয়েই সে তাদের কথাবার্তা শুনছিল। দরজা খুলে উত্তেজিতভাবে বেরিয়ে এল নাতাশা। তাকে স্বাগত জানাতে মঠাধিপতি উঠে দাঁড়িয়ে ডান হাতের ঝোলা আস্তিনটা গুটিয়ে নিল; কিন্তু সেদিকে নজর না দিয়ে নাতাশা সোনিয়ার কাছে গিয়ে তার হাতটা ধরল।

কাউণ্টেস বলল, "নাতাশা, কি চাইছ? এদিকে এস!"

আশীর্বাদ লাভের জন্য নাতাশা মঠাধিপতির কাছে এগিয়ে গেল; সে পরামর্শ দিল, ঈশ্বর ও সন্ত প্রভুর কাছে সাহায্য ভিক্ষা কর।

মঠাধিপতি চলে যেতেই নাতাশা বন্ধুর হাত ধরে তাকে নিয়ে খালি ঘরটাতে গেল।

নাতাশা বলল, "সোনিয়া, ও কি বাঁচবে? সোনিয়া, আমি কত সুখী, অথচ কত দুঃখী!...সোনিয়া, ছোট্ট পাখিটি, সবই তো যেমনটি ছিল তেমনই আছে। শুধু ও যদি বেঁচে ওঠে! ও তো...না, না, তা হতে পারে না... কারণ....কারণ..." নাতাশা কেঁদে উঠল।

সোনিয়া মৃদু গুঞ্জণে বলল," ঠিক! আমি জানতাম! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!"

সোনিয়াও ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে নাতাশাকে চুমো খেল, সান্ত্বনা দিল। ভাবল, "শুধু ও যদি বেঁচে ওঠে!" দুজনেই কাঁদল, কথা বলল, চোখের জল মুছল, তারপর একসঙ্গে প্রিন্স আন্দ্রুর দরজার দিকে এগিয়ে গেল। সাবধানে দরজা খুলে নাতাশা ভিতরে তাকাল; সোনিয়া তার পাশে আধ-খোলা দরজায় গিয়ে দাঁড়াল।

প্রিন্স আন্দ্রু তিনটে বালিশের উপর উঁচু হয়ে শুয়ে আছে। বিবর্ণ মুখখানি শান্ত, চোখ দুটি বন্ধ, নিয়মিত শ্বাসপ্রশ্বাসের লক্ষণ চোখে পড়ছে।

সঙ্গিনীর হাতটা ধরে দরজা থেকে পিছিয়ে এসে সোনিয়া হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "ওঃ নাতাশা!"

"কি হল? কি হল?" নাতাশা শুধাল।

"ওই যে, ওই যে..." সোনিয়া বলল; তার মুখটা সাদা হয়ে গেছে, ঠোঁট কাঁপছে।

আস্তে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে সোনিয়াকে নিয়ে নাতাশা জানালার কাছে গেল; সোনিয়ার কথাগুলি এখনও সে বুঝতে পারে নি।

গম্ভীর, ভয়ার্ত মুখে সোনিয়া বলল, "তোমার মনে আছে অত্রাদ্‌নুতে বড়দিনের সময়...তোমার জন্য যখন আয়নায় তাকিয়েছিলাম...? তোমার কি মনে আছে আমি কি দেখেছিলাম?"

বিস্ফারিত চোখে নাতাশা বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ!"

সোনিয়া বলতে লাগল, "তোমার মনে আছে? তখন আমি এটাই দেখেছিলাম আর সেকথা তোমাকে, দুনিয়াশাকে, সকলকে বলেছিলাম।

দেখেছিলাম, সে বিছানায় শুয়ে আছে, চোখ দুটি বন্ধ, একটা গোলাপী লেপ দিয়ে ঢাকা, দুই হাত এক করা।" তার দৃঢ় বিশ্বাস, এইমাত্র সে যা দেখেছে সেটা আয়না দেখা ছবির হুবহু অনুরূপ।

আসলে তখন সে কিছুই দেখে নি, যা প্রথম মাথায় এসেছিল তাই বলে দিয়েছিল ; কিন্তু তখন যেটা সে বানিয়ে বলেছিল সেটা অন্য যেকোন স্মৃতির মতই এখন তার কাছে সত্য বলে মনে হচ্ছে।

নাতাশাও চেঁচিয়ে বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, গোলাপী রংই ছিল।" তারপর চিন্তিতভাবে বলল, "কিন্তু এর অর্থ কি ?"

তার হাতটা চেপে ধরে সোনিয়া বলল, "ওঃ, আমি জানি না, সবই কেমন অদ্ভুত।"

কয়েক মিনিট পরে প্রিন্স আন্‌দ্রু ঘণ্টা বাজাতেই নাতাশা তার কাছে চলে গেল, কিন্তু অসম্ভব রকমের উত্তেজিত ও অভিভূত হয়ে সোনিয়া জানালায় দাঁড়িয়েই যা ঘটেছে তার বিস্ময়করতা নিয়ে চিন্তা করতে লাগল।

সেদিনই সেনাবাহিনীতে চিঠি পাঠাবার একটা সুযোগ ছিল। কাউণ্টেস তাই ছেলেকে চিঠি লিখতে বসেছে।

বোন-ঝিকে যেতে দেখে চিঠি থেকে চোখ তুলে কাউণ্টেস বলল, "সোনিয়া, তুমি নিকলাসকে লিখবে না ?" নরম কাঁপা গলায় কথা বললেও কাউণ্টেসের মনের কথা সবই সোনিয়া বুঝতে পারল। ঐ দুটি চোখে প্রকাশ পাচ্ছে মিনতি, কোন কিছু চাইবার লজ্জা, প্রত্যাখ্যানের ভয়, আর প্রত্যাখ্যাত হলে তীব্র বিদ্বেষের জন্য প্রস্তুতি।

কাউণ্টেসের কাছে গিয়ে নতজানু হয়ে সোনিয়া তার হাতে চুমো খেল।

বলল, "হ্যাঁ মামণি, লিখব।"

সেদিন যা কিছু ঘটেছে, বিশেষ করে তার স্বপ্ন-দর্শনের যে রহস্যময় পুনরাবৃত্তি সে এই মাত্র দেখেছে, তাতে সোনিয়ার মনটা নরম হয়েছে, উত্তেজিত হয়েছে। অভিভূত হয়েছে। এখন সে বুঝতে পেরেছে যে নাতাশার সঙ্গে প্রিন্স আন্‌দ্রুর সম্পর্কটা নতুন করে গড়ে ওঠায় নিকলাসের পক্ষে প্রিন্সেস মারিকে বিয়ে করার পথে বিঘ্ন দেখা দেবে, আর তাই আনন্দিত চেতনায় সেই আত্মত্যাগের মনোভাব আবার ফিরে এসেছে যাতে সে অভ্যস্ত, যা নিয়ে সে বেঁচে থাকতে ভালবাসে। আর তাই একটা মহৎ কর্মসাধনের সানন্দ চেতনায় সেই আবেগভরা চিঠিটা সে লিখেছে—যদিও চোখের জল এসে তার পশম-কালো চোখ দুটিকে ভিজিয়ে দিয়ে বার বার বাধা দিয়েছে—যা পেয়ে নিকলাস অবাক হয়ে গেছে।

অফিসার ও সৈনিকরা পিয়েরকে গ্রেপ্তার করে রক্ষী-ভবনে নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে শত্রুতাপূর্ণ অথচ সসম্মান আচরণ করতে লাগল। তার প্রতি ব্যবহারে তাদের মনে এখনও একটা অনিশ্চয়তা কাজ করছে—লোকটি কে হতে পারে; হয় তো একজন খুব গণমান্য লোকই হবে; আবার তাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সংঘর্ষের ফলে লোকটির প্রতি শত্রুসুলভ বিদ্বেষও রয়েছে।

কিন্তু পরদিন সকালে যখন রক্ষীদল চলে গেল, তখন পিয়ের বুঝতে পারল যে অফিসার ও সৈনিকসহ নতুন রক্ষীদলের চোখে তার কোন অভিনবত্ব ধরা পড়ল না; বস্তুত চাষীর কোট-পরা এই শক্ত-সমর্থ লোকটার মধ্যে তারা তো সেই পরাক্রমশালী মানুষটিকে দেখছে না যে লুঠেরা ও প্রহরীদলের সঙ্গে বেপরোয়াভাবে লড়াই করেছিল এবং একটি শিশুকে রক্ষা করার জন্য গম্ভীর কথাগুলি বলেছিল; তারা তার মধ্যে দেখল শুধু ১৭ নম্বরের একটি রুশ বন্দীকে যাকে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হুকুমে গ্রেপ্তার করে আটক রাখা হয়েছে। তাই সেদিন তাকে অন্যসব সন্দেহভাজন রুশ বন্দীদের সঙ্গে এক ঘরেইরাখা হল, কারণ যে আলাদা ঘরটাতে সে ছিল সেটা জনৈক অফিসারকে দেওয়া হয়েছে।

যেসব রুশদের সঙ্গে পিয়েরকে আটক রাখা হয়েছে তারা সকলেই একেবারে নিম্নশ্রেণীর মানুষ। তাকে ভদ্রলোক বলে চিনতে পেরে, বিশেষত সে ফরাসী ভাষায় কথা বলছে দেখে, তারা তাকে এড়িয়ে চলতে লাগল। তাকে নিয়ে সকলে হাসি-ঠাট্টা করছে দেখে পিয়ের দুঃখ পেল।

সেদিন সন্ধ্যায় সে জানতে পারল, এইসব বন্দীদের (হয় তো সেও তাদের মধ্যে একজন) আগুন লাগাবার অভিযোগে বিচার করা হবে। তৃতীয় দিনে অন্য সকলের সঙ্গে তাকেও একটা বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে দুজন কর্ণেল ও অন্য ফরাসী সৈন্যদের সঙ্গে নিয়ে একজন সাদা গোঁফওয়ালা ফরাসী জেনারেল বসে আছে। অন্য সকলের মতই পিয়েরকেও জিজ্ঞাসা করা হল সে কে, কোথায় ছিল, কি উদ্দেশ্যে, ইত্যাদি।

পিয়ের জানে এই বিচারের ব্যবস্থাটা পুরোপুরি একটা লোক-দেখানো ব্যাপার। সে জানে, সে এই লোকগুলির মুঠোর মধ্যে পড়েছে, গায়ের জোরে তারা তাকে এখানে এনেছে, সেই গায়ের জোরেই তার কাছ থেকে প্রশ্নের উত্তর দাবী করার অধিকার তারা পেয়েছে, আর তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য তাকে দোষী সাব্যস্ত করা। আর যেহেতু তাকে দোষী সাব্যস্ত করার ক্ষমতা ও ইচ্ছা দুইই তাদের আছে, সেইহেতু এই তদন্ত ও বিচারের ব্যবস্থাটা একান্তই অপ্রয়োজনীয়। এটা তো জানা কথা যে জবাব যাই হোক তার শাস্তি হবেই। যখন তাকে প্রশ্ন করা হল গ্রেপ্তারের সময় সে কি করছিল, তখন পিয়ের করুণভাবে বলল যে আগুনের ভিতর থেকে উদ্ধার করে একটি শিশুকে তার বাবা-মার হাতে তুলে দিচ্ছিল। সে

লুঠেরাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল কেন? পিয়ের জবাব দিল, "একটি স্ত্রী-লোককে বাঁচাবার জন্য," আর "অসম্মানিত একটি নারীকে রক্ষা করা প্রত্যেক মানুষেরই কর্তব্য, এবং..." তারা তার কথায় বাধা দিল, কারণ এসব কথা তারা শুনতে চায় না। সাক্ষীরা তাকে যেখানে দেখতে পেয়েছিল সেই অগ্নিদগ্ধ বাড়িটার উঠোনে সে কেন গিয়েছিল? পিয়ের জবাব দিল, সে মস্কোর অবস্থাটা দেখতে গিয়েছিল। আবার তাকে বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, সে কে? আবার সে জানাল যে প্রশ্নের জবাব সে দেবে না।

"রেখে দাও, খারাপ....খুব খারাপ," সাদা গোঁফ ও লাল মুখ জেনারেলটি কঠোর গলায় বলে উঠল।

চতুর্থ দিনে জুবভ্স্কি প্রাচীরেও আগুন জ্বলে উঠল।

পিয়ের ও অন্য তেরোজনকে নিয়ে যাওয়া হল ক্রিমীয় সেতুর নিকটবর্তী জনৈক বণিকের বাড়ির গাড়ির আড্ডায়। রাজপথ দিয়ে যেতে যেতে পিয়েরের দম বন্ধ হয়ে এল; সারা শহর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। চারদিকেই আগুন জ্বলছে। মস্কো পুড়ে যাওয়ার তাৎপর্য সে তখনও বুঝতে পারে নি; সভয়ে আগুনের দিকে তাকাল।

ক্রিমীয় সেতুর নিকটবর্তী গাড়ির আড্ডাখানায় সে চার দিন কাটাল। সেখানেই ফরাসী সৈন্যদের কথাবার্তা থেকে সে জানতে পারল, যাদের সেখানে আটক রাখা হয়েছে তাদের সম্পর্কে মার্শালের সিদ্ধান্ত যেকোন দিন পৌঁছে যাবে। মার্শালটি যে কে তা পিয়ের জানতে পারল না। স্পষ্টতই তাদের কাছে মার্শাল নিশ্চয়ই একটি খুব বৃহৎ রহস্যময় শক্তি।

৮ই সেপ্টেম্বরের আগেকার যে কয়টা দিন ধরে বন্দীদের দ্বিতীয় দফা জেরা চলতে লাগল, পিয়েরের কাছে সেই দিনগুলি ছিল কঠোরতম।

অধ্যায়—১০

৮ই সেপ্টেম্বর একজন অফিসার—রক্ষীরা তাকে যেরকম সম্মান দেখাল তাতেই বোঝা গেল সে একজন গণমান্য লোক—এসে গাড়ির আড্ডায় ঢুকল। হাতে একখানি কাগজ নিয়ে সে উপস্থিত রুশদের সকলেরই নাম ধরে ডাকল; শুধু পিয়েরকে ডাকল "একজন লোক যে তার নাম বলে নি" বলে। নির্বিকার উদাসভাবে বন্দীদের দিকে তাকিয়ে সে ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে হুকুম দিল, মার্শালের কাছে নিয়ে যাবার আগে এদের যেন ভাল পোশাক পরিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে নিয়ে যাওয়া হয়। একঘণ্টা পরে একদল সৈন্য এসে পিয়ের ও অন্য তেরোজনকে নিয়ে "কুমারীক্ষেত্রে" হাজির করল। দিনটি সুন্দর, বৃষ্টির পরে রোদ উঠেছে, বাতাসে এক কণা ধুলো নেই। চারদিক ধোঁয়ায় ঢেকে নেই; শুধু কুণ্ডলি পাকিয়ে পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে। আগুনের

শিখা চোখে পড়ছে না, চারদিকেই শুধু ধোঁয়ার কুণ্ডলি উঠছে, যতদূর পিয়েরের চোখ গেল সারা মস্কো একটা প্রকাণ্ড ভস্মীভূত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকিয়ে পিয়ের অতিপরিচিত অঞ্চলগুলিকেও চিনতে পারল না। এখানে-ওখানে গির্জাগুলো চোখে পড়ল; সেগুলি পোড়ানো হয় নি। ক্রেমলিনকেও ধ্বংস করা হয় নি। গম্বুজ ও মহান আইভানের ঘণ্টাঘরসমেত ক্রেমলিনের সাদা বাড়িটা চকচক করছে। নব কনভেণ্টের গম্বুজগুলি ঝিকমিক করছে, ঘণ্টাগুলি স্পষ্ট শব্দে বাজছে। ঘণ্টা শুনে পিয়েরের মনে পড়ল আজ রবিবার, কুমারী উৎসবের দিন। কিন্তু উৎসব পালন করতে কেউ সেখানে হাজির হয় নি। সর্বত্র কালো কালো ধ্বংসস্তূপ; ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত যে দুচারজন ভয়ার্ত রুশকে দেখা যাচ্ছে তারাও ফরাসীদের দেখলেই লুকিয়ে পড়তে চেষ্টা করছে।

এটা পরিষ্কার যে রুশ নীড় ধ্বংস হয়ে গেছে, ভেঙে গেছে, কিন্তু বিধ্বস্ত রুশ জীবনযাত্রার জায়গায় সেই ভাঙা নীড়ের উপর গড়ে উঠেছে একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ফরাসী শৃঙ্খলা। যে সৈনিকরা তাকে ও অন্য অপরাধীদের পাহারা দিয়ে নিয়ে চলেছে তাদের চোখে পিয়ের এই সত্যকে দেখতে পেল; দেখতে পেল দুই ঘোড়ার গাড়িতে চেপে যে গণ্যমান্য অফিসারটি চলেছে তার চোখে। পিয়েরের মনে হল সে যেন একটা তুচ্ছ কাঠের টুকরো, এমন একটা যন্ত্রের চাকার মধ্যে পড়ে গেছে যার কাজকর্ম সে বুঝতে পারে না, কিন্তু যন্ত্রটা বেশ ভালভাবেই চলছে।

তাকে ও অন্য বন্দীদের নিয়ে যাওয়া হল কুমারী ক্ষেত্রের ডান দিকে মস্ত বাগানওয়ালা একটা বড় সাদা বাড়িতে। প্রিন্স শের্বাতভ-এর বাড়ি; আগে এ বাড়িতে পিয়ের প্রায়ই আসত। সৈনিকদের কথাবার্তা থেকে সে জানতে পেরেছে, এই বাড়িতে এখন এক্‌মুল-এর ডিউক (দাভুত) মার্শাল বাস করে।

ফটকে পৌঁছে তাদের একে একে ভিতরে ঢোকান হল। পিয়েরের স্থান ষষ্ঠ। কাঁচের ঘর, বাইরের ঘর ও হল ঘরের ভিতর দিয়ে একটা লম্বা নীচু পড়ার ঘরে তাকে নিয়ে যাওয়া হল। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে একজন অ্যাড্‌জুটাণ্ট।

নাকের উপর চশমা রেখে ঘরের একেবারে শেষ কোণে টেবিলের উপর ঝুঁকে বসে আছে দাভুত। পিয়ের তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেও একটা কাগজ দেখতে ব্যস্ত থাকায় দাভুত চোখ তুলল না। চোখ না তুলেই নীচু গলায় বলল:

"কে তুমি?"

পিয়ের নীরব, একটা কথাও তার মুখ থেকে বের হল না। সে জানে, দাভুত শুধু একজন ফরাসী জেনারেলই নয়, নিষ্ঠুরতার জন্যও সে কুখ্যাত।

দাভুত বসে আছে ছাত্রের জবাব শুনবার জন্য অপেক্ষারত কড়া ধাতের স্কুল-শিক্ষকের মত। তার ঠাণ্ডা মুখের দিকে তাকিয়ে পিয়ের বুঝতে পারল, জবাব দিতে একমুহূর্ত বিলম্ব ঘটলে তার ফলে তার জীবনটাই চলে যেতে পারে; কিন্তু সে যে কি বলবে তাই জানে না। দাভুত মাথা তুলল, চশমাজোড়াকে কপালের উপর ঠেলে দিল, চোখ কুঁচকে পিয়েরের দিকে তাকাল।

পিয়েরকে ভয় দেখাবার জন্যই মাপা ঠাণ্ডা গলায় বলল, "লোকটিকে আমি চিনি।"

যে ঠাণ্ডা স্রোতটা এতক্ষণ পিয়েরের পিঠ বেয়ে নামছিল এবার সেটা পাক-সাঁড়াশীর মত তার মাথাটাকেই চেপে ধরল।

"আপনি আমাকে চিনতে পারেন না জেনারেল, আমি কখনও আপনাকে দেখি নি...."

তার কথায় বাধা দিয়ে উপস্থিত অপর একজন জেনারেলকে দাভুত বলল, "ও একজন রুশ গুপ্তচর।"

দাভুত ঘুরে বসল। অপ্রত্যাশিতভাবে গলা কাঁপিয়ে পিয়ের তাড়াতাড়ি বলে উঠল:

"না মঁসিয়, আপনি আমাকে চিনতে পারেন নি। আমি একজন বেসামরিক অফিসার; মস্কো ছেড়ে যাই নি।"

"তোমার নাম?" দাভুত শুধাল।

"বেজুখভ।"

"তুমি যে মিথ্যা বলছ না তার কি প্রমাণ আছে?"

এ কথায় আহত না হয়ে অনুনয়ের সুরে পিয়ের বলল, "মঁসিয়!"

দাভুত চোখ তুলে একাগ্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। কয়েক সেকেণ্ড তারা পরস্পরকে দেখল, আর সেই দৃষ্টিই পিয়েরকে রক্ষা করল। যুদ্ধ ও আইনের দৃষ্টিতে সেই দৃষ্টি দুটি মানুষের মধ্যে মানবিক সম্পর্ক গড়ে তুলল। সেইমুহূর্তে দুজনের মনের মধ্যেও অস্পষ্টভাবে কিছু ঘটে গেল; তারা বুঝল, তারা দুজনেই মানবতার সন্তান, দুই ভাই।

একমুহূর্ত কি ভেবে দাভুত ঠাণ্ডা গলায় বলল, "তুমি যে সত্য কথাই বলছ সেটা আমার কাছে কি ভাবে প্রমাণ করবে?"

পিয়েরের মনে পড়ে গেল রাম্বালের কথা; তার নাম, রেজিমেণ্ট ও যে রাস্তায় তার বাড়ি সব বলে দিল।

"তুমি যা বলছ তা নও," দাভুত আবার বলল।

কম্পিত স্খলিত কণ্ঠে পিয়ের তার বক্তব্যের স্বপক্ষে প্রমাণ দিতে লাগল। কিন্তু সেইমুহূর্তে একটি অ্যাডজুটাণ্ট ঘরে ঢুকে দাভুতকে কি যেন বলল।

সে সংবাদ শুনে দাভুতের মুখ উজ্জল হয়ে উঠল; সে ইউনিফর্মের বোতাম আঁটতে লাগল। মনে হল, পিয়েরের কথা সে বেমালুম ভুলে গেছে।

অ্যাডজুটাণ্টটি বন্দীর কথা স্মরণ করিয়ে দিতে সে ভ্রূকুটি করে মাথাটা পিয়েরের দিকে নেড়ে তাকে সরিয়ে নেবার হুকুম দিল। তাকে যে কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে পিয়ের তা বুঝতে পারল না।

মুখ ফিরিয়ে দেখল, অ্যাডজুটাণ্টটি দাভুতকে আর একটা প্রশ্ন করছে।

"হ্যাঁ, অবশ্য!" দাভুত উত্তর দিল, কিন্তু এই "হ্যাঁ"-র যে কি অর্থ তা পিয়ের বুঝতে পারল না।

সে যে কোথায় গিয়েছিল, অনেক দূরে কি না, অথবা কোন্ দিকে—পরবর্তীকালে এসব কিছুই পিয়ের স্মরণ করতে পারে নি। তার বুদ্ধিবৃত্তি অবশ হয়ে গেল, কেমন যেন বিমূঢ় হয়ে পড়ল, কোন দিকে লক্ষ্য না করে অন্যের সঙ্গে পা মিলিয়ে এগিয়ে চলল, এবং অন্য সকলে যখন থামল তখন সেও থেমে গেল। একটা চিন্তাই তখন তার মনের মধ্যে ঘুরতে লাগল: কে তার মৃত্যুদণ্ড দিল? যে কমিশন তাকে প্রথম জেরা করেছিল তারা নয়। এমন মানবিক দৃষ্টিতে দাভুত তার দিকে তাকিয়েছিল যে সেও হতে পারে না। আর একমুহূর্ত পরেই দাভুত তার ভুল বুঝতে পারত, কিন্তু তখনই অ্যাডজুটাণ্টটি এসে তার চিন্তায় বাধা দিল। তাহলে কে তার মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে, তাকে হত্যা করছে, জীবন থেকে তাকে বঞ্চিত করছে—তাকে, পিয়েরকে, অনেক স্মৃতি, আকাঙ্খা, আশা ও চিন্তার একটি মানুষকে? একাজ কে করছে? পিয়েরের মনে হল, কেউ না।

একটা ব্যবস্থা মাত্র—ঘটনার একটা সমাবেশ মাত্র।

যেকোন রকমের একটা ব্যবস্থা তাকে—পিয়েরকে—হত্যা করছে, জীবন থেকে, সব কিছু থেকে বঞ্চিত করছে, তাকে ধ্বংস করছে।

অধ্যায়—১১

প্রিন্স শের্বাতভের বাড়ি থেকে বন্দীদের সোজা নিয়ে যাওয়া হল কুমারী-ক্ষেত্রে—সন্ন্যাসিনীদের মঠের বাঁ দিকে একেবারে সব্জিবাগানের কাছে। সেখানে একটি খুঁটি পোঁতা হয়েছে। খুঁটিটা ছাড়িয়ে একটা নতুন গর্ত খোড়া হয়েছে, আর খুঁটি ও গর্তের কাছাকাছি অনেক মানুষ অর্ধবৃত্তাকারে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। ভিড়ের মধ্যে আছে অল্প কয়েকজন রুশ আর নেপো-লিয়নের অনেক সৈন্যসামন্ত—নানা ইউনিফর্মে সজ্জিত জার্মান, ইতালীয় ও ফরাসী। খুঁটির ডাইনে ও বাঁয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে নীল ইউনিফর্ম, লাল স্কন্ধত্রাণ, উঁচু বুট ও শাকো পরিহিত ফরাসী সৈন্যরা।

তালিকা অনুযায়ী বন্দীদের পর পর দাঁড় করিয়ে দিয়ে (পিয়েরের স্থান ষষ্ঠ) খুঁটিটার দিকে নিয়ে যাওয়া হল। সহসা তাদের দুদিক থেকে ভেরী বেজে উঠল; সেই শব্দে পিয়েরের মনে হল বুঝি তার মনের একটা অংশকে

ছিঁড়ে ফেলা হল। চিন্তা করবার ও বুঝবার শক্তি সে হারিয়ে ফেলেছে। শুধু শুনতে পাচ্ছে আর দেখতে পাচ্ছে। তখন তার শুধু একটি ইচ্ছা—যে ভয়ঙ্কর জিনিস ঘটতে যাচ্ছে সেটা তাড়াতাড়ি ঘটে যাক। অন্য বন্দীদের দিকে তাকিয়ে পিয়ের তাদের ভাল করে লক্ষ্য করতে লাগল।

প্রথম দুজন কয়েদী, মাথা কামানো। একজন লম্বা, লিকলিকে, অপর জনের ময়লা রং, লোমশ পেশীবহুল দেহ, চ্যাপ্টা নাক। তৃতীয়জন গৃহ-ভৃত্য, বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স, ধূসর চুল, নাদুসনুদুস চেহারা। চতুর্থজন চাষী, খুব সুন্দর, হাল্কা বাদামী চওড়া দাড়ি ও কালো চোখ। পঞ্চম একজন কারখানার মজুর, হলদে মুখ, ঢিলে জোব্বা পরা আঠারো বছরের একটি ছেলে।

পিয়ের শুনতে পেল, ফরাসীরা বলাবলি করছে, তাদের আলাদা গুলি করবে, না জোড়ায় জোড়ায়। শান্ত, ঠাণ্ডা গলায় অফিসার বলল, "জোড়ায় জোড়ায়।"

চাদর পরিহিত একজন ফরাসী পদস্থ ব্যক্তি বন্দীদের ডান দিকে এসে রুশ ও ফরাসী ভাষায় দণ্ডাদেশ পাঠ করল।

দু' জোড়া ফরাসী সৈন্য অপরাধীদের দিকে এগিয়ে গেল; অফিসারের হুকুমে সারির প্রথমে দাঁড়ানো কয়েদী দুজনকে ধরল। খুঁটির কাছে পৌঁছে কয়েদী দুজন থামল; থলে আনা হল; আহত পশু যেভাবে আগুয়ান শিকারীর দিকে তাকায় তারাও সেইভাবে নিঃশব্দে চারদিকে তাকাতে লাগল। একজন অনবরত ক্রুশ-চিহ্ন আঁকতে লাগল, অপরজন পিট চুলকোতে চুলকোতে হাসির মত করে ঠোঁট নাড়তে লাগল। সৈনিকরা দ্রুত হাতে তাদের চোখ বেঁধে দিল, মাথার উপর দিয়ে থলে দুটি নামিয়ে দিল; আর দুজনকেই খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ফেলল।

বারোজন নিপুণ বন্দুকবাজ বন্দুক নিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে সেনাদলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে খুঁটি থেকে আট পা দূরে দাঁড়াল। পাছে আসন্ন ঘটনাটা চোখে দেখতে হয় এই ভয়ে পিয়ের মুখ ফিরিয়ে নিল। হঠাৎ ফটাস্ করে এমন একটা কুণ্ডলি পাকানো শব্দ কানে এল যেটা যেকোন ভয়ঙ্কর কামানের শব্দের চাইতেও জোরালো। পিয়ের ঘুরে তাকাল। কিছুটা ধোঁয়া উড়ছে, আর ফরাসী সৈনিকরা বিবর্ণ মুখে ও কম্পিত হাতে গর্তটার কাছে কি যেন করছে। আরও দুজন বন্দীকে আনা হল। একইভাবে একই দৃষ্টিতে তারা দুজনও চারদিকের দর্শকদের দিকে বৃথাই প্রাণরক্ষার নীরব আবেদন নিয়ে তাকাতে লাগল। তাদের ভাগ্যে যে কি ঘটতে চলেছে তাও তারা বুঝতে পারছে না বা বিশ্বাস করতে পারছে না। তাদের কাছে জীবনের যে কি অর্থ তা তারা জানে, আর তাই সে জীবন যে কেউ নিতে পারে এটা তারা না পারছে বুঝতে, আর না পারছে বিশ্বাস করতে।

এবারও পিয়ের এসব দেখতে চাইল না, মুখটা ঘুরিয়ে নিল ; কিন্তু আবার সেই ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের শব্দ তার কানে এল, আর সেইমুহূর্তে সে দেখল ধোঁয়া, রক্ত, আর বিবর্ণ মুখ করাসী সৈন্য ; এবারও তারা খুঁটির পাশে কম্পিত হাতে কি যেন করছে। জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলে চারদিক তাকিয়ে যেন জানতে চাইল এসবের অর্থ কি। যতগুলি চোখের উপর চোখ পড়ল সর্বত্রই ঐ একই জিজ্ঞাসা সে দেখতে পেল।

তার নিজের অন্তরের মধ্যে যে হতাশা, আতঙ্ক ও সংঘাত দেখা দিয়েছে তারই প্রতিফলন সে দেখতে পেল প্রতিটি রুশ ও ফরাসী সৈনিক এবং অফিসারদের মুখে ; একটিও ব্যতিক্রম নেই। মুহূর্তের জন্য তার মনের মধ্যে একটি প্রশ্নই ঝল্‌সে উঠল ; "কিন্তু কে তাহলে এসব করছে ? এরা সকলেই তো আমাদের মত কষ্ট পাচ্ছে। তাহলে কে সে ? কে ?"

"৮৬তম বন্দুকবাজরা, আগে বাড় !" কে যেন চীৎকার করে বলল।

এবার পিয়েরের ঠিক পূর্ববর্তী পঞ্চম বন্দীটিকে নিয়ে যাওয়া হল—একা। পিয়ের বুঝতে পারল না যে সে বেঁচে গেছে, তাকে এবং অন্যদের সেখানে আনা হয়েছে শুধু এইসব মৃত্যুদণ্ড দেখতে। সে কিন্তু কোন রকম আনন্দ বা স্বস্তি বোধ করল না ; ক্রমবর্ধমান আতংকের সঙ্গে সব কিছু দেখতে লাগল। ঢিলে জোব্বা পরা সেই কারখানার ছেলেটিই পঞ্চম বন্দী। তার গায়ে হাত দিতেই সে আতঙ্কে লাফিয়ে একপাশে সরে গিয়ে পিয়েরকে জড়িয়ে ধরল। (পিয়ের শিউরে উঠে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল।) ছেলেটি হাঁটতেও পারছে না। দুই বগলের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে তারা তাকে টেনে নিয়ে চলল ; সে চেঁচাতে লাগল। খুঁটির কাছে নিয়ে যেতেই সে চুপ করে গেল, যেন হঠাৎ তার মধ্যে একটা বোধ ফিরে এসেছে। সে কি বুঝতে পেরেছে যে আর্তনাদ করা অর্থহীন, অথবা সে কি ভেবেছে যে এরা তাকে খুন করবে এটা একান্তই অবিশ্বাস্য। সে যাই হোক, খুঁটির পাশে দাঁড়িয়ে সে চোখ বেঁধে দেবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল এবং একটা আহত জন্তুর মত চকচকে চোখ মেলে চারদিকে তাকাতে লাগল।

এবারে পিয়ের মুখ ঘুরিয়ে চোখ বন্ধ করতে পারল না। ভিড়ের অন্য সকলের মতই এই পঞ্চম হত্যাকাণ্ডের সময় তার কৌতূহল ও উত্তেজনাও একেবারে চরমে উঠেছে। অন্য সকলের মতই পঞ্চম লোকটিও চুপচাপ হয়ে গেছে ; ঢিলে জোব্বাটাকে আরও ভাল করে গায়ে জড়িয়ে একটা খালি পা দিয়ে অন্য পাটা ঘসছে।

তারা যখন তার চোখ বেঁধে দিল তখন পিছনের গিঁটটা মাথায় লাগছিল বলে নিজেই সেটা ঠিক করে নিল ; রক্তাক্ত খুঁটিটার গায়ে তাকে ঠেলান দিয়ে দাঁড় করানো হলে সে নিজেই হেলান দিল এবং কিছুটা অস্বস্তি বোধ করায় সোজা হয়ে দাঁড়াল, পা দুটোকে ঠিক করে নিল, আরাম করে হেলান দিয়ে

দাঁড়াল। পিয়ের তার উপর থেকে চোখ সরিয়ে নিল না, তার সব গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগল।

হয়তো একটা হুকুম দেওয়া হয়েছিল এবং তার পরে আটটা বন্দুকের শব্দও হয়েছিল; কিন্তু পরবর্তীকালে অনেক চেষ্টা করেও গুলির এতটুকু শব্দ শোনার কথা পিয়ের মনে করতে পারত না। সে শুধু দেখেছিল, মজুরটি হঠাৎ তার বন্ধন-দড়ির উপরেই পড়ে গেল, দুটো স্থানে রক্ত দেখা গেল, ঝুলন্ত শরীরটার ভারে দড়িগুলো ঢিলে হয়ে গেল, আর মজুরটি বসে পড়ল, মাথাটা অস্বাভাবিকভাবে ঝুলে আছে, আর একটা পা ভাঁজ হয়ে আছে। পিয়ের খুঁটিটার দিকে এগিয়ে গেল। কেউ তাকে বাঁধা দিল না। বিবর্ণ ভয়ার্ত লোকগুলো মজুরটিকে ঘিরে কি যেন করছে। ঘন গোঁফওয়ালা একটি বুড়ো ফরাসী যখন দাঁড়িগুলো খুলছিল তখন তার নীচের চোয়ালটা অনবরত কাঁপছে। শরীরটা পড়ে গেল। সৈনিকরা বিশ্রীভাবে সেটাকে খুঁটির কাছ থেকে টেনে নিয়ে গর্তের মধ্যে ঠেলে দিতে লাগল।

তারা সকলেই নিশ্চিতভাবে জানে যে তারা অপরাধী; যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের অপরাধের চিহ্নকে সরিয়ে ফেলতেই হবে।

গর্তের ভিতরে তাকিয়ে পিয়ের দেখল, কারখানার ছেলেটি হাঁটু দুটোকে মাথার কাছে নিয়ে পড়ে আছে; একটা কাঁধ অপর কাঁধটার চাইতে বেশী উঁচু হয়ে আছে। সেই কাঁধটা তালে তালে ওঠা-নামা করছে, কিন্তু ইতিমধ্যেই কোদালভর্তি মাটি তার শরীরের উপর ছড়িয়ে দেওয়া শুরু হয়ে গেছে। একটি সৈনিক ক্রুদ্ধ কণ্ঠে পিয়েরকে চলে যেতে বলল। কিন্তু পিয়ের তার কথা বুঝতে পারল না, খুঁটিটার কাছেই দাঁড়িয়ে রইল, কেউ তাড়িয়ে দিল না।

গর্তটা ভর্তি হয়ে গেলে আবার একটা হুকুম দেওয়া হল। পিয়েরকে তার জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল, খুঁটির দুই পাশের দুই সারি সৈন্য অর্ধেক ঘুরে গিয়ে মাপা পা ফেলে সেটার পাশ দিয়ে চলে গেল। বৃত্তের মাঝখানে দাঁড়ানো চব্বিশটি বন্দুকবাজ ছুটে যার যার নিজের জায়গায় চলে গেল।

পিয়ের বিস্ময়বিমূঢ় চোখে বন্দুকবাজদের দিকেই তাকিয়েছিল। একজন ছাড়া আর সকলেই সেনাদলের সঙ্গে ফিরে গেল। এই যুবক সৈনিকটি গর্তের কাছে ঠিক সেই জায়গাটাতেই দাঁড়িয়ে রইল যেখান থেকে সে গুলি ছুঁড়েছিল। তার মুখটা মরার মত সাদা, শাকো পিছনের দিকে সরানো, আর বন্দুকটা মাটির উপরে রাখা। সে মাতালের মত দুলছে; পাছে পড়ে যায় তাই একবার কয়েক পা এগোচ্ছে, আবার পিছিয়ে যাচ্ছে। একটি বৃদ্ধ নন-কমিশন্ড্ অফিসার দলের ভিতর থেকে ছুটে এসে তাকে কনুই দিয়ে জাপ্টে ধরে দলের দিকে নিয়ে গেল। রুশ ও ফরাসীদের ভিড় কমতে শুরু

করেছে। সকলেই মাথা নীচু করে নীরবে চলে যাচ্ছে।

একটি ফরাসী সৈনিক বলল, "এ থেকেই ওরা আগুন দেবার উচিত শিক্ষা পাবে।"

পিয়ের ঘুরে বক্তার দিকে তাকাল। সৈন্যটি নিজের কৃতকর্মের জন্য কিছুটা স্বস্তি পেতে চেষ্টা করছে, কিন্তু পাচ্ছে না। কথা শেষ না করেই সে হাত দিয়ে একটা অর্থহীন ভঙ্গী করে চলে গেল।

অধ্যায়—১২

প্রাণদণ্ড-পর্ব শেষ হবার পরে পিয়েরকে অন্য সব বন্দীদের কাছ থেকে আলাদা করে একটা ছোট, বিধ্বস্ত, দুর্গন্ধময় গির্জায় একলা রেখে দেওয়া হল।

সন্ধ্যার দিকে দুটি সৈনিকসহ একজন নন-কমিশন্‌ড্ অফিসার সেখানে ঢুকে বলল যে তাকে ক্ষমা করা হয়েছে এবং এখন তাকে যুদ্ধ-বন্দীদের জন্য নির্দিষ্ট ব্যারাকে যেতে হবে। তাকে বলা হল না বুঝেই সে উঠে সৈন্যদের সঙ্গে চলল। তারা তাকে নিয়ে গেল মাঠের উঁচুদিকটার শেষ প্রান্তে। সেখানে পোড়া তক্তা, কড়ি ও বরগা দিয়ে কতকগুলি চালাঘর বানানো হয়েছে। তারই একটার মধ্যে তাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। অন্ধকারে জনা বিশেক মানুষ পিয়েরকে ঘিরে ধরল। তারা কে, কেন এখানে এসেছে, আর তার কাছেই বা কি চায়—এসব কিছুই বুঝতে না পেরে সে তাদের দিকে তাকাল। তারা যা বলল তা শুনল, কিন্তু কোন কথার অর্থ বুঝতে পারল না। তাদের প্রশ্নের জবাব দিল, কিন্তু কারা সে জবাব শুনছে, বা শুনে বুঝতে পারছে কি না তাও ভাবল না। তাদের মুখের দিকে, শরীরের দিকে তাকাল, কিন্তু সবকিছুই অর্থহীন মনে হল।

যেমুহূর্তে সে মানুষের হাতে মানুষের সেই ভয়ংকর হত্যাকাণ্ড দেখেছে, অথচ তারা কেউ সে হত্যাকাণ্ড ঘটাতে চায় নি, তখন থেকেই জীবনের মূল উৎসই যেন সহসা তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে; সব কিছুই ভেঙে পড়ে একটা অর্থহীন জঞ্জালের স্তূপে পরিণত হয়েছে। নিজের কাছে স্বীকার না করলেও এই জগতের সুষ্ঠু পরিচালনা, মানবতা, নিজের আত্মা, এবং ঈশ্বরের উপর তার যে বিশ্বাস ছিল তা ধ্বংস হয়ে গেছে। এ অভিজ্ঞতা তার আগেও হয়েছে, কিন্তু এখানকার মত এমন তীব্র অভিজ্ঞতা কখনও হয় নি। এখন তার মনে হচ্ছে, গোটা পৃথিবীটাই তার চোখের সামনে ভেঙে পড়েছে, পড়ে আছে শুধু অর্থহীন ধ্বংসস্তূপ, অথচ এব্যাপারে তার নিজের কোন দোষ নেই। সে অনুভব করছে, জীবনের অর্থকে নতুন করে বিশ্বাস করবার ক্ষমতাও তার নেই।

অন্ধকারে সকলে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে; বোঝা যাচ্ছে তার প্রতি

তাদের অসীম আগ্রহ। তারা তাকে কি যেন বলছে, কি সব প্রশ্ন করছে। তারা তাকে অন্য কোনখানে নিয়ে চলল, এবং শেষ পর্যন্ত চালাটার এমন একটা কোণে নিয়ে গেল যেখানে চারদিককার মানুষগুলো হাসছে আর কথা বলছে।

"আচ্ছা, তাহলে স্যাঙাৎরা...ইনিই সেই প্রিন্স যে..." "যে" শব্দটার উপর বিশেষ জোর দিয়ে চালার অপর দিক থেকে কে যেন বলে উঠল।

দেয়ালে পিঠ দিয়ে একগাদা খড়ের উপর নীরব, নিশ্চল হয়ে বসে পিয়ের একবার চোখ খুলছে, একবার বন্ধ করছে। কিন্তু চোখ বন্ধ করলেই সে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে কারখানার ছেলেটির সেই ভয়ংকর মুখ—তার সরলতার জন্যই বুঝি বেশী ভয়ংকর—আর সেই সব হত্যাকারীর মুখ যারা আত্ম-গ্লানির জন্যই যেন আরও ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। আবার চোখ খুলে চারদিককার অন্ধকারের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে।

তারপাশেই উবু হয়ে বসে আছে একটি ছোটখাট মানুষ। নড়াচড়া করলেই শরীর থেকে ঘামের যে তীব্র গন্ধ আসছে তা থেকেই সে প্রথম লোকটির উপস্থিতি টের পেয়েছে। অন্ধকারে লোকটি নিজের পা নিয়ে কি যেন করছে; তার মুখ দেখতে না পেলেও পিয়ের বুঝতে পারছে যে লোকটি বারবার তার দিকে তাকাচ্ছে।

অন্ধকারে কিছুটা অভ্যস্ত হবার পরে পিয়ের দেখল, লোকটি তার পায়ের পট্টি খুলছে, আর যেভাবে খুলছে তাতে পিয়েরের মনে আগ্রহ দেখা দিল।

এক পায়ের পট্টির দড়িটা খুলে সাবধানে সেটাকে পাকে পাকে খুলে সঙ্গে সঙ্গে অপর পায়ের কাজ শুরু করে লোকটি পিয়েরের দিকে তাকাল। এক হাতে দড়িটা ঝুলিয়ে রেখেই আর এক হাতে দ্বিতীয় পায়ের পট্টিটা খুলতে শুরু করল। এইভাবে নিপুণ দক্ষতায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দুই পায়ের পট্টি খুলে লোকটি মাথার উপরকার একটা গজালে সেদুটো ঝুলিয়ে রাখল। তারপর একটা ছুরি বের করে কি যেন কাটল, ছুরিটা বন্ধ করল, মাথার কাছে বিছানার নীচে রেখে দিল। তারপর পিয়েরের দিকে তাকাল।

"আপনি অনেক গোলযোগ পুইয়েছেন, কি বলেন স্যার?" ছোট মানুষটি হঠাৎ বলে উঠল।

তার সুরেলা কণ্ঠস্বরে এত দয়া ও সরলতা ঝরে পড়ল যে পিয়ের জবাব দিতে চেষ্টা করল, কিন্তু তার চোয়াল কাঁপতে লাগল, দুই চোখে জল এসে গেল।

পিয়েরের এই বিহ্বলতা প্রকাশের এতটুকু সময় না দিয়ে ছোট মানুষটি সেই একই মনোরম স্বরে সঙ্গে সঙ্গে বলতে লাগল:

"আরে বাবা, বেজার হবেন না!...বেজার হবেন না বন্ধু—'এক ঘণ্টা কষ্ট কর, আর এক যুগ বেঁচে থাক!' এটাই তো আসল কথা গো বন্ধু। আর

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে এর মধ্যেও আমরা বেঁচে আছি। এই সব মানুষদের মধ্যে যেমন খারাপ লোক আছে, তেমনই ভাল লোকও আছে।" কথা বলতে বলতে সে সহজেই হাঁটুর উপর ভর করে উঠে দাঁড়াল, কাশল, তারপর চালাটার অপর দিকে চলে গেল।

"অ্যা, ব্যাটা পাজি তুমি!" পিয়ের শুনতে পেল এই লোকটিই ওধারে কথা বলছে। "তাহলে তুমি এসেছ, ব্যাটা পাজি। তার তাহলে মনে আছে....ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওতেই হবে!"

একটা ছোট কুকুর তার দিকে লাফিয়ে উঠছিল; সেটাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সৈনিকটি তার জায়গায় ফিরে এসে বসল। তার হাতে ছেঁড়া কাপড়ে জড়ানো কি যেন রয়েছে।

পুটুলি খুলে পিয়েরের দিকে কিছু সিদ্ধ আলু এগিয়ে দিয়ে সে আগেকার মতই সশ্রদ্ধ স্বরে বলল, "এই যে, কিছু খান স্যার। ডিনারে ছিল ঝোল, আর আলু তো চমৎকার!"

পিয়ের সারাদিন কিছু খায় নি। আলুর ঘ্রাণ তার খুবই ভাল লাগল। সৈন্যটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে খেতে শুরু করল।

সৈনিকটি হেসে বলল, "আচ্ছা, ভাল তো? আপনার তো ভাল লাগা উচিত।"

একটা আলু নিয়ে ছুরিটা বের করে হাতের উপরেই সেটাকে দু'খণ্ড করে কেটে তাতে একটু নুন ছড়িয়ে দিয়ে পিয়েরের হাতে দিল।

আবার বলল, "আলুগুলি চমৎকার! এরকম আগে খেয়েছেন!"

পিয়েরের মনে হল এর চাইতে বেশী সুস্বাদু কিছু সে কখনও খায় নি।

বলল, "আরে, আমি তো ভাল আছি, কিন্তু ওই বেচারিদের ওরা গুলি করল কেন? শেষটির তো বিশ বছরও বয়স হয় নি।"

ছোট মানুষটি বলল, "চু, চু...! কী পাপ! কী পাপ! আচ্ছা স্যার, আপনি কেন মস্কোতে রয়ে গেলেন?"

পিয়ের জবাব দিল, "ওরা এত তাড়াতাড়ি এসে পড়বে ভাবতে পারি নি। হঠাৎই থেকে গেছি আর কি।"

"আর ওরা আপনাকে গ্রেপ্তার করল কেমন করে বাবা? আপনার বাড়িতে?"

"না, আমি অগ্নিকাণ্ড দেখতে গিয়েছিলাম, সেখানেই ওরা আমাকে গ্রেপ্তার করে, আর আগুন লাগানোর অভিযোগে বিচার করে।"

ছোট মানুষটি শুধু বলল, যেখানে আইন আছে, সেখানেই আছে অন্যায়।"

আলুর শেষটুকু চিবোতে চিবোতে পিয়ের শুধাল, "আপনি কি অনেক দিন এখানে আছেন?"

"আমি? আমাকে তো গত রবিবারে ধরে এনেছে, মস্কোর একটা হাসপাতাল থেকে।"

"আরে, আপনি তাহলে একজন সৈনিক?"

"হ্যাঁ, আমরা আপ্‌শেরন রেজিমেণ্টের সৈনিক। জ্বরে মরে যাচ্ছিলাম। কেউ কিছু জানায় নি। প্রায় জন বিশেক সেখানে শুয়েছিলাম। আমাদের কোন ধারণাই ছিল না, কথনও ভাবিও নি।"

"এখানে কি খুব খারাপ লাগছে?" পিয়ের শুধাল।

"কিন্তু উপায় কি বলুন বাবা? আমার নাম প্লাবন, উপাধি কারাতায়েভ," পিয়েরের পক্ষে ডাকবার সুবিধা হবে মনে করেই সে নামটা বলল। "রেজিমেণ্টে সকলে আমাকে ডাকে 'ছোট বাজপাখি' বলে। খারাপ না লেগে কি পারে? মস্কো—তো সব শহরের জননী। তার এই অবস্থা দেখলে কি দুঃখ না হয়ে পারে? কিন্তু কথায় বলে 'পোকা বাঁধাকপির পাতা কেটে ভিতরে ঢোকে, কিন্তু মরে সকলের আগে!"

"কি? কি বললেন?" পিয়ের শুধাল।

"কে? আমি?" কারাতায়েভ বলল। "আমি বলি, ঘটনা তো আমাদের হিসাব মত ঘটে না, ঘটে ঈশ্বরের হিসাবে।" তারপর সঙ্গে সঙ্গে বলতে শুরু করল, "আচ্ছা স্যার, আপনার তো পরিবার আছে, জমিদারি আছে? আর একটা বাড়িও? তার মানে আপনার প্রচুর আছে, কি বলেন? আর গৃহিণীও? আর বুড়ো বাবা-মা, তারা এখনও বেঁচে আছেন কি?"

অন্ধকারে দেখা না গেলেও পিয়ের বুঝতে পারল যে এই প্রশ্নগুলি করার সময় করুণার চাপা হাসিতে সৈনিকটির ঠোঁট দুটি কুঁচকে গেল। পিয়েরের বাবা-মা বেঁচে নেই শুনে, বিশেষ করে মা নেই শুনে সে খুব দুঃখ পেল।

বলল, "স্ত্রী পরামর্শ দেয়, শাশুড়ি জানায় আদর, কিন্তু মার মত আপন জন কেউ নেই! আচ্ছা আপনার ছেলে-মেয়ে আছে তো?"

নেতিবাচক জবাব শুনে লোকটি দুঃখ পেল; তাড়াতাড়ি বলল, "ঠিক আছে! আপনার তো অল্প বয়স, ঈশ্বরের দয়া হলেই সন্তান হবে। সব চাইতে বড় কথাই হল মিলেমিশে থাকা...."

"কিন্তু এখন তো সবই সমান," পিয়ের না বলে পারল না।

কারাতায়েভ বলে উঠল, "আহা বাছা! কারাগার অথবা ভিখারীর কাঁথাকে অগ্রাহ্য করবেন না!"

বেশ আরাম করে বসে সে একটু কাশল। মনে হল, একটা লম্বা গল্প বলার জন্য তৈরি হয়ে নিচ্ছে।

বলতে আরম্ভ করল, "দেখুন বাবা, আমি তো বাড়িতেই বাস করছিলাম। আমাদের একটা ভাল বাড়ি ছিল, প্রচুর জমি ছিল, আমরা চাষীরা তো সুখেই ছিলাম, আর বাড়িটার জন্যও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া যেতে পারে।

বাবাকে নিয়ে যখন ফসল কাটতে যেতাম তখন আমরা হতাম সাতজন। ভালই ছিলাম। সত্যিকারের চাষী ছিলাম। কিন্তু কি যে ঘটল...”

প্লাতন কারাতায়েভ তার দীর্ঘ কাহিনীসূত্রে জানাল—কাঠ কাটতে অন্যের জঙ্গলে ঢুকলে প্রহরী তাকে ধরে ফেলে, বিচার হয়, বেত্রাঘাত হয়, তার পর তাকে সৈন্যদলে চালান করে দেওয়া হয়।

ঈষৎ হাসির সঙ্গে গলার সুর পাল্টে ফেলে সে বলে চলল, “দেখুন বাবা, আমরা এটাকে দুর্ভাগ্য বলেই মনে করেছিলাম, কিন্তু সেটাই বড় হয়ে দেখা দিল। আমি সেই পাপকাজ না করলে আমার ভাইকে সৈন্য হতে হত। কিন্তু তার, আমার ছোট ভাইয়ের পাঁচটি সন্তান, আর আমি ফেলে এসেছি শুধু স্ত্রীকে। আমাদের একটি ছোট মেয়ে ছিল, কিন্তু আমি সৈন্যদলে চলে যাবার আগেই ঈশ্বর তাকে নিয়ে নিলেন। ছুটিতে বাড়ি গেলে কি দেখি তাও বলছি; দেখি তারা আগের চাইতে ভাল আছে। উঠোন-ভরা গরু-মোষ, মেয়েরা সব ভাল আছে, দুই ভাই বিদেশে মাইনে পাচ্ছে, একমাত্র ছোট ভাই মাইকেল বাড়িতে থাকে। বাবা বলে, ‘আমার কাছে সব সন্তানই সমান; যে আঙুলেই কামড় লাগুক, আঘাত সমানই লাগে। কিন্তু সৈন্য হিসাবে যদি প্লাতনের মাথা কামানো না হত তাহলে তো মাইকেলকেই যেতে হত।’ বিশ্বাস করুন, বাবা সকলকে কাছে ডেকে এনে আমাদের নিয়ে গেল দেবমূর্তির সামনে। বলল, ‘মাইকেল, ওর পায়ের কাছে নত হও; আর তুমি বৌমা, তুমিও নত হও; আর তোমরা নাতি-নাতনিরা, তোমরাও ওর কাছে নত হও!’ ...বুঝলেন তো ব্যাপারটা? এইরকমই হয়। ভাগ্য একটা মাথা চায়। কিন্তু আমরাই শুধু বিচার করি, ‘এটা ভাল নয়—এটা ঠিক নয়।’ আমাদের ভাগ্য হচ্ছে টানা-জালের জলের মত: যতক্ষণ টানবেন ততক্ষণ ফুলে-ফেঁপে উঠবে, কিন্তু যেই জল থেকে টেনে তুলবেন অমনি সব ফাঁকা! এইরকমই হয়!”

প্লাতন তার আসনটাকে খড়ের উপর সরিয়ে নিল।

একটু চুপ করে থেকে উঠে দাঁড়াল।

“আচ্ছা, মনে হচ্ছে আপনার ঘুম পাচ্ছে,” বলে তাড়াতাড়ি ক্রুশ চিহ্ন এঁকে সে বার বার বলতে লাগল:

“প্রভু যীশুখৃস্ট, মহাত্মা সন্ত নিকলাস, ফ্রোলা ও লাভ্রা! প্রভু যীশুখৃস্ট, মহাত্মা সন্ত নিকলাস, ফ্রোলা ও লাভ্রা! প্রভু যীশুখৃস্ট, আমাদের প্রতি করুণা কর, আমাদের রক্ষা কর!” কথা শেষ করে আভূমি নত হল, উঠে দাঁড়াল, দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তারপর আবার খড়ের স্তূপের উপর বসে পড়ল।” এই তো পথ। হে ঈশ্বর, আমাকে পাথরের মত শুইয়ে দাও, পাঁউরুটির মত জাগিয়ে তোল” বিড়বিড় করে বলতে বলতে কোটটা গায়ে চাপা দিয়ে সে শুয়ে পড়ল।

পিয়ের শুধাল, "আপনি কি প্রার্থনা করলেন?"

প্রায় ঘুমের মধ্যে প্লাতন অস্ফুটে বলল, "অ্যাঁ? আমি কি বলছিলাম? প্রার্থনা করছিলাম। আপনি প্রার্থনা করেন না?"

"হ্যাঁ, করি," পিয়ের বলল। "কিন্তু ওই যে ফ্রোলা ও লাভ্রা বললেন, ওটা কি?"

প্লাতন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, "এই কথা! ওরা হলেন 'ঘোড়াদের' দুই সন্ত। জন্তু-জানোয়ারদের প্রতিও তো করুণা করা চাই। আরে, পাজিটা! বেশ তো কুঁকড়ে গরম হয়ে আছ দেখছি, এই কুকুরীর বাচ্চা!" পায়ের কাছে শুয়ে থাকা কুকুরটার গায়ে হাত বুলিয়ে পুনরায় পাশ ফিরে শুয়ে প্লাতন সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল।

বাইরে অনেক দূর থেকে কান্না ও আর্তনাদের শব্দ ভেসে আসছে, চালা-ঘরের ফাটল দিয়ে আগুনের শিখা দেখা যাচ্ছে, কিন্তু ভিতরটা শান্ত ও অন্ধকার। অনেকক্ষণ পর্যন্ত পিয়েরের ঘুম এল না; অন্ধকারে চোখ মেলে তাকিয়ে প্লাতনের নাসিকা-গর্জন শুনতে শুনতে তার মনে হল, যে পৃথিবী ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল সেটাই যেন নতুন রূপে, নতুন ও অবিচলিত ভিত্তির উপর নতুন করে গড়ে উঠছে তার আত্মার মধ্যে।

অধ্যায়—১৩

যে চালাঘরে পিয়েরকে রাখা হয়েছে সেখানেই রাখা হয়েছে আরও তেইশটি সৈনিক, তিনটি অফিসার ও দুটি কর্মচারীকে। সেখানেই পিয়ের চারটি সপ্তাহ কাটাল।

পরবর্তীকালে সেই দিনগুলির কথা মনে হলে আর সব কিছুই অস্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়; একমাত্র প্লাতন কারাতায়েভ ছাড়া; তার মনে প্লাতনের মূর্তিটি সর্বদাই বিরাজ করছে অত্যন্ত স্পষ্ট এক মূল্যবান স্মৃতি হয়ে, রাশিয়ার যা কিছু ভাল ও অখণ্ড তারই প্রতিমূর্তি হয়ে। পরদিন ভোরে পিয়ের যখন তার সেই পার্শ্ববর্তী লোকটিকে দেখল তখন সর্বপ্রথম তার মনে জাগল একটা অখণ্ডতার আভাষ: কোমরে দড়ি দিয়ে বাঁধা ফরাসী ওভারকোট, সৈনিকের টুপি ও কাঠের জুতো পরিহিত প্লাতনের গোটা শরীরটাই যেন এক অখণ্ডতার প্রতিমূর্তি। তার মাথাটা 'অখণ্ড' তার পিঠ, বুক, ঘাড়, এমন কি সর্বদা আলিঙ্গন-উন্মুখ দুই প্রসারিত হাত, তার স্মিত হাসি এবং বড় বড় শান্ত দুটি বাদামী চোখ—সবই অখণ্ড।

একজন বুড়ো সৈনিকের ভঙ্গীতে নিজের যেসব অভিযানের কথা সে বলেছে তা থেকেই বোঝা যায় তার বয়স পঞ্চাশ হয়েছে। সে নিজে তার বয়স জানে না, সেটা স্থির করতেও অপারগ। কিন্তু তার ঝকঝকে, উজ্জল, সাদা দুই পাটি অর্ধবৃত্তাকার দাঁত যেমন সুস্থ তেমনই মজবুত, তার দাড়িতে

যা মাথায় একটা সাদা চুল নেই, তার সারা দেহে নমনীয়তা, দৃঢ়তা ও কষ্টসহিষ্ণুতার আভাব।

গ্রেপ্তার হবার পরে প্রথম কয়েকদিন তার শারীরিক শক্তি ও কর্মপটুতা এত বেশী ছিল যে ক্লান্তি ও রোগ কাকে বলে তাই সে জানত না। প্রতি রাতে শোবার আগে সে বলত: "প্রভু, আমাকে শুইয়ে দাও পাথরের মত, আর জাগিয়ে তোল একটুকরো পাউরুটির মত।" আর প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে বলত: "আমি শুয়েই কুঁকড়ে গিয়েছিলাম, জেগে উঠেই গা ঝাড়া দিয়েছি।" সত্যি, শোয়ামাত্রই সে ঘুমিয়ে পড়ত পাথরের মত, আর শরীরটাকে একবার ঝাড়া দিয়েই মুহূর্তের মধ্যে কাজের জন্য প্রস্তুত হয়ে যেত, ঠিক ছোট ছেলেরা যেমন ঘুম থেকে উঠেই খেলার জন্য তৈরি হয়ে যায়। সব কাজই সে করতে পারত, খুব ভাল না পারলেও মন্দও নয়। সে রুটি সেঁকত, রান্না করত, সেলাই করত, জুতো মেরামত করত। সবসময়ই কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকত, গল্প করত আর গান গাইত শুধু রাতে। শিক্ষিত গায়কের মত সে গাইত না, গাইত পাখির মত যখন যেভাবে খুশি।

বন্দী হবার পরে তার মুখে দাড়ি গজাল; মনে হল, সামরিক ও অন্য যা কিছু তার চরিত্রের বিপরীত সে সব কিছু ঝেড়ে ফেলে সে ফিরে গেছে তার আগেকার চাষীর জীবনে।

"এবার সৈনিকের ছুটি—শার্ট থাকছে ব্রীচেসের বাইরে", সে বলত।

সৈনিক জীবনের কথা বলতে তার ভাল লাগত না, অবশ্য সে সম্পর্কে কোন অভিযোগও তার ছিল না; প্রায়ই বলত যে সারা সৈনিক জীবনে মাত্র একবার তাকে চাবুক খেতে হয়েছে। যখনই কিছু বলত নিজের "খৃস্টীয়" জীবনের (চাষীর জীবনকে সে ঐ নামেই উল্লেখ করত) পুরনো ও মূল্যবান স্মৃতির কথাই বলত।

অন্য সব বন্দীদের কাছে প্লাতন কারাতায়েভ নেহাৎই একজন অতি সাধারণ সৈনিক। তারা তাকে ডাকত "ছোট বাজপাখি" অথবা "প্লাতোশা বলে, তাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করত, নানা কাজে পাঠাত। কিন্তু পিয়েরের কাছে সে রয়ে গেল প্রথম রাতের দেখা সেই একই মূর্তি: সরলতা ও সত্যের এক অপরিমেয়, অখণ্ড, শাশ্বত প্রতিমূর্তি।

একমাত্র প্রার্থনা ছাড়া প্লাতন কারাতায়েভ অন্য কিছুই মুখস্থ রাখতে পারত না। কথা বলতে আরম্ভ করে কিভাবে যে শেষ করবে তাও জানত না।

তার কথার অর্থে চমকে উঠে পিয়ের মাঝে মাঝে তাকে কথাটা আর একবার বলতে অনুরোধ করত, কিন্তু একমুহূর্ত আগে যে কথাগুলি বলছে প্লাতন আর একবার তা বলতে পারত না। তার প্রিয় গান: "স্বদেশ", "বার্চগাছ" ও "আমার রুগ্ন হৃদয়"—এর কথাগুলিও সে পিয়েরকে আলাদা করে বলতে পারত না; বললেও গানের বাইরে সে কথাগুলির কোন অর্থই

খুঁজে পাওয়া যেত না। তার প্রতিটি কথা ও কাজই অজ্ঞাত এক কর্মধারার বহিঃপ্রকাশ—সেই কর্মধারা তারই জীবন। কিন্তু তার জীবনের তো আলাদা করে কোন অর্থ নেই। এক অখণ্ড সত্তার অংশ হিসাবেই তো তার যার কিছু অর্থ। ফুলের ভিতর থেকে যেমন ভেসে আসে গন্ধ, তেমনই তার কথা ও কাজ তার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে অনিবার্য স্বাভাবিকতায়। আলাদা করে কোন একটি কথা বা কাজের কোন মূল্য বা তাৎপর্য সে বুঝতে পারে না।

অধ্যায়—১৪

প্রিন্সেস মারি যখন নিকলাসের কাছে শুনল যে তার দাদা ইয়ারোস্লাভ্‌ল্‌-এ রস্তভদের বাড়িতে আছে তখনই সে সেখানে যাবার জন্য প্রস্তুত হল; মাসির কোন নিষেধই শুনল না; শুধু নিজে নয়; ভাই-পোটিকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে বলে স্থির করল। একাজটা কঠিন কি সহজ, সম্ভব কি অসম্ভব, তা সে কাউকে জিজ্ঞাসা করল না, জানতেও চাইল না: দাদা মৃত্যুর পথে; এ সময় তার কাছে থাকা এবং তার ছেলেকে তার কাছে নিয়ে যাওয়া তার কর্তব্য; তাই সে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। প্রিন্স আন্দ্রু যে নিজে তাকে কিছুই জানায় নি তার কারণ হিসাবে সে ভাবল, হয় তো অত্যধিক দুর্বলতার জন্য সে নিজে চিঠি লিখতে পারছে না, অথবা এই দীর্ঘ পথযাত্রা তার পক্ষে এবং দাদার ছেলেটির পক্ষে যেমন কষ্টকর তেমনই বিপজ্জনক বলেই সে মনে করছে।

কয়েকদিনের মধ্যেই প্রিন্সেস মারি যাত্রার জন্য প্রস্তুত হল। যাত্রার আয়োজনের মধ্যে আছে একটা বড় পারিবারিক গাড়ি যাতে চড়ে সে ভরোনেজ গিয়েছিল, একটা আধ-খোলা ছোট এক্কা, ও একটা মালগাড়ি। তার সঙ্গে যাচ্ছে মাদ্‌ময়জেল বুরিঁয়ে, ছোট্ট নিকলাস ও তার শিক্ষক, বুড়ি নার্স, তিনটি দাসী, তিখন, যুবক পরিচারক ও সংবাদবাহক।

মস্কোর ভিতর দিয়ে প্রচলিত পথে যাওয়ার কথা ভাবাই যায় না। প্রিন্সেস মারিকে বাধ্য হয়ে লিপেৎস্ক, রিয়াজান, ভ্লাদিমির ও শুয়ার ভিতর দিয়ে যে ঘোরা পথটা বেছে নিতে হল সেটা খুব দীর্ঘ, আর সে পথের সব জায়গায় ডাক-ঘোড়া পাওয়া যায় না বলে খুবই কষ্টসাধ্য; আর যেহেতু রিয়াজানের কাছে ফরাসীরা দেখা দিয়েছে সেজন্য পথটা বিপজ্জনকও বটে।

এই কষ্টকর পথযাত্রায় প্রিন্সেস মারির উদ্যম ও মনের জোর দেখে মাদ্‌ময়জেল বুরিঁয়ে, দেসালেস ও চাকরবাকররা অবাক হয়ে গেছে। সকলের পরে সে শুতে যায়, আর ঘুম থেকে ওঠে সকলের আগে; কোন কষ্টই তাকে দমিয়ে রাখতে পারে না। তার উদ্যম ও কর্মশক্তির ফলেই দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষ নাগাদ তারা ইয়ারোস্লভ্‌ল্‌-এর কাছে পৌঁছে গেল।

ভরোনেঝ-এ শেষের দিন ক'টা ছিল তার জীবনের সব চাইতে সুখের দিন। রস্তভের প্রতি ভালবাসা আর তাকে যন্ত্রণা দেয় না, বিচলিত করে না। সে ভালবাসা তার সারা মন জুড়ে আছে, তার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে, তার বিরুদ্ধে সে আর এখন লড়াই করে না। স্পষ্ট করে নিজেকে না বললেও ইদানীং তার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে যে সে ভালবেসেছে এবং ভালবাসা পেয়েছে।

কিন্তু মনের একদিককার এই সুখ দাদার জন্য দুঃখবোধের পথে কোনরকম বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি; উপরন্তু, মনের এই প্রশান্তির ফলে দাদার প্রতি মনোভাবকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

ভ্রমণের সময় যেরকম ঘটে থাকে, প্রিন্সেস মারি শুধু যাত্রার কথাই ভাবতে লাগল, উদ্দেশ্যটা ভুলে রইল। কিন্তু ইয়ারোস্লাভ্‌ল্‌-এর যত কাছে এগোতে লাগল ততই সন্ধ্যার মধ্যেই যে দৃশ্যের সম্মুখীন তাকে হতে হবে তার চিন্তা নতুন করে মনে জাগল, তার উত্তেজনাকে চরমে তুলে দিল।

রস্তভরা কোথায় আছে এবং প্রিন্স আন্দ্রু কেমন আছে তা জানবার জন্য সংবাদটাকে আগেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বড় গাড়িটা শহরের ফটক দিয়ে ঢুকলে প্রিন্সেস মারি যখন জানালা দিয়ে মুখটা বের করল তখন তার মুখের ভয়ঙ্কর ফ্যাকাসেভাব দেখে লোকটি ভয় পেয়ে গেল।

বলল, "সব খোঁজ নিয়েছি ইয়োর এক্সেলেন্সি: রস্তভরা আছেন স্কোয়ারের ভিতরে বণিক ব্রোনিকভের বাড়িতে; এখান থেকে বেশী দূর নয়, ভলগার একেবারে দক্ষিণ তীরে।"

প্রিন্সেস মারি সভয়ে তার দিকে তাকাল; যেকথা সে সব চাইতে বেশী করে জানতে চাইছে তার জবাব লোকটি দিচ্ছে না কেন: তার দাদা কেমন আছে? মাদ্‌ময়জেল বুরিঁয়েই প্রশ্নটা করল।

"প্রিন্স কেমন আছেন?"

"হিজ এক্সেলেন্সি তাদের সঙ্গে এক বাড়িতেই আছেন।"

"তাহলে বেঁচে আছে," এইকথা ভেবে বলল, "সে কেমন আছে?"

"চাকররা বলছে, একই রকম।"

"একই রকম" মানে কি সেটা প্রিন্সেস মারি জিজ্ঞাসা করল না; সকলের অলক্ষ্যে সাত বছরের নিকলাসের দিকে একবার তাকিয়ে সেই যে মাথা নীচু করল, ভারী গাড়িটা দুলে দুলে ঝাঁকুনি দিতে দিতে সশব্দে চলতে চলতে না থামা পর্যন্ত আর সে মাথা তুলল না। ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে গাড়ির সিঁড়িটা নামিয়ে দেওয়া হল।

গাড়ির দরজা খুলে গেল। বাঁ দিকে জল—একটা বড় নদী—ডান দিকে বারান্দা। ফটকে অনেকে দাঁড়িয়ে আছে: চাকরবাকর, আর একটি গোলাপী মেয়ে; মেয়েটি যেন মুখ ভার করে হাসছে। (মেয়েটি সোনিয়া।)

প্রিন্সেস মারি সিঁড়ি বেয়ে ছুটে চলল। মেয়েটি তেমনই কৃত্রিম হাসির সঙ্গে বলে উঠল, "এই পথে, এই পথে!" হলে ঢুকে প্রিন্সেস সামনেই দেখতে পেল প্রাচ্য দেশীয় চেহারার একটি বর্ষীয়সী মহিলাকে। মহিলাটি দ্রুত তার দিকে এগিয়ে গেল। কাউণ্টেস।

প্রিন্সেস মারিয়াকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেল।

ফরাসীতে বলল, "বাছা আমার! তোমাকে কত ভালবাসি; কতদিন হল তোমার কথা শুনছি, জানছি।"

প্রিন্সেস মারি বুঝতে পারল ইনিই কাউণ্টেস; এর সঙ্গে কিছু বলা দরকার। ফরাসীতে কিছু সৌজন্যসূচক কথা বলে সে শুধাল: "ও কেমন আছে?"

"ডাক্তার বলছে আর কোন বিপদ নেই," কথাগুলি মুখে বললেও দীর্ঘশ্বাস ফেলে এমনভাবে চোখ তুলে তাকাল যাতে তার কথার প্রতিবাদই বুঝি প্রকাশ পেল।

প্রিন্সেস বলল, "সে কোথায়? আমি কি তাকে দেখতে পারি—দেখতে পারি?"

"একটু দেরি কর প্রিন্সেস, একটু। এটি বুঝি তার ছেলে?" দেসেলেসের সঙ্গে ঘরে ঢুকতেই ছোট্ট নিকলাসকে দেখিয়ে কাউণ্টেস বলল। "বাড়িটা বেশ বড়, সকলেরই জায়গা হয়ে যাবে। আহা, কী চমৎকার ছেলেটি!"

কাউণ্টেস প্রিন্সেস মারিকে নিয়ে বৈঠকখানায় গেল। সেখানে সোনিয়া ও মাদ্‌ময়জেল বুরিঁয়ে গল্প করছিল। কাউণ্টেস ছেলেটিকে আদর করতে লাগল, আর বুড়ো কাউণ্ট এসে প্রিন্সেসকে স্বাগত জানাল। প্রিন্সেস মারি যখন তাকে সর্বশেষ দেখেছিল তারপর থেকে বুড়ো কাউণ্ট অনেক বদলে গেছে। তখন সে ছিল চটপটে, ফুর্তিবাজ, আত্মপ্রত্যয়শীল একটি বৃদ্ধ, আর এখন তাকে দেখে মনে হচ্ছে একটি করুণ, বিভ্রান্ত মানুষ। প্রিন্সেস মারির সঙ্গে কথা বলার সময় সে অনবরত চারদিকে তাকাচ্ছে, যেন জানতে চাইছে তার ব্যবহার ঠিক হচ্ছে কি না। মস্কোর ধ্বংস এবং তার সম্পত্তি নষ্ট হয়ে যাবার পরে অভ্যস্ত আশ্রয় থেকে সরে এসে সে যেন নিজের গুরুত্ববোধটাই হারিয়ে ফেলেছে, যেন ধরেই নিয়েছে জীবনে তার আর কোন স্থান নেই।

সোনিয়ার পরিচয় দিয়ে বলল, "এটি আমার জ্ঞাতি বোন-ঝি—তোমার সঙ্গে ওর পরিচয় নেই প্রিন্সেস?

প্রিন্সেস মারি সোনিয়ার দিকে তাকাল, মনের বিরূপ অনুভূতিকে চাপা দেবার চেষ্টা করে তাকে চুমো খেল। কিন্তু এখানকার সকলের মনের অবস্থাই তার থেকে আলাদা দেখে তার খুব কষ্ট হতে লাগল।

সকলের দিকে ফিরে সে আবার শুধাল, "সে কোথায়?"

সোনিয়া লজ্জায় লাল হয়ে বলল, "তিনি নীচে আছেন। নাতাশা তার

কাছে আছে। তার কাছে লোক পাঠানো হয়েছে। আপনাকে খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে প্রিন্সেস।"

বিরক্তিতে প্রিন্সেস মারির চোখে জল এসে গেল। মুখ ঘুরিয়ে কাউণ্টেস-কে আবার জিজ্ঞাসা করতে যাবে কিভাবে তার কাছে যাবে, এমন সময় দরজায় পায়ের শব্দ শোনা গেল। ঘুরে তাকিয়ে প্রিন্সেস দেখল নাতাশা প্রায় ছুটে আসছে—অনেকদিন আগে মস্কোতে যাকে দেখে তার মোটেই ভাল লাগে নি সেই নাতাশা।

কিন্তু নাতাশার মুখের দিকে তাকিয়েই সে বুঝতে পারল যে এতক্ষণে একজন সমব্যথী সে পেয়েছে; এই তো বন্ধু। প্রিন্সেস ছুটে নাতাশার কাছে গেল, তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁধে মাথা রেখে কাঁদতে লাগল।

প্রিন্স আন্দ্রুর বিছানার মাথার কাছে বসে প্রিন্সেস মারির আসার সংবাদ শোনা মাত্রই সে ছুটে এখানে চলে এসেছে।

ছুটতে ছুটতে সে যখন বৈঠকখানায় ঢুকল তখন তার উত্তেজিত মুখে শুধু একটি লক্ষণই ফুটে উঠেছে—ভালবাসার লক্ষণ—সীমাহীন ভালবাসা—প্রিন্স আন্দ্রুর প্রতি, প্রিন্সেস মারির প্রতি, তার প্রেমিকের যারাই নিকটজন তাদের প্রতি; সে মুখে আরও ফুটে উঠেছে করুণা, অন্যের জন্য কষ্টস্বীকার, এবং অপরের সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করার একান্ত বাসনা। এই মুহূর্তে নাতাশার অন্তরে নিজের চিন্তা অথবা প্রিন্স আন্দ্রুর সঙ্গে তার সম্পর্কের চিন্তার কোন স্থান নেই।

নাতাশার মুখের উপর প্রথম দৃষ্টিপাতের ফলেই তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্না প্রিন্সেস মারি এসব কথা বুঝতে পেরেছে; তাই তো তার কাঁধে মাথা রেখে দুঃখের সুখে সে কাঁদছে।

"চল, ওর কাছে চল মারি," বলেই নাতাশা তাকে অন্য ঘরে নিয়ে চলল।

প্রিন্সেস মারি মাথা তুলে চোখ মুছে নাতাশার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। সে বুঝল, এর কাছ থেকেই সে সব কিছু জানতে ও বুঝতে পারবে।

"কেমন...." প্রশ্ন করতে গিয়েও সে থেমে গেল।

তার মনে হল, কথায় প্রশ্ন করা বা জবাব দেওয়া দুইই অসম্ভব। নাতাশার চোখ-মুখই তাকে সব কথা পরিষ্কারভাবে, গভীরভাবে বুঝিয়ে দেবে।

নাতাশা তার দিকে তাকিয়ে আছে; মনে হচ্ছে ভয় পেয়েছে, ইতস্তত করছে সব কথা বলবে কি না। হঠাৎ নাতাশার ঠোঁট দুটি কুঁকড়ে উঠল, মুখের চারদিকে বিশ্রী ভাঁজ দেখা দিল, দুই হাতে মুখ ঢেকে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

প্রিন্সেস মারি সব বুঝতে পারল।

তবু আশা ছাড়ল না; যেকথার উপর তার নিজেরই ভরসা নেই সে কথায়ই প্রশ্ন করল:

"কিন্তু তার ঘাটা কেমন আছে? সাধারণ অবস্থাই বা কেমন?"

"তুমি, তুমি,...নিজেই দেখতে পাবে" নাতাশা এর বেশী কিছু বলতে পারল না।

দুজনই আরও কিছুক্ষণ নীচেই বসে রইল; তারপর কান্না থামলে শান্ত মুখে তার ঘরের দিকে পা বাড়াল।

"সমস্ত রোগটা কি অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে? তার অবস্থা কি অনেকদিন থেকেই খারাপ? কখন এরকম হল?" প্রিন্সেস মারি একে একে খোঁজ নিতে লাগল।

নাতাশা বলল, জ্বর ভাব ও যন্ত্রণার জন্য বেশ বিপদ দেখা দিয়েছিল, কিন্তু ত্রয়েৎসায় এসে সেটা কেটে গেল, তখন ডাক্তার শুধু গ্যাংগ্রিনের আশংকা করতে লাগল। সে বিপদও কেটে গেছে। ইয়ারোস্লাভ্‌ল্‌ আসার পর থেকে ক্ষতস্থানে পুঁয হতে শুরু করল, তবে ডাক্তার বলল যে এটা স্বাভাবিক পথেই মোড় নেবে। তারপর দেখা দিল জ্বর, কিন্তু ডাক্তার বলেছে যে জ্বরটা গুরুতর কিছু নয়।"

উদ্গত কান্নাকে চাপা দিয়ে নাতাশা বলল, "কিন্তু দুদিন আগে হঠাৎ এটা ঘটেছে। কেন তা জানি না, কিন্তু সে যে কেমন হয়ে গেছে সেটা নিজেই দেখতে পাবে।"

"সে কি খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে? শুকিয়ে গেছে?" প্রিন্সেস জানতে চাইল।

"না, ঠিক তা নয়, আরও খারাপ। নিজেই দেখবে। ও মারি, সে এত ভাল, সে বাঁচতে পারে না, বাঁচতে পারে না, কারণ..."

অধ্যায়—১৫

পরিচিত ভঙ্গীতে প্রিন্স আন্দ্রুর দরজাটা খুলে নাতাশা যখন তার আগে আগে প্রিন্সেস মারিকে ঘরে ঢুকতে দিল, তখন প্রিন্সেসের বুকের ভিতর থেকে একটা চাপা কান্না ঠেলে উঠছে। অনেক চেষ্টা করে এখন নিজেকে কিছুটা শান্ত করলেও সে জানে যে দাদাকে দেখে সে চোখের জল রাখতে পারবে না।

"দুদিন আগে হঠাৎ এটা ঘটেছে," এই কথার দ্বারা নাতাশা কি বোঝাতে চেয়েছিল প্রিন্সেস তা বুঝতে পেরেছে। কথাগুলির অর্থ, সে হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে; এভাবে নরম হয়ে যাওয়া, শান্ত হয়ে যাওয়া আসন্ন মৃত্যুর লক্ষণ। দরজায় পা রাখতে গিয়েই কল্পনায় সে আন্দ্রুর ছেলেবেলার মুখখানি যেন দেখতে পেল। সে নিশ্চিত জানে, মৃত্যুর আগে তার বাবা যেমন বলেছিল আন্দ্রুও তেমনই নরম, মমতা ভরা স্বরে তার সঙ্গে কথা বলবে, আর সেও তা সহ্য করতে না পেরে তার সামনেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠবে। কিন্তু আগে হোক পরে হোক, ঘরে তো ঢুকতে হবেই; সে ভিতরে গেল। আন্দ্রুকে যতই স্পষ্ট

করে দেখতে পাচ্ছে, নিজের ক্ষীণ দৃষ্টিতে যতই তার চোখ-মুখ পরিষ্কার হচ্ছে ফুটে উঠছে, ততই চাপা কান্না তার গলা বেয়ে ঠেলে উপরে উঠে আসছে; তারপরই তার মুখটা সে দেখতে পেল, তার চোখে চোখ পড়ল।

কাঠবেড়ালের লোমের ড্রেসিং-গাউন পরে চারদিকে বালিশ রেখে সে একটা ডিভানে শুয়ে আছে। শীর্ণ, বিবর্ণ চেহারা। সরু, সাদা একটা হাতে একখানা রুমাল, অন্য হাতে নবোদ্গত গোঁফে আস্তে আস্তে টোকা দিচ্ছে, ধীরে ধীরে আঙুলগুলি নড়ছে। তারা ঘরে ঢুকতেই একদৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল।

তার মুখখানি দেখে, চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে প্রিন্সেস মারির গতি সহসা শিথিল হয়ে এল; তার মনে হল, চোখের জল শুকিয়ে গেছে, চাপা কান্না থেমে গেছে। তার চোখ-মুখের ভাষা বুঝতে পেরে সহসা নিজেকে বড়ই অপরাধী মনে হল; একটা ভীরুতা তাকে ঘিরে ধরল।

নিজেকেই শুধাল, "কিন্তু কিসে আমি অপরাধী?" আন্দ্রুর ঠাণ্ডা, কঠোর দৃষ্টি যেন জবাব দিল, "কারণ তুমি বেঁচে আছ, জীবিতের কথা ভাবছ, আর আমি..."

তার যে গভীর দৃষ্টি বাইরের পরিবর্তে ভিতরটাকেই দেখতে পায় তাতে ফুটে উঠেছে একটা বিরূপতার আভাষ।

বোনের হাতটা নিয়ে তাতে চুমো খেল।

দৃষ্টির মতই শান্ত ও নিস্পৃহ গলায় বলল, "কেমন আছ মারি? এখানেই বা এলে কেমন করে?"

আন্দ্রুর গলার স্বর শুনে প্রিন্সেস মারি হতবাক হয়ে গেল। সে যদি যন্ত্রণায় চীৎকার করত তাহলে সে চীৎকারও বুঝি প্রিন্সেস মারির বুকে এতখানি ত্রাসের সঞ্চার করতে পারত না।

সেই একই ধীর, শান্ত গলায় সে আবার বলল, "ছোট্ট নিকলাসকে সঙ্গে করে এনেছ কি?"

"এখন কেমন আছ?" প্রশ্নটা করে প্রিন্সেস মারি নিজেই অবাক হয়ে গেল।

"সেটা তুমি ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করো," সে জবাব দিল। পুনরায় স্নেহশীল হবার চেষ্টায় শুধু ঠোঁট দুটি নেড়েই সে ফরাসীতে বলল:

"এখানে আসার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।"

প্রিন্সেস মারি তার হাতটা চেপে ধরল। সে চাপে আন্দ্রুর মুখটা ঈষৎ কুঞ্চিত হল। আন্দ্রু চুপ, পিন্সেসও জানে না কি বলবে। এখন সে বুঝতে পেরেছে দুদিন আগে আন্দ্রুর কি হয়েছে। আন্দ্রুর কথায়, গলার স্বরে, বিশেষ করে তার শান্ত বিরূপ দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে পৃথিবীর সবকিছু থেকে বিচ্ছেদ, আর একটি জীবিত মানুষের বেলায় সেটা বড়ই ভয়ংকর। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, অনেক চেষ্টা করে তবে সে জীবিতকে বুঝতে পারছে, কিন্তু

আসলে সে বুঝতে পারছে না, বুঝবার শক্তি নেই বলে নয়, আসল কারণ সে বুঝেছে অন্য কিছু—এমন কিছু যাকে জীবিতরা বোঝে না, বুঝতে পারে না—সেই বোধই এখন তার মনকে ভরে রেখেছে।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে নাতাশাকে দেখিয়ে সে বলল, "দেখ, কী বিচিত্র পথে ভাগ্য আবার আমাদের মিলিয়ে দিয়েছে। সে তো সারাক্ষণই আমার দেখাশোনা করছে।"

প্রিন্সেস মারি কথাগুলি শুনল, কিন্তু এসব কথা আন্দ্রু বলছে কেমন করে তা সে বুঝতে পারল না। সে-অনুভূতিশীল, মমতাময় প্রিন্স আন্দ্রু,—কেমন করে তার সামনেই এসব কথা তাকেই বলতে পারল যাকে সে ভালবাসে আর যে তাকে ভালবাসে? তার যদি জীবনের আশা থাকত তাহলে এমন আপত্তিজনক সুরে এই কথাগুলি সে বলতে পারত না। সে যদি না জানত যে সে মরতে চলেছে তাহলে সে কি ওকে করুণা না করে পারত? ওর সামনে এমন কথা বলতে পারত? এর একমাত্র ব্যাখ্যা সে আজ উদাসীন, কারণ অন্য কিছু, অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ কিছু, তার কাছে আত্মপ্রকাশ করেছে।

আলোচনা হতে লাগল নিস্পৃহ ও অসংলগ্নভাবে; মাঝে মাঝেই বাধা পড়ল।

"মারি এসেছে রিয়াজানের পথে," নাতাশা বলল।

"সত্যি?" আন্দ্রু শুধাল।

"ওরা বলছে যে গোটা মস্কো পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, আর...."

নাতাশা থেমে গেল। কথা বলা অসম্ভব। বোঝা যাচ্ছে যে আন্দ্রু মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না।

আন্দ্রু বলল, "হ্যাঁ, সকলেই তাই বলছে। বড়ই দুঃখের কথা।" অন্যমনস্কভাবে আঙুল দিয়ে গোঁফে টোকা দিতে দিতে সে সামনের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

তারপর যেন দুজনের সঙ্গে ঘরোয়াভাবে কথা বলার বাসনাতেই প্রিন্স আন্দ্রু হঠাৎ বলে উঠল, "তাহলে কাউণ্ট নিকলাসের সঙ্গে তোমার দেখা হল মারি? সে তো এখানে লিখেছে, যে তোমাকে তার খুব পছন্দ। তোমারও যদি তাকে ভাল লেগে থাকে তাহলে তো তোমাদের বিয়ে হলে বেশ ভালই হয়।"

প্রিন্সেস মারি তার কথাগুলি শুনল, কিন্তু জীবিত সব কিছু থেকে সে যে এখন কতদূরে চলে গেছে তারই প্রমাণ ছাড়া কথাগুলির মধ্যে তার কোন অর্থই সে খুঁজে পেল না।

"আমার কথা কেন বলছ? শান্তভাবে বলে মারি নাতাশার দিকে তাকাল।

নাতাশা বুঝতে পারল, কিন্তু মারির দিকে তাকাল না। তিনজনই আবার

নিশ্চুপ।

প্রিন্সেস মারি হঠাৎ কাঁপা গলায় বলে উঠল, "আন্দ্রু, ছোট্ট নিকলাসকে দেখবে না? সে তো সবসময় তোমার কথা বলে।"

প্রিন্স আন্দ্রু এই প্রথম একটুখানি হাসল, কিন্তু প্রিন্সেস মারি তো তার মুখকে ভালভাবেই চেনে, সে সভয়ে প্রত্যক্ষ করল, সুখের জন্য বা ছেলের প্রতি স্নেহবশতঃ আন্দ্রু হাসে নি, হেসেছে শান্ত শ্লেষে, কারণ তার মনে হয়েছে যে তাকে জাগিয়ে রাখবার শেষ চেষ্টা হিসাবেই প্রিন্সেস কথাগুলি বলেছে।

"হ্যাঁ, তাকে দেখলে আমি খুশি হব। সে বেশ ভাল আছে তো?"

ছোট্ট নিকলাসকে যখন প্রিন্স আন্দ্রুর ঘরে আনা হল তখন সে ভয়ার্ত চোখে বাবার দিকে তাকাল, কিন্তু কাঁদল না, কারণ আর কেউই কাঁদছে না। প্রিন্স আন্দ্রু তাকে চুমো খেল, কিন্তু কি কথা তাকে বলবে তা বুঝতে পারল না।

নিকলাসকে বাইরে নিয়ে যাবার পরে প্রিন্সেস মারি আবার দাদার কাছে গেল, তাকে চুমো খেল, কিন্তু এবার আর চোখের জল রোধ করতে পারল না, কাঁদতে লাগল।

প্রিন্স আন্দ্রু একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

বলল, "নিকলাসের জন্য কাঁদছ?"

প্রিন্সেস মারি মাথা নেড়ে কাঁদতেই লাগল।

"মারি, তুমি কি 'সুভাষিতাবলী'..." প্রিন্স আন্দ্রু থেমে গেল।

"কি বললে?"

"কিছু না। এখানে তুমি কেঁদ না," সেই একই নিস্পৃহভাবে প্রিন্সেস মারির দিকে তাকিয়ে সে বলল।

সে কান্না দেখে প্রিন্স আন্দ্রু বুঝতে পারল, ছোট্ট নিকলাস এবার পিতৃহারা হবে সে চিন্তায়ই প্রিন্সেস মারি কাঁদছে। আপ্রাণ চেষ্টায় সে জীবনের পথে ফিরে আসতে চাইল, তাদের মত করে সব কিছু দেখতে চাইল।

ভাবল, "হ্যাঁ, এদের কাছে সেটা দুঃখের।' কিন্তু কত সহজ, সরল।"

"আকাশের পাখিরা বীজ বোনে না, ফসলও কাটে না, তবু তোমাদের পরম পিতা তাদের আহার যোগায়, কথাগুলি সে নিজেকে বলল, আর প্রিন্সেস মারিকেও বলতে চাইল; "কিন্তু না, ওরা বুঝবে না, কথাটা ওরা ওদের মত করে নেবে। ওরা বুঝতে পারে না, যেসব অনুভূতিকে ওরা মূল্য দেয়—আমাদের সেইসব অনুভূতিই অপ্রয়োজনীয়। পরস্পরকে আমরা বুঝতে পারি না।" সে চুপ করে রইল।

প্রিন্স আন্দ্রুর ছেলের বয়স সাত। একটু-আধটু পড়তে পারে, কিছুই জানে না। সেদিনের পর থেকে অনেক কিছুর ভিতর দিয়ে সে জীবন

কাটিয়েছে, জ্ঞান লাভ করেছে, দেখেছে, অভিজ্ঞতা হয়েছে, কিন্তু পরবর্তী কালে যেসব বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী সে হয়েছে সেগুলি যদি সেদিন তার আয়ত্তে থাকত তাহলেও তার বাবা, মারি ও নাতাশার মধ্যে যে দৃশ্যটি অভিনীত হতে সে দেখেছে তার অর্থকে সেদিনের আরও ভালভাবে বা গভীরভাবে বুঝতে পারত না। সব কিছুই সে বুঝছে, না কেঁদে নাতাশার সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সে নীরবে তার দিকেই এগিয়ে গেল, সুন্দর চিন্তামগ্ন দুটি চোখ মেলে সলজ্জভাবে তার দিকে তাকাল, তার গোলাপী উপরের ঠোঁটটা কাঁপতে লাগল।

তারপর থেকেই সে দেসালেস ও কাউন্টেসকে এড়িয়ে চলতে লাগল; হয় একাকি বসে থাকে, নয়তো ভীরু পায়ে প্রিন্সেস মারি অথবা নাতাশার কাছে যায়, শান্ত লাজুক ভঙ্গীতে তাদের জড়িয়ে ধরে।

প্রিন্স আন্দ্রুর কাছ থেকে চলে যাবার পরে প্রিন্সেস মারি ভালভাবেই বুঝতে পারল কি লেখা ছিল নাতাশার মুখে। আন্দ্রুকে বাঁচিয়ে তোলার কোনরকম আশার কথা সে আর কোনদিন নাতাশাকে বলে নি। নাতাশার সঙ্গে পালা করে আন্দ্রুর সোফার পাশে বসে থাকে, চোখের জল ফেলে না, অনবরত প্রার্থনা করে, একান্ত অন্তরে সেই শাশ্বত ও অপরিমেয়র দিকেই তাকিয়ে থাকে মৃত্যুপথযাত্রী মানুষটির উপরে যাঁর উপস্থিতির প্রভাব এখন অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

অধ্যায়—১৬

প্রিন্স আন্দ্রু জানে সে মরবে; শুধু তাই নয়, সে বুঝতে পারছে সে মরতে চলেছে, এখনই অর্ধমৃত। পার্থিব সব কিছু থেকে একটা দূরত্ব বোধ, অস্তিত্বের একটা বিচিত্র আনন্দময় হাল্কাভাবের চেতনা তাকে ঘিরে ধরেছে। কোনরকম তাড়াহুড়া বা উত্তেজনা ছাড়াই আসন্ন মৃত্যুর জন্য সে অপেক্ষা করছে। যে দুর্লংঘ্য, শাশ্বত, অতিদূর, অজ্ঞাতের উপস্থিতি সে সারাজীবন অনুভব করেছে আজ সে কাছে এসেছে; একটা বিচিত্র হাল্কা অভিজ্ঞতার মধ্যে সে যেন বোধগম্য হয়ে উঠছে....

আগে আগে এই পরিণতিকে সে ভয় পেত। ভয়ংকর যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর—এই পরিণতির—অভিজ্ঞতা তার দু'বার হয়েছে, কিন্তু এখন আর সেই ভয়কে সে বুঝতে পারছে না।

একটা গোলা যখন লাটিমের মত তার সামনে পাক খাচ্ছিল তখনই প্রথম এই ভয় সে পেয়েছিল; শস্যহীন ক্ষেত, ঝোঁপঝাড় ও আকাশের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পেরেছিল যে সে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছে। আহত হবার পরে আবার যখন নিজেকে ফিরে পেল, জীবনের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে শাশ্বত,

চিরমুক্ত ভালবাসার কমলটি যখন মুহূর্তের মধ্যে তার অন্তরের মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়েছিল, তখন আর তার মৃত্যুর ভয় রইল না, মৃত্যুর চিন্তাই সে ছেড়ে দিল।

আহত হবার পরে সে যখন নির্জনতা, যন্ত্রণা ও আংশিক বিকারের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল তখন সদ্য প্রকাশিত শাশ্বত প্রেমের মধ্যে সে যতই ডুব দিচ্ছিল ততই নিজের অজ্ঞাতে সে পার্থিব জীবন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলছিল। সব কিছুকে, সকল জীবকে ভালবাসা, ভালবাসার জন্য প্রতিনিয়ত নিজেকে বিসর্জন দেওয়ার অর্থ কোন একজনকে ভালবাসা নয়, পার্থিব জীবনটাকে চালিয়ে যাওয়া নয়। ভালবাসার এই রীতিতে সে যতই উদ্বুদ্ধ হতে লাগল ততই সে জীবনকে পরিহার করে চলল, ততই জীবন ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী প্রাচীরটাকে সে ভেঙে ফেলতে লাগল। সেই সময়ে মৃত্যুর চিন্তা মনে এলেই সে নিজেকে বলত: "আরে, তাতে কি হল? সে তো আরও ভাল!"

কিন্তু মিতিশ্‌চির সেই রাতে অর্ধ বিকারের মধ্যে সে যখন সেই বহুবাঞ্ছিতাকে সামনে দেখতে পেল, তার ঠোঁটের উপর নিজের হাতটা রেখে সেই নারী যখন সুখের অশ্রু ঝরাল চোখে, তখন নিজের অলক্ষ্যেই একটি নারীর প্রতি ভালবাসা আবার তার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করল, আবার তাকে বেঁধেছিল জীবনের সঙ্গে। একটা সানন্দ উদ্বিগ্ন চিন্তা তার মনে বাসা বাঁধল। অ্যাম্বুলেন্স ঘাঁটিতে কুরাগিনের সঙ্গে দেখা হবার মুহূর্তটি স্মরণ করতে গিয়ে তখন তার মনের ভাব কি রকম হয়েছিল তা সে মনে করতে পারে না, কিন্তু কুরাগিন বেঁচে আছে কি না সে চিন্তা তাকে কষ্ট দিয়েছিল। সে সম্পর্কে খোঁজ নেবার সাহস পর্যন্ত তার হয় নি।

তার অসুস্থতা স্বাভাবিক গতিতেই চলছিল, কিন্তু "এটা হঠাৎ ঘটল" বলতে গিয়ে নাতাশা যে অবস্থার কথা উল্লেখ করেছে সেটা ঘটেছে প্রিন্সেস মারি আসার দু'দিন আগে। জীবন ও মৃত্যু সেই শেষ আত্মিক সংগ্রামে মৃত্যুই বিজয়ী হয়েছে। তার থেকে এই অপ্রত্যাশিত উপলব্ধি তার হয়েছে, যে-জীবন নাতাশার প্রতি ভালবাসার রূপ ধরে তার কাছে উপস্থিত হয়েছে তাকে সে এখনও মূল্যবান মনে করে, আর তাই অজ্ঞাতপূর্ব একটা আতংক তাকে আক্রমণ করেছে।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। ডিনারের পরে আগের মতই একটু জ্বরভাব হয়েছে, চিন্তার ধারা হয়ে উঠেছে অস্বাভাবিক রকমের স্বচ্ছ। সোনিয়া বসে আছে টেবিলের পাশে। প্রিন্স আন্দ্রু ঘুমে ঢুলছে। সহসা একটা আনন্দের অনুভূতি জাগল তার মনে।

"আঃ, সে এসেছে!" সে ভাবল।

আর সত্যি তাই: সোনিয়ার জায়গায় নিঃশব্দে এসে বসেছে নাতাশা।

যবে থেকে নাতাশা তার দেখাশোনা করতে শুরু করেছে তবে থেকেই

তার উপস্থিতি সে সবসময়ই বুঝতে পারে। তার মুখের উপর থেকে মোমবাতির আলোটাকে আড়াল করে নাতাশা একটা হাতল-চেয়ারে বসে মোজা বুনছে। প্রিন্স আন্দ্রু একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেছিল, যেসব বুড়ি নার্স মোজা বোনে তাদের মত রোগীর শুশ্রূষা কেউ করতে পারে না, মোজা বোনার মধ্যে একটা শান্তভাব আছে ; সেই থেকেই নাতাশা মোজা বোনা শিখছে। তার হাতে সূচ চলছে দ্রুতগতিতে, তার চিন্তান্বিত আনত মূর্তিটা দেখা যাচ্ছে। একটু নড়তেই সুতোর গোলাটা হাঁটুর উপর থেকে গড়িয়ে পড়ল। প্রিন্স আন্দ্রুর দিকে একবার তাকিয়ে গোলাটা কুড়িয়ে নিয়ে সে আবার আগের জায়গায় গিয়ে বসল।

প্রিন্স আন্দ্রু শোয়া অবস্থাতেই নাতাশার দিকে তাকাল ; বুঝতে পারল, একটা ভারী শ্বাস টানবার ইচ্ছা হওয়া সত্ত্বেও তা না করে খুব সাবধানে শ্বাস টানতে লাগল।

ত্রয়ৎসা মঠে অতীতের কথা প্রসঙ্গে প্রিন্স আন্দ্রু নাতাশাকে বলেছিল, বেঁচে থাকলে এই ক্ষতের জন্য সে ঈশ্বরকে চিরদিন ধন্যবাদ দেবে, কারণ এই ক্ষতই তাদের দুজনকে আবার মিলিয়ে দিয়েছে। তারপর থেকে তারা কোনদিন ভবিষ্যতের কথা বলে নি।

নাতাশার দিকে তাকিয়ে ইস্পাতের সুঁচের শব্দ শুনতে শুনতে সে ভাবল "এ কি হতে পারে, না পারে না? এমন অদ্ভুতভাবে ভাগ্য আমাকে ওর কাছে নিয়ে এসেছে কি শুধু আমাকে মেরে ফেলবার জন্য? ...এও কি সম্ভব যে জীবনের সত্যকে আমার কাছে প্রকাশ করা হয়েছে শুধু এটাই বোঝাতে যে মিথ্যার পথেই আমি জীবনটাকে কাটিয়েছি? পৃথিবীর সব কিছুর চাইতে ওকে আমি বেশী ভালবাসি। কিন্তু ওকে ভালবেসে আমি কি করব?" নিজের অজ্ঞাতেই তার মুখ হতে একটা আর্তনাদ বেরিয়ে গেল।

সে শব্দ শুনে নাতাশা মোজাটা রেখে তার দিকে ঝুঁকল ; হঠাৎ তার চকচকে চোখের দিকে চোখ পড়তেই আস্তে পা ফেলে তার কাছে গিয়ে ঝুঁকে দাঁড়াল।

"তুমি কি ঘুমিয়েছ?"

"না, অনেকক্ষণ ধরে তোমাকে দেখছি। তোমার আসা আমি টের পেয়েছি। তুমি এলে যে মৃদু প্রশান্তির স্বাদ পাই তা আর কেউ দিতে পারে না। ...সে এক আলো। সুখে আমার কাঁদতে ইচ্ছা করছে।"

নাতাশা আরও কাছে এগিয়ে গেল। পরমানন্দে তার চোখ ঝিলমিল্ করছে।

"নাতাশা, আমি তোমাকে বড় বেশী ভালবাসি। পৃথিবীর অন্য সব কিছুর চাইতে বেশী।"

"আর আমি!" —মুহূর্তের জন্য নাতাশা মুখটা ফিরিয়ে নিল। শুধাল,

বলল, "বড় বেশী বললে কেন ?"

"কেন বড় বেশী ? ....আচ্ছা, তুমি কি মনে কর, তোমার মন কি বলে—আমি বাঁচব তো ? তুমি কি মনে কর ?"

"সেবিষয়ে তো আমি নিশ্চিত, সম্পূর্ণ নিশ্চিত !" গভীর আগ্রহে তার দুটি হাত ধরে নাতাশা প্রায় চেঁচিয়ে বলল।

প্রিন্স আন্দ্রু কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

"তাহলে কী ভালই হত !" নাতাশার হাতটা নিয়ে তাতে চুমো খেল।

নাতাশার মনে সুখের উচ্ছ্বাস, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল, এ চলবে না, আন্দ্রুকে শান্ত হয়ে থাকতে হবে।

আন্দ্রুকে চেপে রেখে বলল, "কিন্তু তুমি ঘুমোও নি। ঘুমোতে চেষ্টা কর....দোহাই !"

প্রিন্স আন্দ্রু তার হাতটা চেপে ধরে ছেড়ে দিল; নাতাশা ফিরে গিয়ে নিজের জায়গায় বসল। দু'বার তার দিকে তাকাল, দু'বারই দেখল প্রিন্স আন্দ্রুর উজ্জ্বল চোখ দুটি তার দিকেই তাকিয়ে আছে। নাতাশা মোজা বোনায় মন দিল, স্থির করল শেষ না করা পর্যন্ত মুখ ফেরাবে না।

প্রিন্স আন্দ্রুও অচিরেই চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়ল। বেশীক্ষণ ঘুম হল না, হঠাৎই চমকে জেগে উঠল, সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে।

ঘুমোবার আগেও সে একথাই ভাবছিল—জীবন ও মৃত্যুর কথা, প্রধানত মৃত্যুর কথা। মনে হল, ক্রমেই সে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে।

"ভালবাসা ? ভালবাসা কি ?" সে ভাবতে লাগল।

"ভালবাসা মৃত্যুকে বাধা দেয়। ভালবাসাই জীবন। যা কিছু বুঝি, ভালবাসি বলেই বুঝি। একমাত্র ভালবাসাতেই সব কিছু এক হয়। ভালবাসাই ঈশ্বর, আর মরে যাওয়া মানেই আমি, সেই ভালবাসার একটি অংশ, সেই শাশ্বত উৎসে ফিরে যাব।" এই চিন্তার মধ্যে সে কিছুটা সান্ত্বনা পেল। কিন্তু সে তো চিন্তা মাত্র। তাতে কিসের যেন অভাব আছে, যথেষ্ট পরিষ্কার নয়. বড় বেশী একপেশে, ব্যক্তিকেন্দ্রিক, মস্তিষ্কের বোনা জাল। ফিরে এল আগেকার সেই উত্তেজনা ও অস্পষ্টতা। সে ঘুমিয়ে পড়ল।

স্বপ্ন দেখল, সেই ঘরেই সে ঘুমিয়ে আছে, কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ ও অক্ষত। নানা ধরনের সাধারণ মানুষ তার সামনে এল। সে তাদের সঙ্গে কথা বলল, নানা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আলোচনা করল। তারা যেন কোথায় যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। প্রিন্স আন্দ্রু আবছাভাবে বুঝতে পারল, এসবই তুচ্ছ, আরও বড় কাজ তার হাতে আছে, কিন্তু সে কথা বলেই চলল, তার চুটকি কথায় সকলকে তাক লাগিয়ে দিল। ক্রমে সকলেই অলক্ষ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল, আর সব চাইতে বড় হয়ে দেখা দিল রুদ্ধদ্বার ঘরে আলোচনার যোগ্য একটি মাত্র প্রশ্ন। সে উঠে দাঁড়াল; দরজায় সিটকিনি টেনে তালা লাগাতে এগিয়ে গেল।

যথাসময়ে তালাটা লাগাতে পারবে কি না তার উপরেই সব কিছু নির্ভর করছে। তাড়াতাড়ি যেতে চেষ্টা করল, কিন্তু পা চলল না, বুঝতে পারল যে সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করলেও সে যথাসময়ে দরজায় তালা লাগাতে পারবে না। একটা যন্ত্রণাদায়ক ভয় তাকে পেয়ে বসল। সে ভয় মৃত্যু-ভয়। মৃত্যু দুয়ারে দাঁড়িয়ে। কিন্তু যেই সে কোনরকমে হামাগুড়ি দিয়ে দরজার দিকে এগোতে লাগল তখনই দরজার ওপারের সেই ভয়ঙ্কর বস্তুটি দরজা ঠেলে জোর করে ঢুকতে চেষ্টা করল। কোন মানুষ নয়—মৃত্যুই দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকছে; তাকে ঠেকিয়ে রাখতেই হবে। তালা লাগানো আর সম্ভব নয় বলে সে দরজা ঠেলে রাখার শেষ চেষ্টা করল, কিন্তু তার চেষ্টা বড়ই দুর্বল ও এলোমেলো; সেই ভয়ঙ্কর পিছন থেকে দরজায় ধাক্কা দিল, দরজাটা খুলে আবার বন্ধ হয়ে গেল।

আবার সে বাইরে থেকে ঠেলা দিল। আন্দ্রুর শেষ মানবিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল; দরজার পাল্লা দুটো নিঃশব্দে খুলে গেল। সে ঢুকল, ঢুকল মৃত্যু, প্রিন্স আন্দ্রু মারা গেল।

কিন্তু যেমুহূর্তে সে মারা গেল সেই মুহূর্তে প্রিন্স আন্দ্রুর মনে পড়ল যে সে ঘুমিয়েছিল, আর ঠিক যে মুহূর্তে সে মারা গেল তখনই অনেক চেষ্টার পরে সে জেগে উঠেছে।

"হ্যাঁ, এই তো মৃত্যু! আমি মরে গিয়েছিলাম—আবার জেগে উঠেছি। হ্যাঁ, মৃত্যুই তো জাগরণ।" আর সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তর আলোকিত হয়ে উঠল; যে যবনিকা অজ্ঞাতকে আড়াল করে রেখেছিল তার আত্মিক দৃষ্টির সম্মুখ থেকে সেটা সরে গেল। মনে হল, যেসব শক্তি এতদিন তার মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে ছিল তারা ছাড়া পেয়েছে; সেই বিচিত্র ভারহীনতা আর কোন দিন তাকে ছেড়ে যায় নি।

ঠাণ্ডা ঘামের মধ্যে জেগে উঠে সে যখন ডিভানে নড়াচড়া করল তখন নাতাশা কাছে গিয়ে জানতে চাইল কি হয়েছে। সে কোন জবাব দিল না; কিছু বুঝতে না পেরে অদ্ভুতভাবে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

প্রিন্সেস মারি আসার দুদিন আগে এই ঘটনাই ঘটেছিল। ডাক্তারের মতে ক্ষয়কারী জ্বরটা সেদিন থেকেই উৎকট আকার ধারণ করেছে, কিন্তু নাতাশা ডাক্তারের কথায় কান দিল না; তার চোখে ধরা পড়ল কতকগুলি সুস্পষ্ট ভয়ঙ্কর নৈতিক লক্ষণ।

সেদিন থেকেই ঘুম থেকে জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রিন্স আন্দ্রু যেন জীবন থেকেও জেগে উঠতে লাগল। একটা স্বপ্নের সময়কালের সঙ্গে তুলনায় ঘুম থেকে জাগরণের যে গতি তা দেখে বিচার করলে জীবনের সময়কালের সঙ্গে তুলনায় এই জাগরণের গতি মোটেই শ্লথতর নয়।

এই তুলনামূলক ধীরগতি জাগরণের মধ্যে ভয়ঙ্কর বা দুর্বার কিছু ছিল না।

তার শেষের দিনগুলি অতি সাধারণ ও সরলভাবেই কাটতে লাগল। প্রিন্সেস মারি ও নাতাশা কখনও তাকে ছেড়ে যায় না; এটা তারাও বুঝতে পারল। কিন্তু তারা কাঁদল না, ভয়ে শিউরেও উঠল না; শেষের ক'টা দিন তারা নিজেরাও বুঝতে পারল যে তারা আর প্রিন্স আন্দ্রুর সেবা করছে না (সে এখন আর তাদের মধ্যে নেই, তাদের ছেড়ে গেছে), সেবা করছে তার দেহের। এই অনুভূতি দুজনের মনেই তখন এত প্রবল যে মৃত্যুর ভয়ঙ্কর বহিরঙ্গ দিকটা তাদের আর আঘাত দিতে পারছে না, তাই তাদের মনে শোকও জাগছে না। তার সামনে বা অন্যত্র তারা আর চোখের জল ফেলছে না, তাকে নিয়ে আলোচনাও করছে না। মনে মনে তারাও বুঝেছে, নিজেদের বুকের কথাকে তারা মুখের কথায় প্রকাশ করতে পারবে না।

দুজনই দেখছে সে ধীরে ধীরে নিঃশব্দে মৃত্যুর গভীর থেকে গভীরে তলিয়ে যাচ্ছে; দুজনই জানে যে এটা ঘটবেই, আর ঘটাই স্বাভাবিক।

সে দোষ স্বীকার করল, প্রার্থনা করল: সকলেই এসে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেল। ছেলেকে যখন তার কাছে নিয়ে গেল তখন সে বালকের ঠোঁটে নিজের ঠোঁট ছুঁইয়ে মুখটা ফিরিয়ে নিল, কাজটা কষ্টকর ও দুঃখজনক বলে নয়, তার ধারণা যে শুধু এইটুকুই তার করণীয়; কিন্তু তাকে যখন ছেলেকে আশীর্বাদ করতে বলা হল তখন সে তাও করল, তারপর চারদিকে তাকাতে লাগল, যেন জানতে চাইল তার আর কিছু করণীয় আছে কি না।

আত্মা ছেড়ে যাবার সময় যখন দেহের শেষ খিঁচুনি দেখা দিল তখনও প্রিন্সেস মারি ও নাতাশা তার পাশেই ছিল।

চোখের সামনে দেহটা ঠাণ্ডা হয়ে এল; কয়েক মিনিটের জন্য একেবারে নিশ্চল হয়ে পড়ে রইল। প্রিন্সেস মারি বলল, "সব কি শেষ হয়ে গেল?" নাতাশা এগিয়ে গেল, মৃত চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিল। চোখের পাতা বন্ধ করে দিল, কিন্তু তাতে চুমো না খেয়ে এই একান্ত প্রিয়জনটির শেষ স্মৃতি তার দেহটাকে জড়িয়ে ধরল।

"ও কোথায় চলে গেল? এখন কোথায় আছে?...."

দেহটাকে ধুয়ে-মুছে সাজিয়ে যখন টেবিলের উপরে শবাধারে রাখা হল তখন সকলে এসে তার কাছ থেকে বিদায় নিল, সকলেই কাঁদতে লাগল।

ছোট নিকলাসও কাঁদল, কারণ বেদনাদায়ক বিহ্বলতায় তার অন্তরটা বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। কাউণ্টেস ও সোনিয়া কাঁদল নাতাশার প্রতি করুণায়, কারণ সে আর নেই। বুড়ো কাউণ্ট কাঁদল, কারণ সে জানে যে অচিরেই তাকেও এই ভয়ঙ্কর পথে পা বাড়াতে হবে।

এবার নাতাশা ও প্রিন্সেস মারিও কাঁদল কিন্তু সে কান্না নিজেদের দুঃখে নয়; তাদের চোখের সম্মুখে মৃত্যুর যে সরল গম্ভীর রহস্য উদ্ঘাটিত হল তারই চেতনায় আবিষ্ট মনের শ্রদ্ধায় ও আবেগে তারা কাঁদতে লাগল।

ত্রয়োদশ পর্ব

অধ্যায়—১

মানুষের মন কখনও কোন ঘটনার কারণসমূহকে পুরোপুরি জানতে পারে না, অথচ জানবার বাসনা নিহিত আছে মানুষের মনের গভীরে। বহু কারণাংশের যেকোন একটিকেই যেখানে আলাদা করে দেখলে কারণ বলে মনে হতে পারে তাদের জটিলতাকে বিচার করে না দেখে মানুষ কারণের কাছাকাছি যেকোন একটি কারণাংশকেও মূল কারণ বলে ধরে নিয়ে বলে ওঠে: "এটাই কারণ।" ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে সর্ব প্রথম এবং সব চাইতে প্রাচীন অভিমত ছিল নানা দেবদেবীর ইচ্ছাকেই কারণ বলে গ্রহণ করা, আর তার পরে সে জায়গা নিয়েছিল তাদের ইচ্ছা যারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত—অর্থাৎ ইতিহাসের মহানায়ক যারা। কিন্তু যেকোন ঐতিহাসিক ঘটনাই তাতে অংশগ্রহণকারী জনসাধারণের কার্যাবলীর ফল; সেই ঘটনার মূলে প্রবেশের চেষ্টা করলেই স্পষ্ট বোঝা যাবে যে ইতিহাসের মহানায়কদের ইচ্ছা জনসাধারণের কার্যাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করে না, বরং তার দ্বারাই বারবার নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। ঐতিহাসিক ঘটনার তাৎপর্যকে আমরা যেভাবেই বুঝি না কেন তাতে কিছু যায়-আসে না; তথাপি যে মানুষ বলে যে নেপোলিয়নের ইচ্ছানুসারেই পশ্চিমের মানুষগুলি পূব দিকে গিয়েছিল এবং যে মানুষ বলে যে এ ঘটনা ঘটবে বলেই ঘটেছিল, তাদের মধ্যে সেই একই পার্থক্য দেখা যায় যেমনটি দেখা যেত সেই দুটি দলের মধ্যে যাদের একদল বলত যে পৃথিবীটা স্থির আর অন্য সব গ্রহ তার চারদিকে ঘুরছে এবং অন্য দল বলত যে পৃথিবীকে কে ধরে আছে তা তারা জানে না, তবে একথা জানে যে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারেই পৃথিবী ও অন্যসব গ্রহের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। সব কারণের সেরা কারণটি ছাড়া কোন ঐতিহাসিক ঘটনার আর কোন কারণ নেই, থাকতে পারে না। কিন্তু ঐসব ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করবার মত নিয়ম-কানুন আছে, আর তার কিছু কিছু আমাদের জানাও বটে। কিন্তু সেই সব নিয়ম-কানুনকে আবিষ্কার করা একমাত্র তখনই সম্ভব যখন কোন একটি মানুষের ইচ্ছার মধ্যে সেই কারণকে খুঁজবার চেষ্টাকে আমরা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করি, ঠিক যেভাবে মানুষ যখন পৃথিবীর স্থিরত্বের ধারণাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করল একমাত্র তখনই গ্রহনিচয়ের গতিবিধির নিয়ম আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছিল।

'ইতিহাসকাররা মনে করে, বরদিনোর যুদ্ধ এবং শত্রু-কর্তৃক মস্কো দখল ও অগ্নিদগ্ধ করে তার ধ্বংস সাধনের পরেই ১৮১২ সালের যুদ্ধের সব চাইতে

গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হচ্ছে রিয়াজান হতে কালুগা রোড এবং তারুতিনো শিবির পর্যন্ত রুশ বাহিনীর অভিযান—ক্রাস্‌নয়া পখ্‌রা নদী বরাবর সৈন্যদের তথাকথিত পার্শ্বযাত্রা। সেই প্রতিভাদীপ্ত জয়ের গৌরব তারা দিয়ে থাকে বিভিন্ন মানুষকে, আর সে গৌরব কার প্রাপ্য তা নিয়ে বিতর্কও আছে। এমনকি ফরাসী ইতিহাসকাররা সমেত বিদেশী ইতিহাসকাররাও সেই পার্শ্বযাত্রার কথা বলতে গিয়ে রুশ সেনানায়কদের প্রতিভাকে স্বীকৃতি জানিয়েছে। কিন্তু যুদ্ধবিষয়ক লেখকরা, এবং তাদের দেখাদেখি অন্যরাও, কেমন করে মনে করে যে এই অভিযানটি একটি মাত্র মানুষের গভীর ধ্যান-ধারণারই ফল যে রাশিয়াকে রক্ষা করেছে এবং নেপোলিয়নকে ধ্বংস করেছে সেটা বোঝা খুব শক্ত। প্রথমত, এই পার্শ্বযাত্রার মধ্যে গভীর জ্ঞান ও প্রতিভার পরিচয় কোথায় আছে সেটাই বোঝা শক্ত, কারণ যখন আক্রান্ত হবার কোন ভয় নেই তখন একটি সেনাদলের পক্ষে সেই জায়গায় অবস্থান করাই যে সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক যেখানে যথেষ্ট খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যাবে সেটা বুঝতে তো খুব বেশী মানসিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না; ১৮১২ সালে মস্কো থেকে পশ্চাদপসরণের পরে সেনাদলের পক্ষে সব চাইতে ভাল ঘাঁটি যে কালুগা রোড সেটা তো যেকোন একটা তেরো বছরের স্বল্পবুদ্ধি ছেলেও অনুমান করতে পারত। সুতরাং কোন্ যুক্তিবলে ইতিহাসকাররা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে এই রণ-কৌশল গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক সেটা বোঝা অসম্ভব। তাছাড়া, এটা বোঝা আরও শক্ত যে তারা কেন মনে করে বসল যে রাশিয়াকে রক্ষা করার এবং ফরাসীদের ধ্বংস করার উদ্দেশ্য নিয়েই এই রণ-কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল; কারণ এই রণ-কৌশলের আগে, সমকালে, বা পরবর্তীকালে যদি অন্য কোনরকম পরিস্থিতি দেখা দিত তাহলে সেটা রুশদের পক্ষে ধ্বংসাত্মক এবং ফরাসীদের পক্ষে সুবিধাজনক হয়ে উঠতেও পারত। সেই সেনাযাত্রার সময় থেকেও যদি রুশদের অবস্থার উন্নতি ঘটতে আরম্ভ করে থাকে, তাহলেও তো একথা বলা যায় না যে ঐ যাত্রাই তার কারণ।

মস্কো যদি ভস্মীভূত না হত তাহলে কি হত? মুরাত যদি রুশদের দৃষ্টির আড়ালে যেতে না দিত? নেপোলিয়ন যদি নিষ্ক্রিয় না হত? বেনিংসেন ও বার্ক্‌লের পরামর্শমত রুশবাহিনী যদি ক্রাস্‌নয়া পখ্‌রাতে যুদ্ধ করত? রুশরা যখন পখ্‌রা নদী পেরিয়ে এগোচ্ছিল তখন যদি ফরাসীরা তাদের আক্রমণ করত? নেপোলিয়ন যে উৎসাহ-উদ্যমের সঙ্গে স্মোলেন্‌স্ক্‌-এ রুশদের আক্রমণ করেছিল তার দশ ভাগের এক ভাগ উৎসাহ-উদ্যম নিয়েও সে যদি তারুতিনোর পথে তাদের আক্রমণ করত তাহলে কি হত? ফরাসীরা যদি পিতার্সবুর্গের দিকে এগিয়ে যেত তাহলেই বা কি হত?...এইসব ঘটনার যেকোন একটা ঘটলেই পার্শ্বযাত্রা মুক্তির বদলে ধ্বংস বয়ে আনতে পারত।

তৃতীয় কথা এবং সব চাইতে দুর্বোধ্য কথা এই যে ইতিহাস নিয়ে যারা

আলোচনা করে তারাও ইচ্ছা করেই বুঝতে চায় না যে এই পার্শ্বযাত্রা কোন একটি মানুষের ব্যাপার নয়, কেউই আগে থেকে এটা ভাবে নি, আর বাস্তব ক্ষেত্রে, ফিলি (রুশ-বাহিনীর পশ্চাদপরসণের পথে সর্বশেষ গ্রাম) থেকে পশ্চাদপসরণের মতই, এই পার্শ্বযাত্রাটা পুরোপুরিভাবে কোন সময়ই কারও মাথায় ছিল না, একটু-একটু করে, ধাপে-ধাপে, ঘটনার পর ঘটনার ভিতর দিয়ে অসংখ্য বিচিত্র পরিস্থিতির পরিণতিতে এটা ঘটেছে ; ব্যাপারটা পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে দেখা দিল একমাত্র তখন যখন ঘটে যাবার পরে সেটা অতীতের বিষয় হল।

ফিলির বৈঠকে রুশ কম্যাণ্ডারদের মাথায় স্বাভাবিকভাবেই একটি মাত্র পথের কথাই এসেছিল,—সোজা নিঝ্‌নি রোড ধরে পিছু হটে যাওয়া। কিন্তু কমিসারিয়েট বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ল্যানস্‌কয় প্রধান সেনাপতিকে জানাল, সেনাবাহিনীর রসদের মোটা অংশই মজুত করা আছে তুলা ও রিয়াজান প্রদেশের ওকানদীর তীর বরাবর; কাজেই নিঝ্‌নি রোড ধরে গেলে সেনাদল প্রশস্ত ওকানদীর দ্বারা রসদ-ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, আর প্রথম শীতে ওকানদী পার হওয়া যাবে না। নিঝ্‌নি-নভ্‌গরদের পথ ধরে সোজা পিছিয়ে যাবার পরিবর্তে কেন অন্য পথ ধরতে হয়েছিল এখানেই তার হদিস পাওয়া যায়। সেনাদল রিয়াজান রোড ধরে আরও দক্ষিণে এগিয়ে চলল রসদের দিকে। পরবর্তীকালে ফরাসীদের নিক্রিয়তা, তুলার অস্ত্রাগারের নিরাপত্তার চিন্তা এবং রসদের কাছাকাছি যাবার সুবিধা—এই তিনটি পরিস্থিতির ফলেই সেনাদল আরও দক্ষিণে বেঁকে তুলা রোড ধরল। পথ্‌রা নদীর ওপারে তুলা রোডে পৌঁছে রুশ কম্যাণ্ডাররা স্থির করল পদোল্‌স্ক্‌-এই থেকে যাবে ; তখনও তারা তারুতিনো ঘাঁটির কথা চিন্তাই করে নি ; কিন্তু অসংখ্য ঘটনা ও ফরাসী সৈন্যদের পুনরাবির্ভাব, প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের সম্ভাবনা, এবং সর্বোপরি কালুগা প্রদেশে রসদের প্রাচুর্য—সবকিছু মিলে আমাদের সৈন্যদের বাধ্য করল আরও দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে এবং তুলা থেকে কালুগা রোড ধরে তারুতিনোর দিকে এগিয়ে যেতে ; যেসব রাস্তায় রসদ মজুত করা ছিল তার মধ্যস্থলেই তারুতিনোর অবস্থান। মস্কো পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত কখন নেওয়া হয়েছিল সেটা বলা যেমন অসম্ভব, ঠিক তেমনই তারুতিনো যাবার সিদ্ধান্ত কখন নেওয়া হয়েছিল বা কে নিয়েছিল সেটা সঠিকভাবে বলাও অসম্ভব। অসংখ্য বিচিত্র ধরনের ঘটনার ফলে সেনাবাহিনী যখন সেখানে পৌঁছে গেল একমাত্র তখনই সকলে নিশ্চিত হয়ে ভাবল যে এই যাত্রাই ছিল তাদের অভিপ্রেত এবং বহুকাল আগেই তারা এর ফলটা দেখতে পেয়েছিল।

অধ্যায়—২

বিখ্যাত পার্শ্বযাত্রা ব্যাপারটা মোটামুটি এই : ফরাসীদের অগ্রগতি বন্ধ হবার পরে আক্রমণকারীদের কাছ থেকে অবিরাম পশ্চাদপসরণকারী রুশ বাহিনী নিজেদের গতি-পথ পরিবর্তন করল এবং যখন দেখল যে শত্রু তার পিছনে ধাওয়া করছে তখন স্বভাবতই তারা সেইদিকে এগোতে লাগল যেখানে প্রচুর রসদ মজুদ ছিল।

রুশ বাহিনীর প্রতিভাধর কম্যাণ্ডারদের কথা না ভেবে আমরা যদি সে বাহিনীটাকে পরিচালকহীন রূপে কল্পনা করি তাহলে সে বাহিনীর পক্ষে যেসব অঞ্চলে অধিকাংশ রসদ পাওয়া যাবে এবং যেটা দেশের সব চাইতে সমৃদ্ধ অঞ্চল সেখান দিয়ে অর্ধবৃত্তাকার পথে আবার মস্কো ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই করা সম্ভব হত না।

নিঝ্‌নি থেকে রিয়াজান, তুলা ও কালুগা রোড ধরে চলাটা এতই স্বাভাবিক যে রুশ লুঠেরারাও ঐ পথেই চলাচল করে থাকে, আর পিতার্সবুর্গ থেকে কুতুজভকেও ঐ পথেই সৈন্য চালিয়ে নিতে বারবার বলা হচ্ছিল। রিয়াজান রোড ধরে সৈন্য চালানোর জন্য তারুতিনোতে কুতুজভকে সম্রাটের কাছ থেকে তীব্র ভৎ’সনাই শুনতে হল; অথচ কালুগার কাছে যেখানে সে ইতিমধ্যেই ঘাঁটি পেতেছে সম্রাটের চিঠিতে তাকে সেখানে যাবার নির্দেশই দেওয়া হল।

একটা বলের মত গড়াতে গড়াতে রুশ বাহিনী স্বাভাবিকভাবে যেখানে যাবার কথা সেখানেই পৌঁছে গেল। কুতুজভের কৃতিত্ব তথাকথিত সমর কৌশলগত প্রতিভায় নয়, তার কৃতিত্ব যে একমাত্র সেই ঘটনার তাৎপর্যকে বুঝতে পেরেছিল। ফরাসী বাহিনীর তৎকালীন নিষ্ক্রিয়তার অর্থ একমাত্র সেই বুঝতে পেরেছিল, একমাত্র সেই বারবার বলেছে যে বরদিনোর যুদ্ধে তাদের জয় হয়েছে, প্রধান সেনাপতি হিসাবে শত্রুকে আক্রমণ করতে চাওয়াটাই তার কাছে প্রত্যাশিত হলেও রুশ বাহিনীকে অকারণ সংঘর্ষ থেকে নিবৃত্ত করতে সেই সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করেছিল।

বরদিনোতে আহত জন্তুটিকে পলায়মান শিকারী যেখানে রেখে গিয়েছিল সে সেখানেই পড়ে রইল; কিন্তু সে তখনও বেঁচে আছে কি না, শক্তিশালী হয়েও নেহাৎ পড়ে আছে কিনা, সেকথা শিকারী জানত না। হঠাৎ জন্তুটার আর্তনাদ শোনা গেল।

সেই আহত পশুর (ফরাসী বাহিনী) যে আর্তনাদ তার শোচনীয় অবস্থাটাকে প্রকাশ করে দিল সেটা হল শান্তির প্রস্তাব দিয়ে লরিস্থানকে কুতুজভের শিবিরে প্রেরণ।

নেপোলিয়ন সবসময়ই বিশ্বাস করত যে তার মাথায় যা আসে সেটাই ঠিক; যতই অর্থহীন হোক যে কথাগুলি প্রথম তার মনে এল তাই সে কুতুজভকে লিখে পাঠাল।

লিখল: "মঁসিয় লি প্রিন্স কুতুজভ, কয়েকটি বিশেষ প্রশ্ন নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করার জন্য আমার একজন অ্যাডজুটাণ্ট-জেনারেলকে আপনার কাছে পাঠাচ্ছি। ইয়োর হাইনেসের কাছে আমার মিনতি, সে আপনাকে যা বলবে, বিশেষ করে দীর্ঘকাল ধরেই আপনার ব্যক্তিত্বের প্রতি যে সম্মান ও বিশেষ শ্রদ্ধা আমি পোষণ করে আসছি সেই মনোভাবকে সে যখন প্রকাশ করবে, তখন আপনি যেন তার কথায় বিশ্বাস করেন। এ চিঠির আর কোন উদ্দেশ্য নেই; মঁসিয় লি প্রিন্স কুতুজভ, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তাঁর পবিত্র ও সদয় আশ্রয়ে তিনি আপনাকে রক্ষা করুন!

মস্কো, ৩০ শে অক্টোবর, ১৮১২ নেপোলিয়ন।"

কুতুজভ জবাব দিল: "আমাকে কোনরকম মিটমাটের উদ্যোক্তা বলে মনে করলে উত্তরপুরুষ আমাকে অভিশাপ দেবে। আজ এই আমার জাতির মনোভাব।" কিন্তু সেনাদল যাতে আক্রমণ না করে সেজন্য সাধ্যমত চেষ্টা করতে লাগল।

যে একটা মাস ধরে ফরাসী সৈন্যরা মস্কোতে লুঠতরাজ করে ফিরছিল আর রুশ সৈন্যরা তারুতিনোতে তাঁবু ফেলে চুপচাপ বসেছিল, সেই সময়কালে দুই সেনাদলের মধ্যে কি মনোবলে কি সংখ্যায় একটা পরিবর্তন দেখা দিয়েছে—তার ফলে এখন রুশ পক্ষের দিকেই পাল্লাটা ভারী হয়েছে। যদিও ফরাসী বাহিনীর অবস্থা ও সংখ্যার কথা রুশরা জানত না, তবু এই পরিবর্তন ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই আক্রমণ করার প্রয়োজনটা অসংখ্য লক্ষণের ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেতে লাগল। সে লক্ষণগুলি হল: লরিস্টনের দৌত্য; তারুতিনোতে রসদের প্রাচুর্য; চতুর্দিক থেকে ফরাসীদের নিষ্ক্রিয়তা ও বিশৃংখলার সংবাদ; চমৎকার আবহাওয়া; আমাদের রেজিমেণ্টে নতুন সৈনিকের অবিরাম যোগদান; রুশ সৈন্যদের লম্বা বিশ্রাম ও কাজ করার জন্য অধৈর্য হয়ে ওঠা; যে ফরাসী বাহিনী এতকাল ছিল দৃষ্টির আড়ালে তাদের গতিবিধি সম্পর্কে অবহিত হবার জন্য তারুতিনোতে অবস্থিত ফরাসীদের সম্পর্কে খুব নিকটবর্তী রুশ ঘাঁটির সৈন্যদের কৌতূহল; ফরাসীদের বিরুদ্ধে চাষী ও গেরিলা সৈন্যদের সহজ জয়লাভের সংবাদ ও তজ্জনিত উৎসাহ বৃদ্ধি; ফরাসীরা যতদিন মস্কোতে থাকবে ততদিন রাশিয়ার প্রতিটি মানুষের মনে প্রতিশোধের তীব্র স্পৃহা; এবং সর্বোপরি প্রতিটি রুশসৈনিকের মনের অস্পষ্ট ধারণা যে তুলনামূলকভাবে উভয়দলের সৈন্যসংখ্যার পরিবর্তন ঘটেছে, আর সেটা ঘটেছে আমাদেরই স্বপক্ষে। তুলনামূলক শক্তির যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটার ফলে সৈন্যদের অগ্রাভিযান অনিবার্য হয়ে উঠেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ির মিনিটের কাঁটাটা একটা বৃত্ত পূর্ণ করামাত্রই যেমন ঘড়িটা বাজতে শুরু করে তেমনই উচ্চতর মহলের ফিস-ফিস, ফুস-ফুস এবং বর্ধিত কর্মপ্রচেষ্টার ভিতর দিয়ে এই পরিবর্তনই ঘোষিত হচ্ছে।

রুশ বাহিনী পরিচালিত হচ্ছে সপার্ষদ কুতুজভের হাতে এবং পিতার্সবুর্গ থেকে সম্রাটের হাতে। মস্কো পরিত্যাগের সংবাদ পিতার্সবুর্গে পৌঁছবার আগেই গোটা অভিযানের একটা বিস্তারিত পরিকল্পনা রচনা করে কুতুজভকে পাঠানো হয়েছিল সেই মত কাজ করতে।

যদিও মস্কো আমাদের হাতে আছে এটা ধরে নিয়েই পরিকল্পনাটা রচিত হয়েছিল তবু কর্ম-পরিষদ কর্তৃক সেটা অনুমোদিত ও গৃহীত হয়েছিল। কুতুজভ উত্তরে শুধু জানাল যে এতটা দূর থেকে পাঠানো ব্যবস্থা অনুসারে কাজ করার অনেকরকম অসুবিধা আছে। কাজেই সম্ভাবিত অসুবিধা দূর করার জন্য নতুন নির্দেশাদি পাঠানো হল; সেই সঙ্গে কুতুজভের কাজকর্মের উপর নজর রাখতে এবং সে সম্পর্কে প্রতিবেদন পাঠাতে নতুন লোকও পাঠানো হল।

এছাড়া, রুশ বাহিনীর গোটা কর্ম-পরিষদও নতুন করে গঠিত হয়েছে। ব্যাগ্রেশন নিহত হওয়ায় এবং বার্ক্‌লে আক্রোশবশত চলে যাওয়ায় সেই ত্বটি শূন্যপদেও লোক নেওয়া দরকার। তা নিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাও চলতে লাগল।

কুতুজভ ও তার কর্ম-পরিষদের প্রধান বেনিংসেনের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ; সম্রাটের ব্যক্তিগত প্রতিনিধির উপস্থিতি, এবং এইসব রদ-বদলের ফলে সেনাবাহিনীর কর্মচারিদের মধ্যে নানারকম দলাদলি চলতে লাগল। যুদ্ধ কিন্তু এসব সত্ত্বেও নিজস্ব গতিতেই চলতে থাকল।

সম্রাটের ২রা অক্টোবরে লেখা যে চিঠিটা কুতুজভের হাতে পৌঁছল তারু-তিনো যুদ্ধের পরে তাতে লেখা হয়েছিল: "প্রিন্স মাইকেল ইলারিয়নভিচ! ২রা সেপ্টেম্বর থেকে মস্কো শত্রুপক্ষের হাতে রয়েছে। আপনার সর্বশেষ প্রতিবেদনটি লেখা হয়েছে ২০ শে তারিখে; এই সময় কালের মধ্যে আপনি শত্রুর বিরুদ্ধে অথবা প্রাচীন রাজধানীর উদ্ধারে কোনরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি, কিন্তু আপনার সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুসারে আপনি আরও পিছিয়ে গিয়েছেন। শত্রুপক্ষের একটা ছোট দল ইতিমধ্যেই সেরপুখভ দখল করেছে, এবং সেনাবাহিনীর পক্ষে অপরিহার্য বিখ্যাত অস্ত্রাগারসহ তুলা বিপন্ন হয়ে পড়েছে। জেনারেল উইন্‌তিন্‌গরদের প্রতিবেদন থেকে আমি জানতে পেরেছি যে দশ হাজার সৈন্যের একটি শত্রুপক্ষীয় দল পিতার্সবুর্গ রোড ধরে এগিয়ে চলেছে। কয়েক হাজার সৈন্যের আর একটি দল দিমিত্রভের দিকে এগিয়ে আসছে। একটা তৃতীয় সেনাদল ভ্লাদিমির রোড ধরে এগোচ্ছে এবং একটা চতুর্থ বড় দল রুজা ও মোঝায়েস্ক-এর মধ্যে ঘাঁটি করেছে। নেপোলিয়ন স্বয়ং ২৫ শে তারিখ পর্যন্ত মস্কোতেই ছিলেন। এইসব সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে শত্রুপক্ষ যখন তার বড় বড় সেনাদলকে নানা দিকে ছড়িয়ে রেখেছে এবং নেপোলিয়ন ও তার রক্ষীবাহিনী মস্কোতেই রয়েছে তখনও কি আপনার

সম্মুখস্থ শত্রুপক্ষ এতদূর শক্তিশালী হতে পারে যে আপনি তাদের আক্রমণ করতে পারছেন না? বরং আপনার অধীনস্থ সৈন্যদের চাইতে দুর্বলতর সেনাদল নিয়ে সেই হয়তো আপনার পশ্চাদ্ধাবন করছে। আমার তো মনে হয় এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে একটি দুর্বলতর শত্রুকে আক্রমণ করে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া, অন্ততপক্ষে তাকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করাই আপনার পক্ষে সুবিধাজনক; তাতে যে সমস্ত অঞ্চল এখন ফরাসীদের দখলে আছে তার কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ পুনর্দখল করে তুলা এবং ভিতরকার অন্য শহরগুলিকে বিপদমুক্ত করা যাবে। এদিকে বর্তমান অবস্থায় পিতার্সবুর্গে বেশী সৈন্য রাখা সম্ভব হয় নি; ফলে যেকোন রকমের একটা সেনাদল নিয়ে এসে শত্রু যদি এ রাজধানীটিকেও বিপন্ন করে তোলে তার সব দায়-দায়িত্ব আপনাকেই বহন করতে হবে; কারণ আপনার যে বাহিনীকে রাখা হয়েছে তাতে যথেষ্ট দৃঢ়তা ও উদ্যমের সঙ্গে চললে এই নতুন বিপদকে এড়িয়ে চলা খুবই সম্ভবপর। স্মরণ রাখবেন, মস্কো ছেড়ে আসার জন্য শুধু দেশবাসীর কাছে আপনার জবাবদিহি করাটা এখনও বাকি আছে। আপনি জানেন, আপনাকে পুরস্কৃত করতে আমি সর্বদাই প্রস্তুত আছি। সে দুর্বলতা আমাকে দুর্বল করবে না, কিন্তু আপনার কাছ থেকে সেই উৎসাহ, দৃঢ়তা ও সাফল্য আশা করার অধিকার আমার এবং গোটা রাশিয়ার অবশ্যই আছে; আপনার বুদ্ধি, সামরিক প্রতিভা এবং আপনার অধীনস্থ সৈন্যদের সাহসের গুণে সে প্রত্যাশা আমরা নিশ্চয়ই করতে পারি।"

এই চিঠি যখন পাঠানো হল ততদিনে কুতুজভ আর তার সৈন্যদের ঠেকিয়ে রাখতে পারল না; একটা সংঘর্ষ এর মধ্যেই ঘটে গেছে।

২রা অক্টোবর সীমান্ত ঘাঁটির শাপোভালভ নামক একটি কসাক টহল দেবার সময় একটি খরগোসকে মেরে ফেলে এবং আর একটিকে আহত করে। আহত খরগোসটির পিছনে ধাওয়া করে জঙ্গলের একেবারে ভিতরে ঢুকে পড়ে সেখানে অবস্থিত মুরাতের সেনাবাহিনীর বাম ব্যূহের কাছে পৌঁছে যায়। সে যে ফরাসীদের হাতে প্রায় ধরা পড়ে গিয়েছিল ফিরে এসে হাসতে হাসতে সেকথা সহকর্মীদের কাছে গল্প করল। আর সে গল্প শুনে জনৈক কর্ণেল তার কম্যাণ্ডারকে খবরটা জানিয়ে দিল।

কসাকটিকে ডেকে পাঠিয়ে নানারকম প্রশ্ন করা হল। কসাক অফিসাররা এই সুযোগে কয়েকটা ঘোড়া হাতিয়ে নিতে চাইল, কিন্তু একজন ঊর্ধ্বতন অফিসার ব্যাপারটা আরও উপরে জানিয়ে দিল। উপর মহলে তখন খুবই রেশারেশি চলছে। কয়েকদিন আগেই এর্মোলভ বেনিংসেনের সঙ্গে দেখা করে তাকে বলে এসেছে, আক্রমণ শুরু করার জন্য প্রধান সেনাপতির উপর যেন চাপ সৃষ্টি করা হয়।

বেনিংসেন উত্তরে তাকে বলেছে, "আমি যদি আপনাকে না জানতাম তা

হলে ভাবতাম যে আপনি মুখে যা বলছেন আসলে তা চাইছেন না। আমি যে পরামর্শই দেই না কেন, হিজ হাইনেস অবশ্যই করবেন ঠিক তার উল্টোটি।"

কসাকটির প্রতিবেদন এবং অশ্বারোহী টহলদার পাঠানোতেই প্রমাণ পাওয়া গেল যে সন্ধিক্ষণ সমাগত। কসে পাক-দেওয়া স্প্রিংটা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, ঘড়ির কাঁটা ঘুরতে শুরু করেছে, ঘণ্টা বাজছে। নিজের সব শক্তি, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা এবং মানব-চরিত্রের জ্ঞান সত্ত্বেও কসাকটির প্রতিবেদন, বেনিংসেনের চিঠি, তার মতে সম্রাটের অভিপ্রায়, এবং সব জেনারেলের ঐক্যমতের কথা চিন্তা করে কুতুজভ আর সেনাদলের অনিবার্য অগ্রগতিকে ঠেকিয়ে রাখতে পারল না, নিষ্ফল এবং ক্ষতিকর জেনেও সেই কাজটি করার হুকুমই দিল—অর্থাৎ যা ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে তাতে নিজের সম্মতি জানাল।

অধ্যায়—৪

কসাকটি খবর দিল যে ফরাসী বাহিনীর বাঁ দিকটা অরক্ষিত; তার সঙ্গে বেনিংসেনের চিঠি এসে এটাই বুঝিয়ে দিল যে এখনই আক্রমণের নির্দেশ দেওয়া দরকার: দিন স্থির হল ৫ই অক্টোবর।

৪ঠা অক্টোবর সকালে কুতুজভ হুকুম-নামায় সই করল। তল্ সেটা এর্মোলভকে পড়ে শোনাল; তাকে বাকি ব্যবস্থার উপর নজর রাখতে বলল।

"ঠিক আছে—ঠিক আছে। এখন আমার হাতে সময় নেই," বলে এর্মোলভ কুটির থেকে বেরিয়ে গেল।

তল্ যে হুকুমনামাটা রচনা করল সেটা খুবই ভাল হয়েছে। অস্তারলিজের হুকুমনামার মতই এটাও লেখা হল—তবে এবার আর জার্মান ভাষায় নয়।

"প্রথম সেনাদল এখানে-এখানে যাবে," "দ্বিতীয় সেনাদল ওখানে-ওখানে যাবে," ইত্যাদি। কাগজে-কলমে সেনাদলগুলি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে গেল এবং শত্রু বিধ্বস্ত হল। সব হুকুমনামার বেলায়ই যা হয়ে থাকে, আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে সব কিছুই ভাবা হল, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে যেরকম ঘটে থাকে, একটি সেনাদলও যথানির্দিষ্ট সময়ে এসে পৌঁছল না।

হুকুমনামার প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি তৈরি হবার পরে একজন অফিসারকে ডেকে সেগুলো এর্মোলভের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল। অশ্বারোহী রক্ষীবাহিনীর যে তরুণ অফিসারটির উপর এই কাজের ভার দেওয়া হল সে কুতুজভের একজন আর্দালি। এত বড় কাজের ভার পেয়ে খুশি মনে সে এর্মোলভের বাসায় গেল।

"চলে গেছেন," এর্মোলভের আর্দালি জানাল।

অশ্বারোহী রক্ষীবাহিনীর অফিসারটি তখন আর এক জেনারেলের কাছে গেল; এর্মোলভকে প্রায়ই তার সঙ্গে দেখা যায়।

"না, জেনারেলও বেড়িয়ে গেছেন।"

ঘোড়ায় চেপে অফিসার অন্য একজনের কাছে গেল।

"না, তিনিও বেড়িয়ে গেছেন।"

"এই বিলম্বের জন্য তারা আবার আমাকে না দায়ী করেন। যত সব বাজে ব্যাপার!" ভাবতে ভাবতে অফিসারটি গোটা শিবিরটা চক্কর দিল। একজন বলল, অন্য কয়েকজন জেনারেলের সঙ্গে এর্‌মোলভকে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে দেখেছে; অন্যরা বলল সে নিশ্চয় বাড়ি ফিরে গেছে। অফিসারটি সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত খোঁজাখুঁজি করল; খাবার সময় পর্যন্ত পেল না। কিন্তু এর্‌মোলভকে কোথাও পাওয়া গেল না; সে যে কোথায় গেছে তা কেউ জানে না। একজন সহকর্মীর কাছ থেকে কোনরকমে কিছু খেয়ে সে আবার সামনের দিকে ছুটল মিলরাদভিচের খোঁজে। সেও বেরিয়ে গেছে; তবে সেখান থেকে বলে দেওয়া হল যে জেনারেল কিকিন-এর বলনাচের আসরে তাকে পাওয়া যেতে পারে।

"কিন্তু সেটা কোথায়?"

অনেক দূরে একটা বাড়ি দেখিয়ে কসাক অফিসারটি বলল, "কেন, ঐ তো, ঐ এচ্‌কিনোতে।"

"সে কি? আমাদের সীমানার বাইরে?"

"দুটো রেজিমেণ্টকে ঘাঁটিতে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর তারা ওখানে মজা করছে। জঘন্য! দুটো ব্যাণ্ড আর তিন দল গায়িকা!"

অফিসারটি আমাদের সীমানার ওপারে এচ্‌কিনোর দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। অনেকদূর থেকেই বাড়ির ভিতর থেকে ভেসে আসা নৃত্য-সঙ্গীতের সুর তার কানে এল।

অবিরাম শিস ও তর্‌বানের (একরকম তারের যন্ত্র) বাজনার সঙ্গে শুনতে পেল গান "ঐ প্রান্তরে....ঐ প্রান্তরে!" মাঝে মাঝেই উল্লাস-ধ্বনিতে তাও চাপা পড়ে যাচ্ছে। আটটা বেজে গেছে। ঘোড়া থেকে নেমে একটা বড় বাড়ির বারান্দায় গিয়ে সে দাঁড়াল। একদিকে রুশ সৈন্য আর অন্যদিকে ফরাসী সৈন্য থাকা সত্ত্বেও বাড়িটা অক্ষতই আছে। ভিতরে ঢুকে দেখল, সব প্রধান জেনারেলরাই সেখানে হাজির; এর্‌মোলভের দশাসই মূর্তিটাও আছে। সকলেরই কোটের বোতাম খোলা; লাল মুখে অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে তারা হো-হো করে হাসছে। ঘরের মাঝখানে একটি সুদর্শন বেঁটে জেনারেল মহা উৎসাহে ত্রেপাক নাচছে।

"হা, হা, হা! সাবাস নিকলাস আইভানিচ! হা, হা, হা!"

অফিসারটির মনে হল একটা গুরুতর নির্দেশসহ এরকম সময়ে এখানে আসায় তার দ্বিগুণ অপরাধ হয়েছে; তার অপেক্ষা করাই উচিত ছিল; কিন্তু একজন জেনারেল তাকে দেখে ও তার মুখে সব শুনে এর্‌মোলভকে খবর দিল।

ভ্রূকুটিত মুখে এগিয়ে এসে এর্‌মোলভ অফিসারটির বক্তব্য শুনল; কোন

কথা না বলে কাগজগুলি তার হাত থেকে নিয়ে নিল।

কর্তব্যরত একজন সহকর্মী এর্মোলভ প্রসঙ্গে অশ্বারোহী রক্ষীবাহিনীর অফিসারটিকে বলল, "তুমি কি মনে কর তিনি হঠাৎই বেরিয়ে গিয়েছিলেন? এটা একটা চাল। কনভ্নিৎসিনকে বিপদে ফেলবার জন্য ইচ্ছা করেই এটা করা হয়েছে। দেখো, কাল কী কেচ্ছাটাই না হবে!"

অধ্যায়—৫

কুতুজভ বলেই রেখেছিল পরদিন তাকে যেন বেশ সকালেই ঘুম থেকে ডেকে দেওয়া হয়। শীর্ণদেহ বৃদ্ধ মানুষটি তাড়াতাড়ি প্রার্থনা করল, পোশাক পরল, এবং যে যুদ্ধে তার সম্মতি নেই তাতেই সৈন্য পরিচালনা করতে হবে মনের মধ্যে এই খুঁতখুঁতি নিয়েই কালিচে গাড়িতে চেপে লেতাশোভ্কা (তারুতিনো থেকে সাড়ে তিন মাইল দূরের একটা গ্রাম) থেকে নির্দিষ্ট জায়গার দিকে গাড়ি চালিয়ে দিল। কালিচেতে বসে সে একবার ঝিমুচ্ছে, আবার জেগে উঠছে, আর তখনই কান পেতে শুনতে চেষ্টা করছে যুদ্ধ শুরু হবার ইঙ্গিত স্বরূপ কোন কামানের শব্দ ডান দিক থেকে আসছে কি না। স্যাঁতসেতে, একঘেয়ে হেমন্তের সকাল সবে ভোর হচ্ছে। তারুতিনোর কাছাকাছি পৌঁছে কুতুজভ দেখতে পেল, অশ্বারোহী সৈন্যরা তার যাবার পথটা পেরিয়েই ঘোড়াগুলোকে জল খাওয়াতে নিয়ে চলেছে। কুতুজভ তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকাল, গাড়িটা থামাল, জিজ্ঞাসা করল তারা কোন্ রেজিমেণ্টের লোক। যে সেনাদলের নাম তারা বলল তাদের তো এখন অনেক দূর এগিয়ে এক জায়গায় ওঁৎ পেতে থাকার কথা। "হয় তো একটা ভুল হয়ে গেছে," বৃদ্ধ সেনাপতি ভাবল। কিন্তু আরও কিছুটা এগিয়ে দেখল, পদাতিক রেজিমেণ্টের সৈন্যরা অস্ত্রশস্ত্র একজায়গায় জড় করে রেখে আধা পোশাক পরে যই—পরিজ খাচ্ছে আর জ্বালানি বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সে একজন অফিসারকে ডেকে পাঠাল। অফিসার এসে জানাল, যুদ্ধযাত্রার কোন হুকুম তারা পায় নি।

"সে কি! পাওয়া যায় নি...." বলতে গিয়েও কুতুজভ সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সংযত করল; একজন উর্ধ্বতন অফিসারকে ডেকে পাঠাল। কালিচে থেকে নেমে মাথাটা নীচু করে নিঃশব্দে পায়চারি করতে লাগল; নিঃশ্বাস খুব দ্রুত পড়ছে। যাকে ডাকা হয়েছিল সেই অফিসার এইখানে আসতেই কুতুজভের মুখটা রাঙা হয়ে উঠল; এই ভুলের জন্য অফিসারটিই দায়ী বলে নয়, সে রাগ দেখাবার মত যথেষ্ট উপযুক্ত একজন লোক বলে। কাঁপতে কাঁপতে, হাঁপাতে হাঁপাতে বুড়ো মানুষটি একেবারে ক্ষেপে গেল, এইখানে তার উপর ঝাঁপিয়ে

পড়ে হাত তুলে তাকে শাসাল, চীৎকার করল, গালাগালি দিয়ে ভূত ভাগিয়ে দিল। ক্যাপ্টেন ব্রোজিন নামক আর একটি লোক ঘটনাক্রমে সেখানে এসে হাজির হয়েছিল; কোন দোষে সে দোষী নয়; তবু তার কপালেও সেই একই লাঞ্ছনা জুটল।

"কী রকম বদমাস লোক হে তোমরা? সব্বাইকে গুলি করব। পাজির দল!" হাত ঘোরাতে ঘোরাতে নিজেও কাঁপতে কাঁপতে কুতুজভ কর্কশ গলায় চীৎকার করে বলল।

তার দৈহিক যন্ত্রণা দেখা দিল। সে একজন প্রধান সেনাপতি, প্রশান্ত মহামহিম, সকলেই বলে তার মত শক্তিধর মানুষ রাশিয়াতে দ্বিতীয়টি নেই: অথচ এই অবস্থায় সে যেন গোটা সেনাবাহিনীর কাছে হাসির খোরাক হয়ে উঠেছে। সে তখন নিজের মনেই ভাবছে: "আজ তো এত তাড়াহুড়া করে প্রার্থনা করার কোন দরকার আমার ছিল না, বা সারা রাত জেগে চিন্তা করারও দরকার ছিল না। আমি যদি জোচ্চোর অফিসার হতাম তাহলে তো কেউ আমাকে এভাবে ঠাট্টা করতে সাহস পেত না...আর এখন!" তাকে যেন দৈহিক শাস্তি দেওয়া হয়েছে সেইরকম যন্ত্রণাই সে ভোগ করছে; তাই তো রাগে, দুঃখে সে চীৎকার করছে। কিন্তু বেশীক্ষণ তার শক্তিতে কুলোল না; চারদিকে তাকিয়ে যখন বুঝতে পারল যে সে অনেক আজেবাজে বকেছে, তখনই আবার গাড়িতে চেপে নিঃশব্দে গাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে গেল।

তার রাগ একবার ফুরিয়ে গেলে আর ফিরে আসে না। চোখ মিটমিট করে সকলের কৈফিয়ৎ ও যুক্তির ফিরিস্তি শুনল (এর্মোলভ অবশ্য পরদিনের আগে তার সঙ্গে দেখা করতেই এল না); আর যে সেনাসমাবেশ ও যুদ্ধযাত্রা আজ করা গেল না সেটা পরদিন করা হোক এই মর্মে বেনিংসেন, কনভ্-নিৎসিন ও তোল্-এর পীড়াপীড়িতে কুতুজভকে আর একবার সে প্রস্তাবে সম্মতি দিতেই হল।

অধ্যায়—৬

পরদিন সন্ধ্যায় সৈন্যরা নির্দিষ্ট জায়গায় সমবেত হল এবং রাতেই যাত্রা শুরু করল। হেমন্তের রাতের আকাশে গাঢ় লাল মেঘ জমেছে, কিন্তু বৃষ্টি নেই। মাটি ভিজে, কিন্তু কর্দমাক্ত নয়; সৈন্যরা নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে, শুধু মাঝে মাঝে গোলন্দাজ বাহিনীর ঝন্ ঝন্ শব্দ ঈষৎ কানে আসছে। সৈন্যদের জোরে কথা বলতে, পাইপ টানতে, বা আগুন জ্বালাতে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে; তারাও ঘোড়ার ডাক বন্ধ করার চেষ্টা করছে। অভিযানের এই গোপনীয়তা তাদের বেশী করে মুগ্ধ করেছে; মনের সুখে তারা এগিয়ে চলেছে। লক্ষ্য-স্থলে পৌঁছে গেছে মনে করে কিছু দল থেমে গিয়ে অস্ত্রশস্ত্র স্তূপ করে রেখে ঠাণ্ডা মাটিতেই বসে পড়ল; কিন্তু বেশীর ভাগ সৈন্যই সারারাত ধরে এগিয়ে

চলল এবং এমন সব জায়গায় গিয়ে পৌঁছল যেখানে যাওয়া তাদের উচিত ছিল না।

একমাত্র কাউণ্ট অর্লভ-দেনিসভ তার কসাকদের নিয়ে যথাসময়ে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে গেল। স্ত্রমিলভা গ্রাম থেকে দিমিত্রভ্স্ক্ যাবার পথের ধারে একটা বনের প্রান্তে পৌঁছে এই সেনাদলটি থামল।

ভোরের দিকে কাউণ্ট অর্লভ-দেনিসভ ঝিমুচ্ছিল, এমন সময় ফরাসী বাহিনী ছেড়ে আসা একটি সৈনিককে এনে হাজির করায় তার ঘুম ভেঙে গেল। লোকটি পনিয়াতোস্কি সেনাদলের একজন পোলিশ সার্জেণ্ট; পোলিশ ভাষাতেই সে বলল যে, তাকে অনেক আগেই অফিসার করা উচিত ছিল, তাদের যেকোন লোকের চাইতে সে বেশী সাহসী, অথচ তাকে খুবই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হয় বলেই সে তাদের ছেড়ে এসেছে, আর তাদের ভালভাবে শিক্ষা দিতে চায়। আরও বলল, সেখান থেকে মাত্র এক ভার্স্ট দূরে মুরাত রাতটা কাটাচ্ছে, আর মাত্র একশ সৈন্তের একটা দল যদি তার সঙ্গে দেওয়া হয় তাহলে সে তাকে জীবিত গ্রেপ্তার করতে পারবে। কাউণ্ট অর্লভ-দেনিসভ সহ-অফিসারদের সঙ্গে পরামর্শ করল। প্রস্তাবটা এতই লোভনীয় যে প্রত্যাখ্যান করা যায় না। সকলেই স্বেচ্ছায় যেতে রাজী হল এবং একবার চেষ্টা করে দেখার পরামর্শ দিল। অনেক যুক্তি-তর্ক ও বাদানুবাদের পরে স্থির হল, মেজর-জেনারেল গ্রেকভ দুটি কসাক রেজিমেণ্ট নিয়ে পোলিশ সার্জেণ্টের সঙ্গে যাবে।

যাত্রার আগে কাউণ্ট অর্লভ-দেনিসভ সার্জেণ্টকে বলল, "মনে রেখো, যদি মিথ্যা বলে থাক তো তোমাকে কুকুরের মত ফাঁসিতে ঝোলানো হবে; কিন্তু যদি সত্য হয় তাহলে পাবে এক শ' স্বর্ণমুদ্রা!"

কোন জবাব না দিয়ে সার্জেণ্ট গম্ভীরভাবে ঘোড়ায় চেপে গ্রেকভের সঙ্গে চলে গেল। তারা জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলে কাউণ্ট অর্লভ-দেনিসভ প্রথম ভোরের বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে ফিরে এল। নিজের দায়িত্বে যে কাজ সে করেছে সেজন্য বেশ উত্তেজনাও বোধ করছে। ভোরের অস্পষ্ট আলোয় ও নিভে-আসা শিবির-আগুনের আলোয় সে শত্রু-শিবিরের দিকে তাকাল। ডানদিকে খোলা জায়গায় এখন আমাদের সেনাদলকে দেখতে পাবার কথা। সেইদিকে ভাল করে তাকিয়েও তাদের দেখতে পেল না। কাউণ্টের মনে হল, ফরাসী শিবির কর্মচঞ্চল হয়ে উঠেছে; তার ক্ষীণদৃষ্টি অ্যাডজুটাণ্টটিও সেকথা সমর্থন করল।

শিবিরের দিকে তাকিয়ে কাউণ্ট অর্লভ বলল, "আঃ, সত্যি খুব দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

হঠাৎ তার মনে হল যে এই সার্জেণ্ট একটি প্রতারক, সে মিথ্যা কথা বলেছে; এই দুটি রেজিমেণ্টের অনুপস্থিতির জন্ম রুশ আক্রমণটাই ব্যর্থ হয়ে

যাবে, তাদের সে যে কোথায় নিয়ে যাবে তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। এত সৈন্যের মধ্যে থেকে একজন প্রধান সেনাপতিকে কেমন করে গ্রেপ্তার করা যাবে!

কাউণ্ট বলল, "আমি নিশ্চিত বলছি ওই রাস্কেলটা মিথ্যা বলেছে।"

একজন বলল, "তাদের তো এখনও ফিরিয়ে আনা যায়।"

"অ্যা? সত্যি....তুমি কি মনে কর? তাদের এগিয়ে যেতে দেব, না দেব না?"

"আপনি কি তাদের ফিরিয়ে আনতে চান?"

"ফিরিয়ে আন, ওদের ফিরিয়ে আন!" হঠাৎ দৃঢ়সংকল্পে অর্লভ বলে উঠল। "নইলে বড় বেশী দেরী হয়ে যাবে। এখনই আলো ফুটেছে।'

অ্যাডজুটাণ্ট জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

গ্রেকভ ফিরে এলে কাউণ্ট অর্লভ-দেনিসভ উত্তেজনাবশে আক্রমণ করাই স্থির করল। সঙ্গের লোকজনদের মনেও সেই একই উত্তেজনা।

"ঘোড়ায় চাপো!" সে চাপা গলায় হুকুম দিল। সৈন্যরা জায়গামত দাঁড়িয়ে ক্রুশ চিহ্ন আঁকল।...."আগে বাড়, ঈশ্বর তোমাদের সহায় হোন!"

"হুর্‌রা—আ—আ!" সারা বন প্রতিধ্বনিত হল। কসাক দলটি বর্শা বাগিয়ে নালাটা পেরিয়ে শিবিরের দিকে ছুটে চলল।

প্রথম যে ফরাসী সৈনিকটি কসাকদের দেখতে পেল সে সভয়ে চীৎকার করে উঠল—আর শিবিরে যে যেখানে ছিল—কেউ পোশাক পরে নি, সবে ঘুম থেকে উঠেছে—সকলেই যে যেদিকে পারল ছুট দিল; রইল কামান, বন্দুক, আর ঘোড়া।

পিছনে ও চারদিকে নজর না দিয়ে কসাকরা যদি ফরাসীদের পিছু নিত তাহলে তারা সেখানকার সব কিছু সহ স্বয়ং মুরাতকেও গ্রেপ্তার করতে পারত। অফিসাররাও তাই চেয়েছিল। কিন্তু লুটের মাল ও বন্দীদের হাতের মুঠোয় পাওয়ায় কসাকদের এক পাও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া তখন অসম্ভব। কেউ কোন হুকুমের পরোয়াই করল না। এক জায়গাতেই পনেরোশ' কয়েদি ও আটত্রিশটি বন্দুক পাওয়া গেল; তাছাড়া পতাকা, ঘোড়া, গদী, ঘোড়ার সাজ ও অন্য টুকিটাকি জিনিস তো আছেই। সব কিছুর বন্দোবস্ত করতে হবে, বন্দী ও বন্দুকগুলোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে, লুটের মাল ভাগ করতে হবে—তারজন্য চীৎকার-চেঁচামেচি ও নিজেদের মধ্যে ছোটখাট লড়াইও হল—এইসব নিয়েই কসাকরা ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

পিছন থেকে তাড়া না খাওয়ায় ফরাসীরা ক্রমে ধাতস্থ হল: নানা দলে ভাগ হয়ে গুলি চালাতে শুরু করল। অর্লভ-দেনিসভ অন্য সেনাদলের আসার প্রতীক্ষায় থেকে আর অগ্রসর হল না।

এদিকে বেনিংসেন ও তোল্-এর নেতৃত্বাধীন পদাতিক সেনাদলগুলি

হুকুমনামা অনুসারেই যথারীতি যাত্রা করলেও নির্দিষ্ট স্থানে না পৌঁছে পৌঁছে গেল অন্য কোন স্থানে। অবশ্য কিছু সেনাদল শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট স্থানেই গিয়ে হাজির হল; কিন্তু তখন এত দেরি হয়ে গেছে যে তারা কোন কাজে লাগার পরিবর্তে শত্রুপক্ষের গোলাগুলির শিকারে পরিণত হল। তোল্ ঘোড়া ছুটিয়ে মহাউৎসাহে সর্বত্র ছুটে বেড়াল; কিন্তু দেখল সর্বত্র সব কিছুই বিপর্যস্ত, এলোমেলো। যখন একটা জঙ্গলের মধ্যে বাগভুত-এর সেনাদলের সঙ্গে হঠাৎই দেখা হয়ে গেল তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে; অনেক আগেই তাদের অর্লভ-দেনিসভের সঙ্গে যোগ দেবার কথা। উত্তেজিত ও বিরক্ত হয়ে একজন কাউকে এজন্য দায়ী করতে গিয়ে তোল্ সেই সেনাদলের কম্যাণ্ডারের কাছে হাজির হয়ে তাকে যাচ্ছেতাই ভাষায় গালাগালি করে শেষ পর্যন্ত বলল যে তাকে গুলি করা উচিত। জেনারেল বগভুত একজন শান্ত প্রকৃতির বৃদ্ধ যোদ্ধা; এইভাবে দেরি হওয়াতে এবং সর্বত্র গোলমাল ও ভুল-বোঝাবুঝির ফলে বিচলিত হওয়ায় সেও হঠাৎ ভীষণ রেগে গেল; সকলকে অবাক করে দিয়ে নিজের স্বভাববিরুদ্ধভাবে তোল্-এর প্রতি অনেক অশোভন উক্তি করে বসল।

"অন্যের কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়াটা আমি পছন্দ করি না, কিন্তু অন্য যে-কোন লোকের মতই আমার লোকজনদের নিয়ে মরতে পারি," এই কথা বলে একটিমাত্র সেনাদল নিয়ে সে এগিয়ে গেল।

শত্রুপক্ষের গুলিবর্ষণের মুখে একটা মাঠে নেমে এই সাহসী জেনারেলটি সৈন্যদের নিয়ে সোজা এগিয়ে গেল; গভীর উত্তেজনায় একবার ভেবেও দেখল না এই অবস্থায় একটিমাত্র সেনাদল নিয়ে যুদ্ধের মধ্যে এগিয়ে যাওয়ায় কোন ফল হবে কি না। রাগে সে তখন দিশেহারা; বিপদ, কামানের গোলা, বুলেট—যা হোক একটা কিছু তার চাই। প্রথম আসা একটি বুলেটেই তার মৃত্যু হল, অন্য বুলেটে মরল তার অনেক সৈন্য। নেহাৎ অকারণেই তার সেনাদল আরও কিছুক্ষণ সেই গুলিবর্ষণের মুখে টিকে রইল।

অধ্যায়—৭

এদিকে আর একটা সেনাদল সম্মুখ থেকে ফরাসীদের আক্রমণ করবে এ-রকম কথা ছিল, কিন্তু সে দলের সঙ্গে ছিল কুতুজভ। সে ভাল করেই জানত যে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরিচালিত এই যুদ্ধের ফলে গোলমাল সৃষ্টি ছাড়া আর কোন লাভই হবে না, তাই সৈন্যদের টেনে রাখতে সে সাধ্যমত চেষ্টা করে চলল। মোটেই এগিয়ে গেল না।

ছোট ধূসর ঘোড়াটায় চেপে সে নীরবে পথ চলতে লাগল, আর কেউ যুদ্ধের কথা বললে ধীরে সুস্থে তার কথার জবাব দিতে লাগল।

মিলরাদভিচ অগ্রসর হবার অনুমতি চাইলে তাকে বলল, "'আক্রমণ' কথাটা তো তোমাদের সকলের জিভেই লেগে আছে, কিন্তু কোন রকম জটিল

সেনাসমাবেশ করতে যে আমরা অক্ষম সেকথাটা তোমরা কেউ বুঝতে পারছ না।"

অন্য একজনকে বলল, "আজ সকালে আমরা মুরাতকে বন্দী করতে পারি নি, ঠিক সময়ে সেখানে পৌঁছতেও পারি নি; এখন আর কিছু করার নেই!"

কুতুজভকে খবর দেওয়া হল, ফরাসীদের পিছন দিকে যেখানে আগে কোন সৈন্য ছিল না এখন সেখানে দুই ব্যাটেলিয়ন পোলিশ সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে। একথা শুনে পশ্চাদ্বর্তী এর্মোলভের দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে সে বলল, "দেখলে তো! এরা আক্রমণ করতে বলছে, সব রকম ফন্দি-ফিকির করতে বলছে, কিন্তু কাজের বেলায় কেউ কিছু করছে না, আর ওদিকে শত্রুপক্ষ আগে থেকে খবর পেয়ে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা করে ফেলছে।"

একথা শুনে এর্মোলভ চোখ কুঁচকে একটু হাসল। বুঝতে পারল, তার উপরকার ঝড়টা উড়ে গেছে; এটুকু খোঁচা দিয়েই কুতুজভ এখন খুশি থাকবে।

পার্শ্ববর্তী রায়েভ্‌স্কিকে কনুইয়ের খোঁচা দিয়ে বলল, "আমাকে নিয়ে বেশ একটু মস্করা করে নিলেন।"

একটু পরেই এর্মোলভ কুতুজভের কাছে গিয়ে সশ্রদ্ধভাবে নিবেদন করল:

"ইয়োর হাইনেস, আক্রমণের হুকুম যদি দিতে চান তো এখনও সময় আছে—শত্রুরা এখনও সরে পড়ে নি। আর তা যদি না করেন তো রক্ষী-বাহিনী এক ফোঁটা ধোঁয়াও দেখতে পাবে না।"

কুতুজভ জবাব দিল না, কিন্তু তাকে যখন জানানো হল যে মুরাতের সৈন্যরা পিছু হটছে তখন সে সৈন্যদের অগ্রসর হবার হুকুম দিল; যদিও প্রতি একশ' পা অন্তর সে একবার করে পৌনে এক ঘণ্টার মত থামতে লাগল।

যুদ্ধ যা করার তা অর্লভ-দেনিসভের কসাকরাই করল; বাকি সৈন্যদের মধ্যে শত শত লোক অকারণেই প্রাণ হারাল।

এই যুদ্ধের ফলস্বরূপ কুতুজভ পেল হীরক-পদক, বেনিংসেন পেল হীরক ও লাখ রুবল, অন্যরাও পদমর্যাদা অনুসারে মনোমত পুরস্কার পেয়ে খুশি হল, আর কর্মচারিদের মধ্যে নতুন করে রদ-বদল করা হল।

তারুতিনো যুদ্ধের পরে রুশ অফিসার ও জেনারেলরা বলল, "আমাদের নিয়ে এইরকমই করা হয়, মাথা-মুণ্ডু কিছুই ঠিক থাকে না!" তারা বলতে চাইল, কতকগুলো বোকা মিলে সব তালগোল পাকিয়ে দিয়েছে, আমরা হলে এরকম করতাম না। একথা সব সময়ই বলা হয়। কিন্তু একথা যারা বলে তারা হয় কি বলছে তাই জানে না, আর না হয় তো ইচ্ছা করেই নিজেদের ঠকায়। তারুতিনো, বরদিনো, বা অস্তারলিজ—কোন যুদ্ধই

পরিকল্পনামাফিক হয় না। এটা একেবারে মূল সত্য।

সংখ্যা স্বাধীন শক্তি একটা যুদ্ধের গতিকে প্রভাবিত করে, সে গতি-পথ আগে থেকে জানা যায় না, এবং কোন একটি শক্তির দ্বারা নির্দেশিত পথের সঙ্গে মেলেও না।

যদি ইতিহাসকারদের, বিশেষ করে ফরাসী ইতিহাসকারদের বিবরণে দেখা যায় যে তাদের যুদ্ধ-বিগ্রহগুলি পূর্বরচিত পরিকল্পনা অনুসারেই পরিচালিত হয়েছে তাহলে একমাত্র এই সিদ্ধান্তই করা যায় যে সেসব বিবরণই মিথ্যা।

স্পষ্টতই তারুতিনোর যুদ্ধ তোল্-এর লক্ষ্যে পৌছে নি; কাউণ্ট অর্লভ-দেনিসভ যুদ্ধে গিয়েছিল মুরাতকে বন্দী করতে, সে উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয় নি; গোটা সেনাদলকে সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস করবার যে উদ্দেশ্য বেনিংসেন ও অন্য অনেকের ছিল তাও পূর্ণ হয় নি; নিজেকে খ্যাতিমান করার উদ্দেশ্য নিয়ে যে অফিসার যুদ্ধে গিয়েছিল তার মনস্কামনা পূর্ণ হয় নি; বা যে কসাকরা আরও বেশী লুটের মালের আশায় ছিল তাও তারা পায় নি; ইত্যাদি। কিন্তু যুদ্ধের সত্যিকারের ফল যা হল, সেদিন গোটা রাশিয়া যে ফলকে কামনা করেছিল— ফরাসীদের রাশিয়া থেকে তাড়িয়ে দিয়ে তাদের সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করা— সেটাই যদি এ যুদ্ধের লক্ষ্য হয়ে থাকে তাহলে তো ঐ পরিস্থিতিতে যা ঘটা উচিত ছিল তারুতিনোর যুদ্ধে ঠিক তাই ঘটেছে। সে যুদ্ধের যা সত্যিকারের ফলাফল তার চাইতে সুবিধাজনক আর কোন ফলের কথা তো কল্পনাও করা যায় না। ন্যূনতম প্রচেষ্টা ও তুচ্ছ ক্ষয়-ক্ষতির ভিতর দিয়ে প্রচণ্ড গোলযোগ সত্ত্বেও সারা অভিযানের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ফলটিই অর্জিত হল: পশ্চাদপসরণের স্থলে অগ্রগমন, ফরাসীদের দুর্বলতাকে উদ্ঘাটন, আর যুদ্ধ-ক্ষেত্র থেকে পলায়নের জন্য নেপোলিয়নের বাহিনী যে আঘাতের জন্য অপেক্ষা করেছিল তারই ব্যবস্থা গ্রহণ।

অধ্যায়—৮

"মস্কোয়া"র গৌরবময় জয়লাভের পরে নেপোলিয়ন মস্কোতে প্রবেশ করল। জয়লাভ সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না কারণ যুদ্ধক্ষেত্রটি তখন ফরাসীদের দখলে। প্রাচীন রাজধানীকে পিছনে ফেলে রুশরা পশ্চাদপসরণ করে চলেছে। খাদ্য, অস্ত্র, বারুদ ও অপরিমেয় সম্পদে ভরা মস্কো এসেছে নেপোলিয়নের হাতে। ফরাসীদের তুলনায় অর্ধেক সৈন্য-শক্তি নিয়ে রুশ বাহিনী একটা মাসের মধ্যে একবারও আক্রমণের চেষ্টা পর্যন্ত করল না। নেপোলিয়নের অবস্থা তখন খুবই সুবিধাজনক। দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে সে তখন রুশ বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ধ্বংস করতে পারে; সুবিধাজনক শর্তে সন্ধির আলোচনা করতে পারে, অথবা তাতে ব্যর্থকাম হলে পিতার্সবুর্গকে ধ্বংস করতে অগ্রসর হতে পারে; এমন কি বেগতিক বুঝলে স্মোলেনস্ক্ বা

ভিল্‌নাতে ফিরে যেতে পারে, অথবা মস্কোতেই থেকে যেতে পারে ঃ সংক্ষেপে, ফরাসীরা যে সুবিধাজনক অবস্থায় আছে সেটাকে বজায় রাখতে কোন বিশেষ প্রতিভারই দরকার হয় না। সেজন্য দরকার শুধু কতকগুলি অত্যন্ত সরল ও সহজ পদক্ষেপ: সৈন্যদের লুঠতরাজ করতে না দেওয়া; শীতের পোশাকের ব্যবস্থা করা—একটা গোটা বাহিনীর পক্ষে যথেষ্ট শীতবস্ত্র তখন মস্কোতে ছিল; এবং সুশৃংখল পদ্ধতিতে রসদ সংগ্রহ করা—ফরাসী ইতিহাসকারদের মত অনুসারেই গোটা বাহিনীর ছ' মাসের মত রসদ তখন মস্কোতে ছিল। তথাপি সব প্রতিভার সেরা প্রতিভা যে নেপোলিয়ন, ইতিহাসকারদের মতে সৈন্যদের উপর যার নিয়ন্ত্রণ অক্ষুণ্ণ ছিল, সে এর কোন পন্থাই অবলম্বন করল না।

সেরকম কিছু তো করলই না, উপরন্তু যতগুলি পথ তার সামনে খোলা ছিল তার মধ্যে সবচাইতে বুদ্ধিহীন ও ক্ষতিকর পথটাই সে বেছে নিল। নেপোলিয়ন তো কত কিছুই করতে পারত: শীতকালটা মস্কোতে থাকতে পারত, পিতার্সবুর্গের পথে অথবা নিঝ্‌নি-নভ্‌গরদের পথ ধরে অগ্রসর হতে পারত, অথবা আরও উত্তরের অথবা আরও দক্ষিণের কোন পথে (যেমন পরবর্তীকালে কুতুজভ যে পথ ধরেছিল) ফিরে যেতে পারত; অথবা সে বাস্তব ক্ষেত্রে যা করল তার চাইতে বোকামি বা বিপজ্জনক আর কিছু কল্পনাও করা যায় না। অক্টোবর পর্যন্ত সে মস্কোতেই কাটাল, সৈন্যদের যথেচ্ছ লুটতরাজের সুযোগ দিল, তারপর একটা সেনাদলকে রেখে যাবে কি না সেবিষয়ে ইতস্তত করে মস্কো পরিত্যাগ করল, যুদ্ধে যোগদান না করে কুতুজভের সঙ্গে যোগাযোগ করল, ডাইনে মোড় নিয়ে মালো-ইয়ারোস্লাভেৎস্‌-এ পৌঁছল; আবারও সোজাসুজি এগিয়ে কুতুজভের পথটা না ধরে তার পরিবর্তে বিধ্বস্ত স্মোলেন্‌স্ক্‌ রোড ধরে মোঝায়েস্ক্‌-এ ফিরে গেল। পরবর্তী ঘটনাতেই প্রমাণ হয়েছে যে এর চাইতে নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক এবং সেনাবাহিনীর পক্ষে অধিকতর ক্ষতিকর আর কিছুই ভাবা যেত না। নিজের বাহিনীকে ধ্বংস করাই যদি নেপোলিয়নের লক্ষ্য ছিল তাহলেও তো রুশবাহিনী যা করুক বা না করুক, অত্যন্ত নিপুণ কোন রণ-কুশলীও তো সে উদ্দেশ্যকে পুরোপুরি কার্যে পরিণত করার জন্য এর চাইতে সফল কোন কর্মপন্থা উদ্ভাবন করতে পারত না।

প্রতিভাধর বীর নেপোলিয়ন কিন্তু এই কাজটিই করল। কিন্তু নেপোলিয়ন ইচ্ছা করেই তার বাহিনীকে ধ্বংস করেছে, অথবা অত্যন্ত বোকার মতই সে এ কাজ করেছে, এ কথা বলা নিশ্চয়ই ঠিক হবে না; যেমন ঠিক হবে না যদি বলা হয় যে সে খুব কুশলী ও প্রতিভাধর বলেই নিজের ইচ্ছা অনুসারেই তার বাহিনীকে মস্কোতে নিয়ে গিয়েছিল।

উভয় ক্ষেত্রেই যে সব নিয়ম যুদ্ধের গতিকে পরিচালিত করেছে তার

সঙ্গে নেপোলিয়নের ব্যক্তিগত ক্রিয়া-কলাপ আকস্মিকভাবেই মিলে গিয়েছে মাত্র; নইলে যেকোন সৈনিকের ব্যক্তিগত কার্যকলাপের চাইতে তার নিজের কার্যকলাপের কোন বিশেষ গুরুত্ব নেই।

ইতিহাসকাররা ভুল করেই বলে থাকে যে মস্কোতে এসে নেপোলিয়নের বিদ্যাবুদ্ধি দুর্বলতর হয়ে গিয়েছিল; আর তারা একথা বলে কারণ ফলাফল-গুলি তার কার্যাবলীকে সমর্থন করে নি। আগেও যেমন করেছে, এবং ১৮১৩ সালের পরেও যেমন করেছে, তেমনই নিজের সব ক্ষমতা ও শক্তিকে নিয়োগ করেই সে নিজের ও সেনাবাহিনীর ভাল করতেই চেয়েছে। এক্ষেত্রেও তার কার্যাবলী মিশরে, ইতালিতে, অস্ট্রিয়ায় এবং প্রাশিয়াতে তার কার্যাবলীর তুলনায় কিছু কম বিস্ময়কর ছিল না। মিশরে তার প্রতিভা কতখানি খাঁটি ছিল সেকথা আমরা নিশ্চিতভাবে জানি না, কারণ তার বড় বড় জয়ের বর্ণনা আমরা শুনেছি ফরাসীদেরই মুখে। অস্ট্রিয়া বা প্রাশিয়াতে তার প্রতিভার সঠিক মূল্যায়ণ আমরা করতে পারি না, কারণ সেখানেও আমাদের সব তথ্যের উৎস হয় ফরাসী, না হয় জার্মান। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, নিজেদের লজ্জাকে ঢাকবার জন্য তার প্রতিভাকে স্বীকার করার কোন প্রয়োজন আমাদের নেই। সমস্ত ব্যাপারটাকে সহজ, সরল চোখে দেখবার অধিকার অর্জন করতে অনেক মূল্য আমরা দিয়েছি, আর তাই সে অধিকার আমরা ছাড়ব না।

অন্য সব জায়গার মতই মস্কোতেও তার ক্রিয়াকলাপ সমান বিস্ময়কর ও প্রতিভার পরিচায়ক। মস্কোতে ঢোকার মুহূর্ত থেকে তাকে ছেড়ে যাবার ক্ষণটি পর্যন্ত সে হুকুমের পর হুকুম জারি করেছে, পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা রচনা করেছে। কোন নাগরিক নেই, প্রতিনিধি-দল নেই, মস্কো পুড়ছে, কিন্তু তাতে সে বিচলিত হয় নি। নিজের সৈন্যদের কল্যাণ, শত্রুর কার্য-কলাপ, রাশিয়ার সাধারণ মানুষের কল্যাণ, প্যারিসের ঘটনাবলীর গতিবিধি, অথবা প্রত্যাশিত সন্ধির শর্তাবলী নিয়ে কূটনৈতিক আলোচনা—কোন কিছুই তার দৃষ্টি এড়ায় নি।

অধ্যায়—৯

সামরিক ব্যাপারের দিক থেকে মস্কোতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই নেপোলিয়ন জেনারেল সাবাস্তিয়ানিকে কড়া হুকুম দিল রুশ বাহিনীর গতিবিধির উপর নজর রাখতে, বিভিন্ন পথে সেনাদল পাঠাবার ব্যবস্থা করল, আর কুতুজভকে খুঁজে বের করার ভার দিল মুরাতের উপর। তারপর ক্রেমলিনকে সুরক্ষিত করার ব্যাপারে নানারকম নির্দেশ দিল, আর রাশিয়ার গোটা মানচিত্রের বুকে ভবিষ্যতে অভিযান চালাবার একটা চমৎকার পরিকল্পনাও তৈরি করে ফেলল।

কূটনৈতিক প্রশ্নের প্রসঙ্গে নেপোলিয়ন ক্যাপ্টেন ইয়াকভ্লেভকে ডেকে পাঠাল। তার সর্বস্ব লুঠ করে এমনভাবে ছেঁড়া পোশাক পরিয়ে ছেড়েছে যে সে বেচারি মস্কো ছেড়ে যাবার পথ পায় নি। তাকে ডেকে এনে নেপোলিয়ন নিজের নীতি ও উদারতার কথা পুংখানুপুংখভাবে বুঝিয়ে বলল এবং সম্রাট আলেক্সান্দারের বরাবরে একটা চিঠি লিখে তাকে পিতার্সবুর্গে পাঠিয়ে দিল। চিঠিতে লিখল, তার বন্ধু এবং ভাইকে একথা জানানো সে কর্তব্য বলে মনে করে যে মস্কোতে রস্তপচিনের কার্যকলাপ খুবই শোচনীয়।

সেই একইভাবে নিজের মতামত ও উদারতার কথা তুতোলমিনকে বুঝিয়ে বলে সেই বুড়ো মানুষটিকেও পিতার্সবুর্গে পাঠাল আলোচনা চালাতে।

আইনঘটিত ব্যাপারে অগ্নিকাণ্ডের ঠিক পরেই সে হুকুম দিল, যারা আগুন লাগিয়েছে তাদের খুঁজে এনে ফাঁসি দেওয়া হোক। তার বাড়িটাকে আগুনে পুড়িয়ে দেবার হুকুম দিয়ে শয়তান রস্তপ্চিনকে শাস্তি দিল।

শাসনকার্যসংক্রান্ত ব্যাপারে মস্কোর জন্য একটা গঠনতন্ত্র মঞ্জুর করা হল। একটা পৌরসভা স্থাপন করে নিম্নলিখিত ঘোষণা জারি করা হল :

মস্কোর অধিবাসীগণ !

"আমাদের দুর্ভাগ্য বড়ই নিষ্ঠুর, কিন্তু আপনাদের সম্রাট ও নৃপতি হিজ ম্যাজেস্টি সে দুর্ভাগ্যের গতিকে রোধ করতে চান। অবাধ্যতা ও অপরাধের শাস্তি তিনি কিভাবে দিয়ে থাকেন অনেক ভয়ঙ্কর দৃষ্টান্তের ভিতর দিয়ে সে শিক্ষা আপনারা পেয়েছেন। বিশৃঙ্খলার অবসান করে জনগণের নিরাপত্তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আপনাদের ভিতর থেকেই মনোনীত একটি পিতৃতুল্য শাসক-কর্তৃপক্ষ আপনাদের পৌরসভা ও নগর-সরকার গড়ে তুলবে। তারাই আপনাদের দেখাশোনা করবেন, আপনাদের প্রয়োজন ও কল্যাণের ব্যবস্থা করবেন। এই প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা কাঁধের উপর দিয়ে কোণাকুণিভাবে একটা লাল ফিতে পরবেন. আর পৌরপিতা তাছাড়াও একটি সাদা কোমরবন্ধ পরবে। কিন্তু তারা যখন কর্তব্যরত অবস্থায় থাকবেন না তখন শুধু বাম বাহুতে একটা লাল ফিতে জড়িয়ে রাখবেন।

"নগর-পুলিশকে পুরনো ব্যবস্থামতই গড়ে তোলা হয়েছে ; তাদের কার্যকলাপে ইতিমধ্যেই ভাল ফলও পাওয়া গেছে। সরকার দু'জন কমিসারী-জেনারেল বা পুলিশ-প্রধান নিয়োগ করেছেন ; নগরের বিভিন্ন ওয়ার্ডের জন্য ওয়ার্ড-ক্যাপ্টেনও নিয়োগ করা হয়েছে। বাম বাহুতে সাদা ফিতে দেখেই আপনারা তাদের চিনতে পারবেন। ছোট-বড় মিলিয়ে বেশ কয়েকটি গির্জা খোলা হয়েছে; সেখানে নির্বিঘ্নে ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলছে। আপনাদের

প্রতিবেশী নাগরিকরা প্রতিদিনই নিজ নিজ গৃহে ফিরে আসছে; দুর্ভাগ্যের দরুণ যে সাহায্য ও আশ্রয় তাদের প্রয়োজন তা যাতে তারা পান তার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে এবং আপনাদের অবস্থার উন্নতি করতে এইসব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য এটাও প্রয়োজন যে আপনারাও এব্যাপারে সর্বশক্তি নিয়োগ করবেন, যে দুর্ভাগ্যের শিকার আপনারা হয়েছেন যথাসম্ভব তাকে ভুলে যাবেন, এই আশা পোষণ করবেন যে আপনাদের ভাগ্য এত বেশী নিষ্ঠুর নয়, একটা বিষয়ে নিশ্চিত থাকুন যে আপনাদের শরীরের উপর এবং অবশিষ্ট সম্পত্তির উপর যারা হাত দিতে চেষ্টা করবে তাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে অনিবার্য ও লজ্জাকর মৃত্যু এবং আপনাদের সর্বপ্রকার নিরাপত্তার ব্যাপারে কোনরকম সন্দেহ পোষণ করবেন না, কারণ যিনি সব নৃপতির সেরা এবং সর্বাপেক্ষা ন্যায়বান এটাই তার ইচ্ছা। সৈনিকগণ ও নাগরিকগণ, আপনারা যে জাতির মানুষই হোন না কেন, জনগণের মনে আস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করুন, পরস্পর ভাইয়ের মত বাস করুন, পরস্পরকে সাহায্য করুন, আশ্রয় দিন, যারা অসৎ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত তাদের অভি-প্রায়কে ব্যর্থ করতে ঐক্যবদ্ধ হোন, সামরিক ও অসামরিক কর্তৃপক্ষকে মান্য করে চলুন, তাহলেই আপনাদের চোখের জলের ধারা বন্ধ হবে।"

সেনাবাহিনীর রসদের ব্যাপারে নেপোলিয়ন নির্দেশ দিল, সেনাদল পর্যায়ক্রমে মস্কো প্রবেশ করবে **a la maraude** (লুঠেরা হিসাবে), এমন-ভাবে নিজেদের রসদ সংগ্রহ করবে যাতে সেনাবাহিনীর ভবিষ্যতের ব্যবস্থা হয়ে যায়।

ধর্মের ব্যাপারে নেপোলিয়ন নির্দেশ দিল, পুরোহিতদের ফিরিয়ে আনা হোক এবং গির্জায় গির্জায় আবার ধর্মীয় অনুষ্ঠান চালু হোক।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও সেনাবাহিনীর রসদের ব্যাপারে নিম্নলিখিত ইস্তাহার সর্বত্র প্রচার করা হল :

ঘোষণা—

"শুনুন! মস্কোর যেসব শান্তিকামী অধিবাসী, শিল্পকর্মী ও মজুর দুর্ভাগ্যের দরুণ নগর থেকে বিতাড়িত হয়েছেন, অকারণ ভয়ে যেসব চাষীরা এখনও মাঠ থেকে দূরে সরে আছেন, তারা সকলেই শুনুন! এই রাজধানীতে শান্তি ফিরে আসছে, শৃংখলা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। আপনাদের দেশবাসীরা সাহসের সঙ্গে তাদের গুপ্ত ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে আসছে। তাদের প্রতি এবং তাদের সম্পত্তির প্রতি যে কোনরকম হিংসাত্মক ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি হচ্ছে। হিজ ম্যাজেস্টি সম্রাট ও নৃপতি তাদের সকলকে আশা দিয়েছেন; একমাত্র যারা তার আদেশ অমান্য করছে তারা ভিন্ন আর কাউকেই তিনি

শত্রু বলে মনে করেন না। আপনাদের সব দুর্ভাগ্যের অবসান করে আবার আপনাদের নিজ নিজ গৃহে ও পরিবারের মধ্যে ফিরিয়ে দিতেই তিনি চান। সুতরাং তার এই মহৎ অভিপ্রায়ে আপনারা সাড়া দিন, নির্ভয়ে আমাদের কাছে আসুন। অধিবাসীবৃন্দ, পরিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে আপনাদের আবাসে ফিরে আসুন। আপনাদের যা কিছু প্রয়োজন অচিরেই সব পাবেন। কারিগর ও শিল্পশ্রমিকগণ, আপনাদের কাজে, আপনাদের ঘরে, আপনাদের দোকানে ফিরে আসুন; সর্বত্রই রক্ষীরা আপনাদের সাহায্যার্থে অপেক্ষা করে আছে। আপনাদের কাজের উপযুক্ত মজুরি আপনারা পাবেন। আর শেষ কথা, যে-সব চাষীরা ভয়ে বনে-জঙ্গলে লুকিয়ে আছেন তারাও নির্ভয়ে ফিরে আসুন; বিশ্বাস করুন আপনাদের জন্য সব রকম নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে। নগরে যেসব বাজার বসানো হয়েছে সেখানে চাষীরা তাদের উদ্বৃত্ত রসদ এবং জমির ফসল নিয়ে আসতে পারবেন। তারা যাতে স্বাধীনভাবে সেসব বিক্রি করতে পারেন তার জন্য সরকার নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি নিয়েছেন: (১) আজ থেকে চাষী, কৃষিজীবী, এবং মস্কোর উপকণ্ঠের অধিবাসীরা নির্বিঘ্নে তাদের সবরকম জিনিসপত্র দুটি নির্দিষ্ট বাজারে নিয়ে যেতে পারবেন—তাদের একটি মখভায়া স্ট্রীটে এবং অন্যটি রসদ বাজারে অবস্থিত। (২) ক্রেতা ও বিক্রেতা যে দর সাব্যস্ত করবে সেই দরেই সব জিনিসপত্র তাদের কাছ থেকে কেনা হবে; কোন বিক্রেতা যদি তার জিনিসের ন্যায্য দাম না পান তাহলে তিনি ইচ্ছা করলেই তার জিনিস গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন, কোন ওজুহাতেই কেউ তাকে বাধা দিতে পারবেনা। (৩) প্রতি সপ্তাহের রবিবার ও বুধবার প্রধান কেনা-বেচার দিন স্থির করা হয়েছে, এবং তদুদ্দেশ্যে মঙ্গলবার ও শনিবার মালগাড়িগুলি পাহারা দেবার জন্য বড় রাস্তা বরাবর অনেক দূর পর্যন্ত সৈন্য মোতায়েন রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। (৪) চাষীরা যাতে তাদের মালগাড়ি ও ঘোড়া নিয়ে নির্বিঘ্নে ফিরে যেতে পারে তদনুরূপ ব্যবস্থাও করা হয়েছে। (৫) স্বাভাবিক বেচা-কেনা চালু করার জন্য অবিলম্বে সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

"নগর ও গ্রামের অধিবাসীবৃন্দ, আর মজুর ও শিল্পকর্মীরা, জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে আপনাদের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে, হিজ ম্যাজেস্টি সম্রাট ও নৃপতির এই পিতৃসুলভ মনোবাঞ্ছাকে আপনারা পূর্ণ করুন, জন-কল্যাণের কাজে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করুন। তার পদপ্রান্তে রাখুন আপনাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস; আমাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে বিলম্ব করবেন না!"

সেনাদল ও জনসাধারণের মনোবলকে বাড়িয়ে তুলবার জন্য মাঝে মাঝেই অবস্থার পর্যালোচনা করে পুরস্কার বিতরণ করা হতে লাগল। অধিবাসীদের সান্ত্বনা দেবার জন্য সম্রাট স্বয়ং অশ্বারোহণে রাজপথ পরিক্রমা করতে লাগলো এবং প্রচুর রাজকার্য থাকা সত্ত্বেও তাঁর হুকুমে প্রতিষ্ঠিত থিয়েটারগুলিতে

পদার্পণ করতে লাগল।

মুকুটধারীদের শ্রেষ্ঠ ধর্ম মানবপ্রীতির ক্ষেত্রেও নেপোলিয়ন সাধ্যায়ত্ত সব কিছুই করল। সমস্ত দাতব্য প্রতিষ্ঠানের মাথায় maison de ma mere শব্দগুলি খোদাই করিয়ে গভীর পুত্রস্নেহের সঙ্গে রাজকীয় মহানুভবতাকে মিশিয়ে প্রকাশ করল। অনাথ হাসপাতালটি পরিদর্শন করে অনাথ শিশুদের দিকে নিজের হাত বাড়িয়ে দিত চুম্বনের জন্য, তুতোল্‌মিনের সঙ্গে সদয়ভাবে কথাবার্তাও বলত। তারপর, থিয়েরের্সর বর্ণনা অনুসারে নিজের তৈরি জাল রুশ টাকায় সৈন্যদের বেতন দেবার হুকুম করল: "নিজের এবং ফরাসী বাহিনীর যোগ্য উপায়ে এইভাবে টাকার ব্যবস্থা করে যাদের সর্বস্ব পুড়ে গেছে তাদেরও সাহায্য দেবার বন্দোবস্ত করল। কিন্তু যেহেতু তখন খাদ্য এতই দুর্মূল্য যে তা বিদেশীদের দেওয়া চলে না, আর বিদেশীরা তো অধিকাংশই শত্রু, তাই বাইরে থেকে খাদ্য কেনবার জন্য তাদের টাকা দেওয়াটাই নেপোলিয়ন বাঞ্ছনীয় মনে করল এবং তাদের মধ্যে কাগজের রুবল বিতরণের ব্যবস্থা করল।"

সেনাদলের মধ্যে কঠোর শৃংখলা রক্ষার জন্য অনবরত হুকুম জারি করা হতে লাগল যে যারা সামরিক কর্তব্য পালন না করবে তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে এবং কঠোর হাতে ডাকাতি বন্ধ করতে হবে।

অধ্যায়—১০

কিন্তু আশ্চর্যের কথা, এইসব বিধান, প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনা অনুরূপ পরিস্থিতিতে প্রচারিত অন্য সব বিধি-ব্যবস্থার চাইতে কোন অংশে খারাপ না হলেও সমস্যার একেবারে মূলে পৌঁছতে পারল না; মূল যন্ত্র থেকে বিচ্যুত ঘড়ির কাঁটার মত উদ্দেশ্যবিহীন এলোমেলোভাবে দুলতে লাগল যেন।

সামরিক দিক থেকে বলা যায়, অভিযানের যে পরিকল্পনা সম্পর্কে থিয়ের্স মন্তব্য করেছে "এর চাইতে গভীরতর, কুশলতর, বা আশ্চর্যতর কোন পরিকল্পনা তার (নেপোলিয়নের) প্রতিভার পক্ষেও সম্ভব হয় নি," সেটাকে কিন্তু মোটেই কার্যকর করা যায় নি, বা কখনও যেতও না, কারণ সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর সঙ্গে সে পরিকল্পনার কোন যোগই ছিল না। ক্রেমলিনের যে সুরক্ষা-ব্যবস্থার জন্য "লা মস্ক্" (স্বর্গীয় আশীর্বাদধন্য বাসিল গির্জাকে নেপোলিয়ন এই নামেই উল্লেখ করত) গির্জাকে ধূলিসাৎ করতে হত সেটা একেবারেই বৃথা প্রমাণিত হল। ক্রেমলিনে সুরঙ্গ খোঁড়ার ফলে নেপো-লিয়নের এই মনোবাসনা পূর্ণ করারই সহায়ক হল যে সে মস্কো ছেড়ে চলে যাবার পরেই যেন ক্রেমলিনকে উড়িয়ে দেওয়া হয়—যেমন ছোট ছেলে চায় যে মেঝের যে-জায়গাটাতে সে আঘাত পেয়েছে কেউ এসে সেই জায়গাটাকে আঘাত করুক। রুশ বাহিনীর পিছু নেবার ব্যাপারে নেপোলিয়নের খুবই

উৎসাহ ছিল, আর তার ফলও হল অশ্রুতপূর্ব। ষাট হাজার সৈন্যের রুশ বাহিনী ফরাসী সেনাপতিদের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল, আর—থিয়ের্সের মতে—যেভাবে একটা হারানো পিন খুঁজে পাওয়া যায় সেইভাবে ঘটনাক্রমেই তাদের দেখা মিলল মুরাতের কৌশল ও প্রতিভার দৌলতে।

কূটনীতির ব্যাপারে, তুতোলিমিন ও ইয়াকভলেভের কাছে নিজের মহানুভবতা ও ন্যায়পরায়ণতার যেসব বুলি নেপোলিয়ন আউড়েছিল সেসবই বৃথা হয়ে গেল : নেপোলিয়ন এই দূতদের সঙ্গে দেখা করল না এবং তাদের দৌত্যের কোন জবাবও দিল না।

আইন ঘটিত ব্যাপারে, তথাকথিত অগ্নিপ্রদানকারীদের মৃত্যুদণ্ডের পরেও মস্কোর বাকি অংশটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

শাসন-পরিচালনার ব্যাপারে, পৌরসভা প্রতিষ্ঠার ফলে লুটতরাজ বন্ধ হল না ; শুধু যাদের নিয়ে পৌরসভা গঠিত হল তারাই শৃঙ্খলা রক্ষার নামে মস্কোতে লুটতরাজ চালাল, আর না হয় তো লুটতরাজের হাত থেকে কেবলমাত্র নিজেদের ধন-সম্পত্তি বাঁচাবার চেষ্টা করল।

ধর্মের ব্যাপারেও বিশেষ কোন সুফল দেখা গেল না। মস্কোতে যে দু' তিনজন পুরোহিতকে পাওয়া গেল তারা নেপোলিয়নের ইচ্ছা পালন করতে চেষ্টা করল, কিন্তু প্রার্থনা-অনুষ্ঠান চালাবার সময় জনৈক ফরাসী সৈনিক তাদের একজনের মুখে চড় মেরে বসল, এবং অপরজনের সম্পর্কে জনৈক ফরাসী অফিসার মন্তব্য করল : "আমি যে পুরোহিতটিকে খুঁজে এনে ধর্মানুষ্ঠানের কাজ করতে বললাম সে গির্জাটিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে তালা লাগিয়ে দিল। কিন্তু সেই রাতেই আবার দরজা ভাঙা হল, তালাগুলো চূর্ণবিচূর্ণ করা হল, পুঁথিগুলো নষ্ট করা হল এবং অন্য সবরকম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করা হল।"

ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে শিল্প-শ্রমিক ও চাষীদের প্রতি যে ঘোষণা প্রচার করা হল তাতে কোনরকম সাড়া মিলল না। শিল্প-শ্রমিকদের পাত্তাই পাওয়া গেল না, আর যেসব কমিসাররা ঘোষণাপত্র নিয়ে শহর ছেড়ে অনেক বেশী দূরে গেল চাষীরা তাদের ধরে ধরে খুন করল।

জনসাধারণ ও সৈন্যদের মনোরঞ্জনের জন্য যেসব থিয়েটারের ব্যবস্থা করা হল তাতেও কোন সুফল পাওয়া গেল না। খাঁটি এবং মেকি কাগজের টাকায় তখন মস্কো ছেয়ে গেছে ; তার দামও পড়ে গেছে। লুণ্ঠনকারী ফরাসীদের একমাত্র লক্ষ্য সোনার দিকে। শুধু যে নেপোলিয়নের দেওয়া কাগজের টাকাই মূল্যহীন হয়ে পড়ল তাই নয়, সোনার তুলনায় রূপোর দামও পড়ে গেল।

কিন্তু সেসময়ে কর্তৃপক্ষ যেসব হুকুম জারি করেছিল তার মধ্যে বিফলতার সবচাইতে বিস্ময়কর উদাহরণ হল লুটতরাজ বন্ধ করতে ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে

আনতে নেপোলিয়নের প্রচেষ্টা।

সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এই সব প্রতিবেদনই পাওয়া গেল :

"নির্দেশনামা সত্ত্বেও শহরে লুটতরাজ অবাধে চলেছে। এখনও শৃঙ্খলা ফিরে আসে নি এবং একটি ব্যবসায়ীও বিধিসম্মতভাবে ব্যবসাপত্র চালাচ্ছে না। সেনাদলের সঙ্গের ব্যবসায়ীরাই শুধু ব্যবসাপত্র চালাতে সাহস করছে, আর তারা তো বেচছে শুধু চোরাই মাল।"

"আমার ওয়ার্ডের আশেপাশে তৃতীয় কোরের সেনাদল লুটতরাজ চালাচ্ছে; যেসব হতভাগ্য অধিবাসী যৎসামান্য যা কিছু এখনও হাতে আছে তাই নিয়ে মাটির নীচে আশ্রয় নিয়েছে; তাদের শেষ সম্বলটুকু কেড়ে নিয়েও সন্তুষ্ট না হয়ে সৈনিকরা নিষ্ঠুরভাবে তাদের তরবারি দিয়ে আঘাত করছে; এরকম ঘটনা বার বার আমার চোখে পড়েছে।"

"সৈন্যরা ডাকাতি করছে, লুট করছে, এছাড়া নতুন কিছু নেই—৯ই অক্টোবর।"

"ডাকাতি ও লুট সমানে চলেছে। আমাদের অঞ্চলে একটা চোরের দল গড়ে উঠেছে; শক্তিশালী সেনাদল পাঠিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা উচিত—১১ই অক্টোবর।"

"সম্রাট অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছেন এই কারণে যে লুটতরাজ বন্ধ করার কড়া নির্দেশ সত্ত্বেও লুটেরা রক্ষীবাহিনীদের দলে দলে ক্রেমলিনে ফিরতে দেখা যাচ্ছে। পুরনো রক্ষী দলের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও লুটতরাজ তীব্র আকারে নতুন করে দেখা দিয়েছে গতকাল সন্ধ্যায়, রাতে ও আজ। সম্রাট অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন, তার দেহরক্ষী হিসাবে নিযুক্ত যেসব বাছাই সৈনিকদের উচিত শৃঙ্খলার দৃষ্টান্ত স্থাপন করা তারাই এতদূর অবাধ্য হয়ে উঠেছে যে সামরিক রসদের ঘাঁটি ও গুদামে পর্যন্ত তারা হানা দিয়েছে। অন্যরা আবার শান্ত্রী ও অফিসারদের অমান্য করে, এমন কি তাদের গালাগালি ও মারধোর করে নিজেদেরই অসম্মান ডেকে এনেছে।

শাসনকর্তা লিখেছে, "রাজপ্রাসাদের গ্র্যাণ্ড মার্শাল তিক্ত ভাষায় অভিযোগ করেছে, বার বার হুকুম দেওয়া সত্ত্বেও সৈন্যরা সারা উঠোনে, এমন কি সম্রাটের জানালার নীচেও মলমূত্র ত্যাগ করছে।"

লাগাম-ছাড়া গরু-ঘোড়ার মত বেপরোয়াভাবে ইতস্তত ছুটাছুটি করে যে ফসল তাদের অনাহারে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারত তাকেই পায়ের নীচে মাড়িয়ে সৈন্যরা মস্কোতে থেকে দিনের পর দিন মরতে লাগল। কিন্তু তবু তারা মস্কো ছেড়ে গেল না।

শুধু সেইদিন থেকে তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পালাতে শুরু করল যেদিন স্মোলেন্স্ক্ রোডে মালবাহী ট্রেনটা আটক করা হল এবং তারুতিনোতে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। একটা সেনাদল পরিদর্শনের সময় অপ্রত্যাশিতভাবে

তারুতিনো যুদ্ধের সংবাদ পেয়েই রুশদের শাস্তি দেবার ইচ্ছা জাগল নেপো-লিয়নের মনে (থিয়ের্স তাই লিখছে), আর সঙ্গে সঙ্গে সেনাবাহিনীর দাবী মেনে নিয়ে তাদের প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিল।

মস্কো থেকে পালাবার সময় সৈন্যরা যে যা চুরি করেছিল সব সঙ্গে নিয়ে চলল। নেপোলিয়ন ও তার ব্যক্তিগত সব সম্পত্তি সঙ্গে নিয়েই চলল, কিন্তু একটা মাল-ট্রেন সেনাবাহিনীর গতিরোধ করায় খুব আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল (থিয়ের্সের কথা)। তবু যুদ্ধের অভিজ্ঞতার দরুন বাড়তি যানবাহনগুলো পুড়িয়ে ফেলার আদেশ দিল না। সৈন্যরা যেসব কালিচে-গাড়ি ও অন্য বড় বড় গাড়িতে করে যাচ্ছিল সেদিকে তাকিয়ে থেকে নেপোলিয়ন বলল, এ তো ভালই হয়েছে ; রসদ এবং রুগ্ন ও আহতদের বয়ে নেবার জন্য এই গাড়ি-গুলি ব্যবহার করা যাবে।

গোটা সেনাবাহিনীর অবস্থা দাঁড়াল সেই আহত জন্তুটির মত যে বুঝতে পারছে যে একটু একটু করে সে মরতে চলেছে অথচ কি যে করছে তা নিজেই জানে না। মস্কোতে প্রবেশের মুহূর্ত থেকে তার ধ্বংস পর্যন্ত নেপোলিয়ন ও তার সেনাবাহিনীর সমর-কৌশল ও লক্ষ্যকে পর্যালোচনা করা আর একটি মারাত্মকভাবে আহত জন্তুর মৃত্যুকালীন লাফঝাঁপ ও থরো থরো কাঁপন লক্ষ্য করা একই কথা। প্রায়ই দেখা যায় আহত জন্তুটি খস্‌খস্‌ শব্দ শুনলেই সোজা শিকারীর বন্দুকের দিকে ছুটে যায়, একবার এগিয়ে যায় আবার পিছিয়ে আসে এবং নিজের মৃত্যুকেই ত্বরান্বিত করে। তারুতিনো যুদ্ধের খস্‌খসানি জন্তুটিকে ভয় পাইয়ে দিল, সে ধেয়ে গেল শিকারীর বন্দুকের দিকে, তার কাছে পৌঁছে গেল, ফিরে এল এবং শেষ পর্যন্ত—যেকোন বন্য পশুর মতই—সেই একান্ত অসুবিধাজনক ও বিপজ্জনক পথ ধরেই পিছন দিকে ছুটতে লাগল যেখানকার গন্ধ তার পরিচিত।

একটি অসভ্য মানুষ যেমনভাবে যে জাহাজের সম্মুখস্থ প্রতিমূর্তিটাই বুঝি জাহাজটাকেই চালায়, তেমনই আমরাও মনে করি যে নেপোলিয়নই এত সব গতিবিধির নেতা ; কিন্তু এই সময়টাতে নেপোলিয়ন যেন সেই ছোট ছেলেটির মতই আচরণ করতে লাগল যে গাড়ির ভিতরে বসে এক জোড়া দড়ি হাতে নিয়ে ভাবে যে গাড়িটাকে সেই চালাচ্ছে।

অধ্যায়—১১

৬ই অক্টোবর খুব সকালে পিয়ের চালাঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল ; ফিরে এসে দরজার পাশে থেমে বাঁকা-পা, নীল-ধূসর ছোট কুকুরটার সঙ্গে খেলা করতে শুরু করল। কুকুরটা তার চার পাশে লাফাতে লাগল। ছোট কুকুরটা তাদের চালাতেই থাকে ; রাত্তিরে কারাতায়েভের পাশে ঘুমোয় ; মাঝে মাঝে শহরে চলে যায়, কিন্তু ঠিক ফিরে আসে। হয় তো কোনদিনই

কুকুরটার কোন মালিক ছিল না; এখনও নেই; তাই ওর কোন নামও নেই। ফরাসীরা ওকে ডাকত "আজোর" বলে; গল্প-বলিয়ে সৈনিকটি ওকে ডাকে "ফেমগালৃকা"; কারাতায়েভ ও অন্যরা ডাকে "গ্রে", কখনও বা "ফ্ল্যাবি।" কোন মনিব নেই, নাম নেই, জাতি-বর্ণ নেই, কিন্তু তাতে নীল-ধূসর কুকুরটার কোন সুখ-দুঃখ নেই। লোমশ লেজটাকে পালকের মত উঁচে তুলে নাচায়; প্রায়ই পিছনের একটা পা তুলে তিন পায়ে এমন সুন্দর দৌড়য় যেন চারটে পা ব্যবহার করাটাই অতি বাজে কাজ। সব কিছুতেই ও খুশি। কখনও গড়াগড়ি দিতে দিতে আনন্দে ঘেউ-ঘেউ করে, কখনও গম্ভীর মুখে রোদ পোয়ায়, আবার কখনও একটুকরো কাঠ বা খড় নিয়েই মনের সুখে খেলা করে।

এতদিনে পিয়েরের পোশাক বলতে দাঁড়িয়েছে একটা ময়লা ছেঁড়া শার্ট, একজোড়া সৈনিকদের ট্রাউজার—কারাতায়েভের পরামর্শে শরীরটা গরম রাখবার জন্যে সেটাকে সে গোড়ালির কাছে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়েছে—আর চাষীদের কোট ও টুপি। এই সময়ের মধ্যে তার শরীরের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। এখন আর তাকে শক্ত-সমর্থ বলা যায় না, তবে তাকে দেখলে তার বংশানুক্রমিক শক্তি-সামর্থ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। গোঁফ-দাড়িতে মুখের নীচটা ঢেকে গেছে, উকুন-ভরা জট-পাকানো চুল মাথাটাকে ঢেকে রেখেছে টুপির মত। চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে একটা দৃঢ়, শান্ত, ও সোৎসাহ সতর্কতার ভাব। তার চোখে আগে যে অলস গতি দেখা যেত তার জায়গায় এখন দেখা দিয়েছে একটা সোৎসাহ বিরোধিতা ও কাজের মনোভাব।

পিয়ের প্রথমে মাঠের উপর দিয়ে তাকিয়ে গাড়ি-ঘোড়া ও অশ্বারোহীদের দেখল, তারপর দৃষ্টি ফেরাল নদীর ওপারে, তারপর কুকুরটার দিকে, এবং শেষে নিজের পায়ের নোংরা, মোটা, বড় বড় আঙুলগুলোকে নানা ভঙ্গীতে নেড়ে চেড়ে সেইদিকেই তাকাল। যতবার খোলা পা দুটোর দিকে তাকাচ্ছে ততবারই আত্মতুষ্টিভরা হাসিতে মুখটা ভরে উঠছে। পা দুটোর দিকে তাকালেই তার মনে পড়ে যায় এই কয়েক সপ্তাহের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার কথা; আর সে স্মৃতি তার কাছে মধুর।

কয়েকদিন ধরেই আবহাওয়া বেশ শান্ত ও পরিষ্কার; সকালবেলা কিছুটা নীহার পড়ে—একেই বলে "বুড়িবৌদের গ্রীষ্মকাল।"

বাতাস রৌদ্রতপ্ত; সকালবেলাকার নীহারের সতেজ স্পর্শে সেই আতপ্ত বাতাস আরও মনোরম লাগছে।

দূরে ও নিকটে সব কিছুর উপরেই লেগেছে সেই হঠাৎ আলোর ঝলকানি যা শুধু হেমন্তের এই সময়টাতেই দেখা যায়। দূরে দেখা যাচ্ছে "চাতক পাহাড়", তার গ্রাম, গির্জা, ও সাদা বড় বাড়িটা সমেত। পাতা-ঝরা গাছগুলি, বালি, ইট ও বাড়িগুলির ছাদ, গির্জার সবুজ চূড়া, আর দূরের সাদা

বাড়ির কোণগুলি—স্বচ্ছ বাতাসে সব কিছুই ফুটে উঠেছে সূক্ষ্ম রেখায় ও অস্বাভাবিক স্পষ্টতায়। কাছেই দেখা যাচ্ছে ফরাসীদের দ্বারা দখল-করা অর্ধদগ্ধ প্রাসাদটার ধ্বংসাবশেষ ; বেড়ার ধারে গাঢ় সবুজ রঙের লিলাক ফুলের ঝোপগুলোও চোখে পড়ছে। যে ধ্বসে-পড়া বাড়িটাকে খারাপ আবহাওয়ায় অত্যন্ত কুৎসিত দেখায়, এখনকার নিশ্চল পরিষ্কার উজ্জ্বলতায় তাকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে।

জনৈক ফরাসী কর্পোরাল ঘরোয়াভাবে কোটের বোতাম খুলে মাথায় একটা খুলি-টুপি পরে এবং মুখে একটা ছোট পাইপ গুঁজে চালার কোণ থেকে বেরিয়ে এসে বন্ধুর মত চোখ টিপে পিয়েরের দিকে এগিয়ে গেল।

"কী একখানা রোদ মঁসিয় কিরিল! (পিয়েরকে তারা ঐ নামেই ডাকে।) কি বলেন? ঠিক যেন বসন্তকাল।"

দরজায় হেলান দিয়ে কর্পোরাল পাইপটা পিয়েরের দিকে এগিয়ে দিল, যদিও সে যতবার পাইপটা এগিয়ে দিয়েছে ততবারই পিয়ের সেটা ফিরিয়ে দিয়েছে।

"এই আবহাওয়ায় পথে বের হওয়া…" লোকটি বলতে শুরু করল। পথে বের হবার কথায় পিয়ের ব্যাপারটা জানতে চাইলে কর্পোরাল বলল যে প্রায় সব সৈন্যই তো চলে যাচ্ছে, আর ঐদিনই বন্দীদের সম্পর্কে একটা আদেশ প্রচার করা হবে। সকলভ নামক এই চালারই পিয়েরের একজন সঙ্গীর মুমূর্ষু অবস্থা ; পিয়ের কর্পোরালকে জানাল যে তার সম্পর্কে একটা কিছু করা দরকার। জবাবে কর্পোরাল পিয়েরকে বলল, পিয়েরের দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই, তাদের একটা অ্যাম্বুলেন্স ও একটা স্থায়ী হাসপাতাল আছে, রোগীদের যথাযথ ব্যবস্থা অবশ্যই করা হবে, আর কর্তৃপক্ষ সম্ভাবিত সব ঘটনার কথা আগে থেকেই জানেন।

"তাছাড়া, আপনি তো জানেন মঁসিয় কিরিল, আপনি শুধু ক্যাপ্টেনকে মুখের কথাটি বললেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তিনি কখনই কোন কিছু ভুলে যান না। তিনি রোঁদে বের হলে তার সঙ্গে কথা বলুন, আপনার জন্য তিনি সব কিছু করবেন।"

(কর্পোরাল যে ক্যাপ্টেনটির কথা বলল তার সঙ্গে পিয়েরের প্রায়ই দীর্ঘ গাল-গল্প হয় ; সে লোকটি তাকে অনেক সুযোগ-সুবিধা করে দিয়েছে।)

"এই তো সেদিন তিনি আমাকে বললেন," কি জান সেণ্ট তমাস, মঁসিয় কিরিল একজন লেখাপড়া-জানা লোক, ফরাসী বলতে পারেন। তিনি একজন দুর্দশাগ্রস্ত সিনর, কিন্তু একজন মানুষের মত মানুষ। তিনি সব জানেন, বোঝেন…তিনি যদি আমার কাছে কিছু চান, আমি তাকে ফিরিয়ে দেব না। কি জান, লেখাপড়া শিখলেই মানুষ শিক্ষার কদর ও ভদ্র লোকের দাম বোঝে। "আপনার সুবিধার জন্যই কথাটা বললাম মঁসিয়

কিরিল। সেদিন যদি আপনি না থাকতেন তাহলে তো অবস্থা বেশ খারাপই হত।"

আরও কিছুক্ষণ কথা বলে কর্পোরাল চলে গেল। (যে ঘটনার কথা সে উল্লেখ করল সেটা কয়েকদিন আগে ঘটেছে—বন্দী ও ফরাসী সৈন্যদের মধ্যে একটা লড়াই বেঁধে গেলে পিয়ের তার বন্ধুদের শান্ত করেছিল।) পিয়েরকে কর্পোরালের সঙ্গে কথা বলতে শুনে কয়েকজন বন্দী ব্যাপারটা জানতে চাইল। পিয়ের যখন ফরাসী সৈন্যদের মধ্যে ছেড়ে চলে যাবার কথা বলছিল, তখন ছিন্নবস্ত্র পরিহিত একটি ফরাসী সৈন্য বিবর্ণ মুখে চালাঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। অভিবাদনের ভঙ্গীতে তাড়াতাড়ি কপালে আঙুল ঠেকিয়ে সে পিয়েরকে জিজ্ঞাসা করল, প্লাতোচ নামক যে সৈন্যটিকে সে একটি শার্ট দিয়ে গেছে সেলাই করতে সে চালাঘরে আছে কি না।

এক সপ্তাহ আগে ফরাসী সৈন্যদের জুতোর চামড়া ও কাপড় দেওয়া হয়েছে; তারা আবার সেগুলো বন্দীদের দিয়েছে বুট ও শার্ট তৈরি করে দেওয়ার জন্য।

পরিষ্কার ভাঁজ-করা একটা শার্ট নিয়ে এসে কারাতায়েভ বলল, "তৈরি, একেবারে তৈরি ভাই!"

গরম আবহাওয়ায় কাজের সুবিধার জন্য কারাতায়েভ পরেছে শুধু ট্রাউ-জার আর ঝুল-কালির মত কালো একটা ছেঁড়া শার্ট। লেবুগাছের বাকল দিয়ে তৈরি একটা টুকরো দিয়ে চুলটাকে গোল করে বেঁধেছে; ফলে তার গোল মুখটাকে আরও গোল এবং আরও সুন্দর দেখাচ্ছে।

নিজের হাতে সেলাই করা শার্টটাকে মেলে ধরে প্লাতন হেসে বলল, "কথা যখন দিয়েছি তখন কাজ হাসিল হবেই। বলেছিলাম শুক্রবার, এই নাও শার্ট তৈরি।"

ফরাসী সৈনিকটি অস্বস্তির সঙ্গে চারদিকে তাকাল; তারপর ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে তাড়াতাড়ি ইউনিফর্মটা খুলে ফেলে শার্টটা পরে ফেলল। তার শুকনো, বিবর্ণ শরীরে শুধু একটা তেল-চিটচিটে লম্বা সিল্কের ওয়েস্টকোট পরা ছিল; শার্ট ছিল না। নিশ্চয়ই তার মনে ভয় ছিল যে বন্দীরা তাকে দেখে হাসবে; তাই সে খুব তাড়াতাড়ি শার্টের মধ্যে মাথাটা গলিয়ে দিল। কিন্তু বন্দীরা একটা কথাও বলল না।

শার্টটাকে টেনে দিয়ে প্লাতন বার বার বলতে লাগল, "দেখ, কী সুন্দর মাপমত হয়েছে।"

চোখ না তুলেই মাথা ও হাত শার্টের মধ্যে গলিয়ে দিয়ে ফরাসীটি শার্টের সেলাইটাই পরীক্ষা করতে লাগল।

নিজের কাজে নিজেই খুশি হয়ে একগাল হেসে প্লাতন বলল, "দেখ ভাই, এটা তো সেলাইয়ের দোকান নয়, আর ঠিকমত যন্ত্রপাতিও আমার কাছে

নেই ; কথায় বলে, একটা উকুন মারতেও যন্ত্র থাকা চাই।"

সৈনিকটি ফরাসীতে বলল, "ভাল হয়েছে, খুব ভাল হয়েছে ; তোমাকে ধন্যবাদ। কিন্তু কিছুটা কাপড় তো বাড়তি হবার কথা।"

কারাতায়েভ তবু নিজের কাজের প্রশংসা করেই বলতে লাগল। শরীরের সঙ্গে বসে গেলে মাপে আরও ঠিক হবে। পরতে খুব ভাল লাগবে, আরাম পাবে…"

ফরাসীটি পুনরায় হেসে বলল, "ধন্যবাদ, ধন্যবাদ বুড়ো। …কিন্তু বাড়তি কাপড়টা ?" এক রুবলের নোটটা বের করে কারাতায়েভকে দিল। "কিন্তু বাড়তি কাপড়টা আমাকে দিয়ে দাও।"

পিয়ের বুঝল, প্লাতন ফরাসীটির কথাগুলো বুঝতে পারছে না, কিন্তু কিছু বলল না। টাকাটা পেয়ে কারাতায়েভ ফরাসী সৈনিকটিকে ধন্যবাদ দিয়ে আবার নিজের কাজের প্রশংসায় মেতে উঠল। কিন্তু ফরাসীটির বাড়তি কাপড়টুকু চাইই ; তাই সে পিয়েরকে বলল তার কথাগুলি ভাষান্তরিত করে দিতে।

কারাতায়েভ তখন বলল, "ওটুকু কাপড় কিসের জন্য চাইছ ? ও দিয়ে আমাদের জন্য পায়ের পট্টি হত। ঠিক আছে, কিছু মনে করো না।" হঠাৎ কারাতায়েভের মুখের ভাবটা বদলে গেল ; বিষণ্ণ মুখে নিজের শার্টের ভিতর থেকে একবাণ্ডিল কাটা কাপড় বের করে ফরাসীটিকে দিল। "ভাইরে !" বলেই কারাতায়েভ তার দিকে না তাকিয়েই চলে গেল। ফরাসীটি কাপড়ের দিকে তাকাল, একমুহূর্ত কি যেন ভাবল, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পিয়েরের দিকে তাকাল, আর তারপরেই যেন পিয়েরের চাউনিই তাকে কিছু বলে দিয়েছে এমনিভাবে হঠাৎ সে মুখটা লাল করে ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে বলল, "প্লাতোচ্ ! হেই প্লাতোচ ! এগুলো তুমিই রেখে দাও !" টুকরো কাপড়-গুলো ফিরিয়ে দিয়েই মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল।

মাথাটা নেড়ে নেড়ে কারাতায়েভ বলল, "এই তো, চেয়ে দেখ। সকলে বলে, ওরা খৃস্টান নয়, ওদেরও মন আছে। তাই তো বুড়োরা বলে : 'যে হাত ঘামে সেই হাতই খোলা, আর শুকনো হাতই মুঠো করা।' লোকটির পোশাক নেই, তবু সে এগুলো ফিরিয়ে দিয়ে গেল।"

কারাতায়েভ চিন্তিতভাবে হেসে কাপড়ের টুকরোগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল।

"কিন্তু এ দিয়ে চমৎকার পায়ের পট্টি তৈরি হবে," এই কথা বলে সে চালাঘরে ঢুকে গেল।

অধ্যায়—১২

পিয়েরকে বন্দী করার পরে চার সপ্তাহ কেটে গেছে; ফরাসীরা তাকে সাধারণ কয়েদীদের কাছ থেকে সরিয়ে অফিসারদের চালায় নিয়ে যেতে চেয়েছে, কিন্তু যে চালায় তাকে প্রথম রাখা হয়েছিল পিয়ের সেখানেই রয়ে গেছে।

একটি মানুষের পক্ষে যত রকম দুঃখকষ্ট সহ্য করা সম্ভব দগ্ধ ও বিধ্বস্ত মস্কোতে তারই অভিজ্ঞতা পিয়েরের হয়েছে; কিন্তু তার শারীরিক শক্তি ও স্বাস্থ্যকে ধন্যবাদ, বিশেষ করে ধন্যবাদ এই সত্যকে যে এত সব দুঃখকষ্ট এমন ধীরে ধীরে এসেছে যে কবে তার শুরু হয়েছে তাই সে বলতে পারে না, এই পরিস্থিতিকে সে যে শুধু হেলায় সহ্য করেছে তাই নয়, সহ্য করেছে আনন্দের সঙ্গে। আর ঠিক এই সময়েই মনের সেই শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য সে পেয়েছে যার জন্য এতদিন সে বৃথাই চেষ্টা করে এসেছে। এতকাল নানাভাবে মনের এই শান্তির সন্ধানে সে ফিরেছে। শান্তি খুঁজেছে বিশ্ব-মানব-প্রীতির মধ্যে, ভ্রাতৃসংঘের কর্মধারার মধ্যে, শহর-জীবনের ভোগ-সুখের মধ্যে, মদ্যপানে, আত্মত্যাগের বীরত্বপূর্ণ কাজকর্মের মধ্যে। এবং নাতাশার প্রতি রোম্যান্টিক ভালবাসার মধ্যে। কিন্তু হায়, সেসব সন্ধান ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু আজ কোনরকম চিন্তা-ভাবনা না করেই সেই শান্তি ও অন্তরের মিল সে খুঁজে পেয়েছে মৃত্যুর ভয়াবহতা, দুঃখকষ্ট ও কারাতায়েভের অন্তর-সম্পদের মধ্যে।

রাশিয়া, যুদ্ধ, রাজনীতি, বা নেপোলিয়নের চিন্তা এখন আর তার মনে আসে না। সে এখন পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে, এগুলো তার কাজ নয়, এসব ব্যাপারে তার মতামত কেউ চায় না, আর তাই তার দিক থেকে মতামত দেবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। "রাশিয়া আর গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়া এক-সূত্রে গাঁথা নয়," কারাতায়েভের এই কথাগুলি সে মনে মনে আওড়াল। কথাগুলি তাকে আশ্চর্য রকমের সান্ত্বনা এনে দেয়। নেপোলিয়নকে হত্যা করার বাসনা এখন তার কাছে অর্থহীন, এমন কি হাস্যকর মনে হয়। স্ত্রীর প্রতি ক্রোধ এবং তার সঙ্গে জড়িত হয়ে নিজের নামকে কলংকিত করার দুশ্চিন্তা এখন তার কাছে শুধু তুচ্ছ নয়, একটা মজার ব্যাপার বলে মনে হয়। সেই নারী কোথায় কি রকম জীবন যাপন করছে, তাতে তার কি যায় আসে? তাদের বন্দীর নাম যে কাউণ্ট বেজুকভ এ-কথা তারা জানুক বা না জানুক তাতে কার কি, আর তার নিজেরই বা কি?

এখন পিয়েরের দিনমানের একমাত্র স্বপ্ন, কবে সে মুক্তি পাবে। অথচ পরবর্তীকালে সারা জীবনভোর মহা উৎসাহের সঙ্গে সে চিন্তা করেছে ও কথা বলেছে এই একটি মাসের বন্দী-জীবনের কথা, সেই আনন্দ-ঘন অনুভূতির

কথা, এবং মনের সেই পরিপূর্ণ শান্তি ও অন্তর মুক্তির কথা যার অভিজ্ঞতা সে পেয়েছিল শুধু সেই ক'টি সপ্তাহে।

প্রথম দিনটিতেই খুব ভোরে উঠে চালাঘর থেকে বেরিয়ে সে যখন প্রথম দেখেছিল আধো অন্ধকারে ঢাকা কুমারী মাতার নব কনভেণ্টের গম্বুজ ও ক্রুশ, ধূলিমলিন ঘাসের উপর সাদা শিশিরকণাগুলি, "চাতক পাহাড়," বহু-দূরে বিলীয়মান আঁকাবাঁকা নদীটির তরুছায়া-ঢাকা তীর, প্রথম যখন শ্বাস নিয়েছিল তাজা বাতাসে আর মস্কো থেকে উড়ে আসা কাকদের ডাক শুনে-ছিল মাঠের উপরে, একটু পরে যখন পুর্বদিকটা আলোয় ভরে গেল, মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল সূর্যের রশ্মি, আর সঙ্গে সঙ্গে গম্বুজ ও ক্রুশ, সাদা শিশিরকণা, দূরবর্তী নদী, সব কিছু সেই আলোয় ঝল্‌মল্‌ করে উঠল—তখন এক অজ্ঞাতপূর্ব নতুন আনন্দ ও জীবনী শক্তির স্বাদ পেয়েছিল পিয়ের। সেই আনন্দ ও শক্তি গোটা বন্দীজীবনে তাকে ঘিরে রইল; শুধু তাই নয়, জীবনের দুঃখকষ্ট যত বাড়তে লাগল সেই আনন্দ ও শক্তিও ততই বেড়ে চলল।

তাছাড়া, এই চালাঘরে আসার পর থেকে সহ-বন্দীরা তার সম্পর্কে যে উচ্চ ধারণা পোষণ করছে তাতেও তার এই অনুভূতি আরও তীব্র হয়েছে। তার বহু ভাষার জ্ঞান, তার প্রতি ফরাসীদের শ্রদ্ধা, তার সরলতা, তার দানশীলতা, তার শক্তিমত্তা, সঙ্গীদের প্রতি সদয় ব্যবহার, কোন কিছু না করে চুপচাপ বসে থাকা ও চিন্তা করার ক্ষমতা (অন্য সকলের কাছে ব্যাপারটা দুর্বোধ্য),—সব কিছু মিলিয়ে সকলের চোখে সে হয়ে উঠেছে একটি রহস্যময় উচ্চ কোটির মানুষ। শক্তিমত্তা, জীবন-সম্ভোগের প্রতি বিতৃষ্ণা, অন্যমনস্কতা ও সরলতা—এই যেসব গুণ এতকাল তার নিজস্ব জগতে চলার পথে ছিল প্রতিবন্ধকস্বরূপ, সেইসব গুণই এই মানুষদের চোখে তাকে এনে দিয়েছে নায়কের মর্যাদা। পিয়ের বোঝে, তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গীই তার উপর চাপিয়েছে নতুন দায়িত্বভার।

অধ্যায়—১৩

৬ই ও ৭ই অক্টোবরের রাত থেকেই ফরাসীদের ফিরতি-যাত্রা শুরু হল; রান্নাঘর ও চালাগুলো ভেঙে দেওয়া হল, গাড়ি বোঝাই হল, সৈন্যদল ও মালগাড়ি যাত্রা শুরু করল।

সকাল সাতটায় অভিযানের জন্য প্রস্তুত হয়ে একটি ফরাসী রক্ষীদল চালা-গুলির সামনে এসে দাঁড়াল। পরনে শাকো, হাতে বন্দুক, পিঠে ভ্রমণ-গাঠ্‌রি ও বড় বড় বস্তা। সকলের মুখে ফরাসী ভাষার উত্তেজিত আলোচনা ও খিস্তি খেউড়ের খই ফুটতে লাগল।

চালার মধ্যে সকলেই পোশাক পরে, কোমরবন্ধ এঁটে তৈরি ; শুধু আদেশের অপেক্ষা। কেবল রুগ্ন সৈনিক সকলভ খালি পায়ে আসনে বসে আছে ; পোশাক পরে নি ; তার বিবর্ণ মুখে চোখের চারদিক কালি পড়েছে। মুখটা শুকিয়ে যাওয়ার ফলে চোখ দুটো আরও বড় দেখাচ্ছে ; সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সে বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে আছে ; কিন্তু কেউ তার দিকে নজর দিচ্ছে না দেখে সে নিজের মনেই গোঙাচ্ছে।

পিয়ের কোমরে একটা দড়ি জড়িয়েছে ; জনৈক ফরাসী সৈন্যের দেওয়া চামড়া থেকে কারাতায়েভ তাকে যে জুতো জোড়া বানিয়ে দিয়েছে সেটাই পরেছে। রুগ্ন লোকটির কাছে গিয়ে পিয়ের তার পাশেই বসে পড়ল।

বলল, "জান সকলভ, ওরা সকলে যাচ্ছে না। এখানে ওদের একটা হাসপাতাল আছে। আমাদের চাইতে তুমি হয় তো ভালই থাকবে।"

লোকটি জোরগলায় আর্তনাদ করে উঠল, "হে প্রভু! আঃ, এবার আমি মরব! হে প্রভু!"

উঠে দরজার দিকে যেতে যেতে পিয়ের বলল, "আমি আবার গিয়ে সরাসরি ওদের বলব।"

পিয়ের দরজার কাছে পৌছতেই আগের দিনের সেই পাইপওয়ালা কর্পোরাল দুজন সৈন্য সঙ্গে নিয়ে এসে হাজির হল। কর্পোরাল ও সৈন্যদের পরিধানে পথযাত্রার পোশাক, ভ্রমণ-গাঠ্‌রি ও শাকো. তাতে ধাতুর পাত আঁটা। সেই পোশাকে পরিচিত মুখগুলোই যেন বদলে গেছে।

হুকুমমত কর্পোরাল এসেছে দরজা বন্ধ করতে। বাইরে বের হবার আগে বন্দীদের গুণতি করা হবে।

পিয়ের বলল, "কর্পোরাল, এই রুগ্ন লোকটিকে নিয়ে কি করা যাবে..."

কিন্তু সেইমুহূর্তে কর্পোরালের হাব-ভাব দেখে পিয়েরের মনে সন্দেহ জাগল, এই লোকটি তার পরিচিত সেই কর্পোরাল, না অপরিচিত কেউ। তার উপর, পিয়ের কথা বলতে শুরু করতেই হঠাৎ দুপাশ থেকে দমাদ্দম ঢাক বেজে উঠল। পিয়েরের কথা শুনে কর্পোরাল ভুরু কুঁচকে অর্থহীন কিছু কথা বলে সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিল। চালাটা আধা অন্ধকার হয়ে গেল, আর দুদিকে ঢাকের শব্দের মধ্যে রুগ্ন লোকটির আর্তনাদ ডুবে গেল।

"সেই একই জিনিস!...আবারও!..." পিয়ের আপন মনেই বলে উঠল ; তার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা শিহরণ নেমে গেল। কর্পোরালের পরিবর্তিত মুখ, তার কণ্ঠস্বর, ঢাকের কাঠ-ফাটানো আওয়াজ—সবকিছুর ভিতর দিয়ে সেই রহস্যময় নির্বিকার শক্তিকেই যেন সে নতুন করে চিনতে পারল যা মানুষকে বাধ্য করেছে পরস্পরকে হত্যা করতে—যে শক্তির ফলকেই সে দেখেছে নানা প্রাণদণ্ডের মধ্যে। সে শক্তিকে ভয় করা অথবা তার কাছ থেকে পালাবার চেষ্টা করা, সে শক্তির যন্ত্র হিসাবে যা কাজ করে তাদের

কাছে কাকুতি-মিনতি জানানো—সব বৃথা। এসবই পিয়ের জানে। শুধু অপেক্ষা করা এবং সহ্য করা ছাড়া অন্য গতি নেই। পিয়ের রুগ্ন লোকটির কাছে আর ফিরে গেল না, তার দিকে ফিরেও তাকাল না, ভুরু কুঁচকে কুটীরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল।

দরজা খোলা হল। বন্দীরা ভেড়ার পালের মত গাদাগাদি করে দরজার কাছে ভিড় করল। পিয়ের তাদের ঠেলে জোর করে পথ করে নিয়ে সেই ক্যাপ্টেনটির দিকেই এগিয়ে গেল যে কর্পোরাল হিসাবে তাকে কথা দিয়েছিল যে তার জন্য সব কিছু করতে প্রস্তুত। ক্যাপ্টেনের পরিধানেও অভিযানের পোশাক; তার নিস্পৃহ মুখে সেই একই জিনিস দেখা গেল যা পিয়ের দেখেছে কর্পোরালের কথায় আর ঢাকের বাজনায়।

ভীড়-করা বন্দীদের দিকে তাকিয়ে কঠোরভাবে ভ্রূভঙ্গী করে ক্যাপ্টেন বারবার বলতে লাগল, "এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও!"

সব চেষ্টা বিফল হবে জেনেও পিয়ের তার দিকে এগিয়ে গেল।

যেন পিয়েরকে চিনতেই পারে নি এমনি নির্বিকার দৃষ্টিতে তাকিয়ে অফিসার শুধাল, "কি চাই?"

পিয়ের রুগ্ন লোকটির কথা বলল।

"যেমন করেই হোক সে হেঁটেই যাবে! শয়তান ভরসা!" বলেই ক্যাপ্টেন আর একবার তাড়া লাগাল, "এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও!"

"কিন্তু লোকটি যে মরতে বসেছে," পিয়ের তবু বলল।

সক্রোধে ভুরু কুঁচকে ক্যাপ্টেন চেঁচিয়ে উঠল, "তাহলে তো ভালই হয়…"

"ড্রাম—দা—দা—দাম, দাম-দাম…" ঢাক বেজে উঠল। পিয়ের বুঝল, সেই রহস্যময় শক্তি লোকগুলিকে পুরোপুরি কব্জা করে ফেলেছে; এখন এদের কোন কথা বলা বৃথা।

অফিসার-বন্দীদের সৈনিক-বন্দীদের থেকে আলাদা করে তাদের সামনে যেতে বলা হল। পিয়েরকে নিয়ে অফিসারের সংখ্যা ত্রিশ, আর সৈনিক শ' তিনেক।

অন্য চালা থেকে আগত অফিসাররা সকলেই পিয়েরের অপরিচিত; তাদের পোশাক-পরিচ্ছদও তার চাইতে ভাল। তারা পিয়েরের দিকে, তার জুতোর দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল, যেন সে একজন বিদেশী। তার অনতিদূরেই একজন মোটাসোটা মেজর হেঁটে চলেছে; তার ফ্যাকাসে মুখটা ফোলা-ফোলা, রাগী-রাগী দেখতে; পরনের কাজান ড্রেসিং-গাউনটাকে একটা তোয়ালে দিয়ে বেঁধেছে; স্পষ্টতই অন্য বন্দীরা তাকে বেশ সমীহ করে চলছে। তার এক হাতে তামাকের থলে; সে হাতটা সে ঢুকিয়ে রেখেছে ড্রেসিং-গাউনের ভিতরে; অন্য হাতে ধরে আছে পাইপের গোড়াটা। হাঁফাতে হাঁফাতে আর জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে সে সকলের

সঙ্গেই ঝগড়া করছে; তার ধারণা সকলেই তাকে ধাক্কা মারছে, অথচ ধাক্কাধাক্কি করে এগোবার কোন কারণই তো নেই। অপর একজন ছোটখাট অফিসার সকলের সঙ্গেই কথা বলছে; তাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সারাদিনে কতটা পথ যাওয়া যাবে—এই নিয়ে আলোচনা করছে; ফেল্ট্ বুট ও কমিসারিয়েট ইউনিফর্ম পরা আর একজন অফিসার এদিক-ওদিক ছুটে যাচ্ছে, মস্কোর ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকাচ্ছে, আর যা দেখছে তার বিবরণ শোনাচ্ছে উচ্চকণ্ঠে। একজন তৃতীয় অফিসার কমিসারিয়েট-অফিসারের কথার প্রতিবাদ করল। কথা শুনলেই বোঝা যায় লোকটি পোল। সে বার বার বলতে লাগল যে কমিসারিয়েট-অফিসার স্থানগুলির ভুল বিবরণ শোনাচ্ছে।

মেজর রেগে বলল, "আপনার আপত্তিটা কোথায়? এটা সেণ্ট নিকলাস না সেণ্ট ব্লাসিয়াস তাতে কি যায় আসে? দেখছেন তো সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, বাস। খতম্…আহা, তোমরা ঠেলছ কেন? রাস্তাটা কি যথেষ্ট চওড়া নয়?" বলেই সে পিছনের লোকটির দিকে তাকাল। সে কিন্তু মোটেই ঠেলছিল না।

আগুনে-পোড়া ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকিয়ে বন্দীরা অনেকেই বলতে লাগল, "ওঃ, ওঃ, ওঃ! ওরা কী করেছে? নদীর ওপারে সব কিছু, আর জুবভা ও ক্রেমালন…তাকিয়ে দেখ! অর্ধেকটাও নেই। হ্যাঁ, আমি তো বলেছিলাম—নদীর ওপার পর্যন্ত সব কিছু গেছে, আর সেই কথাই ঠিক।"

মেজর বলে উঠল, "আচ্ছা, জানই তো সব পুড়ে গেছে, তাহলে সেকথা বলে আর লাভটা কি?"

খামভ্‌নিকির (এ অঞ্চলটা পোড়ে নি) একটা গির্জার কাছ দিয়ে যাবার সময় বন্দীরা সকলেই সহসা একপাশে সরে গেল; সকলের কণ্ঠে ফুটে উঠল ত্রাশ ও বিরক্তির চীৎকার।

"আঃ, শয়তানের দল! নাস্তিকের দল!, হ্যাঁ; মৃত, মৃত, লোকটা নির্ঘাৎ মৃত…সারা গায়ে কি যেন মাখানো!"

যে বস্তুটি দেখে সকলে চীৎকার করছে পিয়ের গির্জার সেই দিকটাতে এগিয়ে গেল। অস্পষ্টভাবে দেখতে পেল, কে যেন গির্জার বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে রয়েছে। একটা মানুষের মৃতদেহ; বেড়ার গায়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছে; মুখে ঝুল-কালি মাখিয়ে দিয়েছে।

"এগিয়ে চল! কী শয়তান…এগিয়ে চল! ত্রিশ হাজার শয়তান!…" রক্ষীবাহিনীর লোকরা শাপ-শাপান্ত করতে লাগল; আর ফরাসী সৈন্যরা নতুন উদ্যমে সেই সব বন্দীদের তলোয়ারের খোঁচায় এগিয়ে নিয়ে চলল যারা দাঁড়িয়ে মৃতদেহটার দিকে তাকিয়ে ছিল।

অধ্যায়—১৪

খামভ্‌নিকি অঞ্চলের এড়ো পথ ধরে বন্দীরা এগিয়ে চলেছে। তাদের পিছনে চলেছে শুধু রক্ষীবাহিনীর লোক এবং তাদের যানবাহন ও মালগাড়ি। কিন্তু সরবরাহ-ভাণ্ডারের কাছে পৌছেই তারা মিশে গেল প্রকাণ্ড একসারি বারুদবাহী গাড়ি ও বেসরকারী যানবাহনের জটলার মধ্যে।

যারা সামনে রয়েছে তাদের রাস্তা পার হবার অপেক্ষায় বন্দীরা সেতুর মুখে থেমে গেল। সেতুর উপর থেকে তারা দেখল, সামনে ও পিছনে মাল-গাড়ির সীমাহীন ভিড়। ডানদিকে যেখানে কালুগা রোড নেস্‌কুচ্‌নির কাছে মোড় নিয়েছে সেখানে সেনাদল ও গাড়ির সীমাহীন সারি বহুদূর পর্যন্ত চোখে পড়ছে। এই সব সৈন্যই বিউহারনায়েস-এর দলের; তারাই যাত্রা করেছে অন্য সকলের আগে। পিছনে নদীর তীরবরাবর এবং "পাথর সেতু"র উপরে রয়েছে নে-র সেনাদল ও যানবাহন

বন্দীরা আছে দাভুত-এর সেনাদলের হেপাজতে। তারা ক্রিমীয় সেতু পার হচ্ছে; অনেকে ইতিমধ্যেই ভিড় থেকে বেরিয়ে কালুগা রোডে পড়েছে।

ক্রিমীয় সেতু পার হয়ে বন্দীরা কয়েক পা এগিয়ে থামল; তারপর আবার এগিয়ে চলল। চারদিক থেকে যানবাহন ও সৈন্যরা এসে ক্রমেই ভিড় বাড়াতে লাগল। কালুগা রোড থেকে সেতু পর্যন্ত কয়েক শ' পা এগোতেই তাদের একঘণ্টার বেশী সময় লাগল। কালুগা রোড ও ট্রান্সমস্ক্‌ভার সংযোগে পৌছে ভিড়ের চাপে বন্দীদের কয়েক ঘণ্টা সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে হল। সমুদ্র-গর্জনের মত চারদিক থেকে শোনা যেতে লাগল চাকার ঘর্ঘর, পায়ের শব্দ, আর রাগারাগি ও গালাগালির অবিশ্রাম চীৎকার। একটা পোড়া বাড়িতে হেলান দিয়ে পিয়ের সেই শব্দ শুনছে; তার কল্পনায় সেই শব্দের সঙ্গে এসে মিশেছে ঢাকের শব্দ।

পিয়ের যে আধ-পোড়া বাড়িটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কয়েকজন অফিসার-বন্দী পরিস্থিতিটা ভাল করে দেখবার জন্য সেই বাড়িরই প্রাচীরের উপর উঠে গেল।

তারা চেঁচিয়ে বলতে লাগল, "কী ভিড়! ভিড়ের দিকে তাকাও!···কামানের উপরে পর্যন্ত মালপত্র বোঝাই করেছে। দেখ, দেখ, বদমাসরা কত জিনিস লুট করেছে···ঐ দেখ। গাড়িতে লোকটার পিছনে কি রয়েছে।···আরে, হা ভগবান, ওগুলো দেবমূর্তির ফ্রেম!···ওঃ, রাস্কেলের দল।···দেখ, ওই লোকটা কত জিনিস কাঁধে নিয়েছে; হাঁটতে পারছে না। হায় প্রভু, ওরা যে গাড়ির চাকাগুলো পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে।···আর ট্রাংকের উপর বসে-থাকা ওই লোকগুলোকে দেখ···হায় ভগবান। ওরা যে লড়াই করছে···"

"ঠিক হয়েছে, লাগাও নাকের উপর একঘুষি—ঠিক নাকের উপর। এ-ভাবে চললে আমরা তো সন্ধ্যার আগে বের হতেই পারব না। দেখ, ওদিকে দেখ···আরে, ওটা নিশ্চয় নেপোলিয়নের নিজের। কী সব ঘোড়া! আর মুকুটসহ যুক্তাক্ষর-চিত্রগুলি। সবটাই যেন একটা চলমান বাড়ির মত।···ঐ একটা লোকের বস্তাটা পড়ে গেল, আর সেটা খুঁজে পাচ্ছে না। আবার লড়াই···শিশু-কোলে একটা মেয়ে মানুষ; দেখতে মন্দ নয়! হ্যাঁ, এভাবে ছাড়া এগোবার পথ পাবে না···তাকিয়ে দেখ, ভিড়ের যেন শেষ নেই। রুশ কুমারীরা···হা ঈশ্বর, তারাও এসেছে! গাড়ির মধ্যে—দেখ, কেমন আরাম করে তারা বসেছে।"

খাম্‌ভনিকির গির্জার কাছে যেমন ঘটেছিল তেমনই কৌতুহলের ঢেউয়ের টানে বন্দীরা আবারও সামনের দিকে এগিয়ে গেল; চেহারাটা উঁচু-লম্বা হওয়ায় পিয়ের সকলের মাথার উপর দিয়েই তাদের এই কৌতুহলের কারণটা লক্ষ্য করতে পারল। বারুদের গাড়িগুলোর মাঝখানের তিনটে গাড়িতে গাদাগাদি করে বসে আছে কতকগুলি মেয়ে। চোয়াড়ে মুখ, পরনে জল্‌জ্বলে রঙের পোশাক। কর্কশ স্বরে চীৎকার করে তারা কি যেন বলছে।

সেই রহস্যময় শক্তিকে চিনবার মুহূর্ত থেকেই পিয়েরের কাছে কোন কিছুই আর বিচিত্র বা ভয়ংকর বলে মনে হচ্ছে না: কৌতুকভরে মুখে ঝুল-কালি মাখানো একটা মৃতদেহ নয়, এই চলমান মেয়েগুলো নয়, বা মস্কোর ধ্বংসাবশেষও নয়। এখন যা কিছু চোখে পড়ছে কিছুই তার মনের উপর দাগ কাটতে পারছে না—যেন একটা কঠোর সংগ্রামের প্রস্তুতির দরুণ তার মনকে দুর্বল করে দিতে পারে এমন কোন কিছুকেই সে আমল দিচ্ছে না।

মেয়েদের গাড়িটা চলে গেল। তার পিছন পিছন এল আরও গাড়ি, আরও সৈন্য, আরও মালগাড়ি, আরও সৈন্য, কামানের গাড়ি, সৈন্য, বারুদের গাড়ি, আরও সৈন্য, আর মাঝে মাঝেই মেয়ের দল।

পিয়ের কোন ব্যক্তিবিশেষকেই দেখছে না, দেখছে শুধু তাদের গতিবিধি।

মনে হচ্ছে, কোন অদৃশ্য শক্তি বুঝি এই সব লোকজন ও ঘোড়াকে টেনে নিয়ে চলেছে। পিয়েরের চোখের সামনে যারা নানা পথ ধরে ধেয়ে আসছে তাদের সকলেরই একই লক্ষ্য—তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাওয়া: সকলেই ধাক্কা-ধাক্কি করছে, রাগ করছে, মারামারি করছে, তাদের সাদা দাঁতগুলি ঝিকমিক করছে, ভুরু কুঁচকে উঠছে, চারদিক থেকে একই ধরনের গালাগালি ভেসে আসছে, আর সকলের মুখেই ফুটে উঠেছে সেই একই কঠোর, নিষ্ঠুর ভাব যা সকালেই পিয়ের দেখেছে ঢাকের শব্দের সঙ্গে কর্পোরালের মুখে।

সন্ধ্যা নাগাদ রক্ষীদলের অধিনায়কের চীৎকার, হাঁকডাক ও আপ্রাণ চেষ্টায় চারদিক থেকে চিড়ে-চ্যাপ্টা হওয়া বন্দীরা কোন রকমে কালুগা রোডে

উঠে হাঁপ ছাড়ল।

বিশ্রাম না নিয়েই তারা দ্রুত হাঁটতে লাগল; থামল একেবারে সূর্যাস্তের মুখে। মালপত্রের গাড়িগুলোও পৌঁছে গেল; সকলে রাতের বিশ্রামের আয়োজন করতে লাগল। সকলেই ক্রুদ্ধ, অসন্তুষ্ট। অনেকক্ষণ পর্যন্ত চারদিক থেকে শোনা যেতে লাগল ঈশ্বরের দোহাই, ক্রুদ্ধ চীৎকার ও মারামারির শব্দ।

এই বিশ্রামের কালে রক্ষীদলের লোকরা বন্দীদের প্রতি আগের চাইতে অনেক বেশী খারাপ ব্যবহার করতে লাগল। এখানেই প্রথম বন্দীদের খাদ্য-রেশন হিসাবে দেওয়া হল ঘোড়ার মাংস।

অফিসার থেকে শুরু করে নিম্নতম সৈনিক পর্যন্ত সকলেই প্রতিটি বন্দীর উপর যেন ব্যক্তিগত আক্রোশ মেটাতে লাগল; অথচ আগে তাদের ব্যবহার ছিল কত বন্ধুত্বপূর্ণ।

এই আক্রোশ আরও বেড়ে গেল যখন বন্দীদের নাম ডাকার পরে দেখা গেল, যে রুশ সৈনিকটি শূল বেদনার ভান করছিল মস্কো ছাড়বার গোলমালের সুযোগে সে পালিয়েছে। পিয়ের দেখল, রাস্তা থেকে কিছুটা দূরে সরে যাওয়ার জন্য জনৈক ফরাসী একটি রুশ সৈনিককে নির্মমভাবে প্রহার করছে, আর রুশ সৈনিকটির পলায়নের জন্য একজন নন-কমিশন্ড্ অফিসারকে দায়ী করে তার বন্ধু সেই ক্যাপ্টেনটি তাকে কোর্ট-মার্শাল করবে বলে শাসাচ্ছে। নন-কমিশন্ড্ অফিসারটি যখন যুক্তি দেখাল যে সেই বন্ধুটি অসুস্থ থাকায় হাঁটতে পারছিল না, তখন অফিসারটি জবাবে বলল, যারা পিছিয়ে পড়বে তাদের গুলি করে মারবার হুকুম তো দেওয়াই ছিল। পিয়েরের মনে হল, যে মারাত্মক শক্তি প্রাণদণ্ডবিধানের সময় তাকে একেবারে বিধ্বস্ত করে ফেলেছিল, কিন্তু বন্দী অবস্থায় থাকার সময় যার কথা সে ভুলেই গিয়েছিল, সেই শক্তি আবার তার অস্তিত্বের উপর চেপে বসেছে। সে শক্তি ভয়ংকর, কিন্তু পিয়ের অন্তরে অন্তরে অনুভব করল, সেই মারাত্মক শক্তি তাকে ধ্বংস করতে যত চেষ্টাই করুক, তার অন্তরের মধ্যে ধীরে ধীরে জেগে উঠছে, শক্তিশালী হয়ে উঠছে জীবনের এক নতুন শক্তি।

ঘোড়ার মাংস ও যবের ঝোল সহযোগ নৈশাহার সেরে সে বন্ধুদের সঙ্গে গল্পগুজব করতে লাগল।

তারা মস্কোতে যা দেখেছে, অথবা ফরাসীদের কাছ থেকে যে রূঢ় ব্যবহার তারা পাচ্ছে, অথবা তাদের গুলি করে মারবার যে হুকুম জারী করা হয়েছে, পিয়ের বা অন্য কেউই সে সম্পর্কে কোন কথাই বলল না। যেন তাদের অবস্থার অবনতির প্রতিক্রিয়া হিসাবেই তারা বিশেষভাবে উজ্জীবিত ও আনন্দিত হয়ে উঠেছে। অভিযান-কালে যেসব মজার দৃশ্য তারা দেখেছে তারই স্মৃতি-চারণায় তারা সময় কাটাতে লাগল, বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে কোন

কথাই বলল না।

সূর্য অনেকক্ষণ অস্ত গেছে। আকাশে অনেক তারা জল্ জল্ করছে। পূর্ণ চাঁদের উদয়ে দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে অগ্নিকাণ্ডের মত একটা লাল আভা। প্রকাণ্ড লাল গোলকটি ধূসর পরিবেশের মধ্যে বিচিত্র ভঙ্গীতে দুলছে। ক্রমে তার রং হাল্কা হয়ে এল। সন্ধ্যার অবসান হয়েছে, কিন্তু এখনও রাত আসে নি। পিয়ের উঠে পড়ল ; নতুন সঙ্গীদের ছেড়ে শিবির-আগুনগুলো পার হয়ে রাস্তার অপর পাশে চলে গেল ; সে শুনেছে, সাধারণ সৈনিকদের সেখানেই রাখা হয়েছে। সে তাদের সঙ্গে কথা বলবে। পথে একটি ফরাসী শান্ত্রী তাকে থামাল, ফিরে যেতে হুকুম করল।

পিয়ের ফিরে গেল ; শিবির-আগুনের পাশে সঙ্গীদের কাছে নয়, ফিরে গেল একটা গাড়ির কাছে ; সেখানে কেউ নেই। গাড়ির চাকার পাশে দুই পা ভেঙে মাথাটা নুইয়ে ভিজে মাটির উপর বসে অনেকক্ষণ পর্যন্ত নিজের চিন্তায়ই ডুবে রইল। হঠাৎ সে উচ্চকণ্ঠে হো-হো করে এমনভাবে হেসে উঠল যে আশপাশের সকলেই সবিস্ময়ে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করল, এই বিচিত্র, একক হাসির অর্থ কি।

"হা-হা-হা!" পিয়ের হাসছে। তারপর উচ্চকণ্ঠে নিজেকেই বলল, "সৈনিকটি আমাকে যেতে দিল না। তারা আমাকে ধরে আটক করেছে। আমাকে বন্দী করেছে। কি, আমাকে? আমাকে? আমার অমর আত্মাকে? হা-হা-হা! হা-হা-হা!..." হাসতে হাসতে তার চোখে জল এসে গেল।

একজন উঠে দেখতে এল, এই বিচিত্র মানুষটি নিজে-নিজেই হাসছে কেন? হাসি থামিয়ে পিয়ের উঠে পড়ল, কৌতূহলী লোকটার কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে চারদিকে তাকাল।

সীমাহীন প্রকাণ্ড অস্থায়ী আস্তানাটা এতক্ষণ শিবির-আগুনের ফট্-ফট্ শব্দে ও নানা জনের কণ্ঠস্বরে মুখরিত ছিল ; এখন সব নিস্তব্ধ ; আগুনের লাল আভা ক্রমেই স্তিমিত হয়ে আসছে। মাথার উপরে আকাশের গায়ে ভরা চাঁদটা ঝুলে আছে। আগে চোখে না পড়লেও দূরের বন ও প্রান্তর এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আরও দূরে, সব বন ও প্রান্তর পেরিয়ে, উজ্জ্বল দোদুল্যমান অসীম দূরত্ব যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। পিয়ের বহুদূরবর্তী আকাশ ও ঝিকিমিকি তারাদের দিকে তাকাল। ভাবল, "আর এসবই তো আমি, এসবই তো আছে আমার অন্তরের মধ্যে, এই সব কিছুকে নিয়েই তো আমি। অথচ এই সবকিছুকে ধরে এনে ওরা কাঠের বেড়া দেওয়া চালাঘরের মধ্যে বন্দী করেছে!" সে হাসল ; তারপর উঠে গিয়ে সঙ্গীদের পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

অধ্যায়—১৫

অক্টোবরের গোড়ায় নেপোলিয়নের কাছ থেকে শান্তির প্রস্তাবের চিঠি নিয়ে আর একজন দূত এল কুতুজভের কাছে। যদিও নেপোলিয়ন তখন কুতুজভের কাছ থেকে অনতিদূরে কালুগা রোডেই ছিল, তবু সে চিঠিতে মস্কোর তারিখ দেওয়া। লরিস্তন আগে যে চিঠি এনেছিল তার যে জবাব কুতুজভ দিয়েছিল, এবারেও সেই একই জবাব দিয়ে সে জানিয়ে দিল, শান্তি স্থাপনের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

দরখভের যে গেরিলা বাহিনী তারুতিনোর বাঁ দিকে কর্মরত ছিল সেখান থেকে অচিরেই খবর এল যে ব্রুসিয়ের-এর এক ডিভিশন সৈন্যকে ফর্‌মিন্‌স্ক-এ দেখা গেছে, আর যেহেতু তারা মূল ফরাসী বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, তাই অনায়াসেই তাদের ধ্বংস করা যাবে। সৈনিক ও অফিসাররা পুনরায় যুদ্ধের দাবী জানাল। তারুতিনোর অনায়াস জয়লাভের স্মৃতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে জেনারেলরাও দরখভের প্রস্তাবমত কাজ করতে কুতুজভের উপর চাপ সৃষ্টি করল। কোন রকম আক্রমণের দরকার আছে বলে কুতুজভ মনে করল না। ফলে অনিবার্যভাবেই একটা সমঝোতা হল: ব্রুসিয়েরকে আক্রমণ করতে একটা ছোটখাট সেনাদলকে ফর্‌মিন্‌স্ক্-এ পাঠানো হল।

পরবর্তীকালে এই ছোট কাজটাই অত্যন্ত কষ্টকর ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছিল; আর একটা বিচিত্র যোগাযোগের ফলে এই কাজের ভার পড়ল দখ্‌তুরভ্-এর উপর—এ লোকটি সেই বিনীত ছোটখাট দখ্‌তুরভ্ যার সম্পর্কে কেউ কখনও লেখে নি যে সে যুদ্ধের পরিকল্পনা রচনা করেছে, রেজি-মেণ্টের আগে আগে ছুটে গিয়েছে, কামানশ্রেণীর উপর ক্রুশ ছুঁড়ে দিয়েছে, ইত্যাদি, আর যার সম্পর্কে এই কথাই ভাবা হয়েছে ও বলা হয়েছে যে সে অস্থিরমতি ও স্বল্পবুদ্ধি—অথচ অস্তারলিজ থেকে শুরু করে ১৮:৩ সাল পর্যন্ত গোটা রুশ-ফরাসী যুদ্ধে আমরা তাকেই দেখেছি যে কোন সংকট-কালে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে। অস্তারলিজে সকলেই যখন পালাচ্ছিল আর মরছিল, পশ্চাৎ-রক্ষীদলের একজন জেনারেলও যখন উপস্থিত ছিল না, তখন একমাত্র সেই শেষ পর্যন্ত অগেজ্‌দ্ বাঁধে ছিল, রেজিমেণ্ট পরিচালনা করছিল, এবং সাধ্যমত সব কিছু রক্ষা করছিল। জ্বরে আক্রান্ত হয়েও নেপোলিয়নের গোটা বাহিনীর আক্রমণ থেকে স্মোলেন্‌স্ক শহরকে রক্ষা করতে মাত্র বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে সে সেখানে গিয়েছিল। স্মোলেন্‌স্ক-এর মলাখভ ফটকে জ্বরের ঘোরে সবে একটু তন্দ্রা এসেছিল এমন সময় শহরের উপর বোমাবর্ষণের শব্দে জেগে উঠে সে সারাটা দিন স্মোলেন্‌স্ক শহরকে রক্ষা করেছিল। বরদিনোর যুদ্ধে যখন ব্যাগ্রেশনের মৃত্যু হল, বাম ব্যূহের দশ ভাগের ন' ভাগ সৈন্য নিহত হল, এবং ফরাসী গোলন্দাজ বাহিনী সর্বশক্তি নিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে

পড়ল, তখন এই অস্থিরমতি, স্বল্পবুদ্ধি দখ্‌তুরভকেই সেখানে পাঠানো হয়েছিল—প্রথমে অন্য কাউকে সেখানে পাঠিয়ে কুতুজভ যে ভুলটা করেছিল তাড়াতাড়ি সে ভুলের সংশোধন করা হয়েছিল। শান্তশিষ্ট, ছোটখাট দখ্‌তুরভ সেখানেই ঘোড়া ছুটিয়ে দিল, আর রুশ বাহিনীর শ্রেষ্ঠ গৌরবের প্রতিভূ হয়ে দেখা দিল বরদিনো। কাব্যে ও গন্থে অনেক মহাবীরের বর্ণনাই আমাদের শোনানো হয়েছে, কিন্তু দখ্‌তুরভ সম্পর্কে একটি কথাও কেউ বলে নি।

আবার এই দখ্‌তুরভকেই পাঠানো হল ফর্‌মিন্‌স্ক্‌-এ, আর সেখান থেকে মালো—ইয়ারোস্লাভেৎস্‌-এ; সেখানেই হল ফরাসীদের সঙ্গে শেষ যুদ্ধ, আর সেখান থেকেই ফরাসী বাহিনীতে ভাঙনের সূত্রপাত ঘটল। অথচ অভিযানের সেই সময়কার অনেক প্রতিভাধর ও বীরের কথা আমাদের শোনানো হলেও দখ্‌তুরভ সম্পর্কে প্রায় কিছুই বলা হল না, অথবা যৎকিঞ্চিৎ বলা হলেও সেটা যেন নেহাৎই একটা দায় সারা কাজের মত করা হল। আর দখ্‌তুরভ সম্পর্কে এই নীরবতাই তার কৃতিত্বের সব চাইতে বড় প্রমাণ।

১০ই অক্টোবর তারিখে দখ্‌তুরভ ফর্‌মিন্‌স্ক-এর অর্ধেক পথ পার হয়ে অরিস্তভ গ্রামে থামল এবং প্রাপ্ত আদেশমত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। ঠিক সেই সময় গোটা ফরাসী বাহিনী যুদ্ধ করবার অভিপ্রায় নিয়ে মুরাত্‌-এর ঘাঁটিতে পৌঁছেই হঠাৎ বিনা কারণে বাঁ দিকে মোড় নিয়ে নব কালুগা রোডে পড়ে ফর্‌মিন্‌স্ক্‌-এ ঢুকতে লাগল; সেখানে তখন ছিল শুধুমাত্র ক্রুসিয়ের। সেই সময় দখ্‌তুরভের অধীনে ছিল দরখভের সেনাদল ছাড়াও ফিনার ও সেস্‌লাভিন-এর দুটি ছোট গোরিলা বাহিনী।

১১ই অক্টোবর সন্ধ্যায় সেস্‌লাভিন একজন ফরাসী রক্ষী সৈন্যকে গ্রেপ্তার করে অরিস্তভ প্রধান ঘাঁটিতে এসে হাজির হল। বন্দীটি বলল, রুশ বাহিনীর অগ্রবর্তী অংশটাই সেদিন ফর্‌মিন্‌স্ক্‌-এ ঢুকেছে. নেপোলিয়ন তাদের সঙ্গেই আছে, আর চারদিন আগেই গোটা বাহিনী মস্কো ছেড়ে চলে এসেছে। সেইদিন সন্ধ্যায়ই জনৈক পারিবারিক ভূমিদাস বরভস্ক্‌ থেকে এসে জানাল, একটা প্রকাণ্ড বাহিনীকে সে শহরে ঢুকতে দেখেছে। দখ্‌তুরভের দলের কয়েকজন কসাকও জানাল, ফরাসী রক্ষীবাহিনীকে তারা বরভ্‌স্ক-এর পথে যেতে দেখেছে। এইসব সংবাদ থেকে স্পষ্টই বোঝা গেল, যেখানে তারা আশা করেছিল যে মাত্র একটি ডিভিশনের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে, সেখানে এখন গোটা ফরাসী বাহিনীই একটা অপ্রত্যাশিত পথে মস্কো থেকে এগিয়ে আসছে—অর্থাৎ তারা আসছে কালুগা রোড ধরে। এ অবস্থায় কি করা উচিত সেটা ঠিক বুঝতে না পারার জন্য তখনই সংঘর্ষে লিপ্ত হবার ইচ্ছা দখ্‌তুরভের ছিল না। তাকে হুকুম দেওয়া হয়েছে ফর্‌মিন্‌স্ক্‌ আক্রমণ করতে হবে। কিন্তু তখন তো সেখানে ছিল শুধুমাত্র ক্রুসিয়ের, কিন্তু এখন যে

গোটা ফরাসী বাহিনী সেখানে হাজির। এর্মলভ নিজের বিচার-বুদ্ধি অনুসারে কাজ করতে চাইল, কিন্তু দখ্‌তুরভ জানাল, তার আগে কুতুজভের নির্দেশ অবশ্যই পেতে হবে। সুতরাং স্থির হল, তার কাছে একটা চিঠি পাঠানো হবে।

সেকাজের জন্য বল্‌খভিতিনভ নামক একজন দক্ষ অফিসারকে বেছে নেওয়া হল ; একটা লিখিত প্রতিবেদন পেশ করা ছাড়াও সে মুখে মুখে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলবে। মধ্যরাতে চিঠি ও মৌখিক নির্দেশ নিয়ে বল্‌খভি-তিনভ বাড়তি ঘোড়াসহ একজন কসাককে সঙ্গে নিয়ে প্রধান ঘাঁটির উদ্দেশ্যে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

অধ্যায়—১৬

হেমন্তের আতপ্ত অন্ধকার রাত। চারদিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে। দু'বার ঘোড়া বদল করে আঠালো কর্দমাক্ত পথে দেড় ঘণ্টায় বিশ মাইল ঘোড়া ছুটিয়ে রাত একটায় বল্‌খভিতিনভ লিতাশোভ্‌কায় পৌছল। একটা কুটিরের কঞ্চির বেড়ার গায়ে "জেনারেল স্টাফ" সাইনবোর্ড ঝুলতে দেখে সেখানেই ঘোড়া থেকে নেমে হাতের লাগামটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে অন্ধকার পথে পা বাড়াল।

একটি লোক জেগে উঠে অন্ধকার পথেই সশব্দে নাক ঝাড়ছিল ; তাকে দেখেই বলল, "কর্তব্যরত জেনারেলের কাছে আমাকে নিয়ে চল, তুড়ন্ত! খুব জরুরী।"

আর্দালিটি ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, "সন্ধ্যা থেকে তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ; আজ তিন রাত তিনি ঘুমোন নি। আপনি আগে ক্যাপ্টেনকে ডেকে তুলুন।"

"কিন্তু ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আমি জেনারেল দখ্‌তুরভের কাছ থেকে আসছি," অন্ধকারেই খোলা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বল্‌খভিতিনভ বলল।

আর্দালি আগেই ঘরে ঢুকে কাকে যেন ডাকতে লাগল।

"ইয়োর অনার, ইয়োর অনার! একজন সংবাদবাহক।"

"কি? ব্যাপার কি? কার কাছ থেকে এসেছে?" একটা ঘুমজড়িত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

অন্ধকারে বক্তাকে দেখতে না পেলেও কথা শুনেই সে যে কনভ্‌নিৎসিন নয় সেটা অনুমান করে বল্‌খভিতিনভ বলল, "দখতুরভ এবং আলেক্সি পেত্রভিচের কথা থেকে।"

যে লোকটকে ডেকে তোলা হল সে হাই তুলে শরীরটা টান-টান করল।

কি যেন খুঁজতে বলল, "তাকে এখন জাগাতে চাই না। তিনি খুব অসুস্থ। হয় তো খবরটা গুজব মাত্র।"

"এই দেখুন চিঠি," বল্‌খভিতিনভ বলল। "আমার উপর হুকুম আছে, চিঠিটা এক্ষুণি দিতে হবে কর্তব্যরত জেনারেলের হাতে।"

"এক মিনিট অপেক্ষা করুন। মোমবাতিটা জ্বালাই। ব্যাটা রাস্কেল কোথাকার, জিনিসপত্র সব কোথায় যে লুকিয়ে রাখে ?" শরীর টান-টান করে লোকটি আর্দালিকে বলল। (লোকটি কনভ্‌নিৎসিন-এর অ্যাডজুটাণ্ট শ্‌চেরবিনিন) "পেয়েছি, পেয়েছি।"

আর্দালি একটা দেশলাই ঠুকতে লাগল ; শ্‌চেরবিনিন মোমবাতিদানের উপর কি যেন হাতড়াতে লাগল।

"আঃ, যত সব জানোয়ার!" লোকটি বিরক্ত গলায় বলল।

শ্‌চেরবিনিনের হাতের মোমবাতির আলোয় বল্‌খভিতিনভ তার যৌবন-দীপ্ত মুখটা দেখতে পেল। আর একটি ঘুমন্ত মানুষের মুখও তার চোখে পড়ল। সে কনভনিৎসিন।

মোমবাতির আলোয় শ্‌চেরবিনিন পত্রবাহককে দেখতে পেল। তার সর্বাঙ্গ কাদায় মাখামাখি ; সেই আস্তিন দিয়ে মুখ মোছার ফলে মুখভর্তিও কাদা লেগেছে।

খামটা নিয়ে শ্‌চেরবিনিন শুধাল, "প্রতিবেদন কে পাঠিয়েছে ?"

বল্‌খভিতিনভ বলল, "খবরটা নির্ভরযোগ্য। কয়েদীরা, কসাকরা ও স্কাউটরা সকলে একই কথা বলেছে।

গ্রেট-কোটে শরীর ঢেকে নৈশ টুপি মাথায় যে লোকটি শুয়েছিল তার কাছে যেতে যেতে শ্‌চেরবিনিন বলল, "কিছু করার নেই, তাকে ঘুম থেকে জাগাতেই হবে। পিতর পেত্রভিচ! (কনভ্‌নিৎসিন কিন্তু নড়ল না।) জেনারেল স্টাফ-এর চিঠি!" সে জানে এই কথা ক'টি নিশ্চয় তার ঘুম ভাঙিয়ে দেবে।

বস্তুত সঙ্গে সঙ্গেই নৈশ টুপি পরা মাথাটা জেগে উঠল। কনভ্‌নিৎসিনের মুখটা সুন্দর ও কঠিন ; গাল দুটো জ্বরে লাল হয়ে উঠেছে। মুহূর্তের জন্য বর্তমান থেকে বহুদূরের একটি স্বপ্নময় ভাব সে মুখে দেখা গেল, কিন্তু পরক্ষণেই সে চমকে উঠল, মুখের উপর নেমে এল তার স্বাভাবিক শান্ত, কঠিন ভাব।

আলোর দিকে মিট মিট করে তাকিয়ে সে ধীরে সুস্থে জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা। ব্যাপারটা কি ?"

অফিসারের বক্তব্য শুনতে শুনতেই কনভ্‌নিৎসিন সিল ভেঙে চিঠিটা পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে পশমী মোজা-পরা পা দুটো মাটির মেঝেতে নামিয়ে সে বুটজোড়া পরতে শুরু করল। মাথার টুপিটা খুলে চুলটাকে কপালের উপর আঁচড়ে আবার টুপিটা পরে নিল।

"আপনি খুব দ্রুত এসেছেন তো? চলুন, হিজ হাইনেসের কাছে যাওয়া যাক।"

কনভ্‌নিৎসিন সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরেছে যে আনীত সংবাদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং মোটেই সময় নষ্ট করা চলবে না। সংবাদ ভাল কি মন্দ তা সে ভাবল না। সেকথা জিজ্ঞাসাও করল না। সে ব্যাপারে তার কোন আগ্রহ নেই। যুদ্ধের ব্যাপারটাকে সে বুদ্ধি বা যুক্তি দিয়ে বিচার করে না, বিচার করে অন্য কিছু দিয়ে। তার মনে একটা গভীর অব্যক্ত দৃঢ় ধারণা আছে যে শেষ পর্যন্ত সবই ভালয় ভালয় শেষ হবে, কিন্তু প্রত্যেককে নিজ নিজ কর্তব্য করে যেতে হবে। আর তাই সে করে, সর্বশক্তি নিয়োগ করে কর্তব্য পালন করে। বার্কলে, রায়েভ্‌স্কি, এর্মলভ, প্লাতভ ও মিলোরা দখ্‌তুরভদের মত ৮১২ সালের তথাকথিত মহাবীরদের তালিকায় দখ্‌তুরভের মত পিতর পেত্রভিচ কনভ্‌নিৎসিনের নামটাও মনে হয় সৌজন্যের খাতিরেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দখ্‌তুরভের মতই সীমিত ক্ষমতা ও তথ্যের মানুষ বলেই তারও খ্যাতি ছিল; দখ্‌তুরভের মতই সেও কখনও যুদ্ধের পরিকল্পনা রচনা করে নি, কিন্তু যেখানেই সংকট সেখানেই তাকে সব সময় দেখা গেছে। কর্তব্যরত জেনারেল হিসাবে নিযুক্ত হবার পর থেকে সে সর্বদাই দরজা খুলে ঘুমোয়; তার হুকুম রয়েছে—প্রতিটি সংবাদবাহককে যেন তাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলবার অনুমতি দেওয়া হয়। যুদ্ধের সময় সে সর্বদাই গোলাগুলির মধ্যে ছুটে যেত; তাই কুতুজভ সেজন্য তাকে তিরস্কার করেছে, তাকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাতে ভয় পেয়েছে। দখ্‌তরভের মতই সেও তেমনি একটা কাঁটাওয়ালা চাকা যা কোন শব্দ করে না বা যার প্রতি কারও নজর পড়ে না, অথচ যে চাকাটা গোটা যন্ত্রের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

কুটির থেকে বেরিয়ে স্যাঁতসেতে অন্ধকার রাতের মধ্যে এসে কনভ্‌নিৎসিন ভ্রূকুটা কুঁচকাল—তার একটা কারণ মাথার যন্ত্রণাটা বেড়ে গেছে, আর অপর কারণ একটা অপ্রীতিকর চিন্তা ঢুকেছে তার মাথায়: এই সংবাদটা পাবার পরে এখানকার সব প্রভাবশালী লোকদের, এবং বিশেষ করে বেনিংসেনের বাসাটা কিভাবে নড়ে উঠবে; তারুতিনোর পর থেকে কুতুজভের সঙ্গে তাদের সম্পর্কটা তো একেবারে আদায়-কাঁচকলায়। এই চিন্তাটাই তার কাছে অপ্রীতিকর, যদিও সে জানে যে এ ব্যাপারে কিছুই করার নেই।

বাস্তবক্ষেত্রেও সে গিয়ে তোল্‌কে সংবাদটা জানাতেই সে তার সঙ্গে একই ঘরে বসবাসকারী জেনারেলটি যুদ্ধ সম্পর্কে তার পরিকল্পনার কথা বোঝাতে লাগল। ক্লান্ত নীরবতার সঙ্গে অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার কথাবার্তা শুনবার পরে কনভ্‌নিৎসিন তাকে স্মরণ করিয়ে দিল যে অবিলম্বে তাদের হিজ হাইনেসের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

অধ্যায়—১৭

সব বুড়ো মানুষের মতই কুতুজভও রাতে বেশীক্ষণ ঘুমতে পারে না। দিনের বেলায় প্রায়ই অপ্রত্যাশিতভাবে ঘুমিয়ে পড়ে, কিন্তু রাতে পোশাক না ছেড়ে বিছানায় শুয়ে সাধারণত জেগে থেকে নানা কথা ভাবে।

এখনও ফোলা-ফোলা হাতের উপর ক্ষতচিহ্নিত ভারী মাথাটা রেখে সে বিছানায় শুয়ে আছে; গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে এক চোখে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে।

সম্রাটের সঙ্গে অধিক যোগাযোগের ফলে তার উপর বেনিংসেনের প্রভাবটাই অন্য সকলের চাইতে বেশী হওয়ায় বেনিংসেন ইদানীং কুতুজভকে এড়িয়েই চলে; ফলে তার এবং তার সেনাদলের পক্ষে অকারণ আক্রমণাত্মক কাজকর্মে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনাটা কম হওয়ায় কুতুজভ বেশ স্বস্তিও অনুভব করছে। তারুতিনোর যুদ্ধ ও তার আগের দিনের শিক্ষার কথা কুতুজভ বেশ বেদনার সঙ্গেই স্মরণ করে থাকে; তার ধারণা সে শিক্ষার প্রভাব অন্যদের উপরেও পড়েছে।

কুতুজভ ভাবে: "তাদের বোঝা দরকার যে আক্রমণ করলে আমাদের শুধু ক্ষতিই হবে। ধৈর্য আর সময়ই হচ্ছে আমার যোদ্ধা, আমার বিজয়ী বীর।" সে জানে, কাঁচা থাকতে আপেল তোলা উচিত নয়। যখন পাকবে তখন ওটা আপনি পড়বে; কাঁচা অবস্থায় পাড়লে আপেলটা নষ্ট হবে, গাছের ক্ষতি হবে, আর তোমার দাঁত টকে যাবে। অভিজ্ঞ শিকারীর মত সে জানে যে জন্তুটা আহত হয়েছে, পুরো শক্তি নিয়ে রাশিয়ার পক্ষে যতখানি আঘাত করা সম্ভব ততখানি আহত হয়েছে। কিন্তু সে আঘাত মারাত্মক কিনা সেটা এখনও অনিশ্চিত। কিন্তু এখন লরিস্তন ও বার্থিলেমিকে পাঠানোর ফলে এবং গেরিলাদের বিবরণ অনুসারে কুতুজভ প্রায় নিশ্চিত যে আঘাতটা মারাত্মকই হয়েছে। কিন্তু আরও প্রমাণ তার চাই, আর সেজন্য অপেক্ষা করা দরকার।

"ওকে কতখানি আহত করা গেছে সেটা দেখতে ওরা চাইছে দৌড়ে যেতে। অপেক্ষা কর, তাহলেই দেখতে পাবে। অবিরাম চলা মানেই অবিরাম অগ্রগতি! কিসের জন্য? নিজেদের বিশিষ্ট করে তুলতে! যুদ্ধ যেন একটা মজার ব্যাপার। তারা সব ছেলেমানুষের মত—সকলেই দেখাতে চায় তারা কত ভাল যুদ্ধ করতে পারে, ফলে তাদের কাছ থেকে ঘটনার কোন অর্থপূর্ণ বিবরণই পাওয়া যায় না। কিন্তু এখন তো তার কোন প্রয়োজন নেই।"

বরদিনোর আঘাতটা মারাত্মক হয়েছে কি না এই অনিশ্চিত প্রশ্নটা একটা পুরো মাস ধরে কুতুজভের মাথার মধ্যে ঘুরছে। একদিকে ফরাসীরা মস্কো দখল করেছে। অন্যদিকে কুতুজভ সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করে যে

সে নিজে এবং সব রুশরা মিলে সর্বশক্তি দিয়ে যে ভয়ংকর আঘাত হেনেছে সেটা মারাত্মক হতে বাধ্য। কিন্তু সে যাই হোক প্রমাণ তো দরকার ; প্রমাণের জন্য সে একটা মাস অপেক্ষা করেছে ; যত অপেক্ষা করেছে ততই বেশী অধৈর্য হয়ে উঠেছে। ক্রসিয়েরের ডিভিসন সম্পর্কে দরখভের প্রতিবেদন, নেপোলিয়নের সেনাদলের দুর্দশা সম্পর্কে গেরিলাদের সংবাদ, মস্কো ছেড়ে যাবার প্রস্তুতির গুজব—সব কিছু এই ধারণাকেই সমর্থন করছে যে ফরাসী বাহিনী মার খেয়ে পালাবার তাল করছে। কিন্তু এসবই তো ধারণামাত্র ; যুবকদের কাছে এগুলি গুরুত্বপূর্ণ মনে হলেও কুতুজভের কাছে তা নয়। ষাট বছরের অভিজ্ঞতায় সে জানে গুজবকে কতটা মূল্য দেওয়া যায় ; এতে আত্মতুষ্টির অবকাশ মেলে, কিন্তু বিরূপ পরিস্থিতির কোন মূল্যায়ন হয় না। তাই তার মনে স্বস্তি নেই। রুটিনমাফিক সব কাজই সে করে—সহযোগীদের সঙ্গে আলোচনা করে, চিঠিপত্র লেখে, পিতার্সবুর্গের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে, ইত্যাদি। কিন্তু একমাত্র সেই দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পায় ফরাসীদের ধ্বংস, আর সেটাই তার অন্তরের একমাত্র কামনা।

১১ই অক্টোবর রাতে হাতের উপর ভর দিয়ে শুয়ে শুয়ে সেইকথাই সে ভাবছিল।

পাশের ঘরে কারা যেন এসেছে ; তোল্, কনভ্‌নিৎসিন ও বল্‌খভিতিনভের পায়ের শব্দ কানে এল।

"আরে, ওখানে কারা ? ভিতরে আসুন, ভিতরে আসুন ! খবর কি ?" ফিল্ডমার্শাল তাদের ডাকল।

একটি পরিচারক মোমবাতি জ্বালিয়ে দিল। তোল্ সংক্ষেপে খবরটা জানাল।

"সংবাদ এনেছে কে ?" এমনভাবে তাকিয়ে কুতুজভ প্রশ্নটা করল যে মোমবাতির আলোয় তার কঠোরতা তোল্-এর দৃষ্টি এড়াল না।

"এবিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই ইয়োর হাইনেস।"

"তাকে ভিতরে ডাকুন, এখানে ডেকে আনুন।"

কুতুজভ একটা পা ঝুলিয়ে বিছানায় উঠে বসল ; অপর ভাঁজ-করা পায়ের উপর রইল তাঁর ভুঁড়িটা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে সংবাদবাহকের দিকে তাকাল, যেন নিজের মনের কথাটাই তার মুখের উপর দেখতে চাইল।

বুকের উপর খোলা শার্টটা টেনে মিলিয়ে দিয়ে বার্দ্ধক্যজনিত নীচু গলায় বল্‌খভিতিনভকে বলল, "আমাকে বল, আমাকে বল বন্ধু। কাছে এস—আরও কাছে। আমার জন্য কি খবর তুমি এনেছ ? অ্যা ? নেপোলিয়ন মস্কো পরিত্যাগ করেছে এই তো ? তুমি ঠিক জান ? অ্যা ?"

তাকে যা কিছু বলে দেওয়া হয়েছিল বল্‌খভিতিনভ গোড়া থেকে সব কথা সবিস্তারে বলল।

"আরও তাড়াতাড়ি বল, আরও তাড়াতাড়ি! আমাকে কষ্ট দিও না!" কুতুজভ তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠল।

বল্‌খভিতিনভ সব কথা বলে নির্দেশের অপেক্ষায় চুপ করে রইল। তোল্‌ কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কুতুজভ তাকে থামিয়ে দিল। নিজে কিছু বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু হঠাৎ তার মুখটা কুঁচকে ভাঁজ হয়ে গেল। তোল্‌-এর দিকে হাতটা নেড়ে ঘরের বিপরীত দিকে ঝোলানো দেবমূর্তিগুলির ছায়ায় যে কোণটা অন্ধকার হয়ে আছে সেইদিকে চলে গেল।

দুই হাত জোড় করে কাঁপা-গলায় বলতে লাগল, "হে প্রভু, হে আমার সৃষ্টিকর্তা, আমাদের প্রার্থনা তুমি শুনেছ···রাশিয়া বাঁচলো। হে প্রভু, তোমাকে ধন্যবাদ।"

কুতুজভ কাঁদতে লাগল।

অধ্যায়—১৮

এই সংবাদ পাবার পর থেকে অভিযানের শেষ দিন পর্যন্ত কুতুজভের সমস্ত কাজকর্মের একমাত্র লক্ষ্য হল ছলে, বলে, কৌশলে, ও অনুরোধে তার সৈন্য-দের ধ্বংসের মুখ শত্রুর বিরুদ্ধে অনর্থক আক্রমণ, রণ-কৌশল ও সংঘর্ষ থেকে বিরত রাখা। দখ্‌তরুরভ মালো-ইয়ারোস্লাভেৎস-এ চলে গেল, কিন্তু কুতুজভ মূল বাহিনীর সঙ্গেই রয়ে গেল, আর কালুগা থেকে সকলকে চলে যেতে হুকুম দিল; সে শহর থেকে আরও পিছনে সরে যাওয়া তার কাছে খুবই সহজ বলে মনে হল।

কুতুজভ সর্বত্রই পশ্চাদপসরণ করে চলল, কিন্তু শত্রুপক্ষ তার পশ্চাদপ-সরণের জন্য অপেক্ষা না করেই বিপরীত মুখে পালাতে লাগল।

নেপোলিয়নের ইতিহাসকাররা তারুতিনো এবং মালো-ইয়ারো-স্লাভেৎস্‌-এ তার সুকৌশল সৈন্য-পরিচালনার কথা আমাদের শুনিয়েছে; আর নেপো-লিয়ন যদি সময়মত দক্ষিণের সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলিতে প্রবেশ করতে পারত তাহলে কি ঘটতে পারত তা নিয়েও অনেক জল্পনা-কল্পনাও করেছে।

কিন্তু নেপোলিয়নের দক্ষিণ অঞ্চলের দিকে এগিয়ে যাবার পথে যে কোন বাধাই ছিল না (কারণ রুশ বাহিনী কোথাও তাকে বাধা দেয় নি) সেকথা না হয় নাই বলা হল; তবু ইতিহাসকাররা ভুলে গেছে যে কোন কিছুই তখন আর নেপোলিয়নের বাহিনীকে রক্ষা করতে পারত না, কারণ ততক্ষণে তার মধ্যে অনিবার্য ধ্বংসের বীজটি বপন করা হয়ে গেছে। যে বাহিনী মস্কোতে প্রচুর রসদের সরবরাহ পেয়েও তাকে মজুত না করে পায়ের নীচে পিষে নষ্ট করেছে এবং স্মোলেন্‌স্ক্‌-এ পৌছে খাদ্যসম্ভার গুদামজাত না করে কেবল লুটই করেছে, সেই বাহিনী কালুগা প্রদেশে গিয়ে কেমন করে সুবুদ্ধি ফিরে

পাবে যখন সেখানেও বাস করত মস্কোর মতই সব রুশ অধিবাসীরা এবং সেখানেও জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাক করে দেবার মত সব কিছুই ছিল ?

সে বাহিনী কোথাও গিয়ে বাঁচতে পারত না। বরদিনোর যুদ্ধ এবং মস্কো ধ্বংসের পরে তার ভিতরে-ভিতরে যেন ধ্বংসের বীজ আপনা থেকেই রোপিত হয়ে গিয়েছিল।

স্বয়ং নেপোলিয়ন ও তার সৈন্যসহ যারা একদিন ছিল একটা বাহিনীর সদস্য তারাই পালাতে লাগল কোথায় পালাচ্ছে তা না জেনে ; যে অসহায় অবস্থার সম্পর্কে তখন তারা সকলেই অল্প-বিস্তর সচেতন তার হাত থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালিয়ে বাঁচাটাই তখন প্রত্যেকেরই একমাত্র লক্ষ্য হয়ে উঠেছে।

তাই তো দেখতে পাই. জেনারেলরা সকলে একত্রে আলোচনার ভান করে মালো-ইয়ারোস্লাভেৎস্-এর বৈঠকে সমবেত হয়ে নানা রকম অভিমত প্রকাশ করলেও একেবারে সকলের শেষে কথা বলতে উঠে সরল-হৃদয় সৈনিক মুতোঁ যখন বলল যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালিয়ে যাওয়াই এখন একমাত্র দরকারী কাজ, তখন সকলের মুখই বন্ধ হয়ে গেল ; এমন কি এই সর্বজন-স্বীকৃত সত্যের বিরুদ্ধে নেপোলিয়নও কিছুই বলতে পারল না।

. পালিয়ে যাওয়াই যে দরকার সেকথাটা সকলে বুঝলেও তাকে স্বীকার করে নেওয়ার মধ্যে একটা লজ্জাবোধ তবু থেকেই গেল। সেই লজ্জাকে জয় করার জন্য একটা বাইরের আঘাতের খুবই দরকার ছিল, আর যথাসময়েই সে আঘাতটাও এল। তাকেই ফরাসীরা বলত "le hourra de l' Empereur."

মালো-ইয়ারোস্লাভেৎস্-এর বৈঠকের পরদিন খুব সকালে একদল মার্শাল ও একজন পরিদর্শককে সঙ্গে নিয়ে নেপোলিয়ন নিজের এলাকার মধ্যেই অশ্বারোহণে বেরিয়েছিল ; পূর্বেকার ও আসন্ন যুদ্ধের ঘটনাস্থল এবং সেনা-বাহিনী পরিদর্শনের জন্যই নাকি তার এই পরিক্রমণ। যাই হোক, কয়েকজন কসাক লুটের মালের খোঁজে ঘুরতে ঘুরতে নেপোলিয়নের দেখা পেয়ে যায় এবং তাকে প্রায়, গ্রেপ্তার করবার উপক্রম করে। কসাকরা যে তখন নেপোলিয়নকে গ্রেপ্তার করে নি, নেপোলিয়ন যে তখনকার মত বেঁচে গিয়েছিল, তার কারণ কসাকদের মন ছিল তখন লুটের মালের দিকে। সৈন্যদের ছেড়ে তারা লুটতরাজের দিকেই মন দিল। নেপোলিয়নকে ফেলে তারা ছুটল লুটের সন্ধানে, নেপোলিয়ন কোনক্রমে পালিয়ে বাঁচল।

সৈন্যপরিবেষ্টিত অবস্থায় স্বয়ং সম্রাটই যখন এত সহজে শত্রুপক্ষের হাতে পড়তে পারত সে অবস্থায় নিকটবর্তী পরিচিত পথ ধরে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর ছিল না। চল্লিশ বছরের পুরনো পাকস্থলী নিয়ে নেপোলিয়ন সৈনিকটির কথার ইঙ্গিতটা বুঝতে পারল ; তার পূর্বেকার গতিশীলতা ও

সাহস এখন আর নেই; তাছাড়া কসাকরাও তাকে বেশ ভয় পাইয়ে দিয়েছে; তাই মুতোঁর সঙ্গে একমত হয়ে সে সঙ্গে সঙ্গে হুকুম দিল,—ইতিহাসকাররা তাই বলে—স্মোলেনস্ক রোড ধরে পশ্চাদপসরণ করা হোক।

নেপোলিয়ন যে মুতোঁর সঙ্গে একমত হল এবং সৈন্যবাহিনী পশ্চাদপসরণ করল, তাতে কিন্তু একথা প্রমাণ হয় না যে নেপোলিয়নই তার বাহিনীর পশ্চাদপসরণ ঘটিয়েছিল; বরং বলা যায়, যে শক্তিসমূহ গোটা বাহিনীকে প্রভাবিত করে তাকে মোঝায়েস্ক্ (অর্থাৎ স্মোলেনস্ক্) রোড ধরে পরিচালিত করেছিল সেই শক্তিই একই সঙ্গে নেপোলিয়নকেও প্রভাবিত করেছিল।

অধ্যায়—১৯

একজন গতিশীল মানুষ সব সময়ই তার চলার সপক্ষে একটা লক্ষ্য খুঁজে নেয়। এক হাজার ভার্স্ট পথ অতিক্রম করতে হলে তাকে কল্পনা করে নিতেই হবে যে সেই হাজার ভার্স্টের শেষে তার জন্য একটা ভাল কিছু অপেক্ষা করে আছে। চলার শক্তি অর্জন করতে হলে একটা প্রতিশ্রুত-দেশের সম্ভাবনা সম্মুখে রাখতেই হবে।

ফরাসীদের অগ্রগতির সম্মুখে সেই প্রতিশ্রুত দেশটি ছিল মস্কো, আর তাদের পশ্চাদপসরণের সময় সেটি হয়েছে তাদের স্বদেশ। কিন্তু সে স্বদেশ তো বহুদূরে; যে মানুষকে এক হাজার ভার্স্ট যেতে হবে তার পক্ষে একান্তভাবে প্রয়োজন শেষ লক্ষ্যকে সরিয়ে রেখে নিজেকে এই কথা বলা: "আজ আমি চল্লিশ ভার্স্ট দূরের এমন একটা স্থানে পৌছব যেখানে পাব বিশ্রাম, যেখানে রাতটা কাটাতে পারব।" প্রথম দিনের যাত্রাপথে সেই বিশ্রাম-স্থলটিই তার শেষ লক্ষ্যকে ঢেকে দিয়ে তার সব আশা-আকাংখাকে আকর্ষণ করে। আর ব্যক্তিবিশেষের এই মনোভাব সমষ্টির ক্ষেত্রে আরও বহুগুণ শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

পুরনো স্মোলেনস্ক্ রোড ধরে আগুয়ান ফরাসী বাহিনীর শেষ লক্ষ্য তাদের স্বদেশভূমি তখন অনেক দূরে; তাদের প্রত্যক্ষ লক্ষ্য হচ্ছে স্মোলেনস্ক; তাই সমগ্র সেনাবাহিনীর মনের মধ্যে বহুগুণে বর্দ্ধিত হয়ে তাদের সব আশা ও আকাংখা সেইপথেই তাদের টেনে নিয়ে চলল। স্মোলেনস্ক্-এ তাদের জন্য প্রচুর খাদ্য ও নতুন সেনাদল অপেক্ষা করছে এ-কথা যে তারা জানত তা নয়; সেরকম কোন কথা তাদের বলাও হয় নি (বরং উর্ধ্বতন অফিসাররা এবং স্বয়ং নেপোলিয়নও জানত যে সেখানে রসদের একান্ত অভাব আছে)। কিন্তু একমাত্র এই আশা ও আকাংখাই তাদের দিয়েছে এগিয়ে চলার এবং বর্তমান দুঃখদুর্দশা সহ্য করবার শক্তি। কাজেই একথা যারা জানত এবং

যারা জানত না দুই দলই নিজেদের প্রতারিত করে আশ্বাসের স্থল হিসাবে স্মোলেন্স্ক-এর দিকেই ছুটে চলল।

বড় রাস্তায় পড়ে ফরাসীরা বিস্ময়কর উদ্যম ও অশ্রুতপূর্ব দ্রুতগতিতে পালাতে লাগল নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে! একই প্রেরণা ফরাসী সৈন্যদের এক-সূত্রে বেঁধে দিল, উৎসাহ যোগাল; তাছাড়া আরও একটি কারণ তাদের একসঙ্গে বেঁধেছিল—সেটা তাদের প্রবল সংখ্যা। মাধ্যাকর্ষণ নিয়মের মতই তাদের সমষ্টিগত প্রবলতা প্রতিটি মানব-অণুকে নিজের দিকে টেনে নিল। তারা হাজারে হাজারে এক জাতি, এক প্রাণ হয়ে ছুটতে লাগল।

এই সন্ত্রাশ ও দুর্দশার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য প্রত্যেকেই তখন চাইছে নিজেকে বন্দী হিসাবে শত্রুর হাতে সঁপে দিতে; কিন্তু একদিকে যাত্রার লক্ষ্যস্থল স্মোলেন্স্ক্-এর প্রতি সম-আকর্ষণের শক্তি সকলকে একই পথে টেনে নিয়ে চলল, আবার অন্যদিকে একটা আর্মি কার তো কোন কোম্পানির কাছে আত্ম-সমর্পণ করতে পারে না; যদিও ফরাসীরা নিজেদের আলাদা করে নিয়ে যে কোন উপযুক্ত ওজুহাতে আত্মসমর্পণের সুযোগ খুঁজতে লাগল, সে সুযোগ কিন্তু তাদের সামনে এল না। তাদের সংখ্যাধিক্য এবং সমবেত দ্রুত গতির জন্যই তারা সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হল; সর্বশক্তি নিয়োগ করে ফরাসীরা যেভাবে ছুটতে লাগল তাতে রুশদের পক্ষে তাদের গতিরোধ করা শুধু কষ্টকর নয়, অসম্ভব হয়ে পড়ল। একটা বিশেষ সময়-সীমার পরে কোন যান্ত্রিক বিচ্ছেদই জীবদেহের পচনকে ত্বরান্বিত করতে পারে না।

একতাল বরফ একমুহূর্তেই গলে যেতে পারে না। এমন একটা নির্দিষ্ট সময়-সীমা আছে যার কমে তাপের কোন মাত্রা প্রয়োগ করেই বরফকে গলানো যায় না। পরন্তু, তাপ যত বেশী হয়, অবশিষ্ট বরফটা তত বেশী জমাট বেঁধে যায়।

রুশ কম্যাণ্ডারদের মধ্যে একমাত্র কুতুজভই এটা বুঝত। স্মোলেন্স্ক্ রোড ধরে ফরাসীদের পলায়ন যখন স্পষ্ট হয়ে উঠল, তখন ১১ই অক্টোবর রাতে কনভ্‌নিৎসিন যেটা আগে থেকেই দেখতে পেয়েছিল তাই ঘটতে লাগল। ঊর্ধ্বতন অফিসাররা সকলেই চাইল নাম করতে, শত্রুকে মারতে, অবরোধ করতে, বন্দী করতে, ফরাসীদের পরাভূত করতে। সকলেই যুদ্ধের জন্য হৈ-হৈ করে উঠল।

একমাত্র কুতুজভই আক্রমণ প্রতিহত করতে সাধ্যমত চেষ্টা করল (যে-কোন প্রধান সেনাপতির পক্ষেই সে সাধ্য খুবই সীমিত)।

আজ আমরা যা বলছি সেদিন কুতুজভ তা বলতে পারে নি: "আমাদের সৈন্যদের মৃত্যু ডেকে এনে আর ভাগ্যহীন লোকগুলোকে অমানুষিকভাবে হত্যা করে কেন এই যুদ্ধ, কেন এই পথ-অবরোধ? যখন বিনা যুদ্ধেই তাদের

সেনাদলের এক তৃতীয়াংশ মস্কো থেকে ভিয়াজ্মা রোডের উপর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, তখন এ যুদ্ধের কি দরকার ?" কিন্তু পরিণত বুদ্ধির উপর নির্ভর করে সে তাদের বলল স্বর্ণ-সেতুর কথা ; সঙ্গে সঙ্গে তারা হেসে উঠল, কটুক্তি করল, মরণোন্মুখ জন্তুটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে, উল্লাসে ফেটে পড়ল।

এর্মলভ, মিলরাদভিচ, প্লাতভ এবং অন্যরা ভিয়াজমার কাছে ফরাসীদের মুঠোর মধ্যে পেয়ে দুটো ফরাসী কোরকে বিচ্ছিন্ন করে ভেঙে চুরমার করে দেবার ইচ্ছাকে সংযত করতে পারল না ; তাদের এই অভিপ্রায় কুতুজভকে জানাবার উদ্দেশ্যে খামে ভরে তাকে পাঠিয়ে দিল এক তাড়া সাদা কাগজ।

সৈন্যদের বাধা দিতে কুতুজভ সাধ্যমত চেষ্টা করল, কিন্তু রাস্তা বন্ধ করে দেবার চেষ্টায় সৈন্যরা আক্রমণ করে বসল। শুনেছি, পদাতিক রেজিমেণ্টগুলি বাজনা বাজিয়ে ঢাক পিটিয়ে আক্রমণ করতে এগিয়ে গেল এবং হাজার হাজার মানুষ খুন হল।

কিন্তু তারা না পারল পথ আটকাতে, আর না পারল কাউ.ক পরাজিত করতে ; বিপদের মুখে পড়ে ফরাসী বাহিনী আরও সুসংহত হয়ে ধীরে ধীরে সংখ্যায় কমতে কমতেও স্মোলেন্‌স্ক্-এর মারাত্মক পথ ধরে এগিয়ে চলল।

ত্রয়োদশ পর্ব সমাপ্ত

চতুর্দশ পর্ব

অধ্যায়—১

বরদিনোর যুদ্ধ, তার পরেই মস্কো দখল এবং বিনা যুদ্ধে ফরাসীদের পলায়ন—এটা ইতিহাসের একটি পরম শিক্ষনীয় ঘটনা।

সব ইতিহাসকারই একমত যে বিভিন্ন রাষ্ট্র ও জাতির পারস্পরিক সংঘর্ষের বহিরঙ্গ কার্যকলাপই যুদ্ধের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে এবং সে যুদ্ধের অল্প-বিস্তর সাফল্যের ফল অনুসারেই রাষ্ট্রের ও জাতির শক্তির হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটে।

কোন রাজা বা সম্রাট অন্য এক রাজা বা সম্রাটের সঙ্গে ঝগড়া বাঁধিয়ে একটা সেনাবাহিনী গড়ে তোলে, শত্রুর সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করে, তিন, পাঁচ, অথবা দশ হাজার মানুষকে মেরে জয়লাভ করে, এবং একটা রাজ্য ও কয়েক লক্ষ লোকের একটা জাতিকে পদানত করে—এ ধরনের ঐতিহাসিক

বিবরণ খুব বিস্ময়কর মনে হলেও ইতিহাসের ঘটনাবলী (আমরা যতদূর জানি) এই বক্তব্যের সত্যতাকেই সমর্থন করে যে এক সেনাদলের বিরুদ্ধে অপর সেনাদলের সাফল্যের তারতম্যই সেই জাতির শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ, অন্তত পক্ষে একটি মৌলিক নির্দেশক—যদিও এটা খুবই দুর্বোধ্য যে একটা জাতির একশ' ভাগের এক ভাগ মাত্র হয়েও একটা সেনাদলের পরাজয় ঘটলে একটা গোটা জাতি কেন আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। যেই একটি সেনাদল জয়লাভ করল অমনি সঙ্গে সঙ্গে বিজয়ী জাতির অধিকার বিজিতের সর্ব রকম স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে বৃদ্ধিলাভ করে। একটা সেনাদল পরাজিত হল, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা জাতি তার সব অধিকার হারিয়ে ফেলল, আর সেই সেনাদল যদি সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত হল তো গোটা জাতি হল সম্পূর্ণ পদানত।

ইতিহাস অনুসারে প্রাচীনকাল থেকেই এই চলে আসছে, এবং আমাদের কালেও তাই চলেছে। নেপোলিয়নের সব যুদ্ধ এই নীতিকেই সমর্থন করে। অস্ট্রীয় বাহিনী যতটা পরাজয় বরণ করেছে সে অনুপাতে অস্ট্রীয়া তার অধিকার হারিয়েছে, আর সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পেয়েছে ফ্রান্সের অধিকার ও শক্তি। জেনা ও অয়েরস্তাদ-এ ফরাসীদের জয়লাভ প্রাশিয়ার স্বাধীন সত্তাকে ধ্বংস করেছে।

কিন্তু তারপরে ১৮১২-তে ফরাসীরা মস্কোর কাছে একটা জয়লাভ করল। মস্কো দখল করা হ'ল, আর তারপরে আর কোন যুদ্ধ হল না, কিন্তু রাশিয়ার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হল না, বিলুপ্ত হয়ে গেল ছয় লক্ষ সৈন্যসমন্বিত ফরাসী বাহিনী এবং তারপরে নেপোলিয়ন-শাসিত ফ্রান্স দেশটা পর্যন্ত। ইতিহাসের বিধানের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে ঘটনাকে বিকৃত করে একথা বলাও অসম্ভব যে বরদিনোর রণক্ষেত্র রুশদের হাতেই থেকে গিয়েছিল, অথবা মস্কোর পরে আর যেসব যুদ্ধ হয়েছিল তাতেই নেপোলিয়নের সেনাদল বিধ্বস্ত হয়েছিল।

বরদিনোতে ফরাসীদের জয়লাভের পরে সাধারণভাবে আর কোন যুদ্ধ হয় নি, গুরুতর কোন সংঘর্ষও ঘটে নি, তথাপি ফরাসী বাহিনীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেল। এর অর্থ কি? এটা যদি চীনের ইতিহাস থেকে নেওয়া কোন দৃষ্টান্ত হত তাহলে আমরা বলতে পারতাম যে এটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনাই নয় (কোন কিছু যখন তাদের হিসাবের সঙ্গে খাপ খায় না ইতিহাসকাররা তখন সুবিধামত এই কথাই বলে থাকে); এটা যদি কোন ছোটখাট সংঘর্ষ হত, তাহলে এটাকে ব্যতিক্রম বলে ধরে নিতে পারতাম; কিন্তু এই ঘটনাটি ঘটেছে আমাদের পিতৃপুরুষের চোখের সামনে, তাদের কাছে এটা ছিল তাদের পিতৃভূমির জীবন-মরণের প্রশ্ন, আর আমাদের জ্ঞানমত এটা ঘটেছিল বৃহত্তম একটি যুদ্ধে।

১৮৮২-র অভিযানে বরদিনোর যুদ্ধ ফরাসী বিতাড়ন পর্যন্ত এই অধ্যায়টিই

প্রমাণ করেছে যে একটা যুদ্ধে জয়লাভ করলেই একটা দেশকে জয় করা যায় না, এবং দেশজয়ের কোন অনিবার্য সংকেতও সেটা নয়; এতে আরও প্রমাণ হয়েছে, যে-শক্তি একটা জাতির ভাগ্য নির্ধারণ করে সে-শক্তি কোন বিজয়ীর হাতে থাকে না, সেনাদল ও যুদ্ধের মধ্যেও থাকে না, থাকে অন্য কোথাও।

মস্কো ছেড়ে আসার আগে ফরাসী বাহিনীর অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে ফরাসী ইতিহাসকাররা বলেছে যে অশ্বারোহী বাহিনী, গোলন্দাজ বাহিনী ও যানবাহন ব্যবস্থা ছাড়া আর সবদিক থেকেই "গ্র্যাণ্ড আর্মি"র অবস্থা বেশ ভালই ছিল—আর পশুদের কোন রকম খাদ্যই ছিল না। সে দুর্ভাগ্যের কোন প্রতিকার কারও হাতে ছিল না, কারণ সে জেলার চাষীরা সব খড় পুড়িয়ে দিয়েছিল যাতে সেগুলি ফরাসীদের হাতে না পড়ে।

জয়লাভ করেও ঈপ্সিত ফল পাওয়া গেল না, কারণ চাষী কার্প ও ভ্লাস এবং অনুরূপ অসংখ্য চাষী চড়া দাম পেয়েও তাদের খড় নিয়ে মস্কোতে যায় নি, সব পুড়িয়ে দিয়েছে।

এমন দুটি লোককে কল্পনা করা যাক যারা দ্বৈত যুদ্ধের সব রকম নিয়ম-কানুন মেনে তরবারি নিয়ে যুদ্ধ করতে এসেছে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে যুদ্ধ চলল; হঠাৎ একজন যোদ্ধা যখন বুঝতে পারল যে সে আহত হয়েছে আর ব্যাপারটা ঠাট্টা-ইয়ার্কি নয়, তখন সে তরবারি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হাতের কাছে যে মুগুরটা পেল তাই ঘোরাতে শুরু করল। তারপর কল্পনা করা যাক, যে-যোদ্ধাটি কার্যোদ্ধারের শ্রেষ্ঠ এবং সহজতম পথটি বেছে নিল সেই কিন্তু আবার বীরত্বের চিরাচরিত ঐতিহ্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আসল কথা গোপন করে প্রচার করে দিল যে দ্বৈতযুদ্ধের সব নিয়ম-কানুন মেনে তর-বারির সাহায্যেই সে জয়লাভ করেছে। সেই দ্বৈতযুদ্ধের এ হেন বিবরণ থেকে কত রকম গোলমাল ও অস্পষ্টতার সৃষ্টি যে হতে পারে তা তো সহজেই কল্পনা করা যায়।

এক্ষেত্রে দ্বৈতযুদ্ধের নিয়ম অনুযায়ী যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছে ফরাসী বাহিনী; তার যে প্রতিপক্ষ তরবারি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মুগুর তুলে নিয়েছে সে হল রুশ জনগণ; যারা দ্বৈতযুদ্ধের নিয়ম অনুযায়ী ব্যাপারটার ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছে তারা হল এই ঘটনার বর্ণনাকারী ইতিহাসকাররা।

স্মোলেন্‌স্ক্‌-এর অগ্নিকাণ্ডের পরে যে যুদ্ধ শুরু হল তাতে যুদ্ধের সাবেকী ঐতিহ্যের কিছুই পালন করা হল না। শহর ও গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া, যুদ্ধের পরে পশ্চাদপসরণ করা, বরদিনোতে প্রচণ্ড আঘাত হানার পরে নতুন করে পশ্চাদপসরণ করা, মস্কোকে জ্বালিয়ে দেওয়া, লুটেরাদের গ্রেপ্তার করা, যান-বাহন বাজেয়াপ্ত করা, আর গেরিলা যুদ্ধ—এ সবেতেই তো নিয়মকে লংঘন করা হয়েছে।

নেপোলিয়ন এটা বুঝতে পেরেছিল ; সময় সময় সে মস্কোতে দ্বৈতযুদ্ধের সঠিক মনোভাবও গ্রহণ করেছে এবং প্রতিপক্ষের তরবারির বদলে মাথার উপরে একটা মুগুরকে উদ্যত হতে দেখে সে কুতুজভ ও সম্রাট আলেক্সান্দারের কাছে এই মর্মে অভিযোগ করতেও ছাড়ে নি যে সব রকম নিয়ম-কানুন লংঘন করে যুদ্ধটা চালানো হচ্ছে—যেন মানুষ মারার ব্যাপারেও কোন নিয়ম-কানুন থাকতে পারে। এ প্রসঙ্গে ফরাসীদের প্রতিবাদ জ্ঞাপন এবং কিছু উচ্চপদস্থ রুশ কর্মচারিকর্তৃক মুগুর-যুদ্ধটা লজ্জাজনক বিবেচিত হওয়া সত্ত্বেও জনযুদ্ধের মুগুরটাকে যথাসম্ভব ক্ষতিকরভাবে ও প্রচণ্ড শক্তিতে উদ্যত করা হল, এবং কারও পরামর্শ, রুচি বা অন্য কিছুর পরোয়া না করে অর্থহীন সরলতার সঙ্গে সেটাকে বার বার তুলতে ও নামাতে লাগল, এবং ফরাসীদের মারতে মারতে একসময় গোটা অভিযানকেই বিধ্বস্ত করে দিল।

১৮১৩ সালে ফরাসীরা যা করেছিল তার পরিবর্তে এরা যে নিয়মমাফিক অভিবাদন জানিয়ে সবিনয়ে ও সমাদরে নিজেদের তরবারির হাতলটা উদার বিজয়ীর দিকে এগিয়ে না ধরে সংকট-মুহূর্তে কোন রকম নিয়মের তোয়াক্কা না করে হাতের কাছে যে মুগুরটা পেয়েছে সেটাকেই তুলে নিয়ে অনবরত আঘাত করেছে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের অন্তরের বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার বদলে জেগে উঠেছে অবহেলা ও সহানুভূতি—একটা জাতির পক্ষে সেটা ভালই হয়েছে।

অধ্যায়—২

যুদ্ধের তথাকথিত নিয়মের অন্যতম স্পষ্ট ও সুবিধাজনক ব্যতিক্রম হচ্ছে একত্র সম্মিলিত বহুজনের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্ন ছোট ছোট দলে আক্রমণ চালানো। জাতীয় স্তরের যুদ্ধেই এধরনের আক্রমণ চালানো হয়ে থাকে। এধরনের আক্রমণের ক্ষেত্রে দুটো জনতা পরস্পরের মুখোমুখি হওয়ার পরিবর্তে দু'দলেই সরে যায়, এককভাবে আক্রমণ করে, অধিকতর শক্তিশালী প্রতিপক্ষের আক্রমণের মুখে পালিয়ে যায়, কিন্তু সুযোগ পেলেই আবার আক্রমণ করে। এই যুদ্ধই করেছিল স্পেনের গেরিলারা, ককেসাসের পার্বত্য জাতিরা, এবং ১৮১২-তে রুশরা।

এধরনের যুদ্ধকে লোকে "গেরিলা যুদ্ধ" বলে ; তারা ধরে নেয় যে নামেই এর তাৎপর্য পরিষ্কার হয়ে ওঠে। কিন্তু এধরনের যুদ্ধ কোন নিয়মের আওতায় আসে না এবং অব্যর্থ বলে স্বীকৃত একটি সুপরিচিত রণ-নীতির এটা সম্পূর্ণ বিরোধী। সে নীতিটা হল—সংঘর্ষের সময় প্রতিপক্ষের চাইতে অধিকতর শক্তিশালী হতে হলে আক্রমণকারীকে সর্বশক্তি একত্রীভূত করতে হবে।

গেরিলা যুদ্ধ (ইতিহাসই সাক্ষী যে সেটা সর্বদাই সফল) এই নীতিকে

সরাসরি লংঘন করে চলে।

এই স্ববিরোধিতার কারণ হল—সমর-বিজ্ঞানে ধরেই নেওয়া হয় যে একটি বাহিনীর শক্তি ও তার সৈন্যসংখ্যা সমার্থবাচক। সমর-বিজ্ঞান বলে, সৈন্য যত বেশী শক্তিও তত বেশী।

সমর-বিজ্ঞানের পক্ষে এ-কথা বলা আর বলবিদ্যার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ভড়ের উল্লেখ করে বলবেগের সংজ্ঞা নিরূপণ করা একই কথা।

বলবেগ ভড় ও গতির ফলস্বরূপ।

সামরিক ব্যাপারে একটি বাহিনীর শক্তি ভড় এবং একটি অজ্ঞাত কিছুর ফলস্বরূপ।

একটি বাহিনীর শক্তি যে তার আকারের অনুরূপ হয় না, ছোট ছোট দল যে বড় দলকে পরাস্ত করে, তার অসংখ্য দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পাতায় দেখতে পেয়ে সমর-বিজ্ঞান অস্পষ্টভাবে একটি অজ্ঞাত শক্তির অস্তিত্বকে স্বীকার করে এবং সেটাকে খুঁজে বের করতে চেষ্টা করে।

একটি বাহিনীর মনোবল হচ্ছে সেই অজ্ঞাত শক্তি; তাকে জড় দিয়ে গুণ করলেই আসল শক্তিটাকে পাওয়া যায়। এই অজ্ঞাত কিছুর—একটা বাহিনীর মনোবলের—সংজ্ঞা নিরূপণ করা এবং তার তাৎপর্যকে প্রকাশ করা বিজ্ঞানের একটা সমস্যা।

দশটি সৈনিক, দশটি ব্যাটেলিয়ন, বা দশটি ডিভিশন পনেরোটি সৈনিক, ব্যাটেলিয়ন, বা ডিভিশনের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়লাভ করে—অর্থাৎ অপর-পক্ষকে মেরে ফেলে বা বন্দী করে, অথচ নিজপক্ষের মারা যায় চারজন; তার অর্থ, একপক্ষে যায় চারজন, আর অপরপক্ষে যায় পনেরো জন। ফলে চার হয়ে যায় পনেরোর সমান, আর তাই ৪-ক=১৫-খ। ফলে ক/খ=১৫/৪। এই সমীকরণ থেকে আমরা সেই অজ্ঞাত বস্তুর মূল্যমানটা পাই না, পাই দুটো অজ্ঞাতবস্তুর আনুপাতিক হার। বিভিন্ন নির্বাচিত ঐতিহাসিক ঘটনাকে (যুদ্ধ, অভিযান, যুদ্ধের সময়কাল) এই সমীকরণের অন্তর্ভুক্ত করলে এমন একটা সংখ্যা-শ্রেণী পাওয়া যেতে পারে যার মধ্যে নিহিত আছে কতকগুলি বিধি আর সেগুলি অবশ্যই আবিষ্কারযোগ্য।

একটি বাহিনী আক্রমণ চালাবে একযোগে আর পশ্চাদপসরণ করবে ছোট ছোট দলে—রণ-কৌশলের এই নিয়মই অজান্তে স্বীকার করে যে একটি বাহিনীর শক্তি নির্ভর করে তার মনোবলের উপর। আক্রমণ প্রতিহত করতে যে শৃংখলার দরকার একটা সেনাদলকে গোলাগুলির মুখে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে তার চাইতে অনেক বেশী শৃংখলা প্রয়োজন। কিন্তু এই নিয়মের মধ্যে সেনাদলের মনোবলকে ধরা হয় নি; তাই বার বার এটা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে।

রণকৌশল অনুসারে আত্মরক্ষার জন্য ছোট ছোট দলে বিভক্ত হওয়া

উচিত হলেও ফরাসী বাহিনী ১৮১২-তে পশ্চাদপসরণের সময় একটি দলেই সংঘবদ্ধ হয়েছিল, কারণ তখন সেনাদলের মনোবল এতদূর ভেঙে পড়েছিল যে একমাত্র ভয়ই তাদের একত্র রাখতে পেরেছিল। অপরদিকে, নিয়ম অনুসারে রুশদের উচিত ছিল একযোগে সংঘবদ্ধভাবে আক্রমণ করা, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তারা ভাগ হয়ে গিয়েছিল ছোট ছোট দলে, কারণ তাদের মনোবল তখন এতই উঁচুপর্দায় উঠেছিল যে কোন একটি সৈনিক বিনা হুকুমে ফরাসীদের উপর আঘাত হানতে লাগল, অথচ বাধ্যতামূলকভাবে নিজেদের কোনরকম দুঃখ-দুর্দশা ও বিপদের মুখে ঠেলে দিতে হল না।

অধ্যায়—৩

ফরাসীদের স্মোলেন্স্ক-এ প্রবেশের পর থেকেই তথাকথিত দলীয় যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।

দলীয় যুদ্ধবিগ্রহ সরকারীভাবে স্বীকৃত হবার আগেই কসাক ও চাষীদের হাতে হাজার হাজার দলছাড়া শত্রুসৈন্য, লুটেরা ও ঘোড়ার খাদ্য-চোর নিহত হয়েছে ; একটা দলছাড়া পাগলা কুকুরকে অন্য কুকুররা যেভাবে মেরে ফেলে তারাও এইসব ফরাসীদের সেইভাবেই মেরেছে। দেনিস দাভিদভই প্রথম এধরনের লড়াইয়ের মূল্য বুঝেছিল।

২৪শে অগস্ট দাভিদভের প্রথম দলীয় সেনাদল গঠিত হল ; তারপর আরও অনেককে স্বীকৃতি দেওয়া হল। অভিযান যত অগ্রসর হয়ে চলল ততই এধরনের অসংখ্য সেনাদল গড়ে উঠতে লাগল।

এই বেসরকারী সেনাদলগুলি বিরাট বাহিনীটাকে একটু একটু করে ভাগে-ভাগে ধ্বংস করতে লাগল। ফরাসী বাহিনীরূপী শুকনো গাছ থেকে যে-সব পাতা আপনা থেকেই ঝরে পড়ছিল তারা কেবল সেগুলিকে সংগ্রহ করতে লাগল, কখনও বা গাছটাকে ঝাঁকিও দিল। অক্টোবর নাগাদ ফরাসীরা, যখন স্মোলেন্স্ক-এর দিকে পালাতে শুরু করেছে ততদিনে ছোট-বড় নানা আকারের ও চরিত্রের শত শত এই ধরনের সেনাদল গড়ে উঠেছে। কতকগুলি গড়ে উঠল পুরোপুরি সামরিক কায়দায় ; তাদের মধ্যে পদাতিক, অশ্বারোহী, কর্মচারি এবং জীবনযাত্রার আয়াস-আরাম সবই ছিল। কতকগুলি গড়ে উঠল কেবলমাত্র কসাক অশ্বারোহী নিয়ে। পদাতিক, অশ্বারোহী, চাষী ও জোতদারদের নিয়েও অনেক দল এখানে-ওখানে গড়ে উঠল ; তাদের পরিচয় কেউ জানল না। জনৈক গির্জা-কর্মী একটা দল গড়ে এক মাসে 'কয়েক শ শত্রুকে বন্দী করল ; আর জনৈক গ্রাম-প্রধানের স্ত্রী ভাসিলিসা কয়েক শ' ফরাসীকে হত্যা করল।

দলীয় যুদ্ধের আগুন তীব্রতর হয়ে জ্বলে উঠল অক্টোবরের শেষের দিকে।

প্রথম অধ্যায় সবে শেষ হয়েছে ; নিজেদের সাহস দেখে যোদ্ধারা নিজেরাই অবাক ; প্রতি মিনিটে তাদের শংকা এই বুঝি ফরাসীরা তাদের ঘিরে ফেলে গ্রেপ্তার করে ; ঘোড়ার পিঠ থেকে না নেমেই তারা জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থাকে, নামবার সাহস হয় না, সর্বদাই ভয় ফরাসীরা বুঝি পিছু নিয়েছে। অক্টোবরের শেষ নাগাদ এধরনের যুদ্ধ একটা নির্দিষ্ট আকার লাভ করল ; সকলেই পরিষ্কার বুঝতে পারল ফরাসীদের বিরুদ্ধে কতটা এগুনো যেতে পারে এবং কতটা পারে না। যে ছোট দলগুলি অনেক আগে থেকেই কাজ শুরু করে দিয়েছে এবং খুব কাছে থেকে ফরাসীদের দেখেছে, তারা যেসব কাজকে সম্ভব বলে মনে করে বড় দলের অধিনায়করা তা কল্পনাও করতে পারে না। যেসব কসাক ও চাষীরা ফরাসীদের মধ্যে লুকিয়ে ঢুকে পড়েছে তারা সবকিছুই সম্ভব বলে মনে করে।

২২ শে অক্টোবর বেসরকারী দলের অন্যতম নেতা দেনিসভ তার দলবল নিয়ে গেরিলা উদ্দীপনার একেবারে চরমে উঠল। ভোর থেকে সে সদলবলে এগিয়ে চলেছে। যে জঙ্গলটা বড় রাস্তাটাকে ঘিরে রেখেছে সারাদিন সেই জঙ্গলের ভিতর থেকে সে দেখেছে, অশ্বারোহী বাহিনীর মালপত্র ও রুশ বন্দীদের নিয়ে একটা বড় ফরাসী দল কড়া পাহারায় স্মোলেন্স্ক-এর দিকে এগিয়ে চলেছে। দেনিসভ এবং দলখভ (সেও একটা ছোট দল নিয়ে দেনিসভের কাছাকাছিই ঘোরাফেরা করছিল) ছাড়া কয়েকটা ডিভিশনের কম্যাণ্ডারও এই দলটির কথা জানতে পেরে দাঁতে শান দিতে শুরু করল। এই-সব বড় দলের দুজন কম্যাণ্ডার—একজন পোল ও অপরজন জার্মান—সঙ্গে সঙ্গে দেনিসভকে আমন্ত্রণ জানাল, একসঙ্গে দলটিকে আক্রমণ করতে তাদের দলের সঙ্গে যোগ দিতে।

তাদের দলিলপত্র পড়ে দেনিসভ বলল, "না ভাই, আমার নিজেরই যথেষ্ট গোঁফ গজিয়েছে"; জার্মানটিকে লিখে জানাল, এরকম একজন সাহসী ও বিখ্যাত জেনারেলের অধীনে কাজ করবার আন্তরিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাকে সে সুখ থেকে বঞ্চিত থাকতে হচ্ছে, কারণ সে ইতিমধ্যেই একজন জেনারেলের অধীনে কাজ করছে। পোলিশ জেনারেলকেও সেই একই মর্মে চিঠি লিখে জানাল, সে ইতিমধ্যেই একজন জার্মান জেনারেলের অধীনে কাজ করছে।

এইভাবে সব বন্দোবস্ত করে দেনিসভ ও দলখভ স্থির করল, উপর-ওয়ালাদের কিছু না জানিয়ে নিজেদের ছোট দল নিয়েই তারা ঐ যাত্রী-দলটিকে আক্রমণ করে দখল করে নেবে। ২২শে অক্টোবর দলটা মিকুলিনো গ্রাম থেকে শামশেভো গ্রামের দিকে যাচ্ছিল। মিকুলিনো ও শামশেভোর মাঝখানে রাস্তার বাঁ দিকে মস্তবড় সব জঙ্গল কোথাও একেবারে রাস্তা পর্যন্ত প্রসারিত, আবার কোথাও বা রাস্তা থেকে এক ভার্স্ট বা তার কিছু দূরে

অবস্থিত। দেনিসভ ও তার দল সারাদিন সেই জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে গেল; কখনও জঙ্গলের বেশ ভিতর দিয়ে, কখনও বা জঙ্গলের একেবারে কিনারা ধরে; কিন্তু কোন সময়ই আগুয়ান ফরাসী দলটিকে দৃষ্টির বাইরে যেতে দিল না। সকালেই দেনিসভের দলের কসাকরা ঘোড়ার জিন-ভর্তি দুটো মালগাড়িকে আক্রমণ করে নিয়ে এল; জঙ্গল যেখানে রাস্তার খুব কাছাকাছি পৌছে গেছে সেখানে গাড়ি দুটো কাদায় আটকে গিয়েছিল। তারপর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দলটা ফরাসীদের উপর সারাক্ষণ নজর রেখেছে, কিন্তু আক্রমণ করে নি। ফরাসী দলটাকে নির্ভয়ে চুপচাপ শাম্‌শেভোতে পৌছতে দেওয়া দরকার, কারণ পূর্ব ব্যবস্থা মত সেখানে একটি পাহারাওয়ালার কুটিরে দলখভের আসার কথা আছে; তারপরেই ভোরবেলা তারা অতর্কিতে দুদিক থেকে দলটার মাথার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে তুষারপিণ্ডের মত; এক আঘাতেই তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে দখল করে নেবে।

তাদের পিছনে মিকুলিনো থেকে দুই ভার্স্ট দূরে জঙ্গলটা যেখানে রাস্তা পর্যন্ত প্রসারিত সেখানে ছয় জন কসাককে মোতায়েন করা হয়েছে; কোন নতুন ফরাসী দলকে দেখা গেলে সঙ্গে সঙ্গে তাদের খবর দিতে হবে।

শামেশেভো ছাড়িয়ে রাস্তার উপর অনুরূপভাবে নজর রাখবে দলখভ; অন্য ফরাসী সৈন্যরা কতদূরে আছে সেদিকে খেয়াল রাখবে সে। তাদের হিসাবমত এই দলটাতে পনেরো শ' লোক আছে। দেনিসভের আছে দু'শ,' আর দলখভের লোকের সংখ্যাও ঐরকমই। কিন্তু সংখ্যার এই তারতম্য দেনিসভকে দমাতে পারল না। তার এখন একমাত্র জানা দরকার এরা সব কোন্‌ সৈন্য এবং শত্রুপক্ষের ভিতর থেকে একটা "জিভ"—অর্থাৎ একটা লোককে গ্রেপ্তার করা যায় কি না সকালবেলাকার মালগাড়ির উপর আক্রমণটা এত দ্রুত সারা হয়েছিল যে মালগাড়ির সঙ্গে যে ফরাসী সৈন্য ছিল তাদের সকলকেই মেরে ফেলা হয়েছে; কেবল একটা ঢাক বাজিয়ে ছেলেকে জীবন্ত ধরা হয়েছে; কিন্তু যেহেতু সেও দলছাড়া তাই সেনাদল সম্পর্কে বিশেষ কোন খবরই সে বলতে পারল না।

গোটা সেনাদল পাছে সতর্ক হয়ে যায় এই ভয়ে দ্বিতীয়বার আক্রমণ করাটা দেনিসভ বিপজ্জনক বলেই মনে করছে। তাই সে তার দলের চাষী তিখন শ্‌চেরবাতিকে শাম্‌শেভোতে পাঠিয়েছে, যাতে সে অন্তত এমন একজন ফরাসী ভাণ্ডারীকেও ধরে আনতে পারে যাকে আগে আগে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অধ্যায়—৪

হেমন্তের একটি আতপ্ত বর্ষার দিন। আকাশে ও দিগন্তে ঘোলা জলের রং। মাঝে মাঝে একটা কুয়াসা নেমে আসছে, আর তারপরেই হঠাৎ বৃষ্টির

তির্যক ফোঁটা পড়তে শুরু করছে।

গায়ে জোব্বা ও মাথায় ভেড়ার চামড়ার টুপি চড়িয়ে দেনিসভ একটা শুঁটকো ঘোড়ায় চেপে চলেছে। পোশাক বেয়ে বৃষ্টির ধারা গড়িয়ে পড়ছে। ঘোড়াটা মাথা ঘুরিয়ে কান হেলিয়ে চলেছে। ঘোড়ার মতই বৃষ্টির ছাঁট এড়াবার জন্য সেও মুখ ঘুরিয়ে সাবধানে সামনের দিকে তাকাচ্ছে। ছোট ঘন কালো দাড়িওয়ালা সরু মুখটাকে রাগী দেখাচ্ছে।

দেনিসভের পাশেই যথারীতি রয়েছে তার এক সহকর্মী; জোব্বা ও ভেড়ার চামড়ার টুপি পরে সেও চলেছে একটা বড় চকচকে ডন ঘোড়ায় চেপে।

তৃতীয় এসাউল লভায়েস্কি লোকটি দীর্ঘকায়; একটা তীরের মত খাড়া; মুখ বিবর্ণ, চুল ভাল, কুত্‌কুতে হাল্কা চোখ, মুখে ও চালচলনে শান্ত আত্ম-তুষ্টির প্রকাশ।

তাদের আগে আগে হেঁটে চলেছে একটি চাষী পথ-প্রদর্শক। পরনে ধূসর চাষী কোট, মাথায় সাদা বোনা টুপি।

কিছুটা পিছনে মস্ত লেজ ও লোমশ একটা ছোট, শুট্‌কো কির্‌ঘিজ ঘোড়ায় চেপে চলেছে নীল রঙের ফরাসী ওভারকোট পরা একটি তরুণ অফিসার। ঘোড়াটার মুখ থেকে রক্ত ঝরছে।

তার পিছনে ঘোড়ায় চেপে চলেছে একজন হুজার। তার পিছনে ঘোড়ার পাছার উপর বসে চলেছে ছেঁড়া ফরাসী ইউনিফর্ম ও নীল টুপি পরা একটা ছেলে। ঠাণ্ডা লাল হাত দিয়ে ছেলেটা হুজারকে ধরে আছে; ভুরু তুলে অবাক হয়ে চারদিকে তাকাচ্ছে। এটিই সে ফরাসী ঢাক-বাজিয়ে ছেলে যাকে সকালে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

তাদের পিছন-পিছন জঙ্গল-কাটা বনপথ ধরে চলেছে তিন-চার সারি হুজার, তারপর কসাক; তাদের কারও পরনে পশমী জোব্বা, কারও ফরাসী ওভারকোট, কারও বা মাথায় ঘোড়ার কাপড় ছড়ানো। ঘোড়াগুলো আসলে বাদামী বা ফুট্‌ফুট রঙের যাই হোক না কেন, বৃষ্টিতে ভিজে এখন সবগুলোকেই কালো দেখাচ্ছে। লোমগুলো ভিজে জট পাকিয়ে যাওয়ায় ঘাড়গুলোকে খুব সরু মনে হচ্ছে। গা থেকে ধোঁয়া উঠছে। জামা, জিন, লাগাম, সব কিছুই রাস্তায় জমে-থাকা পচা পাতার মত জলে ভিজে পিছল ও স্যাঁৎসেতে হয়ে উঠেছে। বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত কসাকদের সারির মধ্যে ফরাসী ও কসাকদের ঘোড়ায় টানা দুটো মালগাড়ি গাছের কাটা ডালপালা ও গর্তের জলের ভিতর দিয়ে কোন রকমে এগিয়ে চলেছে।

রাস্তার মধ্যে একটা জলের গর্তকে এড়িয়ে চলতে গিয়ে দেনিসভের ঘোড়াটা একপাশে কিছুটা সরে যেতেই চালকের হাঁটুটা একটা গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেল।

"আঃ, মহা শয়তান!" দেনিসভ রেগে চেঁচিয়ে উঠল; দাঁত বের করে তিন চাবুক কসাল ঘোড়াটার পিঠে; নিজের ও সঙ্গীদের গায়ে ছিটকে এসে কাদা লাগল।

একে বৃষ্টি তায় ক্ষুধা (সকাল থেকে কারও কিছু খাওয়া হয় নি), দেনিসভের মন-মেজাজ এমনিতেই ভাল নেই; তার উপর এখনও পর্যন্ত দলখভের কোন পাত্তা নেই, এবং একটা "জিভ্"কে আটক করতে যে লোকটাকে পাঠানো হয়েছে সেও এখনও ফেরে নি।

"একটা যান-বাহনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আজকের মত সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। একা একা ওদের আক্রমণ করার অনেক ঝুঁকি; আর আক্রমণটা যদি একদিন পিছিয়ে দেই তাহলে বড় কোন গেরিলা দল আমাদের নাকের উপর দিয়ে শিকারটা ছিনিয়ে নিয়ে যাবে।" ভাবতে ভাবতেই দেনিসভ অনবরত সামনের দিকে তাকাচ্ছে; মনে আশা, যদি দলখভের কোন লোককে দেখতে পায়।

জঙ্গলের মধ্যে এমন একটা পথে তারা পৌঁছে গেল যেখান থেকে ডান দিকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। দেনিসভ থামল।

বলল, "কে যেন আসছে।"

এসাউলও সেইদিকে তাকাল। বলল, "দুজন আসছে, একজন অফিসার ও একজন কসাক। কিন্তু লেফ্টেনান্ট-কর্ণেল স্বয়ং আসছেন বলে তো মনে হচ্ছে না।"

একটা উৎরাই ধরে নেমে যাওয়ার ফলে অশ্বারোহী দুজনকে আর দেখা গেল না; কিন্তু কয়েক মিনিট পরে আবার তারা দেখা দিল। সামনে একজন অফিসার; চুল ও পোশাক জলে ভিজে গেছে; হাতের চামড়ার চাবুকটা চালাচ্ছে; ট্রাউজার উঠে গেছে হাঁটুর উপরে। পিছনে রেকাবে পা রেখে দাঁড়িয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে একটি কসাক। অফিসারটির বয়স খুবই অল্প, চওড়া গোলাপী মুখ, তীক্ষ্ণ ফুর্তিবাজ চোখ; ঘোড়া ছুটিয়ে দেনিসভের কাছে পৌঁছে তার হাতে একটা ভেজা খাম দিল।

বলল, "জেনারেলের কাছ থেকে। খামটা শুকনো নেই বলে ক্ষমা করবেন।"

ভুরু কুঁচকে দেনিসভ খামটা নিয়ে খুলে ফেলল।

লভায়েস্কিকে লক্ষ্য করে অফিসারটি বলল, "সেখানে সকলেই অনবরত বলেছে: 'এটা বিপজ্জনক, এটা বিপজ্জনক।' কিন্তু কমারভ ও আমি—" কসাকটিকে দেখাল—"প্রস্তুত ছিলাম। আমাদের প্রত্যেকের একটা করে পিস্তল আছে।…কিন্তু এ কে?" ঢাক-বাজিয়ে ছোকরাকে দেখে সে প্রশ্ন করল। "কোন বন্দী কি? আপনারা এরই মধ্যে লড়াই শুরু করে দিয়েছেন? ওর সঙ্গে কথা বলতে পারি কি?"

চিঠিটা পড়ে দেনিসভ চেঁচিয়ে বলল, "রস্তভ! পেত্য়া! কেন বল নি তুমি কে?" সে হেসে তরুণের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিল।

অফিসারটি পেত্য়া রস্তভ।

সারাটা পথ পেত্য়া নিজেকে তালিম দিতে দিতে এসেছে—পূর্ব পরিচয়ের কথা না জানিয়ে দেনিসভের সঙ্গে একজন বয়স্ক লোকের মতই ব্যবহার করবে। কিন্তু দেনিসভ হেসে উঠতেই পেত্য়ার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, খুশিতে তাতে লালের ছোপ লাগল, এতক্ষণ পর্যন্ত যে সরকারী আদব-কায়দার তালিম নিচ্ছিল সেটা ভুলে গিয়ে দেনিসভকে বলতে লাগল, ইতিমধ্যেই ভিয়াজমার কাছে একটা যুদ্ধে সে অংশ নিয়েছে, এবং হুজার হিসাবে সেখানে বেশ বিখ্যাত হয়ে উঠেছে।

দেনিসভ তাকে বাধা দিয়ে বলল, "তোমাকে দেখে খুশি হলাম।" তার মুখে আবার উদ্বেগের চিহ্ন ফুটে উঠল।

সঙ্গীকে বলল, "মাইকেল ফিয়কৃলিতিচ, জান আবার সেই জার্মানের চিঠি।" পেত্য়াকে দেখিয়ে বলল, "ও তো তার অধীনেই আছে।"

দেনিসভ সঙ্গীকে জানাল, চিঠিতে জার্মান জেনারেলটি আবারও সেই দাবীই জানিয়েছে যে যানবাহনের উপর আক্রমণ চালাতে সে যেন তার সঙ্গে হাত মেলায়।

তারপর বলল, "আমরা যদি এ সুযোগ না নেই, তাহলে কাল সেই আমাদের নাকের উপর দিয়ে সুযোগটা ছিনিয়ে নেবে।"

নতুন করে অ্যাড্‌জুটান্ট ও জেনারেলের খেলা শুরু করে পেত্য়া অভিবাদনের ভঙ্গীতে হাত তুলে বলল, "কোন হুকুম দেবেন কি ইয়োর অনার? না কি আমি আপনার সঙ্গেই থাকব?"

"হুকুম?" দেনিসভ চিন্তিতভাবে বলল। "তুমি কি কাল পর্যন্ত থাকতে পারবে?"

"আহা, তাই করুন···আমি আপনার সঙ্গে থাকতে পারি কি?" পেত্য়া চেঁচিয়ে বলল।

দেনিসভ শুধাল, "কিন্তু জেনারেল তোমাকে ঠিক কি বলে দিয়েছে? এখনি ফিরতে বলেছে কি?"

পেত্য়ার মুখ লাল হয়ে উঠল।

"তিনি কিছুই বলেন নি। আমার তো মনে হয় থাকতে পারি।"

দেনিসভ বলল, "বেশ, ঠিক আছে।"

নিজের লোকদের দিকে ফিরে একটা দলকে বিশ্রামস্থলে যেতে বলল; জায়গাটা জঙ্গলের মধ্যে পাহারাদারের কুটিরের কাছে; কিরঘিজ ঘোড়সওয়ার অফিসারটিকে বলল দলখভের খোঁজ করতে এবং সে সন্ধ্যায় আসবে কি না সেটা জানতে। দেনিসভের নিজের ইচ্ছা, সঙ্গী ও পেত্য়াকে নিয়ে

জঙ্গলের সেই প্রান্তে চলে যাবে যেখানে সেটা শাম্‌শেভো পর্যন্ত বিস্তৃত ; ফরাসীদের যে সাময়িক আশ্রয়স্থলটাকে পরদিন আক্রমণ করা হবে সেখান থেকে তার কিছু অংশের উপর নজর রাখা যাবে।

চাষী পথ-প্রদর্শককে বলল, "আচ্ছা বুড়ো, আমাদের শাম্‌শেভোতে নিয়ে চল।"

দেনিসভ, পেত্‌য়া, ও সঙ্গীটি কসাক ও হুজারদের সঙ্গে নিয়ে একটা খাঁড়ি পেরিয়ে বাঁ দিক দিয়ে জঙ্গলের শেষ প্রান্তের দিকে ঘোড়া চালিয়ে দিল।

অধ্যায়—৫

বৃষ্টি থেমে গেছে। শুধু কুয়াসা নামছে, আর গাছ থেকে জলের ফোঁটা পড়ছে। দেনিসভ, তার সঙ্গী ও পেত্‌য়া নীরবে চলেছে। তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বোনা টুপি মাথায় চাষীটি। বাকলের জুতো পায়ে গাছের শিকড় ও ভেজা পাতার উপর দিয়ে সে নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে জঙ্গলের শেষ প্রান্তের দিকে।

একটা উঁচু জায়গায় উঠে সে থামল, চারদিকে তাকাল, তারপর যেখানে গাছগুলো ফাঁকাফাঁকা সেইদিকে এগিয়ে চলল। একটা বড় ওক গাছের পাতাগুলি এখনও ঝরে পড়েনি। সেখানে পৌঁছে হাত বাড়িয়ে সে রহস্যজনকভাবে ইঙ্গিতে কি যেন দেখাল।

দেনিসভ ও পেত্‌য়া ঘোড়া ছুটিয়ে তার কাছে এগিয়ে গেল। চাষীটি যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে তারা ফরাসীদের দেখতে পেল। বনের ঠিক ওপারে একটা উৎরাইয়ের বুকে বসন্তকালীন গমের একটা ক্ষেত দেখা গেল। ডান দিকে একটা গভীর খাঁড়ির ওপারে একটা ছোট গ্রাম ও ভাঙা ছাদওয়ালা একটা বাড়িও আছে। গ্রামের মধ্যে, বাড়িটাতে, বাগানে, কূয়োর পাশে, পুকুরের ধারে, সবটা উঁচু জায়গায়, সেতুটা থেকে রাস্তা বরাবর পাঁচ'শ' গজ দূর পর্যন্ত আগাগোড়া মানুষের পর মানুষের জমায়েত চোখে পড়ল কাঁপা কাঁপা কুয়াসার ভিতর দিয়ে। অ-রুশ ভাষায় ঘোড়াগুলোকে ডাকাডাকি এবং পরস্পরের কথাবার্তা পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে।

ফরাসীদের উপর থেকে চোখ না সরিয়েই দেনিসভ নীচু গলায় বলল, "বন্দীকে এখানে নিয়ে এস।"

একটি কসাক ঘোড়া থেকে নেমে ছেলেটিকে তুলে দেনিসভের কাছে নিয়ে গেল। ফরাসী সৈন্যদের দেখিয়ে দেনিসভ তাকে জিজ্ঞাসা করল, এখানে-ওখানে যারা রয়েছে তারা কারা। ঠাণ্ডা হাত দুটো পকেটে ঢুকিয়ে ভুরু দুটো তুলে ছেলেটি সভয়ে দেনিসভের দিকে তাকাল, কিন্তু যা কিছু সে

জানে সব কথা বলার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সে এলোমেলো জবাব দিতে লাগল ; দেনিসভ যা জিজ্ঞাসা করল তাতেই সায় দিয়ে চলল। ভুরু কুঁচকে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে দেনিসভ তার সঙ্গীর অনুমান জানতে চাইল।

পেত্য়া দ্রুত মাথা ঘুরিয়ে একবার ঢাক-বাজিয়ে ছেলেটির দিকে, একবার দেনিসভের দিকে, একবার তার সঙ্গীর দিকে, এবং একবার গ্রাম ও পথ বরাবর অবস্থিত ফরাসীদের দেখতে লাগল। তার একমাত্র চেষ্টা, কোন কিছুই যেন দৃষ্টি না এড়ায়।

চোখ মিট্‌মিট্‌ করতে করতে দেনিসভ বলল, "দলখভ আসুক আর না আসুক, আমরা ওদের দখল করবই।"

সঙ্গী বলল, "জায়গাটা খুবই উপযুক্ত।"

দেনিসভ বলল, "ঠিক আছে, জলাভূমির পাশ দিয়ে পদাতিক সেনাদের পাঠাও। তারা বাগানটা পর্যন্ত ধেয়ে যাবে। তুমি কসাকদের নিয়ে ওখানে গিয়ে ঘিরে ফেলবে"—সে গ্রামের ওপারে জঙ্গলের মধ্যে একটা জায়গা দেখাল—"আর হুজারদের নিয়ে আমি যাব এখান থেকে। আর সংকেত করা মাত্রই গুলি···"

সঙ্গী বলল, "গহ্বরটা অনতিক্রমণীয়—ওখানেও একটা জলাভূমি আছে। ঘোড়াগুলো ডুবে যাবে। আমাদের ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে হবে আরও বাঁ দিক দিয়ে···"

তারা যখন নীচু গলায় কথা বলছে সেই সময় পুকুরের পাশের নীচু জমিটা থেকে একটা গুলির শব্দ হল, একটা সাদা ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা গেল, তারপর আর একটা, আর সঙ্গে সঙ্গে নীচের ঢালু জায়গাটা থেকে শত শত ফরাসীর খুশির হৈ-হল্লা শোনা গেল। মুহূর্তের জন্য দেনিসভ ও তার সঙ্গী সরে গেল। তারা এত কাছে চলে গিয়েছিল যে তারা ভাবল যে তারাই এই গুলি ও হৈ-হল্লার কারণ। কিন্তু তাদের জন্য সেসব হয় নি। আরও নীচে একটা লোক লাল পোশাক পরে জলাভূমির ভিতর দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল। ফরাসীরা তাকে লক্ষ্য করেই গুলি ছুঁড়েছে, চেঁচামেচি করেছে।

সঙ্গীটি বলল, "সে কি, ও যে আমাদের তিখন।"

"তাই তো! তাই তো!"

"রাস্কেল।" দেনিসভ বলল।

"ও ঠিক চলে যাবে," চোখ কুঁচকে সঙ্গী বলল।

যাকে ওরা তিখন বলল সে দৌড়ে নদীর কাছে গিয়ে জলে ঝাঁপ দিল, জল ছিটকে উঠল, মুহূর্তের জন্য অদৃশ্য হয়ে গেল, তারপর হাত-পা ছুঁড়ে জল থেকে উঠেই ছুট লাগাল। ফরাসীরা তার পিছু নিয়ে শেষটা থেমে গেল।

"লোকটা চালাক আছে," সঙ্গীটি বলল।

বিরক্ত মুখে দেনিসভ বলল, "কি জানোয়াররে বাবা। এতক্ষণ ও কি

করছিল ?"

"লোকটা কে ?" পেত্য়া শুধাল।

আমাদের "প্লাস্তন" (পদাতিক বন্দুকবাজ)। একটা "জিভকে" ধরে আনতে ওকে পাঠিয়েছিলাম।

"ওঃ, তাই," পেত্য়া এমনভাবে মাথা নেড়ে কথাটা বলল যেন সে সব কিছু বুঝতে পেরেছে ; আসলে কিন্তু সে কিছুই বোঝে নি।

তিখন শ্চেরবাতি তাদের দলের অপরিহার্য লোকদের অন্যতম। সে গঝাত নদীর কাছাকাছি পক্রোভ্স্ক-এর একজন চাষী। কাজের ভার নিয়ে দেনিসভ যখন প্রথম পক্রোভ্স্ক-এ এসেছিল এবং গ্রাম-প্রধানকে ডেকে ফরাসীদের খোঁজ-খবর জানতে চেয়েছিল তখন অন্য সব গ্রাম প্রধানদের মতই নিজেকে বাঁচাবার জন্য সে বলেছিল, কোন ফরাসীকে সে দেখে নি, বা তাদের সম্পর্কে কিছু শোনেও নি। কিন্তু দেনিসভ যখন বুঝিয়ে বলল যে ফরাসীদের মেরে ফেলাই তার উদ্দেশ্য, আর তাই সে জানতে চাইছে সে-অঞ্চলে কোন ফরাসী এসেছে কি না, তখন গ্রাম-প্রধান জবাব দিল যে কিছু লুটেরা তাদের গ্রামে এসেছিল, কিন্তু একমাত্র তিখন শ্চেরবাতিই তাদের খোঁজ খবর রাখে। দেনিসভ তিখনকে ডাকিয়ে এনে তার কাজকর্মের অনেক প্রশংসা করে গ্রাম-প্রধানের সামনেই জার ও দেশের প্রতি আনুগত্য এবং পিতৃভূমির সব সন্তানেরই যে ফরাসীদের ঘৃণা করা উচিত সেবিষয়ে কিছু কথা বলেছিল।

দেনিসভের কথায় ভয় পেয়ে তিখন বলেছিল, "আমরা তো ফরাসীদের কোন ক্ষতি করি নি। কি জানেন, তাদের নিয়ে একটু মজা করেছি আর কি। জন বিশেকের মত লুটেরাদের মেরে ফেলেছি বটে, কিন্তু আর কারও কোন ক্ষতি তো করি নি…"

পরদিন চাষীটির কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে দেনিসভ যখন পক্রোভ্স্ক ছেড়ে চলে গেল তখন তাকে জানানো হল যে তিখন তাদের দলে যোগ দিয়েছে এবং তাদের সঙ্গে থাকার অনুমতি চাইছে। দেনিসভ অনুমতি দিয়েছে।

প্রথম দিকে তিখন আজেবাজে কাজগুলি করত ; আগুন জ্বালাত, জল আনত, মরা ঘোড়ার চামড়া ছাড়াত, ইত্যাদি ; কিন্তু অচিরেই দলীয় লড়াইয়ের প্রতি তার আকর্ষণ ও যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া গেল। রাতের বেলা লুঠতরাজ করতে বেরিয়ে ফরাসীদের পোশাক ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসত ; বলে দিলে কিছু বন্দীও ধরে আনত। তখন দেনিসভ তাকে আজেবাজে কাজ থেকে মুক্তি দিয়ে অভিযানে বের হবার সময় তাকে সঙ্গে নিত এবং তাকে কসাকদের সঙ্গে ভর্তি করে নিল।

তিখন ঘোড়ায় চড়তে ভালবাসে না ; সব সময় পায়ে হেঁটে চলে ; কিন্তু

কখনও অশ্বারোহীদের থেকে পিছনে পড়ে থাকে না। তার সঙ্গে থাকে একটা ছোট বন্দুক, একশ' বর্শা ও একটা কুড়ুল। তিখন খুব ভালভাবে কাঠ চিরতে পারে, কুড়ুল দিয়ে ছোট ছোট কাঠের পেরেক ও চামচে বানাতে পারে। দেনিসভের দলে তার একটা বিশিষ্ট আসন তৈরি হয়েছে। যখনই বিশেষ কষ্টকর ও বাজে কোন কাজ করার দরকার হয়—একটা গাড়িকে কাদার ভিতর থেকে ঠেলে তোলা, লেজ ধরে টেনে একটা ঘোড়াকে জলাভূমির ভিতর থেকে বের করে আনা, তার ছাল ছাড়ানো, ফরাসীদের মধ্যে ঢুকে পড়া, অথবা একদিনে ত্রিশ মাইলের বেশী হাঁটা—তখন সকলেই হাসতে হাসতে তিখনকে দেখিয়ে দেয়।

সকলেই বলে, "এতে শয়তানটার কিছু হবে না—ও তো ঘোড়ার মত শক্তি রাখে।"

একবার তিখন একটি ফরাসীকে গ্রেপ্তার করবার চেষ্টা করলে ফরাসীটি পিস্তল ছুঁড়ে তার পিঠের মাংসল জায়গাটাতে গুলি করেছিল। ভদ্কা খেয়ে ও তার প্রলেপ লাগিয়েই তিখন সে ঘাটা সারিয়ে তুলেছিল। সেই থেকে দলের সকলেই ঘটনাটা নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করে, আর তিখনও হাসিমুখে তাতে যোগ দেয়।

কসাকরা তাকে ক্ষেপাবার জন্য বলে, "হ্যালো সাঙাৎ! আর কখনও যাবে? কেমন একখানা দিয়েছে?" তিখন রাগের ভান করে ইচ্ছা করেই চোখ-মুখ পাকিয়ে ফরাসীদের সম্পর্কে নানারকম হাসির কথা বলে এই ঘটনায় তিখনের আচরণে একটাই পরিবর্তন দেখা গেল—আহত হবার পর থেকে সে আর কাউকে বন্দী করে আনে না।

দলের মধ্যে সেই সবচাইতে সাহসী ও দরকারী লোক। আক্রমণের অধিকতর সুযোগ আর কেউ পায় নি, আর কেউই তার চাইতে বেশী ফরাসীদের গ্রেপ্তার করতে বা মারতে পারে নি; ফলে সব কসাক ও হুজাররাই তাকে ভাঁড় বানিয়ে তুলেছে, আর সেও স্বেচ্ছায় সে ভূমিকাটিকে মেনে নিয়েছে। গত রাতে দেনিসভ তাকে শামশেভো পাঠিয়েছে একটি "জিভ"কে গ্রেপ্তার করে আনতে। কিন্তু হয় মাত্র একটি ফরাসীকে নিয়ে আসতে তার মন চায় নি, অথবা সারা রাত ঘুমিয়ে কাটিয়েছে; কারণ যাই হোক এখন দিনের বেলায় ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে একেবারে ফরাসীদের আওতার মধ্যে ঢুকে পড়েছে এবং—উপর থেকে দেনিসভ যে-রকমটা দেখতে পেয়েছে—ফরাসীরাও তাকে ঠিক দেখতে পেয়েছিল।

অধ্যায়—৬

পরদিনের আক্রমণ সম্পর্কে সঙ্গীর সঙ্গে কিছু কথা বলে দেনিসভ ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ফিরে চলল।

পেত্য়াকে বলল, "চল হে ছেলে, এবার গিয়ে শরীরটাকে শুকিয়ে নেওয়া যাক।"

পাহারা-ঘরে পৌঁছে দেনিসভ থেমে জঙ্গলের দিকে ভাল করে তাকাল। গাছপালার ভিতর দিয়ে একটি লোক লম্বা হাল্কা পায়ে এগিয়ে আসছে। তার পা দুটি লম্বা, লম্বা হাত দুটি দু' পাশে ঝুলছে, পরনে খাটো কুর্তা, বাকলের জুতা ও কাজান টুপি। তার কাঁধে একটা ছোট বন্দুক, আর কোমরবন্ধে একটা কুড়ুল গোঁজা। দেনিসভকে দেখেই সে তাড়াতাড়ি কি একটা যেন ঝোপের মধ্যে ছুঁড়ে দিল, মাথার ভিজে টুপিটা খুলল। তারপর কম্যাণ্ডারের দিকে এগিয়ে গেল। লোকটি তিখন। বলীরেখা ও ছোট ছোট গর্তভরা মুখ ও ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ দুটি আত্মতৃপ্তির খুশিতে ঝিল্‌মিল্‌ করছে। মাথাটা তুলে যেন একটা হাসিকে চেপে রেখে দেনিসভের দিকে তাকাল।

"আচ্ছা, তুমি কোথায় উধাও হয়েছিলে," দেনিসভ শুধাল।

ক্যাসফেঁসে অথচ সুরেলা মোটা গলায় তিখন সাহসের সঙ্গে তাড়াতাড়ি জবাব দিল, "কোথায় উধাও হয়েছিলাম? আমি তো গিয়েছিলাম ফরাসী-দের ধরে আনতে।"

"দিনের আলোয় ওখানে ঢুঁ মেরেছিলে কেন? গাধা কোথাকার! আচ্ছা, একটাকেও আন নি কেন?"

"আহা, একটাকে তো ঠিকই এনেছিলাম," তিখন বলল।

"সে কোথায়?"

"দেখুন, খুব ভোরেই তাকে ধরেছিলাম," তিখন বলতে লাগল। "তাকে জঙ্গলে নিয়ে এলাম। পরে বুঝলাম তাকে দিয়ে কোন কাজ হবে না। তাই ভাবলাম আবার গিয়ে একটু ভাল কাউকে আনব।"

দেনিসভ সঙ্গীকে বলল, "দেখলে তো?...কী শয়তান—ঠিক যা ভেবে-ছিলাম। তাকেই নিয়ে এলে না কেন?"

তিখন সঙ্গে সঙ্গে সক্রোধে বলে উঠল, "তাকে এনে কি লাভ হত? তাকে দিয়ে আপনার কাজ হত না। আপনার কি রকম লোক চাই তা যেন আমি জানি না!"

"তুমি একটা জানোয়ার!...তারপর?"

তিখন বলতে লাগল, "আর একজনের খোঁজে গেলাম। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এইভাবে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে শুয়ে পড়লাম। (হঠাৎ সে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল।) একজন এসে হাজির হল, অমনি তাকে জাপটে ধরলাম, এইভাবে। (সে লাফিয়ে উঠল।) বললাম, 'চল কর্ণেলের কাছে।' সে চেঁচাতে শুরু করে দিল, আর হঠাৎ তারা চারজন হয়ে গেল। ছোট ছোট তলোয়ার নিয়ে তারা আমার দিকে ধেয়ে এল। আমিও কুড়ুল নিয়ে রুখে দাঁড়ালাম, এইভাবে: বললাম, 'তোমরা কি করতে চাও? খ্রীস্ট তোমাদের

সহায় হোন !" বুকটা চিতিয়ে ক্রুদ্ধ গলায় চীৎকার করে হাত নেড়ে তিখন বলল।

চোখ মিট্‌মিট্‌ করে তাকিয়ে সঙ্গীটি বলল, "হ্যাঁ, তুমি যে জলের ভিতর দিয়ে কিভাবে পালাচ্ছিলে সেটা আমরা পাহাড়ের উপর থেকে দেখেছি।"

পেত্য়ার ভীষণ হাসি পেল, কিন্তু তারা কেউই হাসল না। এসবের অর্থ কি বুঝতে না পেরে সে একবার তিখনের মুখের দিকে, একবার সঙ্গীটির এবং একবার দেনিসভের মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

রাগে কাশতে কাশতে দেনিসভ বলল, "ওসব ভাঁড়ামি রাখ! প্রথম-টিকেই কেন ধরে আনলে না?"

তিখন এক হাতে পিঠ ও অন্য হাতে মাথা চুলকোতে লাগল; তারপর হঠাৎ বোকার মত দন্তপাতি বিকশিত করল; ফলে একটা পড়া দাঁতের ফোঁকলা জায়গাটা বেরিয়ে পড়ল (এই জন্যই তাকে শ চেরবাতি—অর্থাৎ ফোঁকলা-দাঁতি বলে ডাকে)। দেনিসভ মুচকি হাসল; পেত্য়া খুশিতে হো-হো করে হেসে উঠল; তিখনও সে হাসিতে যোগ দিল।

তিখন বলল, "আহা, সে যে একেবারেই অকর্মার ধাড়ি। তার পোশাক —তাও বাজে! তাকে আনি কেমন করে? আর কী অভদ্র, ইয়োর অনার। বলে কি না, 'আমি নিজেই তো একজন জেনারেলের ছেলে, আমি যাব না!'"

দেনিসভ বলল, "তুমি একটা জানোয়ার। আমি চেয়েছিলাম তাকে প্রশ্ন করে…"

তিখন বলল, "কিন্তু আমি তাকে প্রশ্ন করেছিলাম। সে বলল বিশেষ কিছু জানে না। আরও বলল, 'আমরা তো অনেকে রয়েছি, কিন্তু সকলেই এলেবেলে—নামেই সৈনিক। জোর গলায় একটা হাঁক দাও, দেখবে সবগুলো ধরা দেবে।'" দেনিসভের চোখে চোখ রেখে তিখন হেসে ফেলল।

"তোমাকে একশ' চাবুক লাগাব—ভাঁড়ামি করার মজা শিখিয়ে দেব!" দেনিসভ রুক্ষকণ্ঠে বলল।

তিখন সক্ষোভে বলল, "কিন্তু আপনি রাগ করছেন কেন? এমন ভাব দেখাচ্ছেন যেন আপনার ফরাসীদের আমি চোখেই দেখি নি। অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত সবুর করুন, আপনার যে ক'জন চাই এনে দেব—চান তো তিন জনকে এনে দেব।"

"ঠিক আছে; এবার চলা যাক," বলে দেনিসভ ঘোড়া চালিয়ে দিল; পাহারা-ঘর পর্যন্ত রাগে ভুরু কুঁচকে চুপচাপ চলতে লাগল।

তিখন কিছুটা পিছিয়ে পড়ল। পেত্য়া শুনতে পেল, তিখন যে বুটজোড়া ঝোপের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়েছিল তা নিয়ে কসাকরা তিখনের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করছে।

তিখনের কথা শুনে ও হাসি দেখে পেত্য়া যেরকম হাসির দমকে ফেটে পড়েছিল সেটা কেটে যেতে এবং তিখন একটা মানুষকে মেরে ফেলেছে সে-কথা বুঝবার পরে পেত্য়া খুব অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। সে ঢাক-বাজিয়ে ছেলেটার দিকে তাকাল; বুকের মধ্যে একটা ব্যথা অনুভব করল। কিন্তু এ অস্বস্তি শুধু মুহূর্তের জন্য। তার মনে হল, তাকে মাথা উঁচু করে চলতে হবে, সাহস দেখাতে হবে, আগামীকালের অভিযান সম্পর্কে সঙ্গীটির সঙ্গে আলোচনা করতে হবে; যে দলে সে এসে পড়েছে তার উপযুক্ত তাকে হতেই হবে।

যে অফিসারটিকে খবর নিতে পাঠানো হয়েছিল তার সঙ্গে পথেই দেখা হয়ে গেল। সে খবর দিল, দলখন্ড অচিরেই এসে পড়বে এবং সে বহাল তবিয়তেই আছে।

সঙ্গে সঙ্গে দেনিসভ খুশি হয়ে উঠল। পেত্য়াকে কাছে ডেকে বলল: "আরে, এবার তোমার কথা বল।"

অধ্যায়—৭

পরিবারের লোকজনরা মস্কো ত্যাগ করার পরেই পেত্য়া তাদের ছেড়ে নিজের রেজিমেণ্টে যোগ দেয় এবং অচিরেই একটা বড় গেরিলা দলের অধিনায়ক জেনারেল তাকে আর্দালি হিসাবে নিয়ে নেয়। কমিশন পাবার পর থেকে, বিশেষ করে যবে থেকে সে সক্রিয় সেনাদলে যোগ দিয়েছে এবং ভিয়াজ্মার যুদ্ধে অংশ নিয়েছে, তখন থেকে বড় হয়ে ওঠার একটা সানন্দ উত্তেজনা তাকে পেয়ে বসেছে; সত্যিকারের বীরত্বপূর্ণ কিছু করবার কোন সুযোগ যাতে হাতছাড়া হয়ে না যায় তার জন্য সে সদাসর্বদাই একান্ত তৎপর। সেনাবাহিনীতে এসে সে যা কিছু দেখেছে ও জেনেছে তাতে তার মন আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার এও মনে হয়েছে যে সে যেখানে যেখানে থাকছে না আসল বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধটা সেখানেই ঘটে যাচ্ছে। তাই যেখানে সে নেই সেখানেই ছুটে যেতে তার এত তাড়া।

২১শে অক্টোবর তার জেনারেল জানাল যে একজন কাউকে দেনিসভের দলের কাছে পাঠাতে হবে; তখন পেত্য়া এমন করুণভাবে সেখানে যাবার অনুমতি চাইল যে জেনারেল আপত্তি করতে পারল না। কিন্তু পাঠাবার সময় জেনারেলের মনে পড়ে গেল ভিয়াজ্মার যুদ্ধে পেত্য়ার পাগলের মত কাণ্ড-কারখানা; তাকে যেখানে পাঠানো হয়েছিল, সোজা রাস্তা ধরে সেদিকে না গিয়ে সে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছিল ফরাসী অগ্রবর্তী বাহিনীর একেবারে গোলাগুলির মুখে এবং সেখানে দু' দু'বার নিজের পিস্তল থেকে গুলি ছুঁড়েছিল। তাই জেনারেল এখন স্পষ্ট করে তাকে বলে দিয়েছে,

দেনিসভের কোন অভিযানে সে অংশ নিতে পারবে না। তাই তো দেনিসভ যখন জিজ্ঞাসা করেছিল সে থেকে যেতে পারবে কি না তখন পেত্য়া জবাব দিতে ইতস্তত করেছিল ; তার চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। বনের প্রান্তে উপস্থিত হবার আগে পর্যন্ত পেত্য়া ভেবেছিল যে জেনারেলের নির্দেশ সে কঠোরভাবে মেনে চলবে এবং অবিলম্বে ফিরে যাবে। কিন্তু ফরাসীদের দেখতে পেয়ে এবং তিখনকে দেখার পরে যখন সে জানতে পারল যে সেরাতে নিশ্চয় একটা আক্রমণ চালানো হবে তখন সে হঠাৎ মতটা পাল্টে ফেলে স্থির করে বসল, যে জেনারেলকে সে এতদিন পর্যন্ত শ্রদ্ধা করে এসেছে সে একটি বদ্‌খত্ জার্মান, আর দেনিসভ একজন বীর, সঙ্গীটিও বীর, এমন কি তিখনও বীর ; তাই এই সংকটকালে তাদের ছেড়ে যাওয়া তার পক্ষে খুবই লজ্জা-জনক ব্যাপার হবে।

দেনিসভ, পেত্য়া ও সঙ্গীটি যখন পাহারা-ঘরে পৌঁছল তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। গোধূলির আলোয় ঘোড়াগুলোকে দেখা যাচ্ছে ; কসাক ও হুজাররা জঙ্গলের এমন জায়গায় আগুন জ্বালিয়েছে যেখান থেকে ফরাসীরা ধোঁয়া দেখতে পাবে না। ছোট পাহারা-ঘরের বারান্দায় জনৈক কসাক আস্তিন গুটিয়ে মাংস কাটছে। ঘরের মধ্যে দেনিসভের দলের তিনটি অফিসার একটা দরজাকে টেবিলের উপরকার কাঠে রূপান্তরিত করছে। পেত্য়া ভেজা পোশাক ছেড়ে সেগুলো শুকতে পাঠিয়ে সঙ্গে সঙ্গে খাবার টেবিল পাতার কাজে অফিসারকে সাহায্য করতে লেগে গেল।

দশ মিনিটের মধ্যে টেবিল তৈরি হয়ে গেল ; একটা তোয়ালেও বিছিয়ে দেওয়া হল। টেবিলে পরিবেশন করা হল ভদ্‌কা, এক ফ্লাস্ক রাম, সাদা রুটি, ঝলসানো মাংস ও নুন।

অফিসারদের সঙ্গে টেবিলে বসে দুই হাতে চর্বিওয়ালা সুস্বাদু মাংস ছিঁড়তে ছিঁড়তে পেত্য়ার মনে সকলের জন্য একটা শিশুসুলভ রোমাঞ্চকর ভালবাসা জেগে উঠল ; ফলে তার মনেও বিশ্বাস জন্মাল যে অন্যরাও তাকে সেইভাবেই ভালবাসে।

সে দেনিসভকে বলল, "আচ্ছা ভাসিলি দিমিত্রিচ, আপনি কি মনে করেন, আমার এখানে এই ক'টা দিন থাকা কি ঠিক হবে?" জবাবের জন্ত অপেক্ষা না করে সে নিজেই জবাবটা দিল : "দেখুন, আমাকে বলা হয়েছিল খুঁজে বের করতে—তা আমি তো খুঁজছি···শুধু আমাকে একেবারে ভিতরে···মানে আসল ঘটনার মধ্যে যেতে দেবেন···আমি কোন পুরস্কার চাই না···কিন্তু আমি চাই···"

পিছনে হেলান দিয়ে হাত নেড়ে দাঁতে দাঁত চেপে পেত্য়া চারদিকে তাকাতে লাগল।

দেনিসভ হেসে বলল, "একেবারে প্রধান ঘটনার মধ্যে···"

পেত্য়া বলতে লাগল, "শুধু দয়া করে আমাকে একটু পরিচালনার দায়িত্ব দিন, যাতে আমি সত্যি পরিচালনার সুযোগটা পাই। তাতে আপনার কি আসে-যায়?…ও হো, আপনার একটা ছুরি চাই?" জনৈক অফিসারের দিকে মুখ ঘুরিয়ে পেত্য়া বলল।

একটা ভাঁজ-করা ছুরি তার দিকে এগিয়ে দিল। অফিসার ছুরিটার প্রশংসা করল।

মুখ লাল করে পেত্য়া বলল, "দয়া করে ওটা রেখে দিন। আমার ওরকম আরও আছে।" হঠাৎ সে চেঁচিয়ে বলল, "হা ঈশ্বর! আমি তো একেবারেই ভুলে গেছি। আমার কাছে কিছু কিসমিস আছে, খুব ভাল জিনিস, একেবারে বীঁচি নেই। আমাদের সঙ্গে একজন নতুন দোকানী এসেছে, সে খুব ভাল ভাল জিনিস রাখে। আমি দশ পাউণ্ড কিনে নিয়েছি। মিষ্টি কিছু খাওয়াটা আমার অভ্যাস আপনাদেরও চাই তো?…" পেত্য়া ছুটে বারান্দায় বেরিয়ে গেল এবং কয়েকটা থলে ভর্তি প্রায় পাঁচ পাউণ্ড কিসমিস নিয়ে ফিরে এল। "আপনারা কিছু নিন, কিছু নিন!"

সঙ্গীটিকে জিজ্ঞাসা করল, "আপনার একটা কফি-পাত্র চাই, তাই না? দোকানীর কাছ থেকে আমি একটা চমৎকার কফি-পাত্র কিনেছি। তার জিনিসপত্রগুলোই চমৎকার। আর লোকটি খুব সৎ, সেটাই বড় কথা। আপনাকে একটা পাঠিয়ে দেব। আর আপনার চকমকি পাথরগুলো বোধ হয় অকেজো হয়ে গেছে, বা ক্ষয় হয়ে গেছে—মাঝে মাঝে ওরকম হয়। আমার সঙ্গেই কিছু পাথর আছে, এই দেখুন না"—একটা থলে দেখাল—একশ' পাথর আছে। খুব সস্তায় কিনেছি। যতগুলি চান নিয়ে নিন, দরকার হলে সবগুলিও…"

পরক্ষণেই বড় বেশী কথা বলে ফেলছে ভেবে সে হঠাৎ চুপ করে গেল। মনে করতে চেষ্টা করল, এই রকম বোকামির কাজ আর কিছু করেছে কি না। সারাদিনের ঘটনার কথা ভাবতে গিয়ে ঢাক-বাজিয়ে ছোকরাটার কথা মনে পড়ে গেল , "এখানে আমরা তো তোফা আছি, কিন্তু তার কি হল? এরা তাকে কোথায় রেখেছে? তাকে খেতে দিয়েছে তো? তার মনে আঘাত দেয় নি তো?" চকমকি পাথর নিয়ে অনেক কথা বলে ফেলায় এখন আর তার কথা বলতে সাহস হল না।

ভাবল, "তার কথা যদি জিজ্ঞাসা করি তো বলবে: 'ও নিজে ছেলে-মানুষ, তাই ছোট ছেলের প্রতি করুণা দেখাচ্ছে।' কাল দেখিয়ে দেব আমি ছেলেমানুষ কি না। আহা, ছেলেটার কথা জিজ্ঞাসা করলে কি খারাপ শোনাবে? ঠিক আছে, যা হয় হবে।"

সে শুধাল, "যে ছেলেটিকে বন্দী করা হয়েছে তাকে ডেকে এনে কিছু খেতে দিতে পারি কি?…হয় তো…"

দেনিসভ বলল, "সত্যি, ছেলেটা বেচারি। তাকে ডেকে আন। তার নাম ভিন্‌সেণ্ট বোসে। তাকে ডেকে পাঠাও।"

"আমিই ডেকে আনছি," পেত্‌য়া বলল।

"হ্যাঁ, হাঁা, ডাকো। বেচারি," দেনিসভ কথাটা আর একবার বলল।

পেত্‌য়া তখন দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল। অফিসারদের ফাঁক দিয়ে গলে সে দেনিসভের কাছে এসে বলল :

"আপনাকে একবার চুমো খেতে দিন। আঃ, আপনি কত ভাল, কত চমৎকার!"

দেনিসভকে চুমো খেয়ে সে দৌড়ে কুটির থেকে বেরিয়ে গেল।

দরজার বাইরে থেকে চেঁচিয়ে ডাকল, "বোসে! ভিন্‌সেণ্ট।"

অন্ধকারে কে যেন শুধাল, "কাকে চান স্যার?"

পেত্‌য়া জবাব দিল, যে ফরাসী ছেলেটিকে সেদিনই গ্রেপ্তার করা হয়েছে সে তাকেই খুঁজছে।

"ওঃ, ভেসেন্নি?" একজন কসাক বলল।

ছেলেটির নাম ভিনসেণ্ট। ইতিমধ্যেই কসাকরা তাকে "ভেসেন্নি" এবং চাষী ও সৈনিকরা "ভেস্‌নিয়া" বানিয়ে ফেলেছে। দুটো নামকরণেই বসন্ত (ভেস্‌না) কথাটার ইঙ্গিত রয়েছে; ছেলেটি সকলের মনে বসন্তের আমেজই এনে দিয়েছে।

"ওখানে আগুনের পাশে বসে শরীরটা গরম করছে। হো, ভেসেনিয়া! ভেসেনিয়া!—ভেসেন্নি!" অন্ধকারেই তারা হাসাহাসি করে ডাকতে লাগল।

পাশে দাঁড়ানো একটি হুজার বলল, "ছেলেটি বেশ চটপটে। কিছুক্ষণ আগেই আমরা তাকে কিছু খেতে দিয়েছি। তার ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছিল।"

অন্ধকারে কাদার ভিতর দিয়ে ছুটে আসা খালি পায়ের শব্দ শোনা গেল। ঢাক-বাজিয়ে ছেলেটি দরজায় হাজির।

পেত্‌য়া ফরাসীতে বলল, "আরে, এই যে তুমি! কিছু খাবে কি? কোন ভয় নেই, ওরা তোমাকে মারবে না। এস, ভিতরে এস।"

প্রায় শিশুর মত কাঁপা গলায় ছেলেটি বলল, "ধন্যবাদ মঁসিয়।" নোংরা পা দুটো চৌকাঠে ঘসতে লাগল।

ছেলেটিকে অনেক কথা বলার ইচ্ছা পেত্‌য়ার ছিল, কিন্তু বলবার সাহস হল না। একটু দাঁড়িয়ে থেকে ছেলেটির হাত ধরে চাপ দিল। "ভিতরে এস, ভিতরে এস!" শান্ত মৃদুস্বরে আর একবার কথাটা বলল। দরজাটা খুলে তাকেই আগে ঢুকতে দিল।

ছেলেটিকে ঢুকিয়ে দিয়ে পেত্‌য়া কিছুটা দূরে গিয়ে বসল। তার প্রতি মনোযোগ দেওয়াটা তার পক্ষে মর্যাদাহানিকর বলে মনে হল। পকেটে হাত

দিয়ে টাকাগুলি নাড়াচাড়া করতে লাগল। কিছু টাকা ঢাক-বাজিয়ে ছেলেটিকে দিলে কি সেটা হাস্যকর মনে হবে!

অধ্যায়—৮

দলখভ এসে পড়ায় পেত্য়ার মনোযোগ ঢাক-বাজিয়ে ছেলেটির উপর থেকে সরে গেছে। ইতিমধ্যেই দেনিসভ তাকে দিয়েছে মাংস ও ভদ্‌কা, তাকে পরিয়ে দিয়েছে একটা রুশ কোট যাতে অন্য বন্দীদের সঙ্গে পাঠিয়ে না দিয়ে তার দলেই রেখে দেওয়া হয়। সেনাদলে এসে দলখভের অসাধারণ সাহসিকতা ও ফরাসীদের প্রতি নিষ্ঠুরতার অনেক গল্প পেত্য়া শুনেছে। তাই সে কুটিরে ঢোকার পর থেকে পেত্য়া তার উপর থেকে চোখ সরায় নি, নিজের মনে সাহস এনে মাথা উঁচু করে রেখেছে। যাতে সে এই মহৎ সঙ্গের অনুপযুক্ত না হয়ে পড়ে।

দলখভের চেহারার সরলতায় পেত্য়া অবাক হয়ে গেল।

দেনিসভের পরনে কসাক কোট, মুখে দাঁড়ি, অঘটন-ঘটনকারী নিকলাসের মূর্তি তার বুকে, তার কথা বলার ধরন ও কাজকর্মই বলে দেয় তার অসাধারণ মর্যাদার কথা। কিন্তু যে দলখভ মস্কোতে পরত একটা পারসিক পোশাক, এখন তাকে দেখলে রক্ষীবাহিনীর একজন ঠিক-ঠিক অফিসার বলেই মনে হয়। তার মুখ পরিষ্কার করে কামানো, পরনে রক্ষীবাহিনীর মোটা কোট, বোতামের ঘরে একটা সেণ্ট জর্জের স্মরণ ঝোলানো, মাথায় একটা লুট-করা টুপি খাড়া করে বসানো। ভেজা পশমী জোব্বাটা ঘরের এক কোণে খুলে রেখে কারও সঙ্গে কুশল-বিনিময় না করে সোজা দেনিসভের কাছে গিয়ে কাজকর্ম সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করতে লাগল। দেনিসভ সব কথাই খুলে বলল।

"এই অবস্থা। কিন্তু তারা কি ধরনের সৈন্য আর তাদের সংখ্যাই বা কত সেসবই আমাদের অবশ্য জানতে হবে। সেখানে যাবার দরকার হবে। তারা সংখ্যায় কতজন আছে সেটা সঠিক না জেনে আমরা কাজ শুরু করতে পারি না। সুনির্দিষ্ট ও সঠিকভাবে কাজ করতে আমি ভালবাসি। এখানে—এই ভদ্রমশায়দের কেউ একজন কি আমার সঙ্গে ফরাসী শিবিরে যেতে পারবেন? আমি একটা বাড়তি ইউনিফর্ম এনেছি।"

"আমি, আমি···আমি যাব আপনার সঙ্গে," পেত্য়া বলল।

দলখভকে লক্ষ্য করে দেনিসভ বলল, "আপনার সেখানে যাবার কোনই দরকার নেই, আর ওকে তো আমি কিছুতেই যেতে দেব না···"

"এটা আমার পছন্দ!" পেত্য়া বলে উঠল। "কেন আমি যেতে পাব না?"

"কারণ যাওয়াটা বৃথা।"

"দেখুন, মাফ করবেন, কারণ…কারণ…আমি যাব, বাস। আপনি আমাকে সঙ্গে নেবেন তো?" দলখভের দিকে ফিরে সে বলল।

ফরাসী ঢাক-বাজিয়ে ছেলেটিকে ভাল করে লক্ষ্য করতে করতে দলখভ অন্যমনস্কভাবে বলল, "কেন নেব না?" দেনিসভকে শুধাল, "এই বাচ্চাটা কি অনেকদিন আপনার সঙ্গে আছে?"

"ওকে আজই ধরা হয়েছে, কিন্তু কিছুই জানে না। ওকে আমার সঙ্গেই রেখে দিচ্ছি।"

"বেশ, আর অন্যদের কোথায় রেখেছেন?" দলখভ জানতে চাইল।

"কোথায়? তাদের পাঠিয়ে দিয়েছি, আর একটা রসিদ নিয়েছি, দেনিসভ মুখ লাল করে চেঁচিয়ে বলল। "আর আমি সাহস করেই বলছি যে বিবেকের বিরুদ্ধে আমি একটা লোকেরও জীবন নেই নি। খোলাখুলিই বলছি, একজন সৈনিকের সম্মানকে কলংকিত করার পরিবর্তে ত্রিশ অথবা তিন শ' লোককে কড়া পাহারায় শহরে পাঠিয়ে দেওয়া কি আপনার পক্ষে কঠিন কাজ হত?"

নিরাসক্ত ব্যঙ্গের সুরে দলখভ বলল, "এই ষোল বছরের কাউণ্টের মুখে এসব অমায়িক কথা মানায়, কিন্তু আপনি এসব কথা বন্ধ করুন।"

পেত্য়া সলজ্জ ভঙ্গীতে বলল, "সে কি? আমি তো কিছু বলি নি! শুধু বলেছি, আপনার সঙ্গে অবশ্যই যাব।"

দলখভ বলতে লাগল, "দেখুন, আপনার আর আমার পক্ষে এ ধরনের কথা এখন বন্ধ করাই ভাল। আচ্ছা, এই ছেলেটাকে আপনার কাছে রেখেছেন কেন? ওর জন্য দুঃখ হচ্ছে বলে তো। আপনার এই "রসিদের" ব্যাপারটা কি আমরা জানি না? আপনি পাঠালেন একশ' আর সেখানে পৌঁছল ত্রিশ। বাকিরা হয় না খেয়ে মরে, নয় তো তাদের মেরে ফেলা হয়। সুতরাং তাদের না পাঠানোটাও কি আসলে একই ব্যাপার নয়?"

সঙ্গীটি তার হাল্কা রঙের চোখ দুটি কুঁচকে সমর্থনসূচক ঘাড় নাড়ল।

"সেটা কথা নয়। ব্যাপারটা নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই না। আমি শুধু এটাকে আমার বিবেকের উপর চাপিয়ে দিতে চাই না। আপনি বলছেন তারা তো মরবেই। ঠিক আছে। কিন্তু আমি তো মারছি না!"

দলখভ হাসতে লাগল।

"বিশ বার তো পার হয়ে গেল, কে তাদের বলেছিল আমাকে গ্রেপ্তার না করতে? আমাকে ধরতে পারলে তো একটা অস্পেন গাছেই ঝুলিয়ে দিত, আর যত উদারতাই দেখান আপনারও সেই একই হাল হত।" সে থামল। "যাই হোক, আমাদের কাজ তো চালাতেই হবে। কসাককে আমার কিটটা আনতে বলুন। তাতে দুটো ফরাসী ইউনিফর্ম আছে। দেখ হে, তুমি আমার

সঙ্গে যাচ্ছ তো ?" সে পেত্য়াকে শুধাল।

"আমি ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়," প্রায় অশ্রুসজল চোখে দেনিসভের দিকে তাকিয়ে পেত্য়া বলল।

দেনিসভের সব আপত্তির জবাবে পেতয়া শুধু বলল, যেন তেন প্রকারের বদলে সঠিকভাবে সব কাজ করতে সেও অভ্যস্ত, আর ব্যক্তিগত বিপদের কথা সে কখনও ভাবে না।

"কারণ আপনি নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে ওখানে তারা কতজন আছে সেটা যদি আমরা না জানতে পারি…তার উপর নির্ভর করছে শত শত জীবন, আর এদিকে আমরা মাত্র দু'জন। তাছাড়া, আমার যাবার একান্ত ইচ্ছা, আমি যাবই, কাজেই আমাকে বাধা দেবেন না," সে বলল। "তার ফল আরও বেশী খারাপ হবে…"

অধ্যায়—৯

ফরাসী গ্রেটকোট ও শাকো গায়ে চড়িয়ে পেত্য়া আর দলখভ ঘোড়ায় চেপে সেই খোলা জায়গাটায় গেল যেখান থেকে দেনিসভ ফরাসী শিবিরটা দেখতে পেয়েছিল। তারপর গাঢ় অন্ধকারে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে খাঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল। নীচে পৌছে দলখভ সঙ্গী কসাকদের সেখানেই অপেক্ষা করতে বলে রাস্তাটা ধরে সেতুর দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। উত্তেজনায় অধীর হয়ে পেত্য়া চলল তার পাশে পাশে।

ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "যদি ধরা পড়ি আমাকে ওরা জীবন্ত গ্রেপ্তার করতে পারবে না! আমার সঙ্গে পিস্তল আছে।"

অতি দ্রুত ফিস্ ফিস্ করে দলখভ বলল, "রুশ ভাষায় কথা বলো না," আর ঠিক সেইমুহূর্তে অন্ধকারের ভিতর থেকে তাদের কানে এল ; Qui vive (কে যায় ?) আর একটা বন্দুকের ধাতব শব্দ।

পেত্য়ার মুখে রক্ত উঠে এল ; পিস্তলটা চেপে ধরল।

দলখভ ফরাসীতে জবাব দিল. "বর্শাধারী ষষ্ঠ রেজিমেণ্ট।" ঘোড়ার গতি সে কমালও না, বাড়ালও না।

সেতুর উপর শান্ত্রীর কালো মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে।

"সংকেত বাক্য ?"

ঘোড়ার রাশ টেনে ধরে দলখভ পায়ে হাঁটা গতিতে এগিয়ে চলল। প্রশ্ন করল. "কর্নেল জেরার্দ এখানে আছে কি না বল ?"

কোন জবাব না দিয়ে তার পথ আটকে শান্ত্রী আবার বলল, "সংকেত-বাক্য ?"

"একজন অফিসার যখন রোদে বের হয় তখন শান্ত্রীরা তার কাছে

সংকেত বাক্য শুনতে চায় না," দলখভ সহসা গর্জে উঠে শাস্ত্রীকে লক্ষ্য করে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। "আমি জানতে চাইছি, কর্ণেল এখানে আছে কি না?"

শাস্ত্রী এক পাশে সরে দাঁড়াল; তার জবাবের জন্য অপেক্ষা না করে দলখভ ধীর গতিতে ঘোড়া চালিয়ে দিল।

একটি অস্পষ্ট মনুষ্য মূর্তিকে রাস্তা পার হতে দেখে দলখভ তাকে থামিয়ে কম্যাণ্ডার ও অফিসাররা কোথায় আছে জানতে চাইল। বস্তা কাঁধে সেই সৈনিকটি থামল, দলখভের ঘোড়ার কাছে এগিয়ে গেল, ঘোড়ার গায়ে হাত দিয়ে দেখল, তারপর সহজভাবে বন্ধুর মত বুঝিয়ে বলল যে কম্যাণ্ডার ও অফিসাররা পাহাড়ের আরও উঁচুতে ডান দিকের একটা গোলাবাড়ির উঠোনে রয়েছে।

রাস্তার দুই পাশে শিবির-আগুনকে ঘিরে ফরাসীদের কথাবার্তা কানে এল। তার ভিতর দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে দলখভ সেই উঠোনের দিকে এগিয়ে গেল। ভিতরে ঢুকে ঘোড়া থেকে নেমে সে একটা বড় জলজ্বলে শিবির-আগুনের দিকে এগিয়ে গেল। আগুনটা ঘিরে কয়েকজন জোর গলায় কথা-বার্তা বলছে। আগুনের এক কোণে একটা ছোট গামলায় কি যেন সিদ্ধ হচ্ছে। খাড়া টুপি ও নীল ওভারকোট পরা একটি সৈনিক পাশে হাঁটু গেড়ে বসে একটা কাঠি দিয়ে তার ভিতরকার বস্তুটাকে নাড়ছে।

আগুনের অপর দিকে ছায়ায় উপবিষ্ট একজন অফিসার বলল, "আর, সে লোকটা বড় কঠিন ঠাঁই!"

আর একজন হেসে বলল, "লোকগুলোকে সে বিপদে ফেলবে।"

দলখভ ও পেত্য়ার ঘোড়ার শব্দ কানে আসতে তারা অন্ধকারে তাকিয়ে চুপ করে গেল।

দথলভ সানন্দে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল, "বঁজুর, মঁসিয়!"

অন্ধকারে উপবিষ্ট অফিসারদের মধ্যে একটা আলোড়ণ দেখা দিল, দীর্ঘ-স্কন্ধ দীর্ঘকায় একটি অফিসার আগুনটা ঘুরে দলখভের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

বলল, "আরে, ক্লিমেণ্ট না কি? কোথায় হাওয়া হয়ে···" নিজের ভুল বুঝতে পেরে সে থেমে গেল; ভুরু কুঁচকে অপরিচিত জনের মত দলখভকে স্বাগত জানিয়ে তার জন্য কি করতে পারে তা জানতে চাইল।

দলখভ বলল, সে ও তার সঙ্গী অনেকক্ষণ থেকেই তাদের রেজিমেণ্টটাকে ধরতে চেষ্টা করছে; তারপর সাধারণভাবে সকলকে উদ্দেশ করেই জানতে চাইল, তারা ষষ্ঠ রেজিমেণ্টের কোন খবর রাখে কি না। তারা কেউ কিছু জানে না; পেত্য়ার মনে হল তার ও দলখভের দিকে তারা শত্রুতাপূর্ণ সন্দেহ-জনক দৃষ্টিতে তাকাতে শুরু করেছে। কয়েক সেকেণ্ড সকলেই চুপচাপ।

পিছন থেকে একজন চাপা হাসির সঙ্গে বলে উঠল, "সন্ধ্যা বেলাকার ঝোলের আশা করে যদি এসে থাক তাহলে বড়ই দেরি করে ফেলেছ।"

দলখভ জবাব দিল, তারা ক্ষুধার্ত নয়, আর সেই রাতেই তাদের আরও এগিয়ে যেতেই হবে।

যে সৈনিকটি পাত্রটাকে নাড়ছিল তার হাতে ঘোড়া দুটোকে ছেড়ে দিয়ে সে দীর্ঘস্কন্ধ অফিসারটির পাশে বসে পড়ল। সে অফিসারটি কিন্তু দলখভের উপর থেকে চোখ না সরিয়ে পুনরায় জানতে চাইল, সে কোন্ রেজিমেন্টের লোক। প্রশ্নটা যেন শুনতেই পায় নি এমনি ভাব দেখিয়ে দলখভ কোন জবাব দিল না, পকেট থেকে একটা বেঁটে ফরাসী পাইপ বের করে আগুন ধরাল, তারপর জিজ্ঞাসা করল, তাদের সামনের রাস্তাটা কতদূর পর্যন্ত কসাকদের হাত থেকে নিরাপদ।

আগুনের পিছন থেকে একজন অফিসার জবাব দিল, "সে দস্যুরা তো সর্বত্র রয়েছে।"

দলখভ বলল, "তার সঙ্গী ও তার মত দলছাড়াদের পক্ষেই কসাকরা বিপজ্জনক, কিন্তু তারা হয়তো বড় কোন দলকে আক্রমণ করতে সাহস করবে না, কি বলেন ?" কেউ কোন জবাব দিল না।

শিবির-আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে প্রতি মুহূর্তে পেত্য়া ভাবছে, "এবার উনি চলে আসবেন।"

কিন্তু দলখভ আবার সেই আলোচনাই নতুন করে শুরু করল এবং সরাসরি প্রশ্ন করতে লাগল, প্রতিটি ব্যাটেলিয়নে কত সৈন্য আছে, কতগুলি ব্যাটেলিয়ন আছে, আর বন্দীই বা কতজন আছে। সেই দলের সঙ্গের রুশ বন্দীদের কথা জানতে গিয়ে দলখভ বলল :

"এই মরা মানুষগুলোকে টেনে নিয়ে চলা একটা ভয়ংকর কাজ! এসব ছোটলোককে গুলি করে মেরে ফেলাই ভাল।" বলেই সে এমন অদ্ভুতভাবে হো-হো করে হেসে উঠল যে পেত্য়ার মনে হল ফরাসীরা অবিলম্বেই তাদের ছদ্মবেশ ধরে ফেলবে। নিজের অজ্ঞাতেই সে আগুনের কাছ থেকে এক পা পিছিয়ে গেল।

দলখভের হাসির জবাবেও কেউ কিছু বলল না। জনৈক ফরাসী অফিসার গ্রেট কোটটা মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল বলে তারা তাকে দেখতে পায় নি। এবার সে উঠে একজন সঙ্গীর কানে কানে কি যেন বলল। দলখভ উঠে পড়ল ; যে সৈনিকটি ঘোড়া দুটিকে ধরে রেখেছিল তাকে ডাকল।

আপনা থেকেই দলখভের আরও কাছে সরে গিয়ে পেত্য়া ভাবল, "ওরা কি ঘোড়া দুটো এনে দেবে ?"

ঘোড়া দুটো আনা হল।

"শুভ সন্ধ্যা মশায়রা," দলখভ বলল।

পেত্য়ারও ইচ্ছা হল বলে "শুভ রাত্রি," কিন্তু একটা কথাও তার মুখে এল না। অফিসাররা তখন পরস্পর ফিস্‌ফিস্ করছে। দলখভের ঘোড়ায়

চাপতে বেশ দেরি হল, কারণ ঘোড়াটা কিছুতেই স্থির হয়ে দাঁড়াচ্ছিল না। তারপর সে হাঁটা-গতিতে উঠোনটা পেরিয়ে গেল। পেত্য়াও চলতে লাগল তার পাশে পাশে; মুখ ফিরিয়ে দেখার সাধ হল ফরাসীরা তাদের পিছনে ছুটে আসছে কি না, কিন্তু সাহসে কুলোল না।

রাস্তায় পড়ে দলখভ আর খোলা মাঠ পেরিয়ে ঘোড়া ছোটাল না, চলল গ্রামের ভিতর দিয়ে। একটা জায়গায় থেমে সে কান পাতল। শুধাল, "শুনতে পাচ্ছ?" পেত্য়া রুশ গলার শব্দ চিনতে পারল, দেখল শিবির-আগুনকে ঘিরে বসে আছে রুশ বন্দীদের কালো কালো মূর্তি। সেতুর কাছে নেমে এসে পেত্য়া ও দলখভ শান্ত্রীকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। সে বেচারি একটিও কথা না বলে বিষণ্ণ মনে পায়চারি করে চলেছে। তারপর তারা সেই খাঁড়িতে নেমে গেল যেখানে কসাকরা তাদের জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে।

"আচ্ছা, এবার বিদায়। দেনিসভকে বলে দিও 'দিনের আলো ফুটতেই প্রথম গুলির সঙ্গে সঙ্গে,'" এই কথা বলেই দলখভ ঘোড়া ছুটিয়ে দিচ্ছিল, কিন্তু পেত্য়া তাকে জড়িয়ে ধরল।

চেঁচিয়ে বলল, "সত্যি! আপনি কত বড় বীর। আঃ, কী সুন্দর, কী চমৎকার! আপনাকে আমি কত ভালবাসি!"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে!" দলখভ বলল। কিন্তু পেত্য়া তাকে ছেড়ে দিল না। সেই অস্পষ্ট আলোয় দলখভ দেখল, পেত্য়া তার উপর নুয়ে পড়েছে, তাকে চুমো খেতে চাইছে। দলখভ তাকে চুমো খেল, হাসল, তারপর ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অধ্যায়—১০

পাহারাদারের কুটিরে পৌঁছে পেত্য়া বারান্দাতেই দেনিসভের দেখা পেল। পেত্য়াকে যেতে দিয়ে দেনিসভ তার ফিরে আসার প্রতীক্ষায় উত্তেজনা, উদ্বেগ, ও আত্ম-তিরস্কারের ভিতর দিয়ে সময় কাটাচ্ছিল।

সে বলে উঠল, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! হ্যাঁ, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! কিন্তু তুমি কি জান, তোমার জন্য আমি ঘুমতে পারি নি! যাহোক, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। এখন শুয়ে পড়। সকাল হবার আগে এখনও একটু চোখ বুজে নিতে পারব।"

পেত্য়া বলল, "কিন্তু···না, আমি এখনই ঘুমতে চাই না। তাছাড়া, আমি জানি ঘুমিয়ে পড়লেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। তাই যুদ্ধের আগে না ঘুমনোটা আমার অভ্যাস হয়ে গেছে।"

কুটিরের ভিতরে বসে খুশি মনে সে অভিযানের খুটিনাটি বিষয়গুলির কথা ভাবতে লাগল; পরদিন যা ঘটবে তাও কল্পনা করতে লাগল। যখন দেখল দেনিসভ ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাইরে তখনও বেশ অন্ধকার। বৃষ্টি থেমে গেছে, কিন্তু গাছ থেকে তখনও ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। কুটিরের কাছেই কসাকদের ঝুপড়ি ও ঘোড়াগুলোর কালো কালো চেহারা চোখে পড়ছে। কুটিরের পিছনে দুটো মালগাড়ি ও ঘোড়ার কালো কালো ছায় এবং খাঁড়ির মধ্যে নিভে-আসা আগুনের লাল আভা দেখা যাচ্ছে। সব কসাক ও হুজাররা ঘুমিয়ে পড়ে নি ; এখানে-ওখানে জল পড়া ও ঘোড়ার চিবনোর শব্দের ফাঁকে ফাঁকে নীচু গলার ফিস্‌ফিস্‌ শব্দ কানে আসছে।

বাইরে এসে পেত্‌য়া অন্ধকারের দিকে তাকাল ; মালগাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। গাড়ির নীচে একজনের নাক ডাকছে, চারদিকে ঘোড়াগুলো যই চিবচ্ছে। অন্ধকারে নিজের ঘোড়াটাকে চিনতে পেরে পেত্‌য়া সেই দিকে এগিয়ে গেল। ইউক্রেনীয় জাতের ঘোড়া হলেও পেত্‌য়া ঘোড়াটাকে "করবাখ্‌" বলে ডাকে।

ঘোড়াকে চুমো খেয়ে পেত্‌য়া বলল, "দেখ করবাখ! কাল কিছু কাজের কাজ হবে।"

যে কসাকটি গাড়ির নীচে বসেছিল সে বলল, "আপনি এখনও ঘুমোন নি স্যার?"

"না, আরে···লিখাচিভ—এটাই তো তোমার নাম? তুমি কি জান এইমাত্র আমি ফিরেছি। আমরা ফরাসী শিবিরে ঢুকেছিলাম।"

পেত্‌য়া সমুদয় বিবরণ তাকে জানাল।

কসাক বলল, "এখন আপনার একটু ঘুমিয়ে নেওয়া উচিত।"

"এ আমার অভ্যাস আছে," পেত্‌য়া বলল। "বলি কি, তোমাদের পিস্তলের পাথরগুলো কি ক্ষয়ে গেছে? আমার সঙ্গে কিছু পাথর আছে। তোমার কি দরকার আছে? কয়েকটা নিতে পার।"

কসাকটি গাড়ির নীচ থেকেই মুখ বাড়িয়ে পেত্‌য়াকে ভাল করে দেখল।

পেত্‌য়া বলল, "সব কিছু সঠিকভাবে করাই আমার অভ্যাস। অনেকেই কোনরকমে কাজ সারে, আর পরে সেজন্য পস্তায়। সেটা আমি পছন্দ করি না।"

"ঠিক কথা," কসাক বলল।

"হ্যাঁ, আর একটা কথা! দেখ ভাই, দয়া করে আমার তরবারিটা একটু শান দিয়ে দিতে পার? পারবে কি?"

"নিশ্চয় পারব।"

লিখাচিভ উঠে এল। থলিটা হাতড়ে কি সব বের করল, অচিরেই শান-পাথরে ইস্পাত ঘসার একটা যুদ্ধের মত শব্দ পেত্‌য়ার কানে এল। গাড়ির উপর উঠে সে এক কোণে বসল। কসাকটি মালগাড়ির নীচে বসেই তরবারিতে শান দিতে লাগল।

"বলছি কি! বাছারা সবাই কি ঘুমিয়ে পড়েছে?" পেত্য়া শুধাল।

"কতক ঘুমিয়েছে, কতক ঘুমোয় নি—যেমন আমরা।"

"আচ্ছা, সেই ছেলেটা?"

"ভেসেন্নি? আরে, সে তো ওখানে বারান্দাতেই শুয়ে পড়েছে। ভয় পাবার পরে এখন ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গেছে।"

পেত্য়া অনেকক্ষণ চুপ করে নানান শব্দ শুনতে লাগল। অন্ধকারে পায়ের শব্দ শুনতে পেল একটা কালো মূর্তি এগিয়ে এল।

গাড়ির কাছে এসে শুধাল, "কি ধার দিচ্ছ?"

"কেন, এই ভদ্রলোকের তরবারি।"

"ঠিক আছে," লোকটি বলল; পেত্য়ার ধারণা সে একজন হুজার; "কাপটা কি এখানে ফেলে গেছি?"

"ওখানে, চাকাটার পাশে।"

হুজার কাপটা তুলে নিল।

"শীঘ্রই ভোর হবে," হাই তুলে কথাটা বলে সে চলে গেল।

পেত্য়া অবশ্যই জানে যে রাস্তা থেকে এক ভার্স্ট দূরে জঙ্গলের মধ্যে দেনিসভের গেরিলাদের দলে সে আছে; ফরাসীদের কাছ থেকে আটক-করা একটা মালগাড়ির উপর সে বসে আছে; পাশে ঘোড়াগুলো এক দিগড়িতে বাঁধা রয়েছে; মালগাড়ির নীচে বসে লিখাচিভ তারই তরবারিতে শান দিচ্ছে; ডান দিকের বড় কালো ছায়াটা পাহারাদারের ঘর; বাঁ দিকে নীচে লাল আলোটা শিবিরের নিভে-আসা আগুন; যে লোকটা কাপ নিতে এসেছিল সে একটি হুজার। এসবই তার জানবার কথা, কিন্তু এই মুহূর্তে এসব কিছুই সে জানে না, জানতে চায়ও না। সে এখন রূপকথার রাজ্যে বাস করছে; সেখানে কোন কিছুই বাস্তবের অনুরূপ নয়। বড় কালো ছায়াটা আসলে পাহারাদারের কুটির হলেও সেটা পৃথিবীর নীচে একেবারে অতলে যাবার একটা গহ্বরও হতে পারে। লাল আলোটা হয় তো একটা আগুন, আবার ওটা তো একটা প্রকাণ্ড দানবের চোখও হতে পারে। হয় তো সত্যি সত্যি সে বসে আছে একটা মালগাড়ির উপর, কিন্তু এও তো হতে পারে যে মালগাড়ি না হয়ে ওটা একটা ভয়ংকর উঁচু মিনার যেখান থেকে পড়ে গেলে সে হয় তো সারাদিন, বা সারা মাস ধরেই পড়তে থাকবে, অথবা শুধু পড়তেই থাকবে, কোনদিন আর নীচে পৌঁছবে না। হয় তো কসাক লিখাচিভই মালগাড়ির নীচে বসে আছে, কিন্তু সে তো এমন একটি পরম দয়ালু, পরম সাহসী, পরম আশ্চর্য ও পরম চমৎকার মানুষ হতে পারে যার কথা পৃথিবীর কেউ জানে না। হয় তো একটি হুজারই জল নিতে এসে ফিরে গেছে, কিন্তু আসলে হয় তো সে উধাও হয়েছে—একেবারে অদৃশ্য হয়ে মহাশূন্যে মিলিয়ে গেছে।

এখন পেত্য়া যাই দেখুক কিছুতেই বিস্মিত হবে না। সে এখন রূপকথার রাজ্যে বাস করছে ; সেখানে সবই সম্ভব।

আকাশের দিকে তাকাল। আকাশটাও যেন পৃথিবীর মতই রূপকথার দেশ। আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে, গাছের উপর দিয়ে মেঘেরা ভেসে যাচ্ছে, যেন তারাদের মুখের ঘোমটা খুলে দিচ্ছে। অনেক সময় মনে হচ্ছে যেন মেঘেরা সরে যাচ্ছে আর পরিষ্কার কালো আকাশ বেরিয়ে আসছে। কখনও মনে হচ্ছে আকাশটা উপরে উঠে যাচ্ছে, একেবারে মাথার উপরে অনেক উঁচুতে, আবার মনে হচ্ছে সেটা এত নীচে নেমে এসেছে যেন হাত দিয়ে ছোঁয়া যাবে।

পেত্য়ার চোখ দুটি বুজে এল ; সে একটু ঢুলতে লাগল।

গাছ থেকে জল পড়ছে। চুপি-চুপি কথা শোনা যাচ্ছে। ঘোড়াগুলো হ্রেষারব করে পরস্পর ঠেলাঠেলি করছে। একজন নাক ডাকাচ্ছে।

"ও ঝেগ্-ঝেগ্, ও ঝেগ্-ঝেগ্..." শান-পাথরে তরবারি ঘসার শব্দ হচ্ছে। হঠাৎ পেত্য়া শুনতে পেল, সম্মিলিত অর্কেস্ট্রায় একটা অজানা, মধুর, গম্ভীর মন্ত্র বাজছে। পেত্য়ার স্বর-জ্ঞান নাতাশার মতই, যদিও নিকলাসের চাইতে বেশী, কিন্তু সে কখনও গান শেখে নি বা তা নিয়ে ভাবেও নি। তাই অপ্রত্যাশিতভাবে যে সুর তার কানে এল তাই তার কাছে তাজা ও আকর্ষণীয় বলে মনে হল। সুরটা ক্রমেই স্পষ্টতর হচ্ছে ; এক যন্ত্র থেকে অপর যন্ত্রে সঞ্চারিত হচ্ছে। যে সুরটা বাজানো হচ্ছে সেটা "ফুগ্" (পর্যায়ক্রমিক সঙ্গীত)—যদিও "ফুগ" কাকে বলে পেত্য়া তা জানে না। যন্ত্রগুলিকে কখনও মনে হচ্ছে বেহালা, কখনও বা শিঙা, কিন্তু ঐ দুটোর চাইতেই অনেক ভাল ও অনেক স্পষ্ট। সেগুলি পর্যায়ক্রমে বাজতে বাজতে একসঙ্গে মিশে গেল ; আবার আলাদা হয়ে গেল, আবার মিশে গেল। কখনও বেজে উঠল গির্জার গম্ভীর সঙ্গীত, কখনও বা আশ্চর্য এক জয়গান।

সামনে তাকিয়ে পেত্য়া ভাবল, "আরে—আমি কি স্বপ্ন দেখেছি! কানের মাধ্য বাজছে। হয় তো এ সঙ্গীত আমারই নিজস্ব। ঠিক আছে, বাজো আমার সঙ্গীত! এবার!..."

সে চোখ বুজল, আর অমনি চারদিক থেকে ভেসে এল সুর, মিশে গেল, আলাদা হল, মিশে গেল, তারপর সব সুর মিলে মিশে একটি মধুর গম্ভীর মন্ত্র হয়ে উঠল। পেত্য়া নিজের মনেই বলল, "আহা, কী আনন্দময়! ঠিক আমার মনের মতন!" প্রকাণ্ড অর্কেস্ট্রাটাকে পরিচালিত করার ইচ্ছা জাগল তার মনে।

"এবার ধীরে, ধীরে মিলিয়ে যাও!" শব্দগুলি তার কথা শুনল। "এবার পূর্ণতর, আরও আনন্দময়। আরও—আরও আনন্দময়!" অমনি কোন অজ্ঞাত গভীরতা থেকে উঠল বর্দ্ধিত শব্দরাশি। "এবার সব স্বর এক

হয়ে যাও!" পেত্য়া হুকুম দিল। আর অনেকদূর থেকে সে শুনতে পেল প্রথমে পুরুষের কণ্ঠস্বর, তারপর নারীদের। সে শব্দ সম্মিলিত বিজয়-গর্বে ক্রমেই বেড়ে চলল, আর পেত্য়া ভয়ে ও আনন্দে কান পেতে তাদের অপার সৌন্দর্য শুনতে লাগল।

একটা গম্ভীর জয়যাত্রার সঙ্গীত, গাছের জলপড়ার শব্দ, ও তরবারির হিস্‌হিস্ একত্রে মিশে ধ্বনি উঠল "ও ঝেগ্-ঝেগ্-ঝেগ্..."

সে ধ্বনি কতক্ষণ ছিল পেত্য়া জানে না: সে আনন্দে মজে গেল, নিজের আনন্দে নিজেই অবাক হল, আর মনে মনে দুঃখ পেল যে এ আনন্দের কেউ অংশীদার নেই। লিখাচিভের ডাকে তার স্বপ্ন ভেঙে গেল।

"এটা হয়ে গেছে ইয়োর অনার; এটা দিয়ে একটা ফরাসীকে কেটে দু' টুকরো করতে পারবেন।"

পেত্য়া জেগে উঠল।

"আলো ফুটেছে, সত্যি আলো ফুটেছে," সে চেঁচিয়ে উঠল।

যে ঘোড়াগুলোকে আগে দেখা যাচ্ছিল না এখন সেগুলির লেজ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে; পাতাঝরা ডালের ফাঁকে ফাঁকে বৃষ্টি-ভেজা আলো দেখা যাচ্ছে। শরীরটাকে নাড়া দিয়ে পেত্য়া লাফ দিয়ে উঠল, পকেট থেকে একটা রুবল বের করে লিখাচিভকে দিল, তারপর তরবারিটা ঘুরিয়ে ধার পরীক্ষা করে, খাপে ভরে নিল। কসাকরা ঘোড়া খুলে দিয়ে কসে জিন আঁটতে লাগল।

লিখাচিভ বলল, "এই তো কম্যাণ্ডার এসে গেছেন।"

দেনিসভ পাহারাদারের ঘর থেকে বেরিয়ে এল; পেত্য়াকে ডেকে নিয়ে সকলকে তৈরি হবার হুকুম দিল।

অধ্যায়—১১

আধো অন্ধকারে লোকজনরা ঘোড়া খুঁজে নিয়ে, জিন পরিয়ে, একত্র হল। দেনিসভ পাহারাদারের কুটিরের পাশে দাঁড়িয়ে শেষ নির্দেশাদি দিতে লাগল। দলের পদাতিক বাহিনী পথে নামল। শত শত পায়ে কাদা ছিটিয়ে প্রথম ঊষার কুয়াশার ভিতর দিয়ে তারা জঙ্গলের মধ্যে অতি দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল। সর্দারটিও তার দলের লোকদের কিছু হুকুম দিল। ঘোড়ার রাশ হাতে নিয়ে সওয়ার হবার হুকুমের অপেক্ষায় পেত্য়া অধৈর্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঠাণ্ডা জলে স্নান করায় তার মুখটা জল্‌জল্ করছে; চোখ দুটো খুব ঝক্‌ঝকে দেখাচ্ছে। শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত নামছে; সারা শরীরের ধমনী-গুলো তালে তালে চলছে।

দেনিসভ শুধাল, "সব কিছু তৈরি? এবার ঘোড়া আন।"

ঘোড়া আনা হল। জিনটা ঢিলে থাকায় দেনিসভ কসাকটির উপর রাগ করল, তাকে বকুনি দিল, তারপর সওয়ার হয়ে বসল। পেত্য়া রেকাবে পা দিল। পিছন ফিরে একবার হুজারদের দেখে নিয়ে দেনিসভের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

বলল, "ভাসিলি দিমিত্রিচ, আমাকে একটা কাজের ভার দিন। দয়া করে···ঈশ্বরের দোহাই··· !"

দেনিসভ বোধ হয় পেত্য়ার অস্তিত্বই ভুলে গিয়েছিল। মুখটা ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল।

কঠোর কণ্ঠে বলল, "তোমার কাছে আমার একটাই কথা। আমাকে মেনে চলবে ; কোথাও নিজের থেকে নাক গলাবে না।"

পেত্য়াকে সে আর একটি কথাও বলল না ; সারা পথ নিঃশব্দে ঘোড়া চালাল। যখন বনের প্রান্তে পৌঁছল তখন মাঠের উপর পরিষ্কার আলো ছড়িয়ে পড়েছে। দেনিসভ ফিস্‌ফিস্ করে সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলছে ; কসাকরা পেত্য়া ও দেনিসভকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। সকলে চলে গেলে দেনিসভ ঘোড়ার পিঠে হাত রেখে পাহাড়ের উৎরাই বেয়ে নামতে শুরু করল। ঘোড়াগুলো আরোহীসমেত খাঁড়িতে নেমে গেল। পেত্য়া দেনিসভের পাশেই আছে ; তার নাড়ির গতি ক্রমাগত বাড়ছে। ক্রমেই আলো বাড়ছে, কিন্তু দূরের জিনিস তখনও কুয়াশায় ঢাকা। উপত্যকায় পৌঁছে দেনিসভ পিছনে তাকাল ; ইসারায় একটি কসাককে কাছে ডাকল।

বলল, "সংকেত !"

কসাকটি হাত তুলল ; একটা গুলি সশব্দে ছুটে গেল। মুহূর্তের মধ্যে ঘোড়ার জোর কদমে ছোটার শব্দ শোনা গেল, বিভিন্ন দিক থেকে চীৎকার উঠল, আরও গুলি ছোঁড়ার আওয়াজ হল।

ঘোড়ার ক্ষুরের ও চীৎকারের প্রথম শব্দ শুনেই পেত্য়া ঘোড়ার পিঠে চাবুক কসাল, রাশ আলগা করে দিয়ে সামনে ছুটে গেল ; দেনিসভের কোন কথা কানেই নিল না। পেত্য়ার মনে হল, প্রথম গুলিটা ছোঁড়ার মুহূর্তেই সহসা যেন দুপুরের আলো দেখা দিল। ঘোড়া ছুটিয়ে সে সেতুর দিকে চলল। কসাকরা চলেছে তার আগে আগে। সেতুর উপরে জনৈক কসাকের সঙ্গে তার ধাক্কা লাগল ; সে পিছিয়ে পড়েছিল, জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। তার সামনে সৈন্যরা সম্ভবত ফরাসী সৈন্যরা রাস্তা পার হবার জন্য ডান থেকে বাঁ দিকে ছুটছে। তাদের একজন পেতয়ার ঘোড়ার পায়ের নীচে কাদার মধ্যে পড়ে গেল।

একটা কুটিরের চারপাশে কসাকরা ভিড় করেছে ; তারা একটা কিছু নিয়ে ব্যস্ত। ভিড়ের ভিতর থেকে ভয়ংকর আর্তনাদ শোনা গেল। ঘোড়া ছুটিয়ে এসে হাজির হল পেত্য়া। প্রথমেই তার চোখে পড়ল, একটি ফরাসী

সৈনিক তাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়বার জন্য বর্শার হাতলটা ধরে আছে ; তার মুখ বিবর্ণ, চোয়াল কাঁপছে।

"হুর্‌রা।...বাছারা!...আমাদের!" পেত্‌য়া চেঁচিয়ে বলল। তারপর উত্তেজিত ঘোড়ার রাশ ঢিল দিয়ে গ্রাম্য পথ ধরে ছুটে গেল।

সামনের দিকে গুলির শব্দ শোনা গেল। কসাকরা, হুজাররা, ছেঁড়া পোশাকপরা রুশ বন্দীরা রাস্তার দু'পাশ থেকে ছুটে এসে জোর গলায় অসংলগ্নভাবে চীৎকার করে কি যেন বলছে। বেশ সাহসী দেখতে একজন ফরাসী হুজারদের দিকে হাতের ব্যেয়নেট উদ্যত করে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে। তার পরনে নীল ওভারকোট, মাথায় টুপি নেই, লাল মুখটা ভ্রূকুটি-কুটিল। পেত্‌য়া যখন ঘোড়া ছুটিয়ে সেখানে গেল ততক্ষণে লোকটি ধরাশায়ী হয়েছে। "আবার বড় বেশী দেরি হয়ে গেল!" কথাটা বিদ্যুৎগতিতে পেত্‌য়ার মনে উদয় হল ; ঘোড়া ছুটিয়ে সে আবার সেইদিক পানে গেল যেখান থেকে বারবার গুলির শব্দ আসছে। আগেরদিন রাতে দলখভের সঙ্গে সে যে বাড়ির উঠোনে গিয়েছিল সেখান থেকেই গুলি আসছে। ঘন ঝোপঝাড়ের ভিতরকার বাঁশের বেড়ার আড়ালে ঘাঁটি গেড়ে ফরাসীরা ফটকে সমবেত কসাকদের উপর গুলি চালাচ্ছে। ফটকের কাছে এগিয়ে পেত্‌য়া ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে দলখভকে দেখতে পেল ; বিবর্ণ মুখে সে লোকজনদের উদ্দেশে চীৎকার করে বলছে, "ঘুরে যাও! পদাতিক বাহিনীর জন্য অপেক্ষা কর!" ততক্ষণে পেত্‌য়া তার কাছে পৌঁছে গেল।

"অপেক্ষা?...হুর্‌রা—আ-আ!" পেত্‌য়া চীৎকার করে উঠল। এক মুহূর্তও না থেমে যেখান থেকে গুলির শব্দ আসছে, যেখানে ধোঁয়া সব চাইতে ঘন সেইদিকে ছুটে গেল।

গুলিবর্ষণের শব্দ হল ; কিছু বুলেট হিস্‌-হিস্‌ করে পাশ দিয়ে চলে গেল, কিছু গিয়ে ছিটকে পড়ল কোন কিছুর উপর। কসাকরা ও দলখভ পেত্‌য়াকে অনুসরণ করে ফটকের দিকে ঘোড়া চালিয়ে দিল। ঘন ধোঁয়ার মধ্যে কিছু ফরাসী অস্ত্র ফেলে দিয়ে ঝোপ থেকে ছুটে বেরিয়ে এল কসাকদের সামনে, অন্যরা পাহাড় বেয়ে পুকুরের দিকে নেমে গেল। ওদিকে পেত্‌য়া উঠোনের পাশ দিয়ে ঘোড়া ছোটাতে ছোটাতে রাশটা হাতে না ধরে দুই হাতই অদ্ভুত-ভাবে ঘোরাতে লাগল, আর ক্রমেই জিন থেকে সরে যেতে লাগল। জোড় কদমে ছুটতে ছুটতে একটা নিভন্ত আগুনের কাছে পৌঁছে ঘোড়াটা হঠাৎ থেমে গেল, আর পেত্‌য়া ধপাস্‌ করে ভেজা মাটিতে পড়ে গেল। কসাকরা দেখল, তার মাথাটা নিশ্চল থাকলেও হাত-পাগুলো খুব তাড়াতাড়ি নড়ছে। একটা বুলেট তার খুলির মধ্যে ঢুকে গেছে।

এদিকে ঊর্ধ্বতন ফরাসী অফিসারটি তরবারির মাথায় সাদা রুমাল বেঁধে বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে ঘোষণা করল যে তারা আত্মসমর্পণ

করছে। তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে দলখভ ঘোড়া থেকে নেমে পেত্য়ার কাছে গেল। সে তখন হাত ছড়িয়ে নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে।

"শেষ!" ভুরু কুঁচকে কথাটা বলে দলখভ ফটকের দিকে এগিয়ে গেল। দেনিসভ ঘোড়া ছুটিয়ে তার দিকেই আসছে।

মৃত্যুর অভ্রান্ত লক্ষণ তার কাছে খুবই পরিচিত। দূর থেকে পেত্য়ার দেহটাকে সেইভাবে পড়ে থাকতে দেখে দেনিসভও চীৎকার করে বলল, "মেরে ফেলেছে?"

"সব শেষ।" দলখভ পুনরায় কথাটা বলল; বলে যেন খুশি হল। তারপর তাড়াতাড়ি বন্দীদের দিকে এগিয়ে গেল। কসাকরা এসে তাদের ঘিরে ফেলেছে। সে দেনিসভকে উদ্দেশ করে বলল, "আমরা ওদের নিয়ে যাব না!"

দেনিসভ জবাব দিল না; পেত্য়ার কাছে এগিয়ে গিয়ে ঘোড়া থেকে নামল; তারপর কম্পিত হাতে পেত্য়ার রক্তমাখা কর্দমাক্ত মুখখানাকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে ধরল। মুখটা এর মধ্যেই সাদা হয়ে গেছে।

পেত্য়ার কথাগুলি তার মনে পড়ে গেল: "মিষ্টি কিছু খাওয়া আমার অভ্যাস। কিসমিসগুলি খুব ভাল··সব নিন!" কুকুরের মত আর্তনাদ করে দেনিসভ ঘুরে দাঁড়াল। সে শব্দ শুনে কসাকরা সবিস্ময়ে তার দিকে তাকাল। দেনিসভ হাঁটতে হাঁটতে বাঁশের বেড়াটার কাছে গিয়ে সেটাকে চেপে ধরল।

দেনিসভ ও দলখভ যে রুশ বন্দীদের উদ্ধার করল তাদের মধ্যেই ছিল পিয়ের বেজুখভ।

অধ্যায়—১২

মস্কো থেকে পথ চলার পুরো সময়-কালের মধ্যে বন্দীদের সম্পর্কে ফরাসী কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে কোন নতুন আদেশ জারী করা হয় নি। সেই বন্দীদের দলে পিয়েরও ছিল। মস্কো ছাড়বার সময় বন্দীরা যে সেনাদল ও মালবাহী গাড়ির সঙ্গে ছিল, ২২শে অক্টোবর তারা আর সে দলের সঙ্গে ছিল না। যাত্রার প্রথম দিকে গজাল-ভর্তি যে গাড়িগুলো তাদের সঙ্গে চলছিল তাদের অর্ধেক দখল করে নিয়েছে কসাকরা, আর বাকি অর্ধেক সামনে এগিয়ে গেছে। অশ্বহীন যে অশ্বারোহী সৈন্যরা বন্দীদের আগে আগে চলছিল তাদের একজনও নেই; সকলেই উধাও হয়ে গেছে। প্রথম দিকে বন্দীরা তাদের যে কামান-শ্রেণী দেখতে পেয়েছিল, এখন তার জায়গায় এসেছে মার্শাল জুনোৎ-এর মস্তবড় মালবাহী গাড়ি; ওয়েস্টফেলীয় সৈন্যরা সেটাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে চলেছে। বন্দীদের পিছন-পিছন আসছে অশ্বারোহী বাহিনীর একটা মালবাহী গাড়ি।

যে ফরাসী বাহিনী এতদিন তিন সারিতে অগ্রসর হচ্ছিল, ভিয়াজমা থেকে তারা চলেছে এক সারিতে। মস্কো ছেড়ে আসার পরে প্রথম বিশ্রাম ঘাটিতে পিয়ের বিশৃংখলার যে লক্ষণগুলি দেখতে পেয়েছিল তা এখন চরমে উঠেছে।

যে রাস্তা ধরে তারা চলেছে তার দুই পাশে পড়ে আছে যত মরা ঘোড়া; ছেঁড়া পোশাক পরা যেসব সৈনিক বিভিন্ন রেজিমেণ্ট থেকে পিছিয়ে পড়েছিল তারা অনবরত দল বদল করে চলেছে, কখনও একটা চলতি দলে যোগ দিচ্ছে, আবার পিছিয়ে পড়ছে।

চলতে চলতে বারকয়েক ভুল করে বিপদ-সংকেত দেওয়ার ফলে পাহারাদার সৈন্যরা বন্দুক থেকে গুলি ছুঁড়ে ছুটে পালাতে শুরু করে; ফলে নিজেরাই ধাক্কাধাক্কি করে মরে; আর পরে আবার একত্র হলে অকারণ ত্রাসের জন্য একে-অন্যকে গালাগালি করতে থাকে।

অশ্বারোহী বাহিনীর ভাণ্ডার, বন্দীদের পাহারা-দল ও জুনোৎ-এর মালবাহী গাড়ি—তিনটে দল একসঙ্গে চললেও তারা যেন একই সঙ্গে আলাদা ও এক, যদিও প্রতিটি দলের লোকজনই অতি দ্রুত কমে যাচ্ছে।

গোলন্দাজ বাহিনীর মালপত্রবাহী গাড়ির সংখ্যা একশ' কুড়ি; এখন অবশিষ্ট আছে ষাটের মত, বাকিগুলো হয় বেদখল হয়েছে, নয়তো পিছিয়ে পড়েছে। জুনোৎ-এর মালগাড়িরও কতকগুলি বেদখল হয়েছে অথবা পরিত্যক্ত হয়েছে। তিনটে মালগাড়ি আক্রমণ করে লুট করেছে দাভুৎ-এর সেনাদলের দলছাড়া সৈন্যরা। জার্মানদের কথাবার্তা থেকে পিয়ের জানতে পেরেছে যে বন্দীদের তুলনায় মালবাহী গাড়িগুলোর জন্য একটা বড় রকমের রক্ষীবাহিনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে; মার্শালের নিজের হুকুমেই তাদেরই সহকর্মী একজন জার্মানকে গুলি করে মারা হয়েছে, কারণ মার্শালের নিজস্ব একটা রূপোর চামচ তার কাছে পাওয়া গিয়েছিল।

বন্দীদের দলগুলি প্রায় সবই বরফে জমাট বেঁধে গেছে। যে একশ' ত্রিশ জন মস্কো থেকে যাত্রা করেছিল তাদের মধ্যে এখন অবশিষ্ট আছে একশ' জনেরও কম। অশ্বারোহী বাহিনীর জিন অথবা জুনোৎ-এর মালপত্রের চাইতেও পাহারাদারদের কাছে বন্দীরাই বড় বোঝা। তারা জানে, জিনগুলো এবং জুনোৎ-এর চামচগুলো তবু কিছু কাজে লাগতে পারে, কিন্তু একদল শীতার্ত ক্ষুধিত সৈন্য সমপরিমাণে শীতার্ত ও ক্ষুধিত রুশদের পাহারা দিতেই থাকবে (তাদের অনেকেই ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে পিছিয়ে পড়েছে এবং এ অবস্থায় তাদের গুলি করে মারার হুকুমও আছে)—এটা শুধু দুর্বোধ্যই নয়, একান্ত আপত্তিকরও বটে। নিজেদের কষ্টকর অবস্থায় বন্দীদের প্রতি কোনরূপ করুণা দেখাতেও যেন তারা ভয় পেল এবং তাদের প্রতি রূঢ় ও কঠোর ব্যবহার করতে লাগল।

দরগবুঝ্-এ পাহারাদার সৈন্যরা বন্দীদের একটা আস্তাবলে তালাবন্ধ করে রেখে নিজেদের ভাঁড়ারই নিজেরা লুট করতে চলে গেলে কয়েকজন সৈনিক-বন্দী দেয়ালের নীচ দিয়ে সুরঙ্গ কেটে পালিয়ে গেল। কিন্তু ফরাসীরা আবার তাদের গ্রেপ্তার করে গুলি করে মেরে ফেলল।

যাত্রার মুখে অফিসার-বন্দীদের অন্য বন্দীদের থেকে আলাদা করে রাখার যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেটা অনেকদিনই উঠে গেছে। যারা হাঁটতে পারল তারাই একসঙ্গে চলতে লাগল; তৃতীয় ঘাঁটির পরেই পিয়ের কারাতায়েভ ও তার নীল-ধূসর বাঁকা-ঠ্যাং কুকুরটার দলে যোগ দিল।

মস্কো ছেড়ে আসার পরে তৃতীয় দিনে কারাতায়েভ আবার সেই জ্বরে পড়ল মস্কোর হাসপাতালে থাকতে যে জ্বরে সে ভুগে ছিল। সে ক্রমে যতই দুর্বল হয়ে পড়ল পিয়ের ততই তার কাছ থেকে সরে যেতে লাগল। কেন তা পিয়ের জানে না, কিন্তু যেদিন থেকে কারাতায়েভ দুর্বল হতে লাগল সেদিন থেকেই পিয়ের যেন কিছুটা অনিচ্ছাতেই তার কাছে যেত। কাছে গেলেই করাতায়েভের চাপা গোঙানি কানে আসে, তার শরীরের দুর্গন্ধ ক্রমেই বেশী করে নাকে আসে, আর পিয়ের ততই তার কাছ থেকে দূরে সরে যায়; তার কথা ভাবেও না।

চালাঘরে বন্দী থাকার সময় পিয়ের জেনেছিল—বুদ্ধি দিয়ে নয়, সমস্ত সত্তা দিয়ে, জীবন দিয়ে জেনেছিল যে, মানুষের সৃষ্টি হয়েছে সুখের জন্য, সুখ আছে তার অন্তরে, আছে মানুষের সহজ, সরল প্রয়োজনের পরিপূর্তিতে; দুঃখের উদ্ভব হয় অভাব থেকে নয়, প্রয়োজনাতিরিক্ত জিনিসের প্রতি আসক্তি থেকে। আর এখন এই তিন সপ্তাহের ভ্রমণ-কালে আর একটি সান্ত্বনাদায়ক নতুন সত্যকে সে জেনেছে—এই পৃথিবীতে ভয়ংকর বলে কিছু নেই। জেনেছে, যন্ত্রণা ও মুক্তিরও সীমা আছে, আর সে সীমা পরস্পরের খুব কাছাকাছি; গোলাপের বিছানায় শুয়ে একটি কুঁচকানো পাপড়ির জন্য মানুষ ঠিক ততখানি কষ্টই পায় যেটা সে ভোগ করছে স্যাঁতসেতে খালি মেঝের উপর ঘুমিয়ে, যখন শরীরের একদিক গরম হতে না হতেই অপর দিকটা ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে; আঁটো নাচের জুতো পরলে যতখানি কষ্ট পেত, এখন ঘা-ভর্তি খালি পায়ে হাঁটতেও সেইরকম কষ্টই পাচ্ছে। নতুন করে আবিষ্কার করেছে, রাতের বেলা আস্তাবলে তালাবন্ধ অবস্থায় সে যতটা স্বাধীন আছে, স্ত্রীকে স্বেচ্ছায় বিয়ে করার সময় তার চাইতে বেশী স্বাধীন ছিল না। এখন তার কাছে সব চাইতে যন্ত্রণাদায়ক তার ঘা-ভর্তি খালি পা দুটো। (ঘোড়ার মাংস ক্ষুধাবর্ধক ও পুষ্টিকর, নুনের বদলে যে বারুদ তারা ব্যবহার করে তার যবক্ষার-স্বাদও এখন ভালই লাগে; ঠাণ্ডাও খুব বেশী নয়, দিনের বেলা হাঁটতে বেশ গরমই লাগে, আর রাতের জন্য আছে শিবির-আগুন; যেসব উকুন শরীরটাকে কুরে কুরে খায় তারাই এখন শরীরটাকে

গরম রাখে।) প্রথমেই যে জিনিসটা অসহ্য মনে হল সেটা তার পা দুটো।

দ্বিতীয় দিন পথ চলার পরে শিবির-আগুনে পা দুটো পরীক্ষা করে পিয়ের ভাবল, 'সে পা নিয়ে হাঁটা অসম্ভব। কিন্তু যখন সকলে উঠে পড়ল তখন সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তাদের সঙ্গে হাঁটতে লাগল; শরীর একটু গরম হলে হাঁটতে আর কোন কষ্ট হল না, কিন্তু রাতে পা দুটো আগের চাইতে ভয়ংকর দেখালো। কিন্তু সেদিকে না তাকিয়ে সে অন্য কথা ভাবতে লাগল।

। এতদিনে পিয়ের মানব জীবনের পরিপূর্ণ শক্তিকে উপলব্ধি করতে পেরেছে; উপলব্ধি করেছে মানুষের সেই আত্মরক্ষাকারী শক্তিকে যার সাহায্যে মনকে এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে নিবিষ্ট করা যায়; এ যেন বয়লারের সেই সেফটি-ভাল্‌ভটি যার সাহায্যে তাপ একটা নির্দিষ্ট সীমাকে ছাড়িয়ে ফেলেই বাড়তি তাপটাকে বের করে দেওয়া হয়।

যে বন্দীরা পিছিয়ে পড়েছিল তাদের ওরা কিভাবে গুলি করে মেরেছিল তা পিয়ের চোখে দেখে নি, কানেও শোনেনি, যদিও একশ'র বেশী বন্দী সেই পথেই মৃত্যু বরণ করেছে। কারাতায়েভের কথা সে ভাবে না; সেও প্রতিদিন আরও দুর্বল হয়ে পড়ছে; অচিরেই তারও সেই দশা হবে। পিয়ের নিজের কথা আরও কম ভাবে। অবস্থা যতই কঠিনতর হয়ে উঠছে, ভবিষ্যৎ হয়ে উঠছে আরও ভয়ংকর, ততই সান্ত্বনাদায়ক আনন্দময় চিন্তা, স্মৃতি ও কল্পনারা তার বর্তমান অবস্থাকে ছাড়িয়ে উঠতে লাগল।

অধ্যায়—১৩

২২শে অক্টোবর দুপুরে কর্দমাক্ত পিছল পথে চড়াই বেয়ে উঠতে উঠতে পিয়ের একবার তার পায়ের দিকে একবার উঁচু-নীচু রাস্তার দিকে তাকাচ্ছে। মাঝে মাঝে চারদিকে পরিচিত ভিড়ের দিকে তাকিয়ে আবার তার পায়ের দিকে দৃষ্টি ফেরাচ্ছে। দুইই তার কাছে সমান পরিচিত, সমান নিজস্ব। নীল-ধূসর খোঁড়া কুকুরটা মনের খুশিতে রাস্তার পাশ দিয়ে ছুটে চলেছে। কখনও পিছনের একটা পা তুলে তিন পায়ে লাফাচ্ছে। আবার ছুটছে চার পায়ে, মরা জন্তুর উপর বসে-থাকা কাকগুলোর দিকে ছুটে যাচ্ছে ঘেউ-ঘেউ করে। মস্কোর চাইতে এখন কুকুরটা আরও খুশি ও চকচকে হয়েছে। চারদিকে মানুষ থেকে ঘোড়া পর্যন্ত নানা জন্তুর পচা মাংস পড়ে আছে; লোকজনের যাতায়াতের ফলে নেকড়েগুলো আসতে পারছে না, ফলে কুকুরটা যথেচ্ছভাবে মাংস খেতে পারছে।

সকাল থেকেই বৃষ্টি হচ্ছে। মনে হয়েছিল যেকোন সময় বৃষ্টিটা থামতে পারে, এবং আকাশ পরিষ্কার হতে পারে, কিন্তু একটু থেমেই আবার জোর বৃষ্টি নামল। জলে-ভেজা রাস্তাটা আর জল শুষে নিতে পারল না, ফলে গাড়ির

চাকার দাগ বেয়ে জলের স্রোত বয়ে চলল।

দুই দিকে তাকাতে তাকাতে পিয়ের হাঁটছে। তিনটে করে পা আঙুলে গুণছে। বৃষ্টিকে উদ্দেশ করে সে বলে উঠল, "এইবার, আবার, চালিয়ে যাও! জোরছে ঢালো!"

মনে হল সে কিছুই ভাবছে না, কিন্তু অন্তরের গভীরতম তলে একটা গুরুত্বপূর্ণ, সান্ত্বনাদায়ক বিষয় নিয়ে তার মন মেতে আছে। আগের দিন কারাতায়েভের সঙ্গে তার যে কথা হয়েছে তা থেকে অনুমিত একটি সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্তই সেই বিষয়।

গতকালের বিশ্রাম—ঘাঁটিতে শিবির-আগুনটা নিভে যাওয়ায় পিয়ের উঠে পার্শ্ববর্তী জ্বলন্ত আগুনটার দিয়ে এগিয়ে গেল। সেখানে একটা গ্রেটকোটে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে বসে প্লাতন কারাতায়েভ সৈন্যদের একটা গল্প বলছে। মাঝ রাত পার হয়ে গেছে। এসময় সাধারণত কারাতায়েভের জ্বরটা ছেড়ে যায়, সে বেশ সুস্থ বোধ করে। তবু কারাতায়েভের রোগজীর্ণ কণ্ঠস্বর শুনে এবং আগুনের আভায় উজ্জল করুণ মুখটা দেখে পিয়েরের বুকটা ব্যথায় টন্-টন্ করে উঠল। লোকটির প্রতি এই করুণার উদ্রেক হওয়ায় পিয়ের ভয় পেয়ে গেল, সেখান থেকে চলে যেতে চাইল, কিন্তু আর কোন আগুন না থাকায় প্লাতনের দিকে না তাকিয়ে চেষ্টা করে সেখানেই বসে পড়ল।

"আরে, কেমন আছ?" শুধাল।

"কেমন আছি? রোগ নিয়ে গজ্গজ্ করলে তো ঈশ্বর মৃত্যুই দেবেন," এই জবাব দিয়ে প্লাতন আবার গল্পটা বলতে শুরু করল।

বিবর্ণ শীর্ণ মুখে ঈষৎ হাসি ফুটিয়ে আর দুই চোখে খুশির ঝিলিক তুলে বলতে লাগল, "তারপর, শোনরে ভাই…"

পিয়ের গল্পটা অনেকদিন শুনেছে। কারাতায়েভ খুশিতে ডগমগ হয়ে তাকেই অন্তত ছ'বার গল্পটা শুনিয়েছে। কিন্তু ভালভাবে জানা হলেও পিয়ের এমনভাবে গল্পটা শুনতে লাগল যেন এই নতুন শুনেছে; শুনতে শুনতে কারাতায়েভের শান্ত উচ্ছ্বাস যেন তার মধ্যেও সঞ্চারিত হল। জনৈক বুড়ো বণিককে নিয়েই গল্প। সপরিবারে সে সৎ ও ধর্মভীরু জীবন যাপন করত। একদা একজন ধনী বণিকের সঙ্গে সে গিয়েছিল নিঝ্নি মেলায়।

একটা সরাইখানায় উঠে রাতে দুজনই শুতে গেল; সকালে দেখা গেল সঙ্গীটির সর্বস্ব লুঠ হয়েছে, আর গলাকাটা অবস্থায় পড়ে আছে। একটা রক্তমাখা ছোরা পাওয়া গেল বণিকের বালিশের তলায়। তার বিচার হল, তাকে চাবুক মারা হল, তারপর দুই নাক ফুটো করে কঠোর শাস্তি ভোগের জন্য সাইবেরিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হল।

"তারপর, ভাইরে, এইভাবে দশটা বছর বা তারও বেশী সময় কেটে গেল। বুড়ো মানুষটা অনুগতভাবে কয়েদীর জীবন যাপন করতে লাগল।

কখনও কোন অন্যায় করে না। শুধু মৃত্যুর জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে। একদিন আমাদের মতই বুড়ো মানুষটাকে নিয়ে কয়েদীরা জমা হল। সকলেই যার যার শাস্তির কারণ ও ঈশ্বরের প্রতি পাপের কথা বলতে লাগল। একজন বলল সে একটি লোককে খুন করে এসেছে, আর একজন বলল দুটি, তৃতীয় জন ঘরে আগুন জ্বালিয়ে এসেছে, অপর একজন ছিল নেহাৎই ভবঘুরে। কোন অন্যায় কাজ করে নি। এইভাবে তারা বুড়োকে শুধাল, 'তোমার কি জন্য শাস্তি হয়েছে বাবা?'—সে বলল, 'আমি ভোগ করছি নিজের ও অপরের পাপের শাস্তি। কিন্তু আমি কাউকে খুন করি নি, যা আমার নয় তাতে কখনও হাত দেই নি, শুধু যারা আমার চাইতেও গরীব তাদের সাহায্য করেছি। প্রিয় ভাই সব, আমি ছিলাম একজন বণিক; বিষয় সম্পত্তিও প্রচুর ছিল।' তারপর সে পরপর সব কথা খুলে বলল। 'নিজের জন্য আমি দুঃখ করি না। মনে হয় ঈশ্বর আমাকে শুদ্ধ করেছেন! শুধু দুঃখ হয় আমার বুড়ি বৌটা আর ছেলেমেয়েদের জন্য।' এই বলে বুড়ো কাঁদতে লাগল। ঘটনাচক্রে যে লোকটা অপর বণিকটিকে খুন করেছিল সেও ছিল সেই কয়েদীদের দলে। সে বলল, 'ঘটনাটা কোথায় ঘটেছিল বাবা? কখন, কোন মাসে?' সব কথা শুনবার পরে তার বুকটা টনটন করে উঠল। তখন সে বুড়ো লোকটির কাছে এইভাবে এসে তার পায়ের উপর পড়ল। বলল, "আমার জন্যই তুমি মরতে চলেছ বাবা। সত্যি বলছি বাছারা, অকারণেই এই নির্দোষ লোকটি কষ্ট ভোগ করছে। সেকাজটা করেছিলাম আমি, আর আমিই তোমার ঘুমের মধ্যে তোমার মাথার নীচে ছুরিটা রেখে দিয়েছিলাম। খ্রীস্টের দোহাই, তুমি আমাকে ক্ষমা কর বাবা!"

কারাতায়েভ থামল; স্মিত হেসে আগুনের দিকে তাকিয়ে রইল; দুটো পা জুড়ে নিল।

"আর বুড়ো মানুষটা বলল, 'ঈশ্বর তোমাকে ক্ষমা করবেন; তাঁর চোখে আমরা সকলেই পাপী। আমার নিজের পাপের ফলই আমি ভোগ করছি,' এই বলে সে খুব কাঁদতে লাগল। আচ্ছা, "তোমরা কি মনে কর বন্ধুরা?" কারাতায়েভ প্রশ্ন করল; উচ্ছ্বসিত হাসিতে তার মুখটা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল, যেন এখন সে যা বলল তার মধ্যেই রয়েছে এই গল্পের প্রধান আকর্ষণ ও পুরো অর্থ। "তোমরা কি মনে কর প্রিয় বন্ধুরা? সেই খুনী কর্তৃপক্ষের কাছে দোষ স্বীকার করল। বলল, 'আমি ছ'জনের প্রাণ নিয়েছি, (লোকটা মহাপাপী) কিন্তু আমি সব চাইতে বেশী দুঃখিত এই বুড়ো মানুষটির জন্য। তাকে আর কষ্ট দেবেন না।' এইভাবে সে নিজের দোষ স্বীকার করল, সব লিখে দেওয়া হল, যথাসময়ে কাগজপত্র পাঠানো হল। জায়গাটা অনেক দূরে; নানা প্রশ্ন নিয়ে বিচার-বিবেচনা চলতে লাগল, যথারীতি কাগজ ভরে গেল; এদিকে সময়ও পার হতে লাগল। সমস্ত ব্যাপারটা জারের কাছে

গেল। কিছুদিন পরে জারের নির্দেশ এল: বণিককে মুক্তি দেওয়া হোক এবং ঘোষণানুযায়ী ক্ষতিপূরণও দেওয়া হোক। কাগজপত্র এলে তারা বুড়ো মানুষটিকে খুঁজতে লাগল। 'যে নির্দোষ বুড়ো মানুষটি অকারণে কষ্টভোগ করছিল সে কোথায়? জারের কাছ থেকে একখানা কাগজ এসেছে!' তারা লোকটিকে খুঁজতে লাগল। "এইখানে কারাতায়েভের নীচের চোয়ালটা কাঁপতে লাগল। "কিন্তু ইতিমধ্যেই সে ঈশ্বরের ক্ষমা পেয়ে গেছে—লোকটি মারা গেছে! এই হল ব্যাপার!" কথা শেষ করে কারাতায়েভ স্মিত হেসে নীরবে বহুক্ষণ সামনের দিকে তাকিয়ে রইল।

আর পিয়েরের অন্তর অস্পষ্টভাবে কিন্তু আনন্দের সঙ্গে ভরে উঠল গল্পের জন্য নয়, তার রহস্যময় তাৎপর্যের জন্য: বলতে বলতে কারাতায়েভের মুখখানি যে উচ্ছ্বসিত আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এবং সেই আনন্দের যে অতীন্দ্রিয় তাৎপর্য আছে তাতেই ভরে উঠল তার অন্তর।

অধ্যায়—১৪

"যার যার জায়গায়!" হঠাৎ একটা উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

পাহারাদার সেনাদল ও বন্দীদের মধ্যে উত্তেজনার একটা মধুর অনুভূতি এবং আনন্দময় গম্ভীর কোন কিছুর প্রত্যাশা দেখা দিল। চারদিক থেকে ভেসে এল সামরিক নির্দেশ; সুবেশধারী একদল অশ্বারোহী ভাল ঘোড়ায় চেপে বাঁ দিক থেকে এসে বন্দীদের পাশ দিয়ে চলে গেল। কর্তৃপক্ষ স্থানীয় লোকের আবির্ভাব আসন্ন হলে যে কৎকণ্ঠা জাগে তারই স্পষ্ট প্রকাশ সকলের মুখে। বন্দীরা এক জায়গায় ভিড় করল; তাদের রাস্তা থেকে ঠেলে সরিয়ে দেওয়া হল। পাহারাদাররা সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

"সম্রাট! সম্রাট! মার্শাল! ডিউক!" ঝকঝকে অশ্বারোহী দলটি চলে যেতে না যেতেই ছ'টি ধূসর ঘোড়ায় টানা একটা গাড়ি সশব্দে চলে গেল। পিয়ের মুহূর্তের জন্য তিন-কোণা টুপি মাথায় একটি লোককে দেখতে পেল; তার ফোলা ফোলা সুদর্শন সাদা মুখে প্রসন্ন দৃষ্টি। পিয়েরের দশাসই দর্শনীয় চেহারার উপর তার চোখ পড়ল; যেরকম ভ্রূকুটি করে লোকটি পিয়েরের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল তা দেখে তার মনে হল, লোকটির মনে তার প্রতি সহানুভূতি জাগলেও সে সহানুভূতিকে চেপে রাখতেই সে চায়।

ভাণ্ডারের ভারপ্রাপ্ত জেনারেল ভীত রক্তিম মুখে চর্মসার ঘোড়াটার পিঠে চাবুক কসতে কসতে গাড়ির পিছনে ছুটে গেল। সৈন্যরা কয়েকজন অফিসারের একটা দলকে ঘিরে দাঁড়াল। সকলের মুখেই উত্তেজনা ও দুশ্চিন্তার আভাষ।

পিয়ের শুনতে পেল সকলেই জিজ্ঞাসা করছে, "তিনি কি বললেন? তিনি কি বললেন?"

মার্শাল যখন চলে গেল, আর বন্দীরা একত্রে ভিড় করল, তখন পিয়ের কারাতায়েভকে দেখতে পেল। সকাল থেকে তার দেখা মেলে নি। ছোট ওভারকোটটা পরে সে একটা বার্চ গাছে হেলান দিয়ে বসে আছে। গতকাল গল্প বলার সময় যে সানন্দ অনুভূতি ফুটে উঠেছিল তার মুখে, তা ছাড়াও একটা শান্ত গাম্ভীর্যের আভাষ এখন সেখানে ছড়িয়ে পড়েছে।

অশ্রুভরা সদয় গোল গোল দুটি চোখ মেলে কারাতায়েভ পিয়েরের দিকে তাকাল; সে যেন চাইছে পিয়ের তার কাছে যাক যাতে সে কিছু বলতে পারে। কিন্তু পিয়ের তখনও মনস্থির করতে পারে নি। সে এমন ভাব দেখাল যেন কারাতায়েভের দৃষ্টি তার নজরে পড়ে নি। তাড়াতাড়ি সে সেখান থেকে সরে গেল।

বন্দীরা এগিয়ে গেলে পিয়ের আবার ঘুরে তাকাল। কারাতায়েভ তখনও রাস্তার পাশে বার্চ গাছের নীচে বসে আছে; তার মাথার উপর ঝুঁকে দুটি ফরাসী সৈনিক কি যেন বলছে। পিয়ের আবার ফিরে তাকাল। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগল।

কারাতায়েভ যেখানে বসেছিল তার পিছন থেকে একটা গুলির শব্দ এল। পিয়ের সেটা পরিষ্কার শুনতে পেল, কিন্তু সেইমুহূর্তে তার মনে হল স্মোলেন্স্ক পৌঁছতে আর ক'টা ঘাঁটি বাকি আছে সে হিসাবটা এখনও শেষ করা হয় নি। আবার সে হিসাব করতে শুরু করল। দুটি ফরাসী সৈনিক তার পাশ দিয়ে চলে গেল; একজনের হাতে একটা ধূমায়মান বন্দুক নীচু করে ধরা। দুজনেরই মুখ বিবর্ণ। একজন ভীরু চোখে পিয়েরকে দেখছে। তাদের চোখে মুখে ঠিক সেই ভাব যা পিয়ের দেখছিল মৃত্যুদণ্ড পাবার মুহূর্তে সেই তরুণ সৈনিকটির মুখে। তার দিকে তাকিয়ে পিয়েরের মনে পড়ে গেল যে দুদিন আগে এই লোকটিই আগুনে শুকোতে গিয়ে তার শার্টটা পুড়িয়ে ফেলেছিল এবং তার দিকে তাকিয়ে হেসেছিল।

কারাতায়েভ যেখানে বসেছিল তার পিছনে কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করছে। পিয়ের ভাবল, "জানোয়ারটা কী বোকা! এরকম ঘেউ ঘেউ করছে কেন?"

যেখানে গুলিটা ছোঁড়া হয়েছে এবং কুকুরটা ডাকছে, পিয়েরের বন্ধু কয়েদী-সৈনিকরা কিন্তু পিয়েরের মত সেদিকে মোটেই তাকাল না, কিন্তু তাদের সকলের দৃষ্টিই তখন কঠিন হয়ে উঠেছে।

অধ্যায়—১৫

ভাণ্ডার, বন্দী ও মার্শালের মালপত্রবাহী গাড়ি সবই শাম্‌শোভা গ্রামে থামল। সকলেই শিবির-আগুন ঘিরে বসে পড়ল। পিয়ের আগুনের কাছে গিয়ে খানিকটা ঝল্‌সানো শূকর মাংস খেল, তারপর আগুনের দিকে পিঠ

দিয়ে শোয়ামাত্রই ঘুমিয়ে পড়ল। বরদিনোর যুদ্ধের পরে মোঝায়েস্কের মতই এখানেও সে আবার ঘুম দিল।

আবারও সত্য ও কল্পনা একাকার হয়ে গেল; আবারও সে বা অন্য কেউ তার চিন্তাকে ভাষা দিল; হয় তো বা সেই একই চিন্তা বা ভাষা পেয়েছিল মোঝায়েস্কে তার স্বপ্নের ভিতর দিয়ে।

"জীবনই সব। জীবনই ঈশ্বর। সব কিছু বদলায়, এগিয়ে চলে, আর সেই এগিয়ে চলাই ঈশ্বর। যতক্ষণ জীবন আছে ততক্ষণই আনন্দ আছে ঈশ্বর চেতনার মধ্যে। জীবনকে ভালবাসাই ঈশ্বরকে ভালবাসা। যন্ত্রণার ভিতর দিয়ে, নির্দোষ যন্ত্রণার ভিতর দিয়ে এই জীবনকে ভালবাসাই তো অন্য সব কিছু অপেক্ষা কঠিন ও পবিত্র।"

"কারাতায়েভ!" পিয়েরের মনে পড়ে গেল।

হঠাৎ সে যেন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পেল সেই দীর্ঘবিস্মৃত সদয় বৃদ্ধটিকে যে তাকে সুইজারল্যাণ্ডে ভূগোল শিখিয়েছিল। "একটু সবুর কর," বলে বুড়ো মানুষটি তাকে একটা ভূগোলক দেখাল। এই ভূ-গোলকটি জীবন্ত—কোন নির্দিষ্ট আয়তনবিহীন একটি স্পন্দনশীল গোলক। অনেকগুলি বিন্দুকে পর পর চেপে তার পরিধি গড়ে তোলা হয়েছে; সেই বিন্দুগুলি পরিবর্তিত হয় ও স্থান পরিবর্তন করে; কখনও কয়েকটি মিলে একটি হয়ে যায়, আবার কখনও একটি ভেঙে অনেকগুলি হয়ে যায়। প্রতিটি বিন্দু ছড়িয়ে পড়ে যত বেশী সম্ভব স্থান দখল করতে চেষ্টা করে, কিন্তু ঐ একই কাজ করতে গিয়ে অন্য বিন্দুগুলি সেটাকে চেপে ধরে, অনেক সময় সেটাকে ধ্বংস করে ফেলে, আবার অনেক সময় সেটার সঙ্গে মিশে যায়।

"এই তো জীবন," বুড়ো শিক্ষক বলল।

পিয়ের ভাবল, "কথাটা কত সরল ও পরিষ্কার। আগে কেন যে এটা বুঝি নি?"

"ঈশ্বর আছেন কেন্দ্রে; প্রতিটি বিন্দু এমনভাবে প্রসারিত হতে চায় যাতে তাঁকে যথাসম্ভব বেশী করে প্রতিবিম্বিত করা যায়। প্রতিটি বিন্দু বড় হয়, মিশে যায়, উপর থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়, অতলে তলিয়ে যায়, আবার ভেসে ওঠে। ঐ তো ওখানে, কারাতায়েভ নিজেকে প্রসারিত করে অদৃশ্য হয়ে গেছে। বুঝতে পারছ বাবা?" শিক্ষক বলল।

"বুঝতে পারছ হে গাড়োল?" কে যেন চীৎকার করে উঠল; পিয়েরের ঘুম ভেঙে গেল।

সে উঠে বসল। একটি ফরাসী এইমাত্র একজন রুশ সৈন্যকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে আগুনের পাশে বসে পড়ে একটা শিকের সাহায্যে একটুকরো মাংস ঝলসাচ্ছে। তার আস্তিন গোটানো; পেশীবহুল লোমশ লাল হাতের বেঁটে আঙুল দিয়ে বেশ সুকৌশলে শিকটাকে ঘোরাচ্ছে। পোড়া কয়লার

আভায় তার বাদামী বিষণ্ণ মুখ ও ভ্রূকুটিকুটিল ভুরু দুটো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

যে সৈন্যটি তার পিছনে দাঁড়িয়েছিল তার দিকে ফিরে বিড়বিড় করে বলল, "ওর পক্ষে সবই সমান। ডাকাত কোথাকার! পালাও!"

শিকটা ঘোরাতে ঘোরাতে সে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে পিয়েরের দিকে তাকাল। পিয়ের মুখ ঘুরিয়ে অন্ধকারের দিকে চোখ ফেলল। ফরাসীটি যে রুশ সৈন্যটিকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে সে আগুনের কাছে বসে হাত দিয়ে যেন কার গায়ে চাপড় মারছে। আরও ভাল করে পিয়ের নীল-ধূসর কুকুরটাকে চিনতে পারল; সৈন্যটির পাশে বসে সে লেজ নাড়ছে।

"আহা, ও কি এসে গেছে? কিন্তু প্লাত—" বলতে গিয়েও সে কথাটা শেষ করতে পারল না।

সহসা একযোগে অনেক স্মৃতি কল্পনায় তার মনের মধ্যে ভিড় করে এল—গাছের নীচে বসে প্লাতন যেভাবে তার দিকে তাকিয়েছিল, সেখান থেকে আসা যে গুলির শব্দ সে শুনেছিল, কুকুরটার ঘেউ-কেউ, তাকে পাশ কাটিয়ে ছুটে যাওয়া দুটি ফরাসী সৈনিকের অপরাধী মুখ, নীচে নামানো ধূমায়মান বন্দুক, এখানে কারাতায়েভের অনুপস্থিতি—সে যেন প্রায় বুঝে ফেলেছে যে কারাতায়েভকে মেরে ফেলেছে, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে, কেন তা সে জানে না, পিয়েরের মনে পড়ে গেল আর একটি গ্রীষ্ম-সন্ধ্যার স্মৃতি যেদিনটা সে তার কিঃভের বাড়ির বারান্দায় একটি সুন্দরী পোলিশ মহিলার সঙ্গে কাটিয়েছিল। দিনের ঘটনাগুলিকে একসূত্রে গাঁথার চেষ্টা না করে, অথবা তার থেকে কোন সিদ্ধান্ত না টেনে পিয়ের চোখ বুজল; গ্রীষ্মকালীন পল্লীর একটা দৃশ্য তার চোখের সামনে ভেসে উঠল; তার সঙ্গে মিশল জলে নেমে স্নানের স্মৃতি, একটি স্পন্দনশীল ভূ-গোলকের স্মৃতি, আর সঙ্গে সঙ্গে সে এমনভাবে ডুবে গেল যেন জলস্রোত এসে তার মাথার উপর দিয়ে বয়ে গেল।

সূর্যোদয়ের আগেই চীৎকার-চেঁচামেচি ও ঘন ঘন বন্দুকের শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। ফরাসী সৈন্যরা ছুটে পালাচ্ছে।

তাদের একজন চেঁচিয়ে বলল, "কসাকরা এসেছে!" মুহূর্তকাল পরে একদল রুশ পিয়েরকে ঘিরে দাঁড়াল।

কি যে ঘটে যাচ্ছে অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে তা বুঝতেই পারল না। শুধু শুনতে পেল, চারদিকে তার বন্ধুরা আনন্দে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

কসাক ও হুজারদের জড়িয়ে ধরে বুড়ো সৈন্যরা কেবলই কাঁদছে আর বলছে, "ভাইরা আমার! প্রিয়জন আমার! আদরের মাণিক আমার!"

হুজার ও কসাকরা বন্দীদের চারপাশে ভিড় করে দাঁড়াল। কেউ তাদের পোশাক দিল, কেউ বুট দিল, কেউ বা দিল রুটি। তাদের মাঝখানে বসে

পিয়েরও ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল, একটা কথাও বলতে পারল না। প্রথম যে সৈনিকটি তার কাছে এগিয়ে এল তাকেই বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে চুমো খেতে লাগল।

বিধ্বস্ত বাড়িটার ফটকে দাঁড়িয়ে আছে দলখভ। নিরস্ত্র ফরাসীরা ভিড় করে চলে যাচ্ছে তার সামনে দিয়ে। উত্তেজিত ফরাসীরা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু দলখভের চোখের দিকে তাকিয়ে তারা চুপ করে গেল। বিপরীত দিকে দাঁড়িয়ে আছে তার কসাক; বন্দীদের গুণছে, আর প্রতি একশ' জন গোণা হয়ে গেলে খড়ি দিয়ে ফটকে একটা করে দাগ দিচ্ছে।

দলখভ কসাককে শুধাল, "কতজন হল?"

"দ্বিতীয় শত হল," কসাক জবাব দিল।

দলখভ অনবরত বলছে, "ফাইলেজ, ফাইলেজ! (এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও!)' কথাটা সে ফরাসীদের কাছ থেকে শিখেছে। বন্দীদের চোখে চোখ পড়তেই তার দুই চোখে একটা নিষ্ঠুর আলো ঝিলিক দিয়ে উঠছে।

বাগানে একটা গর্ত খোঁড়া হয়েছে। কসাকরা পেত্য়া রস্তভের মৃতদেহটা সেখানে বয়ে নিয়ে চলেছে। খালি মাথায়, বিষণ্ন মুখে দেনিসভ চলেছে তাদের পিছনে পিছনে।

অধ্যায়—১৬

২৮ শে অক্টোবরের পরে প্রথম বরফ পড়তে আরম্ভ হলে ফরাসীদের পলায়ন আরও শোচনীয় আকার ধারণ করল। লোকগুলো বরফে জমে যেতে লাগল, অনেকে শিবির-আগুনে ঝলসেই মারা পড়ল। ওদিকে লোমের পোশাক-পরা লোকদের নিয়ে গাড়ির পর গাড়ি চলতে লাগল। সম্রাট, রাজন্যবর্গ, ডিউকবৃন্দ যে যা চুরি করেছিল সব গেল সেইসব গাড়িতে; কিন্তু ফরাসী বাহিনীর পলায়ন ও ভাঙন আগের মতই চলতে লাগল।

রক্ষীবাহিনীকে না ধরেই (গোটা যুদ্ধের সময় তারা লুটতরাজ ছাড়া আর কিছুই করে নি) ফরাসী বাহিনীর মোট সৈন্য সংখ্যা ছিল তিয়াত্তর হাজার। মস্কো থেকে ভিয়াজ্‌মা যেতেই সে সৈন্য সংখ্যা কমে দাঁড়াল ছত্রিশ হাজার, যদিও যুদ্ধে মারা পড়েছে অনধিক পাঁচ হাজার মাত্র। এইভাবে শুরু করে পরবর্তীকালের সৈন্যসংখ্যা হ্রাসের হারটা গণিতিক নিয়মেই নির্ধারণ করা যেতে পারে। শীতের তীব্রতার হ্রাস-বৃদ্ধি, পশ্চাদনুসরণ, পথের প্রতিবন্ধকতা, বা অন্য বিশেষ কারণগুলি ছাড়াই মস্কো থেকে ভিয়াজ্‌মা, ভিয়াজ্‌মা থেকে স্মোলেনস্ক, স্মোলেনস্ক থেকে বেরিজিনা, এবং বেরিজিনা থেকে ভিল্‌না

—সর্বস্তরে ফরাসী বাহিনী একই হারে গলে গেল, ধ্বংস হয়ে গেল। ভিয়াজ্‌মার পর থেকে ফরাসী বাহিনী তিন সারির পরিবর্তে এক সারিতে ভিড় করতে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত সেইভাবেই চলল। বেথিয়ের তার অবস্থা বর্ণনা করতে সম্রাটকে এই রকম লিখল (এখন আমরা জেনেছি একটি সেনাবাহিনীর অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে একজন অধিনায়ক অফিসার সত্য থেকে কতদূরে সরে যেতে পারে):

"গত দু'তিন দিনের যাত্রাপথের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন সেনাদলের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তাদের অবস্থা সম্পর্কে সম্রাটের কাছে একটা প্রতিবেদন পাঠানো আমি আমার কর্তব্য বলে মনে করি। তারা প্রায় দলছুট হয়ে পড়েছে সৈন্যদের এক-চতুর্থাংশও তাদের রেজিমেণ্টের পতাকাতলে সমবেত আছে কি না সন্দেহ, বাকিরা যার যেদিকে খুশি চলেছে; নিয়ম-শৃংখলার হাত এড়িয়ে খাদ্য-সংগ্রহের আশাতেই তারা ছুটছে। সাধারণভাবে তারা মনে করে যে স্মোলেন্‌স্ক্‌ই একমাত্র স্থান যেখানে তাদের অবস্থার উন্নতি হবার আশা আছে। গত কয়েক দিনে দেখা গেছে, অনেক সৈন্য তাদের কার্তুজ ও অস্ত্রশস্ত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে, আপনার চূড়ান্ত পরিকল্পনা যাই হোক না কেন, ইয়োর ম্যাজেস্টির সেবার স্বার্থেই এটা জরুরী যে গোটা বাহিনীকে স্মোলেন্‌স্ক্‌-এ সমবেত করা হোক, এবং যেসব অশ্ববিহীন অশ্বারোহী সৈন্য, অপ্রয়োজনীয় মালপত্র ও গোলন্দাজ বাহিনীর মালপত্র এখন আর সৈন্যসংখ্যার সমানুপাতিক নয় সেইসব অকার্যকর বোঝার হাত থেকে সেনাবাহিনীকে মুক্ত করা হোক। সৈন্যরা ক্ষুধায় ও ক্লান্তিতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। নতুন করে খাদ্য সরবরাহ ও কয়েক দিনের বিশ্রাম তাদের দরকার। এই কয়দিনে রাস্তায় অথবা সাময়িক আস্তানায় অনেকে মারা গেছে। পরিস্থিতি ক্রমেই খারাপ হচ্ছে, ভয় হয় জরুরী প্রতিকারের ব্যবস্থা না হলে নতুন করে যুদ্ধ বাধলে সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে না।

"৯ই নভেম্বর: স্মোলেন্‌স্ক্‌ থেকে ত্রিশ ভার্স্ট দূরে।"

স্খলিত পায়ে কোনরকমে স্মোলেন্‌স্ক্‌-এর স্বর্গরাজ্যে পৌঁছে খাদ্যের সন্ধানে বিফল মনোরথ হয়ে ফরাসীরা পরস্পরকে খুন করল, নিজেদের খাদ্য লুট করল, এবং সবকিছু লুট করা শেষ হবার পরে আরও দূরে পালিয়ে গেল।

কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, কিছুই জানে না। প্রতিভাধর নেপোলিয়ন জানত আরও কম, কারণ তার কাছে কেউ কোন নির্দেশ পাঠায় নি। তথাপি সে নিজে এবং তার আশপাশের লোকরা তাদের পুরনো অভ্যাসমতই চলতে লাগল: হুকুম জারী করল, চিঠি লিখল, প্রতিবেদন পাঠাল, দৈনিক নির্দেশও ঘোষণা করল, একে অন্যকে Sire, mon, prince d' Eckmul, roi de

Naples ইত্যাদি বলে সম্বোধনও করল। কিন্তু এইসব হুকুম ও প্রতিবেদন শুধু কাগজেই রইল, তার কিছুই কার্যে পরিণত করা হল না, কারণ কার্যে পরিণত করা সম্ভব ছিল না। যদিও একে অন্যকে ম্যাজেস্টি, হাইনেস, বা কাজিন বলে ডাকত, তবু তারা সকলেই জানত যে তারা অতি শোচনীয় জীব, অনেক অন্যায় তারা করেছে, আর এখন তার জন্য মাশুল গুণতে হচ্ছে। সেনাবাহিনীর প্রতি দরদ দেখাবার ভান করলেও আসলে প্রত্যেকেই ভাবছে শুধু নিজের কথা, ভাবছে কত শীঘ্র এখান থেকে পালিয়ে নিজেকে বাঁচাবে।

অধ্যায়—১৭

মস্কো থেকে নিয়েমেন ফিরবার পথে রুশ ও ফরাসী বাহিনীর গতিবিধি ছিল অনেকটা কানা রুশোর কানামাছি খেলারই মত। সেই খেলায় দুজন খেলুড়ের চোখ বেঁধে দেওয়া হয়; তাদের মধ্যে একজন মাঝে মাঝে একটা ছোট ঘণ্টা বাজিয়ে নিজের অবস্থান জানিয়ে দেয়। প্রথমে সে ঘণ্টা বাজায় নির্ভয়ে, কিন্তু কোন শক্ত কোণে আটকা পড়লে যথাসম্ভব নিঃশব্দে সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করে, আর প্রায়ই পালাতে গিয়ে সোজা প্রতি-পক্ষের হাতের মধ্যে ধরা পড়ে যায়।

প্রথমে কালুগা রোড ধরে যাবার সময় নেপোলিয়নের সৈন্যরা সকলকে তাদের উপস্থিতি জানিয়েই চলতে লাগল, কিন্তু পরে স্মোলেন্‌স্ক্‌ রোডে পৌঁছে তারা ঘণ্টার ঘুন্টিটা চেপে ধরে ছুটতে লাগল এবং পালাতে গিয়ে সোজা রুশদের খপ্পরে ধরা পড়ল।

একটা সেনাদল পালাচ্ছে, অপর সেনাদল তাদের পিছু নিয়েছে। স্মোলেন্‌স্ক্‌ ছাড়িয়ে ফরাসীদের সামনে কয়েকটা ভিন্ন ভিন্ন পথ খোলা ছিল। সহজেই মনে করা যেতে পারে যে সেখানে চারদিন অবস্থানের সময় ফরাসী বাহিনী নিশ্চয় শত্রুপক্ষের উপস্থিতি জানতে পারত, আরও সুবিধাজনক কোন ব্যবস্থার আশ্রয় নিতে পারত, এবং নতুন কোন পথের কথা ভাবতে পারত। কিন্তু চারদিন বিশ্রামের পরে কোনরকম পরিকল্পনা বা কৌশল ছাড়াই তারা চিরাচরিত পথ ধরে ছুটতে আরম্ভ করল; বাঁয়েও গেল না, ডাইনেও গেল না, সোজা এগিয়ে গেল ক্রাস্‌নৃ ও ওর্শার ভিতর দিয়ে সব চাইতে খারাপ পুরনো রাস্তাটা ধরে।

শত্রু সম্মুখ দিক থেকে আসবে না, আসবে পিছন থেকে—এই আশায় ফরাসীরা পালাবার পথে এত দূরে ছড়িয়ে পড়ল যে অনেক জায়গায় তাদের পরস্পরের দূরত্ব চব্বিশ ঘণ্টাকেও ছাড়িয়ে গেল। প্রথমে সম্রাট, পরে রাজন্য-বর্গ, তারপরে ডিউকরা—তাদের সামনে সকলেই পালাচ্ছে। নীপার পেরিয়ে নেপোলিয়ন ডান দিকের রাস্তা ধরবে—সেটাই তার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত কাজ

হত—এই আশায় রুশ বাহিনী ডাইনে মোড় নিয়ে ক্রাস্‌নুতে গিয়ে বড় রাস্তায় পড়ল। আর কানামাছি খেলার মতই ফরাসীরা এসে আমাদের অগ্রবর্তী বাহিনীর মুখোমুখি হয়ে পড়ল। অপ্রত্যাশিতভাবে শত্রুকে দেখতে পেয়ে ফরাসীরা হতভম্ব হয়ে গেল, আকস্মিক ভয়ে থমকে দাঁড়াল, কিন্তু তার পরেই পিছনের বন্ধুদের ফেলে রেখে নতুন করে পালাতে শুরু করল। তারপর তিনদিন ধরে ফরাসী বাহিনীর ভিন্ন ভিন্ন শাখা—প্রথমে মুরাত-এর দল, তারপর দাভুৎ-এর দল, এবং তারপর নে-র দল—সকলেই রুশবাহিনীর মুঠোর মধ্যে পড়ে গেল। তারা পরস্পরকে ছেড়ে গেল; ভারী মালপত্র, কামান-বন্দুক এবং অর্ধেক সৈন্য ফেলে রেখে ডান দিকে অর্ধবৃত্তাকারে রাতের অন্ধকারে রুশ বাহিনীর পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

সকলের শেষে এল নে; কারও পথে না পড়লেও সে স্মোলেন্‌স্ক্‌-এর দেয়ালগুলো উড়িয়ে দিতে লাগল, কারণ ঐ দেয়ালের গায়ে ধাক্কা খেয়ে সে দেয়ালকেই শাস্তি দিতে চাইল। দশ হাজার সৈন্য ছিল নে-র অধীনে; কিন্তু ওর্শাতে সে নেপোলিয়নের কাছে পৌঁছল মাত্র এক হাজার সৈন্য নিয়ে; বাকি সব সৈন্য ও কামান-বন্দুক সে ফেলে এসেছে; একটা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে রাতের অন্ধকারে আত্মগোপন করে সে নীপার নদী পার হয়ে এসেছে।

ওর্শা থেকে ভিল্‌না রোড ধরে তারা আরও দূরে পালাতে লাগল; পশ্চাদ্ধাবনকারী সৈন্যদের সঙ্গে তখনও চলল তাদের কানামাছি খেলা। বেরিজিনাতে তারা আবার দলছুট হয়ে পড়ল, অনেকে নদীতে ডুবে মরল, অনেকে আত্মসমর্পণ করল, আর যারা নদী পার হতে পারল তারা পালিয়ে গেল আরও দূরে। তাদের সর্বাধিনায়ক লোমের কোট পরে স্লেজে চেপে একাই ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল, পিছনে রেখে গেল সঙ্গীসাথীদের। আরও যারা পারল তারাও চলে গেল, আর যারা পারল না তারা হয় আত্মসমর্পণ করল, নয় তো মরল।

অধ্যায়—১৮

এ অভিযান যেন ফরাসীদের পলায়নেরই বৃত্তান্ত; এতে তারা যেন যথাশক্তি আত্ম-হননেই মেতে উঠল। যেদিন তারা কালুগা রোড ধরল সেদিন থেকে তাদের নেতার সেনাবাহিনী থেকে পলায়নের দিন পর্যন্ত তাদের গতিবিধি ছিল একেবারেই অর্থহীন। সুতরাং লোকে একথা ভাবতে পারত, যে ইতিহাসকাররা মনে করে যে একটি মানুষের ইচ্ছাই জনতার কর্মধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে তাদের পক্ষে এই সময়কার পশ্চাদপসরণের বাহিনীকে তাদের মতবাদের সঙ্গে খাপখাওয়ানো অসম্ভব হয়ে পড়বে। কিন্তু না! এই অভিযান সম্পর্কে ইতিহাসকাররা পাহাড়প্রমাণ বই লিখেছে, আর সর্বত্রই বিস্তারিত-

ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে নেপোলিয়নের সুব্যবস্থা, তার সমর-কৌশল, সৈন্য-পরিচালনার সুষ্ঠু পরিকল্পনা, এবং তার মার্শালদের সামরিক প্রতিভার কথা।

একটি রসদ-সমৃদ্ধ অঞ্চলে যাবার রাস্তা খোলা ছিল; পরবর্তীকালে কুতুজভ যে রাস্তা বরাবর তার পশ্চাদ্ধাবন করেছিল সেই সমান্তরাল রাস্তাটাও খোলা ছিল; তবু নেপোলিয়ন যে মালো—ইয়ারোস্লাভেৎস্ থেকে পশ্চাদ-পসরণের সময় অপ্রয়োজনে একটা বিধ্বস্ত রাস্তা ধরে পশ্চাদপসরণ করেছিল তার ব্যাখ্যাস্বরূপ আমাদের বলা হয়েছে যে গভীর বিচার-বিবেচনাই নাকি তার কারণ। তার স্মোলেন্স্ক্ থেকে ওর্শা পর্যন্ত পশ্চাদপসরণের পক্ষেও সেই একই গভীর বিচার-বিবেচনার কথা বলা হয়েছে। তারপর বর্ণনা করা হয়েছে ক্রাস্নুতে তার বীরত্বের। বলা হয়েছে, সেখানে সে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত ছিল, ব্যক্তিগতভাবে যুদ্ধে নেতৃত্ব দিতেও রাজী ছিল, আর একটা বার্চের ডাল হাতে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলেছিল:

"সম্রাট হিসাবে আমি দীর্ঘকাল কাজ করেছি, এবার সেনাপতি হিসাবে কাজ করার সময় এসেছে।" তথাপি অবশিষ্ট বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত সৈন্যদের ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে পরক্ষণেই আবার সে পালিয়ে গিয়েছিল।

তারপর আমাদের বলা হয়েছে মার্শালদের অন্তরের মহত্ত্বের কথা—বিশেষ করে নে-র কথ—আর সে মহত্ত্বের তো এই স্বরূপ; বাহিনী-পতাকা, কামান-বন্দুক ও নয়-দশমাংস সৈন্যকে ফেলে রেখে রাতের অন্ধকারে বনের আড়াল দিয়ে নীপার নদী পার হয়ে সে ওর্শাতে পালিয়ে গিয়েছিল।

এবং সবশেষে, বীরত্বপূর্ণ সেনাদলের কাছ থেকে মহান সম্রাটের চূড়ান্ত যাত্রাকে ইতিহাসকাররা বর্ণনা করেছে একটি মহৎ ও প্রতিভার স্মারক রূপে। এমন কি যে চূড়ান্ত পলায়নকে সাধারণ ভাষায় নীচতার সর্বনিম্ন ধাপ বলে বর্ণনা করা হয়, যা নিয়ে প্রতিটি শিশুকেও লজ্জা পেতে শেখানো হয়,—তাকেও ইতিহাসকারদের ভাষায় সমর্থন জানানো হয়েছে।

ঐতিহাসিক যুক্তির সুতোকে যখন আর টানা যায় না, কোন কাজ যখন মানুষ যাকে সঠিক, এমন কি ন্যায় বলে মনে করে তার সম্পূর্ণ বিরোধী হয়, তখনই ইতিহাসকাররা "মহত্ত্ব" নামক একটি আত্মরক্ষাকারী ধারণার আশ্রয় নিয়ে থাকে। মনে হয়, 'মহত্ত্ব' বুঝি ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠির অতীত। মহাপুরুষের পক্ষে কিছুই অন্যায় নয়; এমন কোন নৃশংসতা নেই যার জন্য একজন মহাপুরুষকে দোষী করা যায়।

গরম লোমের পোশাকে শরীর ঢেকে নেপোলিয়ন স্বদেশে পালিয়ে গেল; মৃত্যুর মুখে ফেলে রেখে গেল তাদের যারা শুধু তার সহকর্মী নয়, যাদের সে এখানে নিয়ে এসেছিল। সে ভাবল খুব ভাল কাজই করেছে, আর তাই ভেবে তার মনও শান্ত হল।

নেপোলিয়ন বলল, "মহান থেকে হাস্যকরের ব্যবধান মাত্র একটি

ধাপের।" আর সারা বিশ্ব পঞ্চাশ বছর ধরে তারই পুনরাবৃত্তি করে গেল: "মহান! মহিমময়! নেপোলিয়ন মহিমময়!" মহান থেকে হাস্যকরের ব্যবধান মাত্র একটি ধাপের।

একথা কারও মনে হল না যে, ন্যায়-অন্যায়ের মানদণ্ডের বিচারে যে মহত্ত্ব তুল্যমূল্য নয় তাকে স্বীকার করার অর্থই নিজের অন্তঃসারশূন্যতা ও অপরিমেয় নীচতাকে স্বীকার করা।

আমার কাছে, যেহেতু খৃস্টের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি ভাল ও মন্দের মানদণ্ড, মানুষের কোন কাজই বিচারের উর্ধ্বে নয়। যেখানে সরলতা, সাধুতা ও সত্য অনুপস্থিত, সেখানে কোন মহত্ত্ব থাকতে পারে না।

অধ্যায়—১৯

১৮১২ সালের অভিযানের শেষাংশের বিবরণ পড়ে কোন্ রুশ অধিবাসীর মনে দুঃখ, অসন্তোষ ও বিহ্বলতার একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি জাগে নি? আমাদের তিন তিনটি বাহিনী যখন যথেষ্ট সংখ্যাধিক্য নিয়ে ফরাসীদের ঘিরে ধরেছিল, ক্ষুধার্ত ও শীতার্ত বিশৃংখল ফরাসীরা যখন দলে দলে আত্ম-সমর্পণ করছিল, যখন (ইতিহাসকারদের বিবরণ মতে) রুশদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল ফরাসীদের প্রতিরোধ করা, তাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলা এবং সব্বাইকে গ্রেপ্তার করা,—তখন সব ফরাসীদের কেন গ্রেপ্তার বা ধ্বংস করা হয় নি, এ প্রশ্ন নিজের কাছে কে না করেছে?

এটা কি করে ঘটল যে, রুশ বাহিনী যখন সংখ্যায় ফরাসীদের তুলনায় দুর্বলতর ছিল তখন তারা বরদিনোতে লড়তে পারল, আর যখন তারা তিন দিক থেকে ফরাসীদের ঘিরে ফেলল, যখন তাদের গ্রেপ্তার করাই ছিল তাদের লক্ষ্য, তখন তারা সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারল না? ফরাসীরা কি আমাদের চাইতে এত বেশী উঁচুদরের যোদ্ধা যে অধিক সংখ্যক সৈন্য নিয়ে ঘিরে ফেলেও আমরা তাদের মারতে পারি নি? সেটা ঘটল কেমন করে?

এই সব প্রশ্নের উত্তরে ইতিহাস (অথবা ঐ নামে যাকে ডাকা হয়) বলে, এটা ঘটেছিল কারণ কুতুজভ এবং তর্মাসভ এবং চিচাগভ এবং অমুক লোক ও তমুক লোক অমুক-তমুক রণ-কৌশলকে কার্যে পরিণত করে নি···

কিন্তু কেন তারা তা করে নি? আর পূর্ব-ব্যবস্থা অনুযায়ী কোন লক্ষ্যকে কার্যে পরিণত না করার অপরাধে যদি তারা অপরাধী হয়ে থাকে, তাহলে কেন তাদের বিচার হল না, শাস্তি হল না? কিন্তু একথা যদি স্বীকার করেও নেওয়া যায় যে কুতুজভ, চিচাগভ ও অন্যরাই রুশ ব্যর্থতার কারণ তাহলেও তো এটা দুর্বোধ্যই থেকে যায় যে ক্রাস্নয় ও বেরিজিনাতে (দু' জায়গাতেই আমাদের সৈন্যসংখ্যা বেশী ছিল) রুশ বাহিনী সুবিধাজনক অবস্থাতে থেকেও

কেন রুশদের লক্ষ্য অনুযায়ী মার্শালগণ, রাজন্যবর্গ ও সম্রাটসহ গোটা ফরাসী বাহিনীকে গ্রেপ্তার করতে পারে নি।

কুতুজভ আক্রমণের পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল এই কথা বলে রুশ সামরিক ইতিহাসকাররা এই অদ্ভুত ঘটনার যে ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে সেটাও ভিত্তিহীন, কারণ আমরা জানি ভিয়াজ্‌মায় এবং তারুতিনোতে কুতুজভ সেনাদলকে আক্রমণ থেকে বিরত রাখতে পারে নি।

যে রুশবাহিনী অনেক কম শক্তি নিয়ে বরদিনোতে পূর্ণ শক্তিতে শক্তিমান শত্রুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে পারল, কেন তারা ক্রাস্‌নয় ও বেরিজিনাতে অধিকতর শক্তিশালী পক্ষ হওয়া সত্ত্বেও বিশৃংখল ফরাসীদের হাতে মার খেল?

শত্রুপক্ষকে ছিন্নভিন্ন করে নেপোলিয়ন ও তার মার্শালদের গ্রেপ্তার করাই যদি রুশদের লক্ষ্য ছিল—সে লক্ষ্য যে ব্যর্থ হয়েছে তাই নয়, সে উদ্দেশ্য সাধনের প্রতিটি চেষ্টা অত্যন্ত লজ্জাজনকভাবে প্রতিহত হয়েছে—তাহলে তো অভিযানের এই শেষ পর্যায়কে ফরাসীরা যে তাদের জয়ের পর জয় বলে মনে করে সেটাই ঠিক, আর রুশ ইতিহাসকাররা যে সেটাকে আমাদের জয় বলে মনে করে সেটাই সম্পূর্ণ ভুল।

রুশ সামরিক ইতিহাসকাররা যদি যুক্তির দাবী মেনে চলে তাহলে তাদের স্বীকার করতেই হবে যে রুশবাহিনীর শৌর্য, দেশসেবা প্রভৃতি সম্পর্কে যত উচ্ছ্বসিত কাব্য তারা রচনা করুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে মস্কো থেকে ফরাসীদের পশ্চাদপসরণ নেপোলিয়নের জয়ের পর জয় এবং কুতুজভের পরাজয়ের পর পরাজয়েরই স্বাক্ষর বহন করে।

কিন্তু জাতীয় গর্ববোধের ব্যাপারটাকে সম্পূর্ণ দূরে সরিয়ে রেখেও যেকোন মানুষেরই মনে হবে যে এধরনের সিদ্ধান্ত স্ববিরোধী, কারণ ফরাসীদের উপর্যুপরি জয় তাদের এনে দিয়েছিল পরিপূর্ণ ধ্বংস, আর রুশদের উপর্যুপরি পরাজয়ের ফল হল শত্রুপক্ষের সার্বিক বিনষ্টি এবং তাদের দেশের মুক্তি।

এই স্ববিরোধের উৎস খুঁজতে হবে একটিমাত্র ঘটনার মধ্যে: ইতিহাসকাররা সম্রাট ও জেনারেলদের চিঠিপত্র, স্মৃতিকথা, প্রতিবেদন, প্রকল্প ইত্যাদি থেকে তাদের রচনার উপাদান সংগ্রহ করতে গিয়ে ১৮১২ সালের অভিযানের শেষ পর্যায়ে এমন একটি লক্ষ্যের কথা বলেছে—অর্থাৎ মার্শালবর্গ ও সেনাবাহিনীসহ নেপোলিয়নকে ছিন্নভিন্ন করে গ্রেপ্তার করা—কোনকালেই যার কোন অস্তিত্বই ছিল না।

এরকম কোন লক্ষ্য কখনও ছিল না বা থাকতে পারে না, কারণ সেটা একান্তই অর্থহীন এবং তাকে কার্যে পরিণত করা একেবারেই অসম্ভব।

সেটা যে অর্থহীন· তার প্রথম কারণ, নেপোলিয়নের ছত্রভঙ্গ বাহিনী তখন যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে রাশিয়া থেকে পালাচ্ছিল, আর প্রতিটি রুশ তখন

সেটাই চাইছিল। কাজেই ফরাসীরা যখন প্রাণপণ শক্তিতে পালিয়েই যাচ্ছে তখন অকারণ যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রয়োজনটা কোথায়?

দ্বিতীয়, যে সৈন্যরা পালিয়ে যেতেই সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে তাদের পথ আটকে দেবার তো কোনই অর্থ হয় না।

তৃতীয়, যে-ফরাসী বাহিনী বাইরের হস্তক্ষেপ ছাড়াই নিজেকে নিজেই এমনভাবে ধ্বংস করে চলছিল যেপথে কোনরকম বাধার সম্মুখীন না হয়েও মূল বাহিনীর একশ' ভাগের এক ভাগের বেশী সৈন্য নিয়েও সীমান্ত পার হতে পারে নি, তাকে ধ্বংস করার জন্য নিজেদের সৈন্য নষ্ট করা হত একান্তই অর্থহীন।

চতুর্থ, সম্রাট, রাজন্যবর্গ, এবং ডিউকবৃন্দকে গ্রেপ্তারের বাসনাটাই অর্থহীন হত,—তাদের গ্রেপ্তার করা হলে সেটা যে রুশদের পক্ষে খুবই বেশীরকমের হতবুদ্ধিকর হত সেকথা তো সেসময়কার সবচাইতে নিপুণ কূটনীতিবিদরাই (জোসেফ দ্য মেইস্তার প্রভৃতিরা) স্বীকার করেছে। ফরাসী সৈন্যদের গ্রেপ্তার করার বাসনা আরও বেশী অর্থহীন হত, কারণ ক্রাস্‌নুতে পৌঁছবার আগেই আমাদের সৈন্যসংখ্যা কমতে কমতে অর্ধেকে এসে দাঁড়িয়েছিল; যখন আমাদের নিজেদের সৈন্যরাই পুরো রেশন পাচ্ছিল না, আর যাদের ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে তারাই ক্ষুধায় মরতে বসেছে, সেই পরিস্থিতিতে একটা গোটা সৈন্যদলকে বন্দী করে পাহারা দিয়ে নিয়ে যেতে একটা গোটা ডিভিশন সৈন্যেরই দরকার হয়ে পড়ত।

নেপোলিয়ন ও তার বাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করে গ্রেপ্তার করার গুরুগম্ভীর পরিকল্পনাগুলি সেই বাজার-মালির পরিকল্পনারই মত যে বাগানে ঢুকে গাছের চারা মাড়িয়ে দেওয়ার জন্য গরুটাকে তাড়িয়ে দিতে ফটক পর্যন্ত ছুটে গিয়ে তার মাথায়ই মারল লাঠির ঘা। তার স্বপক্ষে একটিমাত্র কথাই বলা যায় যে সে খুব রেগে গিয়েছিল। কিন্তু এইসব প্রকল্প যারা রচনা করেছিল তাদের স্বপক্ষে একথাও বলা যাবে না, কারণ ফুলের কেয়ারি মাড়িয়ে দেবার ফলে তাদের অন্তত কোন ক্ষতি হয় নি।

নেপোলিয়নকে তার সেনাদল থেকে বিচ্ছিন্ন করা যে অর্থহীন তাই শুধু নয়, সেটা অসম্ভবও বটে।

সেটা যে অসম্ভব তার প্রথম কারণ, অভিজ্ঞতা থেকেই জানা যায় যে রণক্ষেত্রে তিন মাইল দীর্ঘ সেনা সমাবেশ কখনও পরিকল্পনামাফিক চলতে পারে না; চিচাগভ, কুতুজভ ও উইৎগেন্‌স্তিন যথাসময়ে একটা নির্দিষ্টস্থানে মিলিত হবে—তার সম্ভাবনা এতই সুদূর যে সেটা প্রায় অসম্ভবের পর্যায়েই পড়ে। বস্তুত, পরিকল্পনাটা হাতে পেয়ে কুতুজভ তো বলেইছিল যে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত কোন পরিকল্পনা বাঞ্ছিত ফল এনে দিতে পারে না।

দ্বিতীয়, সেটা অসম্ভব এই কারণে যে, যে দুর্বার গতিতে নেপোলিয়নের

সৈন্যরা পালাচ্ছিল তাকে স্তব্ধ করে দিতে হলে রুশদের তৎকালীন সৈন্যশক্তি অপেক্ষা আরও বহুগুণ সৈন্যের প্রয়োজন হত।

তৃতীয়, সেটা অসম্ভব এই কারণে যে "বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া" এই সামরিক কথাটাই অর্থহীন। একটুকরো রুটিকে কেটে বিচ্ছিন্ন করা যায়, কিন্তু একটা সেনাদলকে তা করা যায় না। একটা সেনাদলকে বিচ্ছিন্ন করা—তার পথ আটকে দেওয়া—সম্পূর্ণ অসম্ভব, কারণ গ্রেপ্তার এড়িয়ে চলবার প্রচুর পথ সব সময়ই খোলা থাকে; তাছাড়া আছে রাতে যখন কিছুই চোখে দেখা যায় না; সমর-বিজ্ঞানীরা তো ক্রাস্‌নু ও বেরিজিনার দৃষ্টান্ত থেকেই সেটা ভালভাবে বুঝতে পারে। যারা বন্দী হতে চায় একমাত্র তাদেরই বন্দী করা যায়, যেমন যে পাখি হাতে এসে বসে তাকেই শুধু ধরা সম্ভব। সৈন্যরা যখন জার্মানদের মত রণ-কৌশল হিসাবে আত্মসমর্পণ করে একমাত্র তখনই তাদের বন্দী করা যায়। কিন্তু ফরাসী সৈন্যরা সে কৌশলকে গ্রহণীয় বলে মনে করে নি, কারণ কি পলায়নে কি বন্দী-জীবনে ক্ষুধায় এবং শীতে মৃত্যু তাদের অনিবার্য নিয়তি।

চতুর্থ এবং প্রধান কথা, সেটা অসম্ভব এই কারণে যে, জগতের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত ১৮১২ সালের মত ভয়ংকর অবস্থার মধ্যে কখনও কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয় নি; ফরাসীদের পশ্চাদ্ধাবন করতে রুশ-বাহিনীকে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হয়েছে; তার বেশী কিছু করতে গেলে সে নিজের ধ্বংসকেই ডেকে আনত।

তারুতিনো থেকে ক্রাস্‌নু যাবার পথে রুশবাহিনী রুগ্ন অথবা দলছুট হিসাবে পঞ্চাশ হাজার সৈন্যকে হারাল, অর্থাৎ সংখ্যাটা যেকোন একটা বড় প্রাদেশিক শহরের জনসংখ্যার সমান। অর্ধেক সৈন্য মারা পড়ল বিনা যুদ্ধে।

অভিযানের এইরকম একটা পর্যায়ে—যখন সৈন্যদের ছিল না বুট, ছিল না ভেড়ার চামড়ার কোট, ছিল না যথেষ্ট খাদ্য, ভদ্‌কা তো একেবারেই ছিল না, পনেরো ডিগ্রি তুষারপাতের মধ্যে মাসের পর মাস রাত কাটিয়েছে বাইরে তাঁবু খাটিয়ে, যখন দিনের আলো থাকত মাত্র সাত কি আট ঘণ্টা, আর বাকি রাতটাতে শৃংখলা বজায় রাখা ছিল অসম্ভব, যখন কেবলমাত্র যুদ্ধের কয়েক ঘণ্টা নয়, মাসের পর মাস সৈন্যদের এমন একটা মৃত্যুপুরীতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যেখানে শৃংখলা ভেঙে পড়তে বাধ্য, যখন প্রতিটি মুহূর্তে তারা যুদ্ধ করেছে ক্ষুধা ও শীতের আক্রমণে মৃত্যুর বিরুদ্ধে, যখন মাত্র একটি মাসে অর্ধেক সৈন্য ধ্বংস হয়ে গেল—অভিযানের সেই পর্যায় সম্পর্কে ইতিহাসকাররা আমাদের শোনালেন মিলোরাদভিচের কোন্‌ পথে কোথায় সৈন্য পরিচালনা করা উচিত ছিল, তর্মাসভের কোন্‌ নির্দিষ্ট স্থানে যাওয়া উচিত ছিল, হাঁটু পর্যন্ত বরফের ভিতর দিয়ে নদী পেরিয়ে চিচাগভের যাওয়া উচিত ছিল অন্য কোন্‌খানে, এবং যেন তেন প্রকারেন ফরাসী বাহিনীকে বিচ্ছিন্ন করা ও

পরাস্ত করা উচিত ছিল, ইত্যাদি ইত্যাদি।

অর্ধেক সৈন্য মৃত্যুর মুখে চলে পড়লেও জাতির যোগ্য লক্ষ্য পূরণে যা কিছু করা সম্ভব এবং যা কিছু করা উচিত রুশ সৈন্যরা সেসবই করেছে; রাশিয়ার অন্য একদল মানুষ বৈঠকখানায় আরামে বসে তাদের অসম্ভব কিছু করতে বলেছে বলেই রুশ সৈন্যদের কোনরকম দোষ দেওয়া উচিত নয়।

প্রকৃত সত্য ও ঐতিহাসিক বিবরণের মধ্যে বিচিত্র স্ববিরোধকে আজ বোঝা শক্ত তার কারণই হল, ইতিহাসকাররা লিখেছে সুন্দর সুন্দর কথা দিয়ে বিভিন্ন জেনারেলের মনোভাবের ইতিহাস, প্রকৃত ঘটনার ইতিহাস নয়।

তাদের আগ্রহ মিলোরাদভিচের কথায়, আর অমুক বা তমুক জেনারেল যেসব পুরস্কার পেয়েছে তার প্রতি; কিন্তু যে পঞ্চাশ হাজার মানুষ হাস-পাতালে অথবা কবরের নীচে পড়ে রইল তাদের কথা সেই ইতিহাসকারদের মনকে টানে নি, কারণ সেটা তাদের অনুসন্ধানের আওতার মধ্যে পড়ে না।

অথচ কেউ যদি প্রতিবেদন ও সাধারণ পরিকল্পনাগুলি বাতিল করে দিয়ে যে লাখ লাখ মানুষ প্রত্যক্ষভাবে সেইসব ঘটনায় অংশ নিয়েছিল তাদের কথা আলোচনা করে তাহলেই যেসব সমস্যাকে সমাধানের অতীত বলে মনে হয়েছে সেসব কিছুরই অত্যন্ত সহজ ও সরল সমাধানের সূত্র সে সঙ্গে সঙ্গেই পেয়ে যাবে।

নেপোলিয়ন ও তার সেনাদলকে বিচ্ছিন্ন করার চিন্তা এক ডজন মানুষের কল্পনায় ছাড়া আর কোথাও কোনকালে ছিল না। থাকতে পারে না, কারণ সে চিন্তাই অর্থহীন ও অবাস্তব।

জনসাধারণের মনে ছিল একটি লক্ষ্য: দেশকে আক্রমণের হাত থেকে মুক্ত করা। প্রথমত, ফরাসীরা যখন নিজে থেকেই পালাতে শুরু করল তখনই সে লক্ষ্য সিদ্ধ হয়ে গেল, কাজেই তাদের পলায়ন না থামানোটাই তখন একমাত্র কাজ। দ্বিতীয়ত, যে গেরিলা যুদ্ধে ফরাসীরা ধ্বংস হচ্ছিল তাতেই সে লক্ষ্য সিদ্ধ হয়েছে; তৃতীয়ত, রুশ বাহিনীর একটা বড় অংশ তখন ফরাসীদের পিছনে ধাওয়া করে চলেছে, তারা থামলেই সব শক্তি নিয়ে ফরাসীদের আক্রমণ করতে তারা প্রস্তুতই ছিল।

রুশ বাহিনীকে তখন কাজ করতে হয়েছিল ধাবমান জন্তুর পিঠে চাবুকের মত। আর অভিজ্ঞ কোচয়ানমাত্রই জানে যে ধাবমান জন্তুটার মাথায় চাবুকের ঘা বসানোর চাইতে ভয়-দেখানো ভঙ্গীতে চাবুকটাকে উদ্যত রাখাটাই শ্রেয়তর।

চতুর্দশ পর্ব সমাপ্ত

পঞ্চদশ পর্ব

অধ্যায়—১

একটি মুমূর্ষু জন্তুকে দেখলে মানুষের মনে আতংক জাগে : চোখের সামনে তারই অনুরূপ একটি জীব মরতে বসেছে। কিন্তু যখন কোন প্রিয় ঘনিষ্ঠ মানুষের মৃত্যু ঘটে তখন জীবন অবসানের এই ত্রাস ছাড়াও দেখা দেয় একটা কাটা ঘা, একটা আত্মিক ক্ষত, দৈহিক ক্ষতের মতই সে ক্ষত কখনও মারাত্মক হয়, কখনও শুকিয়ে যায়, কিন্তু বাইরে থেকে যেকোনরকম খোঁচা লাগলেই ব্যথা লাগে, কুঁকড়ে ওঠে।

প্রিন্স আন্দ্রুর মৃত্যুর পরে নাতাশা ও প্রিন্সেস মারিরও সেই অবস্থা হল। মৃত্যুর যে ভীতিপ্রদ মেঘ ছায়া ফেলেছে তাদের উপর তার মুখোমুখি হয়ে বিষণ্ণ মনে তারা চোখ বুজে রইল, জীবনের দিকে চোখ মেলে তাকাবার সাহস তাদের নেই ; যেকোনরকম বেদনাদায়ক স্পর্শ থেকে ক্ষতস্থানকে তারা সযত্নে রক্ষা করে চলল। রাস্তায় দ্রুত ধাবমান একটা গাড়ি, ডিনারে যোগ দেবার ডাক, কি পোশাক পরে বের হবে সে সম্পর্কে দাসীর প্রশ্ন, অথবা কোনরকম আন্তরিকতাবিহীন বা দুর্বল সহানুভূতি : এ সব কিছুই তাদের কাছে অপমান বলে মনে হয়, ক্ষতস্থান বেদনায় নতুন করে টাটিয়ে ওঠে, যে কঠোর ভয়ংকর সঙ্গীত কল্পনায় এখনও তাদের কানে প্রতিধ্বনিত হয় তাকে ভাল করে শুনবার জন্য যে প্রশান্তি প্রয়োজন হয় তাও বিঘ্নিত হয়, মুহূর্তের জন্য যে রহস্যময় সীমাহীন দৃশ্য তাদের সামনে খুলে গিয়েছিল সেদিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা আর হয়ে ওঠে না।

একমাত্র যখন তারা দুজন একত্র থাকে তখনই এই সব অপমান ও বেদনা থেকে তারা মুক্তি পায়। নিজেদের মধ্যেও তারা খুব কম কথা বলে, আর যখন বলে তাও অতি তুচ্ছ ব্যাপার নিয়েই বলে।

ভবিষ্যতের আলোচনাকে দুজনই এড়িয়ে চলে। ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে স্বীকার করাটাই তাদের কাছে প্রিন্স আন্দ্রুর স্মৃতিকে অসম্মান দেখানোর সামিল। যে মারা গেছে তার সম্পর্কিত সব কিছুকেই তারা সযত্নে এড়িয়ে চলে। তাদের মনে হয়, যে জীবনকে তারা পার হয়ে এসেছে তার অভিজ্ঞতাকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, প্রিন্স আন্দ্রুর জীবনের যেকোন ঘটনার উল্লেখ করলেই তাদের চোখের সামনে যে রহস্য রূপায়িত হত, তার মহত্ত্ব ও পবিত্রতা বিঘ্নিত হবে।

একাদিক্রমে কথা বলা থেকে বিরত থাকা এবং সেবিষয় সম্পর্কিত সব কিছুকে অনবরত এড়িয়ে চলার ফলে তাদের মনের অনুভূতি অধিকতর পবিত্রতা ও স্পষ্টতা নিয়ে তাদের মনের সামনে ভেসে ওঠে।

কিন্তু নির্ভেজাল পরিপূর্ণ সুখের মতই নির্ভেজাল পরিপূর্ণ দুঃখও অসম্ভব। প্রিন্সেস মারি এখন তার নিজের ভাগ্যেরএকমাত্র স্বাধীন বিধাতা ; সে তার ভাইপোটিরও অভিভাবিকা ও শিক্ষয়িত্রী ; কাজেই প্রথম পক্ষকাল যে দুঃখের রাজ্যে সে বাস করেছে সর্বপ্রথম তাকেই সেখান থেকে বাস্তব জীবনে ফিরে আসতে হয়েছে। আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে চিঠি এলে তার জবাব দেয় ; যে ছোট ঘরটায় ছোট নিকলাস থাকে সেটা স্যাঁতসেতে, আর তাই তার কাশি হয়েছে ; আল্‌পাতিচ্‌ই তো স্মাভ্‌ল্‌ থেকে সেখানকার অবস্থার কথা জানিয়ে প্রস্তাব ও পরামর্শ দিয়েছে যে মস্কোতে ভজ্‌দ্‌ভিজেংকা স্ট্রীটের বাড়িতে ফিরে যাওয়াই তাদের উচিত ; সে বাড়িটা অক্ষতই আছে. সামান্য মেরামত করে দিলেই চলবে। জীবন তো কোথাও থেমে থাকে না ; কাজেই বাঁচতে তো হবেই। প্রিন্স আন্‌দ্রুর মৃত্যুর পর থেকে প্রিন্সেস মারি যে নির্জন ধ্যানের রাজ্যে ডুবে ছিল সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে যত কষ্টই হোক, নাতাশাকে একলা ফেলে যেতে তার যত দুঃখ ও লজ্জাই হোক, তবু জীবনের নানা চিন্তার দাবীই বড় হয়ে দেখা দিল, অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে দাবীর কাছে সে নতি স্বীকার করল। আল্‌পাতিচের সঙ্গে বসে হিসাবপত্র দেখল, ভাইপোর ব্যাপারে দেসালেসের সঙ্গে আলোচনা করল, এবং মস্কো ফিরে যাবার হুকুম দিয়ে সেজন্য তোড়জোড় শুরু করে দিল।

নাতাশা একা পড়ে গেল ; প্রিন্সেস মারি যবে থেকে যাত্রার আয়োজন করতে লাগল তখন থেকে তার কাছ থেকেও সে সরে গেল।

প্রিন্সেস মারি কাউন্টেসকে বলল, নাতাশাকেও তাদের সঙ্গে মস্কো যেতে দেওয়া হোক ; বাবা-মা সানন্দে সে প্রস্তাব গ্রহণ করল, কারণ তারা দেখছে তাদের মেয়েটি দিনের পর দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে, আর স্থান পরিবর্তন ও মস্কোর ডাক্তারদের পরামর্শের ফল তার পক্ষে ভালই হবে।

সে প্রস্তাব করা হলে নাতাশা বলল, "আমি কোথাও যাচ্ছি না। দয়া করে আমাকে একা থাকতে দাও!" অনেক কষ্টে দুঃখের চাইতে বিরক্তির চোখের জল চেপে সেখান থেকে ছুটে চলে গেল।

সে বুঝল, প্রিন্সেস মারি তাকে ছেড়ে যাচ্ছে, তার দুঃখ তাকে একাই সইতে হবে। বেশীর ভাগ সময় সে নিজের ঘরে একাই কাটায়। এই নির্জনতা তাকে ক্লান্ত করে তোলে, যন্ত্রণা দেয়, তবু সেটা তার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। কেউ ঘরে ঢুকলেই সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়, মুখের ভাব বদলে জায়গা বদল করে, একটা বই বা সেলাই হাতে নেয়. অনধিকারপ্রবেশকারী কতক্ষণে চলে যাবে তার জন্য অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করে।

সারাক্ষণই তার মনে হয়, যার দিকে তার অন্তরের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে আছে যেকোন মুহূর্তেই তার ভিতরে সে প্রবেশ করতে পারবে।

ডিসেম্বরের শেষ দিকে একদিন শীর্ণ, বিবর্ণ শরীর কালো পশমী গাউনে

ঢেকে, চুলে কোনরকমে একটা গিঁট বেঁধে, সোফার উপর গুড়িসুড়ি মেরে বসে, ওড়নার একটা কোন পালিশ করতে করতে নাতাশা দরজাটার এক কোণের দিকে তাকিয়েছিল।

সে তাকিয়ে আছে সেই দিকে যেদিক দিয়ে প্রিন্স আন্দ্রু চলে গিয়েছে—জীবনের ওপারে। জীবনের সেই পরপারের কথা নাতাশা আগে কখনও ভাবে নি, সেটা তার কাছে মনে হত বহুদূরের এক দুর্গম স্থান, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে অনেক কাছের, অনেক ঘনিষ্ঠ এবং অনেক বেশী বোধগম্য; বরং এখন জীবনের এপারটাই শূন্যতা ও নির্জনতায় ভরা, যন্ত্রণা ও অমর্যাদায় আকীর্ণ।

প্রিন্স আন্দ্রু এখন যেখানে আছে বলে সে জানে সেইদিকেই সে তাকিয়ে আছে; কিন্তু এখানে সে যে রূপে ছিল তা থেকে কোন ভিন্নতর রূপে সে তাকে কল্পনাই করতে পারে না। এখনও সে তাকে সেইভাবেই দেখছে যেভাবে দেখেছিল মিতিশ্‌চিতে, ত্রয়স্তায়, এবং ইয়ারোস্লাভ্‌ল্‌-এ।

সে প্রিন্স আন্দ্রুর মুখ দেখতে পেল, তার কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, তার ও নিজের কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করল, আর মাঝে মাঝে এমন সব সংলাপ বানিয়ে বলল যা তারা বলতে পারত।

ওই তো শীর্ণ বিবর্ণ হাতের উপর মাথাটা রেখে ভেলভেটের জোব্বা পরে সে হাতল-চেয়ারটায় হেলান দিয়ে শুয়ে আছে। বুকটা ভয়ংকরভাবে বসে গেছে, কাঁধ দুটো ঠেলে উঠেছে। দুটি ঠোঁট দৃঢ়বদ্ধ, দুই চোখে আলোর ঝিলিক, বিবর্ণ কপালে কখনও ভাঁজ পড়ছে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। একটা পা দ্রুত গতিতে ঈষৎ কাঁপছে। নাতাশা জানে সে ভয়ংকর ব্যথার সঙ্গে লড়ছে। "সে ব্যথাটা কেমন ধারা? কেন এ ব্যথা তার হল? তার কেমন লাগছে? ব্যথাটা তাকে কিভাবে কষ্ট দিচ্ছে?" নাতাশা ভাবতে লাগল। সে যে তাকে দেখছে সেটা লক্ষ্য করে প্রিন্স আন্দ্রু চোখ তুলে বলতে লাগল:

"একটি যন্ত্রণাক্লিষ্ট মানুষের সঙ্গে চিরদিনের মত নিজেকে বেঁধে ফেলা—সে বড় ভয়ংকর। সে যে নিয়ত যন্ত্রণা।" সেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নাতাশার দিকে তাকাল। কি বলবে বুঝবার আগেই নাতাশা যথারীতি জবাব দিয়ে বসল: "এরকম চলতে পারে না—চলবে না। তোমাকে সেরে উঠতেই হবে—সম্পূর্ণ সেরে উঠতে হবে।"

সেই দৃশ্যের একেবারে গোড়া থেকেই সে তাকে দেখতে পেল; তখনকার পরিবেশটি যেন নতুন করে আবার ঘটল। কথাগুলির সঙ্গে প্রিন্স আন্দ্রুর চোখে যে দীর্ঘ, বিষণ্ণ, কঠিন দৃষ্টি ফুটে উঠেছিল তাও তার মনে পড়ে গেল; সে দৃষ্টির তিরস্কার ও হতাশার অর্থও সে বুঝতে পারল।

নাতাশা নিজেকেই বলতে লাগল, "স্বীকার করেছিলাম যে সে যদি কষ্ট পেয়েই চলতে থাকে তাহলে সেটা সত্যই ভয়ংকর ব্যাপার হবে। অবস্থাটা

তার পক্ষে ভয়ংকর হবে জেনেই কথাটা বলেছিলাম, কিন্তু সে তার ভিন্ন অর্থ করল। ভাবল, ব্যাপারটা আমার দিকে থেকে ভয়ংকর হবে। তখনও সে বাঁচতে চাইছে, মৃত্যুকে ভয় করছে। আর কি রকম বোকার মত অদ্ভুতভাবে তাকে আমি কথাগুলি বললাম! যা আমার মনের কথা তা আমি বলতে পারি নি। ভেবেছিলাম সম্পূর্ণ অন্য রকম। মনের কথা যদি বলতে পারতাম তাহলে আমার বলা উচিত ছিল: সে যদি মুমূর্ষু অবস্থায়ই চলতে থাকে, আমার চোখের সামনেই যদি একটু একটু করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়, তাহলেও এখন আমি যে অবস্থায় আছি তার তুলনায় অধিকতর সুখীই হতাম। এখন তো কিছু নেই···কেউ নেই। সে কি তা জানত? না, সে জানত না, কোন দিন জানবে না। আর সে ভুল শুধরে নেবার কোন—কোন সম্ভাবনাই এখন আর নেই।" এখন আবার মনে হচ্ছে সেই একই কথাগুলি প্রিন্স আন্দ্রু আবার তাকে বলছে, আর নাতাশা কল্পনায় সম্পূর্ণ আলাদা উত্তর তাকে দিচ্ছে। তাকে থামিয়ে দিয়ে নাতাশা বলল: "তোমার পক্ষে ভয়ংকর, কিন্তু আমার পক্ষে নয়। তুমি তো জান, তোমাকে ছাড়া আমার জীবনের কোন অর্থ নেই, আর তোমার সঙ্গে কষ্ট ভোগ করাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ।" তার হাতটা ধরে নাতাশা তাতে চাপ দিল, প্রিন্স আন্দ্রুর মৃত্যুর চার দিন আগেকার সেই ভয়ংকর সন্ধ্যায় ঠিক যেভাবে তার হাতটাকে সে চেপে ধরে-ছিল। কল্পনায় সে মমতা ও ভালবাসা মাখানো সেই কথাগুলি বলতে লাগল যা সে তখনও বলতে পারত, কিন্তু বলছে শুধু এখন: "আমি তোমাকে ভালবাসি।···তোমাকেই! আমি ভালবাসি, ভালবাসি···' গভীর আবেগে নিজের হাত চেপে ধরে আপ্রাণ চেষ্টায় দাঁতে দাঁত চেপে সে কথাগুলি বলল···

মধুর দুঃখ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল, দুই চোখ জলে ভরে এল: পর-ক্ষণেই সহসা নিজেকেই প্রশ্ন করল, কাকে সে বলছে এসব কথা? আবার সবকিছুই একটা শুষ্ক, কঠোর বিমূঢ়তায় ঢেকে গেল; ভ্রূকুটিকুটিল চোখে আবার সে ফিরে তাকাল বর্তমান জগতের দিকে। আর এখন, এখন তার মনে হল, রহস্যের যবনিকাকে সে ভেদ করতে পেরেছে।···কিন্তু যে মুহূর্তে তার মনে হল যে ধারণার অতীত সত্য তার কাছে প্রকাশিত হতে চলেছে ঠিক তখনই দরজার হাতলের একটা খটাখট আওয়াজ তার কানে এসে বিঁধল।

দাসী দুনিয়াশা দ্রুত পায়ে আচমকা ঘরে ঢুকল। তার মুখে ভয়ার্ত দৃষ্টি।

অদ্ভুত উত্তেজিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "দয়া করে এখনই আপনার বাবার কাছে চলুন। "বড়ই দুর্ভাগ্য···পিতর ইলিনিচ···একটা চিঠি," ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সে কথা শেষ করল।

অধ্যায়—২

সাধারণভাবে সকলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্নতাবোধ ছাড়াও নিজের পরিবার থেকে একটা বিশেষ বিচ্ছিন্নতার বোধ নাতাশাকে পেয়ে বসেছে। বাবা মা ও সোনিয়া—সকলেই তার এত ঘনিষ্ঠ, এত পরিচিত, এত সাধারণ যে তাদের সব কথা, সব মনোভাবই তার সাম্প্রতিক জীবনের প্রতি একটা বিদ্রূপস্বরূপ; তাদের সম্পর্কে সে যে উদাসীন তাই শুধু নয়, তাদের প্রতি সে একান্তই বিরূপ। তাই দুনিয়াশার মুখে পিতর ইলিনিচ ও দুর্ভাগ্য কথাদুটি শুনেও তার অর্থটা যেন ঠিক ধরতে পারল না।

"কিসের দুর্ভাগ্য? তাদের কি দুর্ভাগ্য ঘটতে পারে? তারা তো নিজেদের পুরনো, শান্ত, সাধারণ জীবনযাত্রাকেই চালিয়ে যাচ্ছে," নাতাশা ভাবল।

সে যখন নাচ-ঘরে ঢুকল তখন তার বাবা দ্রুত পায়ে তার মার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তার গালে ভাঁজ পড়েছে, চোখের জলে ভিজে গেছে। কান্নায় গলা আটকে আসছিল বলে বাবা সে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছে। নাতাশাকে দেখে হতাশভাবে হাত নাড়তে নাড়তে সে কান্নায় ভেঙে পড়ল। গোল নরম মুখখানা কান্নায় বিকৃত হয়ে উঠল।

"পে…পেত্য়া…যাও, যাও, ও…ডাকছে…" শিশুর মত কাঁদতে কাঁদতে বাবা দুর্বল পা ফেলে কোন রকমে চেয়ারের কাছে গিয়ে দুই হাতে মুখ ঢেকে ধপাস করে বসে পড়ল।

সহসা নাতাশার সারা শরীরের ভিতর দিয়ে যেন একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ বয়ে গেল। তীব্র ব্যথার আঘাতে আর্ত হৃদয়ে সে একটা ভয়ংকর বেদনা অনুভব করল; মনে হল, তার ভিতরটা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে, সে যেন মরতে বসেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই বেদনার পরিবর্তে দেখা দিল একটা মুক্তির অনুভূতি—যে বেদনাদায়ক সংযম তাকে জীবন থেকে সরিয়ে রেখেছিল তার হাত থেকে মুক্তি। 'বাবার এই দৃশ্য, দরজার ফাঁক দিয়ে ভেসে-আসা মার ভয়ংকর উন্মাদ চীৎকার—মুহূর্তের মধ্যে ভুলিয়ে দিল নিজেকে, তার সব দুঃখকে।

সে বাবার কাছে ছুটে গেল, কিন্তু বাবা দুর্বলভাবে হাত নেড়ে মার ঘরটা দেখিয়ে দিল। প্রিন্সেস মারি বেরিয়ে এল সে ঘর থেকে। তার মুখ বিবর্ণ, থুত্‌নি কাঁপছে; নাতাশার হাত ধরে কি যেন বলল। নাতাশা তাকে দেখতে পেল না, তার কথাও শুনতে পেল না। দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে মুহূর্তের জন্য দরজায় একটু থামল, বুঝি বা নিজের সঙ্গেই লড়াই করল, তারপর ছুটে গেল মার কাছে।

অদ্ভুত ভঙ্গীতে কাউণ্টেস হাতল-চেয়ারে শুয়ে আছে। শরীরটা টান-টান করে দেয়ালে মাথা ঠুকছে। সোনিয়া ও দাসী তার দুই হাত ধরে আছে।

কাউণ্টেস চীৎকার করছে, "নাতাশা! নাতাশা! এ সত্য নয়…এ সত্য নয়… ও মিথ্যা কথা বলছে…নাতাশা।" সকলকে ঠেলে দিয়ে সে আর্তনাদ করে উঠল, "তোমরা চলে যাও; একথা সত্য নয়! মারা গেছে!…হা, হা, হা!…এ কথা সত্য নয়।"

হাতল চেয়ারে এক হাঁটু রেখে নাতাশা মার উপর ঝুঁকে দাঁড়াল, অপ্রত্যাশিত শক্তিতে তাকে তুলে ধরে তার মুখটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিল, তারপর মাকে জড়িয়ে ধরল।

"মামণি!…লক্ষ্মী সোনা!…এই তো আমি এসেছি সোনামণি!"

নাতাশা ফিস্‌ফিস্ করে অবিশ্রাম কথা বলতে লাগল।

কিছুতেই মাকে ছাড়ল না, গভীর মমতায় তাকে জড়িয়ে ধরে রইল, একটা বালিশ ও গরম জল আনতে বলল, বোতাম খুলে মার পোশাকটা ছিঁড়ে খুলে ফেলল।

"লক্ষ্মী সোনা মা…মামণি, মানিক আমার!"…মার মাথায়, হাতে, মুখে বার বার চুমো খেয়ে সে বলতে লাগল, আর তার নিজের অবারণ চোখের জল নাক ও গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল।

কাউণ্টেস মেয়ের হাত চেপে ধরে চোখ বুজল, মুহূর্তের জন্য শান্ত হল। সহসা অনভ্যস্ত দ্রুতগতিতে উঠে বসল, ফাঁকা চাউনিতে চারদিকে তাকাল, আর নাতাশাকে দেখতে পেয়ে সর্বশক্তি দিয়ে তার মাথাটা চেপে ধরল, মেয়ের বেদনাদীর্ণ মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

অস্পষ্ট নিম্নস্বরে বলল, "নাতাশা, তুমি তো আমাকে ভালবাস? নাতাশা, তুমি তো আমাকে ঠকাবে না? সব সত্য আমাকে খুলে বলবে তো?"

জল-ভরা চোখ মেলে নাতাশা মার দিকে তাকাল; সে চোখে ভালবাসা ও ক্ষমার মিনতি ছাড়া আর কিছু নেই।

যে প্রচণ্ড দুঃখ তার মাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে তার কিছুটা ভার নিজের উপর নেবার আপ্রাণ চেষ্টায় নাতাশা বার বার বলতে লাগল, "লক্ষ্মী মামণি আমার!"

কিন্তু জীবনে ফুটে ওঠার কালে তার বড় আদরের ছেলেটি নিহত হয়েছে আর সে নিজে এখনও বেঁচে আছে—এ-কথা মা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না। তাই তো বাস্তব সত্যের সঙ্গে সংগ্রামে বিফল হয়ে আবার সে ফিরে গেল বিকারের জগতে।

সেদিনটা, সেরাতটা, এবং তার পরের দিন ও রাত যে কিভাবে কাটল তা নাতাশার মনে পড়ে না। সে একটুও ঘুমল না, মাকে ছেড়ে কোথাও গেল না। ধৈর্যশীল ভালবাসা দিয়ে প্রতিটি মুহূর্ত মাকে ঘিরে রাখল।

কোন কথা নয়, সান্ত্বনা নয়, শুধু তাকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনার অক্লান্ত প্রয়াস।

তৃতীয় রাতে কয়েক মিনিটের জন্য কাউন্টেস একেবারে চুপচাপ হয়ে গেল। চেয়ারের হাতলে মাথা রেখে নাতাশা চোখ বুজল, কিন্তু বিছানার ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দে আবার চোখ মেলল। বিছানায় উঠে বসে কাউন্টেস মৃদুস্বরে কথা বলছে।

"তুমি আসায় কত খুশি হয়েছি। তুমি ক্লান্ত: একটু চা খাবে না?" নাতাশা তার কাছে এগিয়ে গেল। মেয়ের হাতখানি ধরে কাউন্টেস বলেই চলল, "তুমি দেখতে কত ভাল হয়েছ, আরও মানুষের মত হয়ে উঠেছ।"

"মামণি! কী বলছ তুমি?"

"নাতাশা, সে নেই, সে নেই!"

মেয়েকে জড়িয়ে ধরে এই প্রথম কাউন্টেস কেঁদে উঠল।

অধ্যায়—৩

প্রিন্সেস মারি তার যাত্রা স্থগিত রাখল। সোনিয়া ও কাউণ্ট নাতাশার কাজগুলি করতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। তারা বুঝল, একমাত্র নাতাশাই তার মার অকারণ হতাশাকে সংযত রাখতে পারে। তিনটি সপ্তাহ নাতাশা মার পাশে সর্বক্ষণ রইল; তার ঘরেই একটা লাউঞ্জ-চেয়ারে ঘুমোয়, তাকে খাওয়ায়-দাওয়ায়, অনবরত তার সঙ্গে কথা বলে, কারণ একমাত্র তার মুখের মমতামাখা কথাগুলি কানে গেলেই তার মা শান্ত থাকে।

কিন্তু মার আহত মন সুস্থ হল না। পেত্‌য়ার মৃত্যু তার জীবনের অর্ধেকটা ছিঁড়ে নিয়ে গেছে। পেত্‌য়ার মৃত্যু-সংবাদ যখন এল তখন সে ছিল পঞ্চাশ বছরের একটি তাজা উৎসাহে ভরা নারী, আর একমাস পরে সে যখন ঘর থেকে বের হল তখন সে জীবনে সম্পূর্ণ বীতস্পৃহ একটি নিরাসক্ত বৃদ্ধা। কিন্তু যে আঘাত কাউন্টেসকে ঠেলে দিল প্রায় মৃত্যুর মুখে, সেই দ্বিতীয় আঘাত নাতাশাকে ফিরিয়ে আনল নবজীবনের মধ্যে।

নাতাশা ভেবেছিল তার জীবন শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু মার প্রতি ভালবাসা তাকে অপ্রত্যাশিতভাবে বুঝিয়ে দিল, যে ভালবাসা জীবনের মূল কথা তা এখনও তার মধ্যে সক্রিয়। ভালবাসা জেগে উঠেছে, আর সেই সঙ্গে জীবনও জেগেছে।

প্রিন্স আন্দ্রুর শেষ দিনগুলি প্রিন্সেস মারি ও নাতাশার জীবনকে এক-সূত্রে বেঁধে দিয়েছে; এই নতুন দুঃখ তাদের দুজনকে আরও ঘনিষ্ঠ করে তুলল। প্রিন্সেস মারি তার যাত্রা স্থগিত রাখল; তিনটি সপ্তাহ ধরে রুগ্ন শিশুর মত নাতাশার পরিচর্যা করল। মার শয়ন-কক্ষে কাটানো শেষের

সপ্তাহ ক'টি নাতাশার দৈহিক শক্তিকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল।

একদিন বিকেলে নাতাশাকে জ্বরে কাঁপতে দেখে প্রিন্সেস মারি তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল। নাতাশা শুয়ে পড়ল, কিন্তু পর্দাগুলো নামিয়ে দিয়ে প্রিন্সেস মারি যখন চলে যাচ্ছিল তখন সে তাকে ডাকল।

"আমার ঘুমতে ইচ্ছা করছে না মারি, আমার কাছে একটু বস।"

"তুমি ক্লান্ত—ঘুমতে চেষ্টা কর।"

"না, না। কেন আমাকে এখানে নিয়ে এলে? মা আমার খোঁজ করবে।"

"মা এখন ভাল আছে। আজ সে বেশ ভালভাবে কথা বলেছে।" প্রিন্সেস মারি বলল।

নাতাশা বিছানায় শুয়ে ঘরের আধা-অন্ধকারে প্রিন্সেস মারির মুখটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

সে ভাবতে লাগল, "প্রিন্সেস মারি কি তার মত দেখতে? হ্যাঁ, তার মতই, তবু তার মত নয়। কিন্তু এও তো আমার কাছে নতুন, বিচিত্র, অজ্ঞাত। এও আমাকে ভালবাসে। কি আছে এর অন্তরে? যা কিছু ভাল সব। কিন্তু কেমন করে? এর মনটি কার মত? আমার সম্পর্কে এর ধারণা? সত্যি, প্রিন্সেস মারি চমৎকার মানুষ!"

প্রিন্সেস মারির হাতটা টেনে নিয়ে নাতাশা ভীরু গলায় বলল, "মারি, তুমি আমাকে খারাপ ভেবো না। ভাববে না তো? প্রিয় মারি, তোমাকে আমি কত ভালবাসি! এস আমরা বন্ধু হই, খুব বন্ধু।"

তাকে জড়িয়ে ধরে নাতাশা তার মুখে ও হাতে চুমো খেল; তাতে প্রিন্সেস মারি লজ্জা পেল, আবার সুখীও হল।

সেদিন থেকেই প্রিন্সেস মারি ও নাতাশার মধ্যে দুই সখীর মত একটা ভীরু উচ্ছ্বসিত বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। তারা সব সময় পরস্পরকে চুমো খায়, ভাল ভাল কথা বলে, অধিকাংশ সময় এক সঙ্গে কাটায়। যখন তারা একা থাকে তার তুলনায় তারা পরস্পরের মধ্যে গভীরতর মিল অনুভব করে যখন তারা একত্রে কাটায়। তাদের মধ্যে গড়ে উঠল বন্ধুত্বের চাইতেও অধিকতর শক্তিশালী একটা অনুভূতি; একে অন্যের উপস্থিতিতে পায় যেন জীবনের এক নতুন অনুভূতি।

কখনও তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ করে থাকে; কখনও বিছানায় শুয়ে কথা বলতে বলতে রাত ভোর করে দেয়। বেশীর ভাগ সময় বলে দূর অতীতের কথা। প্রিন্সেস মারি বলে তার শৈশবের কথা, মার কথা, বাবার কথা, তার দিবাস্বপ্নের কথা। আর নাতাশাও প্রিন্সেস মারির প্রতি ভাল-বাসায় তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজের অতীতকেও ভালবাসতে শিখেছে, জীবনের

যেদিকটা তার কাছে দুরধিগম্য ছিল তাকেও বুঝতে শিখেছে। ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে দুজনেই জীবনকে দেখতে শিখেছে নতুন দৃষ্টিতে, নতুন বিশ্বাসে—জীবনের প্রতি, তার আনন্দের প্রতি বিশ্বাসে।

আগের মতই কখনও তারা প্রিন্স আন্‌দ্রুর কথা বলে না; কথা বলে নিজেদের মনের মহৎ ভাবনাকে তারা ছোট করতে চায় না; কিন্তু তার সম্পর্কে তাদের এই নীরবতার ফলে ক্রমেই তারা নিজেদের অজ্ঞাতেই তাকে ভুলে যেতে লাগল।

নাতাশা এতই শীর্ণ, বিবর্ণ ও দুর্বল হয়ে পড়েছে যে সকলেই তার স্বাস্থ্যের কথা বলে, আর তাতে সেও খুশি হয়। কিন্তু মাঝে মাঝে হঠাৎ একটা ভয় তাকে চেপে ধরে—শুধু মৃত্যুর ভয় নয়, রোগ, দুর্বলতা ও খারাপ দেখাবার ভয়; অনিচ্ছা সত্ত্বেও খোলা হাতটাকে সে ভাল করে লক্ষ্য করে, তার শীর্ণতায় বিস্মিত হয়, আর সকালে উঠেই নিজের করুণ মুখখানি আয়নায় দেখে। সে বুঝতে পারে এইরকম হওয়াই স্বাভাবিক, তবু তার মনটা ভয়ানক খারাপ হয়ে যায়।

একদিন তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে তার হাঁপ ধরে গেল। কিছু না বুঝেই তক্ষুনি নীচে নেমে গেল এবং নিজের শক্তি পরীক্ষা করার জন্য আবার দৌড়ে উপরে উঠে গেল।

অন্য এক সময় দুনিয়াশাকে ডাকতে গিয়ে গলাটা কেঁপে ওঠায় আবার তাকে ডাকল—আর ডাকল সেই বুকের ভিতর থেকে আসা গলায় যে গলায় সে গান করত; তারপর কান পেতে নিজেই নিজের গলা শুনতে লাগল।

সে জানত না, একথা বিশ্বাসও করত না, কিন্তু যে চটচটে কাদায় ঢাকা পড়ার জন্য তার আত্মা দুর্ভেদ্য হয়ে উঠেছিল তার কাছে, সেই কাদার স্তরের নীচ থেকে নরম ঘাসের অংকুরগুলি এর মধ্যেই মাথা তুলতে শুরু করেছে; মাটিতে শিকড় গজিয়ে তাদের জীবন্ত সবুজের আভায় সেই অংকুরগুলি তার সব দুঃখকে এমনভাবে ঢেকে দেবে যে অচিরেই তাকে আর দেখা যাবে না। তার মনের ক্ষত ভিতর থেকে সেরে উঠতে শুরু করেছে।

জানুয়ারির শেষ দিকে প্রিন্সেস মারি মস্কো যাত্রা করল; নাতাশা যাতে তার সঙ্গে গিয়ে ডাক্তার দেখায় সেজন্য কাউন্ট পীড়াপীড়ি করতে লাগল।

অধ্যায়—৪

ভিয়াজ্‌মাতে শত্রুপক্ষকে পরাভূত করে তচ্‌নচ্‌ করে দিতে অতি-উৎসাহী সৈন্যদলকে কুতুজভ সংযত করে রাখতে পারে নি। সেই সংঘর্ষের পর থেকে পলায়মান ফরাসীদের এবং তাদের পশ্চাদ্ধাবনকারী রুশদের অগ্রগতি ক্রাস্নয় পর্যন্ত বিনা যুদ্ধেই চলতে থাকল। পলায়ন ছিল এতই দ্রুতগতি যে পশ্চা-

দ্ধাবনকারী রুশবাহিনী ফরাসীদের সঙ্গে তাল রাখতে পারে নি। অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ বাহিনীর ঘোড়াগুলি ক্লান্ত হয়ে পড়ল, আর ফরাসীদের গতি-বিধির যেসব খবর পাওয়া গেল তাও কোন ক্ষেত্রেই নির্ভরযোগ্য নয়।

দৈনিক সাতাশ মাইল হারে একটানা পথ চলার ফলে রুশ বাহিনীর সৈন্যরা এতই শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে পড়ল যে আরও দ্রুত চলা তাদের পক্ষে সম্ভব হল না।

রুশ বাহিনী যে কতখানি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল সেটা বুঝতে হলে শুধু এই সত্যটাই জানা প্রয়োজন যে তারুতিনোর পরে পাঁচ হাজারের মত নিহত ও আহত করে এবং শতাধিক বন্দীকে হারিয়ে যে রুশ বাহিনী এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে তারুতিনো ছেড়ে এসেছিল তারা ক্রাস্‌নুতে পৌঁছল মাত্র পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে।

ফরাসীদের পলায়ন যেমন তাদের বাহিনীর ধ্বংস সাধন করেছিল, ঠিক তেমনই রুশদের পশ্চাদ্ধাবনের দ্রুতগতিও হয়েছিল আমাদের বাহিনীর পক্ষে ধ্বংসাত্মক। দুইয়ের মধ্যে একমাত্র তফাৎ হল—রুশ বাহিনীর গতি ছিল স্বেচ্ছাপ্রণোদিত, ফরাসীদের মত তাদের মাথার উপর ধ্বংসের খড়্গ ঝুলছিল না; আর যেখানে রুগ্ন ফরাসীদের ফেলে যেতে হল শত্রুর হাতে, রুগ্ন রুশদের ফেলে যাওয়া হল তাদের নিজেদেরই লোকের হাতে। নেপোলিয়নের বাহিনীর ক্ষয়-ক্ষতির প্রধান কারণ তাদের চলার দ্রুতগতি, আর রুশ বাহিনীর তুলনামূলক সৈন্য-সংখ্যার হ্রাসই তার চূড়ান্ত প্রমাণ।

পিতার্সবুর্গের কর্তৃপক্ষ এবং রুশ বাহিনীর জেনারেলরা সকলেই তখন চাইছিল ফরাসীদের পলায়ন। কুতুজভ ও ফরাসীদের পলায়নের পথে বিঘ্ন-সৃষ্টির চেষ্টা না করে তারুতিনো ও ভিয়াজ্‌মার মতই এখানেও সেই একই লক্ষ্যে সাধ্যমত সর্বশক্তি নিয়োগ করল এবং আমাদের বাহিনীর গতিকে যথাসম্ভব শ্লথ করে রাখল।

প্রতিটি রুশ সৈন্যের মত কুতুজভও মনে-প্রাণে বুঝল ও জানল—যুক্তি বা রণ-বিজ্ঞানের সাহায্যে নয়, সমগ্র রুশ সত্তা দিয়ে—যে ফরাসীরা পরাজিত হয়েছে, শত্রুরা পালাচ্ছে, তাদের তাড়িয়ে দিতেই হবে; কিন্তু সেইসঙ্গে বৎসরের এই সময়টাতে এরকম তুলনাবিহীন দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে চলার যে কত কষ্ট, কত দুঃখ সৈন্যদের মতই সেটাও কুতুজভ ভালই বুঝতে পারল।

কিন্তু যেসব জেনারেল—বিশেষ করে রুশ বাহিনীর বিদেশী জেনারেলরা—চাইল নিজেদের জন্য খ্যাতি অর্জন করতে, কাউকে তাক লাগিয়ে দিতে, এবং কোন না কোন কারণে রাজা ও ডিউককে গ্রেপ্তার করতে, তারা ভাবল যে যুদ্ধ করে বিজয়ী হবার এই তো সময়। তাই তারা যখন ছেঁড়া জুতো ও ছেঁড়া পোশাক পরা অর্ধভুক্ত সৈন্য নিয়েই একের পর এক যুদ্ধের প্রকল্প উপস্থিত করতে লাগল, কুতুজভ তখন শুধু বারবার দুই কাঁধে ঝাঁকুনি দিতে

লাগল।

রুশ বাহিনী যেখানেই ফরাসী বাহিনীর একেবারে ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়ল, এইভাবে নিজেদের বিশিষ্ট করে তুলবার, রণ-কৌশল প্রয়োগ করবার, শত্রুকে পরাজিত ও তচ্‌নচ্‌ করে দেবার বাসনা সেখানেই বিশেষ করে প্রকট হতে লাগল।

সেটাই ঘটল ক্রাস্‌নুতে; তারা আশা করেছিল তিনটি ফরাসী সেনাদলের একটির সঙ্গে সেখানেই তাদের মোলাকাত হবে; কিন্তু তার বদলে সেখানে তারা হাজির হল ষোল হাজার সৈন্যসহ স্বয়ং নেপোলিয়নের মুখোমুখি। সেখানে একটি বিধ্বংসী সংঘর্ষকে পরিহার করে নিজের সৈন্যদের অক্ষত রাখতে কুতুজভের সর্বপ্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও পথশ্রমে ক্লান্ত রুশদের হাতে বিশৃংখল ফরাসী সৈন্যদের নিধন-যজ্ঞ তিনদিন ধরে চলল ক্রাস্‌নুর পথে-প্রান্তরে।

তোল্‌ একটা নির্দেশ-নামা লিখেছিল: "প্রথম সেনাদল অমুক অমুক দিকে এগিয়ে যাবে" ইত্যাদি। কিন্তু যথারীতি সে নির্দেশনামা মোতাবেক কিছুই ঘটল না। উর্তেম্‌বের্গের প্রিন্স ইউজেন একটা পাহাড়ের উপর থেকে পলায়মান ফরাসীদের উপর গোলাবর্ষণ করতে লাগল। আরও সৈন্য সে চেয়ে পাঠাল, কিন্তু কেউ এল না। ফরাসীরা রুশদের দৃষ্টি এড়িয়ে পালাতে লাগল; রাতের আঁধারে জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে যথাসাধ্য ছুটতে লাগল।

মিলরাদভিচ তো নিজেই নিজেকে বলত "ভয় ও নিন্দার অতীত এক নাইট।" ফরাসীদের সঙ্গে আলোচনা চালানো ছিল তার প্রিয় কাজ। ফরাসীদের কাছে দূত পাঠিয়ে সে তাদের আত্মসমর্পণ দাবী করল, অনেক সময় নষ্ট করল, কিন্তু তাকে যা করতে বলা হয়েছিল তার কিছুই করল না।

ঘোড়ায় চেপে অশ্বারোহী বাহিনীর সামনে হাজির হয়ে ফরাসীদের দেখিয়ে সে বলল, "দেখ বাছারা, ওই সেনাদলটা তোমাদের দিয়ে দিলাম।"

অশ্বারোহী সৈন্যরা তখন ঘোড়ার পেটে কাঁটা মেরে তরবারি উঁচিয়ে অনেক কষ্টে সেই সেনাদলের সামনে, অর্থাৎ ঠাণ্ডায় জমে-যাওয়া তুষারপাতে আহত ও অভুক্ত একদল ফরাসীর সামনে গিয়ে হাজির হল; তারাও সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করল; তারা তো অনেক আগে থেকে এই-জন্যে অপেক্ষা করেইছিল।

ক্রাস্‌নুতে তারা ছাব্বিশ হাজার ফরাসীকে বন্দী করল, কয়েক শ' কামান দখল করল, আর পেল "মার্শালের দণ্ড" নামক একটা লাঠি; কার কতখানি কৃতিত্ব তাই নিয়ে তর্ক করল, এবং নিজেদের সাফল্যে খুশিও হল; যদিও নেপোলিয়নকে, নিদেন পক্ষে কোন মার্শাল বা নায়ককে পাকড়াও করতে না পারায় তারা দুঃখিত হল এবং সে অক্ষমতার জন্য পরস্পরকে, বিশেষ করে কুতুজভকে দায়ী করতে লাগল!

আবেগের তাড়নায় পরিচালিত এই লোকগুলি আসলে অনিবার্য নিয়মের হাতে অন্ধ যন্ত্রমাত্র হলেও তারা নিজেদের ভাবল এক একজন মহাবীর ; মনে করল যে একটি মহান, সম্মানিত কাজ তারাই সম্পন্ন করেছে। সব দোষ তারা চাপাল কুতুজভের ঘাড়ে; বলল, অভিযানের গোড়া থেকেই সে নেপোলিয়নকে পরাজিত করার পথে বাধার সৃষ্টি করেছে, নিজের বাসনা পূরণ করা ছাড়া আর কিছুই সে ভাবে নি, কাপড়ের কলগুলিতে বেশ আরামে ছিল বলে সেখান থেকে এক পাও নড়তে চায় নি, ক্রাস্‌নুতে সে রুশ বাহিনীর অগ্রগতিকে ঠেকিয়ে দিল কারণ সেখানে নেপোলিয়ন আছে শুনেই তার মুণ্ডু ঘুরে গিয়েছিল, এবং এটাও হতে পারে যে নেপোলিয়নের সঙ্গে তার একটা বোঝা-পড়া হয়ে গিয়েছিল, তাকে বেশ কিছু ঘুষ দেওয়া হয়েছিল, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

শুধু যে সমসাময়িকরা আবেগের বশে এইসব কথা বলেছে তাই নয়, পরবর্তী যুগ এবং ইতিহাসও নেপোলিয়নকে মহান পুরুষ বলে প্রশংসা করেছে, আর কুতুজভকে বিদেশীরা বর্ণনা করেছে একজন ফন্দিবাজ, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, দুর্বল বৃদ্ধ সভাসদরূপে ; আর তার সম্পর্কে রুশদের বর্ণনা কিছুটা অস্পষ্ট— সে যেন এক ধরনের পুতুল, শুধু একটা রুশ নামের অধিকারী বলেই কিছুটা কাজের লোক।

অধ্যায়—৫

১৮১২ ও ১৮১৩ সালে কুতুজভের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ভুল কাজের অভিযোগ আনা হল। সম্রাট তার উপর অসন্তুষ্ট হল। এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সম্প্রতি লিখিত একখানি ইতিহাসের পুঁথিতে বলা হয়েছে, কুতুজভ ছিল একজন ধূর্ত, মিথ্যাবাদী সভাসদ, নেপোলিয়নের নাম শুনেই ভয়ে জড়সড়, ক্রাস্‌নুতে ও বেরিজিনাতে তার ভুলের জন্যই রুশ বাহিনী ফরাসীদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত জয়লাভের গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়েছিল ; •

রুশ মানসিকতা যেসব মহাপুরুষদের (Grands Hommes) স্বীকার করে না তাদের নয়, কিন্তু যেসব বিরল ও একক ব্যক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছাকে উপলব্ধি করে তার কাছেই নিজের ইচ্ছাকে সঁপে দেয়, এই তাদের নিয়তি। উচ্চতর বিধানকে মেনে নেবার জন্য জনতার ঘৃণা ও বিদ্বেষ এইভাবেই তাদের দণ্ডিত করে।

বিচিত্র ও ভয়ংকর শোনালেও যে-নেপোলিয়ন ইতিহাসের হাতের একটি অতি নগণ্য যন্ত্রমাত্র, যে কখনও কোথাও, এমন কি নির্বাসন-কালেও, কোন-রকম মানবিক মর্যাদার স্বাক্ষর রাখতে পারে নি, সেই নেপোলিয়নই রুশ ইতিহাসকারদের কাছে স্তুতিবচন ও উৎসাহের বস্তু, সেই এক মহাপুরুষ।

কিন্তু কুতুজভ—সে মানুষটি একেবারে শুরু থেকে ১৮১২ সালে তার কাজের শেষ পর্যন্ত, বরদিনো থেকে ভিল্‌না পর্যন্ত, একটিবারও কি কথায় আর কি কাজে কখনও দোলাচলচিত্ত হয় নি, আত্মত্যাগ ও ভবিষ্যৎ-সচেতনতার এমন একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে যা ইতিহাসের ব্যতিক্রমস্বরূপ,—সেই কুতুজভ তাদের কাছে একটি অস্পষ্ট করুণার পাত্রবিশেষ ; তার সম্পর্কে এবং ১৮১২ সাল সম্পর্কে কিছু বলতে গেলেই তারা কেমন যেন লজ্জা বোধ করে।

অথচ একটিমাত্র লক্ষ্যে স্থিরদৃষ্টি হয়ে কর্মের পথে এগিয়ে চলার এমন আর একটি ঐতিহাসিক চরিত্রের কল্পনা করাও তো শক্ত ; আর সমগ্র জাতির ইচ্ছার অধিকতর উপযুক্ত বা তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আর একটি লক্ষ্যের কথা কল্পনা করাও তো সমান শক্ত। আবার, ১৮১২ সালে কুতুজভের সমগ্র কর্ম-প্রচেষ্টা যে লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়েছিল, অন্য কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তির দ্বারা সেরূপ পরিপূর্ণভাবে লক্ষ্য পূর্ণ করবার আর একটি দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পাতা থেকে খুঁজে বের করা তো ততোধিক শক্ত।

কুতুজভ কখনও ""পিরামিডের উপর থেকে নীচে তাকিয়ে চল্লিশ শতাব্দীর" কথা বলে নি, বলে নি পিতৃভূমির জন্য তার ত্যাগের কথা, সে কি করতে চেয়েছিল বা করতে পেরেছিল তার কথা : সাধারণভাবে বলা যায়, সে কখনও নিজের কথা বলে নি, কোন মুখোশ আঁটে নি মুখে, অতি সাধারণ মানুষের মত অত্যন্ত সরলভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছে, মুখেও বলেছে সরলতম সাধারণ কথা। চিঠি লিখেছে মেয়েদের কাছে আর মাদাম দ্য স্তাইলের কাছে, উপন্যাস পড়েছে, সুন্দরীদের সঙ্গ ভালবেসেছে, জেনারেল, অফিসার ও সৈনিকদের সঙ্গে হাসি-তামাসা করেছে, এবং কেউ কিছু প্রমাণ করতে চাইলে কখনও তার প্রতিবাদ করে নি। ইয়াউজা সেতুর কাছে কাউন্ট রস্তপ্‌চিন যখন ঘোড়া ছুটিয়ে কুতুজভের কাছে এসে ব্যক্তিগতভাবে তাকে তিরস্কার করে বলেছিল : "আপনি যেকথা দিয়েছিলেন বিনা যুদ্ধে মস্কো ছেড়ে যাবেন না তার কি হল ?" কুতুজভ তখন উত্তরে বলেছিল : "বিনা যুদ্ধে আমি মস্কো ছেড়ে যাব না," যদিও তখন মস্কো পরিত্যক্ত হয়েই গেছে। সম্রাটের কাছ থেকে এসে আরাক্‌চিভ যখন বলল যে এর্মলভকে গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধানের পদে নিযুক্ত করা উচিত তখন কুতুজভ জবাব দিল : "ঠিক, এই কথাই আমি নিজেও ভাবছিলাম,'' যদিও একমুহূর্ত আগে এর উল্টো কথাই সে বলেছিল। একদল নির্বোধ জনতার মধ্যে যখন একমাত্র সেই বুঝেছে আসন্ন ঘটনাবলীর প্রচণ্ড তাৎপর্য, তখন মস্কোর সে মহাবিপদের জন্য রস্তপ্‌চিন তাকেই দায়ী করুক আর নিজেকেই দায়ী করুক তাতে কি আসে—যায় ? আর গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান হিসাবে কে নিযুক্ত হল না হল, তাতেও তো বিশেষ কিছুই আসে-যায় না।

নিজে কখন কি বলছে না বলছে সে খেয়াল না থাকলেও এই মানুষটি

কিন্তু পুরো কর্মকাণ্ডের মধ্যে একবারও এমন একটি কথা উচ্চারণ করে নি যা সমগ্র যুদ্ধকালে তার একমাত্র লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিহীন। স্পষ্টই বোঝা যায়, সংকটময় পরিস্থিতিতে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও সে বার বার নিজের মনের কথাকেও প্রকাশ করেছে; যদিও সে জানত যে তাকে কেউ ঠিক ঠিক বুঝবে না। যে বরোদিনের যুদ্ধে অন্য সকলের সঙ্গে তার মত-পার্থক্যের সূচনা সেখান থেকে আরম্ভ করে একমাত্র সেই বলেছে যে বরদিনোর যুদ্ধে তাদের জয় হয়েছে, আর মুখের কথায়, চিঠিপত্রে, ও প্রতিবেদনে মৃত্যুকাল পর্যন্ত সেই একই কথা সে বারবার বলেছে। একমাত্র সেই বলেছে, মস্কোকে হারানো মানেই রাশিয়াকে হারানো নয়। লরিস্তনের শান্তি-প্রস্তাবের উত্তরে সে বলেছে; কোন রকম সন্ধি হতে পারে না, কারণ সেটাই জনগণের ইচ্ছা। ফরাসীদের পশ্চাদপসরণের সময় একমাত্র সেই বলেছে, আমাদের সব রণ-কৌশল বৃথা, আমাদের আশাতিরিক্ত ভালভাবেই আপনা থেকেই সব কিছু ঘটে চলেছে; শত্রুকে একটা "সোনালী সেতু" অবশ্যই দিতে হবে; তারুতিনো, বা ভিয়াজ্‌মা, বা ক্রাস্‌নুর যুদ্ধের কোন প্রয়োজন নেই; সীমান্তে পৌঁছবার জন্য কিছু সৈন্য আমাদের সঙ্গে রাখতেই হবে; এবং দশজন ফরাসীর বিনিময়েও একজন রুশকে বলি দিতে সে রাজী নয়।

আর এই সভাসদটি—এইভাবেই তাকে বর্ণনা করা হয়েছে—সম্রাটকে খুশি করার জন্য আরাকৃচিভের কাছে মিথ্যা বললেও সেই সম্রাটের বিরূপতাকে মেনে নিয়ে ভিল্‌নায় বলেছে, সীমান্তের ওপারে যুদ্ধকে চালিয়ে নেওয়া অর্থহীন ও ক্ষতিকর।

একমাত্র সেই যে ঘটনাবলীর তাৎপর্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছিল তার প্রমাণ শুধু তার মুখের কথাই নয়। তিলমাত্র ব্যতিক্রমবিহীনভাবে তার সব কাজই পরিচালিত হয়েছিল একটিমাত্র ত্রিবিধ লক্ষ্যের দিকে (১) ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করা। (২) তাদের পরাজিত করা, এবং (৩) আমাদের জনগণ ও আমাদের সৈন্যদের দুঃখ-কষ্টকে যথাসম্ভব কম রেখে শত্রুকে রাশিয়া থেকে বিতারিত করা।

এই সময়াপহরক কুতুজভ যার নীতি ছিল "ধৈর্য ও সময়," চূড়ান্ত যুদ্ধের এই শত্রুই কিন্তু অতুলনীয় গাম্ভীর্যের সঙ্গে সব রকম প্রস্তুতি নিয়ে বরদিনোতে যুদ্ধ করেছিল। এই কুতুজভ অস্তারলিজের যুদ্ধ শুরু হবার আগেই বলেছিল যে সে যুদ্ধে আমাদের হার হবে; অন্য সকলের মতের বিরুদ্ধে সেই বৃদ্ধ পর্যন্ত বলেছে যে বরদিনোতে আমাদের জয় হয়েছে, অথচ যুদ্ধে জয়লাভ করে কোন সেনাবাহিনী পশ্চাদপসরণ করেছে এ রকম ঘটনা আগে কখনও ঘটে নি। পশ্চাদপসরণের সময় একমাত্র সেই বারবার বলেছে যে তখন আর অকারণে কোন যুদ্ধ করা উচিত নয়; নতুন করে আর একটা যুদ্ধ শুরু করা অথবা রুশ সীমান্ত অতিক্রম করাও উচিত নয়।

কিন্তু সকলের অভিমতের বিরোধিতা করে সেই বৃদ্ধ মানুষটি একাকি কেমন করে তৎকালীন ঘটনাবলী সম্পর্কে জনমতের গুরুত্বটা এমনভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিল যাতে সারা কর্মকাণ্ডের মধ্যে একটিবারের জন্যও তাকে তা থেকে সরে যেতে হয় নি ?

তৎকালীন ঘটনাবলীর তাৎপর্যকে প্রত্যক্ষ করবার এই অসাধারণ ক্ষমতার উৎস ছিল তার অন্তরের নিষ্কলুষ জাতীয়তাবোধ।

তার এই জাতীয়তাবোধের স্বীকৃতি হিসাবেই জনসাধারণ স্বয়ং জারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে—রাজানুগ্রহবঞ্চিত একটি বৃদ্ধকেই—এই জাতীয় যুদ্ধে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছিল। আর এই জাতীয়তাবোধই তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল মানবিকতার সেই সর্বোচ্চ মঞ্চে যেখান থেকে প্রধান সেনাপতিরূপে সে তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল মানুষকে হত্যা ও ধ্বংস করতে নয়,—তাদের রক্ষা করতে, তাদের করুণা করতে।

ইওরোপীয় নায়কের—মানুষের তথাকথিত শাসনকর্তার যে নকল ছাঁচ ইতিহাস আবিষ্কার করেছে, তার মধ্যে ফেলে এই সরল, বিনয়ী ও প্রকৃত মহৎ মূর্তিটিকে ঢালাই করা যায় নি।

অনাগত ভৃত্যের দৃষ্টিতে কোন মানুষই মহৎ হতে পারে না, কারণ মহত্ত্ব সম্পর্কে তারও একটা নিজস্ব ধারণা থাকে।

অধ্যায়—৬

তথাকথিত ক্রাস্নয় যুদ্ধের প্রথম দিনটি ছিল ৫ই নভেম্বর। সন্ধ্যার দিকে—জেনারেলদের মধ্যে অনেক বিতর্ক ও ভুলভ্রান্তির পরে, এবং পরস্পরবিরোধী হুকুম দিয়ে অ্যাড্‌জুটাণ্টদের দিকে দিকে পাঠিয়ে দেবার পরে—যখন একটা কথা পরিষ্কার বোঝা গেল যে শত্রুপক্ষ সর্বত্র পালাতে শুরু করেছে এবং আর কোন যুদ্ধ হবে না, তখন কুতুজভ ক্রাস্নয় ছেড়ে দোব্রুতে চলে গেল ; তার প্রধান ঘাঁটি সেইদিনই সেখানে স্থানান্তরিত হয়েছে।

পরিষ্কার দিন। তুষার ঝরছে। ছোট, মোটা সাদা ঘোড়ার পিঠে চেপে কুতুজভ দোব্রু চলেছে ; পিছনে চলেছে অসন্তুষ্ট জেনারেলদের একটা বড় দল ; তারা ফিস্‌ফিস্‌ করে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। পথের দুধারে আগাগোড়া সেদিনকার ফরাসী বন্দীরা (সংখ্যায় তারা সাত হাজার) দলে দলে শিবির-আগুনের পাশে ভিড় করে শরীর গরম করছে। দোব্রুর কাছাকাছি এক জায়গায় ছিন্নবাস পরিহিত বন্দীদের একটা মস্ত বড় দল কল-গুঞ্জনে ব্যস্ত ; হাতের কাছে যা পেয়েছে তাই দিয়ে শরীরটা ঢেকেছে, ক্ষত-স্থানে ব্যাণ্ডেজ বেঁধেছে ; রাস্তার উপর এক সারি ফরাসী কামানের পাশে

তারা দাঁড়িয়ে আছে। প্রধান সেনাপতিকে দেখে তাদের কলগুঞ্জন থেমে গেল; সকলেরই চোখ পড়ল কুতুজভের উপর; তার মাথায় লাল পটি দেওয়া সাদা টুপি, আর একটা প্যাড-লাগানো ওভার কোট। সাদা ঘোড়ায় চেপে সে ধীরে ধীরে তাদের পার হয়ে গেল; কামানগুলো কোথায় দখল করা হয়েছে আর সৈনিকদের কোথায় বন্দী করা হয়েছে সেকথা বুঝিয়ে বলতে লাগল একজন জেনারেল।

কুতুজভ কি যেন ভাবছে; জেনারেলের কথাগুলি তার কানে গেল না। অসন্তোষভরা চোখ দুটি কুঁচকে সে একদৃষ্টিতে হতভাগা বন্দীদের দিকেই তাকিয়ে চলেছে। তুষারপাতের ফলে নাক ও গাল বিকৃত হয়ে যাওয়ায় তাদের প্রায় সকলকেই কিম্ভূত দেখাচ্ছে; প্রায় সকলেরই চোখ লাল, ফোলা-ফোলা, পুঁজ জমেছে।

একদল ফরাসী রাস্তার খুব কাছে দাঁড়িয়েছিল। তাদের মধ্যে দুজন এক-টুকরো কাঁচা মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে; একজনের মুখে ঘা দগ্‌দগ্‌ করছে। তাদের দ্রুত সঞ্চালিতে দৃষ্টির মধ্যে কেমন একটা ভয়ংকর পশুর মত ভাব ফুটে উঠেছে।

কুতুজভ অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে এই সৈন্য দুটির দিকে তাকিয়ে রইল। তার মুখে ভাঁজ পড়ল, চোখ কুঁচকে গেল, চিন্তিতভাবে মাথাটা দোলাতে লাগল। আর এক জায়গায় দেখল, একটি কৃশ সৈনিক একজন ফরাসীর কাঁধে হাত রেখে বন্ধুর মত কি যেন বলছে। সেই একইরকম মুখের ভাব করে কুতুজভ আর একবার মাথাটা দোলাতে লাগল।

ফরাসীদের কাছ থেকে দখল-করা কতকগুলি পতাকার দিকে প্রধান সেনাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রিয়োব্রাঝেন্‌স্ক্‌ রেজিমেণ্টের সামনে দাঁড়িয়ে একজন জেনারেল সমানে কথা বলে যাচ্ছিল; তার দিকে ফিরে কুতুজভ শুধাল, "আপনি কি বলছিলেন?...ওঃ, ঐ পতাকাগুলির কথা!"

অন্যমনস্কভাবে কুতুজভ চারদিকে তাকাল। চারদিক থেকে হাজার হাজার চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে, আর মুখের একটা কথার জন্য অপেক্ষা করে আছে।

প্রিয়োব্রাঝেন্‌স্ক্‌ রেজিমেণ্টের সামনে দাঁড়িয়ে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে চোখ বুজল। পারিষদবর্গের একজন ইঙ্গিতে সৈন্যদের বলল, পতাকাগুলো হাতে দিয়ে তারা প্রধান সেনাপতিকে ঘিরে দাঁড়াক। কুতুজভ কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে রইল; তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বেও কর্তব্যের খাতিরে মাথাটা তুলে কথা বলতে শুরু করল। একদল অফিসার তাকে ঘিরে দাঁড়াল। বেশ মনোযোগ দিয়ে অফিসারদের সেই বৃত্তের দিকে সে তাকাল; তাদের কয়েকজনকে চিনতে পারল।

প্রথমে সৈনিকদের এবং পরে অফিসারদের সম্বোধন করে বলল,

"তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ। কঠোর ও বিশ্বস্ত কাজের জন্য তোমাদের সকলকেই ধন্যবাদ জানাই। জয় সম্পূর্ণ হয়েছে ; রাশিয়া তোমাদের ভুলবে না! চিরদিন তোমরা সম্মানিত থাকবে।"

কথা থামিয়ে সে আবার চারদিকে তাকাল।

একটি সৈনিক প্রিয়োব্রাঝেনস্ক পতাকার পাশে ফরাসী ঈগল-মার্কা একটা পতাকা ধরে ছিল। হঠাৎই তার হাতের ফরাসী ঈগলটাকে নীচু করে ফেলতেই কুতুজভ তাকে বলল, "ওর মাথাটা নীচু কর, নীচু কর! নীচু, আরও নীচু, ঠিক আছে। হুর্‌রা বাছারা!"

"হুর্‌-র্‌-রা!" হাজার কণ্ঠে উঠল গর্জন।

সৈন্যরা চীৎকার করতে লাগল। কুতুজভ ঘোড়ার পিঠে সামনে ঝুঁকে মাথাটা নীচু করল, তার চোখে একটা মৃদু, ব্যঙ্গের হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠল।

চীৎকার থেমে গেলে আবার বলল, "দেখ ভাইসব"...সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের ভাব ও গলার স্বর বদলে গেল। এ যেন প্রধান সেনাপতি কথা বলছে না, কথা বলছে একটি সাধারণ বুড়ো মানুষ যে তার সহকর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা শোনাতে চায়।

অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যে একটা চঞ্চলতা দেখা দিল ; তার কথা ভালভাবে শুনবার জন্য সকলেই এগিয়ে গেল।

"দেখ ভাইসব, আমি জানি এটা সহ্য করা তোমাদের পক্ষে শক্ত, কিন্তু কোন উপায় নেই! সহ্য কর ; আর বেশী দিন নয়। অতিথিদের বিদায় করতে পারলেই আমরা বিশ্রাম নেব। তোমাদের সেবার কথা জার ভুলবেন না। তোমরা কষ্ট পাচ্ছ। তবু তো তোমরা দেশেই রয়েছ, আর ওরা— দেখতেই তো পাচ্ছ ওদের কি হাল হয়েছে," বন্দীদের দেখিয়ে সে বলল। "আমাদের চাইতেও ভিক্ষুকের চাইতেও ওদের অবস্থা শোচনীয়। ওরা যখন শক্তিশালী ছিল, তখন আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করেছি, কিন্তু এখন আমরা ওদের প্রতি করুণা দেখাতে পারি। ওরাও তো মানুষ। তাই নয় কি বাছারা?"

চারদিকে তাকাল ; তার উপর নিবদ্ধ সশ্রদ্ধ বিস্ময়-বিমুগ্ধ দৃষ্টির মধ্যে সে সমবেত সকলের সহানুভূতিরই আভাষ পেল। তার মুখ ক্রমেই উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল, সেখানে ফুটে উঠল একটি বৃদ্ধ মানুষের মৃদু হাসি, তার ঠোঁটের কোণ দুটি সংকুচিত হল, চোখের উপর ভাঁজ পড়ল। কথা থামিয়ে বুঝি বা বিচলিত হয়েই সে মাথাটা নোয়াল।

হঠাৎ মাথা তুলে সে চীৎকার করে বলল, "কিন্তু কে ওদের এখানে আসতে বলেছিল? ঠিক শাস্তি হয়েছে, য—যত..."

চাবুক ঘুরিয়ে সে জোড় কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। সৈন্যরা আনন্দের সঙ্গে "হুর্‌রা!" বলে চেঁচিয়ে উঠল।

কুতুজভের কথাগুলি সৈনিকরা মোটেই বুঝতে পারে নি। ফিল্ড-মার্শালের কথাগুলি কেউ পুনরাবৃত্তি করতে পারবে না! তার ভাষণটি শুরু হয়েছিল গম্ভীরভাবে। কিন্তু তারপরই হয়ে উঠল একটি বুড়ো মানুষের সরল মনের কথা; কিন্তু সেই ভাষণের হৃদ্য আন্তরিকতা, জয়-গৌরবের সঙ্গে শত্রুর প্রতি করুণার মিশ্র অনুভূতি, এবং আমাদের আদর্শের ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে সচেতনতা—এসব কিছু সৈনিকরা শুধু যে বুঝেছিল তাই নয়, প্রতিটি সৈনিকের অন্তরকে তা স্পর্শ করেছিল; তাদের দীর্ঘ সানন্দ উল্লাস-ধ্বনিতেই তা প্রকাশ পেল। পরে জনৈক জেনারেল যখন কুতুজভের কাছে জানতে চাইল যে তার কালিচে-গাড়িটা আনতে পাঠানো হবে কিনা তখন সে প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে কুতুজভ অপ্রত্যাশিতভাবে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল; গভীর আবেগে তার হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠল।

অধ্যায়—৭

ক্রাস্‌নু যুদ্ধের সর্বশেষ দিন ৮ই নভেম্বর সৈন্যরা যখন রাতের বিশ্রাম-ঘাঁটিতে হাজির হল তখন গোধূলির অন্ধকার নেমে আসছে। সারাদিন আবহাওয়া শান্ত ছিল; মাঝে মাঝে সামান্য বরফও পড়েছে; কিন্তু সন্ধ্যার দিকে আবহাওয়া পরিষ্কার হতে লাগল। পড়ন্ত বরফের ভিতর দিয়ে লাল-কালো তারকাখচিত আকাশ দেখা দিল; তুষারপাত তীক্ষ্ণতর হল।

যে পদাতিক রেজিমেণ্টটি তারুতিনো ছেড়েছিল তিন হাজার সৈন্য নিয়ে এখন তার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে মাত্র ন' শ'। সেই রেজিমেণ্টটাই বড় রাস্তার ধারে একটি গ্রামের রাতের ঘাঁটিতে এসে প্রথম পৌছল। কোয়ার্টারমাস্টাররা জানাল, রুগ্ন ও মৃত ফরাসী, অশ্বারোহী সৈন্য ও কর্মচারিতে সব কুটিরই ভর্তি হয়ে গেছে। শুধু রেজিমেণ্ট-কম্যাণ্ডারের জন্য একটা ঘর পাওয়া যেতে পারে।

কম্যাণ্ডার ঘোড়া নিয়ে সেই ঘরটাতে গেল। বাকি রেজিমেণ্ট গ্রামের ভিতর দিয়ে এগিয়ে শেষ কুটিরটার সামনে তাদের অস্ত্রশস্ত্র স্তূপ করে রাখল।

বহু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমন্বিত একটা প্রকাণ্ড জন্তুর মত রেজিমেণ্ট তাদের বিছানা ও খাবার তৈরির কাজে লেগে গেল। একদল এক-হাঁটু বরফ ভেঙে গ্রামের দক্ষিণ দিকের বার্চের বনে ঢুকে গেল; সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে ভেসে আসতে লাগল কুড়ুল ও তলোয়ারের শব্দ, ডাল ভাঙার শব্দ, নানারকম খুশির হল্লা। আর একদল হাড়ি-কড়াই ও জইয়ের বিস্কুট বের করল এবং ঘোড়াগুলোকে খাবার দিল। তৃতীয় দলটা, গ্রামের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে অফিসারদের থাকার ব্যবস্থা করার কাজে লেগে গেল, ফরাসীদের মৃতদেহগুলি বয়ে নিয়ে দূরে ফেলে দিল, ঘরের বোর্ড, শুকনো কাঠ ও চালের খড় টেনে নিয়ে আগুন জ্বালাল, আর বাঁশের বেড়া দিয়ে নিজেদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা

করতে লাগল।

জন পনেরো লোক একটা চালাঘরের ছাদটা খুলে ফেলার পরে হৈ-হৈ করে তার উঁচু বাঁশের বেড়াটা ধরে টেনে নামাতে চেষ্টা করছিল।

সকলে সমস্বরে বলে উঠল, "এবার, এক সাথে, সবাই মিলে, হেইয়ো জোয়ান, মারো টান!" ধপাস্ করে দেয়ালটা পড়ে গেল, সেইসঙ্গে জোয়ানরাও ছিটকে পড়ল। শুরু হয়ে গেল উচ্চ হাসি ও হল্লা।

"এবার এক সাথে হাত লাগাও। দুজন-দুজন করে। একটু সবুর কর বাছারা···একটা গান ধর!"

সকলে চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। একটা মিষ্টি মোলায়েম গলায় গান শুরু হল। তৃতীয় কলিটা শেষ হতে শেষ সুরটা যখন মিলিয়ে গেল, অমনি বিশটা কণ্ঠস্বর একসঙ্গে গর্জন করে উঠল: "উ—উ-উ-উ। এই তো চাই। এক সাথে। মারো টান, হেইয়ো জোয়ান।" কিন্তু হাজার চেষ্টায়ও বেড়াটা নড়ল না। সকলেই চুপ। শুধু শোনা গেল বড় বড় নিঃশ্বাসের শব্দ।

"এই যে ষষ্ঠ কোম্পানির বাছারা! আচ্ছা বদমাশ তো তোমরা! একটু হাত লাগাও না বাবা···আবার একদিন আমাদেরও তো ডাকতে হতে পারে।"

ষষ্ঠ কোম্পানির জন বিশেক সৈন্য গ্রামের দিকে যাচ্ছিল। তারাও এসে হাত লাগাল। আর পঁয়ত্রিশ ফুট লম্বা ও সাত ফুট উঁচু বাঁশের বেড়াটা হেলে দুলে গ্রামের পথ দিয়ে চলতে চলতে শ্রান্ত লোকগুলোর কাঁধের উপর কেটে বসতে লাগল।

"জোরসে ধরো···পড়ে যাচ্ছ নাকি? আরে, থামছ কেন? এই যে, ওদিকে ···"

অর্থহীন খুশি-ভরা বকাবকি অবাধে চলতে লাগল।

"হচ্ছে কি তোমাদের?" সহসা জনৈক সার্জেন্ট-মেজরের কর্তৃত্বপূর্ণ গলা শোনা গেল। "এখানে ভদ্রলোকরা রয়েছেন; স্বয়ং জেনারেল রয়েছেন কুটিরে, আর তোমরা যত সব মুখ-ফাজিল শয়তান আর জানোয়ারের দল! এটাই তোমাদের প্রাপ্য।" চীৎকার করে কথাগুলি বলে প্রথম যাকে হাতের কাছে পেল তারই পিঠে লাগাল একটা মোক্ষম ঘুষি। "চেঁচামেচিটা কম করতে পার না?"

সকলে চুপ করল। বেড়ার উপর পড়ে গিয়ে আহত সৈনিকটির মুখ ছড়ে গিয়ে রক্ত পড়ছে; সে আর্তনাদ করে মুখ মুছতে লাগল।

সার্জেন্ট-মেজর চলে যেতেই সভয়ে সে ফিস্‌ফিস্ করে বলে উঠল, "দেখ না, শয়তানটা কী মার মেরেছে! মুখটাকে রক্তাক্ত করে দিয়েছে।"

"কেমন লাগছে বল?" কে যেন হাসতে হাসতে বলল। তারপর গলা নামিয়ে সকলে এগিয়ে চলল।

গ্রাম ছাড়িয়ে গিয়ে আবার তারা আগের মতই জোর গলায় কথা বলতে লাগল; মাঝে মাঝেই তাতে চুটকি কথার ফোড়ন।

কুটিরের মধ্যে প্রধান অফিসাররা জড়ো হয়ে আজকের ঘটনাবলী ও আগামীকালের রণ-কৌশল নিয়ে আলোচনা করছে। প্রস্তাব করা হয়েছে, আগামীকাল বাঁদিক ধরে এগিয়ে উপ-রাজাকে (মুরাত) বিচ্ছিন্ন করে গ্রেপ্তার করা হবে।

সৈন্যরা যতক্ষণে বাঁশের বেড়াটাকে যথাস্থানে টেনে নিয়ে গেল ততক্ষণে চারদিকে শিবির-আগুনগুলো জ্বলে উঠে রান্নার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। কাঠ ফেটে শব্দ হচ্ছে, বরফ গলছে, সৈনিকদের কালো-কালো ছায়াগুলি ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কুড়ুল ও কাটারিগুলো চারদিকে স্তূপ করে রাখা হয়েছে। সব কিছুই করা হয়েছে বিনা হুকুমে। রাতের মত কাঠ আনা হয়েছে, অফিসারদের মাথা গুঁজবার ঠাঁই করে দেওয়া হয়েছে, কড়াইতে খাবার সিদ্ধ হচ্ছে, বন্দুক ও যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

উত্তরের দিক থেকে আত্মরক্ষার জন্য বাঁশের বেড়াটাকে এনে সেইদিকে দাঁড় করানো হয়েছে। তার সামনেও একটা শিবির-আগুন জ্বালানো হয়েছে। সকলে ঢাক বাজাল, নাম ডাকা হল, রাতের খাবার খেল, রাতের মত আগুনের চারদিকে গোল হয়ে বসল—কেউ মোজা মেরামত করতে লাগল, কেউ বা পাইপ ধরাল, আবার কেউ বা পোশাক খুলে আগুনের তাতে শার্টের উকুন তাড়াতে বসে গেল।

অধ্যায়—৮

একথা মনে হতে পারে যে রুশসৈন্যরা সেসময় যে অবিশ্বাস্য রকমের শোচনীয় অবস্থার মধ্যে পড়েছিল—গরম জুতো ছিল না, ভেড়ার চামড়ার কোট ছিল না, মাথার উপরে ছাদ ছিল না, পায়ের নীচে ছিল আঠারো ডিগ্রির বরফ (১৮ ডিগ্রি=শূন্য ফারেনহিটের আট ডিগ্রি নীচে), এমন কি পুরো রেশনও ছিল না (কমিসারিয়েট বিভাগ সবসময় সেনাদলের সঙ্গে সমান তালে চলতে পারত না)—তাতে সে দৃশ্য খুবই করুণ ও কষ্টদায়ক হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু আসলে অত্যন্ত ভাল বাস্তব পরিবেশেও সেনাবাহিনী কখনও সে সময়কার চাইতে অধিক খুশি ও প্রাণচঞ্চল ছিল না। তার কারণ সৈন্যদের মধ্যে যারাই মন-মরা অথবা দুর্বল হয়ে পড়ল তাদেরই দিনের পর দিন সেনাদল থেকে ছাটাই করা হতে লাগল। দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে

দুর্বল সৈন্যদের পিছনে ফেলে আসা হল, আর দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে যারা বাহিনীর প্রাণস্বরূপ তাদেরই শুধু রাখা হল।

অন্য সব জায়গার তুলনায় অষ্টম কোম্পানির বাঁশের বেড়াটার আড়ালেই সব চাইতে বেশী লোক জমায়েত হল। দু'জন সার্জেন্ট—মেজরও তাদের দলে গিয়ে বসে পড়ল; তাদের শিবির-আগুনই সব চাইতে বেশী জল্‌ জল্‌ করে জলতে লাগল। তাদের বেড়ার পাশে বসার অনুমতির জন্য চাঁদা হিসাবে তারা কাঠ দাবী করতে লাগল।

"আরে মকিভ, তোমার হয়েছে কি কুকুরের বাচ্চা? তুমি কি শেষ হয়ে গেছ, না কি তোমাকে নেকড়েয় খেয়েছে? আরও কিছুটা কাঠ নিয়ে এস।" লাল-চুল, লাল-মুখ একটি লোক চোখ ঘুরিয়ে চেঁচিয়ে বলল। ধোঁয়ায় চোখ জালা করলেও আগুনের কাছ থেকে না সরেই সে অপর একটি সৈনিককে বলল, "আর তুমি দাঁড়কাক, যাও না, কিছু কাঠ নিয়ে এস!"

লাল-চুল লোকটি সার্জেন্টও নয়, কর্পোরালও নয়, কিন্তু গায়ে বেশ জোর আছে বলেই দুর্বলতর লোকগুলিকে দাপটের সঙ্গে হুকুম করছে। যাকে "দাঁড়কাক" বলা হল সেই শীর্ণ, ছোট খাট মানুষটি হুকুমমত উঠে দাঁড়াতেই আগুনের আলোয় দেখা গেল একটি সুদর্শন তরুণ এক বোঝা কাঠ বয়ে এনেছে।

"এখানে নিয়ে এস—খুব ভাল কাজ করেছ!"

তারা কাঠ চিঁরল, সেগুলোকে আগুনে ফেলে দিয়ে ফুঁ দিতে লাগল, গ্রেটকোটের কোণ দিয়ে হাওয়া করতে লাগল, ফট্‌ ফট্‌ শব্দ করে হু-হু করে জলে উঠল। সকলে আরও ঘন হয়ে বসে পাইপ ধরাল। নবাগত সুদর্শন তরুণটি দুই হাত বুকের উপর কোনাকুনি ভাঁজ করে দুই পা বরফের উপর ঠুকতে লাগল।

"মাগো। শিশির কণাগুলো ঠাণ্ডা কিন্তু পরিষ্কার। ভালই হয়েছে যে আমি বন্দুকধারী…" গান গাইতে গাইতে সে মাঝে মাঝেই হিক্কা তোলার ভান করে চলল।

তরুণটির বুটের তলা ঝুলে আছে দেখে লাল-চুল লোকটি চেঁচিয়ে উঠল, "দেখহে, তোমার জুতোর তলা যে উড়ে যাবে! এত নাচছই বা কেন?"

নর্তক থামল, ঝুলে-পড়া চামড়াটা খুলে নিয়ে আগুনের মধ্যে ফেলে দিল।

"ঠিক বলেছেন বন্ধু," বলে তরুণটি বসে পড়ল। ঝোলার ভিতর থেকে একটুকরো নীল ফরাসী কাপড় বের করে পায়ের পাতাটা জড়িয়ে নিল। পা দুটো আগুনের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে বলল, "বাষ্প ওগুলোর ক্ষতি করে।"

"শীঘ্রই আমাদের নতুন বুট দেওয়া হবে। ওরা বলছেন, এদের তুলো-ধোনা করাটা শেষ হলেই আমরা 'ডবল কিট' পেয়ে যাব!"

একজন সার্জেন্ট-মেজর বলল, "মনে হচ্ছে কুকুরের বাচ্চা পেত্রভটা সকলের পিছনে পড়ে আছে।"

অপরজন বলল, "সারাক্ষণ আমি তার উপর নজর রেখেছি।"

"আচ্ছা, সৈনিক হিসাবে বেচারা বড়ই দুর্বল..."

"কিন্তু সকলে বলছে, তৃতীয় কোম্পানির ন'জনকে কাল খুঁজে পাওয়া যায় নি।"

"ঠিক, সবই ঠিক; কিন্তু কারও পা যদি জমে যায় তাহলে সে হাঁটবে কেমন করে?"

একথা যে বলল তিরস্কারের ভঙ্গীতে তার দিকে ফিরে একটি বুড়ো সৈনিক বলল, "তুমিও তাই করতে চাও না কি?"

যে লোকটিকে "দাঁড়কাক" বলা হয়েছিল সে আগুনের ও-পাশে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "দেখুন, আপনি তো জানেন, মোটা লোক সরু হয়ে যায়, কিন্তু সরু লোকের কপালে জোটে মৃত্যু।" তারপর সার্জেন্ট-মেজরের দিকে ঘুরে দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠল, "আমার কথাই ধরুন। ওদের বলুন, আমাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিক। আমার সারা শরীরে ব্যথা; আমি আর চলতে পারছি না।"

সার্জেন্ট-মেজর শান্ত গলায় বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে।"

সৈনিকটি আর কথা বলল না। গল্প-গুজব চলতে লাগল।

নতুন প্রসঙ্গের অবতারণা করে একজন বলল, "আজ ফরাসী বাবাজীদের অনেককে ধরা হয়েছে। তাদের কারও পায়েই সত্যিকারের বুট বলতে কিছু নেই। সব যেন সৈনিকের ভূত।"

নর্তক তরুণটি বলল, "কসাকরা তাদের বুটগুলি হাতিয়েছে। কর্নেলদের জন্য ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে তাদের বাইরে বের করে দিয়েছে। তাদের দেখলে সত্যি করুণা হয়। তাদের যখন ফেলে দিল তখনও একজনকে জীবন্ত বলে মনে হল; তোমরা কি বিশ্বাস করবে, ওদের ভাষায় সে যেন বিড়বিড় করে কি বলল।"

প্রথম লোকটি বলতে লাগল, "কিন্তু ওরা খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন; মনে হয় বেশ বড় ঘরের মানুষ।"

"আহা, আপনি কি মনে করেন? ওদের সেনাদলে সব শ্রেণীর মানুষই আছে।"

নর্তক তরুণটি বিচলিত হাসি হেসে বলল, "কিন্তু আমাদের কথা ওরা কিছুই বোঝে না। আমি শুধিয়েছিলাম, সে কার প্রজা, তাতে নিজের ভাষায়ই বিড় বিড় করে কি যেন বলল। দুর্ভাগ্য আর কি!"

প্রথম লোকটি বলতে লাগল, "কিন্তু বন্ধুগণ, আশ্চর্যের কথা কি জান, মোঝায়েস্কের চাষীরা বলছে তারা যখন মৃতদেহগুলিকে রণক্ষেত্রে কবর

দিচ্ছিল তখনও যে সব মৃতদেহ প্রায় একমাসকাল সেখানে পড়েছিল সেগুলি তখনও ছিল কাগজের মত সাদা, পরিষ্কার, বারুদের ধোঁয়ার মত কোন গন্ধও তা থেকে পাওয়া যায় নি।"

"সেটা কি ঠাণ্ডার জন্য?" একজন শুধাল।

"তুমি খুব বুদ্ধিমান! ঠাণ্ডার জন্যই ঘটে! আরে, তখন তো বেশ গরম। যদি ঠাণ্ডার জন্যই হবে তাহলে তো আমাদের মৃতদেহগুলোও পচত না। কিন্তু সেখানে গিয়ে আমাদের মৃতদেহগুলি দেখে এস, সব পচে গেছে, পোকা পড়েছে। তাদের টেনে নিয়ে যাবার সময় আমরা তো মুখে রুমাল বেঁধে মাথা ঘুরিয়ে নেই: কাজটা করা খুবই শক্ত। কিন্তু ওদের মৃতদেহগুলি কাগজের মত সাদা, বারুদের ধোঁয়ায় যেটুকু গন্ধ থাকে তাও নেই।"

সকলে চুপ।

সার্জেণ্ট-মেজর বলল, "তাহলে নিশ্চয় তাদের খাদ্যের ফল। তারা তো সকলেই ভদ্রলোকদের খাবার খেত।"

কেউ তার কথার প্রতিবাদ করল না।

"মোঝায়েস্কের যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটবর্তী চাষীরা বলছে, চারদিকের দশটা গাঁয়ের লোক ডেকে এনে বিশদিন ধরে গাড়ি বোঝাই করেও মৃতদেহগুলি সরিয়ে দেওয়া শেষ করা যায় নি; আর নেকড়ের কথা যদি বল···"

জনৈক বুড়ো সৈনিক বলল, "এটাই তো আসল যুদ্ধ। মনে করে রাখবার মত একমাত্র যুদ্ধ। কিন্তু তারপর থেকে···লোকে শুধু যন্ত্রণাই ভোগ করছে।"

"আর তুমি কি জান বাবা, গত পরশু আমরা যেই তাদের দিকে ধেয়ে গেলাম, অমনি, বিশ্বাস কর, আমরা তাদের কাছে পৌছবার আগেই তারা বন্দুক ছুঁড়ে ফেলে নতজানু হয়ে বসে পড়ল। বলে উঠল, "ক্ষমা কর!" এটা তো মাত্র একটা ঘটনা। লোকে বলছে, প্লাতভ দু' দু'বার স্বয়ং পোলিয়নকে ধরেছিল। কিন্তু তাকে ধরার সঠিক মন্ত্র তো তার জানা ছিল না। তাকে ধরছে, আবার ধরছে, কিন্তু কোন লাভ হচ্ছে না। সে হাতের মধ্যেই পাখি উড়ে যায়। তাকে মারবারও কোন পথ নেই।"

"তোমাকে দেখেই বুঝেছি তুমি একটি পাকা মিথ্যাবাদী!"

"মিথ্যাবাদী, বটে! এটাই আসল সত্য।"

"সে যদি আমার হাতে পড়ত, তাহলে ধরামাত্রই একটা অস্পেন গাছের বর্শা দিয়ে তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলতাম। সে যে কত মানুষের সর্বনাশ করেছে!"

বুড়ো সৈনিকটি হাই তুলে বলল, "ওসব কথা এখন থামাও। সে আর এখানে আসছে না।"

আলোচনায় ভাঁটা পড়ল; সৈন্যরা ঘুমের আয়োজন করতে লাগল।

একজন সবিস্ময়ে আকাশের ছায়াপথের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল,

"তারাগুলোর দিকে তাকাও। কী রকম অদ্ভুত কিরণ দিচ্ছে! মনে হবে বুঝিবা নারীরা তাদের কাপড় বিছিয়ে দিয়েছে।"

"ওটা আসছে বছর ভাল ফসলের লক্ষণ।"

"আরও কিছু কাঠ দরকার!"

"পিঠ গরম করি তো পেট ঠাণ্ডায় জমে যায়। আশ্চর্য ব্যাপার।"

"হা প্রভু!"

"ঠেলছ কেন? আগুনটা কি তোমার একার জন্য? দেখ, ও কেমন হাত-পা ছড়িয়ে শুয়েছে!"

সব চুপ হয়ে গেল। যারা ঘুমিয়ে পড়েছে তাদের নাক ডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে। অন্যরা পাশ ফিরে শরীর গরম করতে করতে দু' একটা কথা বলছে। একশ' পা দূরের একটা শিবির-আগুনের পাশ থেকে হাসির হর্‌রা ভেসে এল।

একজন বলে উঠল, "পঞ্চম কোম্পানির গর্জনটা শোন! ওখানে অনেকে জমেছে!"

একজন উঠে পঞ্চম কোম্পানিতে চলে গেল।

ফিরে এসে বলল, "ওরা খুব ফুর্তি করছে। দুটি ফরাসী বাবাজী এসে হাজির হয়েছে। একজন একেবারে জমে গেছে, আর অপরজন রাজা-উজির মারছে। ব্যাটা গান গাইছে…"

"আরে, তাহলে আমিও গিয়ে দেখে আসি।"

বেশ কয়েকজন পঞ্চম কোম্পানির কাছে চলে গেল।

অধ্যায়—৯

পঞ্চম কোম্পানি বনের একেবারে প্রান্তে একটা গুপ্ত ডেরায় তখন বিশ্রাম করছে। বরফের মাঝখানে একটা বড় শিবির-আগুন উজ্জ্বল আভায় জ্বলছে; তার আলো, শুভ্র হিমানীকণায় ঢাকা গাছের ডালপালাগুলি আলোকিত হয়ে উঠেছে।

মাঝরাতে বনের ভিতর বরফের উপর তারা পায়ের শব্দ ও শুকনো ডাল-পালার মচ্-মচ্ শব্দ শুনতে পেল।

একজন বলল, "ভালুক আসছে হে।"

সকলে কান খাড়া করল। আগুনের উজ্জ্বল আলোয় বন থেকে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে বেরিয়ে এল অদ্ভুত সাজে সজ্জিত দুটি মনুষ্যমূর্তি।

দু'জন ফরাসী; তারা বনের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। কর্কশ গলায় নিজেদের ভাষায় কি যেন বলতে বলতে তারা আগুনের কাছে এগিয়ে এল। আমাদের সৈন্যরা তাদের কথা কিছুই বুঝতে পারল না। একজন অপরজনের চাইতে

লম্বা ; তার মাথায় অফিসারের টুপি ; দেখে খুবই ক্লান্ত মনে হল। আগুনের কাছে এসে বসতে গিয়ে সে পড়ে গেল। অপরজন অনেক বেশী শক্ত-সমর্থ। মাথায় একটা শাল বাঁধা। সঙ্গীকে তুলে ধরে তার মুখটা দেখিয়ে কি যেন বলল। সৈন্যরা তাদের ঘিরে দাঁড়াল, রুগ্ন লোকটির জন্য একটা গ্রেটকোট পেতে দিল, আর দুজনের মত পরিজ ও ভদ্‌কা এনে দিল।

ক্লান্ত লোকটি ফরাসী অফিসার রাম্বল, আর মাথায় শাল ঢাকা লোকটি তার আর্দালি মোরেল।

পরিজের পাত্রটা শেষ করে খানিকটা ভদ্‌কা পেটে ঢেলে মোরেলের মেজাজ হঠাৎ অস্বাভাবিক রকমের খুশি হয়ে উঠল, সৈন্যদের সঙ্গে অবিরাম বকবক করতে লাগল, অবশ্য সৈন্যরা তার কথা কিছুই বুঝতে পারল না। রাম্বল কিছু খেল না, কনুইয়ের উপর মাথাটা রেখে আগুনের পাশে চুপচাপ শুয়ে থেকে রক্তিম শূন্য দৃষ্টি মেলে রুশ দৈনিকদের দিকে তাকিয়ে রইল। মাঝে মাঝে একটা টানা আর্তনাদ করে আবার চুপ করে থাকছে। তার কাঁধের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে মোরেল সৈনিকদের বোঝাতে চেষ্টা করল যে সে একজন অফিসার, তাকে একটু গরমে রাখা দরকার। সেখানে উপস্থিত জনৈক রুশ অফিসার তার কর্ণেলের কাছে লোক পাঠিয়ে জানতে চাইল, ফরাসী অফিসারটিকে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে একটু গরমে রাখা চলবে কি না। লোকটি এসে জানাল, কর্ণেল লোকটিকে তার কাছেই পাঠিয়ে দিতে বলেছে ; তখন রাম্বলকে যেতে বলা হল। সে উঠে হাঁটতে চেষ্টা করতেই তার পা টলতে লাগল। পাশের সৈনিকটি ধরে না ফেললে সে পড়েই যেত।

একটি সৈনিক চোখ টিপে রাম্বলকে ঠাট্টা করে বলল, "একাজ আর কখনও করবেন না. কি বলেন ?"

"আরে বোকা কোথাকার! কি বাজে বকছ, চাষাতো, একেবারে চাষা!" চারদিক থেকে সকলে তাকে বকতে লাগল :

তারা রাম্বলকে ঘিরে দাঁড়াল। দুজন সৈনিক দুদিক থেকে ধরে তাকে কুটিরে বয়ে নিয়ে চলল। তাদের গলা জড়িয়ে ধরে রাম্বল কাতর কণ্ঠে আর্তনাদ করে বলতে লাগল :

"আহা, ভাল মানুষের দল, আমার দয়ালু, বড় দয়ালু বন্ধুরা! এরাই তো মানুষ! আমার সাহসী, দয়ালু বন্ধুরা!" ছোট শিশুর মত সে একজন সৈনিকের কাঁধে মাথাটা রাখল।

এদিকে মোরেল তখন সৈন্যপরিবৃত হয়ে আগুনের পাশে সব চাইতে ভাল জায়গাটাতে বসে পড়েছে।

মোরেল বেশ শক্ত-সমর্থ ; ফোলা চোখ দুটো থেকে জল পড়ছে ; তার পরনে একটা মেয়েদের জোব্বা ; মাথায় টুপির উপরে মেয়েদের মত করে একটা শাল জড়িয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে যে তার নেশা হয়েছে। পাশের

সৈনিকটির গলাটা জড়িয়ে ধরে ভাঙা গলায় একটা ফরাসী গান ধরেছে।

মোরেল যে সৈনিকটিকে জড়িয়ে ধরেছে সে একজন গায়ক ও রসিক লোক। সে বলে উঠল, "এবার—এবার আমাদের শিখিয়ে দাও! আমি ঠিক তুলে নেব। বল—বল।"

চোখ মিটমিট করে মোরেল ফরাসীতে গেয়ে উঠল, "সাহসী রাজা চতুর্থ হেন্‌রি দীর্ঘজীবী হোন! সে শয়তানের আছে চারটি···"

সুরটা ঠিক মত ধরে নিয়ে সৈনিকটি হাত নেড়ে নেড়ে গানটার পুনরাবৃত্তি করল।

চারদিক থেকে হাসির হর্‌রা উঠল, "সাবাস! হা, হা, হা!"

মোরেলও মুখ কুঁচকে হেসে উঠল।

"বেশ, বেশ, চালিয়ে যাও, চালিয়ে যাও!"

"তিন গুণের অধিকারী ত্রিনাথ আমার,
পানে দক্ষ, যুদ্ধে দড়,
সাহসেও বড় সড়··"

"বাঃ, বেশ তো চলছে। আচ্ছা, এবার তুমি গাও জালেতায়েভ।"

জালেতায়েভ অনেক কষ্টে ঠোঁট চেটে চেটে কথাগুলি উচ্চারণ করল।

"খাসা হয়েছে। ঠিক ফরাসীবাবাজীর মতই! হো, হো, হো! তুমি আর কিছু খাবে কি?"

"ওকে আরও খানিকটা পরিজ দাও। অনাহারের পরে পেটটা ভরাতে অনেক সময় লাগে।"

আরও খানিকটা পরিজ দেওয়া হল। মোরেল হাসতে হাসতে তৃতীয় পাত্রে হাত দিল। তাকে দেখে অল্প বয়সী সৈনিকরা সকলেই খুশি। কিন্তু এই সব বাজে হৈ-চৈ মর্যাদা হানিকর বিবেচনা করে বুড়ো সৈনিকরা আগুনের অপর দিকটাতে চুপচাপ শুয়ে রইল। অবশ্য কেউ কেউ মাঝে মাঝে কনুইতে ভর দিয়ে মোরেলকে দেখে মুচ্‌কি মুচকি হাসতে কসুর করল না।

কোট দিয়ে শরীরটা ঢাকতে ঢাকতে একজন বলল, "ওরাও তো মানুষ! তেতো সোমরাজ গাছও তো তার শিকড়েই জন্মায়।"

"হে প্রভু! হে প্রভু! আকাশে কত তারা! ভয়ংকর! তার মানে, প্রচণ্ড তুষারপাত···"

সকলে চুপ করে গেল।

তাদের কেউ দেখছে না জানতে পেরে তারারাও যেন কালো আকাশের বুকে কেলি শুরু করে দিল: এই জলছে, এই নিভছে, এই কাঁপছে, যেন পরস্পরের কানে কানে কোন রহস্যময় খুশির কথা বলছে।

অধ্যায়—১০

গাণিতিক হ্রাস-বৃদ্ধির একটা সমান হারে ফরাসী সৈন্যদের সংখ্যা হ্রাস পেতে লাগল। যে বেরিজিনা অতিক্রম সম্পর্কে এত কথা লেখা হয়েছে সেটা এই অভিযানের চূড়ান্ত পর্যায় মোটেই নয়, ফরাসী বাহিনীর ধ্বংসের একটা মধ্যবর্তী পর্যায় মাত্র। বেরিজিনা সম্পর্কে যে এত কথা লেখা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে তার কারণ—ফরাসীদের দিক থেকে দেখতে গেলে, তাদের বাহিনী যেসব বিপদ-আপদ অনেকদিন ধরেই সয়ে আসছিল হঠাৎ ঐ নদীর উপরকার সেতুর মুখে সেটা একটি মুহূর্তে কেন্দ্রীভূত হয়ে এমন একটা শোচনীয় দৃশ্যের সৃষ্টি করেছিল যা প্রত্যেকের স্মৃতিতে স্পষ্ট হয়ে আছে, আর রুশদের দিক থেকে দেখতে গেলে, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে পিতার্সবুর্গে তখন একটা নতুন পরিকল্পনা (আবারও সেটা প্‌ফুয়েলেরই সৃষ্টি) রচনা করা হয়েছিল যাতে বেরিজিনা নদীতে একটা সমর-কৌশলের ফাঁদ পেতে নেপোলিয়নকে ধরা যায়। প্রত্যেকেই নিশ্চিত ছিল যে সব কিছুই পরিকল্পনা-মাফিক ঘটবে, আর তাই তারা বার বার বলেছে যে বেরিজিনার মুখেই ফরাসী বাহিনীকে ধ্বংস করা হয়েছে। বস্তুত, সংখ্যাতত্ত্ব থেকে এটাই দেখা যায় যে বিনষ্ট কামান ও সৈন্যের বিচারে বেরিজিনার ফরাসীদের ক্ষয়-ক্ষতি ক্রাস্‌নুর তুলনায় অনেক কমই হয়েছিল।

বেরিজিনা সেতু-মুখের একমাত্র গুরুত্ব হল, সেখানেই সন্দেহাতীতভাবে পরিষ্কার প্রমাণ হয়ে গেল যে ফরাসীদের পশ্চাদপসরণের পথকে বিচ্ছিন্ন করে দেবার সবগুলি পরিকল্পনাই ছিল ভ্রান্ত, আর কুতুজভ ও সাধারণ সৈনিকরা যে কর্মপন্থা গ্রহণ করতে চেয়েছিল অর্থাৎ শত্রুপক্ষকে বাধা না দিয়ে কেবল অনুসরণ করে চলা সেটাই ছিল একমাত্র সঠিক পথ। ফরাসীরা তখন দলে দলে পালাচ্ছিল ক্রমাগত গতিবেগ বাড়িয়ে, তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবার চেষ্টায়। তারা পালাচ্ছিল আহত জন্তুর মত; তাই তাদের পথে বাধা দেওয়া ছিল অসম্ভব। সেতুটা যখন ভেঙে পড়ল তখন নিরস্ত্র সৈনিক, মস্কোর অধিবাসী, এবং নারী ও শিশু সকলেই নৌকোর দিকে ধেয়ে গেল, ছুটে গেল বরফ-ঢাকা জলের দিকে, কিন্তু আত্মসমর্পণ করল না।

এই আবেগ খুবই যুক্তিপূর্ণ। পলাতক এবং পশ্চাদ্ধাবনকারী দুয়েরই অবস্থা তখন সমান খারাপ। যতক্ষণ তারা নিজেদের লোকের মধ্যে ছিল ততক্ষণ প্রত্যেক পক্ষই নিজের লোকদের কাছ থেকে সাহায্য পাবার আশায় ছিল। কিন্তু যারা আত্মসমর্পণ করল তারা অপর পক্ষের মত একই শোচনীয় অবস্থায় পড়লেও জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সমান অংশীদার হতে পারে না। বিজয়ী পক্ষের শুভবুদ্ধি সত্ত্বেও অর্ধেক ফরাসী বন্দী যে শীতে ও ক্ষুধায় মারা গিয়েছিল একথা ফরাসীদের জানাবার কোন প্রয়োজন ছিল না,

কারণ তারা জানত যে এর অন্যথা হতে পারে না। যেসব দয়ালু রুশ কম্যাণ্ডার ফরাসীদের প্রতি সদয় ছিল—এমন কি রুশ সেনাদলভুক্ত ফরাসীরাও—বন্দীদের জন্য কিছুই করতে পারে নি। যে পরিস্থিতিতে রুশ বাহিনী পড়েছিল সেই একই পরিস্থিতিতে ফরাসী বাহিনী ধ্বংস হয়ে গেল। আমাদের ক্ষুধার্ত সৈনিকদের কাছ থেকে রুটি ও কাপড় ছিনিয়ে নিয়ে তা ফরাসীদের দেওয়া একান্তই অসম্ভব ছিল। ফরাসীরা ক্ষতির কারণ না হতে পারে, ঘৃণার বস্তু না হতে পারে, অপরাধীও না হতে পারে, কিন্তু তাদের কোন প্রয়োজন তো ছিল না। কিছু রুশ হয় তো তাও করেছিল, কিন্তু তারা বিরল ব্যতিক্রম।

ফরাসীদের পশ্চাতে নিশ্চিত ধ্বংস, কিন্তু সম্মুখে আশা। তাদের জাহাজগুলি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে; সমবেত পলায়ন ছাড়া মুক্তির অন্য কোন পথ ছিল না, আর ফরাসীদের সব শক্তি সেইপথেই কেন্দ্রীভূত হল।

তারা যত পালাতে লাগল ততই তাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠল, বিশেষ করে বেরিজিনার পরে, কারণ পিতার্সবুর্গ পরিকল্পনার ফলে সেখানে রুশদের মনে নতুন আশা জেগেছিল। পিতার্সবুর্গ-বেরিজিনা পরিকল্পনা যদি বিফল হয় তো কুতুজভের জন্যই হবে, এই আশংকায় রুশ কম্যাণ্ডারদের অসন্তোষ, ঘৃণা ও পরিহাসের ভাষা ক্রমেই কঠোরতর হতে লাগল। পরিহাস ও ঘৃণাকে অবশ্য প্রকাশ করা হত সশ্রদ্ধ ভাষায়, কাজেই তার দোষটা যে কোথায় সে প্রশ্নও কুতুজভের পক্ষে তোলা সম্ভব ছিল না। সামনাসামনি সকলেই সৌজন্যের মুখোশ পরে থাকত, কিন্তু পিছন থেকে তাকে দেখে চোখ টিপত, আর পদে পদে তাকে ভুল পথে নিতে চেষ্টা করত।

তাকে বুঝতে পারত না বলেই এই লোকগুলো ধরেই নিয়েছিল যে বুড়োটার সঙ্গে কথা বলা বৃথা; তাদের পরিকল্পনার গভীরতা সে কখনও পরিমাপ করতে পারবে না; সবসময় সেই একই পুরনো কথা বলবে—বলবে "সোনালী সেতু"র কথা, বলবে যে এইসব ছিন্নবাস বিপর্যস্ত সৈন্যদের নিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করা অসম্ভব, ইত্যাদি। এসব কথা তারা অনেক শুনেছে। তাছাড়া, তার সব কথাই এত সহজ ও সরল, আর তাদের প্রস্তাবগুলি এতই জটিল ও কুশলী যে এটা একান্ত স্পষ্ট যে সে লোকটি বুড়ো ও নির্বোধ, আর তারা ক্ষমতাসীন না হলেও প্রতিভাবান।

খ্যাতিমান নৌ-সেনাধ্যক্ষ ও পিতার্সবুর্গের মহানায়ক উইৎগেন্স্তিন যখন সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগ দিল তখনই জেনারেলদের এই মনোভাব ও কথাবার্তা একেবারে তুঙ্গে উঠল। কুতুজভ সবই জানল, বুঝল; কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাঁধে ঝাঁকুনি দিল। শুধু একবার, বেরিজিনার ব্যাপারের পরে, সে রাগে ফেটে পড়ল এবং বেনিংসেনকে (সে আলাদাভাবে সম্রাটের কাছে প্রতিবেদন পাঠিয়েছিল) নিম্নবর্ণিত চিঠি লিখল:

"আপনার নষ্ট স্বাস্থ্যের কারণে ইয়োর এক্সলেন্সি যেন এই চিঠি পেয়েই দয়া করে কালুগা যাত্রা করেন এবং ইম্পিরিয়াল ম্যাজেস্টির কাছ থেকে আরও নির্দেশ ও কর্ম-নিযুক্তির জন্য সেখানেই অপেক্ষা করে থাকেন।

কিন্তু বেনিংসেনের যাত্রার পরে গ্র্যাণ্ড ডিউক জারেভিচ কন্‌স্তান্তিন পাভ্‌লভিচ সেনাদলের সঙ্গে যোগ দিল। এই অভিযানের গোড়ায় সে অংশ নিয়েছিল। কিন্তু পরে কুতুজভ তাকে সরিয়ে দিয়েছিল। এবার সেনাদলে এসেই কুতুজভকে জানিয়ে দিল, আমাদের বাহিনীর যৎসামান্য সাফল্য ও অগ্রগতির মন্থরতার দরুণ সম্রাট তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যেই সম্রাট নিজে সেনাবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হবে।

কি রাজদরবারে কি সমর ক্ষেত্রে সমান অভিজ্ঞ এই বৃদ্ধ মানুষটি—সেই কুতুজভ যে গত অগস্ট মাসে সম্রাটের ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হয়েছিল এবং গ্র্যাণ্ড ডিউক ও সিংহাসনের উত্তরাধিকারীকে সরিয়ে দিয়েছিল —যে নিজের ক্ষমতায় এবং সম্রাটের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মস্কো পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল, এবার সে সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল যে তার দিন শেষ হয়ে এসেছে, তার যা করার তা করা হয়েছে। আর যে ক্ষমতায় সে এখন অধিষ্ঠিত আছে বলে মনে করে সেটা আর তার নেই। আর শুধু যে রাজদর-বারের মনোভাব থেকেই সে এটা বুঝতে পারল তাও নয়। সে বুঝল, যে সামরিক কর্মক্ষেত্রে তার ভূমিকা সে পালন করেছে সেখানকার কাজ শেষ হয়েছে, আর তার উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয়েছে। আর সেইসঙ্গে বার্ধক্যজীর্ণ শরীরের ক্লান্তি এবং দৈহিক বিশ্রামের প্রয়োজন সম্পর্কেও সে সচেতন হয়ে উঠল।

২৯ শে নভেম্বর কুতুজভ ভিল্‌না প্রবেশ করল—যাকে সে বলত "আদরের ভিল্‌না।" দু'বার সে ভিল্‌নার শাসনকর্তা হয়েছে। সমৃদ্ধ শহরটার কোন ক্ষতি হয় নি ; সেখানে সে পেল পুরনো বন্ধুবান্ধব ও পরিচিত জনের সান্নিধ্য, পেল জীবনের সেই আরাম যা থেকে দীর্ঘকাল সে বঞ্চিত ছিল। আর হঠাৎই সেনাবাহিনী ও রাষ্ট্রের চিন্তা-ভাবনা থেকে সরে গিয়ে সেই শান্ত জীবনের মধ্যে সে ডুব দিল যাতে সে চিরদিন অভ্যস্ত ; মনে হল, ইতিহাসের ক্ষেত্রে যা কিছু ঘটছে এবং এখনও করণীয় আছে, তাকে নিয়ে তার কোনরকম চিন্তা-ভাবনাই নেই।

যে দুর্গ-প্রাসাদে কুতুজভ এসে উঠেছে সেখানে সর্বপ্রথম তার সঙ্গে এসে দেখা করল চিচাগভ। নৌ-বিভাগের সাধারণ ইউনিফর্মের সঙ্গে একটা ছোরা ঝুলিয়ে এবং টুপিটাকে বগলদাবা করে সে দুর্গের বিবরণ ও শহরের চাবি-গুলো কুতুজভের হাতে তুলে দিল। কুতুজভের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনা হয়েছে তার খবর চিচাগভ জানত। তাই তার ব্যবহারে একটি

বাহাত্তুরে বুড়োর প্রতি এক অল্পবয়সীর তাচ্ছিল্যপূর্ণ অথচ শ্রদ্ধাশীল ব্যবহারই অতিমাত্রায় প্রকাশ পেল।

কথাপ্রসঙ্গে কুতুজভ বলল, চীনামাটির বাসনপত্রে বোঝাই যে গাড়িগুলি বরিসভে তার কাছ থেকে আটক করা হয়েছিল সেগুলি উদ্ধার করা হয়েছে এবং তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তাতে চিচাগভ জবাব দিল, "আপনি কি বলতে চান যে আমার খাবার থালাটাও নেই···বরং আপনি যদি কোন ডিনার-পার্টি দিতে চান তো আমি প্রয়োজনীয় সব কিছু সরবরাহ করতে পারি।"

কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে কুতুজভ তার সূক্ষ্ম, অন্তর্ভেদী হাসির সঙ্গে বলল, "আমি যা বলেছি শুধু সেইটুকুই বলতে চেয়েছিলাম।"

সম্রাটের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কুতুজভ সেনাবাহিনীর একটা বড় অংশকে ভিল্‌নাতেই আটকে রাখল। আশপাশের লোকরা বলেছে, সেই শহরে অবস্থানকালে সে অস্বাভাবিক রকমের শ্লথগতি এবং শারীরিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সামরিক ব্যাপারে সে উপস্থিত হত অনিচ্ছাসত্ত্বে, সব কিছু জেনারেলদের উপর ছেড়ে দিল, এবং সম্রাটের আগমনের অপেক্ষায় অযথা আমোদ-প্রমোদে কাল কাটাতে লাগল।

৭ই ডিসেম্বর পিতার্সবুর্গ ছেড়ে সম্রাট তার দলবল—কাউণ্ট তলস্তয়, প্রিন্স বল্‌কন্‌স্কি, আরাক্‌চিভ ও অন্যান্যদের নিয়ে ১১ই তারিখে ভিল্‌না পৌঁছে স্লেজ নিয়ে সোজা গিয়ে উঠল দুর্গপ্রাসাদে। প্রচণ্ড তুষারপাত সত্ত্বেও শত শত জেনারেল ও রাজকীয় কর্মচারি পূর্ণ প্যারেড-ইউনিফর্মে সজ্জিত হয়ে দুর্গের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল, আর সেমেনভ রেজিমেণ্টের একটা গার্ড-অব-অনারেরর ব্যবস্থা করা হল।।

একজন বার্তাবাহক ঘর্মাক্ত কলেবর তিন ঘোড়ায় টানা ত্রয়কা গাড়িতে চেপে সকলের আগে দুর্গদ্বারে পৌঁছে চীৎকার করে ঘোষণা করল, "আসছেন!" আর কন্‌ভনিৎসিন ছুটে গিয়ে কুতুজভকে খবরটা দিল; সে তখন দ্বার-রক্ষকের ছোট বাসায় অপেক্ষা করছিল।

এক মিনিট পরেই সেই বুড়ো মানুষটির মস্তথড় দশাসই মূর্তিটা হেলে দুলে এসে বারান্দায় দাঁড়াল। পরনে পূর্ণ ইউনিফর্ম, বুকের উপর সম্মান-স্মারকগুলি ঝোলানো, পেটের উপর একটি চাদর জড়ানো। টুপিটাকে কাৎ করে মাথায় পরে নিল, দস্তানা দুটো হাতে নিল, তারপর বেশ কষ্ট করে এক পাশ হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাস্তার সমতলে পৌঁছে সম্রাটের জন্য তৈরি প্রতিবেদনটি হাতে নিল।

চারদিকে ফিস্‌ফিস্‌ ও ছুটাছুটি শুরু হল। আর একটা ত্রয়কা গাড়ি তীর বেগে ছুটে এল, সকলের দৃষ্টি ঘুরে গেল অগ্রসরমান স্লেজটার দিকে। তাতে সম্রাট ও বল্‌কন্‌স্কির মূর্তি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

পঞ্চাশ বছরের অভ্যাসবশত এ সবকিছুই বৃদ্ধ জেনারেলকে উত্তেজিত করে তুলল। অতিদ্রুত সযত্নে সাজ-পোশাকটা ঠিক করে নিল, টুপিটা ঠিক মত বসাল, মনে সাহস আনল, আর ঠিক যেমুহূর্তে স্লেজ থেকে নেমে সম্রাট তার দিকে চোখ তুলে তাকাল অমনি প্রতিবেদনটা তার হাতে দিয়ে কোমল কৃতজ্ঞ গলায় কথা বলতে শুরু করল।

সম্রাট দ্রুত সঞ্চালিত দৃষ্টিতে কুতুজভের মাথা থেকে পা পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখল, মুহূর্তের জন্য তার দৃষ্টি ভ্রূকুটিকুটিল হয়ে উঠল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেভাব দমন করে বুড়ো মানুষটির দিকে এগিয়ে গেল, হাত বাড়িয়ে তাকে আলিঙ্গন করল। দীর্ঘদিনের অভ্যাসবশত সেই আলিঙ্গনের ফলেও কুতুজভের বুকের ভিতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

সম্রাট অফিসার ও সেমেনভ রেজিমেণ্টকে অভিনন্দন জানাল, তারপর পুনরায় বুড়ো মানুষটির হাতটা চেপে ধরে তার সঙ্গেই দুর্গে প্রবেশ করল।

ফিল্ড-মার্শালকে একাকি পেয়ে সম্রাট শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনে শ্লথ গতি এবং ক্রাস্‌নু ও বেরিজিনাতে ভুলের জন্য অসন্তোষ প্রকাশ করল, এবং বিদেশে আর একটি অভিযানের অভিপ্রায় ব্যক্ত করল। কুতুজভ কোন উত্তর দিল না, কিছু মন্তব্যও করল না। সাত বছর আগে অস্তারলিজ রণক্ষেত্রে যে বিনীত, ভাবলেশহীন দৃষ্টি নিয়ে সম্রাটের নির্দেশ শুনেছিল, আজও সেই একই দৃষ্টি ফুটে উঠল তার চোখে মুখে।

পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে ভারী শরীরটা দুলিয়ে কুতুজভ যখন নতশিরে নাচঘরটা পার হয়ে যাচ্ছিল, তখন কার যেন কণ্ঠস্বরে তার গতিরোধ হল :

"প্রশান্ত মহামহিম!"

কুতুজভ মাথা তুলল। অনেকক্ষণ কাউণ্ট তলস্তয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। একটা রূপোর পাত্র হাতে নিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। পাত্রের উপর একটা ছোট কি যেন রয়েছে। কুতুজভ কিছুই বুঝতে পারল না।

সহসা তার মনে পড়ে গেল; তার গোল মুখে একটা প্রায় অলক্ষ্য হাসি খেলে গেল; মাথা নীচু করে শ্রদ্ধাভরে সে পাত্র থেকে জিনিসটি তুলে নিল। জিনিসটি প্রথম শ্রেণীর অর্ডার অব সেণ্ট জর্জ।

অধ্যায়—১১

পরদিন ফিল্ড-মার্শাল একটি নৈশভোজ ও বলনাচের আয়োজন করল। সম্রাট উপস্থিত থেকে তাকে কৃতার্থ করল। কুতুজভ প্রথম শ্রেণীর অর্ডার অব সেণ্ট জর্জ লাভ করল, সম্রাট তাকে সুউচ্চ সম্মান দেখাল, কিন্তু সম্রাটের অসন্তোষের কথাও প্রত্যেকেই জানল। যথাবিহিত সৌজন্য দেখানো হল,

সে ব্যাপারে সম্রাটই প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করল, কিন্তু সকলেই জানল যে বুড়ো মানুষটিই দোষী, সে কোন কাজের নয়। ক্যাথারিনের সময়কার একটা রীতি অনুযায়ী কুতুজভ যখন হুকুম দিল, যেসব পতাকা দখল করা হয়েছে সম্রাট নাচঘরে ঢুকলেই সেগুলি তার পায়ের কাছে যেন নামিয়ে দেওয়া হয়, তখন সম্রাটের মুখটা ঈষৎ বিকৃত হয়ে গেল, বিড়বিড় করে সম্রাট যা বলল তার মধ্যে কেউ কেউ শুনতে পেল "পুরনো বিদূষক" কথা দুটি।

কুতুজভের প্রতি সম্রাটের অসন্তোষ বিশেষভাবে বেড়ে গেল ভিল্‌নাতে, কারণ আসন্ন অভিযানের গুরুত্বটা সে বুঝতে পারল না, বুঝিবা বুঝতে চাইলও না।

পরদিন সকালে সম্রাট যখন সমবেত রাজকর্মচারিদের বলল: "আপনারা শুধু রাশিয়াকে রক্ষা করেন নি, রক্ষা করেছেন সারা ইওরোপকে," তখনই সকলে বুঝল যে যুদ্ধ শেষ হয় নি।

শুধু কুতুজভই সেটা বুঝতে পারল না; সে প্রকাশ্যেই এই বলে নিজের মত ব্যক্ত করল যে নতুন কোন যুদ্ধ অবস্থার উন্নতি করতে পারবে না, রাশিয়ার গৌরবকেও বৃদ্ধি করতে পারবে না, শুধু যে গৌরব রাশিয়া অর্জন করেছে তাকে নষ্ট করবে। নতুন করে সৈন্য সংগ্রহ করা অসম্ভব, জনসাধারণ যথেষ্ট কষ্ট সহ্য করেছে, পরাজয়ের সম্ভাবনাও তো রয়েছে—এই সব কথাই সে সম্রাটকে বোঝাতে চেষ্টা করল।

এই যখন ফিল্ড-মার্শালের মনোভাব তখন স্বভাবতই তাকে আসন্ন যুদ্ধের পথে একটা বিঘ্ন বলেই মনে করা হতে লাগল।

এই বুড়ো মানুষটির সঙ্গে অপ্রীতিকর সংঘর্ষ এড়াতে অস্তারলিজে তাকে নিয়ে যা করা হয়েছিল এবং রুশ অভিযানের একেবারে শুরুতে বার্কলেকে নিয়ে যা করা হয়েছিল সেই স্বাভাবিক পথটাই বেছে নেওয়া হল—ক্ষমতা সরিয়ে দেওয়া হল স্বয়ং সম্রাটের হাতে, আর এইভাবেই বুড়ো লোকটিকে কিছু না জানিয়ে প্রধান সেনাপতির পায়ের নীচ থেকে মাটি কেটে সরিয়ে দেওয়া হল।

এই উদ্দেশ্য নিয়েই ধীরে ধীরে তার দলবলকে নতুন করে গড়া হল, আর আসল ক্ষমতা চলে গেল সম্রাটের হাতে। তোল্, কনভ্‌নিৎসিন ও এর্মলভ নতুন নতুন পদ পেল। সকলেই ফিল্ড-মার্শালের চরম দুর্বলতা ও ভগ্নস্বাস্থ্যের কথা জোর গলায় বলে বেড়াতে লাগল।

তাকে মর্যাদার আসন থেকে সরিয়ে সে আসন অন্যকে দিতে হলে তার স্বাস্থ্য তো খারাপ হতেই হবে। আর আসলেও তার স্বাস্থ্য তো খারাপই ছিল।

সুতরাং তার ভূমিকা যখন শেষ হয়ে গেল তখন স্বাভাবিক ও সরল পথেই নতুন ও প্রয়োজনীয় অভিনেতার দ্বারা একে একে তার স্থান পূরণ করা হতে

লাগল।

১৮১২ সালের যুদ্ধের যে জাতীয় তাৎপর্য প্রতিটি রুশোর অন্তরের নিধি তাছাড়াও সে যুদ্ধকে এবার লাভ করতে হবে একটা ইওরোপীয় তাৎপর্য।

জনসাধারণের পশ্চিম থেকে পূবে অভিযানের পরেই শুরু করতে হবে তাদের পূব থেকে পশ্চিমে অভিযান, আর সেই নতুন যুদ্ধের জন্য চাই এমন একজন নেতা যার গুণ-গরিমা ও মনোভাব কুতুজভ থেকে ভিন্ন, যে পরি-চালিত হবে ভিন্ন অভিপ্রায়ের দ্বারা।

রাশিয়ার মুক্তি ও গৌরবের জন্য যেমন প্রয়োজন হয়েছিল কুতুজভকে, তেমনই জনগণকে পূব থেকে পশ্চিমে পরিচালিত করতে, জাতীয় সীমান্তকে নতুন করে নির্ধারণ করতে প্রয়োজন হল প্রথম আলেক্সান্দারকে।

ইওরোপ, শক্তি-সাম্য, বা নেপোলিয়ন বলতে কি বোঝায় কুতুজভ তা বুঝতে পারল না। সত্যি সে বুঝতে পারে নি। শত্রুকে ধ্বংস করে রাশিয়াকে মুক্ত করে গৌরবের শিখরে প্রতিষ্ঠিত করার পরে, একজন রুশ হিসাবে রুশ জনগণের প্রতিনিধির আর কিছু করার ছিল না। জাতীয় যুদ্ধের প্রতিনিধির সম্মুখে মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই রইল না। কুতুজভের মৃত্যু হল।

অধ্যায়—১২

সাধারণত যা ঘটে থাকে, বন্দী থাকা অবস্থায় যেসব দৈহিক দুঃখকষ্ট ও মানসিক চাপ পিয়েরকে সহ্য করতে হয়েছিল তার ফল ফলতে লাগল সে অবস্থা থেকে মুক্তিলাভের পরে। মুক্তি পেয়ে সে প্রথমে গেল ওরিল; সেখানে তিন দিন কাটিয়ে কিয়েভ যাত্রার মুখে অসুস্থ হয়ে তিনমাস শয্যাশায়ী হয়ে কাটাল। ডাক্তাররা বলল তার "পিত্ত জ্বর" হয়েছে। চিকিৎসা চলল, রক্তমোক্ষণ করা হল, খাবার ওষুধ দেওয়া হল—সে ভাল হয়ে উঠল

উদ্ধারলাভের সময় থেকে অসুস্থ হওয়া পর্যন্ত সময়ে যা কিছু ঘটেছিল তার প্রায় কোন কথাই পিয়েরের মনে নেই। শুধু মনে পড়ে একঘেয়ে ধূসর আবহাওয়া, কখনও বৃষ্টি পড়ছে, কখনও বরফ, শরীরের ভিতরে যন্ত্রণা, পায়ে ও এক পাশে ব্যথা। সাধারণভাবে আরও মনে পড়ে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ও দুর্ভাগ্যের কথা, অফিসার ও জেনারেলদের কৌতূহল ও জেরার যন্ত্রণা, যান-বাহন ও ঘোড়া সংগ্রহ করার অসুবিধা, এবং নিজের দিক থেকে সর্বক্ষণ চিন্তা ও অনুভূতির অক্ষমতা। মুক্তির দিনটিতেই সে দেখেছিল পেত্য়া রস্তভের মৃতদেহ। সেই একই দিনে জানতে পেরেছিল, বরদিনো যুদ্ধের পরে এক মাসেরও বেশী সময় বেঁচে থাকার পরে প্রিন্স আন্দ্রু সম্প্রতি মারা গেছে রস্তভদের ইয়ারোস্লাভ্ল্-এর বাড়িতে; সেই সঙ্গে দেনিসভ আরও জানিয়ে-

ছিল যে হেলেনের মৃত্যু হয়েছে, যদিও সে ধরেই নিয়েছিল যে এ খবরটা পিয়ের অনেক আগেই জেনেছে। সেসময় পিয়েরের কাছে সব কিছুই আশ্চর্য লেগেছিল : মনে হয়েছিল এসব কথার কোন তাৎপর্যই সে ধরতে পারছে না। তখন তার একমাত্র লক্ষ্য যেসব জায়গায় মানুষ মানুষকে খুন করছে সেখান থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালিয়ে এমন কোন শান্তিপূর্ণ আশ্রয়ে চলে যাওয়া যেখানে গেলে সে সেরে উঠবে, বিশ্রাম নিতে পারবে, এবং যে-সব বিচিত্র নতুন ঘটনার কথা শুনেছে তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করতে পারবে। কিন্তু ওরিলে পৌছেই সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। রোগ থেকে সেরে উঠে দেখল, তার দেখাশুনা করার জন্য মস্কো থেকে এসেছে তার দুই চাকর তেরেন্তি ও ভাস্কা; আর এসেছে তার জ্ঞাতি-বোন বড় প্রিন্সেস যে নিজের এলেৎসের জমিদারিতে থাকে এবং তার উদ্ধার ও অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে তাকে দেখতে এসেছে।

একটু একটু করে রোগ থেকে সেরে উঠলেও অনেকদিন পর্যন্ত সে স্বপ্নের মধ্যে দেখতে পেত, সে যেন এখন সেই বন্দীজীবনই কাটাচ্ছে। সেই অবস্থায়ই একটু একটু করে সে জেনেছে প্রিন্স আনদ্রুব মৃত্যু, তার স্ত্রীর মৃত্যু এবং ফরাসীদের ধ্বংসের খবর।

রোগ থেকে সেরে উঠতে উঠতে মুক্তির একটা সানন্দ অনুভূতি পিয়েরের অন্তরকে ভরে তুলল। অবাক হয়ে দেখল, অন্তরের এই মুক্তির অনুভূতি যেন একটা বাহ্যিক মুক্তির পরিবেশও রচনা করেছে। এখানে এই অপরিচিত শহরে সে একেবারে একা—কোন পরিচিত মানুষ নেই। কেউ তার কাছে কিছু চাইল না, তাকে কোথাও পাঠাল না। যা কিছু চেয়েছিল সবই সে পেয়েছে : যে স্ত্রীর চিন্তা ছিল তার নিরন্তর যন্ত্রণার কারণ সেও আর এখানে নেই, কারণ সে তো ইহলোকেই নেই।

"আঃ, কী সুন্দর! কী চমৎকার?" সুস্বাদু গোমাংস-চা সাজানো পরিষ্কার টেবিলটা যখন তার দিকে এগিয়ে দেওয়া হয়, রাত হলে যখন সে একটা পরিষ্কার নরম বিছানায় গা এলিয়ে দেয়, অথবা যখন তার মনে পড়ে যে ফরাসীরা চলে গেছে আর তার স্ত্রী ইহজগতে নেই, তখনই সে নিজের মনে বলে ওঠে, "আঃ, কী সুন্দর! কী চমৎকার!"

তারপর পুরনো অভ্যাসবশত নিজেকেই প্রশ্ন করে : "আচ্ছা, তারপর কি? এখন আমি কি করব?" সঙ্গে সঙ্গে নিজেই জবাব দেয়, "ঠিক আছে, আমি বাঁচব। আঃ, কী চমৎকার!"

যে প্রশ্নটি আগে তাকে যন্ত্রণা দিত, জীবনের যে লক্ষ্যকে সে অবিরাম খুঁজে বেড়াত, এখন আর সে প্রশ্ন তার সামনে নেই। জীবনের লক্ষ্যকে অনুসন্ধান করে ফেরা যে সাময়িকভাবে দূর হয়েছে তাই নয়, তার জীবনে তার কোন অস্তিত্বই আর নেই, কোনদিন থাকবে না। আর জীবনের এই

লক্ষ্যহীনতাই তাকে এনে দিয়েছে পরিপূর্ণ মুক্তির আনন্দ, সুখের অনুভূতি।

সামনে কোন লক্ষ্য নেই, কারণ এখন সে পেয়েছে বিশ্বাস—কোন বিধান বা বাণী, বা ধারণায় বিশ্বাস নয়, সে বিশ্বাস চিরজাগ্রত, চিরপ্রকাশ ঈশ্বরের প্রতি। আগে নিজের গড়া লক্ষ্যের মধ্যেও সে ঈশ্বরকেই খুঁজেছে। সেই লক্ষ্যের সন্ধান আসলে ঈশ্বরেরই সন্ধান; বন্দী অবস্থায় সহসা সে জেনেছে, কোন বাণী বা যুক্তি দিয়ে নয়, জেনেছে প্রত্যক্ষ অনুভূতি দিয়ে, সেই সত্য যা অনেককাল আগে তার ধাত্রী তাকে শুনিয়েছিল: ঈশ্বর এখানে এবং সর্বত্র বিরাজিত। বন্দী অবস্থায় সে জেনেছে, ভ্রাতৃসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত বিশ্বস্রষ্টার ধারণার চাইতে কারাতায়েভের ঈশ্বর অনেক বড়, অনন্ত ও অপরিমেয়। তার মনের অবস্থা এখন সেই মানুষের মত যে বহুদূরে দৃষ্টি মেলে কাউকে খুঁজতে গিয়ে নিজের পায়ের কাছেই তাকে দেখতে পায়। সারা জীবন চারদিকে মানুষদের মাথার উপর দিয়েই সে তার দৃষ্টিকে প্রসারিত করেছে, অথচ তার বদলে তার উচিত ছিল শুধু নিজের সামনে দৃষ্টিকে মেলে ধরা।

অতীতে সেই দূরধিগম্য অসীমকে সে কখনও খুঁজে পায় নি। শুধু অনুভব করেছে কোথাও না কোথাও সে আছে, তাই তাঁকে খুঁজে ফিরেছে। যা কিছু কাছের, যা কিছু বোধগম্য তার মধ্যে সে দেখেছে শুধু সসীমকে, ক্ষুদ্রকে, সাধারণকে, অর্থহীনকে। চোখে একটা মানস দূরবীন লাগিয়ে অনেকদূরে দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দূরত্বের কুয়াশা ঢাকা যে তুচ্ছ জাগতিক বস্তুকে দেখেছে, স্পষ্ট করে দেখতে না পারার দরুণ তাকেই মনে হয়েছে মহৎ ও অনন্ত। ইওরোপীয় জীবনযাত্রা, রাজনীতি, ভ্রাতৃসংঘ, দর্শন, বিশ্বমানবতা—সব কিছুকেই সেই একইভাবে সে দেখতে পেয়েছে। কিন্তু আজ সব কিছুর মধ্যেই সেই মহান, শাশ্বত ও অনন্তকে সে দেখতে শিখেছে, আর তাই স্বাভাবিকভাবেই দূরবীনটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চারদিকেই খুঁজে পেয়েছে সেই চিরপরিবর্তনশীল, শাশ্বত, অপরিমেয়, অনন্ত জীবনকে। দৃষ্টিকে যত কাছে নিয়ে আসছে ততই শান্তি-সুখে ভরে উঠছে হৃদয়। কিসের জন্য? এই ভয়ংকর প্রশ্ন এতদিন তার মনের মন্দিরকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু আজ সে প্রশ্নের কোন অস্তিত্ব নেই। কিসের জন্য? এই প্রশ্নের একটা সরল উত্তর এখন সর্বদাই তার মনের মধ্যে উপস্থিত: "কারণ ঈশ্বর আছেন, আর সে ঈশ্বরের ইচ্ছা না হলে মানুষের মাথার একগাছি চুলও পড়ে না।"

অধ্যায়—১৩

বাইরে থেকে দেখলে পিয়েরের বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নি। চেহারা যেমন ছিল ঠিক সেইরকমই আছে। এখনও সে আগের মতই অন্যমনস্ক;

চোখের সামনে যা থাকে তার বদলে নিজের বিশেষ কোন জিনিস নিয়েই সে ব্যস্ত থাকে। সে আগে যা ছিল এবং এখন যা হয়েছে তার মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। আগে তাকে মনে হত দয়ালু কিন্তু দুঃখী মানুষ, তাই লোকে তাকে এড়িয়ে চলত, এখন জীবনের আনন্দের একটা হাসি সর্বদাই তার ঠোঁটে লেগে থাকে, অপরের প্রতি সহানুভূতি জল্ জল্ করে তার চোখে, তার জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে একটাই প্রশ্ন—তারাও কি তার মতই পরিতুষ্ট ; তাই তার উপস্থিতিতে মানুষ এখনও আনন্দিত বোধ করে।

আগে সে কথা বলত বেশী, কথা বললেই উত্তেজিত হয়ে উঠত, কদাচিৎ অন্যের কথা শুনত ; এখন সে কদাচিৎ কথার মধ্যে ডুবে যায়, এমনভাবে মন দিয়ে অন্যের কথা শোনে যে সকলেই সাগ্রহে নিজেদের গোপন কথা তাকে বলে।

যে প্রিন্সেস কোনদিনই পিয়েরকে পছন্দ করত না, কারণ বুড়ো কাউণ্টের মৃত্যুর পর সে নিজেকে পিয়েরের উপর একটি বোঝা বলে মনে করত, কিন্তু এখন ওরিলে এসে অল্প কিছুদিন থেকেই পিয়েরকে তার ভাল লেগে গেছে। এদিকে পিয়েরও ধীরে ধীরে যেভাবে তার বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠেছে এক-জন অতি চতুর লোকও তা করতে পারত না। সে সর্বদাই প্রিন্সেসের যৌব-নের শ্রেষ্ঠ দিনগুলির স্মৃতিচারণ করত, আর তার প্রতি সহানুভূতি দেখাত। এই তিক্তহৃদয়, কঠোর, গর্বিত প্রিন্সেসটির মানবিক গুণগুলিকে বাইরে টেনে বের করাই এ ব্যাপারে পিয়েরের একমাত্র কৌশল।

প্রিন্সেস মনে মনে বলল, "খারাপ লোকের প্রভাবে না পড়ে সে যখন আমার মত লোকের সাথে মেশে, তখন তো সে খুব, খুবই সদয়।"

তার দুই চাকর তেরেন্তি ও ভাস্কাও পিয়েরের এই পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে। তাদের ধারণা, মনিব এখন অনেক সরল ও স্বাভাবিক হয়েছে। তেরেন্তি তো অনেক সময়ই তার পোশাক ছাড়িয়ে শুভরাত্রি জানাবার পরেও মনিবের বুট ও পোশাক হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে থাকে, সে নতুন করে কথা বলতে শুরু করে কিনা দেখতে। আর পিয়ের ও তেরেন্তি গল্প করতে চাইছে বুঝতে পেরে সাধারণতই তাকে আরও কিছুক্ষণ ধরে রাখে।

হয়তো জিজ্ঞাসা করত, "আচ্ছা, বল তো···তোমরা খাবার পেতে কি-ভাবে ?"

আর তেরেন্তিও বলতে শুরু করত মস্কো ধ্বংসের কথা, বুড়ো কাউণ্টের কথা, আর দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করত, অথবা পিয়েরের গল্প শুনত, আর তারপরে মনিবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে পারার সুখে ও তার প্রতি স্নেহে গদগদ হয়ে হল ঘরের দিকে চলে যেত।

যে ডাক্তার পিয়েরের চিকিৎসা করত এবং প্রতিদিন তাকে দেখতে আসত, যদিও সে মনে করত যে রোগজর্জর মানবতার স্বার্থে তার প্রতিটি

মুহূর্ত অত্যন্ত মূল্যবান, তবু সেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে পিয়েরের সঙ্গে গল্পগুজব করত।

ভাবত, "এ ধরনের লোকের সঙ্গে কথা বলে সুখ আছে; সে তো অন্য সব প্রাদেশিক লোকদের মত নয়।"

ফরাসী বাহিনীর কয়েকজন বন্দী ওরিলে থাকত। তাদের মধ্যে একজন তরুণ ইতালীয়কে ডাক্তারটি একদিন পিয়েরের সঙ্গে দেখা করাতে নিয়ে এল।

অফিসারটি প্রায়ই পিয়েরের সঙ্গে দেখা করতে আসতে লাগল, আর পিয়েরের প্রতি ইতালীয় যুবকটির অনুরাগ নিয়ে প্রিন্সেস প্রায়ই হাসি-ঠাট্টা করত।

পিয়েরের সঙ্গে দেখা করতে, তার সঙ্গে কথা বলতে, তার নিজের অতীত জীবনের কথা, বাড়ির কথা, ভালবাসার কথা বলতে পারলেই ইতালীয় যুবকটি খুব আনন্দ পেত। ফরাসীদের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে মনের ক্ষোভ ঢালতে পারলে সে খুব খুশি হত।

একদিন সে পিয়েরকে বলল, "সব রুশ যদি তিলমাত্রও আপনার মতই হয়, তাহলে তো এরকম একটা জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মহাপাপ। ফরাসী-দের হাতে আপনি এত কষ্ট সয়েছেন, অথচ তাদের প্রতি কোন শত্রুতা আপনি মনের মধ্যে পোষণ করেন না।"

শুধু ইতালীয় যুবকটির অন্তরের সৎগুণগুলিকে উদ্বুদ্ধ করে এবং সেকাজে আনন্দ অনুভব করেই পিয়ের যুবকটির উচ্ছ্বসিত অনুরাগ অর্জন করতে পেরেছে।

ওরিলে অবস্থানের শেষের দিকে ভ্রাতৃসংঘের একজন পূর্ব পরিচিত ভাই কাউণ্ট উইলার্স্কি পিয়েরের সঙ্গে দেখা করতে এল। ওরিল প্রদেশের একটা বড় জমিদারির এক উত্তরাধিকারিণীকে সে বিয়ে করেছে এবং সেই শহরে কমিসারিয়েট বিভাগে একটি অস্থায়ী চাকরিও জুটিয়ে নিয়েছে।

আগেকার দিনে টাকাপয়সার ব্যাপার নিয়ে, বিশেষ করে কেউ টাকা-পয়সা চাইতে এলে পিয়ের বড়ই বিপদে পড়ে যেত। নিজেকে প্রশ্ন করত, "দেব কি দেব না? আমার টাকাটা আছে, আর তার ওটা দরকার। কিন্তু অন্য কারও দরকার তো আরও বেশী। কার দরকার সব চাইতে বেশী? আর হয় তো দুজনই জোচ্চোর।" পুরনো দিনগুলোতে এইসব প্রশ্নের সামনে সে বড়ই অসহায় বোধ করত, আর যতক্ষণ দেবার মত কিছু থাকত ততক্ষণ যে এসে চাইত তাকেই দিয়ে দিত। সে সময় সম্পত্তির ব্যাপারে কোন প্রশ্ন দেখা দিলেই এক একজন এক একরকম পরামর্শ দিত, আর সে বড়ই বিপাকে পড়ে যেত।

কিন্তু এখন সে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করছে যে এসব প্রশ্ন নিয়ে তার মনে এখন আর কোন সন্দেহ বা বিহ্বলতা নেই। তার মধ্যে এখন এমন একজন

বিচারক আসন পেতে বসেছে যে তার কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এক বিধানের বলে কি করা উচিত আর কি করা উচিত নয় সেটা মুহূর্তেই স্থির করে দেয়।

এই নতুন বিচারকের আশ্রয় সে প্রথম লাভ করল যখন জনৈক ফরাসী বন্দী, একজন কর্ণেল, তার কাছে এল, অনেক বড় বড় কথা বলল, এবং এই বলে শেষ করল যে তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েকে পাঠাবার জন্য তাকে চার হাজার ফ্রাঁ পিয়েরকে দিতেই হবে। তিল মাত্র অসুবিধা বোধ বা প্রচেষ্টা ছাড়াই পিয়ের টাকাটা দিতে অস্বীকার করল, আর পরে এই ভেবে বিস্মিত হল যে আগে যে-কাজটা ছিল প্রায় দুঃসাধ্য এখন সেটা কত সহজ ও সরলভাবে হয়ে গেল। জাগতিক ব্যাপারে তার এই স্থির সিদ্ধান্তের মনোভাবের আর একটা প্রমাণ পিয়ের পেল তার স্ত্রীর ঋণ শোধ এবং মস্কোতে ও শহরতলীতে তার বাড়িঘরগুলি নতুন করে তৈরি করা সম্পর্কে তার সিদ্ধান্তকে লক্ষ্য করে।

তার বড় নায়েব ওরিলে এসে পিয়েরের সঙ্গে দেখা করল। তার সঙ্গে বসে পিয়ের নিজের স্বল্প আয়ের হিসাব করল। বড় নায়েবের হিসাব মত মস্কোর অগ্নিকাণ্ডের ফলে তার ক্ষতি হয়েছে প্রায় বিশ লক্ষ রুবল।

এই ক্ষতির জন্য সান্ত্বনা জানাতে প্রধান নায়েব তাকে হিসাব কষে দেখিয়ে দিল যে এইসব ক্ষতি সত্ত্বেও তার আয় হ্রাস না পেয়ে বরং আরও বৃদ্ধি পেতে পারে যদি সে তার স্ত্রীর ঋণ শোধ করতে অস্বীকার করে,—সে ঋণ শোধ করার কোন বাধ্যবাধকতা তার নেই—এবং তার মস্কোর বাড়ি এবং মস্কোর জমিদারিতে অবস্থিত পল্লীভবনটি নতুন করে তৈরি না করে; সেই-সব বাড়ির জন্য তার বছরে ব্যয় হয় আশী হাজার রুবল, অথচ উপার্জন হয় না কিছুই।

স্মিত হাসির সঙ্গে পিয়ের বলল, "হ্যাঁ, সেকথা সত্যি। সেসবের আমার কোন প্রয়োজন নেই। সর্বস্বান্ত হয়ে আমি অধিকতর ধনী হয়েছি।"

কিন্তু জানুয়ারি মাসে সা ভেলিচ মস্কো থেকে এসে সেখানকার পরিস্থিতির একটা বিবরণ দিল এবং মস্কোর বাড়ি ও পল্লীভবন পুনরায় নির্মাণের দরুণ জনৈক স্থপতির একটা হিসাব দিয়ে বলল যে সে কাজ করার ব্যবস্থাটা পাকা হয়ে গেছে। সেইসময়ই প্রিন্স ভাসিলি এবং পিতার্সবুর্গের অন্য পরিচিত জনরা চিঠি লিখে তার স্ত্রীর ঋণের কথাটা জানিয়ে দিল। আর পিয়েরও স্থির করে ফেলল যে, নায়েবের যে প্রস্তাব তাকে এত খুশি করেছিল সেটা ছিল ভুল। কাজেই সে অবিলম্বে পিতার্সবুর্গ যাবে এবং স্ত্রীর ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলবে, আর মস্কোতে বাড়িঘরও নতুন করে তৈরি করবে। সেটা যে কেন প্রয়োজন তা জানে না, কিন্তু এটা সে নিশ্চিত জানে যে কাজটা প্রয়োজনীয়। এতে তার আয় তিন-চতুর্থাংশ হ্রাস পাবে, কিন্তু এটা অবশ্য করতে হবে।

উইলার্স্কি'ও মস্কো যাচ্ছিল ; স্থির হল দুজন একসঙ্গেই যাবে।

ওরিলে স্বাস্থ্যোদ্ধারের সময় আনন্দ, মুক্তি ও জীবনের একটা অনুভূতি পিয়েরের হয়েছিল ; কিন্তু এবার যাত্রাপথে খোলা পৃথিবীতে এসে, শত শত নতুন মুখ দেখে, সেই অনুভূতি তীব্রতর হল। সারা পথ তার নিজেকে ছুটি-পাওয়া স্কুলের ছাত্রের মত মনে হতে লাগল। সরকারী গাড়ির কোচয়ান, ডাক-ঘাঁটির ওভারসিয়ার, রাস্তার ও গ্রামের চাষীর দল,—সব কিছুই তার কাছে নতুন করে অর্থবহ হয়ে উঠল। উইলার্স্কি অনবরত ইওরোপের তুলনায় রাশিয়ার অজ্ঞানতা, দারিদ্র্য ও অনগ্রসরতার নিন্দা করতে লাগল ; তবু তার উপস্থিতি ও মন্তব্য পিয়েরের আনন্দকে শুধু বাড়িয়েই তুলল। উইলার্স্কি যেখানে দেখে মৃত্যু, পিয়ের সেখানেই দেখে অসাধারণ জীবনী-শক্তি—যে শক্তি এই বরফাবৃত বিস্তীর্ণ প্রান্তরের বুকে এই মৌলিক, বিচিত্র, অসাধারণ মানুষগুলির জীবনকে রক্ষা করছে। উইলার্স্কির কথার কোন প্রতিবাদ সে করল না, বরং তার সঙ্গে একমতই হল—যে আলোচনা শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হবে না তাকে এড়িয়ে চলবার সহজতম পথই হল আপাতত একমত হওয়া—আর তার কথা শুনতে শুনতে পিয়ের আনন্দের হাসি হাসতে লাগল।

অধ্যায়—১৪

পিঁপড়ের ঢিপি ভেঙে দিলে পিঁপড়েরা ছুটোছুটি করে কোথায় যায়, কেন যায়, সেকথা বোঝা শক্ত : কেউ ঢিপি থেকে বেরিয়ে আসে আজেবাজে জিনিস, ডিম ও মরা পিঁপড়ে পিঠে নিয়ে, কেউ বা আবার ফিরে যায় ঢিপিতে ; কেনই বা তারা ঠেলাঠেলি করে, একে অন্যকে ছাড়িয়ে যায়, লড়াই করে। ঠিক সেইরকমই ফরাসীরা চলে যাবার পরে কেন যে রুশরা পুরনো মস্কোতে গিয়ে ভিড় করল তাও বোঝা খুব শক্ত। কিন্তু যখনই আমরা ভেঙে-যাওয়া ঢিপির চারপাশে পিঁপড়েদের ভিড় করতে দেখি, লক্ষ্য করি তাদের অধ্যবসায়, শক্তি ও সংখ্যার আধিক্য তখনই বুঝতে পারি, ঢিপি ভেঙে যাওয়া সত্ত্বেও অবিনশ্বর ও স্পর্শাতীত এমন কিছু তখনও থেকে যায় যা পিঁপড়ে-উপনিবেশকে শক্তি যোগায় ; আর ঠিক সেইভাবেই যদিও অক্টোবর মাসে মস্কোতে কোন রকম শাসন-ব্যবস্থা ছিল না, গির্জা ছিল না, তীর্থস্থান ছিল না, ধনসম্পদ বা বাড়িঘরও ছিল না, তবুও সেটা ছিল অগস্ট মাসের সেই একই মস্কো। তখন সবই ধ্বংস হয়ে গেছে, কিন্তু এমন কিছু ধ্বংস হয় নি যা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে হয়েও অত্যন্ত শক্তিশালী ও অবিনশ্বর।

শত্রুমুক্ত হবার পরে যে প্রেরণায় সকলে চারদিক থেকে এসে মস্কোতে ভিড় করল তা ছিল যেমন ভিন্ন ভিন্ন তেমনই ব্যক্তিগত, আর গোড়ায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বর্বর ও পাশবিক। তবে একটা প্রেরণা সকলের মধ্যেই সমান-

ভাবে কাজ করছিল : যে স্থানটিকে একদা মস্কো বলা হত সেখানে পৌছে নিজেদের সাধ্যমত সেখানে কাজ করার বাসনা।

এক সপ্তাহের মধ্যে পনেরো হাজার অধিবাসী মস্কোতে হাজির হল, পক্ষকালের মধ্যে এল পঁচিশ হাজার ; এইভাবেই চলতে লাগল। ১৮১৩ সালের হেমন্তকালে সেই সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে ১৮১২ সালের লোকসংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেল।

প্রথম দফায় মস্কোতে ঢুকল উইন্স জিন্‌গেরোদের সেনাদলের কসাকরা, নিকটবর্তী গ্রামের চাষীরা, আর মস্কোর যেসব অধিবাসী পালিয়ে গিয়ে কাছাকাছি কোথাও লুকিয়েছিল। মস্কোতে ঢুকে রুশরা যখন দেখল যে সব লুট হয়ে গেছে, তখন তারাও লুটপাট শুরু করে দিল। ফরাসীরা যেকাজ শুরু করেছিল সেটাই তারা চালিয়ে যেতে লাগল। বিধ্বস্ত বাড়িঘরে ও রাজ-পথে যা কিছু পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়েছিল সেগুলি গ্রামে বয়ে নিয়ে যাবার জন্য দলে দলে মালগাড়ি মস্কোতে আসতে লাগল। কসাকরা যা পারল তাদের শিবিরে নিয়ে গেল, অধিবাসীরা অন্য বাড়ির জিনিসপত্র নিয়ে নিজেদের বোঝাই করতে লাগল, যেন সেগুলো তাদেরই সম্পত্তি।

প্রথম লুটেরাদের পরে এল দ্বিতীয় লুটেরা দল, তারপর তৃতীয় দল ; এমনি করে দল বাড়তে বাড়তে লুট করাটা ক্রমেই শক্ত হয়ে পড়ল, আর তাই সেকাজটা আরো সরাসরিভাবে শুরু হয়ে গেল।

ফরাসীরা মস্কোকে পেয়েছিল পরিত্যক্ত অবস্থায়, কিন্তু তখনও তারা পেয়েছিল ব্যবসা-বাণিজ্য ও নানাবিধ শিল্পকর্ম সমন্বিত নিয়মিত জীবনযাত্রার সব রকম ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান, পেয়েছিল বিলাসের উপকরণ এবং সরকারী ও ধর্মীয় নানা প্রতিষ্ঠান। সেসব ব্যবস্থাই তখন নিষ্প্রাণ, তবু তো তাদের অস্তিত্ব ছিল। বাজার ছিল, দোকান ছিল, মালগুদাম ছিল, শস্য ভাণ্ডার ছিল—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলি মালপত্র বোঝাই ছিল—ছিল ছোট-বড় কারখানা, বিলাসদ্রব্যে ভর্তি বড় বড় প্রাসাদ ও সম্পন্ন বাড়িঘর, হাসপাতাল, কারাগার, সরকারী আপিস, গির্জা ও ভজনালয় ফরাসীরা যত বেশী দিন থাকল ততই শহর-জীবনের এইসব সুখ-সুবিধা লোপ পেতে লাগল ; আর শেষ পর্যন্ত সব কিছু তালগোল পাকিয়ে লুট-তরাজের একটা নিষ্প্রাণ দৃশ্যে পরিণত হল।

ফরাসীদের লুটতরাজ যত চলতে থাকল ততই মস্কোর ধন-সম্পত্তি এবং লুটেরাদের শক্তি ক্ষয় হয়ে যেতে লাগল। কিন্তু শহর পুনর্দখলের পরে রুশদের হাতে যে লুটতরাজ শুরু হল তার ফল হল বিপরীত : সে লুটতরাজ যত বেশী দিন ধরে চলতে থাকল আর লুটেরাদের সংখ্যা যতই বাড়তে লাগল ততই শহরের ধনসম্পত্তি ও নিয়মিত জীবনযাত্রা দ্রুততর গতিতে পুনর্গঠিত হতে লাগল।

লুটেরা ছাড়াও নানা ধরনের মানুষ মস্কোতে ফিরে এল ; কেউ এল

কৌতূহলবশে, কেউ এল সরকারী কর্তব্যের তাগিদে, কেউ এল নিজের স্বার্থের টানে; বাড়ির মালিক, পাদরি, নানা রকমের সরকারী কর্মচারি, ব্যবসায়ী, মিস্ত্রি, চাষীরা—সকলেই সারা শরীরের রক্ত যেভাবে হৃদপিণ্ডে ছুটে যায় সে ভাবে জলস্রোতের মত মস্কোর দিকে ধেয়ে আসতে লাগল।

যেসব চাষীরা লুটের মাল বয়ে নিয়ে যাবার জন্য খালি গাড়ি নিয়ে এসেছিল, এক সপ্তাহের মধ্যেই কর্তৃপক্ষ তাদের থামিয়ে সেই সব গাড়িতে করে মৃতদেহগুলি শহরের বাইরে পাঠাতে লাগল অন্য চাষীরা বন্ধুদের এই মুশকিলের খবর পেয়ে যই, যব ও খড় নিয়ে শহরে এল এবং রেশারেশি করে সে সব জিনিসের দাম আগের চাইতেও কমিয়ে দিল। ছুতোর মিস্ত্রিরা বেশী মজুরীর আশায় প্রতিদিন দলে দলে মস্কোতে আসতে লাগল; চারদিকেই শুরু হল কাঠ চেরাই, নতুন বাড়ি তৈরি, আর পুরনো পোড়া বাড়ির মেরামতের কাজ। ব্যবসায়ীরা বাজার চালু করল। আধপোড়া বাড়িগুলোতে হোটেল ও মদের দোকান খোলা হল যেসব গির্জা পুড়ে যায় নি সেখানে পাদরিরা ভজন-পূজন শুরু করে দিল। গির্জার যেসব সম্পত্তি চুরি হয়ে গিয়েছিল দাতারা সেগুলি নতুন করে দান করল। সরকারী কর্মচারিরা তাদের কাজের টেবিল সাজিয়ে বসল। ফরাসীরা যেসব মালপত্র ফেলে গিয়েছিল উর্ধ্বতন কর্মচারি ও পুলিশ মিলে সেগুলো ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দিল। যেসব বাড়িতে অন্য সব বাড়ি থেকে এনে মালপত্র বোঝাই করা হয়েছিল তার মালিকরা বলতে লাগল, সব জিনিস নিয়ে ক্রেমলিনের প্রাসাদে মজুত করাটা অন্যায়। আবার অন্য একদল বলতে লাগল, ফরাসীরা নানা বাড়ি থেকে মালপত্র এনে যেসব বাড়িতে মজুত করেছিল তার মালিকদের সে সব মালপত্রের মালিকানা দেওয়াটা অন্যায়। তারা পুলিশকে গালাগালি করল, তাদের ঘুষ দিল, আগুনে যেসব সরকারী গুদাম পুড়ে গিয়েছিল তার দামের পরিমাণ দশগুণ বাড়িয়ে নিয়ে সরকারী সাহায্যের দাবী জানাল। আর কাউণ্ট রস্তপ্‌চিন ঘোষণা-পত্র লিখে চলল।

অধ্যায়—১৫

জানুয়ারির শেষে পিয়ের মস্কোতে গেল। তার বাড়ির সংলগ্ন যে অংশটা পোড়ে নি সেখানেই উঠল। কাউণ্ট রস্তপ্‌চিন ও অন্য কয়েকজন পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা করল। মনের ইচ্ছা, দিন দুই পরে পিতার্সবুর্গ যাত্রা করবে। বিধ্বস্ত কিন্তু নতুন করে গড়ে-ওঠা শহরের সকলেই বিজয়-উৎসবে ব্যস্ত; সব কিছুই যেন নব জীবনের উত্তাপে টগ্‌বগ্‌ করছে। পিয়েরকে দেখে সকলেই খুশি, সকলেই তার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক. সকলেই জানতে চায় তার অভিজ্ঞতার কথা। পিয়েরও সকলের প্রতিই প্রসন্ন, আবার পাছে কোথাও বাঁধা পড়ে যায় সেই আশংকায়ও সদাসতর্ক। গুরুত্বপূর্ণ বা

তুচ্ছ যে প্রশ্নই তাকে করা হয়, যেমন—সে এখন কোথায় থাকবে ? নতুন করে বাড়িঘর তুলবে কি না ? পিতার্সবুর্গে কবে যাবে, আর কারও জন্যে একটা পুলিন্দা নিয়ে যেতে পারবে কি ?—সব প্রশ্নেরই তার একই জবাব : "হ্যাঁ, হয় তো," অথবা "তাই তো মনে হয়," ইত্যাদি।

সে শুনেছে, রস্তভরা এখন কস্ত্রমাতে আছে, কিন্তু নাতাশার কথা কদাচিৎ তার মনে পড়ে। মনে পড়লেও সেটা দূর অতীতের একটা মধুর স্মৃতিমাত্র।

আসার তিনদিন পরে দ্রুবেৎস্কয়দের কাছে শুনল, প্রিন্সেস মারি মস্কোতেই আছে। প্রিন্স আন্দ্রুর মৃত্যু, যন্ত্রণা ও শেষের দিনগুলির কথা প্রায়ই তার মনে পড়ে ; এখন যেন সে স্মৃতি স্পষ্টতর হয়ে দেখা দিল। প্রিন্সেস মারি মস্কোতে ভজ্‌দ্‌ভিজেংকা স্ট্রীটের বাড়িতেই—বাড়িটা পোড়ে নি—আছে শুনে সেই সন্ধ্যায়ই তার সঙ্গে দেখা করতে গেল।

যেতে যেতে পিয়ের ভাবতে লাগল প্রিন্স আন্দ্রুর কথা, তাদের বন্ধুত্ব, বিভিন্ন সময়ে তাদের সাক্ষাৎ, বিশেষ করে বরদিনোতে তাদের শেষ সাক্ষাতের কথা। সে ভাবতে লাগল : "এও কি সম্ভব যে মনের সেই তিক্ততা নিয়েই সে মারা গেছে ? এও কি সম্ভব যে মৃত্যুর আগেও জীবনের অর্থ তার কাছে প্রকাশিত হয় নি ?" তার মনে পড়ল কারাতায়েভ ও তার মৃত্যুর কথা। আপনা থেকেই এই দুটি মানুষের একটা তুলনা তার মনে এল ; এরা দুজন কত আলাদা, অথচ তাদের মধ্যে মিলও কত : দুজনই বেঁচে ছিল, দুজনই মারা গেছে, আর তাদের দুজনকেই সে ভালবেসেছে।

বেশ বিষণ্ণ মনেই পিয়ের বুড়ো প্রিন্সের বাড়িতে পৌঁছে গেল। বাড়িটার অনেক ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু চেহারাটা পাল্টায় নি। পুরনো পরিচারকটি জানাল, প্রিন্সেস তার ঘরে চলে গেছে, আর রবিবারেই সে লোকজনদের সঙ্গে দেখা করে থাকে।

পিয়ের বলল, "আমার নাম করে বল। হয় তো তিনি দেখা করবেন।"

লোকটি বলল, "ঠিক আছে স্যার। দয়া করে ছবির ঘরটায় আসুন।"

কয়েক মিনিট পরে পরিচারক দেসালেসকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল। দেসালেস জানাল, পিয়ের যদি আনুষ্ঠানিক রীতির অভাব ক্ষমা করে দোতলায় তার ঘরে যায় তাহলে প্রিন্সেস সানন্দে তার সঙ্গে দেখা করবে।

একটা নীচু ঘরে একটিমাত্র মোমবাতির আলোয় প্রিন্সেস বসে আছে ; তার সঙ্গে আছে কালো পোশাক পরা আরও একজন। পিয়েরের মনে পড়ল, প্রিন্সেস সব সময়ই সঙ্গিনী নিয়ে থাকে ; তবে তারা কারা আর কি রকম প্রকৃতির তা সে জানে না, মনেও নেই। কালো পোশাক পরা মহিলাটির দিকে তাকিয়ে সে ভাবল, "নিশ্চয়ই প্রিন্সেসের কোন সঙ্গিনী।"

প্রিন্সেস তাড়াতাড়ি উঠে হাতটা বাড়িয়ে দিল।

পিয়ের তার হাতে চুমো খাবার পরে তার পরিবর্তিত মুখের দিকে

তাকিয়ে প্রিন্সেস বলল, "আচ্ছা, তাহলে এইভাবেই আবার আমাদের দেখা হল। শেষ পর্যন্তও সে আপনার কথাই বলত।"

"আপনার নিরাপদে থাকার খবর পেয়ে আমি খুব খুশি হয়েছিলাম। অনেকদিন পরে সেই প্রথম একটা সুখবর পেয়েছিলাম।"

কেমন যেন একটা অস্বস্তির সঙ্গে প্রিন্সেস সঙ্গিনীর দিকে তাকাল। তারপর আরও কিছু বলতে যাবার মুখেই পিয়ের তাকে বাধা দিল।

"ভাবুন তো—তার কথা আমি কিছুই জানতাম না! ভেবেছিলাম সে যুদ্ধে মারা গেছে। যা কিছু জেনেছি অন্যের মুখ থেকে শুনে জেনেছি। শুধু জানি যে রস্তভদের সঙ্গে তার একটা মনোমালিন্য ঘটেছিল···কী আশ্চর্য যোগাযোগ!"

পিয়ের উৎসাহের সঙ্গে দ্রুত কথা বলতে লাগল। একবার সঙ্গিনীটির মুখের দিকে তাকাল, দেখল তার সদয় ও সমনোযোগ দৃষ্টি তার উপরেই নিবদ্ধ; কেন যেন পিয়েরের মনে হল, কালো পোশাকের এই মানুষটি খুবই সদয় ও ভাল; তার সামনে প্রিন্সেস মারির সঙ্গে খোলাখুলিভাবে সব কথা বলা চলে।

কিন্তু সে যখন রস্তভদের কথা বলল তখন প্রিন্সেস মারির মুখে একটা বিব্রতভাব ফুটে উঠল। তাড়াতাড়ি পিয়েরের মুখের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে সে কালো পোশাকের মহিলাটির দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি কি সত্যি ওকে চিনতে পারেন নি?"

পিয়ের আর একবার সঙ্গিনীটির বিবর্ণ নরম মুখের দিকে তাকাল; তার কালো চোখের সাগ্রহ দৃষ্টির ভিতর দিয়ে দীর্ঘবিস্মৃত, মধুরতর, বড়ই প্রিয় কে যেন তার দিকে তাকিয়ে আছে।

ভাবল, "কিন্তু না, তা হতে পারে না। এই কঠোর, শীর্ণ, বিবর্ণ মুখে যে অনেক বেশী বয়সের ছায়া! এ তো সে হতে পারে না। শুধু একে দেখে তার কথা আমার মনে পড়ছে।" কিন্তু সেইমুহূর্তে প্রিন্সেস মারি ডাকল "নাতাশা!" আর অনেক কষ্টে, অনেক চেষ্টায়, অনেক যত্নে মরচে-ধরা কব্জাওয়ালা দরজা খুলে যাওয়ার মত সে মুখে একটু হাসি খেলে গেল, আর সেই খোলা দরজা দিয়ে একঝলক সুগন্ধ এসে এমন সুখে পিয়েরের মনকে ভরে দিল যা সে অনেকদিন হল ভুলে গেছে, আর—অন্তত এইমুহূর্তে—যার কথা সে চিন্তাও করে নি। সে সুখ তার মনকে ভরে দিল, তাকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে দিল। সে ঈষৎ হাসল; আর কোন সন্দেহ রইল না; এই তো নাতাশা; তাকে সে ভালবাসে।

সেইমুহূর্তে নাতাশার কাছে, প্রিন্সেস মারির কাছে, সর্বোপরি নিজের কাছে আপনা থেকেই পিয়ের এমন একটা গোপন কথাকে প্রকাশ করে বসল যার খবর সে নিজেই জানত না। আনন্দে ও যন্ত্রণায় তার মুখটা লাল হয়ে

উঠল। মনের উত্তেজনাকে চেপে রাখতে চেষ্টা করল। কিন্তু লুকিয়ে রাখার যত চেষ্টা করতে লাগল ততই স্পষ্টতর ভাবে—ভাষার অতীত স্পষ্টতায়—এই সত্যকেই সে নিজের কাছে, নাতাশার কাছে, ও প্রিন্সেস মারির কাছে প্রকাশ করে দিল যে সে নাতাশাকে ভালবাসে।

পিয়ের ভাবল, "এ যে বড়ই অপ্রত্যাশিত।" পুনরায় প্রিন্সেস মারির সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে আবারও সে নাতাশার দিকেই দৃষ্টি ফেরাল, আর গাঢ়তর রঙে রাঙা হয়ে উঠল তার মুখ, আনন্দ ও শংকা মিশ্রিত অধিকতর শক্তিশালী একটা উন্মাদনা তার অন্তরকে চেপে ধরল। তার কথাবার্তা কেমন গোলমেলে হয়ে গেল; কথার মাঝখানেই সে থেমে গেল।

পিয়ের প্রথমে নাতাশাকে খেয়াল করে নি, কারণ এখানে তাকে দেখতে পাবে এটা সে আশাই করে নি; তাকে যে চিনতে পারে নি তার কারণ তার সঙ্গে শেষ দেখার পরে নাতাশার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সে অনেক শীর্ণ, বিবর্ণ হয়ে গেছে, কিন্তু তাকে চিনতে না পারার কারণ সেটা নয়; তাকে যে চিনতে পারা যায় নি তার কারণ যে মুখের দুটি চোখে সব সময়ই ঝিলিক দিত জীবনানন্দের একটা চাপা হাসি, এখন প্রথম দর্শনের মুহূর্তে সে মুখে সেই হাসির ছায়ামাত্র ছিল না: ছিল শুধু সাগ্রহ মনোযোগ আর বিষণ্ণ জিজ্ঞাসা।

পিয়েরের বিব্রত ভাবটা কিন্তু নাতাশার মুখে প্রতিফলিত হল না; একটা আনন্দের আভায় তার সারা মুখটা ঈষৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

অধ্যায়—১৬

প্রিন্সেস মারি বলল, "ও আমার কাছে থাকতে এসেছে। কাউন্ট ও কাউন্টেসও কয়েকদিনের মধ্যেই এখানে এসে পড়বেন। কাউন্টেসের অবস্থা শংকাজনক। কিন্তু নাতাশার নিজেরও ডাক্তারকে দেখানো দরকার ছিল। তাই তারা ওকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

নাতাশাকে সম্বোধন করে পিয়ের বলল, "ঠিক, আজকাল দুঃখ ছাড়া একটিও পরিবার আছে কি? জানেন তো, যেদিন আমরা উদ্ধার পেলাম সেইদিনই ঘটনাটি ঘটল। তাকে আমি দেখেছি। কী যে আনন্দঘন মূর্তি ছেলেটির!"

নাতাশা চোখ তুলে তাকাল; চোখ দুটি বিস্ফারিত ও উজ্জ্বল হয়েই যেন তার কথার জবাব দিল।

পিয়ের বলল, "সান্ত্বনার বাণী কিই বা শোনাব? কিছু বলার নেই। এ-রকম একটি প্রাণোচ্ছল চমৎকার ছেলেকে কেনই বা মরতে হল?"

"ঠিক, এখনকার দিনে বিশ্বাস ছাড়া বাঁচা বড় শক্ত," প্রিন্সেস মারি বলল।

তাকে বাধা দিয়ে পিয়ের তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "ঠিক, ঠিক, খুব ঠিক কথা।"

পিয়েরের চোখে সাগ্রহ দৃষ্টি রেখে নাতাশা শুধাল, "কেন ঠিক?"

প্রিন্সেস মারি বলল, "কেন তাও জিজ্ঞাসা করছ? ভবিষ্যতের কথা ভাবলেই…"

প্রিন্সেস মারির কথা শেষ হওয়ার জন্য অপেক্ষা না করেই নাতাশা আবার সাগ্রহে পিয়েরের দিকে তাকাল।

পিয়ের বলতে লাগল, "কারণ আমাদের সকলের উপরে একজন ঈশ্বর আছেন এ বিশ্বাস যার আছে একমাত্র সেই ওর… এবং আপনার এতবড় ক্ষতিকে সহ্য করতে পারে।"

কি যেন বলতে মুখ খুলেও নাতাশা হঠাৎ থেমে গেল। পিয়ের তাড়াতাড়ি মুখটা ঘুরিয়ে প্রিন্সেস মারির কাছে জানতে চাইল বন্ধুর শেষের দিনগুলির কথা।

পিয়েরের বিব্রত ভাবটা এখন সম্পূর্ণ কেটে গেছে, কিন্তু সেই সঙ্গে সে এটাও বুঝতে পারছে যে তার স্বাধীনতাও সম্পূর্ণ চলে গেছে। সে বুঝতে পারছে, তার প্রতিটি কথা ও কাজের এমন একজন বিচারক এখন এসেছে যার বিচার তার কাছে পৃথিবীর অন্য সকলের বিচারের চাইতে অধিক মূল্যবান। এখন কথা বলতে গেলেই সে ভাবছে তার কথা নাতাশার মনে কোন ভাবের সৃষ্টি করবে। সে যে ইচ্ছা করে নাতাশাকে খুশি করতে কথা বলছে তা নয়, কিন্তু সে যা কিছু বলছে নাতাশার দৃষ্টিকোণ থেকেই বলছে।

প্রিন্স আন্‌দ্রুকে যে অবস্থায় দেখতে পেয়েছিল সেই কথাই প্রিন্সেস মারি বলতে শুরু করল। কিন্তু পিয়েরের আধো-কম্পিত মুখ, তার প্রশ্ন, তার উৎকণ্ঠ চঞ্চল ভাব ধীরে ধীরে প্রিন্সেস মারিকে বাধ্য করল বিস্তারিত বিবরণ দিতে, যদিও সে বিবরণকে স্মরণে আনতে তার নিজেরই ভয় করে।

সমস্ত শরীরটাকে তার দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে তার কাহিনীকে সাগ্রহে শুনতে শুনতে পিয়ের বার বার বলতে লাগল, "ঠিক, ঠিক, আর তাই…?" "ঠিক, ঠিক, সে ক্রমেই শান্ত ও নরম হয়ে উঠল? সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে সর্বদা একটা জিনিসই তো সে চেয়েছে—পরিপূর্ণ ভাল হতে—সুতরাং মৃত্যুকে সে ভয় করতে পারে না। যেটুকু দোষ তার ছিল—যদি কোন দোষ আদপেই থেকে থাকে—তাও তার নিজের তৈরি নয়। তাহলে সে নরম হয়েছিল?…" সহসা নাতাশার দিকে ফিরে অশ্রুসিক্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, "…কী সুখের কথা যে সে আপনাকে আবার দেখতে পেয়েছিল।"

নাতাশার মুখটা কুঁচকে গেল। চোখে ভ্রূকুটি দেখা দিল। একমুহূর্তের

জন্য চোখ নামিয়ে নিল। কথা বলবে কি বলবে না ভেবে ইতস্তত করতে লাগল।

তারপর শান্ত চাপা স্বরে বলল, "হ্যাঁ, সত্যি বড় সুখের। আমার কাছে সত্যি সুখের।" একটু থেমে বলল, "আর সে···সে···সে বলেছিল আমার ঘরে ঢোকার মুহূর্ত থেকেই সে এটা চাইছিল···"

নাতাশার গলা থেমে গেল। মুখ লাল হয়ে উঠল, দুই হাত এক করে হাঁটুটাকে চেপে ধরল, তারপর বেশ চেষ্টা করে নিজেকে সংযত করে মাথাটা তুলে দ্রুত কথা বলতে লাগল।

"মস্কো থেকে যখন যাত্রা করি তখন এর কিছুই আমরা জানতাম না। তার কথা জিজ্ঞাসা করার সাহসও হয় নি। তারপর হঠাৎ সোনিয়াই বলল যে সে আমাদের সঙ্গেই যাচ্ছে। তার তখনকার অবস্থা সম্পর্কে আমার কোন ধারণা ছিল না, সে অবস্থা আমি কল্পনাও করতে পারি নি। আমি শুধু চেয়েছিলাম তাকে দেখতে, তার সঙ্গে থাকতে।" ঘন ঘন শ্বাস টেনে অতি দ্রুত সে কথাগুলি বলল।

তারপর সে একটানা বলে গেল সেই সব কথা যা সে আজ পর্যন্ত আর কাউকে বলে নি—তাদের তিন সপ্তাহব্যাপী পথযাত্রা এবং ইয়ারোস্লাভ্‌ল্-এর জীবনযাত্রায় সব অভিজ্ঞতার কথা।

অশ্রুসিক্ত চোখ দুটি নাতাশার উপর স্থির রেখে পিয়ের হাঁ করে সব কথা শুনল। শুনতে শুনতে প্রিন্স আন্দ্রু, বা মৃত্যু, বা তার কথা—কোন কিছু নিয়েই সে কিছু ভাবল না। শুধুই তার কথাগুলি শুনল, আর কথা বলতে বলতে যে যন্ত্রণা সে ভোগ করছে সেজন্য তার প্রতি করুণা বোধ করতে লাগল।

নাতাশার পাশে বসে প্রিন্সেস মারিও এই প্রথম শুনল তার দাদার শেষের দিনগুলি ও নাতাশার ভালবাসার কথা।

স্পষ্টতই সেই বেদনাদীর্ণ অথচ আনন্দময় কাহিনী বলা নাতাশার পক্ষে খুবই প্রয়োজন ছিল।

অন্তরের গোপনতম কথার সঙ্গে অতি তুচ্ছ বিবরণকে মিশিয়ে সে কথাগুলি বলতে লাগল; মনে হল, তার কথা বুঝি কোনদিন শেষ হবে না। অনেক সময়ই একই কথা দু'বার করে বলতে লাগল।

দরজার বাইরে দেসালেসের গলা শোনা গেল; সে জানতে চাইছে, ছোট্ট নিকলাস ঘরে ঢুকে শুভ রাত্রি জানাতে পারে কি না।

"আচ্ছা, এই সব—সব কথা," নাতাশা বলল।

নিকলাস ঢুকতেই তাড়াতাড়ি উঠে সে প্রায় দৌড়ে পর্দার আড়ালে ঢাকা দরজাটার দিকে গেল, দরজায় মাথাটা ঠুকে গেল, ব্যথায় বা দুঃখে আর্তনাদ করে সে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পিয়ের একদৃষ্টিতে দরজাটার দিকে তাকিয়ে রইল; এই পৃথিবীতে

সহসা কেন যে তার নিজেকে একেবারে একা মনে হল তা সে বুঝতে পারল না।

প্রিন্সেস মারিই তার অন্যমনস্কতা ভেঙে দিয়ে ভাইপোটির প্রতি তার মনোযোগ আকর্ষণ করল।

সেই আবেগের মুহূর্তে ছোট্ট নিকলাসের মুখের সঙ্গে তার বাবার মুখের বড় বেশী মিল দেখে পিয়ের এতদূর অভিভূত হয়ে পড়ল যে ছেলেটিকে চুমো খাবার পরেই সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল, পকেট থেকে রুমালটা বের করে জানালার কাছে চলে গেল। তখনই প্রিন্সেস মারির কাছ থেকে বিদায়ও নিতে চাইল, কিন্তু সে তাকে ছাড়ল না।

"না, অনেক সময়ই নাতাশা ও আমি দুটোর আগে ঘুমতে যাই না, কাজেই আপনি দয়া করে যাবেন না। খাবার দিতে বলছি। আপনি নীচে যান, আমরা এখনি আসছি।"

পিয়ের ঘর থেকে যাবার আগে প্রিন্সেস মারি তাকে বলল, "এই প্রথম নাতাশা তার সম্পর্কে এত কথা বলল।''

অধ্যায়—১৭

আলোকশোভিত বড় খাবার ঘরে পিয়েরকে নিয়ে যাওয়া হল। কয়েক মিনিট পরে দরজায় পায়ের শব্দ শোনা গেল; নাতাশাকে নিয়ে প্রিন্সেস মারি ঘরে ঢুকল। একটা কঠিন গম্ভীরভাব মুখের উপর নেমে এলেও নাতাশা এখন বেশ শান্ত। একটা গুরুতর আন্তরিক আলোচনার পরে সাধারণত যা হয়ে থাকে এক্ষেত্রেও তারা তিনজনই এখন কিছু বিব্রত বোধ করল। আগেকার আলোচনায় ফিরে যাওয়া অসম্ভব, তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আলোচনা খারাপ দেখায়, অথচ কথা বলার ইচ্ছাটা পুরোপুরিই থাকে। তারা চুপচাপ টেবিলে গিয়ে বসল। পরিচারকরা চেয়ারগুলো পিছনে টেনে নিয়ে আবার সামনে ঠেলে দিল। পিয়ের টেবিল-তোয়ালের ভাঁজ খুলল, এবং নিস্তব্ধতা ভাঙবার জন্য প্রথমে নাতাশার দিকে ও পরে প্রিন্সেস মারির দিকে তাকাল। তাদের মনেও ঐ একই সংকল্প। দুজনের চোখেই জ্বলছে খুশির আলো, যেন বলছে দুঃখের পরেও জীবনে আছে আনন্দ।

প্রিন্সেস মারি শুধাল, "আপনি কি ভদকা খান কাউণ্ট?" আর এই কথাগুলি যেন অতীতের ছায়াকে ঠেলে দিল দূরে। "এবার আপনার কথা বলুন। আপনার সম্পর্কে এমন সব অদ্ভুত আশ্চর্য কথা শুনেছি।"

এবার তার পক্ষে স্বাভাবিক মৃদু বিদ্রূপের হাসি হেসে পিয়ের বলল, "তা ঠিক। লোকে আমার সম্পর্কে এমন কথা বলে যা আমি কখনও স্বপ্নেও

ভাবি নি। মারি এব্রামভ্না আমাকে তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আমার কপালে কি ঘটেছে বা ঘটা উচিত ছিল তাই একটানা বলে গেলেন। আমার অভিজ্ঞতার কথা কেমন করে বলা উচিত সে পরামর্শ দিলেন স্তেপান স্তেপানিচ। আমি লক্ষ্য করে দেখলাম, নাম-করা লোক হওয়াটা খুব সোজা (আমিই তো এখন একজন নামী লোক); লোকে আমাকে নেমন্তন্ন করে নিয়ে আমার কথাই শুনিয়ে দেয়।"

নাতাশা হেসে কি যেন বলতে যাচ্ছিল। তাকে বাধা দিয়ে প্রিন্সেস মারি বলল, "আমরা শুনেছি মস্কোতে আপনার দশ লাখ ক্ষতি হয়েছে। কথাটা কি সত্যি?

"কিন্তু আমি তো আগের চাইতে তিনগুণ ধনী হয়েছি," পিয়ের জবাবে বলল। তারপর গম্ভীর হয়ে বলল, "আমি যে মুক্তি পেয়েছি সেটাই আমার সত্যিকারের লাভ।" কিন্তু প্রসঙ্গটা খুবই ব্যক্তিগত হয়ে পড়ছে দেখে সে আর কথা বাড়াল না।

"আপনি কি নতুন করে বাড়িঘর তৈরি করছেন?"

"হ্যাঁ। সাভেলিচ বলছে করতেই হবে।"

প্রিন্সেস মারি শুধাল, "আচ্ছা বলুন তো, যখন মস্কোতে থাকা স্থির করলেন তখন কি আপনি কাউন্টেসের মৃত্যুর সংবাদ জানতেন না?"

পিয়ের জবাব দিল, "না। আমি খবরটা শুনি ওরিলে। শুনে কত যে আঘাত পেয়েছিলাম তা কল্পনাও করতে পারবেন না। আমরা আদর্শ দম্পতি ছিলাম না, কিন্তু তার মৃত্যু আমাকে ভীষণভাবে আঘাত করেছিল। দুটি মানুষের মধ্যে যখন ঝগড়া হয় তখন দুজনেরই দোষ থাকে, কিন্তু তাদের এক একজন যখন আর জীবিত থাকে না তখন অপরজনের দোষটা হঠাৎ বড় বেশী ভারী হয়ে দেখা দেয়। তার উপর এমন মৃত্যু···বন্ধু নেই, সান্ত্বনা নেই! তার জন্য আমি খুব, খুব দুঃখিত।" কথা শেষ করে নাতাশার মুখে সানন্দ সমর্থনের ভাব লক্ষ্য করে সে খুশি হয়ে উঠল।

প্রিন্সেস মারি বলল, "ঠিক, তাহলে তো আপনি আর একবার একটি বিবাহযোগ্য কুমার হলেন।"

পিয়েরের মুখটা হঠাৎ রাঙা হয়ে উঠল; অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে নাতাশার দিকে চাইতেই পারল না। আবার তার দিকে মুখ ফেরাতেই দেখল, নাতাশার মুখটা কঠোর, কঠিন, এমন কি সম্ভবত অবজ্ঞাসূচক হয়ে উঠেছে।

প্রিন্সেস মারি শুধাল, "আমরা শুনেছি আপনি নেপোলিয়নের সঙ্গে দেখা করেছেন, কথা বলেছেন; সেটা কি সত্যি?"

পিয়ের হাসল।

"না, মোটেই না। সকলেই কল্পনায় দেখে, বন্দী হওয়া মানেই নেপোলিয়নের অতিথি হওয়া। তাকে তো কখনও দেখিই নি, তার সম্পর্কে কিছু

শুনি নি পর্যন্ত—আমি ছিলাম অনেক নীচু স্তরের লোকদের সঙ্গে।"

খাওয়া শেষ হয়ে গেল। বন্দী-জীবন সম্পর্কে কোন কথা বলার ইচ্ছা প্রথম দিকে পিয়েরের ছিল না; কিন্তু ক্রমে তাকে সেইদিকে নিয়ে যাওয়া হল।

ঈষৎ হেসে নাতাশা বলল, "কিন্তু আপনি যে নেপোলিয়নকে হত্যা করতেই মস্কোতে ছিলেন সেটা তো সত্যি? যখন সুখারেভ মিনারে আমাদের দেখা হয়েছিল তখনই আমি ব্যাপারটা আন্দাজ করেছিলাম। সেকথা আপনার মনে পড়ে?"

পিয়ের স্বীকার করল যে কথাটা সত্যি; তারপর প্রিন্সেস মারি ও নাতাশার প্রশ্নের টানে নিজের অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ দিতে লাগল।

মৃদু হাসি হেসে প্রিন্সেস মারি একবার পিয়েরের দিকে, একবার নাতাশার দিকে তাকাতে লাগল। গোটা বিবরণের মধ্যে সে শুধু পিয়েরের ভালমানুষিরই পরিচয় পেল। কনুইতে ভর দিয়ে নাতাশা অবিচল মনোযোগের সঙ্গে পিয়েরকে দেখতে লাগল; বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের ভাব বদলাতে লাগল; মনে হল, পিয়েরের বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে সেও যেন তার অভিজ্ঞতার অংশীদার হয়ে উঠেছে। শুধু নাতাশার চাউনি নয়, তার উচ্ছ্বাস ও ছোট ছোট প্রশ্ন থেকেই পিয়ের বুঝতে পারল, সে যা বোঝাতে চাইছে ঠিক সেই কথাটিই নাতাশা বুঝতে পারছে। শুধু সে যা মুখে বলছে তাই নয়, যা সে বলতে চাইছে অথচ ভাষায় প্রকাশ করতে পারছে না সে সব কিছুই নাতাশা বুঝতে পারছে। যে শিশু ও নারীকে রক্ষা করতে গিয়ে পিয়েরকে গ্রেপ্তার হতে হয়েছিল তার বিবরণটা এইরকম: "সে বড় ভয়ানক দৃশ্য—শিশুরা পরিত্যক্ত, কেউ কেউ আগুনের মধ্যে···আমার চোখের সামনে একজনকে কেড়ে নিয়ে গেল···অনেক মেয়ে মানুষের মালপত্র কেড়ে নিল, কানের দুল ছিঁড়ে নিল···" বলতে বলতে তার মুখ লাল হয়ে উঠল, সব কেমন গুলিয়ে যেতে লাগল। "তারপর একটা পাহারাদার বাহিনী এল, আর সব পুরুষদের—মানে যারা লুটতরাজ করছিল না তাদের—গ্রেপ্তার করল। আমিও তাদের মধ্যে ছিলাম।"

"আমার নিশ্চিত বিশ্বাস আপনি সব কথা বলছেন না; আপনি নিশ্চয় কিছু করেছিলেন···" নাতাশা বলতে বলতে একটু থেমে যোগ করল, "কোন ভাল কাজ?"

পিয়ের বলতে লাগল। মৃত্যুদণ্ডের কথা বলতে গিয়ে ভয়াবহ অংশগুলো সে বাদ দিতে চাইল, কিন্তু নাতাশা জেদ ধরল যে কিছুই বাদ দেওয়া চলবে না।

কারাতায়েভের কথা বলতে শুরু করে পিয়ের থেমে গেল। ততক্ষণে সে টেবিল থেকে উঠে ঘরময় পায়চারি করছে, আর নাতাশার চোখ দুটি তাকে অনুসরণ করছে। সে বলতে লাগল:

"না, সেই অশিক্ষিত লোকটির কাছ থেকে—সেই সরল লোকটির কাছ থেকে আমি যা শিখেছি তা আপনারা বুঝতে পারবেন না।"

নাতাশা বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে; বলে যান! লোকটি এখন কোথায়?"

"প্রায় আমার চোখের সামনেই তারা তাকে মেরে ফেলেছে।"

কম্পিত গলায় পিয়ের তাদের পশ্চাদপসরণের শেষের দিনগুলি, কারাতায়েভের অসুস্থতা, ও তার মৃত্যুর কথাগুলি বলতে লাগল।

অভিযানের যেসব কথা এতদিন মনেও আনে নি সেইসব কথাই পিয়ের তাদের শোনাল। সেই সব অভিজ্ঞতার একটা নতুন অর্থ যেন সে এখন খুঁজে পেয়েছে।

তার কথাগুলি বুঝতে পেরে প্রিন্সেস মারি তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েছে, কিন্তু এখন সে এমন কিছু পেয়েছে যাতে তার মনোযোগ আবিষ্ট হয়ে উঠেছে। নাতাশা ও পিয়েরের মধ্যে ভালবাসা ও সুখের সম্ভাবনা দেখতে পেয়ে তার অন্তর খুশিতে ভরে উঠেছে।

সকাল তিনটে বাজল। পরিচারকরা বিষণ্ণ কঠিন মুখে এসে মোমবাতি বদলে দিয়ে গেল, কিন্তু কেউ তাদের খেয়াল করল না।

পিয়েরের গল্প শেষ হল। উজ্জ্বল চোখ মেলে উচ্ছ্বসিত মনোযোগের সঙ্গে নাতাশা তার দিকে চেয়েই রইল। মনে হল, হয় তো পিয়ের মুখে যা বলে নি এমন কোন কথাকে সে ধরতে চেষ্টা করছে। বিব্রত লাজুক চোখে তার দিকে তাকিয়ে পিয়ের ভাবতে চেষ্টা করল, কোন্ কথা দিয়ে আর একটা নতুন বিষয়ের অবতারণা করা যায়। প্রিন্সেস মারি নীরব। কারওরই মনে হল না যে এখন তিনটে বাজে, শুতে যাবার সময় হয়েছে।

পিয়ের বলতে শুরু করল, "লোকে দুর্ভাগ্য ও কষ্টের কথা বলে, কিন্তু এই-মুহূর্তে আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়: 'তুমি কি বন্দী হবার আগে যা ছিলে তাই থাকতে চাও, না আবার এইসব কষ্টের ভিতর দিয়ে চলতে চাও?' তাহলে ঈশ্বর করুন আমি যেন আবার সেই বন্দীত্ব ও ঘোড়ার মাংসই ফিরে পাই! আমরা মনে করি বাঁধা পথের বাইরে ছিটকে পড়লেই বুঝি সব গেল, কিন্তু একমাত্র তখনই তো শুরু হয় যা কিছু নতুন আর ভাল। যতক্ষণ জীবন ততক্ষণই তো সুখ। আমাদের সামনে অনেক কিছু আছে।" নাতাশার দিকে ফিরে বলল, "একথাটা আপনাকে বলছি।"

সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছুর জবাবে নাতাশা বলল, "ঠিক, ঠিক; গোড়া থেকে এই জীবনের মধ্যেই নতুন করে বাঁচতে চাওয়া ছাড়া আমারও আর কিছু চাওয়া উচিত নয়।"

পিয়ের একাগ্রদৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল।

নাতাশা বলল, "হ্যাঁ, তার বেশী কিছু না।"

"একথা সত্যি নয়, সত্যি নয়!" পিয়ের চীৎকার করে বলল। "আমি যে বেঁচে আছি, বেঁচে থাকতে চাই সেটা তো আমার দোষ নয়—আপনারও নয়।"

হঠাৎ নাতাশা মাথা নীচু করে দুই হাতে মুখটা ঢেকে কাঁদতে লাগল।

"কি হল নাতাশা?" প্রিন্সেস মারি বলল।

"কিছু না, কিছু না।" চোখের জলের ভিতর দিয়ে নাতাশা পিয়েরের দিকে তাকিয়ে হাসল। "শুভরাত্রি। শুতে যাবার সময় হয়েছে।"

পিয়ের উঠে বিদায় নিল।

প্রিন্সেস মারি ও নাতাশার সঙ্গে যথারীতি শোবার ঘরেই দেখা হল। পিয়েরের কথা নিয়েই তারা আলোচনা করল। পিয়ের সম্পর্কে প্রিন্সেস মারি কোন মতামত ব্যক্ত করল না, নাতাশাও তার সম্পর্কে কিছু বলল না।

নাতাশা বলল, "আচ্ছা, শুভরাত্রি মারি। তুমি কি জান, আমার প্রায়ই ভয় হয়, তার সম্পর্কে (অর্থাৎ পিয়েরের কথা) এভাবে কোন কথা না বললে আমরা তাকে ভুলেই যাব!"

যেন নাতাশার কথার সমর্থনেই প্রিন্সেস মারি একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল, কিন্তু মুখে সেকথা জানাল না। বলল, "ভুলে যাওয়া কি সম্ভব? আজ সব কথা বলতে পেরে আমার এত ভাল লাগছে। কথাগুলি বলা শক্ত, বলতে কষ্টও হয়, তবু বলা ভাল। খুব ভাল!" নাতাশা বলল। "আমি নিশ্চিত জানি সে আমাকে ভালবাসত। তাই তো সব তাকে বললাম।... ঠিক করি নি?" সহসা সে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।

"পিয়েরকে সব কথা বলা? নিশ্চয়। কী চমৎকার লোক।" প্রিন্সেস মারি বলল।

নাতাশার ঠোঁটে দুষ্টুমির হাসি ফুটে উঠল। অনেকদিন তার মুখে এমন হাসি প্রিন্সেস মারি দেখে নি। হঠাৎ নাতাশা বলে উঠল, "তুমি কি জান মারি, যে করেই হোক সে যেন পরিচ্ছন্ন, মসৃণ ও তাজা হয়ে উঠেছে—যেন এইমাত্র একটা 'রুশ বাথ' নিয়ে এসেছে: বুঝতে পারলে তো? একটা নৈতিক স্নানের কথাই আমি বলছি। ঠিক কি না?"

প্রিন্সেস মারি জবাব দিল, "ঠিক। তার অনেক উন্নতি হয়েছে।"

"পরনে একটা খাটো কোট, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা; ঠিক যেন এইমাত্র স্নান-ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন...বাপি বলত..."

"কেন যে সে (প্রিন্স আন্দ্রু) তাকে অন্য সকলের চাইতে বেশী পছন্দ করত তা আমি জানি," প্রিন্সেস মারি বলল।

"ঠিক, আর সে তো সম্পূর্ণ আলাদা চরিত্রের মানুষ। লোকে বলে, ভিন্ন চরিত্রের লোকরাই বন্ধু হয়। সেকথাটা নিশ্চয় ঠিক। সত্যি, সে তো সম্পূর্ণ

অন্য রকম—সবদিক থেকেই।"

"ঠিক, কিন্তু সে এক আশ্চর্য মানুষ।"

"আচ্ছা, শুভরাত্রি," নাতাশা বলল।

সেই একই দুষ্টুমির হাসি অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার মুখের উপর লেগে রইল।

অধ্যায়—১৮

সেরাতে পিয়েরের ঘুম আসতে অনেক দেরি হল। ঘরময় পায়চারি করল; কখনও কোন কঠিন সমস্যার চিন্তায় ভুরু কোঁচকাল, কখনও মুখ বেঁকিয়ে দুই কাঁধে ঝাঁকুনি দিল, কখনও বা খুশিতে হেসে উঠল।

ভাবতে লাগল প্রিন্স আনদ্রুর কথা, নাতাশার কথা, তাদের ভালবাসার কথা; কখনও অতীতের জন্য মনে ঈর্ষা দেখা দিল, আবার সে মনোভাবের জন্য পরমুহূর্তে নিজেকেই ভৎ'সনা করল। ছটা বেজে গেল। তখনও সে ঘরময় পায়চারিই করছে।

"আচ্ছা, এটা যদি অনিবার্যই হয় তাহলে আর কি করা যাবে? কি আর করা যাবে? নিশ্চয়ই এটাই ঘটবে।" কথাগুলি নিজেকেই বলে সে তাড়াতাড়ি পোশাক বদলে শুতে গেল; মনটা খুশি ও উত্তেজিত, কিন্তু সব রকম ইতস্ততভাব থেকে মুক্ত।

কয়েকদিন আগে পিয়ের স্থির করেছিল শুক্রবার পিতার্সবুর্গে যাবে। বৃহস্পতিবারে সে যখন ঘুম থেকে উঠল তখন সাভেলিচ এসে জানতে চাইল যাত্রার জন্য বাঁধাছাঁদা করবে কি না।

"কি, পিতার্সবুর্গে? পিতার্সবুর্গে কেন? পিতার্সবুর্গে কে আছে?" যেন নিজেকেই প্রশ্ন করল। ভাবল, "ও, হ্যাঁ, এই ঘটনার অনেক আগে কোন কারণে পিতার্সবুর্গ যেতে চেয়েছিলাম বটে। কেন? কিন্তু হয় তো আমাকে যেতেই হবে।" বুড়ো সাভেলিচের মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবল, "লোকটি কত ভাল, সব দিকে নজর, সব কথা মনে রাখে। আর হাসিটিও কত সুন্দর!"

পিয়ের তাকে শুধাল, "আচ্ছা সাভেলিচ, তুমি কি মুক্তি পেতে চাও না?"

"আমার কাছে মুক্তির কি দাম ইয়োর এক্সেলেন্সি? আমরা স্বর্গত কাউন্টের—তাঁর স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটুক—অধীনে কাজ করেছি, আবার আপনার অধীনেও কাজ করছি, কিন্তু কোনদিন তো আমাদের প্রতি কোন অন্যায় করা হয় নি।"

"আর তোমার ছেলেমেয়েরা?"

"ছেলেমেয়েরাও এইভাবেই কাটিয়ে দেবে। এমন মনিবের অধীনে বেঁচে থাকা চলে।"

পিয়ের বলল, "কিন্তু আমার বংশধরদের বেলায় ? ধর আমি হঠাৎ বিয়ে করলাম···তাও তো হতে পারে।" তার মুখে ঈষৎ হাসি।

"ইয়োর এক্সেলেন্সি যদি অনুমতি দেন তো বলি, তাহলে তো খুব ভাল হয়।"

পিয়ের ভাবল, "ব্যাপারটাকে সে কত সহজ মনে করছে। সে জানে না কাজটা কত সাংঘাতিক, কত বিপজ্জনক। আজ হোক, কাল হোক···কাজটা সাংঘাতিক।"

"তাহলে কি হুকুম হয় ? কাল রওনা দিচ্ছেন তো ?" সাভেলিচ শুধাল।

"না, আপাতত স্থগিত রাখছি। তোমাকে পরে বলব। তোমার অসুবিধা ঘটালাম বলে ক্ষমা কর," পিয়ের বলল ; সাভেলিচকে হাসতে দেখে ভাবল : "কী আশ্চর্য যে লোকটা বুঝতে পারছে না আমার কাছে এখন পিতার্সবুর্গ বলে কিছু নেই ; সকলের আগে সেই ব্যবস্থাটা পাকা করতে হবে। কিম্বা হয় তো ও সবই জানে, শুধু না জানার ভান করছে। একটু কথা বলে দেখব নাকি ও কি ভাবছে ? না, অন্য সময় হবে।"

প্রাতরাশের সময় পিয়ের তার দিদি প্রিন্সেসকে বলল যে আগেরদিন সে প্রিন্সেস মারির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল, আর সেখানেই দেখা হয়েছিল —"কার সঙ্গে বল তো ? নাতাশা রস্তভার সঙ্গে ?"

তার সঙ্গে যদি আন্না সেমেনভ্নার দেখা হত তার চাইতে এটা অসাধারণ কি সে হল সেকথা প্রিন্সেস বুঝতেই পারল না।

"তুমি তাকে চেন ?" পিয়ের শুধাল।

"সেসময় তার সেই ব্যাপারটার কথা শুনেছিলাম। খুবই দুঃখের কথা।"

পিয়ের ভাবল, "না, এ হয় কিছু জানে না, আর নয়তো না জানার ভান করছে। একে কোন কথা না বলাই ভাল।"

প্রিন্সেস ও পিয়েরের যাত্রার জন্য খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করেছিল।

পিয়ের ভাবল, "এরা সকলেই কত সদয়। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল, যে সব বিষয়ের প্রতি এখন আর তাদের কোন আগ্রহ থাকতে পারে না তা নিয়ে এরা মাথা ঘামাচ্ছে কেমন করে।"

সেইদিনই পুলিশের বড় কর্তা এসে পিয়েরকে জানিয়ে গেল, যেসব মাল উদ্ধার করা হয়েছে সেইদিনই ক্রেম্লিন প্রাসাদ থেকে সেগুলি মালিকদের ফেরৎ দেওয়া হবে ; কাজেই সে যেন মাল আনতে একজন প্রতিনিধিকে সেখানে পাঠিয়ে দেয়।

পুলিশের বড় কর্তার মুখের দিকে তাকিয়ে পিয়ের ভাবল, "আর এই লোকটিও। অফিসারটি কত ভাল, কী সুন্দর দেখতে, আর কত সদয় ! লোকটি যে এই তুচ্ছ জিনিস নিয়েও মাথা ঘামাচ্ছে সেকথা ভাবা যায় !

অথচ লোকে বলে লোকটি সৎ নয়, ঘুষ খায়। যত সব বাজে কথা। তাছাড়া ঘুষ খাবে না কেন? এইভাবেই তো সে মানুষ হয়েছে, আর একাজ তো সকলেই করে। কিন্তু কি সদয় ও খুশি মাখানো মুখ, আর আমার দিকে তাকিয়ে কেমন হাসছে।"

পিয়ের প্রিন্সেস মারির বাড়ি গেল ডিনার খেতে।

পোড়া বাড়িগুলোর পাশ দিয়ে যেতে যেতে সেই ধ্বংসস্তূপের সৌন্দর্য দেখে সে বিস্মিত হল। শহরের পোড়া বাড়িগুলোর চিমনির স্তূপ আর ভেঙে-পড়া দেয়ালের বহুদূর প্রসারিত মনোরম সৌন্দর্য দেখে তার মনে পড়ে গেল রাইনের কথা, রোমের কলসিয়ামের কথা। পথে যেসব কোচয়ান ও তার সওয়ারীদের সঙ্গে দেখা হল, যে ছুতোর মিস্ত্রিরা নতুন বাড়ি তৈরি করার জন্য কুড়ুল দিয়ে কাঠ কাটছে, ফেরিওয়ালী ও দোকানীরা—সকলেই যেন সানন্দ উজ্জ্বল চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলছে: "আহা। এই তো তিনি এসেছেন! দেখা যাক এবার কি হয়!"

প্রিন্সেস মারির বাড়ির ফটকে পৌঁছে পিয়েরের মনে সন্দেহ জাগল, সত্যি কি সে কাল রাতে এখানে এসেছিল, সত্যি কি নাতাশার সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল, তার সঙ্গে কথা বলেছিল। "হয় তো সবই আমার কল্পনা; হয়তো ভিতরে ঢুকে দেখব তারা কেউ নেই।" কিন্তু ঘরে ঢোকা মাত্রই সমগ্র সত্তা দিয়ে সে নাতাশার উপস্থিতিকে অনুভব করল, নিজের সব স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলল। আগের দিনের মতই সে কালো পোশাক তার পরনে, সেই একই-ভাবে চুল বাঁধা, তবু সে আজ কত আলাদা। আগের দিন ঘরে ঢুকেও তাকে যদি এইরূপেই দেখত তাহলেও পিয়ের মুহূর্তের জন্যও তাকে চিনতে ভুল করত না।

শৈশবে এবং পরে প্রিন্স আন্দ্রুর বাগদত্তা হিসাবে সে তাকে যেরূপে চিনত নাতাশা এখন সেইরূপেই উপস্থিত। তার দুই চোখে একটা জিজ্ঞাসু আলোর ঝিলিক; তার মুখে বন্ধুত্বপূর্ণ ও বিচিত্র দুষ্টুমি ভরা ভাব।

পিয়ের তাদের সঙ্গে ডিনার খেল; হয়তো সারাটা সন্ধ্যা তাদের সঙ্গেই কাটাত, কিন্তু প্রিন্সেস মারি সান্ধ্য উপাসনায় যোগ দিতে যাবে বলে তার সঙ্গেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

পরদিন সে সকাল-সকাল এল, ডিনার খেল, সারা সন্ধ্যা সেখানে কাটাল। যদিও অতিথিকে পেয়ে প্রিন্সেস মারি ও নাতাশা দুজনই খুশি, যদিও পিয়েরের সব আগ্রহ এখন এই বাড়িটাতে কেন্দ্রীভূত, সন্ধ্যা নাগাদ তাদের সব কথাই বলা হয়ে গেল, আলোচনা ক্রমেই একটা তুচ্ছ বিষয় থেকে বিষয়া-ন্তরে যেতে লাগল এবং বার বার ভেঙে যেতে লাগল। পিয়ের এত বেশী সময় সেখানে থাকল যে প্রিন্সেস মারি ও নাতাশার মধ্যে দৃষ্টি-বিনিময় শুরু হয়ে গেল, যেন তারা ভাবছে লোকটি কখন উঠবে। পিয়ের সেটা লক্ষ্য করেও

চলে যেতে পারল না। সেও অস্বস্তি বোধ করল, বিব্রত হল, কিন্তু তবু বসেই রইল, কারণ উঠে বিদায় নেবার শক্তি তার নেই

প্রিন্সেস মারি যখন বুঝল যে এ বসে থাকার কোন শেষ নেই তখন সেই প্রথম উঠে দাঁড়াল, এবং মাথা ধরার কথা বলে শুভরাত্রি জানাল।

শুধাল, "তাহলে আপনি তো কালই পিতার্সবুর্গ যাচ্ছেন?"

যেন কিছুটা আহত হয়েছে এমনি বিস্মিত গলায় পিয়ের তাড়াতাড়ি জবাব দিল, "না, আমি যাচ্ছি না। হ্যাঁ…না…পিতার্স র্গ তো? কাল—কিন্তু এখনই শুভরাত্রি জানাচ্ছি না। আপনাদের যদি কোন দরকার থাকে তো আবার একবার আসব।" প্রিন্সেস মারির সামনে দাঁড়িয়ে মুখ লাল করে সে কথাগুলি বলল, কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল না।

নাতাশা হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল। প্রিন্সেস মারি কিন্তু বেরিয়ে গেল না, একটা হাতল-চেয়ারে বসে গভীর উজ্জ্বল চোখে কঠোর একাগ্রদৃষ্টিতে পিয়েরের দিকে তাকাল। যে ক্লান্তি দেখা দিয়েছিল তার মুখে সেটা এখন সম্পূর্ণ চলে গেছে। একটা গভীর টানা নিঃশ্বাস ছেড়ে সে যেন দীর্ঘ আলোচনার জন্য প্রস্তুত হল।

নাতাশা ঘর থেকে চলে যেতেই পিয়েরের বিব্রত ভাবটা চলে গেল, সেখানে দেখা দিল অধীর উত্তেজনা। তাড়াতাড়ি একটা হাতল-চেয়ার প্রিন্সেস মারির কাছে টেনে নিল।

তার দৃষ্টির জবাবেই যেন বলতে লাগল, "হ্যাঁ, আপনাকে বলতেই চাইছিলাম। প্রিন্সেস, আপনি আমাকে সাহায্য করুন! আমি কি করব? আমি কি আশা করতে পারি? প্রিন্সেস, প্রিয় বান্ধবী আমার, শুনুন! আমি সব কথা জানি। আমি জানি আমি তার যোগ্য নই; জানি এখন এসব কথা বলা অসম্ভব। কিন্তু আমি তার দাদা হতে চাই। না, তা নয়, আমি চাই না, আমি পারি না…"

কথা থামিয়ে সে দুই হাতে মুখ ও চোখ ঘসতে লাগল।

চেষ্টা করে নিজেকে সংযত করে সে আবার বলল, "দেখুন, কখন যে ওকে ভালবেসে ফেলেছি তা আমি জানি না, কিন্তু সারাজীবন আমি ওকেই ভালবেসেছি, একমাত্র ওকে; ওকে এত ভালবেসেছি যে ওকে ছাড়া বেঁচে থাকার কথা আমি কল্পনাও করতে পারি না। বর্তমানে তার কাছে আমি বিয়ের প্রস্তাব করতে পারি না, কিন্তু হয় তো একদিন সে আমার স্ত্রী হতে পারে এবং আমি হয় তো সে সম্ভাবনাকে…সে সম্ভাবনাকে…হারিয়ে ফেলতে পারি, এই চিন্তাই আমার কাছে মর্মান্তিক। বলুন, আমি কি আশা করতে পারি? প্রিয় প্রিন্সেস, বলুন আমি কি করব!" কোন জবাব না পেয়ে পিয়ের তার হাতটা স্পর্শ করল।

প্রিন্সেস মারি জবাব দিল, "আপনি যা বললেন সেই কথাটাই আমি

ভাবছি। আমার বক্তব্য শুনুন। আপনি ঠিকই বলেছেন যে এসময় তার কাছে ভালবাসার কথা বলা···"

প্রিন্সেস মারি থামল। সে বলতে যাচ্ছিল যে তার কাছে ভালবাসার কথা বলা অসম্ভব, কিন্তু সে থেমে গেল কারণ দুদিন আগে নাতাশার আকস্মিক পরিবর্তন দেখে সে বুঝেছে যে পিয়ের যদি তাকে ভালবাসার কথা বলে তাহলে সে আঘাত তো পাবেই না, বরং সেই জিনিসটিই সে এখন চাইছে।

তবু প্রিন্সেস বলল, "এখন সেকথা বললে কিছু হবে না।"

"কিন্তু আমি কি করব?"

"সেটা আমার উপর ছেড়ে দিন," প্রিন্সেস মারি বলল। "আমি জানি ··"

পিয়ের প্রিন্সেস মারির চোখের দিকেই তাকিয়েছিল।

বলল, "তারপর?···তারপর?"

প্রিন্সেস মারি নিজেকে শুধ্রে নিয়ে বলল, "আমি জানি সে আপনাকে ভালবাসে···ভালবাসবে।"

কথাগুলি প্রিন্সেস মারির মুখ থেকে বের হবার আগেই পিয়ের লাফিয়ে উঠল, ভয়াত মুখে তার হাতটা চেপে ধরল।

"কিসের থেকে আপনি একথা ভাবছেন? আপনি মনে করেন যে আমি আশা করতে পারি? আপনি মনে···"

প্রিন্সেস মারি হেসে বলল, "হাঁা, আমি তাই মনে করি। ওর বাবা-মার কাছে চিঠি লিখুন, আর ব্যাপারটা আমার উপর ছেড়ে দিন। সুবিধামত আমি ওকে বলব। আমিও চাই এটা ঘটুক। আমার মন বলছে এটা ঘটবে।"

"না, এ হতে পারে না! আমি কত সুখী! কিন্তু এ হতে পারে না··· আমি কত সুখী! না, এ হতে পারে না!" প্রিন্সেস মারির হাতে চুমো খেয়ে পিয়ের বার বার বলতে লাগল।

প্রিন্সেস মারি বলল, "আপনি পিতার্সবুর্গ চলে যান। সেটাই সব চাইতে ভাল হবে। আমি আপনাকে লিখব।"

"পিতার্সবুর্গে? চলে যাব? বেশ, তাই যাব। কিন্তু কাল আবার আসতে পারি তো?"

পরদিন পিয়ের বিদায় নিতে এল। আজ নাতাশা আগের দিনের মত ততটা প্রাণ-চঞ্চল নয়; কিন্তু তার দিকে তাকিয়ে পিয়েরের মনে হল সে বুঝি নিজেই হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে, যেন তাদের কারও কোন অস্তিত্ব নেই, একমাত্র সুখ ছাড়া আর কিছু নেই। প্রতিটি চাউনি, প্রতিটি ভঙ্গী, প্রতিটি কথা তার অন্তরকে আনন্দে ভরে তুলল; নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করল, "এও

কি সম্ভব? না, এ হতে পারে না।"

বিদায় নেবার সময় নাতাশার শীর্ণ নরম হাতখানি ধরে কিছু বেশী সময় নিজের হাতের মধ্যে না রেখে সে পারল না।

"এও কি সম্ভব যে এই হাত, ওই দুটি চোখ, নারীর সৌন্দর্যের এই রত্ন-ভাণ্ডার যা আজ আমার কাছে এত অপরিচিত তাই একদিন চিরদিনের মত আমার হবে, আমার নিজের মতই একান্ত পরিচিত হবে?...না, সে অসম্ভব...!"

"বিদায় কাউণ্ট," কথাটা উঁচু গলায় বলে তারপর ফিসফিস করে নাতাশা বলল, "আপনার ফিরে আসার জন্য আমি উৎকণ্ঠ হয়ে অপেক্ষা করে থাকব।"

আর এই কয়েকটি সহজ কথা, তার চাউনি, তার মুখের ভাব—সবই দুটি মাস ধরে পিয়েরের কাছে হয়ে রইল অক্ষয় স্মৃতি, ব্যাখ্যা ও সুখ-চিন্তার বিষয়। "আপনার ফিরে আসার জন্য আমি উৎকণ্ঠ হয়ে অপেক্ষা করে থাকব..." হ্যাঁ, হ্যাঁ, কেমন করেই না সে কথাগুলি বলল? হ্যাঁ, "আপনার ফিরে আসার জন্য আমি উৎকণ্ঠ হয়ে অপেক্ষা করে থাকব।" আহা, আমি আজ কত সুখী! আমার ভাগ্যে কি ঘটছে? আমি কত সুখী!" পিয়ের আপন মনেই বলতে লাগল।

অধ্যায়—১৯

হেলেনের সঙ্গে পূর্বরাগের সময় যা কিছু পিয়েরকে বিপন্ন করে তুলেছিল তার কিছুই এখন পিয়েরের অন্তরে নেই। একটা লজ্জাবোধ থেকে তাকে কখনও একবার বলা কথা দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করতে হয় নি, অথবা বলতে হয় নি, "আহা, ও কথাটা কেন বললাম না?" অথবা "কেনই বা আমাকে বলতে হল 'Fe vous aime'?" উল্টে সে বা নাতাশা যা বলেছে তার প্রতিটি কথা সে এখন কল্পনায় পুনরাবৃত্তি করে; নাতাশার মুখ ও তার হাসির প্রতিটি ছবি মনে মনে নতুন করে আঁকে; কিছুই বাদ দিতে বা যোগ করতে চায় না, শুধুই বার বার তার পুনরাবৃত্তি করে। যেপথে থেকেছে সেটা ঠিক কি ভুল সেবিষয়ে, সন্দেহের ছায়ামাত্র এখন তার মনে নেই। শুধু মাঝে মাঝে একটা ভয়ংকর সন্দেহ তার মনের মধ্যে উঁকি দেয়: "এসবই স্বপ্ন নয় তো? প্রিন্সেস মারি ভুল করে নি তো? আমি নিজেই বড় বেশী অহংকারী বা আত্মবিশ্বাসী নই তো? আমি এসবই বিশ্বাস করছি, আর হঠাৎ একদিন প্রিন্সেস মারি তাকে কথাটা বলবে আর সে হেসে বলবে: "কি আশ্চর্য! তিনি নিশ্চয় নিজেকে ভুল বুঝিয়েছেন। তিনি কি জানেন না যে তিনি একজন পুরুষ মানুষ, শুধুই মানুষ, আর আমি...? আমি তো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও মহত্তর কিছু।"

এই একটি মাত্র সন্দেহ প্রায়ই পিয়েরকে বিপন্ন করে তোলে। সে এখন

কোন পরিকল্পনা করে না। আসন্ন সুখটা তার কাছে এতই ধারণার অতীত বলে মনে হয় যেন সেটা পেলেই সব কিছুর অবসান ঘটবে। তার সঙ্গে সঙ্গেই সব কিছুর অবসান।

একটা অপ্রত্যাশিত আনন্দের বিকার তাকে পেয়ে বসেছে। তার মনে হচ্ছে, তার ভালবাসা এবং নাতাশার ভালবাসা পাবার সম্ভাবনা—এই দুয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে জীবনের অর্থ—শুধু তার নয়, সমগ্র জগতের। কখনও কখনও তার মনে হয়, সকলেই যেন তার ভবিষ্যৎ সুখ নিয়েই মত্ত হয়ে আছে। আবার কখনও মনে হয়, অন্য সকলেই তার মত সুখী, শুধু অন্য কাজে ব্যস্ত থাকার ভান করে সে সুখকে আড়াল করে রাখতে চেষ্টা করে। প্রতিটি কথায় ও ভঙ্গীতে তার নিজের সুখের উল্লেখই সে দেখতে পায়।

যখন তাকে বলা হত যে তার সিভিল সার্ভিসে যোগ দেওয়া উচিত, অথবা যখন যুদ্ধ বা অন্য কোন রাজনীতিয় বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হত যে এইসব ঘটনার ফলাফলের উপরেই সকলের কল্যাণ নির্ভর করছে, তখন সে করুণার হাসি হেসে সেসব কথা শুনত, আর বিচিত্র সব মন্তব্য করে সকলকে অবাক করে দিত। কিন্তু এখন যারা জীবনের অর্থ বোঝে বলে সে মনে করে এবং যে দুর্ভাগারা তা বোঝে না তাদের প্রত্যেককেই সে দেখে নিজ অন্তরের আবেগের উজ্জ্বল আলোয়, আর সঙ্গে সঙ্গে অতি সহজে প্রত্যেকের মধ্যেই সে দেখতে পায় যা কিছু ভাল, যা কিছু ভালবাসার যোগ্য।

মৃতা স্ত্রীর ব্যাপার ও কাগজপত্র নিয়ে আলোচনার সময় তার স্মৃতি পিয়েরের মনে একমাত্র করুণা ছাড়া আর কোন অনুভূতি জাগায় না—আজ সে যে আনন্দের স্বাদ পেয়েছে তার সন্ধান সে বেচারি জানত না বলেই তার জন্য পিয়েরের করুণা হয়। প্রিন্স ভাসিলি ইতিমধ্যে নতুন পদমর্যাদা পেয়েছে, কয়েকটা নতুন সম্মান-পদকও লাভ করেছে; তাই এখন সে বেশ গর্বিত; অথচ পিয়েরের চোখে সেই শোচনীয় সদয় বৃদ্ধটি একান্ত করুণার পাত্র।

পরবর্তী জীবনে এই সময়কার সুখময় উন্মত্ততার কথা প্রায়ই পিয়েরের মনে পড়ত। এইসময় নানা মানুষ ও ঘটনার যে অর্থ তার মনে গড়ে উঠেছিল তা চিরদিন তার কাছে সত্য হয়েই ছিল। পরবর্তীকালে সে সব ধারণাকে সে পরিত্যাগ তো করেই নি, বরং যখনই মনে কোন সন্দেহ বা বিরোধ দেখা দিত তখনই সে এই উন্মাদনার সময়কার মতামত দিয়ে তার বিচার করত, আর সব সময় পূর্বেকার সিদ্ধান্তগুলিই সঠিক প্রমাণিত হত।

সে ভাবত, "তখন আমাকে হয়ত বিচিত্র ও অদ্ভুত মনে হত, কিন্তু আমাকে যতটা পাগল বলে মনে হত আমি ততটা পাগল ছিলাম না। বরং অন্য যেকোন সময়ের তুলনায় তখনই আমি ছিলাম বিজ্ঞতর, আমার অন্তর্দৃষ্টি ছিল তীক্ষ্ণতর, এবং জীবনে যা কিছু জানার যোগ্য সবই জেনেছিলাম, কারণ…কারণ তখন আমি সুখী ছিলাম।"

মানুষকে ভালবাসবার আগেই তাদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যকে—যাকে সে বলত "সৎ গুণাবলী"—আবিষ্কার করার ব্যাপারে সে যে অপেক্ষা করে থাকত না এটাই ছিল পিয়েরের পাগলামি ; এখন তার অন্তর ভালবাসায় দুকূল ছাপিয়ে গেছে, আর অকারণে মানুষকে ভালবেসে তাদের ভালবাসবার সন্দেহাতীত কারণগুলি সে খুঁজে পেয়েছে।

অধ্যায়—২০

সেই প্রথম সন্ধ্যায় নাতাশা যখন সানন্দ তামাসার সুরে প্রিন্সেস মারিকে পিয়ের সম্পর্কে বলেছিল ; "ওকে দেখে মনে হচ্ছে বুঝি এই মাত্র 'রুশ বাথ' থেকে বেরিয়ে এসেছেন—পরনে একটা খাটো কোট, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা," তখন পিয়ের চলে যাবার পরে নাতাশার অন্তরের মধ্যে জেগে উঠেছিল অজ্ঞাতপূর্ব ও লুকনো এমন কিছু যাকে কিছুতেই চেপে রাখা যায় না।

তার মুখ, হাঁটা-চলা, চাউনি, কণ্ঠস্বর : সব কিছু সহসা বদলে গেল। সবিস্ময়ে সে অনুভব করল, একটা জীবনী-শক্তি ও সুখের আশা জেগে উঠে প্রকাশের পথ খুঁজছে। সেই সন্ধ্যা থেকেই অতীত জীবনের সব কিছু যেন সে ভুলে গেল। জীবনের অবস্থা নিয়ে কোন অভিযোগ নেই, অতীত সম্পর্কে একটি কথাও বলে না, ভবিষ্যতের কোন সুখের পরিকল্পনা করতেও আর ভয় পায় না। পিয়ের সম্পর্কে অতি সামান্য কথাই বলে, কিন্তু প্রিন্সেস মারি যখন তার কথা উল্লেখ করে তখনই একটা দীর্ঘ-নির্বাপিত আলো জ্বলে ওঠে তার চোখে, ঠোঁট দুটি বেঁকে যায় একটা বিচিত্র হাসিতে।

নাতাশার এই পরিবর্তন দেখে প্রথমে প্রিন্সেস মারি বিস্মিত হত ; কিন্তু পরে তার অর্থ বুঝতে পেরে সে দুঃখ পায়। এই পরিবর্তনের কথা মনে এলেই সে ভাবে : "তাহলে কি আমার দাদার প্রতি তার ভালবাসা এতই সামান্য ছিল যে এত শীঘ্রই তাকে ভুলে গেল ?" কিন্তু নাতাশা কাছে এলে সে মোটেই বিরক্ত হয় না, কোনরকম অনুযোগও করে না। জীবনের যে নব-জাগ্রত শক্তি নাতাশাকে গ্রাস করেছে সেটা তার কাছে এতই অপ্রতিরোধ্য ও অপ্রত্যাশিত যে তার উপস্থিতিতে প্রিন্সেস মারিও অনুভব করে যে অন্তর থেকে নাতাশাকে তিরস্কার করার কোন অধিকারই তার নেই।

এত পরিপূর্ণ ও খোলাখুলিভাবে এই নতুন অনুভূতির কাছে নাতাশা নিজেকে সঁপে দিয়েছে যে তার যে আর কোন দুঃখ নেই, তার অন্তর যে এখন আনন্দে উজ্জ্বল এ সত্যকে লুকোবার কোন চেষ্টাই সে করে না।

পিয়েরের সঙ্গে নৈশ আলোচনা শেষ করে প্রিন্সেস মারি যখন নিজের ঘরে ফিরে গেল তখন দরজার মুখেই তার সঙ্গে নাতাশার দেখা হয়ে গেল।

"সে কথা বলেছে ? সত্যি ? কথা বলেছে ?" সে বার বার প্রশ্ন করল।

একটা আনন্দের অথচ দুঃখের প্রকাশ নাতাশার মুখে স্থির হয়ে রইল ; এই আনন্দটুকুর জন্যও যেন সে ক্ষমা প্রার্থনা করছে।

"দরজায় কান পেতে শুনতে ইচ্ছা করছিল, কিন্তু আমি জানতাম তুমি আমাকে বলবে।"

নাতাশার এই একাগ্র দৃষ্টির অর্থ প্রিন্সেস মারি বুঝল, তাতে অভিভূতও হল, তবু নাতাশার এই উত্তেজনা তাকে দুঃখ দিল, তার কথাগুলি তাকে ব্যথা দিল। প্রিন্সেস মারির মনে পড়ল দাদার কথা, তার ভালবাসার কথা।

ভাবল, "কিন্তু কি আর করা যাবে? ও তো নিরুপায়।"

তারপর বিষণ্ণ কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে পিয়েরের সব কথা সে নাতাশাকে বলল। পিয়ের পিতার্সবুর্গ চলে যাচ্ছে শুনে নাতাশা স্তম্ভিত হয়ে গেল।

যেন বুঝতে পারে নি এমনিভাবে বলে উঠল, "পিতার্সবুর্গে!"

কিন্তু প্রিন্সেস মারির মুখে বেদনার ছায়া লক্ষ্য করে তার এই দুঃখের কারণটি অনুমান করে নাতাশা সহসা কাঁদতে লাগল।

বলল, "মারি, তুমিই বলে দাও আমি কি করব! ভয় হচ্ছে আমি বুঝি খারাপ হয়ে যাব। তুমি যা বলবে আমি তাই করব। আমাকে বলে দাও···"

"তুমি তাকে ভালবাস?"

"হ্যাঁ," নাতাশা ফিস্‌ফিসিয়ে বলল।

"তাহলে কাঁদছ কেন? তোমাকে নিয়ে তো আমিও সুখী," প্রিন্সেস মারি বলল ; নাতাশার চোখে জল দেখে তার আনন্দকে সে ক্ষমা করেছে।

"এখনই কিছু হচ্ছে না—একদিন হবে। ভাব তো, যখন আমি তার স্ত্রী হব আর তুমি নিকলাসকে বিয়ে করবে তখন কী মজাই না হবে!"

"নাতাশা, তোমাকে তো বলেছি ওকথা তুলবে না। এস, তোমার কথাই হোক।"

দুজনই চুপ করে গেল।

"কিন্তু পিতার্সবুর্গে যাবে কেন?" হঠাৎ প্রশ্ন করে নাতাশা তাড়াতাড়ি নিজেই তার জবাব দিল। "কিন্তু না, না, তাকে যেতেই হবে···হ্যাঁ মারি। সে অবশ্যই যাবে··"

॥ পঞ্চদশ পর্ব সমাপ্ত ॥

॥ প্রথম পরিশিষ্ট ॥

অধ্যায়—১

সাত বছর পার হয়ে গেছে। ইওরোপীয় ইতিহাসের ঝঞ্চাবিক্ষুব্ধ সমুদ্র তার তটপ্রান্তে স্তিমিত হয়ে এসেছে; মনে হয় বুঝি শান্তই হয়েছে। কিন্তু যেসব রহস্যময় শক্তি (তাদের কর্ম-পদ্ধতির বিধি-বিধান আমাদের কাছে অজ্ঞাত বলেই রহস্যময়) মানব-সমাজকে পরিচালিত করে তাদের কর্ম-ধারা অব্যাহতই রয়েছে।

ইতিহাস-সমুদ্রের উপরিভাগ শান্ত দেখালেও কালের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখেই মানুষের অগ্রগতির ধারা অবিরাম বয়ে চলেছে। বিভিন্ন মানব-গোষ্ঠি গড়ে উঠেছে আবার ভেঙে গেছে; নানা রাজ্যের ভাঙা-গড়া ও মানুষের স্থানচ্যুতির উদ্যোগ-আয়োজন চলেছে।

ইতিহাস-সমুদ্রের তরঙ্গাভিঘাত এখন আর আগের মত এক সৈকত থেকে অপর সৈকতে আছড়ে পড়ছে না; গভীর তলদেশে টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে। ইতিহাসের বিখ্যাত প্রতিভূরা এখন আর ঢেউয়ের টানে এক তীর থেকে অপর তীরে চলে যাচ্ছে না। মনে হয় এখন তারা একই জায়গায় ঘুরপাক খাচ্ছে। সেনাদলের প্রধান হিসাবে ইতিহাসের যেসব নায়ক একদা যুদ্ধ, অভিযান ও লড়াইয়ে জনগণের গতিবিধিকে পরিচালিত করত তারাই এখন রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সংঘবদ্ধতা, বিধি-বিধান ও সন্ধির সাহায্যে জন-গণের অশান্ত গতিকে নিয়ন্ত্রিত করছে।

ইতিহাসের নায়কদের এইসব কার্য-কলাপকে ইতিহাসকাররা বলে "প্রতিক্রিয়া।"

এই সময়ের পর্যালোচনাকালে তারা ইতিহাসের নায়কদের তীব্র সমা-লোচনা করে থাকে; তাদের মতে তারা প্রতিক্রিয়াপন্থী। আলেক্সান্দার ও নেপোলিয়ন থেকে আরম্ভ করে মাদাম দ্য স্তায়েল, ফোটিয়াস, শেলিং, ফিকৃটে, চাতুব্রায়াঁ ও অন্য যারাই তাদের সমালোচনার শিকার হয়েছে, তাদের কঠোর বিচারে তারাই হয় প্রগতিবাদী হিসাবে মুক্তি পেয়েছে, আর না হয় তো প্রতিক্রিয়াপন্থীরূপে দণ্ডিত হয়েছে।

তাদের বিবরণ অনুসারে সেই সময়ে রাশিয়াতেও প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়ে-ছিল; তার প্রধান অপরাধী ছিল প্রথম আলেক্সান্দার; অথচ সেই লোকই তাদের মতেই তার রাজত্বকালের শুরুতে ছিল রাশিয়ার রক্ষাকর্তা এবং উদার-নৈতিক আন্দোলনের প্রধান উদ্যোক্তা।

আজকের রুশ সাহিত্যে স্কুলের ছাত্র থেকে আরম্ভ করে পণ্ডিত ইতিহাস-

কারদের মধ্যে এমন একজনকেও পাওয়া যাবে না যে নিজ রাজত্বকালে আলেক্সান্দার যেসব ভুল করেছিল তার জন্য তাকে লক্ষ্য করে একটা ছোট পাথরও ছুঁড়ে মারে না।

"তার উচিত ছিল এইভাবে এবং ওভাবে কাজ করা। এক্ষেত্রে তিনি ঠিক কাজই করেছেন, কিন্তু ওক্ষেত্রে করেছেন ভুল। রাজত্বের গোড়ার দিকে এবং ১৮১২ সালে তিনি আশ্চর্য রকমের ভাল কাজ করেছেন, কিন্তু পোল্যাণ্ডকে নতুন শাসনতন্ত্র দিয়ে, পবিত্র মৈত্রীচুক্তি স্থাপন করে, আরাকৃচীভের হাতে ক্ষমতা দিয়ে, গোলিৎসিনকে ও মরমীয়াবাদকে সমর্থন করে এবং পরবর্তীকালে শিশ্‌কভ ও ফোটিয়াসকে অনুগ্রহ দেখিয়ে খুব খারাপ কাজ করেছেন। সক্রিয় সেনাদলের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে এবং সেমেনভ রেজিমেণ্টকে ভেঙে দিয়েও তিনি ভুল করেছেন।"

মানবজাতির কিসে কল্যাণ হয় সে সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের ভিত্তিতে ইতিহাসকাররা তার উদ্দেশ্যে যত নিন্দা-বাক্য উচ্চারণ করেছে তা লিপিবদ্ধ করতে হলে ডজনখানেক পৃষ্ঠার দরকার হবে।

এইসব নিন্দা-তিরস্কারের অর্থ কি?

প্রথম আলেক্সান্দারের রাজত্বের গোড়ার দিকে তার উদারনৈতিক প্রয়াস, নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ, ১৮১২ সালে ও ১৮১৩ সালের অভিযানে তার দৃঢ়তা প্রভৃতি তার যেসব কাজের জন্য ইতিহাসকাররা তার প্রশংসা করে থাকে সেসবই কি ঐ একই উৎস থেকে প্রবাহিত নয়: তার জন্ম, শিক্ষা-দীক্ষা ও জীবনযাত্রার যে পরিবেশে তার ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছিল এবং যা থেকে সেইসব কাজগুলিও উৎসারিত হয়েছিল যার জন্য তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে (যেমন পবিত্র মৈত্রীচুক্তি, পোল্যাণ্ড প্রত্যর্পণ, ১৮২০ ও তার পরবর্তীকালের প্রতিক্রিয়া)—সে সব কিছুরই উৎস কি এক নয়?

ঐ সব নিন্দা-তিরস্কারের মূল ভিত্তিটা কি?

মূল ভিত্তি হল: প্রথম আলেক্সান্দারের মত ইতিহাসের একটি মুখ্য চরিত্র যে মানব-ক্ষমতার একেবারে শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত ছিল,—ক্ষমতার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত ষড়যন্ত্র,—খোসামোদ ও আত্ম-প্রবঞ্চনার মত প্রচণ্ড শক্তিগুলি যার উপর অবিরাম প্রভাব বিস্তার করতে সক্রিয় ছিল,—ইওরোপে সংঘটিত সমস্ত ঘটনার দায়িত্ব যাকে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে বহন করতে হত; কোন কাল্পনিক চরিত্র না হয়ে যে ছিল একটি জীবন্ত চরিত্র, প্রতিটি জীবন্ত মানুষের মতই সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রতি যার ছিল ব্যক্তিগত আবেগ ও অনুরাগ—পঞ্চাশ বছর আগে ("যুদ্ধ ও শান্তি" উপন্যাসখানি সমাপ্ত হয়েছিল ১৮৬৯ সালে) মানব-কল্যাণের সেই ধারণা ও তাৎপর্য-বোধ নিশ্চয় তার ছিল না, বর্তমান কালের একজন অধ্যাপক যৌবনকাল থেকে অধ্যয়ন-কার্যে ব্যাপৃত থেকে—নানা পুঁথি ও বক্তৃতা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে যে ধারণা ও তাৎপর্য-

বোধ গড়ে তুলতে পারে।

কিন্তু একথা যদি ধরেই নেওয়া যায় যে পঞ্চাশ বছর আগে মানবকল্যাণ সম্পর্কে প্রথম আলেক্সান্দারের ধারণাটা ভুল ছিল, তাহলে তো অনিবার্যভাবেই এটাও আমাদের ধরে নিতেই হয় যে আজ যে ইতিহাসকার আলেক্সান্দারের বিচার করছে কালের যাত্রাপথে একদিন তার ধারণাও ভ্রান্ত বলে পরিগণিত হবে। এই অনুমান আরও স্বাভাবিক ও অনিবার্য এই কারণে যে ইতিহাসের পথ-পরিক্রমার পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই নতুন নতুন লেখকের আবির্ভাবের সঙ্গে মানব-কল্যাণের ধারণাও প্রতি বছরই পরিবর্তিত হয়; ফলে আজ যা ভাল দশ বছর পরে তাই মন্দ বলে পরিগণিত হয়; এবং এর বিপরীত ক্রমও সমান সত্য। আরও বড় কথা: ইতিহাসের পথ-পরিক্রমায় কি ভাল আর কি মন্দ তা নিয়ে সমকালীন ইতিহাসকারদের মধ্যেও মতবিরোধের অন্ত নেই: পোল্যাণ্ডকে নতুন শাসন-অধিকার দান এবং পবিত্র মৈত্রীচুক্তি সম্পাদনের জন্য কেউ বা আলেক্সান্দারকে প্রশংসা করে, আবার কেউ বা নিন্দা করে।

আলেক্সান্দার বা নেপোলিয়নের কার্যাবলীকে দরকারী বা ক্ষতিকর কোনটাই বলা যায় না, কারণ সেগুলি কেন দরকারী বা ক্ষতিকর সেটা বলাই তো অসম্ভব। সেসব কার্যাবলী যদি কারও অসন্তোষের কারণ হয় তাহলে তো তার একমাত্র কারণ যে কল্যাণ সম্পর্কে তার সীমিত জ্ঞানের সঙ্গে সেগুলো মেলে না। মস্কোতে আমার পৈত্রিক ভবনকে রক্ষা করা, অথবা রুশ বাহিনীর গৌরব, অথবা পিতার্সবুর্গ ও অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সমৃদ্ধি, অথবা পোল্যাণ্ডের মুক্তি, অথবা রাশিয়ার মহত্ত্ব, অথবা ইওরোপের শক্তি-সাম্য। অথবা "প্রগতি" নামধারী ইওরোপীয় কিছু সংস্কৃতি—আমার কাছে ভাল বা খারাপ যাই মনে হোক, একথা তো স্বীকার করতেই হবে যে প্রতিটি ঐতিহাসিক চরিত্রের এসব ছাড়াও এমন কিছু সাধারণ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থাকে যা আমার কাছে অনধিগম্য।

কিন্তু ধরে নেওয়া যাক যে বিজ্ঞান নামক শক্তিটি সব বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করে ,ভাল-মন্দের এমন একটা শাশ্বত মাপ-কাঠি আমাদের হাতে তুলে দিতে পারে যা দিয়ে ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনাবলীর বিচার করা যেতে পারে: বলা যাক যে আলেক্সান্দার সব কিছুই অন্যভাবে করতে পারত, বলা যাক—আজকের নিন্দুকরা জাতীয়তা, স্বাধীনতা, সাম্য ও প্রগতির যে কর্মসূচী তাকে দিত সেই অনুসারেই সেসব কাজ করতেও পারত। ধরা যাক, এই কর্মসূচী প্রনয়ণ তখন সম্ভব ছিল, এবং আলেক্সান্দার তদনুসারেই সব কাজই করল। কিন্তু তৎকালীন সরকারী রীতিনীতির যারা বিরোধিতা করেছিল, ইতিহাসকারদের মতে যাদের কাজকর্ম ছিল ভাল ও কল্যাণকর, সেক্ষেত্রে তাদের কি হত? তাদের কাজকর্মের তো কোন

অস্তিত্বই থাকত না : থাকত না জীবনের লক্ষণ, থাকত না কিছুই।

একথা যদি আমরা স্বীকার করি যে মানুষের জীবন বুদ্ধির দ্বারা পরি-চালিত; তাহলে তো জীবনের সম্ভাবনাকেই ধ্বংস করা হয়।

অধ্যায়—২

যদি ইতিহাসকারদের মতই ধরে নেওয়া হয় যে মহাপুরুষরাই মানব সমাজকে বিশেষ বিশেষ লক্ষ্যে পৌছে দেয়—যেমন রাশিয়া অথবা ফ্রান্সের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠা, ইওরোপের শক্তি-সাম্য প্রতিষ্ঠা, বিপ্লবের ভাবধারার প্রচার, সাধারণ অগ্রগতি, বা অন্য কিছু—তাহলে তো আকস্মিকতা ও প্রতিভার তত্ত্ব ছাড়া ইতিহাসের ঘটনাবলীকে ব্যাখ্যা করাই অসম্ভব হয়ে পড়ে।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতে যেসব ইওরোপীয় যুদ্ধ হয়েছিল তার লক্ষ্য যদি হয়ে থাকে রাশিয়ার উচ্চাকাংখার পূর্ণতা, তাহলে তো পূর্ববর্তী সব যুদ্ধ ও এই অভিযান ছাড়াই সে লক্ষ্যসাধন করা যেত। আবার ফ্রান্সের উচ্চা-কাংখাই যদি তার লক্ষ্য হয়ে থাকে তাহলেও তো বিপ্লব ও সাম্রাজ্য ছাড়াই তা পূর্ণ করা যেত। নব ভাবধারার প্রচারই যদি তার লক্ষ্য হত তাহলে তো যুদ্ধ-বিগ্রহের পরিবর্তে মুদ্রণ-যন্ত্রই সে কাজ আরও ভালভাবে করতে পারত। সভ্যতার অগ্রগতি যদি লক্ষ্য হত তাহলে তো সহজেই বোঝা যায় যে সম্পত্তি ও মানব জীবনের ধ্বংস সাধন ছাড়াই সভ্যতা বিস্তারের আরও অনেক ভাল ভাল পথ আছে।

তাহলে ঘটনাগুলি অন্যভাবে না ঘটে এভাবে ঘটল কেন?

কারণ এটাই প্রকৃত ঘটনা! ইতিহাস বলে, "আকস্মিকতা পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল, আর প্রতিভা সেটাকে কাজে লাগিয়েছিল।"

কিন্তু আকস্মিকতা কি? প্রতিভাই বা কি?

আকস্মিকতা এবং প্রতিভা কোন সত্যিকারের বস্তুকে বোঝায় না; কাজেই তাদের সংজ্ঞাও দেওয়া যায় না। এই কথা দুটি ঘটনাকে বোঝার একটা স্তরের দ্যোতকমাত্র। একটা বিশেষ ঘটনা কেন ঘটে তা আমি জানি না; আমি মনে করি সেটা জানা যায় না; আর তাই আমি সেটা জানতে চেষ্টাও করি না, আকস্মিকতার দোহাই পাড়ি। আমি দেখি, এমন একটা শক্তি কতকগুলি ফল ফলায় যা সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে; এটা কেন ঘটে তা আমি জানি না, তাই প্রতিভার কথা বলি।

মেষপালক একদল ভেড়ার মধ্যে যে ভেড়াটাকে রোজ একটা বিশেষ খোঁয়াড়ে নিয়ে গিয়ে দানা-পানি দেয়, সেটাই অন্যগুলির চাইতে দ্বিগুণ মোটা হয়, এবং প্রতিভাধর হয়ে ওঠে। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে সেই চর্বিওয়ালা মোটা ভেড়াটাকেই মাংসের প্রয়োজনে জবাই করা হয়।

কিন্তু একটু চিন্তা করলেই ভেড়ার দল বুঝতে পারে যে তাদের

ভাগ্যে যা কিছু ঘটে তা তাদের ভেড়ার উপযুক্ত লক্ষ্য সাধনের জন্যই ঘটে ; তাদেরও এ সত্য স্বীকার করতেই হবে তাদের ভাগ্যে যা ঘটেছে তার উপর তাদের কোন হাত ছিল না ; তাহলেই পুরুষ্টু ভেড়াটার ভাগ্যের পরিণতিটা তারা সহজেই বুঝতে পারবে। কেন তাদের পুরুষ্টু করা হয় সেটা যদি বুঝতে নাও পারে, অন্তত এটুকু তারা বুঝতে পারবে যে ঐ ভেড়াটার কপালে যা ঘটেছে সেটা আকস্মিকভাবে ঘটে নি ; তাহলেই তাদের আর আকস্মিকতা অথবা প্রতিভার তত্ত্বের কোন দরকার হবে না।

আমাদের কেবল এইটুকু স্বীকার করতে হবে যে ইওরোপের সেই প্রচণ্ড আলোড়নের উদ্দেশ্য কি ছিল তা আমরা জানি না, আমরা জানি শুধু যা ঘটেছে তাকে—অর্থাৎ নরহত্যা—প্রথমে ফ্রান্সে, তারপর ইতালিতে, আফ্রিকায়, প্রাশিয়ায়, অস্ট্রিয়ায়, স্পেনে ও রাশিয়ায় ; আরও জানি, পশ্চিম থেকে পূবে এবং পূব থেকে পশ্চিমে মানুষের চলাচল ও গতিবিধিই এই সব ঘটনার মূল কথা ও উদ্দেশ্য ; তার জন্য নেপোলিয়ন ও আলেক্সান্দারের মধ্যে কোন বিরল ক্ষমতা ও প্রতিভার খোঁজ করার কোন দরকার হয় না ; তাদের সাধারণ মানুষের চাইতে অন্য কিছু বলে মনে করা আর তখন সম্ভবই হবে না ; যেসব ছোটখাট ঘটনা এই লোকগুলিকে এত বড় করে তুলেছে তাকে ব্যাখ্যা করার জন্য কোনরকম আকস্মিকতার আশ্রয়ও আমাদের নিতে হবে না ; বরং এই সত্যই আমরা স্পষ্ট করে উপলব্ধি করতে পারব যে ঐসব ছোটখাট ঘটনাগুলি একান্তই অনিবার্য ছিল।

চরম উদ্দেশ্যকে জানার দাবীকে অস্বীকার করলেই আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারব যে কোন একটি গাছে যে ফুল ফোটে বা ফল ফলে তার চাইতে ভাল ফুল ফোটা বা ফল ফলার কথা যেমন কেউ কল্পনা করতে পারে না, তেমনই নেপোলিয়ন ও আলেক্সান্দার যে লক্ষ্য সাধন করেছিল অন্য কোন দুটি মানুষ যে তাদের চাইতে ভালভাবে সে লক্ষ্য সাধন করতে পারত সে কল্পনা করাও অসম্ভব।

অধ্যায়—৩

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইয়োরোপে যেসব ঘটনা ঘটেছে তার মূলগত প্রধান তাৎপর্যই হচ্ছে ইয়োরোপের অধিকাংশ মানুষের স্থান-পরিবর্তন—প্রথমে পশ্চিম থেকে পূবে, এবং পরে পূব থেকে পশ্চিমে। শুরুতে ছিল পশ্চিম থেকে পূবে যাওয়া। পশ্চিমের মানুষরা যাতে মস্কোতে একটা যুদ্ধকালীন অভিযান চালাতে পারে তার জন্য প্রয়োজন ছিল (১) পূবের রণকুশল সামরিক গোষ্ঠির সঙ্গে সংঘর্ষে এঁটে উঠবার মত যথেষ্ট সংখ্যক একটি সামরিক গোষ্ঠি-রূপে নিজেদের গড়ে তোলা, (২) প্রতিষ্ঠিত সব রকম ঐতিহ্য ও রীতিনীতিকে

বিসর্জন দেওয়া, এবং (৩) সামরিক অভিযানের সময় নেতৃপদে এমন একজন লোককে রাখা যে অভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় সব রকম প্রতারণা, দস্যুবৃত্তি ও নরহত্যাকে সমর্থন করতে পারবে।

ফরাসী বিপ্লবের শুরু থেকেই অনুপযুক্ত পুরনো বড় দলটাকে এবং সেই-সঙ্গে পুরনো সব অভ্যাস ও ঐতিহ্যকে ধ্বংস করা হতে লাগল, এবং ধাপে ধাপে তার চাইতেও বড় এমন আর একটা দলকে গড়া হতে লাগল যাদের রীতিনীতি নতুন আর ঐতিহ্যও নতুন, এবং এমন একজনকে মাথার উপরে বসানো হল যে যা কিছু করা হোক না কেন সে সব কিছুর দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

বিচিত্র এক যোগাযোগের ফলে বিভিন্ন ক্রমবর্ধমান ফরাসী উপদলের ভিতর থেকে এমন একটি লোকের আবির্ভাব ঘটল যার কোন পূর্ব ইতিহাস নেই, ঐতিহ্য নেই, নাম নেই, এমন কি যে নিজে ফরাসীও নয়। কোন দলে যোগ না দিলেও তাকেই ঠেলে দেওয়া হল সকলের সম্মুখে।

সহকর্মীদের অজ্ঞতা, বিরোধী শক্তিগুলির দুর্বলতা ও গুরুত্বহীনতা, খোলাখুলি নিজের মিথ্যাকে স্বীকার করতে পারা, আর সর্বোপরি একটা চোখ-ধাঁধানো ও আত্মবিশ্বাসে ভরপুর সীমাবদ্ধতাই সেই লোকটিকে সামরিক নেতৃপদে উন্নীত করে দিল। যে বাহিনীটিকে ইতালিতে পাঠানো হল তার সৈনিকদের ক্ষুরধার রণকুশলতা, প্রতিপক্ষগুলির যুদ্ধে অনীহা, এবং নিজের শিশুসুলভ ঔদ্ধত্য ও আত্ম-বিশ্বাসই তাকে এনে দিল সামরিক খ্যাতি। সে যেখানে যায় সেখানেই অসংখ্য তথাকথিত সুযোগ যায় তার সঙ্গে। ফ্রান্সের শাসক দলের বিরাগভাজন হওয়াটাও তার ভাগ্যে অনুকূল হয়েই দেখা দেয়। পূর্বনির্দিষ্ট পথগুলি এড়িয়ে চলার চেষ্টাও সফল হল না: রাশিয়ার চাকরিতে তাকে নেওয়া হল না, তুরস্কে চাকরির চেষ্টা ব্যর্থ হল। ইতালির যুদ্ধে বার বার ধ্বংসের একেবারে মুখোমুখি হয়েও প্রতিবারই একান্ত অপ্রত্যাশিত-ভাবে সে রক্ষা পেল। যেসব রুশ বাহিনীর হাতে তার সুনাম ও মর্যাদা নষ্ট হতে পারত তারাও নানারকম কূটনৈতিক কারণে তখন মঞ্চে অবতীর্ণ হতে পারল না।

ইতালি থেকে ফিরে গিয়ে সে দেখতে পেল, প্যারিসের শাসন-ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার মুখে; শাসন-ক্ষমতায় যারা অধিষ্ঠিত ছিল সেই ভাঙনের মুখে তারা অনিবার্যভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। আর ঘটনাক্রমেই এই বিপদ থেকে উদ্ধারের একটা সুযোগ এল আফ্রিকায় একটি উদ্দেশ্যহীন ও অর্থহীন অভিযানের রূপে। আবার সেই তথাকথিত, আকস্মিক সুযোগ হল তার সঙ্গী। একটা গুলিও ছোঁড়া হল না, অথচ দুর্ভেদ্য মাল্টা আত্মসমর্পণ করল; তার অত্যন্ত বেপরোয়া পরিকল্পনাগুলিও সাফল্যমণ্ডিত হল। শত্রুপক্ষের যে নৌবহরের চোখ এড়িয়ে পরবর্তীকালে একটি নৌকোও পার পায় নি

তার চোখে ধুলো দিয়ে তার গোটা বাহিনী নির্বিঘ্নে সরে পড়ল। আফ্রিকায় প্রায় নিরস্ত্র অধিবাসীদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালানো হল। আর যারা এইসব অপরাধ করল তারা, বিশেষ করে তাদের নেতা, নিজেদের নিশ্চিত করে বোঝাল যে একাজ তো প্রশংসার্হ, গৌরবজনক—সিজার ও মহান আলেক্সন্দারও তো এই কাজই করেছে, আর তাই এ কাজ সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত।

গৌরব ও আভিজাত্যের এই আদর্শই এই লোক ও তার সঙ্গীসাথীদের আফ্রিকায় নিয়ে গেল সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে। সে যা কিছু করে তাতেই আসে সাফল্য। মহামারী তাকে স্পর্শ করে না। বন্দীকে হত্যার নিষ্ঠুরতাও তার বেলায় অপরাধ বলে গণ্য হয় না। সঙ্গীসাথীদের বিপদের মুখে ফেলে রেখে সে যখন নিতান্ত ছেলেমানুষের মত অকারণে অত্যন্ত হীনভাবে আফ্রিকা থেকে চলে গেল তখন সেজন্য তাকে প্রশংসাই করা হল, এবং পুনরায় শত্রু-পক্ষের নৌবহর দুই দুই বার তাকে পালাতে দিল। সফলতার সঙ্গে এইসব অপরাধ করার উল্লাসে মত্ত হয়ে সে যখন প্যারিসে পৌছল তখন দেখা গেল, যে প্রজাতন্ত্রী সরকার এক বছর আগে তাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে পারত তার নাভিশ্বাস উঠেছে। সেইমুহূর্তে সবরকম দলগত রেশারেশি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত একজন নবাগত হিসেবে তার উপস্থিতি স্বভাবতই তাকে তুলে ধরল উচ্চ পদে—আর নিজের সেরকম কোন পরিকল্পনা না থাকলেও সেই নতুন ভূমিকার জন্য সে তখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

তার কোন পরিকল্পনা ছিল না, সব কিছুতেই তার ভয়, তবু সব দলই তাকে আঁকড়ে ধরল, তার সহযোগিতা দাবী করল।

ইতালি ও মিশরে অর্জিত গৌরব ও সুনাম তখন তার করায়ত্ত; তার উপর আছে তার উন্মাদোচিত আত্ম-প্রশস্তি, যেকোন অন্যায় কাজ করার উপযুক্ত সাহসিকতা এবং খোলাখুলি মিথ্যা বলার ক্ষমতা। কাজেই আসন্ন কর্তব্য সাধনের সেই তো একমাত্র যোগ্য লোক।

আসনটি তো তার জন্যই অপেক্ষা করে ছিল; কাজেই নিজের ইচ্ছা ছাড়াই এবং নিজের অস্থিরচিত্ততা, পরিকল্পনার অভাব, এবং সব ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সে জড়িয়ে পড়ল। সে ষড়যন্ত্র সফল হল।

আইন-পরিষদের একটা সভায় তাকে জোর করে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। ভয়ে তার দিশেহারা অবস্থা; কোন রকমে পালাতে পারলে বাঁচে। মূর্ছা যাবার ভান করে সে এমন সব অর্থহীন উক্তি করে বসল যাতে তার বারোটা বেজে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ফ্রান্সের একদা গর্বিত ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি শাসকরা তখন বুঝতে পেরেছে যে তাদের খেলা সাঙ্গ হয়েছে, তারা তখন সেই লোকটির চাইতেও বিমূঢ়; যেসব কথা বললে সেইমুহূর্তেই তাকে ধ্বংস করা যেত তা তারা মুখেই আনল না।

আকস্মিক সুযোগ, লক্ষ লক্ষ আকস্মিক সুযোগ তার হাতে তুলে দিল

ক্ষমতা, আর সকলেই যেন চুক্তি করে সে ক্ষমতাকে সমর্থন জানাল। ফ্রান্সের যে শাসকরা তার কাছে নতি স্বীকার করল তারাও আকস্মিকতারই ফসল; সেই আকস্মিকতার প্রভাবেই রাশিয়ার প্রথম পল তার রাজত্বকে স্বীকৃতি দিল; ঘটনাচক্রেই তার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র করা হল তা যে ব্যর্থ হল তাই শুধু নয়, তার ফলে তার শক্তি আরও বৃদ্ধি পেল। আকস্মিক ঘটনার ফলেই ডুক্ দ্য এঙ্ঘিন তার হাতে পড়ে, অপ্রত্যাশিতভাবে তার হাতেই নিহত হয়—ফলে জনতার মনে এই ধারণাই দৃঢ়তর হয় যে একাজ করার অধিকার তার আছে, কারণ সে শক্তি তার আছে। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে একটা অভিযানের উদ্যোগ-আয়োজন করেও (করলে হয় তো তার ধ্বংসই ছিল অনিবার্য) আকস্মিক ঘটনাচক্রেই সে বাসনা পরিত্যাগ করে অপ্রত্যাশিতভাবে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল ম্যাক্ ও অষ্ট্রিয়ানদের উপরে, আর বিনা যুদ্ধে তারা আত্ম-সমর্পণ করল। আকস্মিক ঘটনাচক্র আর প্রতিভাই তাকে বিজয়-গৌরব এনে দিল অস্তারলিজ-এ; আর আকস্মিকভাবেই সব মানুষ, কেবল ফ্রান্সের নয়, সারা ইয়োরোপের মানুষ—একমাত্র ইংলণ্ড বাদে—স্বীকার করে নিল তার কর্তৃত্ব, তার নতুন পদ-মর্যাদা, তার গৌরব ও জাঁকজমকের আদর্শ।

নিজেদের শক্তির পরিমাপ করতে এবং আসন্ন অভিযানের জন্য প্রস্তুত হতেই পশ্চিমদেশীয় শক্তিগুলি বার বার পূবের দিকে পা বাড়াল—১৮০৫, ১৮০৬, ১৮০৭, ও ১৮০৯-এ ও আর উত্তরোত্তর তাদের শক্তি বাড়তে লাগল। ১৮১১-তে যে জন-গোষ্ঠিটি গড়ে উঠেছিল ফ্রান্সে, তার সঙ্গে এককাট্টা হয়ে যোগ দিল মধ্য ইয়োরোপের একটা বড় জন-গোষ্ঠি। দল যত বড় হতে লাগল দলপতির শক্তি ততই বাড়তে লাগল। দশ বছরব্যাপী প্রস্তুতির কালে এই লোকটি ইয়োরোপের সব রাজা-রাজরার সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলল। একের পর এক তারা ছুটে এল তার কাছে নতি স্বীকার করতে। এই মহামানবটির করুণা লাভের আশায় প্রাশিয়ার রাজা পাঠাল নিজের স্ত্রীকে; এই লোকটি যদি সিজার-বংশের একটি কন্যাকে তার শয্যা-সঙ্গিনী করে তাহলে অষ্ট্রিয়ার সম্রাট নিজেকে অনুগৃহীত মনে করবে; সব জাতির কাছে যা কিছু পবিত্র তার প্রতিভূস্বরূপ পোপ এই মহামানবটিকে তুষ্ট করতে ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করল। যেন স্বীয় ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য নেপোলিয়ন নিজেকে তৈরি করছে না, যারা রয়েছে তার চারপাশে তারাই তাকে তৈরি করে তুলছে আসন্ন ঘটনাবলীর দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত করে। এমন কোন কাজ, কোন পাপ, কোন ছোটখাট জালিয়াতি সে করে নি যা তার সাঙ্গপাঙ্গদের মুখে মহৎ কীর্তি হিসাবে ঘোষিত হয় নি। জার্মানরা তো তার সম্মানে জেনা ও অরস্তাদ-এ একটা ভোজ-সভারই আয়োজন করেছিল। এই লোকটি শুধু নিজেই মহান নয়, মহান তার পূর্বপুরুষরা, তার ভ্রাতাগণ, তার বি-পুত্রগণ, ও শ্যালকগণও। যেটুকু বুদ্ধি-বিবেচনা তার মধ্যে অবশিষ্ট ছিল

সেটুকুও নিঃশেষ করে একটা ভয়ংকর ভূমিকা পালনের জন্ম তাকে প্রস্তুত করে তুলতে সব কিছুই করা হল। এইভাবে সে নিজে যখন প্রস্তুত হল, তখনকার সৈন্যরাও প্রস্তুত।

অভিযান পূবদিকে অগ্রসর হল—পৌছল চরম লক্ষ্য মস্কোতে। নগর অধিকৃত হল; অস্তারলিজ থেকে ওয়াগ্রাম পর্যন্ত আগেকার সব যুদ্ধে শক্র-পক্ষের যত ক্ষতি হয়েছিল এবার তার চাইতে অনেক বেশী ক্ষয়-ক্ষতি হল রুশ-বাহিনীর। কিন্তু এবার চাকা ঘুরল। যে আকস্মিকতা ও প্রতিভা এতদিন সাফল্যের পর সাফল্যের এক নির্বিঘ্ন স্রোতের মুখে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে এসেছে পূর্বনির্দিষ্ট লক্ষ্যের পথে, হঠাৎ এবার তার পরিবর্তে দেখা দিল অসংখ্য আকস্মিক ঘটনার এক উল্টো স্রোত—বরদিনোতে তার মাথায় সর্দি বসে যাওয়া থেকে মস্কোর অগ্নিকাণ্ডের স্ফুলিঙ্গ ও বরফপাত পর্যন্ত—আর প্রতিভার পরিবর্তে এবার স্পষ্ট হয়ে উঠল নির্বুদ্ধিতা ও অপরিমেয় নীচতা।

আক্রমণকারীরা পালাচ্ছে, ফিরে দাঁড়াচ্ছে, আবার পালাচ্ছে; এবার কিন্তু আকস্মিকতার স্রোত বইতে লাগল নেপোলিয়নের স্বপক্ষে না হয়ে তার বিরুদ্ধে।

আগেকার পশ্চিম-পূব অভিযানের মতই একটা বড় রকমের পূব-পশ্চিম পাল্টা অভিযান গড়ে উঠল। ১৮০৫, ১৮০৭ ও ১৮০৯-এর অভিযানের মতই একটা পূব-পশ্চিম অভিযান শুরু হল, সেই একইভাবে দলের পর দল এসে যোগ দিতে লাগল; যোগ দিল মধ্য ইয়োরোপের মানুষরা; মাঝপথে সেই একই ইতস্ততভাব, এবং লক্ষ্যে পৌছবার পথে সেই একই ক্রমবর্ধমান দ্রুতগতি।

শেষ লক্ষ্য প্যারিসে পৌছনো হল। নেপোলিয়নের রাজত্ব ও বাহিনী ধ্বংস হল। নেপোলিয়নের কিছুই আর করার নেই; এখন তার সব কাজই সকরুণ ও নীচ। কিন্তু আবার ঘটল সেই দুর্বোধ্য আকস্মিক ঘটনা। মিত্র-শক্তিরা নেপোলিয়নকে ঘৃণা করে; তাকেই মনে করে তাদের সব দুঃখ-দুর্দশার কারণ। ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থেকে বিচ্যুৎ হয়ে, সব পাপকর্ম ও চালাকি ধরা পড়ে যাওয়ার ফলে, সকলের চোখেই তার সমাজচ্যুত দুষ্কৃতকারীর সেই মূর্তিই ফুটে ওঠা উচিত ছিল যা সে ছিল দশ বছর আগে এবং পরের এক বছর। কিন্তু কোন বিচিত্র আকস্মিক ঘটনার ফলে সে মূর্তি কারও চোখে ধরা পড়ল না। তার অভিনয় এখনও শেষ হয় নি। যে মানুষটি দশ বছর আগে এবং পরের এক বছর ছিল একটি সমাজচ্যুত দুষ্কৃতকারী তাকে পাঠানো হল জাহাজে ফ্রান্স থেকে দু দিনের পথ একটা দ্বীপে; যেকারণেই হোক সেই দ্বীপটিকে তার রাজ্য হিসাবেই উপহার দেওয়া হল, তার জন্য রক্ষীর ব্যবস্থা করা হল, লক্ষ লক্ষ টাকা তাকে দেওয়া হল।

অধ্যায়—৪

জাতিসমূহের বন্যাস্রোত স্বাভাবিকখাতেই ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে এল। প্রবল আন্দোলনের তরঙ্গ স্তিমিত হয়ে এলেও তার শান্ত বুকে গড়ে উঠল অনেক ঘূর্ণাবর্ত, আর তাতে ভেসে বেড়াতে লাগল সেইসব কূটনীতিকের দল যাদের ধারণা তারাই বন্যাস্রোতকে স্তিমিত করেছে।

কিন্তু সমুদ্রের শান্ত বুক আবার সহসা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল: কূটনীতিকরা মনে করল, তাদের মতবিরোধিতাই প্রাকৃতিক শক্তির এই নতুন চাপের কারণ; তাদের ধারণা হল রাষ্ট্র-প্রধানদের মধ্যে আবার যুদ্ধ বাধবে; সে সংকটের কোন সমাধান নেই। কিন্তু সে ক্রমবর্ধমান তরঙ্গাভিঘাত তাদের প্রত্যাশিত অঞ্চল থেকে এল না। এল আগের মত সেই একই কেন্দ্র থেকে—এল প্যারিস থেকে। পশ্চিম থেকে দেখা দিল শেষ উল্টো টান: যে কূটনৈতিক সমস্যা ছিল আপাতবিচারে অনতিক্রমণীয় সেই উল্টো টানেই তার সমাধান হয়ে গেল; ইতিহাসের সেই অধ্যায়ের সামরিক অভিযানের অবসান ঘটল।

যে মানুষটি ফ্রান্সকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছিল সে ফ্রান্সে ফিরে এল একেবারে একা—কোন ষড়যন্ত্র করে নয়, কোন সৈন্য সঙ্গে নিয়ে নয়। তখন যেকোন রক্ষী তাকে বন্দী করতে পারত; কিন্তু কি এক বিচিত্র কারণে কেউ তা করল না; আগের দিন পর্যন্ত যে মানুষটিকে সকলে অভিশাপ দিয়েছে এবং একমাস পরে আবার অভিশাপ দেবে, তাকেই সকলে মহা উৎসাহে স্বাগত জানাল।

একটা সম্মিলিত পদক্ষেপের জন্য সে মানুষটিকে আজও প্রয়োজন।

সে কাজ সম্পন্ন হল।

শেষ ভূমিকার অভিনয় শেষ হল। অভিনেতাকে বলা হল: এবার রাজবেশ খুলে ফেল, মুখের পাউডার ও রং ধুয়ে ফেল। তাকে আর দরকার হবে না।

কয়েক বছর কেটে গেল। ইতিমধ্যে নিজের দ্বীপে একান্ত নির্জনে একটি করুণ হাসির নাটকে সে অভিনয় করে চলেছে; নিজের অতীত কর্মধারার কোন সমর্থনের আর কোন প্রয়োজন না থাকলেও ষড়যন্ত্র ও মিথ্যা ভাষণের দ্বারা তাকেই সমর্থন করে চলেছে। সারা জগতের কাছে এতদিনে এই সত্যই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, যতদিন পর্যন্ত একটি অদৃশ্য হাত তাকে পরিচালিত করেছে ততদিন মানুষ যাকে ক্ষমতাবলে ভুল করেছিল আসলে সেটা কি ছিল।

এবার নাটকের যবনিকা ফেলে দিয়ে এবং অভিনেতার সব সাজ-পোশাক খুলে ফেলে ম্যানেজার তাকে আমাদের সামনে এনে হাজির করল।

"দেখুন, কাকে আপনারা বিশ্বাস করেছিলেন! এই তো সেই লোক! এখন কি বুঝতে পেরেছেন যে আপনাদের যে মুগ্ধ করেছিল সে ঐ লোক নয়, সে আমি?"

কিন্তু ঘটনার তীব্রতায় হতচকিত হওয়ায় এ সত্য উপলব্ধি করতে মানুষের অনেক দেরি হয়ে গেল।

এর চাইতেও অধিকতর সামঞ্জস্য ও অনিবার্যতা চোখে পড়ে পূব থেকে পশ্চিমে পাল্টা আক্রমণের নায়ক প্রথম আলেক্সান্দারের জীবনে।

পূব-পশ্চিম অভিযানের নায়ক হিসাবে সে যখন অন্য সবাইকে ছাড়িয়ে মাথা তুলেছিল তখন তার কি কি গুণ থাকা দরকার ছিল?

দরকার ছিল ন্যায়বোধ ও ইয়োরোপীয় ঘটনাবলীর প্রতি সহানুভূতির; কিন্তু ক্ষুদ্র স্বার্থের দ্বারা আচ্ছন্ন গতানুগতিক সহানুভূতি নয়; তৎকালের যেসব রাষ্ট্রপ্রধান তার সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল তাদের অপেক্ষা উন্নত নৈতিক চরিত্র; একটি শান্ত, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব; আর নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ক্ষোভ। প্রথম আলেক্সান্দারের চরিত্রে এ সবই ছিল; অসংখ্য তথাকথিত আকস্মিক যোগাযোগ তার জীবনে এসবই গড়ে দিয়েছিল: তার শিক্ষা, প্রথম জীবনের উদারনৈতিক মতবাদ, চারদিকের পরামর্শদাতার দল, আর অস্তারলিজ, তিলজিট, ও এরফুর্ট।

জাতীয় যুদ্ধের সময়ে সে নিষ্ক্রিয় ছিল, কারণ তখন তাকে প্রয়োজন হয় নি। কিন্তু যেমুহূর্তে একটি ব্যাপক ইয়োরোপীয় যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠল, সেইমুহূর্তেই সে স্বস্থানে আবির্ভূত হয়ে ইয়োরোপের দেশগুলিকে সংঘবদ্ধ করে লক্ষ্যপথে এগিয়ে নিয়ে গেল।

লক্ষ্যে পৌঁছনো হল। ১৮১৫-র চূড়ান্ত যুদ্ধের পরে সর্বরকম সম্ভবপর ক্ষমতা আলেক্সান্দারের করায়ত্ত হল। কিন্তু সে ক্ষমতাকে সে কিভাবে ব্যবহার করল?

প্রথম আলেক্সান্দার ইয়োরোপে শান্তির প্রতিষ্ঠাতা, প্রথম জীবন থেকেই নিজের দেশের মানুষের কল্যাণ সাধনে সচেষ্ট, পিতৃভূমিতে নব নব উদার-নৈতিক চিন্তাধারার প্রবর্তক। তার হাতে এখন সর্বাধিক ক্ষমতা। দেশের মানুষের কল্যাণ সাধনের এই তো উপযুক্ত সময়। সুদূর দ্বীপে বসে নির্বাসিত নেপোলিয়ন ছেলেমানুষের মত মিথ্যা স্বপ্ন দেখছে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকলে কেমন করে সে মানবজাতিকে সুখের পথ দেখাতে পারত। প্রথম আলেক্সান্দারের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে, ঈশ্বরের হাত নেমেছে তার মাথায়; অথচ সহসা তার মনে হল, এ ক্ষমতা অতি তুচ্ছ; তাই দূরে সরে গিয়ে সব ক্ষমতা সে তুলে দিল সেইসব নগণ্য মানুষদের হাতে যাদের সে এতকাল ঘৃণা করে

এসেছে। মুখে একমাত্র কথা :

"আমাদের জন্য নয়, আমাদের জন্য নয়, সব কিছু উৎসর্গিত হোক তোমারই নামে !...তোমাদের সকলের মতই আমিও তো মানুষ। মানুষের মতই আমাকে বাঁচতে দাও ; আত্মা ও ঈশ্বরের কথা চিন্তা করতে দাও।"

সূর্য এবং প্রতিটি পরমাণু যেমন একাধারে একটি সম্পূর্ণ জগৎ আবার একটা সমগ্র সত্তার অংশমাত্র, তেমনই প্রতিটি ব্যক্তি তার নিজস্ব আদর্শ ও লক্ষ্যের বাহক হয়েও মানব বুদ্ধির অতীত একটি সাধারণ আদর্শের ও লক্ষ্যের বাহক।

একটি মৌমাছি ফুলের উপর বসতে গিয়ে একটি শিশুর শরীরে হুল ফুটিয়ে দিল। সেই থেকে শিশুটি মৌমাছিকে ভয় পায় ; বলে যে মানুষের শরীরে হুল ফোটাতেই মৌমাছির জন্ম। মৌমাছিকে ফুলের পাপড়ি থেকে মধু সংগ্রহ করতে দেখে কবি তার প্রশংসা করে, আবার একথাও বলে যে ফুলের গন্ধ লুটতেই মৌমাছির জন্ম। ফুল থেকে পরাগ সংগ্রহ করে মৌমাছি যখন তাকে মৌচাকে বয়ে নিয়ে যায় তখন একজন মৌমাছি-পালক বলে যে মধু-সংগ্রহ করাই মৌমাছির কাজ। আবার অন্য একজন মৌমাছি-পালক যে মৌমাছির জীবনযাত্রা ভালভাবে লক্ষ্য করেছে সে বলে, মৌমাছি পরাগ-রেণু সংগ্রহ করে বাচ্চা মৌমাছিকে খাওয়াতে এবং মক্ষীরাণীকে বাঁচিয়ে রাখতে ; বংশবৃদ্ধির জন্যই তার জন্ম। একজন উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানী দেখে, একটি মৌমাছি পুং-পুষ্প থেকে পরাগ সংগ্রহ করে উড়ে গিয়ে তাকে গর্ভকেশরে স্থাপন করে ; তার কাছে এটাই মৌমাছি জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। অপর একজন উদ্ভিদের স্থানান্তরে গমনের ঘটনায় মৌমাছির সহযোগিতাকে লক্ষ্য করে বলে যে সেটাই মৌমাছির জীবনের লক্ষ্য। কিন্তু প্রথম, দ্বিতীয়, অথবা তৃতীয়—মানুষের বুদ্ধিগত কোন কর্মধারাই মৌমাছির জীবনের চরম লক্ষ্য হতে পারে না। এইসব উদ্দেশ্যের সন্ধানে মানুষের বুদ্ধি যত উপরে উঠতে থাকে ততই একটি সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে চরম লক্ষ্য আমাদের বুদ্ধির অতীত।

মৌমাছির জীবনের সঙ্গে জীবনের আত্মপ্রকাশের অন্য মাধ্যমগুলির সম্পর্কটাই একমাত্র জিনিস মানুষের বুদ্ধি যাকে ধরতে পারে। ঐতিহাসিক চরিত্র ও জাতিসমূহের উদ্দেশ্যের বেলায়ও একথা সমান সত্য।

অধ্যায়—৫

১৮১৩ সালে বেজুখভের সঙ্গে নাতাশার বিয়েই প্রাচীন রস্তভ-পরিবারের শেষ সুখের ঘটনা। কাউন্ট ইলিয়া রস্তভ সেই বছরই মারা গেল ; আর

সর্বত্র যেরকম ঘটে থাকে, পিতার মৃত্যুর পরেই পারিবারিক বন্ধনও ভেঙে পড়ল।

আগের বছরের নানা ঘটনা : মস্কোর অগ্নিকাণ্ড ও সেখান থেকে পলায়ন, প্রিন্স আন্‌দ্রুর মৃত্যু, নাতাশার হতাশা, পেত্‌য়ার মৃত্যু, ও বৃদ্ধা কাউণ্টেসের শোক—আঘাতের পর আঘাত হানলো বুড়ো কাউণ্টের মাথায়। এসব ঘটনার কোন তাৎপর্যই সে বুঝতে পারল না ; আধ্যাত্মিক প্রশান্তির সঙ্গে সে পক্বকেশ মাথাটাকে নোয়াল ; যেন প্রার্থনা করল আরও আঘাত এসে তাকে শেষ করে দিক। তাকে কখনও মনে হত ভয়ার্ত ও হতবুদ্ধি, আবার কখনও মনে হত অসম্ভব রকমের জীবন্ত ও উদ্যমশীল।

নাতাশার বিয়ের ব্যবস্থাদি নিয়ে বেশ কিছুদিন ব্যস্ত থাকল। ডিনার ও সাপারের আয়োজন করল ; সবসময়ই চেষ্টা করত হাসি খুশি থাকতে ; কিন্তু যারা তাকে জানত, তাকে ভালবাসত তারা সবই বুঝত, বৃদ্ধকে করুণার চোখে দেখত।

পিয়ের ও তার স্ত্রী চলে গেলে সে খুবই চুপচাপ হয়ে গেল ; সব সময়ই বলতে লাগল, কিছুই তার ভাল লাগে না। কয়েকদিন পরেই সে অসুস্থ হয়ে বিছানা নিল। ডাক্তার যতই আশা দিক, প্রথম থেকেই সে জানত যে আর কোনদিনই সে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবে না। কাউণ্টেস পোশাক না ছেড়েই তার বালিশের পাশে একটা হাতল-চেয়ারে বসে পক্ষকাল কাটিয়ে দিল। যতবার কাউণ্টকে ওষুধ খাওয়ায় ততবারই সে ফুঁপিয়ে কেঁদে নিঃশব্দে তার হাতে চুমো খেত। শেষ দিনেও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে তাদের সম্পত্তি নষ্ট করার জন্য কাউণ্টেসের কাছে, তাদের অনুপস্থিত ছেলের কাছে ক্ষমা চাইত —তার ধারণা তাদের কাছে সেটাই তার প্রধান অপরাধ। অনুষ্ঠানাদির পরে সে শান্তভাবে মারা গেল ; পরদিন দলে দলে পরিচিত লোকজন এসে মৃতের প্রতি তাদের শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে গেল। জীবিতকালে তারাই কাউণ্টকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করলেও এখন সকলেই বলল : "যাই বল না কেন কাউণ্ট খুবই যোগ্য লোক ছিলেন। আজকাল এরকম লোক চোখে পড়ে না।…নিজ নিজ দুর্বলতা আমাদের কার না আছে ?"

বাবার মৃত্যু-সংবাদ যখন নিকলাসের কাছে পৌঁছল তখন সে রুশ বাহিনীর সঙ্গে প্যারিসে ছিল। সঙ্গে সঙ্গে কমিশন থেকে পদত্যাগ করে পদত্যাগ-পত্র গৃহীত হবার জন্য অপেক্ষা না করেই সে ছুটি নিয়ে মস্কো চলে গেল। কাউণ্টের মৃত্যুর একমাস পরেই তার আর্থিক অবস্থা পরিষ্কার বোঝা গেল। তার যেসব ছোটখাট ধার-দেনার কথা কেউ সন্দেহই করে নি তাই যখন সর্বসাকুল্যে একটা মোটা অংক হয়ে দেখা দিল, তখন সকলেই বিস্মিত হল। ঋণের পরিমাণ সম্পত্তির মূল্যের দ্বিগুণ।

বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়রা নিকলাসকে উত্তরাধিকার অস্বীকার করার পরামর্শ

দিল। কিন্তু এই অস্বীকৃতি তার পিতার পবিত্র স্মৃতিকে কলংকিত করবে এ-কথা ভেবে সেসব পরামর্শ বাতিল করে দিয়ে সে উত্তরাধিকার এবং সেই সঙ্গে ঋণ-পরিশোধের দায়কে স্বীকার করে নিল।

যেসব পাওনাদার এতকাল চুপ করে ছিল এবার তারা সদলে এসে যার যার পাওনা-গণ্ডা দাবী করতে লাগল। এসব ক্ষেত্রে সাধারণত যা ঘটে থাকে, কার আগে কে পাওনা বুঝে পাবে তাই নিয়ে পাওনাদারদের মধ্যে রীতিমত প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। নিকলাসকে কেউ এতটুকু রেহাই দিল না, শান্তি দিল না; এতকাল যারা বুড়ো মানুষটিকে করুণা করে এসেছে তারাই উত্তরাধিকারী যুবকটিকে নির্মমভাবে ছেঁকে ধরল।

নিকলাসের কোন পরিকল্পনাই সফল হল না। নিলামে সম্পত্তি বিক্রি হয়ে গেল অর্ধেক মূল্যে; অর্ধেক ঋণ তখনও বাকি রয়ে গেল। ভগ্নিপতি বের্জুখভ যে ত্রিশ হাজার রুবল দিল নিকলাস সেটা হাত পেতে নিল। অবশিষ্ট ঋণের দায়ে পাছে জেল খাটতে হয় তাই সে নতুন করে সরকারী চাকরি গ্রহণ করল।

পরবর্তী শূন্য পদেই তাকে কর্ণেল করা হবে জেনেও সে সেনাবাহিনীতে ফিরে যেতে পারল না, কারণ জীবনের একমাত্র অবলম্বন হিসাবে মা তাকে সম্পূর্ণভাবে আঁকড়ে ধরল; কাজেই পরিচিত লোকজনের মাঝখানে মস্কোতে বাস করতে যত অনিচ্ছাই থাকুক, সিভিল সার্ভিসের চাকরিকে যতই ঘৃণা করুক, তবু মস্কোতে সেই চাকরিতেই সে ঢুকল, অতি প্রিয় সামরিক পরিচ্ছদ খুলে ফেলে মাকে ও সোনিয়াকে নিয়ে মস্কোর দরিদ্র পল্লী সিভ্‌ৎসেভ ভ্রাঝেক-এর একটা ছোট বাড়িতে গিয়ে উঠল।

সেসময় নাতাশা ও পিয়ের পিতার্সবুর্গে বাস করছিল; নিকলাসের অবস্থার কোন স্পষ্ট ধারণা তাদের ছিল না। ভগ্নিপতির কাছ থেকে টাকা ধার নেওয়ার জন্য নিজের শোচনীয় অবস্থাটা তার কাছ থেকে গোপন রাখতেই সে চেষ্টা করেছিল। তার অবস্থা আরও সংকটজনক হয়ে উঠল কারণ বারো শ' রুবল মাস-মাইনেতে তাকে যে মার, সোনিয়ার ও নিজের খরচ চালাতে হচ্ছে তাই শুধু নয়, তাদের দারিদ্র্যের খবরটা মার কাছ থেকে লুকিয়েও রাখতে হচ্ছে। যে বিলাস ও প্রাচুর্যের মধ্যে কাউন্টেস শৈশব থেকে লালিত-পালিত হয়েছে তাকে বাদ দিয়ে জীবন ধারণ করার কথা সে ভাবতেই পারে না; কাজেই ছেলের পক্ষে কতটা কষ্টকর হতে পারে সেটা না বুঝেই কাউন্টেস কোন বান্ধবীকে বাড়িতে ডেকে আনতে গাড়ি পাঠাতে বলে (এখন তাদের নিজেদের গাড়ি নেই), কখনও বা নিজের জন্য হুকুম করে দামী খাবারের, ছেলের জন্য মদের, অথবা হয় নাতাশার জন্য, নয় তো সোনিয়ার জন্য, না হয় নিকলাসের জন্যই কোন দামী উপহারের দরুন টাকার জন্য চাপ দেয়।

সোনিয়া সংসার চালায়, মাসির সেবা করে, তাকে পড়ে শোনায়, তার

খেয়াল ও বদমেজাজ সহ্য করে, এবং কাউণ্টেসের কাছ থেকে সংসারের দারিদ্র্যকে ঢেকে রাখতে নিকলাসকে সাহায্য করে। তার মার জন্য সোনিয়া যা করছে সেজন্য নিকলাস তার প্রতি অপরিশোধ্য ঋণ অনুভব করে, তার ধৈর্য ও সেবার প্রশংসা করে, কিন্তু সব সময় তার কাছ থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করে।

নিকলাসের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয়তর হতে লাগল। মাস-মাইনে থেকে কিছু উদ্বৃত্ত রাখা স্বপ্নবৎ অলিক। কিছু জমাতে তো পারেই না, বরং মার দাবী-দাওয়া মেটাতে তাকে কিছু কিছু ধার-দেনাও করতে হয়। কিছু কিছু আত্মীয়ার পরামর্শমত কোন ধনবতী নারীকে বিয়ে করার কথা সে ভাবতেই পারে না। মুক্তির আর একটা পথ—মায়ের মৃত্যুর কথা কখনও তার মাথায়ই আসে নি। তার কোন কামনা নেই, কোন কিছুই সে আশা করে না। নিজের অবস্থাকে নীরবে সহ্য করতে পারার মধ্যেই সে মনে মনে একটা কঠোর সন্তুষ্টি অনুভব করে। পুরনো পরিচিত জন, তাদের সহানুভূতি ও সাহায্যের প্রস্তাব—সব কিছুকেই সে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করে। এড়িয়ে চলে সব রকম আমোদ-প্রমোদ ও সাধ-আহ্লাদ। এমন কি বাড়িতেও মার সঙ্গে তাস খেলা, ঘরময় পায়চারি করা, এবং একটার পর একটা পাইপ ধরানো ছাড়া আর কিছুই করে না। মনের মধ্যে সেই বিষণ্ণতাকেই সযত্নে লালন করে একমাত্র যার সাহায্যে এই দুরবস্থাকে সে সহ্য করতে পারে।

অধ্যায়—৬

শীতের গোড়াতেই প্রিন্সেস মারি মস্কোতে এল। শহরে প্রচলিত আলোচনা থেকেই সে রস্তভদের অবস্থা জানতে পারল, জানতে পারল "মায়ের জন্য ছেলের আত্মত্যাগের কথা।"

নিকলাসের প্রতি গভীর প্রীতিবশত মারি নিজের মনেই বলল, "তোমার কাছ থেকে এছাড়া অন্য কিছু আমি কখনও আশা করি নি।" নিজেকে সে রস্তভ পরিবারেরই একজন বলে মনে করে। তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করে সে ভাবল, এ অবস্থায় তাদের সঙ্গে একবার দেখা করা তার কর্তব্য। কিন্তু ভরোনেঝ্-এ নিকলাসের সঙ্গে সম্পর্কের কথা স্মরণ করে সেকাজ করার সাহস তার হচ্ছিল না। তবু মস্কোতে আসার কয়েক-সপ্তাহ পরে অনেক চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত তাদের সঙ্গে দেখা করতে গেল।

নিকলাসের ঘরের ভিতর দিয়েই কাউণ্টেসের ঘরে যাবার পথ; নিকলাসের সঙ্গেই তার প্রথম দেখা হল। প্রিন্সেস মারি আশা করেছিল নিকলাস তাকে সাদরেই গ্রহণ করবে, কিন্তু তার পরিবর্তে প্রথম দৃষ্টিতেই তার চোখে এমন একটা নিরাসক্ত, কঠিন, ও গর্বিতভাব দেখতে পেল যা সে

আগে কখনও দেখে নি। নিকলাস তার স্বাস্থ্যের কথা জানতে চাইল, মার ঘরে নিয়ে গেল, সেখানে পাঁচ মিনিট বসেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

প্রিন্সেস কাউণ্টেসের ঘর থেকে বেরিয়ে এলে নিকলাস আবার তার সঙ্গে দেখা করল, গম্ভীর, কঠিন মুখে তাকে নিয়ে বাইরের ঘরে গেল। মার স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে কোন জবাবই দিল না। তার চোখ-মুখ দেখে মনে হল যেন বলতে চায়: "তাতে তোমার কি দরকার? আমাকে শান্তিতে থাকতে দাও।"

প্রিন্সেসের গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে যাবার পরে সোনিয়াকে সামনে পেয়ে নিকলাস সোচ্চারে বলে উঠল, "কেন সে এখানে ঘুর্-ঘুর্ করতে আসে? কি চায় সে? এই সব মহিলা ও তাদের ভদ্রতাকে আমি সইতে পারি না।"

নিজের খুশিকে চেপে রাখতে না পেরে সোনিয়া বলে উঠল, "আঃ নিকলাস, এসব কথা তুমি বলতে পারলে কেমন করে? ও এত ভাল, আর মামণি ওকে এত ভালবাসে!"

নিকলাস জবাব দিল না, যেন প্রিন্সেসের কথা মুখেই আনতে চায় না। বুড়ি কাউণ্টেস কিন্তু সেই থেকে প্রতিদিনই বেশ কয়েকবার প্রিন্সেস মারির কথা বলে।

কাউণ্টেস তার গুণকীর্তন করে, ছেলেকে তার সঙ্গে দেখা করতে পীড়াপীড়ি করে, নিজে প্রায়ই তার সঙ্গে দেখা করতে চায়। কিন্তু নিকলাস সারাক্ষণ চুপ করেই থাকে। তাতে কাউণ্টেস আরও বিরক্ত হয়ে ওঠে।

বলে, "মেয়েটি বড় ভাল; খাসা মেয়ে। তার কাছে গিয়ে তোমার দেখা করা উচিত। তাছাড়া, সদাসর্বদা শুধু আমাদের মুখ দেখতে তো তোমার ভাল না লাগারই কথা।"

"কিন্তু মামণি, সেখানে যাবার ইচ্ছা আমার মোটেই নেই।"

"একসময় তুমি সেখানে যেতে চাইতে, আর এখন চাও না। সত্যি বলছি, তোমাকে আমি ঠিক বুঝতে পারি না। এই তোমার মন খারাপ হয়, এই তুমি কারও সঙ্গে দেখা করতে চাও না।"

"মন খারাপের কথা তো আমি কখনও বলি নি।"

"সে কি, এই তো নিজের মুখেই বললে তার সঙ্গে দেখা করতেও চাও না। ও তো খুব ভাল মেয়ে, তুমি তো সবসময়ই ওকে পছন্দ করতে, কিন্তু এখন যে হঠাৎ তোমার মাথায় কি ঢুকেছে তা তুমিই জান। আমার কাছে তুমি সব কথা লুকিয়ে চল।"

"মোটেই তা নয় মামণি।"

"তবু যদি তোমাকে কোন খারাপ কাজ করতে বলতাম—তোমাকে তো বলছি ভদ্রতার খাতিরে তার সঙ্গে একবার দেখা করতে। সৌজন্যের খাতিরেই তো সেটা করা দরকার…। ঠিক আছে, আমার বলা আমি বললাম,

এরপরেও যদি মার কাছ থেকে লুকোবার মত কোন গোপন কথা তোমার থাকে তো আমি তার মধ্যে নাক গলাতে চাই না।"

"বেশ তো, তুমি যদি চাও তো আমি যাব।"

"এটা তো আমার কোন ব্যাপার নয়। তোমার জন্যই কথাটা বলছি।"

নিকলাস দীর্ঘশ্বাস ফেলল, গোঁফ কামড়াল, তারপর মার মনটাকে অন্য দিকে ঘোরাতে তাস নিয়ে পেশেন্সের ছক বিছিয়ে দিল।

পরদিন সেই একই সংলাপের পুনরাবৃত্তি ঘটল; তার পরের দিন, এবং তারও পরের দিন।

রস্তভ পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে নিকলাসের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত রকমের শীতল অভ্যর্থনার পরে প্রিন্সেস মারিও নিজের কাছে স্বীকার করল যে প্রথম দেখা করতে না যাওয়াটাই তার উচিত ছিল।

আত্ম-গর্বে সে নিজেকে বোঝাল, "এছাড়া আর কিছু তো আমি আশা করি নি। তার কাছে তো আর কোন দরকার ছিল না। আমি গিয়েছিলাম বৃদ্ধা মহিলাটির সঙ্গে দেখা করতে; তিনি আমাকে চিরদিনই ভালবাসেন, তার কাছে আমি অনেক দিক থেকে দায়বদ্ধ।"

মধ্যশীতের একটা দিন। পড়ার ঘরে বসে সে ভাই-পোকে পড়াচ্ছিল, এমন সময় খবর এল রস্তভ এসেছে দেখা করতে। মনে মনে সংকল্প করল, কিছুতেই ধরা দেবে না, মনের উত্তেজনা কোন মতেই প্রকাশ করবে না। মাদ্‌ময়জেল বুরিয়েঁকে ডেকে পাঠিয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে বৈঠকখানায় গেল।

নিকলাসের মুখের দিকে প্রথম দৃষ্টিপাতেই প্রিন্সেস মারি বুঝতে পারল শুধুমাত্র সৌজন্যের খাতিরেই সে এসেছে; তাই নিজের স্বর সে মোটেই পাল্টাল না।

দুজনের মধ্যে কথা হল কাউন্টেসের স্বাস্থ্য নিয়ে, বন্ধুদের নিয়ে, যুদ্ধের সর্বশেষ সংবাদ নিয়ে। তারপর দশ মিনিট পরে ভদ্রতার পাট চুকে যেতেই নিকলাস বিদায় নিতে উঠে দাঁড়াল।

মাদ্‌ময়জেল বুরিয়েঁর সহায়তায় প্রিন্সেস বেশ ভালভাবেই কথাবার্তা চালিয়ে গেল; কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে নিকলাস যখন উঠে দাঁড়াল তখন যেন অসম্ভব একটা ক্লান্তি তাকে ঘিরে ধরল, মনে প্রশ্ন জাগল কেন সে জীবনে সুখের মুখ দেখতে পাবে না; অন্যমনস্কভাবে সে চুপ করে বসে রইল, উজ্জ্বল চোখ দুটি সামনের দিকে নিবদ্ধ, নিকলাস যে উঠে দাঁড়িয়েছে সেটাও সে লক্ষ্য করে নি।

নিকলাস তার দিকে তাকাল; হঠাৎ প্রিন্সেসের জন্য তার নিজেরই দুঃখ হল, মনে হল প্রিন্সেসের এই দুঃখের জন্য হয়তো সে নিজেই দায়ী। ইচ্ছা হল প্রিন্সেসকে একটু সাহায্য করে, কিছু ভাল কথা বলে, কিন্তু বলার মত কিছুই খুঁজে পেল না।

বলল, "বিদায় প্রিন্সেস!"

প্রিন্সেস চমকে উঠল, তার মুখ লাল হয়ে উঠল, গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল।

যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে বলল, "মাফ্ করবেন, আপনি কি সত্যি চলে যাচ্ছেন কাউন্ট? বেশ, তাহলে বিদায়! আরে, কাউণ্টেসের জন্য যে একটা কুশন দরকার!"

"একটু অপেক্ষা কর, আমি এনে দিচ্ছি," বলে মাদ্‌ময়জেল বুরিয়েঁ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দুজনই চুপ। মাঝে মাঝে একে অন্যকে দেখছে।

অবশেষে নিকলাস বিষণ্ণ হেসে বলল, "হ্যাঁ প্রিন্সেস; বগুচারোভোতে আমাদের শেষ সাক্ষাতের পরে খুব বেশী দিন পার হয় নি, হয়তো এরই মধ্যে কত জলই না গড়িয়ে গেছে। তখন আমরা সকলে কী দুঃখেই না পড়েছিলাম, অথচ সেই দিনগুলোকে ফিরিয়ে আনতে অনেক কিছু দিতেই আমি প্রস্তুত। ··· কিন্তু সেদিন আর ফিরবে না।"

প্রিন্সেস মারি উজ্জ্বল দুটি চোখ তুলে একদৃষ্টিতে নিকলাসের দিকে তাকাল। যেন তার কথাগুলির গোপন তাৎপর্যকে বুঝতেই চেষ্টা সে করছে। বলল, "ঠিক, ঠিক. কিন্তু অতীতের জন্য অনুশোচনা করার কোন কারণ তো আপনার নেই। আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা সম্পর্কে যতটুকু জেনেছি তাতে তো মনে হয় খুশির সঙ্গেই আপনি সে দিনকে স্মরণ করবেন, কারণ যে আত্মত্যাগের দ্বারা সে জীবন পরিপূর্ণ···"

নিকলাস তাড়াতাড়ি তাকে বাধা দিয়ে বলল, "আপনার প্রশংসা আমি মেনে নিতে পারলাম না; বরং নিজেকে আমি অবিরাম তিরস্কার করেই চলেছি।···কিন্তু না, এবিষয়টি মনের মতও নয়, সুখেরও নয়।"

নিকলাসের মুখে পুনরায় আগেকার মতই কাঠিন্য ও শীতলতা ফুটে উঠল। কিন্তু যে মানুষটিকে প্রিন্সেস জানত ও ভালবাসত তার দেখা সে এর মধ্যেই পেয়ে গেছে। তাকে উদ্দেশ করেই সে বলতে লাগল:

"ভেবেছিলাম একথা বলবার অনুমতি আপনি আমাকে দেবেন। আপনার···এবং আপনার পরিবারের অন্য সকলের এত কাছে আমি এসেছিলাম যে ভেবেছিলাম আমার সহানুভূতিকে আপনি ভুল বুঝবেন না; কিন্তু আমারই ভুল হয়েছিল।" হঠাৎ তার গলা কাঁপতে লাগল। "কেন জানি না আপনি যেন বদলে গেছেন, আর···"

"এ কেনর হাজার কারণ আছে,"—নিকলাস "কেন" কথাটার উপর বিশেষ জোর দিয়ে বলল। "ধন্যবাদ প্রিন্সেস; অনেক সময়ই এটা কষ্টের।"

"তাহলে এটাই কারণ! এটাই কারণ!" প্রিন্সেস মারির বুকের মধ্যে কে যেন ফিস্‌ফিস্ করে বলল। "না, শুধু এই সদয়, হাসিখুশি, খোলামেলা

দৃষ্টিকে, শুধু এই সুন্দর বহিরাবরণকে তো আমি ভালবাসি নি। ভালবেসেছি তার মহৎ, স্থিতপ্রজ্ঞ, আত্মত্যাগী মনকেও। ঠিক, সে এখন গরীব আর আমি ধনী···হাঁ, সেটাই একমাত্র কারণ···হ্যাঁ, তা যদি না হত···" নিকলাসের আগেকার মমতা স্মরণ করে এবং এখনকার বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে সহসা তার শীতল ব্যবহারের কারণটা সে বুঝতে পারল।

নিজের অজ্ঞাতসারেই নিকলাসের আরও কাছে সরে গিয়ে প্রিন্সেস মারি প্রায় চীৎকার করে বলে উঠল, "কিন্তু কেন, কাউন্ট কেন? আমাকে বলুন। আপনাকে বলতেই হবে।"

নিকলাস নীরব।

প্রিন্সেস বলতে লাগল, "আপনার কেনগুলি আমি বুঝতে পারছি না কাউন্ট, কিন্তু স্বীকার করছি···আমি বড় কষ্ট পাচ্ছি। যেকারণেই হোক আপনার সঙ্গে আমার যে বন্ধুত্ব ছিল তা থেকে আমাকে বঞ্চিত করতে চাইছেন। আর সেখানেই আমার দুঃখ।" তার কণ্ঠ অশ্রুসিক্ত, দুই চোখ অশ্রুপূর্ণ: "জীবনে সুখের মুখ এত অল্প দেখেছি যে যা কিছু হারাই তাই আমার কাছে সহ্যের অতীত।···মাফ করবেন, বিদায়!" সহসা কেঁদে উঠে সে দ্রুতপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তাকে থামাবার চেষ্টায় নিকলাস ডাকল, "প্রিন্সেস, ঈশ্বরের দোহাই! প্রিন্সেস!"

প্রিন্সেস ঘুরে দাঁড়াল। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল—আর যা মনে হয়েছিল অসম্ভব ও অনেক দূরে তাই সহসা হয়ে উঠল সম্ভব, অনিবার্য, অনেক কাছে।

অধ্যায়–৭

১৮১৩-র শীতকালে নিকলাস প্রিন্সেস মারিকে বিয়ে করে স্ত্রী, মা ও সোনিয়াকে নিয়ে বল্ডহিল্‌স্‌-এ চলে গেল।

স্ত্রীর সম্পত্তির এতটুকুও বিক্রি না করে চার বছরের মধ্যে বাকি ঋণ শোধ করে দিল এবং একজন জ্ঞাতির মৃত্যুতে উত্তরাধিকারসূত্রে একটা ছোট সম্পত্তি পেয়ে পিয়েরের ঋণটাও শোধ করে দিল।

আরও তিন বছরে ১৮২০ সালের মধ্যেই সব কিছু এমনভাবে ব্যবস্থা করল যাতে বল্ড হিল্‌স্‌ সংলগ্ন একটা ছোট সম্পত্তিই সে কিনে ফেলল, এবং জীবনের একমাত্র প্রিয় স্বপ্ন অত্রাদনুকে আবার কিনে নেবার জন্য আলোচনা শুরু করে দিল।

প্রয়োজনের তাগিদে খামারের কাজে হাত দিয়ে সেকাজটা তার এতই

ভাল লেগে গেল যে এখন সেটাই তার প্রিয় এবং প্রায় একমাত্র কাজ হয়ে উঠেছে। নিকলাস খুব সাদাসিদেভাবে খামার চালায়: বর্তমানে প্রচলিত নতুন নতুন বিলাতি চাষ-ব্যবস্থা সে পছন্দ করে না। নিজের ক্ষেতে ফসল বোনা ও খড় কাটার মত যত্ন নিয়েই সে অন্য চাষীদের ক্ষেতে ফসল বোনা ও খড় কাটার ব্যবস্থা করে দিত। ফলে চাষীদের সহযোগিতায় নিকলাসের ফসল বোনা ও ফসল কাটা এত ভালভাবে এবং এত আগে আগে হয়ে যেত যা অন্য কোন জমির মালিকের বেলায়ই সম্ভব হত না।

পারিবারিক ভূমিদাসদের—তাদের সে বলত "দ্রোণ"—কাজে লাগানো সে পছন্দ করত না। সকলেই বলত, লাই দিয়ে-দিয়ে সে তাদের মাথাটি খেয়েছে। কখনও কোন ভূমিদাসকে শাস্তি দেবার দরকার হলে সে যে কি করবে তাই বুঝে উঠত না, আর বাড়ির সকলের সঙ্গেই তা নিয়ে পরামর্শ করত অবশ্য চাষীদের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নিতে সে কখনও ইতস্তত বোধ করত না। সে জানত সে যাই করুক সব চাষীরাই সেটা মাথা পেতে নেবে। চারদিকে নিকলাসের জয়-জয়কার পড়ে গেল। তার লোকবল দ্রুত বাড়তে লাগল; পার্শ্ববর্তী সব জমিদারি থেকে ভূমিদাসরা এসে তার কাছে ধর্না দিত বিক্রি হবার জন্য। তার মৃত্যুর অনেকদিন পরেও তার সুশাসনের স্মৃতি ভূমিদাসরা সসম্মানে নিজ নিজ অন্তরে রক্ষা করে চলত। "তিনি তো কর্তার মত কর্তা···প্রথমে চাষীদের কাজ, তারপর নিজের। অবশ্য কোন কিছুকেই তিনি অবহেলা করতেন না—একথায় তিনিই তো ছিলেন সত্যি-কারের কর্তা!"

অধ্যায়—৮

পরিচালনাসংক্রান্ত একটা বিষয় নিয়ে নিকলাস মাঝে মাঝে চিন্তিত বোধ করত—সেটা তার বদমেজাজ আর ঘুষি চালানোর অনেকদিনের হুজারী অভ্যাস। প্রথম প্রথম সে এতে দোষের কিছু দেখতে পেত না, কিন্তু বিয়ের দ্বিতীয় বছরেই এধরনের দণ্ডবিধানের ব্যাপারে হঠাৎ তার মতটা বদলে গেল।

একবার গ্রীষ্মকালে সে বগুচারেভোর গ্রাম-প্রধানকে ডেকে পাঠাল। তার বিরুদ্ধে ছিল অন্যায় আচরণ ও নানারকম বিধিবহির্ভূত কাজের অভিযোগ। নিকলাস বাইরে গেল তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে। গ্রাম-প্রধান কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দেবার পরেই চেঁচামেচি ও ঘুষির শব্দ শোনা গেল। প্রাতরাশে যোগ দিতে এসে নিকলাস স্ত্রীর কাছে গেল। স্ত্রী তখন সেলাইয়ের ফ্রেমটার উপর ঝুঁকে বসে ছিল। সকালে সে কি কি করেছে তার ফিরিস্তি

দিতে গিয়ে নিকলাস বগুচারেভোর গ্রাম-প্রধানের কথাও বলল। কাউণ্টেস মারির মুখ প্রথমে রক্তবর্ণ ও পরে বিবর্ণ হয়ে গেল। মাথা নীচু করে ঠোঁট চেপে সে বসে রইল। স্বামীর কোন কথার জবাবই দিল না।

গ্রাম-প্রধানের কথা মনে হতেই রেগে টং হয়ে নিকলাস চেঁচিয়ে বলল, "লোকটা এত বেহায়া আর পাজী। যদি আমাকে বলত যে মদ খেয়েছিল বলে সে কিছু দেখাশোনা করতে পারে নি···আরে, তোমার কি হয়েছে মারি?" হঠাৎ নিকলাস প্রশ্ন করল।

কাউণ্টেস মারি মাথা তুলে কি যেন বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু তখনই আবার মুখ নামিয়ে নিল; ঠোঁট দুটি বেঁকে যেতে লাগল।

"আরে, কি হয়েছে বল না লক্ষীটি?"

চোখে জল এলে কাউণ্টেস মারিকে বড় সুন্দর দেখায়। সে তো বেদনায় বা বিরক্তিতে কখনও কাঁদে না, কাঁদে দুঃখে ও করুণায়, আর তখনই তার দুটি উজ্জল চোখে ফুটে ওঠে এক দুর্বার মোহ।

নিকলাস তার হাতটা ধরতেই সে আর নিজেকে সামলাতে পারল না; কাঁদতে শুরু করল।

"নিকলাস, আমি সব দেখেছি···সে দোষ করেছিল ঠিকই, কিন্তু তাই বলে তুমি কেন···নিকলাস!" কাউণ্টেস মারি দুই হাতে মুখ ঢাকল।

নিকলাস কিছুই বলল না। মুখ লাল করে স্ত্রীর কাছ থেকে সরে গিয়ে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। স্ত্রী কেন কাঁদছে তা সে বুঝতে পেরেছে, কিন্তু অন্তরের দিক থেকে তার সঙ্গে একমত হয়ে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না যে শিশুকাল থেকে যাকে সে প্রাত্যহিক ঘটনা বলে জেনে এসেছে সেটা অন্যায় কাজ। সে নিজেকেই শুধাল: "এটা কি নেহাৎই মেয়েলিপনা, না কি তার বিচারই ঠিক?" এ সমস্যার সমাধানের আগেই সে আর একবার স্ত্রীর ভালবাসা ও বেদনায় ভরা মুখখানির দিকে তাকাল, আর তখনই সহসা বুঝতে পারল যে তার স্ত্রীর কথাই ঠিক; এতকাল ধরে সে নিজেই ভুল পথে চলে এসেছে।

স্ত্রীর কাছে গিয়ে ধীর গলায় বলল, "মারি, এ জিনিস আর কখনও ঘটবে না; আমি তোমাকে কথা দিলাম।"

ক্ষমাপ্রার্থী বালকের মত সে আর একবার বলল, "কখনও না।"

কাউণ্টেসের দুই চোখে আরও বেশী করে জলের ধারা নামতে লাগল। স্বামীর হাতখানা নিয়ে তাতে চুমো খেল।

নিকলাসের আঙুলে পরা ছিল লাওকুন-এর মাথা খোদাই-করা পাথর বসানো একটা আংটি। সেটার দিকে তাকিয়ে কাউণ্টেস মারি শুধাল, "তোমার আঙুলের পাথরটা কখন ভেঙে ফেললে?"

"আজই—ঐ একই ব্যাপার। ও মারি, সেকথা আর আমাকে মনে

করিয়ে দিও না!" নিকলাসের মুখটা আবার রাঙা হয়ে উঠল। "তোমাকে কথা দিচ্ছি, এ ঘটনা দ্বিতীয়বার ঘটবে না।" ভাঙা আংটিটা দেখিয়ে বলল, "আর এটাই হবে আমার প্রতিশ্রুতির স্মারক।"

তারপর থেকে গ্রাম-প্রধান অথবা নায়েবদের সঙ্গে আলোচনাপ্রসঙ্গে যখনই নিকলাসের মুখে রক্ত উঠে আসে, হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ হতে শুরু করে, তখনই সে আঙুলের ভাঙা আংটিটা তুলে ধরে, আর যার উপরে সে রাগ করছিল তার সামনেই নিজের চোখ দুটো নামিয়ে আনে। কিন্তু পুরো বারোটি মাসের মধ্যে দু' একবার সে প্রতিশ্রুতির কথা ভুলেও গেছে; তখনই সে স্ত্রীর কাছে গিয়ে সে ভুল স্বীকার করেছে এবং পুনরায় কথা দিয়েছে যে সেটাই শেষবার।

স্ত্রীকে বলত, "মারি, তুমি আমাকে ঘৃণা কর। সেটাই আমার প্রাপ্য।"

স্বামীকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টায় স্ত্রী বিষণ্ণ গলায় বলত, "নিজেকে সংযত করবার মত যথেষ্ট মনের জোর যদি তোমার না থাকে, তাহলে চলে যাও, এখনই চলে যাও।"

এ তল্লাটের ভদ্রসমাজ নিকলাসকে শ্রদ্ধা করত, কিন্তু পছন্দ করত না। স্বীয় সমাজের স্বার্থ নিয়ে সে মাথা ঘামাত না, ফলে কেউ তাকে ভাবত অহংকারী, আবার কেউ ভাবত বোকা। সারা গ্রীষ্মকালটা সে খামারের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকত। হেমন্তকালে চলে যেত শিকারে—একমাস, এমন কি দুমাসও বাড়ি ছেড়ে থাকত। শীতকালে অন্য গ্রামগুলি দেখতে যেত, আর পড়াশুনা করে সময় কাটাত। বেশীর ভাগ পড়ত ইতিহাসের বই, আর সে-জন্য প্রতি বছরই বেশ কিছু টাকা ব্যয় করত। এইভাবে একটা ভাল গ্রন্থাগার সে গড়ে তুলেছে; নিয়ম করে নিয়েছে, যত বই কেনা হবে সব সে পড়বে। ক্রমে পড়াটা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল; পড়তে বসলেই সে একটা বিশেষ ধরনের আনন্দ পায়। শীতকালটা বিশেষ কোন কাজে বাইরে না গেলে বাড়িতে পরিবারের সঙ্গেই কাটায়। এইভাবে স্ত্রীর সঙ্গে তার সম্পর্কটা ক্রমেই ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠতে লাগল: প্রতিদিন স্ত্রীর মধ্যে আবিষ্কার করতে লাগল নব নব আত্মিক সম্পদ।

বিয়ের পর থেকে সোনিয়া নিকলাসের বাড়িতেই থাকে। বিয়ের আগে নিকলাস স্ত্রীকে সোনিয়া সম্পর্কে সব কথাই বলেছে; সব দোষ নিজের ঘাড়ে নিয়ে সোনিয়ার প্রচুর প্রশংসা করেছে। প্রিন্সেস মারিকে ব'লছে, এই বোনটির প্রতি সে যেন সদয় ব্যবহার করে। কাউণ্টেস মারি ভাল করেই বুঝতে পেরেছে যে নিকলাস সোনিয়ার প্রতি অবিচার করেছে; তার মনে হয়েছে, তার সম্পত্তির জন্যই নিকলাস তাকে পছন্দ করেছে। সোনিয়ার কোন দোষ সে দেখতে পায় নি। তার প্রতি ভাল ব্যবহার করতেই চেষ্টা করেছে, তবু অনেক সময় তার প্রতি বিদ্বেষ অনুভব করেছে।

একসময় বন্ধু নাতাশার সঙ্গে সোনিয়ার বিষয়ে কথা প্রসঙ্গে নিজের অবিচারের কথাই তাকে বলল।

নাতাশা বলল, "কি জান, তুমি তো 'সুভাষিতাবলী' অনেক বেশী পড়েছ—তাতে একটা অনুচ্ছেদ আছে যেটা সোনিয়ার বেলায় খুব খাটে।"

"কোন্‌টা বল তো?" কাউণ্টেস মারি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল।

"যার আছে তাকে আরও দেওয়া হবে, আর যার কিছু নেই তার কাছ থেকে সব নেওয়া হবে।" মনে পড়ে? সোনিয়া সেই মানুষ যার কিছু নেই; কেন নেই তা আমি জানি না। হয় তো আত্মসর্বস্বতার অভাব, আমি জানি না; কিন্তু তার কাছ থেকেই নেওয়া হয়েছে, সব কিছু নেওয়া হয়েছে। অনেক সময় তার জন্য আমার খুব দুঃখ হয়। আগে আমি খুব চাইতাম যে নিকলাস তাকে বিয়ে করুক, কিন্তু সব সময়ই আমার মনে কেমন যেন একটা ধারণা ছিল যে সেটা ঘটবে না। সে এক ফলহীন ফুল; কি জান—এক ধরনের স্ট্রবেরি ফুলের মত। অনেক সময় তার জন্য আমার দুঃখ হয়; আবার অনেক সময় ভাবি, সে দুঃখকে সে তোমার-আমার মত করে অনুভব করে না।"

কাউণ্টেস মারির মনে হল, সত্যি সত্যি সোনিয়া নিজের অবস্থাকে কষ্টকর বলে মনে করে না; ফলহীন ফুলের ভাগ্যকেই সে মেনে নিয়েছে। সে কোন ব্যক্তিকে ভালবাসে না, ভালবাসে গোটা পরিবারকে। বিড়ালের মতই তার অনুরাগ মানুষের প্রতি নয়, বাড়ির প্রতি। সে বুড়ি কাউণ্টেসের সেবা করে, ছোটদের আদর দিয়ে নষ্ট করে, ছোটখাট সেবার জন্য সদাই প্রস্তুত থাকে, আর সকলেই বিনা কৃতজ্ঞতায়ই সে সেবা গ্রহণ করে।

বল্ড হিল্‌স্-এর পল্লী ভবনটাকে নতুন করে গড়া হয়েছে; অবশ্য বুড়ো প্রিন্সের আমলের মত ততটা বড় মাপে নয়। আর্থিক অসুবিধার মধ্যে অত্যন্ত সাদামাঠাভাবেই বাড়িটা তৈরি করা হয়েছে। পুরনো পাথরের ভিতের উপর প্রকাণ্ড বাড়িটা বানানো হয়েছে কাঠ দিয়ে; তার পলস্তরা করা হয়েছে কেবল ভিতরের দিকটা। নিজস্ব ভূমিদাস ছুতোর মিস্ত্রিরাই নিজেদের বার্চ কাঠ দিয়ে বানিয়েছে খুব সাধারণ শক্ত সোফা, হাতল-চেয়ার, টেবিল ও চেয়ার। বাড়িটা বেশ বড়; তাতে পারিবারিক ভূমিদাসদের জন্য ঘর আছে; আছে অতিথিদের থাকার ব্যবস্থা। রস্তভদের গোটা পরিবার এবং বল্‌কন্‌স্কিদের আত্মীয়স্বজনরা মাঝে মাঝে বল্ড হিল্‌স্-এ আসে ষোলটা ঘোড়া ও ডজনখানেক চাকর-বাকর নিয়ে; থাকে মাসের পর মাস। তাছাড়া, বছরে চারবার করে নামকরণ-দিবস ও জন্ম-দিবস উপলক্ষ্যে শ' খানেক অতিথি এসে দু'একটা দিন কাটিয়ে যায়। বছরের বাকি সময়টা দৈনন্দিন জীবনের বাঁধা পথ ধরেই চলে; প্রাতরাশ, লাঞ্চ, ডিনার ও সাপারের ব্যবস্থা সম্পত্তির আয় থেকেই চলে যায়।

অধ্যায়—৯

১৮২০ সালের পাঁচই ডিসেম্বর, সেণ্ট নিকলাস দিবসের সন্ধ্যা। হেমন্তের শুরু থেকেই নাতাশা স্বামী-পুত্র নিয়ে দাদার বাড়িতেই আছে। পিয়ের গেছে পিতার্সবুর্গে নিজের কাজে; বলে গেছে সেখানে তিন সপ্তাহ থাকবে, কিন্তু প্রায় সাত সপ্তাহ কেটে গেছে; যেকোন সময় তার ফেরার কথা।

বেজুখভ পরিবার ছাড়াও নিকলাসের প্রবীণ বন্ধু অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল ভাসিলি দিমিত্রিচ দেনিসভ ৫ই ডিসেম্বর উপলক্ষ্যে রস্তভদের বাড়িতেই আছে।

৬ই তারিখে তার নামকরণ-উৎসব। বাড়িতে তখন অনেক অতিথির সমাগম হবে। নিকলাস জানে সেদিন তাকে নতুন পোশাক পরতে হবে, যে গির্জাটি সে নিজে তৈরি করেছে সেখানে যেতে হবে, যেসব অতিথিরা তাকে অভিনন্দন জানাতে সেখানে সমবেত হবে তাদের অভ্যর্থনা করতে হবে, তাদের খানাপিনার ব্যবস্থা করতে হবে, ভদ্রজনদের নির্বাচন নিয়ে কথাবার্তা বলতে হবে। সেদিনের সন্ধ্যাটা সে কিন্তু স্বাভাবিক কাজকর্ম নিয়েই কাটাতে ইচ্ছুক। করলও তাই। ডিনারের সময় সে বাড়ি ফিরে এল, স্ত্রীর সঙ্গে একান্তে কথা বলার সময় না থাকায় সোজা গিয়ে বসল বিশ জনের জন্য আয়োজিত লম্বা খাবারের টেবিলে। বাড়ির সকলেই তখন সেখানে হাজির। টেবিলে বসেছে তার মা, মার বান্ধবী বেলোভা, তার স্ত্রী, গভর্নেস ও শিক্ষিকাসহ তাদের তিনটি সন্তান, সোনিয়া, দেনিসভ, নাতাশা ও তার তিন সন্তান, তাদের গভর্নেস, এবং স্বর্গত প্রিন্সের স্থপতি বুড়ো মাইকেল আই-ভানভিচ; অবসর নিয়ে সে বল্ড হিল্‌স্‌-এ বাস করছে।

কাউণ্টেস মারি বসেছে টেবিলের অপর প্রান্তে। স্বামীর হাবভাব দেখেই মনে হল তার মন-মেজাজ ভাল নেই। এভাবে তাকে অকারণে ক্ষুব্ধ হতে দেখে কাউণ্টেস মারি মনে আঘাত পেল, দুঃখিত হল। স্বামী কোথায় গিয়েছিল সেটা জানতে চাইল। নিকলাস জবাব দিল। স্ত্রী আবার জানতে চাইল, খামারে সব কিছু ঠিক ঠিক চলছে কি না। স্ত্রীর অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে বিরক্ত হয়ে সেও ভুরু কুঁচকে তাড়াতাড়ি একটা জবাব দিল।

কাউণ্টেস মারি ভাবল, "তাহলে আমি ভুল করি নি। কিন্তু সে আমার উপর বিরক্ত হল কেন?"

দেনিসভকে ধন্যবাদ; সে আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দিল; সকলে খোলা মনে কথা বলতে শুরু করল। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আর কোন কথা হল না। টেবিল ছেড়ে যাবার আগে তারা যথারীতি বুড়ি কাউণ্টেসকে ধন্যবাদ

জানাল। তারপর কাউণ্টেস মারি হাত বাড়িয়ে স্বামীর হাতে চুমো খেল; জানতে চাইল, সে রাগ করেছে কেন।

নিকলাস জবাবে বলল, "কী সব অদ্ভুত ধারণা যে তোমার মাথায় আসে। রাগ করার কথাই তো আমার মনে আসে নি।"

নিকলাস ও তার স্ত্রীর দিনগুলি সুখেই কাটছে। তাদের সুখ দেখে মাঝে মাঝে সোনিয়া ও বুড়ি কাউণ্টেসেরও ঈর্ষা হয়। তবু তার মধ্যেই দুজনের খিটিমিটিও বাধে। কাউণ্টেস মারির গর্ভাবস্থার পর থেকেই সেটা মাঝে-মাঝেই ঘটছে।

খুশি মনে বেশ শুনিয়ে শুনিয়েই নিকলাস বলল, "দেখুন মাননীয়া ভদ্র-মহোদয়া, সকাল ছ'টা থেকে ঠায় দুপায়েই তো চলছি। কাল আবার অনেক কষ্ট আছে কপালে। সুতরাং এবার একটু বিশ্রাম চাই।"

স্ত্রীকে আর একটি কথাও না বলে সে ছোট বৈঠকখানায় গিয়ে সোফায় শুয়ে পড়ল।

কাউণ্টেস মারি ভাবল, "সর্বদা এই তো চলেছে। আমার সঙ্গে ছাড়া আর সকলের সঙ্গেই ও কথা বলে। বুঝেছি···বুঝেছি, ওর কাছে আমি বিরক্তিকর হয়ে উঠেছি, বিশেষ করে আমার এই অবস্থায়।" সে একবার তাকাল নিজের স্ফীত উদরের দিকে, আবার আয়নায় তাকাল নিজের ফ্যাকাসে, শুকনো মুখের দিকে; চোখ দুটো আগের চাইতে অনেক বড় দেখাচ্ছে।

তার কাছে সব কিছুই বিরক্তিকর বোধ হচ্ছে—দেনিসভের চীৎকার ও উচ্চহাসি, নাতাশার কথা, বিশেষ করে সোনিয়ার বাঁকা চাউনি।

কিছুক্ষণ অতিথিদের সঙ্গে বসে থেকে কাউণ্টেস মারি নিঃশব্দে সেখান থেকে বেরিয়ে নার্সারিতে গেল।

ছেলেমেয়েরা চেয়ার দিয়ে গাড়ি বানিয়ে "মস্কো যাওয়া" খেলছে; মাকেও তাদের সঙ্গে যোগ দিতে ডাকল। কিছুক্ষণ বসে তাদের সঙ্গে খেলা করল, কিন্তু স্বামীর কথা, তার অকারণ রাগের কথা মনে করে চিন্তিত হল। উঠে দাঁড়িয়ে পা টিপে টিপে ছোট বৈঠকখানার দিকে গেল।

নিজেকে বলল, "হয় তো সে ঘুমোয় নি; তার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে হবে।" বড় ছেলে ছোট্ট আন্দ্রু মাকে নকল করে পা টিপে টিপে তাকে অনুসরণ করল। মা খেয়ালই করল না।

বড় বৈঠকখানায় তার সঙ্গে দেখা হতেই সোনিয়া বলল, "সে হয় তো ঘুমিয়ে পড়েছে মারি—তাকে খুবই ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। আন্দ্রু হয় তো তাকে জাগিয়ে তুলবে।"

কাউণ্টেস মারি মুখ ঘুরিয়ে তাকাল, দেখল ছোট্ট আন্দ্রু পিছন পিছন আসছে, বুঝল যে সোনিয়া ঠিকই বলেছে। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ লাল হয়ে

উঠল, কিন্তু কোন কড়া কথা উচ্চারণ করল না। সোনিয়াকে কিছু না বলে ইসারায় আন্দ্রুকে চুপি-চুপি আসতে বলে সে দরজার কাছে গেল। সোনিয়া অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। নিকলাস যে ঘরে ঘুমিয়েছিল সে ঘর থেকে তার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ আসছে। সে শব্দ স্ত্রীর কাছে খুবই পরিচিত। শুনতে শুনতেই সে যেন চোখের সামনে দেখতে পেল স্বামীর মসৃণ, সুন্দর কপাল, তার গোঁফ, তার সমস্ত মুখ; ঘুমের মধ্যে রাতের নিস্তব্ধ প্রহরে সে-সব সে অনেকবার দেখেছে। হঠাৎ নিকলাস নড়ে চড়ে গলা খাঁকারি দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে ছোট আন্দ্রু দরজার বাইরে থেকে বলে উঠল, "বাপি! মামণি এখানে দাঁড়িয়ে আছে!" কাউণ্টেস মারি ভয়ে বিবর্ণ হয়ে ছেলেকে ইসারা করল। সে চুপ করে গেল। মুহূর্তের নীরবতা। সে নীরবতা কাউণ্টেস মারির কাছে ভয়ংকর। সে জানে, ঘুম ভাঙানোটা নিকলাস খুব অপছন্দ করে। আবার নিকলাসের গলা পরিষ্কার করার ও নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পেল। সে বিরক্ত কণ্ঠে বলল:

"একমুহূর্তও শান্তিতে থাকতে পারি না। মারি, তুমি কি ওখানে? কেন ওকে এখানে এনেছ?"

"আমি শুধু তোমাকে দেখতে এসেছিলাম; খেয়াল করি নি···তুমি আমাকে ক্ষমা কর···"

নিকলাস কাশল। আর কিছু বলল না।

কাউণ্টেস মারি দরজা থেকে সরে এসে ছেলেকে নিয়ে নার্সারিতে ফিরে গেল। পাঁচ মিনিট পরে বাবার আদরের মেয়ে তিন বছরের কৃষ্ণাঙ্গী নাতাশা যখন দাদার কাছে শুনল যে বাপি ঘুমচ্ছে আর মা আছে বৈঠকখানায় তখন সে মার অলক্ষ্যে একদৌড়ে বাবার কাছে চলে গেল। কালো চোখের ছোট মেয়েটি সাহস করে দরজাটা সশব্দে খুলে ফেলল, ছোট ছোট পা ফেলে সোফার কাছে এগিয়ে গেল; বাবা তার দিকে পিঠ দিয়ে ঘুমিয়েছিল; নাতাশা পা টিপে এগিয়ে গিয়ে বাবার মাথার নীচেকার হাতে চুমো খেল। মৃদু হেসে নিকলাস মুখ ফেরাল।

দরজায় শোনা গেল কাউণ্টেস মারির ভয়ার্ত চাপা কণ্ঠস্বর: "নাতাশা! নাতাশা! বাপি এখন ঘুমবে।"

ছোট্ট নাতাশা জোর দিয়ে বলল, "না মামণি, বাপি এখন ঘুমবে না। সে তো হাসছে।"

নিকলাস উঠে বসল; মেয়েকে কোলে তুলে নিল।

স্ত্রীকে বলল, "ভিতরে এস মারি।"

ভিতরে ঢুকে সে স্বামীর পাশে বসল।

সভয়ে বলল, "আমি বুঝতে পারি নি যে ছেলেটা আমার পিছু পিছু আসছিল। তোমার ঘরে একটু উঁকি দিয়েছিলাম মাত্র।"

ছোট মেয়েটিকে এক হাতে ধরে নিকলাস আর একহাতে স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে তার চুলে চুমো খেল।

নাতাশাকে বলল, "মামণিকে একটা চুমো খাই ?"

নাতাশা লজ্জায় হেসে ফেলল।

নিকলাস যে জায়গাটায় চুমো খেয়েছিল সেটা ইসারায় দেখিয়ে সে ধমক দিয়ে বলল, "আবার !"

স্ত্রীর মনের কথা বুঝতে পেরে নিকলাস বলল, "আমি তো বুঝতে পারি না কিসে তুমি জানলে যে আমি রাগ করেছি।"

"তুমি ওরকম ভাব দেখালে আমি যে কত দুঃখ পাই, কত একলা বোধ করি সে ধারণা তোমার নেই। আমার সব সময়ই মনে হয়..."

নিকলাস হেসে বলল, "বাজে কথা বলো না মারি। তোমার এজন্য লজ্জা হওয়া উচিত !"

"মনে হচ্ছে তুমি আমাকে ভালবাসতে পার না ; আমি এত সাদাসিদে ...চিরকালই তাই...আর এখন ..এই অবস্থায়..."

"আঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারি না ! রূপের জন্য তো ভালবাসা নয়, ভালবাসাই মানুষকে সুন্দর করে। 'মাল্‌ভিনা' এবং ঐ ধরনের নারীদেরই মানুষ রূপের জন্য ভালবাসে। কিন্তু আমার স্ত্রীকে কি আমি ভালবাসি না ? যদি ভাল না বাসি, কিন্তু...কিভাবে যে বলব ঠিক বুঝতে পারছি না..."

"আমি জানি। তাহলে আমার উপর তুমি রাগ করো নি তো ?"

"ভীষণ রাগ করেছি !" সোফা থেকে উঠে নিকলাস হাসতে হাসতে বলল। "আমি এতক্ষণ কি ভাবছিলাম জান মারি ? ভাবছিলাম, পিয়েরকে বসন্তকাল পর্যন্ত থেকে যেতে বলব।"

হলঘরে কার যেন পায়ের শব্দ শোনা গেল।

"কেউ এসেছে।"

"নিশ্চয় পিয়ের। আমি দেখছি," বলে কাউন্টেস মারি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নিকলাস ছোট মেয়েটিকে নিয়ে ঘরময় দাপাদাপি শুরু করে দিল। এক-সময় হাঁপিয়ে উঠে মেয়েকে কাঁধ থেকে নামিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরল। অকারণেই তার মনে হল : একদিন এই মেয়ে বড় হবে ; সে বুড়ো বয়সে তাকে সমাজে নিয়ে যাবে, আর তার বাবা যেভাবে মেয়ের সঙ্গে "দানিয়েল কুপার" নাচত, সেও সেইভাবে এই মেয়ের সঙ্গে মাজুর্কা নাচবে।

কয়েক মিনিট পরেই কাউন্টেস মারি ঘরে ঢুকে বলল, "সে এসেছে। আহা, আমাদের নাতাশার জীবনে যেন জোয়ার এসেছে। এখন যদি তাকে দেখ ! চল, চল, তাড়াতাড়ি চল।" মেয়েটি বাবাকে জড়িয়ে ধরে আছে দেখে বলল, "অনেক হয়েছে ; এবার ওকে ছেড়ে দাও তো !"

মেয়ের হাত ধরে নিকলাস বেরিয়ে গেল।

কাউণ্টেস মারি নিজের মনেই বলে উঠল, "মানুষ যে এত সুখী হতে পারে তা আমি কখনও বিশ্বাস করতে পারতাম না।" মৃদু হাসিতে তার মুখখানি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল; আবার সেই সঙ্গে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসও ফেলল; দুটি গভীর চোখে ফুটে উঠল শান্ত বিষণ্ণতা; যেন সুখের ভিতর দিযেই সে অনুভব করল যে এমন আর একরকমের সুখ আছে যা এই জীবনে পাওয়া যায় না, অথচ এই মুহূর্তে আপনা থেকেই সে সুখের চিন্তা তার মনে জাগল।

অধ্যায়—১০

নাতাশার বিয়ে হয়েছিল ১৮১৩-র বসন্তকালের গোড়ার দিকে; ১৮২০তেই তার তিনটি মেয়ে হয়েছে; তাছাড়া আছে অনেক আশার ধন কোলের ছেলেটি। নাতাশা আরও শক্ত সমর্থ হয়েছে, মোটা হয়েছে; আজকের স্বাস্থ্যবতী জননী নাতাশার মধ্যে সেদিনের সেই তন্বী তরুণী নাতাশাকে চেনাই শক্ত। দেহ-রেখা আগের চাইতে স্পষ্টতর হয়েছে, মুখে দেখা দিয়েছে একটা প্রশান্ত, গম্ভীরভাব। মুখের সেই উজ্জ্বল, প্রাণবন্ত, রমণীয় ভাবটা আর নেই। তার দেহ ও মুখ এখন নেহাৎই গতানুগতিক; আত্মার সাক্ষাৎ সেখানে কদাচিৎ মেলে। চোখে পড়ে শুধু একটি স্বাস্থ্যবতী, সুন্দরী, উর্বরা নারীমূর্তি। মুখে সেদিনের সেই কণক-দীপ্তি ক্বচিৎ কখনও জ্বলে ওঠে; আর তখন সে যেন আগেকার চাইতেও মনোরমা হয়ে ওঠে।

বিয়ের পর থেকে নাতাশা ও তার স্বামী মস্কোতে, পিতার্সবুর্গে, মস্কোর নিকটবর্তী জমিদারিতে, অথবা নাতাশার মার কাছে অর্থাৎ নিকলাসের বাড়িতেই থেকেছে। তরুণী কাউণ্টেস বেজুখভা সমাজে বড় একটা যাতায়াত করে না; আর গেলেও সেখানকার লোকজন তাকে নিয়ে খুশি নয়; তাদের চোখে সে মনোরমাও নয়, সৌজন্যপূর্ণও নয়। নাতাশা যে একলা থাকাই পছন্দ করে তা কিন্তু নয়; কিন্তু গর্ভিনী অবস্থা, সন্তানের জন্ম, তাদের লালন-পালন, ও স্বামীকে সঙ্গ দানে তার এত বেশী সময় কেটে যায় যে সমাজে যাবার সময়ই হয় না। বিয়ের আগে যারা নাতাশাকে চিনত তারা তো তার এই পরিবর্তন দেখে অবাক হয়ে যেত। একমাত্র বুড়ি কাউণ্টেস মায়ের মন দিয়ে বুঝতে পারত যে নাতাশার যত কিছু হৈ চৈ সবই ছিল স্বামী ও সন্তানের প্রয়োজনে; সে বলত, নাতাশা যে একদিন আদর্শ স্ত্রী ও জননী হবে তা সে আগেই জানত।

কাউণ্টেস বলে, "শুধু তার স্বামী সন্তানের প্রতি ভালবাসা সব সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে এটাই যা সমস্যা।"

কিন্তু সাধারণভাবে সমাজের ধার না ধারলেও নাতাশার কাছে তার আত্মীয়-স্বজনের সমাজ খুবই মূল্যবান—কাউণ্টেস মারি ও তার দাদা, তার মা ও সোনিয়ার সঙ্গ সে খুবই পছন্দ করে। স্বামী-সন্তানকে নিয়ে নাতাশা এত বেশী বিব্রত থাকে যে তার পোশাক পরিচ্ছদ, চুল বাঁধার ধরন, অপরকে ঈর্ষার চোখে দেখা—এসব কিছু নিয়েই সকলের মধ্যে হাসি ঠাট্টা পর্যন্ত চলত। সাধারণভাবে সকলেই মনে করে যে পিয়ের তো স্ত্রীর একেবারে হাতের মুঠোয়। কথাটা সত্যি। বিয়ের প্রথম দিনই নাতাশা তার দাবী-গুলি জানিয়ে দিয়েছিল। সে বলেছিল, পিয়েরের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের মালিক সে ও তার পরিবার। এই সম্পূর্ণ নতুন কথা শুনে পিয়ের তো অবাক। সে যেমন বিস্মিত হল, তেমনই আত্মতুষ্টিও বোধ করল, স্ত্রীর দাবীকে মেনেও নিল।

বাড়ির বাইরে পিয়ের স্ত্রীর নির্দেশ এত বেশী মেনে চলে যে কোন মেয়ের সঙ্গে ঢলাঢলি করা তো দূরের কথা হেসে কথা বলতে পর্যন্ত সাহস করে না; সখ করে কখনও ক্লাবে খেতে পারে না, খুশি মত টাকা খরচ করতে পারে না, এবং বিশেষ কাজ ছাড়া বেশীক্ষণ বাড়ির বাইরে কাটাতে সাহস করে না। অবশ্য এর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বাড়ির ভিতরে নিজের জীবন এবং পরিবারের সকলকে চালাবার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব পিয়ের নিজের হাতে পেয়েছে। বাড়িতে নাতাশা চলে স্বামীর ক্রীতদাসীর মত; সে যখন লেখাপড়া করে গোটা বাড়িটা তখন পা টিপে টিপে চলে। মুখ খুলতে না খুলতেই তার হুকুম পালিত হয়। মনের বাসনা প্রকাশ করামাত্রই নাতাশা এক লাফে ছুটে গিয়ে তা পূর্ণ করে দেয়।

এইভাবে বিবাহিত জীবনের সাতটা বছর কাটাবার পরে পিয়েরের মনে এই সানন্দ অনুভূতি হল যে সে নিজে লোক খারাপ নয়, আর এই অনুভূতির কারণ স্ত্রীর মধ্যে সে নিজেকে প্রতিবিম্বিত হতে দেখেছে। মনে হল, তার মধ্যে ভাল মন্দ দুইই ওতঃপ্রোতভাবে মিশে গেছে। কিন্তু তার মধ্যে যা কিছু ভাল তার প্রতিবিম্ব পড়েছে স্ত্রীর মধ্যে, আর যা কিছু ঠিক ভাল নয় তাই খারিজ হয়ে গেছে। আর এটা কোন বিচার-বিবেচনার ফল নয়, একটা প্রত্যক্ষ ও রহস্যময় প্রতিফলন।

অধ্যায়—১১

রস্তভদের বাড়িতে থাকার সময় দু'মাস আগে পিয়ের একটা চিঠি পেল প্রিন্স থিয়োডোরের কাছ থেকে; পিয়ের যার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা তেমন একটা সমিতিতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় যোগ দিতে তাকে পিতার্সবুর্গে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

চিঠিখানা পড়ে (নাতাশা সব সময়ই স্বামীর চিঠি পড়ে থাকে) নাতাশা বলল, স্বামীর অনুপস্থিতি তার পক্ষে কষ্টদায়ক হলেও তার পিতার্সবুর্গে যাওয়া উচিত। পিয়েরের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির জবাবে নাতাশা তাকে যেতেই বলল, কিন্তু সেইসঙ্গে তার ফিরে আসার একটা নির্দিষ্ট তারিখও ঠিক করে দিল। তাকে চার সপ্তাহের ছুটি দেওয়া হল।

একপক্ষকালের বেশী হয়ে গেল সে ছুটি ফুরিয়েছে। ফলে নাতাশা সব-সময়ই ভয়ে ভয়ে থাকে, কেমন যেন মন-মরা, বিরক্তভাব।

সেই পক্ষকালের মধ্যেই এসে হাজির হল দেনিসভ। সে এখন অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল, বর্তমান বিধিব্যবস্থায় খুবই অসন্তুষ্ট। নাতাশাকে দেখে তার মনে যুগপৎ দেখা দিল দুঃখ ও বিস্ময়। ক্লান্ত বিষণ্ন দৃষ্টি, কদাচিৎ কথার জবাব দেয়, সবসময়ই নার্সারির কথা বলে। একদিন যে তার মনকে ভুলিয়েছিল আজ এই তার স্বরূপ।

নাতাশা সারাক্ষণ মন-মরা ও খিট্‌খিটে হয়ে থাকে; বিশেষ করে যখন মা, দাদা, সোনিয়া, অথবা কাউন্টেস মারি তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে পিয়েরের কাজকে সমর্থন করে, তার ফিরতে বিলম্ব হবার কৈফিয়ৎ দেয়।

যে কাজকে সে কিছুদিন আগেই খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করত তার সম্পর্কেই এখন বলে, "যত সব বাজে, অর্থহীন কাজ—এসব আলোচনার কোন শেষ নেই—যত সব বাজে সমিতি!"

একমাত্র ছেলে পেত্‌য়াকে আদর করতে সে নার্সারিতে চলে যায়। আর কেউই এই তিন বছরের প্রাণীটির মত করে তাকে সান্ত্বনার বাণী শোনাতে পারে না—যুক্তিপূর্ণ কথাও বলতে পারে না। সেই প্রাণীটি যেন বলে: "তুমি রাগ করেছ, তোমার মনে ঈর্ষা জেগেছে, তুমি ভয় পেয়েছ—কিন্তু আমি তো আছি! আর আমিই সেই...।" একথার কোন জবাব নেই। এ তো সত্যের চাইতেও সত্য।

এই দুশ্চিন্তা-ভরা একটা পক্ষকাল নাতাশা ছোট্ট প্রাণীটিকে নিয়ে এত বেশী মাতামাতি করল যে তার ফলে তাকে মাত্রাতিরিক্ত খাওয়াল; সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। ছেলের অসুখ দেখে সে ভীষণ ভয় পেল, অথচ, এটাই তার দরকার ছিল। তাকে সেবাযত্ন করতে পেয়ে স্বামীর জন্য দুশ্চিন্তা সহ্য করা তার পক্ষে সহজতর হল।

বাচ্চাটার সেবাযত্ন করতে করতেই সামনের ফটকে সে পিয়েরের স্লেজের শব্দ শুনতে পেল। বুড়ি নার্স সুখবরটি নিয়ে হাসিমুখে দ্রুতপায়ে ঘরে ঢুকল।

পাছে ছেলের ঘুম ভেঙে যায় তাই কোনরকম নড়াচড়া না করে নাতাশা ফিস্‌ফিস্ করে শুধাল, "সে কি এসেছে?"

নার্সও ফিস্‌ফিস্ করে জবাব দিল, "তিনি এসেছেন মা'ম।"

নাতাশার মুখে রক্ত উঠে এল; আপনা থেকেই চলতে চাইল পা; কিন্তু

সে লাফিয়ে ছুটে যেতে পারল না। বাচ্চাটি আবার চোখ মেলে তার দিকে তাকাল। যেন বলতে চাইল, "তুমি এখানে?" তারপর ধীরে ধীরে ঠোঁট চাটতে লাগল।

সাবধানে মাই টেনে নিয়ে নাতাশা তাকে একটু দোলা দিল, তারপর তাকে নার্সের হাতে তুলে দিয়ে দ্রুত পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। এত তাড়াতাড়ি ছেলেকে ছেড়ে আসায় বিবেকের তাড়নায়ই যেন দরজায় থেমে পিছন ফিরে তাকাল। নার্স ছেলেকে খাটের রেলিংয়ের উপরে তুলে ধরেছে। হেসে নীচু গলায় বলল, "আপনি যান মা'ম! কোন চিন্তা করবেন না, যান!"

নাতাশা হাল্কা পা ফেলে ছুটে গেল বাইরের ঘরের দিকে।

পাইপ মুখে দিয়ে দেনিসভ পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এল নাচ-ঘরে, আর তখনই প্রথম বারের মত চিনতে পারল পুরনো দিনের নাতাশাকে। তার পরিবর্তিত মুখ থেকে উৎসারিত হচ্ছে উজ্জ্বল সানন্দ আলোর বন্যা।

পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে নাতাশা বলছে, "সে এসেছে"; পিয়ের ফিরে এসেছে বুঝতে পেরে দেনিসভও খুশি হয়ে উঠল।

ঝুল-বারান্দায় পৌছে নাতাশা দেখল, লোমের কোট গায়ে একটি দীর্ঘ-দেহী পুরুষ গলার স্কার্ফটা খুলছে "ঐ তো সে! সত্যি সে! সে এসেছে!" বলতে বলতে নাতাশা ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল, তার মাথাটা নিজের বুকে চেপে ধরল, তারপর তাকে সরিয়ে দিয়ে তার রক্তিম খুশি-খুশি মুখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল, "সত্যি সে; যেমন সুখী তেমনই সন্তুষ্ট..."

তখনই সহসা তার মনে পড়ে গেল গত একপক্ষকালের উদ্বেগ ও যন্ত্রণার কথা; মুখ থেকে নিভে গেল খুশির আলো, চোখ কুঁচকে উঠল, ক্রুদ্ধ তিরস্কার বর্ষণ করে পিয়েরকে বিব্রত করে তুলল।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব ভাল কাজ করেছ। তোমার তো মজা, সুখে দিন কাটিয়েছ...কিন্তু আমার কি হাল? অন্তত ছেলেমেয়েদের কথাও তো ভাবা উচিত ছিল। আমার এই অবস্থা, বুকের দুধ নষ্ট হয়ে গেছে...পেত্য়া মরতে বসেছিল। আর তুমি সেখানে ফূর্তি করছিলে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ফূর্তি..."

পিয়ের জানে তার কোন দোষ নেই; আরও আগে আসা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না; সে জানে এই বকবকানি আরও দু'এক মিনিট চলবে; আরও জানে যে সে নিজে বেশ খুশিই আছে। হাসতে চাইল, কিন্তু সাহসে কুলোল না। করুণ-করুণ মুখ করে ঝুঁকে দাঁড়াল।

"সত্যি বলছি, এর আগে আসার উপায় ছিল না। কিন্তু পেত্য়া কেমন আছে?"

"এখন ভাল আছে। এস! তোমার লজ্জা হচ্ছে না দেখে আমি তো অবাক হয়ে যাচ্ছি! তোমাকে ছাড়া আমি যে কেমন হয়ে গিয়েছিলাম, কত

কষ্ট পেয়েছি, তা যদি নিজের চোখে দেখতে!"

"এখন ভাল আছ তো?"

পিয়েরের হাত ধরে টেনে নাতাশা বলল, "চল, চল।" তারা নিজেদের ঘরের দিকে পা বাড়াল।

নিকলাস ও তার স্ত্রী যখন পিয়েরকে দেখতে এল সে তখন নার্সারিতে ছোট ছেলেকে হাতে নিয়ে নাচাচ্ছে। ছেলেটির ফোকলা মুখে স্বর্গীয় হাসির ছটা। ঝড় অনেকক্ষণ থেমে গেছে; নাতাশার মুখে তখন খুশির উজ্জ্বল আলোর ঝিকিমিকি; মমতাভরা চোখে সে স্বামী ও পুত্রের দিকে তাকিয়ে আছে।

শুধাল, "প্রিন্স থিয়োডোরের সঙ্গে সব কথা আলোচনা করেছ তো?"

"হাঁা, চমৎকার আলোচনা হয়েছে।"

"আচ্ছা, প্রিন্সেসের সঙ্গে দেখা হয়েছে? একথা কি সত্যি যে সে ভালবেসেছে···"

"সত্যি; কিন্তু ভাব তো···"

সেইমুহূর্তে নিকলাস ও কাউন্টেস মারি ঘরে ঢুকল। ছেলেকে হাতের উপর রেখেই পিয়ের ঝুঁকে পড়ে তাদের চুমো খেল, সব জিজ্ঞাসাবাদের জবাব দিতে লাগল। কিন্তু তার মন তখনও পড়ে আছে ছোট ছেলের দিকে।

কাউন্টেস মারি বলল, "কী মিষ্টি দেখতে! আচ্ছা নিকলাস, এমন মিষ্টি মধুর মুখ কি তোমাকে টানে না? আমি তো অবাক হয়ে যাই।"

ঠাণ্ডা চোখে বাচ্চাটির দিকে তাকিয়ে নিকলাস বলল, "ওসব আমার আসে না, আমি পারি না। একদলা মাংসপিণ্ড!"

স্বামীকে সমর্থন করে কাউন্টেস মারি বলল, "অথচ ও কিন্তু খুব স্নেহশীল পিতা, অবশ্য বাচ্চারা এক বছরের মত বড় হলে তবে···"

নাতাশা বলল, "পিয়ের কিন্তু ওদের খুব আদর যত্ন করে। সে তো বলে তার হাতটা না কি বাচ্চাদের আসনের মত করেই তৈরি করা হয়েছে। দেখই না।"

"শুধু সেজন্যই নয়···" পিয়ের হঠাৎ হেসে উঠল। ছেলেকে তুলে দিল নার্সের হাতে।

অধ্যায়—১২

অন্য সব বড় সংসারের মতই বল্ড হিল্‌স্‌-এও অনেকগুলি ছোট ছোট স্বতন্ত্র জগৎ মিলেমিশে একটা বড় জগৎ গড়ে উঠেছে; যদিও প্রত্যেকেই নিজ

নিজ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে চলে এবং অন্যের বৈশিষ্ট্যকেও মেনে নেয়। সুখ-দুঃখের যে ঘটনাই সে বাড়িতে ঘটুক সেটা সকলের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়, যদিও সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আনন্দ বা দুঃখ প্রকাশের যার যার নিজস্ব বিশেষ কতকগুলি কারণ অবশ্যই থাকে।

যেমন ধরা যাক, পিয়েরের প্রত্যাবর্তন একটা আনন্দময় বড় রকমের ঘটনা, আর সকলেই সেটাকে সেইভাবেই গ্রহণ করেছে।

পিয়ের ফিরে আসায় চাকর-মহল খুশি হয়েছে কারণ তারা জানে যে সে উপস্থিত থাকলে নিকলাস প্রত্যহ জমিদারি দেখতে যাবে না, তার মন মেজাজও ভাল থাকবে; তাছাড়া, উৎসব উপলক্ষ্যে তারা ভাল ভাল উপহারও পাবে।

পিয়ের ফিরে আসায় ছোটরা ও তাদের গভর্নেসরা খুশি হয়েছে কারণ অন্য কেউ তার মত করে তাদের সবাইকে সামাজিক জীবনযাত্রার মধ্যে টেনে আনে না। একমাত্র সেই ক্ল্যাভিকর্ড-এ সেরকম "একোসাস"-এর সুর বাজাতে পারে যার সঙ্গে সবরকম নাচই নাচা যায়; তাছাড়া, তারা জানে তাদের সকলের জন্যই সে নানান উপহার এনেছে।

ছোট্ট নিকলাস এখন পনেরো বছরের সুঠাম তরুণ: যেমন দেখতে সুন্দর তেমনই বুদ্ধিমান; হালকা বাদামী রঙের কোঁকড়ানো চুল, আর সুন্দর দুটি চোখ। সে খুশি হয়েছে কারণ পিয়ের কাকাকে সে খুব ভালবাসে। পিয়েরের সঙ্গে তার দেখা হয় কালে-ভদ্রে: কেউ তাকে পিয়েরকে ভালবাসতে শেখায়ও নি। কাউণ্টেস মারি তাকে বড় করে তুলেছে; সে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে নিকলাস যাতে তার স্বামীকে তার মতই ভালবাসে; ছোট নিকলাসও তাকে ভালবাসে ঠিকই, কিন্তু সে ভালবাসার সঙ্গে যেন একটু ঘৃণার ছোঁয়া থাকে। কিন্তু পিয়েরকে সে যেন পুজো করে। নিকলাসের মত একজন হুজার বা নাইট হতে সে চায় না, সে চায় পিয়েরের মত জ্ঞানী, গুণী ও দয়ালু হতে। পিয়ের কাছে এলেই তার মুখটা খুশিতে জ্বল্ জ্বল্ করে; পিয়ের তাকে কিছু বললেই তার মুখ লাল হয়ে ওঠে, দম আটকে আসে। তার সব কথা সে কান পেতে শোনে এবং পরেও তা নিয়ে অনেক ভাবে। পিয়েরের অতীত জীবন, ১৮১২-র আগেকার দুঃখের কথা (চুপি চুপি শোনা কিছু কথা থেকেই একটা অস্পষ্ট ছবি সে নিজের মনেই এঁকে নিয়েছে), মস্কোর কাণ্ডকারখানা, বন্দী জীবন, প্লাতন কারাতায়েভ (পিয়েরের মুখ থেকে শোনা), নাতাশার প্রতি ভালবাসা, এবং যে বাবার কথা সে মনেই করতে পারে না তার সঙ্গে পিয়েরের বন্ধুত্ব—সব কিছু মিলিয়ে তার চোখে পিয়ের হয়ে উঠেছে একটি নায়ক ও মহাপুরুষ।

অতিথিরা পিয়েরকে স্বাগত জানিয়েছে কারণ সে সর্বদাই যেকোন মজলিসকে প্রাণবন্ত ও সংঘবদ্ধ করে তুলতে সাহায্য করে।

স্ত্রী ছাড়াও পরিবারের অন্য সব বড়রাও এমন একজন বন্ধুকে ফিরে পেয়ে খুশি হয়েছে যে কাছে থাকলে জীবনযাত্রা আরও স্বচ্ছন্দ ও শান্তিময় হয়ে ওঠে।

বাড়ির বুড়িরা উপহার পেয়েই খুশি; বিশেষত এবার নাতাশা আবার আগেকার মত হয়ে উঠবে।

এইসব আলাদা জগতের আলাদা মনোভাব পিয়ের ভালই বাসে; সেই-ভাবেই সে তাদের সকলেরই বাসনা পূর্ণ করেছে।

পূর্বেকার ব্যয়বহুল ব্যবস্থা মতই পারিবারিক জীবন শুরু করার সময় থেকেই পিয়ের সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছে যে আগেকার তুলনায় এখন তার ব্যয় হয় অর্ধেক, অথচ প্রধানত প্রথমা স্ত্রীর ঋণের দরুণ সংসারে যে বিশৃংখলা দেখা দিয়েছিল তারও অনেক উন্নতি দেখা দিয়েছে।

জীবনযাত্রা সীমিত বলেই তার ব্যয়ও এখন আগের তুলনায় কম: সেই ব্যয়বহুল বিলাসিতা, সেধরনের জীবনযাত্রা তো যেকোন মুহূর্তে বদলানো যায়; এখন আর সেভাবে সে জীবন চালায় না, চালাতে চায়ও না। সে বোঝে, বর্তমান জীবনযাত্রা মৃত্যুর দিন অবধি পাকাপাকিভাবে স্থির হয়ে গেছে, তার কোন পরিবর্তন করা তার সাধ্যায়ত্ত নয়; এই জীবনযাত্রাই অল্প ব্যয়সাধ্য।

হাসি মুখে পিয়ের জিনিসপত্রগুলি সাজিয়ে রাখছিল।

দোকানীর মত করে একটা কাপড়ের ভাঁজ খুলতে খুলতে বলল, "এটা কেমন হয়েছে বল তো?"

বড় মেয়েটিকে কোলে নিয়ে নাতাশা সামনেই বসেছিল; স্বামীর উপর থেকে কাপড়টার দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, "বেলোভার জন্য তো? চমৎকার!" হাত দিয়ে কাপড়টা দেখল।

"নিশ্চয় এক আর্শিন-এর দাম এক রুবল হবে?"

পিয়ের দামটা বলল।

"এত সস্তা!" নাতাশা মন্তব্য করল। "মেয়েরা কী খুশিই না হবে, আর মাও! শুধু আমার জন্য এটা না আনলেও পারতে।" মুক্তোবসানো সোনার চিরুনিটার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বলল।

পিয়ের জবাব দিল, "এডেলই তো লোভ দেখাল: সেই তো বার বার এটা কিনতে বলল।"

সেটাকে চুলে গুঁজে দিয়ে নাতাশা বলল, "কখন পড়ব এটা? ছোট্ট মাশাকে নিয়ে যখন সমাজে যাব তখন? হয় তো তখন আবার এটাই ফ্যাশন হয়ে উঠবে। আচ্ছা, এবার চল।"

উপহারের জিনিসগুলো গুছিয়ে নিয়ে তারা প্রথমে নার্সারিতে, ও পরে বুড়ি কাউন্টেসের ঘরে গেল।

কাউণ্টেস সঙ্গী বেলোভাকে নিয়ে যথারীতি গ্র্যাণ্ড পেসেন্স খেলতে বসেছে। বগলে পার্শেলগুলো নিয়ে পিয়ের ও নাতাশা ঘরে ঢুকল।

কাউণ্টেসের বয়স যখন ষাটের উপর; সব চুল পাকা, মাথার কুঁচি-বসানো টুপিতে মুখটাই প্রায় ঢেকে গেছে। মুখে ভাঁজ পড়েছে, উপরের ঠোঁটটা ঝুলে পড়েছে, চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এসেছে।

পর পর ছেলে ও স্বামীর মৃত্যুতে তার মনে হয়েছিল আকস্মিকভাবেই এ জগৎ তাকে ভুলে গেছে, বেঁচে থাকার সব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যই গেছে হারিয়ে। সে খায়, পান করে, ঘুমোয়, জেগে থাকে, কিন্তু ঠিক বেঁচে থাকে না। জীবনে কোন নতুন ছাপ আঁকা পড়ে না। জীবনের কাছে সে শান্তি ছাড়া আর কিছু চায় না; একমাত্র মৃত্যু দিতে পারে সে শান্তি। কিন্তু মৃত্যু যতদিন না আসে ততদিন তো তাকে বেঁচে থাকতেই হবে, অথবা সব জৈব শক্তিকেই ব বহার করতে হবে। শরীরের বিভিন্ন যন্ত্রকে কাজ করানো ছাড়া তার জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য নেই। তাকে খেতে হয়, ঘুমতে হয়, চিন্তা করতে হয়, কথা বলতে হয়, কাঁদতে হয়, কাজ করতে হয়, রাগ দেখাতে হয়, আরও অনেক কিছু করতে হয় শুধু এই কারণে যে তার পাকস্থলী আছে, মস্তিষ্ক আছে, স্নায়ুতন্ত্র আছে, একটি যকৃৎ আছে। সে কথা বলে যেহেতু তার জিভ ও ফুসফুসের অনুশীলন করা দরকার। ছোট শিশুর মতই সে কাঁদে যেহেতু তার নাকটা পরিষ্কার হওয়া দরকার, ইত্যাদি। একটি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের কাছে যে কাজ উদ্দেশ্যপূর্ণ, তার কাছে সেটা একটা অছিলামাত্র।

যেমন, আগের দিন যদি একটু ভারী খাওয়া হয়ে যায় তো সকালে তার রাগ করা দরকার হয়ে পড়ে, আর সেজন্য অছিলা হিসাবে সে বেছে নেয় বেলোভার বধিরতাকে।

ঘরের এক কোণ থেকে নীচু গলায় তাকে কিছু বলতে শুরু করে:

হয় তো বলে, "আজ দিনটা একটু গরম মনে হচ্ছে সোনা।"

বেলোভা জবাব দিল, "ঠিক, ঠিক, তারা এসেছে।" কাউণ্টেসও রেগে বলল. "হায় প্রভু! মেয়েটা কি বোকা আর কালা!"

আর একটা অছিলা তার নস্য—সেটা হয় বেশী শুকনো, নয় তো বেশী ভেজা, আর নয় তো ভাল গুঁড়ো হয় না। এইসব বিরক্তি প্রকাশের পরে তার মুখটা হল্‌দে হয়ে যায়। বেলোভা আবার কখন কালা হবে, নস্য ভেজা হবে, আর কাউণ্টেসের মুখ হল্‌দে হবে, দাসীরা সেটা অভ্রান্তভাবেই বুঝতে পারে।

বৃদ্ধার এই অবস্থা সংসারের সকলেই বোঝে, কিন্তু মুখে কেউ বলে না, সাধ্যমত তার সব প্রয়োজন মেটাতে চেষ্টা করে। শুধু নিকলাস, পিয়ের, নাতাশা ও কাউণ্টেস মারির মধ্যে বিষণ্ণ হাসির সঙ্গে দু'একবার দৃষ্টি বিনিময়ের ভিতর দিয়েই প্রকাশ পায় যে তারা বৃদ্ধার অবস্থাটা ঠিকই বুঝতে

পেয়েছে।

কিন্তু সে দৃষ্টি আরও অনেক কিছুই প্রকাশ করে: বুঝি বলে, তার জীবনে যা করণীয় ছিল তা সে করেছে, আজ তাকে যা দেখছি সেটাই তার সমগ্র রূপ নয়, একদিন আমরা সকলেই তার মত হব, তাই তার সব খেয়াল হাসিমুখে মেনে নিয়েছি, একদিন যে ছিল পরম মূল্যবান, তাদের মতই জীবন-শক্তিতে পরিপূর্ণ আর তাই করুণার যোগ্য তার জন্য নিজেদের সংযত করেছি। সে দৃষ্টি যেন বলে, "একদিন তো আমরা সকলেই মরব।"

শুধু এ সংসারে যারা সত্যি হৃদয়হীন, যারা নির্বোধ, আর যারা একেবারেই শিশু, তারাই একথাটা বুঝতে পারে না, আর তাই তাকে এড়িয়ে চলে।

অধ্যায়—১৩

পিয়ের ও তাঁর স্ত্রী যখন বৈঠকখানায় ঢুকল কাউণ্টেস তখন মানসিক অনুশীলনের প্রয়োজনে যথারীতি পেশেন্স খেলায় ব্যস্ত ছিল। স্বভাবসিদ্ধভাবেই সে তাকে স্বাগত জানিয়ে বলল, "অনেকদিন পরে সোনা, অনেকদিন পরে! তোমার জন্য অপেক্ষা করে করে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তবু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!" উপহারগুলি পেয়ে আবার সেই একই পুরনো মন্তব্য করল, "উপহারটার তো দাম নয়, আসলে দামী হল তুমি যে আমার কাছে ফিরে এসেছ সেটাই; আমি তো বুড়ো হয়েছি···।" মুখে কথাগুলি বললেও স্পষ্ট বোঝা যায় যে সেইমুহূর্তে পিয়েরকে দেখে কাউণ্টেস খুশি হয় নি, কারণ তার ফলে অসমাপ্ত খেলায় বাধা পড়েছে।

পেশেন্স খেলা শেষ করে তবে সে উপহারগুলি ভাল করে দেখতে লাগল। খুব ভাল জাতের এক বাক্স তাস, উজ্জ্বল নীল রংয়ের একটা "সেভ্রে" চায়ের কাপ—তার উপর মেষপালিকার ছবি আঁকা ও একটা ঢাকনা দেওয়া—আর একটা নস্যের কৌটো, তার উপর ভাল কারিগর দিয়ে কাউণ্টেসের ছবি খোদাই করে আঁকা। এরকম একটা কৌটো কাউণ্টেসের অনেকদিনের ইচ্ছা, কিন্তু এখন সেকথা জানাতে তার ইচ্ছা হল না; সে তাসের বাক্সের দিকেই নজর দিল।

অন্য সব সময়ের মতই বলল, "ধন্যবাদ সোনা, তুমি আমাকে খুব খুশি করেছ। কিন্তু তুমি যে নিজেকে ফিরিয়ে এনেছ সেটাই সব চাইতে বড় কথা—কিন্তু তোমার বৌকে আচ্ছা করে বকে দিও তো; এরকমটা আমি কখনও দেখি নি। ওকে নিয়ে কি করি বলতো? তুমি চলে গেলে ও যেন পাগলের মত হয়ে যায়। কোনদিকে নজর থাকে না, কোন কথা মনে থাকে না···" তারপর সঙ্গিনীর দিকে ফিরে বলল, "দেখ আন্না তিমোফীভ্না,

ছেলে আমার জন্য কী সুন্দর একবাক্স তাস এনেছে!"

বেলোভা উপহারগুলির প্রশংসা করল; তার পোশাকের কাপড় পেয়েও খুশি হল।

তারপর সকলে মিলে সামোভারকে ঘিরে চায়ের টেবিলে বসল। পিয়ের একে একে কাউণ্টেসের সব প্রশ্নের জবাব দিতে লাগল—প্রিন্স ভাসিলি বুড়ো হয়ে গেছে কি না, কাউণ্টেস মারি আলেক্সীভ্না তাকে শুভেচ্ছা পাঠিয়েছে কি না; তাছাড়া আরও এমন সব প্রশ্ন করতে লাগল যাতে কারও কোন আগ্রহ নেই, এমন কি যেসব প্রশ্নের কথা সে নিজেও আর ভাবে না।

কথায় কথায় দেনিসভের আগ্রহে যুদ্ধের কথা; রাজনীতির কথা উঠল। বুড়ি কাউণ্টেস সেসব আলোচনার মাথামুণ্ডু বুঝতে না পেরে বিরক্ত হয়ে সেখান থেকে উঠে গেল। ওদিকে পাশের ঘরে ছেলেমেয়েদের ও নাতাশার হৈ-হল্লা শুনে তাদের তদারকি করতে পিয়েরও চলে গেল।

অধ্যায়—১৪

কিছুক্ষণ পরে ছেলেমেয়েরা ঘরে ঢুকল শুভরাত্রি জানাতে। তারা সকলকে চুমো খেল, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও গভর্নেসরা অভিবাদন করল, তারপর চলে গেল। শুধু থেকে গেল ছোট্ট নিকলাস ও তার শিক্ষক। দেসালেস চুপি চুপি নিকলাসকে নীচে নেমে যেতে বলল।

নিকলাস বল্‌কন্‌স্কিও মৃদু স্বরে বলল, "না মঁসিয়ে দেসালেস, আমি কাকিমাকে বলছি আমাকে এখানে থাকার অনুমতি দিতে।"

কাকিমার কাছে গিয়ে বলল, "মা তাঁতে, দয়া করে আমাকে এখানে থাকতে দাও।"

তার মুখে ফুটে উঠল অনুরোধ, উত্তেজনা ও উচ্ছ্বাস। তার দিকে একবার তাকিয়ে কাউণ্টেস মারি পিয়েরের দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

বলল, "তুমি যতক্ষণ আছ ততক্ষণ ও এখান থেকে নড়বে না।"

সুইস্ শিক্ষিকটির দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে পিয়ের বলল, "একটু পরেই ওকে আপনার কাছে পৌঁছে দিচ্ছি মঁসিয়ে দেসালেস। শুভরাত্রি!" তারপর নিকলাসের দিকে ফিরে বলল, "আমাদের দুজনের মধ্যে তো এখনও ভালকরে দেখা সাক্ষাৎই হয় নি। দেখ মারি, ও কত বড় হয়ে গেছে!"

"আমার বাবার মত?" উজ্জ্বল উচ্ছ্বসিত চোখ মেলে পিয়েরের দিকে তাকিয়ে রক্তিম মুখে ছেলেটি শুধাল।

পিয়ের মাথা নাড়ল। তারপর আবার শুরু হল পিয়ের ও দেনিসভের আলোচনা। মারি উল বুনতে বসে গেল; নাতাশার চোখ সারাক্ষণ স্বামীর উপর। নিকলাস ও দেনিসভ উঠে পাইপ নিয়ে ধূমপান করল, সোনিয়ার

কাছ থেকে আরও চা আনল। কোঁকড়া-চুল ছেলেটি সকলের অলক্ষ্যে ঘরের এককোণে বসে উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পরে সকলে যখন নৈশ ভোজনের জন্য উঠে পড়ল তখন ছোট্ট নিকলাস বল্‌কন্‌স্কি পিয়েরের কথা গিয়ে বলল, "পিয়ের কাকা, তুমি···না··· আচ্ছা, বাপি বেঁচে থাকলে·· সে কি তোমার সঙ্গে একমত হত?"

হঠাৎ পিয়ের বুঝতে পারল, ছোট ছেলেটির উপস্থিতিতে এসব আলোচনা করা ঠিক হয়নি। কিন্তু একটা জবাব তো দিতেই হবে।

"হাঁ, তাই তো মনে হয়," অনিচ্ছাসত্ত্বেও কথাটা বলে সে বেরিয়ে গেল।

অধ্যায়—১৫

ড্রেসিং-গাউন পরে নিকলাস যখন শোবার ঘরে ঢুকল, কাউণ্টেস মারি তখন টেবিলে বসে কি যেন লিখছে।

"কি লিখছ মারি?" নিকলাস শুধাল।

কাউণ্টেস মারির মুখ রাঙা হয়ে উঠল। "একটা দিন-পঞ্জী লিখছি নিকলাস," বলে নীল রংয়ের খাতাটা তার হাতে তুলে দিল।

"দিনপঞ্জী? বল কি?" একটু ঠাট্টার হাসি হেসে সে খাতাটা খুলে পাতা ওল্টাল। সত্যি, ফরাসীতে লেখা একটা দিনপঞ্জী। কাউণ্টেস মারি ও ছেলেদের দৈনন্দিন জীবনের টুকিটাকি কথা লিখে রাখা হয়েছে। খানিকটা দেখে খাতাটা টেবিলে রেখে দিল।

কাউণ্টেস মারি বলল, "দেখ, ছোট্ট নিকলাসকে নিয়ে মাঝে-মাঝেই আমার বড় চিন্তা হয়। এরকম ছেলে সচরাচর দেখা যায় না। আমার ভয় হয়, নিজের ছেলেমেয়েদের দিকে নজর দিতে গিয়ে আমি হয় তো ওকে অবহেলা করছি। আমাদের তো সন্তান আছে, আত্মীয়-স্বজন আছে, কিন্তু ওর তো কেউ নেই। সব সময় নিজের চিন্তায়ই ডুবে থাকে।"

"দেখ, আমার তো মনে হয় না তার জন্য তুমি নিজেকে দোষী করতে পার। স্নেহময়ী মা তার জন্য যা কিছু করতে পারত সেসবই তো তুমি করেছ, এখনও করছ, আর সেজন্য আমিও খুব খুশি। সত্যি ছেলেটি ভাল, খুব ভাল। আজ সন্ধ্যায় তো মন্ত্রমুগ্ধের মত পিয়েরের কথাগুলি শুনছিল। ভাল ছেলে, বড় ভাল ছেলে।"

কাউণ্টেস মারি বলল, "তবু আমি তো তার নিজের মা নই। সেটা আমি বুঝি আর তাই তো ভয় পাই। চমৎকার ছেলে, কিন্তু তাকে নিয়ে আমার ভয়ও খুব। কিছু সঙ্গীসাথী থাকলে তার পক্ষে ভাল হত।"

নিকলাস বলল, "সে ব্যবস্থাও শিগ্‌গিরই হবে। পরের গ্রীষ্মকালেই আমি তাকে পিতার্সবুর্গ নিয়ে যাব।"

কাউণ্টেস মারি মুখে কিছু বলল না। স্বামীর হাতটা হাতে নিয়ে চুমো খেল।

ছোট্ট ভাই-পোটির কথাই ভাবতে লাগল। পিয়েরের কথাগুলি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে সে শুনেছে—স্বামীর এই কথাটা তাকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছে। ছেলেটির স্পর্শকাতর চরিত্রের আরও অনেক বৈশিষ্ট্যই তার মনে পড়ে গেল। তার কথা ভাবতে গিয়ে সে নিজের ছেলেমেয়েদের কথাও ভাবল। তাদের মধ্যে কোন তুলনা সে করল না, কিন্তু তাদের প্রতি নিজের মনোভাবের সঙ্গে ছোট্ট নিকলাসের প্রতি নিজের মনোভাবকে সে তুলনা না করে পারল না; অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে সে বুঝল যে ছোট নিকলাসের প্রতি তার মনোভাবে কোথায় যেন কিছু ত্রুটি আছে।

অনেক সময় সে মনে করে, তাদের বয়সের জন্যই তার মনোভাবের এই পার্থক্য ঘটে, কিন্তু তবু নিজের মনে সে বোঝে যে সে অপরাধী, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, তার প্রতি সে আরও ভাল ব্যবহার করবে, অসাধ্য সাধন করবে—খৃস্ট যেভাবে মানুষকে ভালবাসত। সেইভাবেই এ জীবনে সে ভালবাসবে স্বামীকে, সন্তানকে, ছোট্ট নিকলাসকে, সব প্রতিবেশীকে। কাউণ্টেস মারির মন সর্বদাই উড়ে চলে অনন্ত ও শাশ্বতের পানে, আর তাই কখনও শান্তি পায় না। তার মুখে ফুটে উঠল উন্নত মনের কঠিন ভাব, দেহ-বন্ধনে আবদ্ধ আত্মার গোপন যন্ত্রণা। নিকলাস একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল। "হে ঈশ্বর! সে মরে গেলে আমাদের কি হবে? তার এই মুখ দেখলেই যে সেই ভয়ই আমাকে পেয়ে বসে।" এই কথা ভাবতে ভাবতে দেবমূর্তির সামনে বসে সে সান্ধ্য প্রার্থনা শুরু করল।

অধ্যায়—১৬

নাতাশা ও পিয়ের নিজেদের মধ্যে যেভাবে কথা বলতে শুরু করল তা একমাত্র স্বামী-স্ত্রীই বলতে পারে। বড় বড় চোখ তুলে নাতাশা স্বামীর দিকে এগিয়ে গেল, তার মাথাটা বুকে চেপে ধরে বলে উঠল: "এখন তুমি সম্পূর্ণ আমার, আমার! তোমাকে আর পালাতে দেব না!" —আর সেইমুহূর্ত থেকে যে সংলাপ শুরু হল তা কোন যুক্তি মানে না, বুঝি বা নিজেকেও মানে না; আপন বেগে আপনি উৎসারিত হয়ে চলে, পরস্পর পরস্পরকে পরিষ্কার-ভাবে বুঝতে পারে।

নাতাশা পিয়েরকে বলল তার দাদার জীবন ও কাজকর্মের কথা; তার অনুপস্থিতিতে সে যে কত কষ্ট পেয়েছে, সে যে মারিকে কত ভালবাসে, মারি যে তার তুলনায় অনেক ভাল—এমনি সব কথা। নাতাশা যে তার চাইতে অনেক বড় সেকথা আন্তরিকভাবেই স্বীকার করলেও সে কিন্তু পিয়েরের

কাছে এ দাবীও সেইসঙ্গে রাখল যে পিয়েরকে কিন্তু মারি এবং অন্য সব মেয়ের চাইতে তাকেই বেশী ভালবাসতে হবে, বিশেষ করে এখন পিতার্সবুর্গে অনেক নারী দেখে আসার পর সেকথা তাকে অতি অবশ্য নতুন করে ঘোষণা করতে হবে।

নাতাশার কথার জবাবে পিয়ের বলল, এবার পিতার্সবুর্গে গিয়ে ডিনারে ও বল নাচের আসরে মহিলাদের সঙ্গে মেলামেশা করাটা তার কাছে বড়ই অসহ্য লেগেছে।

বলল, "মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার কায়দাই ভুলে গেছি। সব কেমন এক্-ঘেয়ে লাগত। তাছাড়া, আমি খুব ব্যস্তও ছিলাম।"

নাতাশা একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল:

"মারি চমৎকার মেয়ে! ছেলেমেয়েদের কথা খুব ভাল বুঝতে পারে। মনে হয় সে যেন তাদের মনের ভিতরটা পর্যন্ত দেখতে পায়। ধর না গতকাল মিতা দুষ্টুমি করছিল··"

পিয়ের বাধা দিয়ে বলল, "ঠিক তার বাবার মত।"

নাতাশা হঠাৎ চুপ করে গেল। একটু পরে বলল, "আমি এতক্ষণ কি ভাবছিলাম জান? প্লাতন কারাতায়েভের কথা।"

পিয়ের উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, "ওঃ, প্লাতন কারাতায়েভ? আমাদের পারিবারিক জীবনটা দেখলে সে খুব খুশি হত। সব কিছুর মধ্যেই সে দেখতে চায় মিল, সুখ, শান্তি; তাকে এনে আমাদের জীবনটা দেখাতে পারলে আমি গর্ববোধ করতাম। ভাল কথা—তুমি তো কেবলই আমার অনুপস্থিতির কথা বলছ, কিন্তু তুমি কি বিশ্বাস করবে এই বিরহের পরে তোমাকে এখন কত বেশী ভাল লাগছে···"

"হ্যাঁ, আমার ভাবা উচিত···" নাতাশা বলতে শুরু করল।

"না, সেকথা নয়। তোমাকে না ভালবেসে আমি পারি না। আমার মত এমন ভালবাসতেও কেউ পারে না, কিন্তু এটা একটা বিশেষ ব্যাপার··· সত্যি বলছি, অবশ্য—" পিয়ের কথাটা শেষ করল না; কারণ চার চোখের মিলনেই বাকিটা বলা হয়ে গেল।

নাতাশা হঠাৎ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল, "এই যেসব মধুচন্দ্রিকা নিয়ে এত হৈ-চৈ, প্রথমেই নাকি জীবনের যত মধুমাস,—এসবের কোন মানে হয়! বরং এখনই তো সব চেয়ে সেরা সময়। শুধু তুমি যদি দূরে চলে না যাও! তোমার মনে পড়ে, আমরা কত ঝগড়া করতাম? আর সব সময়ই দোষ ছিল আমার। সব সময়। আর কি নিয়ে যে ঝগড়া করতাম—তাও ছাই মনে পড়ে না!"

পিয়ের হেসে বলল, "কারণ তো একটাই···ঈর্ষা···"

"ওকথা বলো না! আমি সইতে পারি না!" তার চোখে আগুনের

ঝিলিক। একটু থেমে বলল, "তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল?"

"না। আর হলেও আমি তাকে চিনতেই পারতাম না।"

কিছুক্ষণ দুজনই চুপ।

যে মেঘ জমেছিল তাদের মনে সেটাকে উড়িয়ে দিতে নাতাশা বলতে আরম্ভ করল, "আরে জান? তুমি যখন পড়ার ঘরে কথা বলছিলে তখন আমি তোমাকেই দেখছিলাম। তোমরা যেন এক বোঁটায় দুটো ফল—তুমি আর তোমার ছেলে। ...ও হো, এবার আমাকে যেতে হবে। ওটাকে দুধ খাওয়াতে হবে। ...তোমাকে ফেলে যেতে কষ্ট হচ্ছে।"

কয়েক সেকেণ্ড দুজন আবার চুপ। তারপর একই সঙ্গে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে একই সময় দুজন কথা বলতে শুরু করল। পিয়েরের মুখে তৃপ্তির হাসি, নাতাশার মুখে খুশির শান্ত হাসি।

"না, তুমি কি যেন বলছিলে? বলে যাও।"

"না, তুমি বল; আমার যত সব বাজে কথা," নাতাশা বলল।

পিয়ের যেকথা বলতে শুরু করেছিল সেটা শেষ করল। পিতার্সবুর্গে নিজের সাফল্যের কথাই বলল

"আমি শুধু বলতে চেয়েছি, যেসব চিন্তা-ভাবনা থেকে মহৎ ফসল ফলে আসলে সেগুলো খুব সরল, সহজ। আমার বক্তব্যের সার কথাই হল, পাপীরা যদি সংঘবদ্ধ হয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে, তাহলে সৎ লোকদেরও তাই করতে হবে। এটা তো খুব সোজা কথা।"

"ঠিক।"

"আর তুমি কি বলছিলে?"

"আমি? যত বাজে কথা।"

"তবু?"

আরও উজ্জ্বল হাসি হেসে নাতাশা বলল, "আহা, অতিতুচ্ছ কথা। আমি বলতে চেয়েছি পেত্য়ার কথা: আজ যখন নার্স তাকে আমার কাছ থেকে নিতে এল, তখন সে হেসে চোখ বুঁজল, আমাকে জড়িয়ে ধরল আমি জানি, সে লুকোতে চাইছিল। কী মিষ্টি! ঐ যে, আবার কাঁদছে। আচ্ছা, চলি।" নাতাশা বেরিয়ে গেল।

এদিকে একতলায় ছোট্ট নিকলাস বল্‌কন্‌স্কির শোবার ঘরে একটা ছোট বাতি যথারীতি জ্বলছে। (ছেলেটি অন্ধকারকে ভয় পায়; সে ভয় কিছুতেই যাচ্ছে না।) দেসালেস ঘুমোয় চারটে বালিশে ভর দিয়ে; তার রোমক নাক থেকে সুরেলা শব্দ বের হতে থাকে। ছোট নিকলাস ঘামে ভিজে সবে ঘুম থেকে উঠেছে। বিছানায় বসে হাঁ করে সামনে তাকিয়ে আছে। ঘুম ভেঙেছে একটা ভয়ংকর স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন দেখেছে: সে আর পিয়ের কাকা

প্লুতার্কের বর্ণনামত শিরস্ত্রাণ পরে একটা মস্ত বড় সেনাবাহিনীকে পরিচালিত করছে। হেমন্তের বাতাসে যেসব মাকড়শার জাল ভেসে বেড়ায় তারই মত কাৎ হয়ে চলেছে সেনাদল। সম্মুখে "গৌরব"; সেটা মাকড়শার জালের মত হলেও আরও বেশী ঘন। সে ও পিয়ের ধীরে ধীরে লক্ষ্যস্থলের দিকে এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ জালের সুতোগুলো জড়িয়ে গেল; এগিয়ে চলা হল শক্ত। নিকলাস খুড়ো কঠিন, ভয়ংকর মূর্তিতে তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

কিছু ভাঙা মোম ও কলম দেখিয়ে পিয়ের বলে উঠল, "এ কাজ তোমরা করেছ? আমি তোমাদের ভালবাসতাম, কিন্তু আরাকৃচীভ হুকুম পাঠিয়েছেন, যারা এগিয়ে আসবে তাদের প্রথম জনকে আমি হত্যা করব।" ছোট্ট নিকলাস পিয়েরের দিকে ঘুরে দাঁড়াল, কিন্তু পিয়ের সেখানে নেই। তার জায়গায় এসেছে তার বাবা—প্রিন্স আন্দ্রু—বাবার কোন আকার নেই, গঠন নেই, তবু সে আছে; সেটা বুঝতে পেরে নিকলাস ভালবাসায় দুর্বল হয়ে পড়ল: মনে হল সে নিজেও শক্তিহীন, পঙ্গু, নিরাকার। বাবা তাকে আদর করল, করুণা করল। কিন্তু নিকলাস কাকা ক্রমেই তাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। নিকলাস ভয় পেল। তার ঘুম ভেঙে গেল।

"আমার বাবা!" নিকলাস ভাবল। (বাড়িতে প্রিন্স আন্দ্রুর দু-খানা প্রতিকৃতি থাকলেও নিকলাস কখনও তাকে মানুষের রূপে কল্পনা করে নি।) "বাবা আমার কাছে এসেছে, আমাকে আদর করেছে। আমার ও পিয়ের কাকার কাজকে সমর্থন করেছে। সে আমাকে যা করতে বলবে আমি তাই করব। মিউসিয়াস স্কাভোলা তার হাতটা পুড়িয়েছিল। আমার বেলায়ও কেন সেই একই ঘটনা ঘটবে না? আমি জানি তারা চায় আমি লেখাপড়া শিখি। শিখবই তো। কিন্তু একদিন তো লেখাপড়া শেষ হবে, আর তখন তো আমাকে কিছু না কিছু করতেই হবে। ঈশ্বরের কাছে আমার কেবল একটি প্রার্থনা, প্লুতার্কের চরিত্রগুলোর মত আমার বেলায়ও কিছু ঘটুক; তাহলে আমিও তাদের মতই কাজ করতে পারব। আরও ভাল কাজ করব। সকলেই আমাকে চিনবে, ভালবাসবে, আমাকে দেখে আনন্দ পাবে।" আর তখনই তার বুকটা দুলে উঠল; সে কাঁদতে লাগল।

"তোমার কি অসুখ করেছে?" তার কানে এল দেসালেসের গলা।

"না," বলে নিকলাস আবার বালিশে মাথা রাখল।

দেসালেস সম্পর্কে ভাবল, "তিনি খুব ভাল, দয়ালু; আমিও তাকে ভালবাসি! কিন্তু পিয়ের কাকা! আঃ, কী এক আশ্চর্য মানুষ! আর আমার বাবা? আহা, বাবা, আমার বাবা! হ্যাঁ, আমি এমন কিছু করব যাতে বাবাও খুশি হবে…"

॥ দ্বিতীয় পরিশিষ্ট ॥

অধ্যায়—১

ইতিহাস নানা জাতি ও মানবতার জীবনস্বরূপ। মানবতার জীবন, এমন কি একটিমাত্র জাতির জীবনকে আয়ত্তে এনে তাকে ভাষা দেওয়া, তাকে বর্ণনা করা স্বভাবতই অসম্ভব কাজ।

জনগণের যে জীবন স্পষ্টতই মরীচিকাসম তাকে করায়ত্ত করে বর্ণনা করার একই পদ্ধতি অনুসরণ করেছে সব প্রাচীন ইতিহাসকাররা। তারা বর্ণনা করেছে জনগণের শাসক ব্যক্তিবিশেষের কর্মধারাকে, আর সেই সব মানুষের কাজকেই তারা সমগ্র জাতির কাজ বলে ধরে নিয়েছে।

কিন্তু প্রশ্ন হল: সেই সব ব্যক্তি নিজেদের ইচ্ছামত কাজ করতে এক একটা জাতিকে প্ররোচিত করেছে কিভাবে, আর এই সব ব্যক্তির ইচ্ছাই বা পরিচালিত হয়েছিল কিসের দ্বারা? এ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে প্রাচীন কালের মানুষরা ঐশ্বরিক শক্তির অবতারণা করেছে: সেই শক্তিই একদিকে একটা জাতিকে করেছে একজন নির্বাচিত মানুষের ইচ্ছার বশীভূত, আবার অন্যদিকে সেই নির্বাচিত মানুষের ইচ্ছাকে এমনভাবে পরিচালিত করেছে যাতে কোন পূর্বনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে।

মানবিক ব্যাপারে দেবতার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের দ্বারাই প্রাচীনরা এইসব প্রশ্নের মীমাংসা করেছে।

আধুনিক ইতিহাস নীতিগতভাবে এই দুই মতবাদকেই বাতিল করে দিয়েছে।

মনে হওয়া স্বাভাবিক যে মানুষের উপর দেবতার কর্তৃত্ব এবং বিভিন্ন জাতির কোন পূর্বনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত হওয়া প্রাচীন মানুষদের এই উভয়বিধ বিশ্বাসকে বাতিল করার পরে আধুনিক ইতিহাস পর্যালোচনা করবে শক্তির বহিঃপ্রকাশকে নয়, তার কারণকে। কিন্তু আধুনিক ইতিহাস তা করে নি। নীতির দিক থেকে প্রাচীনদের মতকে বাতিল করলেও কার্যত তাকেই তারা অনুসরণ করে চলেছে।

ঐশ্বরিক কর্তৃত্বসম্পন্ন এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত মানুষের পরিবর্তে আধুনিক ইতিহাস আমাদের দিয়েছে হয় অসাধারণ, অতিমানবিক ক্ষমতার অধিকারী নায়কদের, আর না হয় তো নরপতি থেকে সাংবাদিক পর্যন্ত এমন সব সাধারণ মানুষদের যারা জনতাকে পরিচালিত করে। আগেকার দিনের ইহুদি, গ্রীক, বা রোমক জাতির যেসব ঈশ্বর-নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে প্রাচীন ইতিহাসকাররা মানব জাতির প্রতীক বলে মনে

করত, তার পরিবর্তে আধুনিক ইতিহাস তুলে ধরেছে তার নিজস্ব উদ্দেশ্যকে—সে উদ্দেশ্য ফরাসী, জার্মান, অথবা ইংরেজ জাতির কল্যাণ, অথবা সর্বোচ্চ-ক্ষেত্রে মানবজাতির কল্যাণ ও সভ্যতা; অবশ্য সে মানবজাতি বলতে সাধারণত বোঝায় একটি বৃহৎ মহাদেশের উত্তর-পশ্চিমের একটি ক্ষুদ্র অংশের দখলদার মানুষের কল্যাণ ও সভ্যতাকে।

আধুনিক ইতিহাস প্রাচীন মানুষদের বিশ্বাসকে বাতিল করেছে, কিন্তু তার জায়গায় কোন নতুন ভাবধারাকে প্রতিষ্ঠা করে নি; এবং তার ফলে নতুন ইতিহাসকাররা অন্য পথে সেই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হয়েছে, অর্থাৎ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে (১) ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা পরিচালিত জাতি এবং (২) এমন একটি পূর্বজ্ঞাত উদ্দেশ্যের অস্তিত্ব যার দিকে এগিয়ে চলেছে এইসব জাতি ও মানব সমাজ।

গিবন থেকে বাক্‌ল্‌ পর্যন্ত আধুনিক ইতিহাসকারদের মধ্যে আপাত-দৃষ্টিতে যতই অমিল থাকুক, তাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে যতই নতুনত্ব থাকুক, তাদের সকলের লেখার ভিত্তি হিসাবে রয়েছে ঐ দুটি প্রাচীন ও অনিবার্য ধারণা।

১৭৮৯-তে প্যারিসে একটা উত্তেজনা দেখা দিল: সেটা বেড়ে চলল, ছড়িয়ে পড়ল, এবং মানুষের পশ্চিম থেকে পূবের দিকে এগিয়ে চলার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করল। কয়েকবার সে গতি হল পূবমুখী; পূব থেকে পশ্চিমমুখী একটা পাল্টা অগ্রগতির সঙ্গে তার সংঘর্ষ বাঁধল; ১৮১২-তে সেটা পৌঁছল চূড়ান্ত লক্ষ্য মস্কোতে; তারপর একটা অদ্ভুত মিল রেখে শুরু হল প্রত্যাঘাত, আর আগের মতই মধ্য ইয়োরোপের জাতিগুলি তাতে যোগ দিল। প্রতি-আন্দোলন প্রথম আন্দোলনের যাত্রাস্থল প্যারিসে পৌঁছে মিলিয়ে গেল।

সেই বিশ বছরকালের মধ্যে অগণিত শস্যক্ষেত্রে চাষ-আবাদ হল না, অসংখ্য ঘর বাড়ি পুড়ল, বাণিজ্যের গতি পরিবর্তিত হল, লক্ষ লক্ষ মানুষ দেশ ছাড়ল, কেউ নিঃস্ব হল, কেউ বা ধনী হল, প্রেমধর্মে বিশ্বাসী লক্ষ লক্ষ খৃস্টান পরস্পরকে হত্যা করল।

এসবের অর্থ কি? এসব কেন ঘটল? কিসের জন্য মানুষ ঘর পোড়াল, মানুষকে খুন করল? এসব ঘটনার কারণ কি? কোন্ শক্তি তাদের দিয়ে এসব করাল। সেই সময়কার স্মৃতিস্তম্ভ ও ঐতিহ্যের মুখোমুখি হয়ে মানুষের মনে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে এই সব ন্যায্য প্রশ্নই তো উচ্চারিত হয়।

এইসব প্রশ্নের জবাবের আশায় মানুষের সাধারণ বুদ্ধি তো ইতিহাস-বিজ্ঞানের দিকেই চোখ ফেরায়, কারণ জাতি ও মানুষকে নিজেকে চিনতে শেখানোই তো ইতিহাসের লক্ষ্য।

ইতিহাস যদি প্রাচীনদের ধ্যান-ধারণাকে অক্ষুণ্ণ রাখত তাহলে সে বলত মানুষদের পুরস্কার বা শাস্তি দিতে ঈশ্বরই নেপোলিয়নকে শক্তি দিয়েছেন,

দৈব উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করতে তার ইচ্ছাকে পরিচালিত করেছেন; সেক্ষেত্রে এই উত্তরই হত স্পষ্ট ও পূর্ণ। লোকে নেপোলিয়নের দৈব তাৎপর্যে বিশ্বাস করতে পারে, নাও করতে পারে, কিন্তু যে বিশ্বাস করে তার কাছে তৎকালীন ইতিহাসের কোন কিছুই দুর্বোধ্য ঠেকবে না, বা কোন স্ব-বিরোধিতাও তার চোখে পড়বে না।

কিন্তু আধুনিক ইতিহাস তো সে জবাব দিতে পারে না। মানুষের ব্যাপারে দেবতার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের প্রাচীন ধারণাকে বিজ্ঞান স্বীকার করতে পারে না, আর তাই ইতিহাসকে অন্য জবাব দিতে হয়।

এইসব প্রশ্নের জবাবে আধুনিক ইতিহাস বলে: তুমি জানতে চাও এই আন্দোলনের অর্থ কি, তার কারণ কি, আর কোন্ শক্তি এইসব ঘটনা ঘটিয়েছে। শোন:

"ষোড়শ লুই ছিল অত্যন্ত অহংকারী ও আত্মবিশ্বাসী মানুষ; তার এই-এই রক্ষিতা ছিল, এই-এই মন্ত্রী ছিল, আর ফ্রান্সকে সে খুব খারাপভাবে শাসন করছিল। তার বংশধররাও ছিল দুর্বল মানুষ, আর খারাপ শাসনকর্তা। তাদেরও ছিল এই-এই প্রিয়পাত্র, আর এই-এই রক্ষিতা। তাছাড়া, কিছু লোক সেইসময় কিছু বইও লিখেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে প্যারিসের প্রায় ডজন দুই লোক বলতে শুরু করল যে সব মানুষই স্বাধীন ও সমান। তার ফলেই সারা ফ্রান্স জুড়ে মানুষ একে অন্যকে আঘাত করতে লাগল, ডুবিয়ে মারতে লাগল। তারা রাজাকে হত্যা করল; আরও অনেককে হত্যা করল। সেইসময়ে ফ্রান্সে একজন প্রতিভাধর মানুষ ছিল—নেপোলিয়ন। সে সর্বত্র সকলকে জয় করল—অর্থাৎ সে অনেক মানুষ মারল, কারণ সে ছিল একটি মহৎ প্রতিভা। যেকারণেই হোক সে গেল আফ্রিকা-বাসীদের মারতে, আর এত ভালভাবে, এত সুকৌশলে ও সুচিন্তিতভাবে তাদের মারল যে ফ্রান্সে ফিরে এসে সে যখন হুকুম জারি করল যে সকলকেই তাকে মানতে হবে, তখন সকলেই তার বশ্যতা স্বীকার করল। সম্রাট হবার পরে সে আবার গেল ইতালি; অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সে সেখানকার মানুষদের মারতে। সেখানে সে অনেককে মেরে ফেলল। রাশিয়াতে আলেক্সান্দার নামে একজন সম্রাট ছিল; ইয়োরোপে শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে হবে এই মনস্থ করে সে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল। ১৮০৭-এ সে হঠাৎ তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করল, কিন্তু ১৮১১-তে তাদের মধ্যে আবার বিবাদ বাঁধল; আবার তারা অনেক লোক মারতে শুরু করল। নেপোলিয়ন ছয় লক্ষ সৈন্য নিয়ে রাশিয়ায় প্রবেশ করল, মস্কো দখল করল; তারপরই হঠাৎ সে মস্কো থেকে পালিয়ে গেল, আর সম্রাট আলেক্সান্দার স্তিন ও অন্যান্যদের পরামর্শে ইয়োরোপের এই শান্তি বিঘ্নকারীর বিরুদ্ধে গোটা ইয়োরোপকে ঐক্যবদ্ধ করে তুলল। নেপোলিয়নের মিত্রপক্ষের লোকরা হঠাৎ তার শত্রু হয়ে গেল,

তাদের সেনাবাহিনীও তার বিরুদ্ধে এগিয়ে এল। মিত্রশক্তি নেপোলিয়নকে পরাজিত করল, প্যারিসে প্রবেশ করল, নেপোলিয়নকে সিংহাসন ছাড়তে বাধ্য করল, এবং তাকে এল্‌বা দ্বীপে পাঠিয়ে দিল। অবশ্য তার সম্রাট উপাধিটা কেড়ে নিল না, তাকে সর্বপ্রকার সম্মানও দেখাল, যদিও পাঁচ বছর আগে এবং এক বছর পরে সকলেই তাকে দেখত একজন সমাজচ্যুত দস্যুর মত। তারপর যে ষোড়শ লুই ছিল এতদিন ফরাসী ও মিত্রশক্তির পরিহাসের পাত্র সেই আবার শাসন-কর্তৃত্বে ফিরে এল। আর নেপোলিয়ন তারই "ওল্ড গার্ড"দের সামনে চোখের জল ফেলতে ফেলতে সিংহাসন পরিত্যাগ করে নির্বাসনে চলে গেল। তারপর সুকৌশলী রাজনীতিবিদ ও কূটনীতি-বিদরা (বিশেষ করে তালেবাঁদ) ভিয়েনাতে আলোচনায় বসল, এবং তাদের আলোচনার দ্বারা কোন জাতিকে সুখী, কোন জাতিকে দুঃখী করে দিল। হঠাৎ কূটনীতিবিদ ও রাজাদের মধ্যে লড়াই বাঁধার উপক্রম দেখা দিল, উভয় পক্ষের সেনাদলকে যুদ্ধের হুকুম দেওয়া হয় আর কি, এমন সময় এক ব্যাটেলিয়ন সৈন্য নিয়ে নেপোলিয়ন এসে হাজির হল ফ্রান্সে, আর যে ফরাসীরা তাকে ঘৃণা করত তারাই সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে আত্মসমর্পণ করল। মিত্রপক্ষের নরপতিরা ক্ষেপে গিয়ে আবার ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে দিল। প্রতি-ভাধর নেপোলিয়নকে পরাজিতও করল; আর তখনই হঠাৎ তাকে একটা দস্যু বলে চিনতে পেরে সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে পাঠিয়ে দিল। আর সেই নির্বাসিত লোকটি তার বড় আদরের প্রিয় ফ্রান্স থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ধীরে ধীরে সেই পাহাড়ের বুকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেল, আর তার মহৎ কার্যা-বলীকে রেখে গেল অনাগত দিনের মানুষের জন্য। কিন্তু ইয়োরোপে আবার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল; নরপতিগণ আর একবার প্রজাদের উপর উৎপীড়ন চালাতে লাগল।"

এটাকে ঐতিহাসিক বিবরণের প্রতি বিদ্রূপ—তার একটা হাস্যকর চিত্র বলে মনে করলে ভুল করা হবে। পরন্তু সেই যুগের বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্মৃতিকথার সংকলক ও ইতিহাসের লেখক থেকে আরম্ভ করে সাধারণ ইতিহাসের লেখক ও সংস্কৃতির নব ইতিহাসের লেখক পর্যন্ত এইসব প্রশ্নের যেসব পরস্পর-বিরোধী উত্তর দিয়েছে অথচ প্রশ্নের মীমাংসা করতে পারে নি তারই একটা অত্যন্ত মৃদু বিবরণ এখানে দেওয়া হল।

এই সব উত্তর এত অদ্ভুত ও অবাস্তব মনে হবার আসল কারণ, আধুনিক ইতিহাস বধির লোকের মত এমন সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে যা কেউ জিজ্ঞাসা করে নি।

মানবতার ও জনগণের অগ্রগতির বিবরণ দেওয়াই যদি ইতিহাসের উদ্দেশ্য হয় তাহলে তো প্রথম প্রশ্নই হচ্ছে: কোন্ সে শক্তি যা জনগণকে পরিচালিত করে? এই প্রশ্নের উত্তরে আধুনিক ইতিহাস যত্ন সহকারে হয়

বলেছে যে নেপোলিয়ন ছিল মস্ত প্রতিভা, অথবা ষোড়শ লুই ছিল অহংকারী, অথবা কিছু লেখক কিছু বই লিখেছে।

এসবই সত্য হতে পারে, মানুষ সেটা মেনে নিতেও প্রস্তুত, কিন্তু প্রশ্ন তো সেটা নয়। এসবই উল্লেখযোগ্য হত যদি আমরা এমন একটি স্বয়ম্ভু ঐশ্বরিক শক্তিকে স্বীকার করতাম যিনি নেপোলিয়ন, লুই ও লেখকদের মাধ্যমে রাষ্ট্রসমূহকে পরিচালিত করেন; কিন্তু আমরা তা স্বীকার করি না, আর তাই নেপোলিয়ন, লুই, অথবা লেখকদের কথা বলার আগেই এইসব লোকের সঙ্গে রাষ্ট্রসমূহের অগ্রগতি ও আন্দোলনের সম্পর্কটা আমাদের বুঝিয়ে দেওয়া দরকার

ঐশ্বরিক শক্তির পরিবর্তে অন্য কোন শক্তির আবির্ভাব ঘটেছে; সে শক্তি কি দিয়ে গঠিত তা আমাদের বুঝিয়ে বলতে হবে, কারণ ইতিহাসের সমস্ত আকর্ষণই সেই শক্তিতে নিহিত।

ইতিহাস যেন ধরেই নিয়েছে যে এই শক্তি স্বতঃসিদ্ধ ও সর্বজনজ্ঞাত। কিন্তু এটাকে জানা বলে মনে করবার একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থ পাঠের পরে এ সন্দেহ না জন্মে পারে না যে সত্যি সত্যি এটা সকলের জানা কি না।

অধ্যায়—২

কোন্ শক্তি জাতিসমূহকে পরিচালিত করে?

জীবনীমূলক ইতিহাসকার এবং বিভিন্ন জাতির ইতিহাসকার এই শক্তিকে নায়ক ও শাসকদের জন্মগত শক্তি বলে মনে করে। তাদের বিবরণ অনুযায়ী সব ঘটনাই ঘটে নেপোলিয়ন, আলেক্সান্দার, বা অন্য কোন ব্যক্তির ইচ্ছানুসারে। তাদের এ ধারণা সন্তোষজনক হতে পারত যদি প্রতিটি ঘটনার মাত্র একজন করে ইতিহাসকার থাকত। কিন্তু যেমুহূর্তে বিভিন্ন জাতি ও ভাবধারার ইতিহাসকার একই ঘটনার বিবরণ দিতে শুরু করে, তখনই তারা একেবারেই অর্থহীন হয়ে পড়ে, কারণ এই শক্তিকে যে তারা শুধু ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বোঝে তাই নয়, অনেক সময়ই বোঝে সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধীভাবে। এক ইতিহাসকার বলে ঘটনাটি ঘটিয়েছে নেপোলিয়নের শক্তি, আবার অন্য জন বলে ঘটিয়েছে আলেক্সান্দারের শক্তি, অন্য কেউ কোন তৃতীয় ব্যক্তির নাম করে। তাছাড়া, একই ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন শক্তির কথাও তারা বলে। যেমন বোনাপার্তপন্থী থিয়ের্স বলে, নেপোলিয়নের গুণাবলী ও প্রতিভার ওপরেই তার শক্তি প্রতিষ্ঠিত। প্রজাতন্ত্রপন্থী লাঁফ্রে বলে, সে শক্তির ভিত্তি চালাকি ও জনগণকে প্রবঞ্চনা।

সার্বিক ইতিহাসের যেসব লেখকের কারবার সব জাতিকে নিয়ে তারা

তো বিশেষজ্ঞ ইতিহাসকারদের মতকে ভ্রান্ত বলেই মনে করে। তারা নায়ক বা শাসকদের কোন জন্মগত শক্তিকে স্বীকারই করে না; তারা মনে করে, বিভিন্ন লক্ষ্যে পরিচালিত বহু শক্তির ফলই সেই শক্তি যা ঘটনাকে ঘটায়। একটি যুদ্ধ অথবা একটি জাতির অধীনতার বর্ণনা দিতে গিয়ে সাধারণ ইতিহাসকার তার কারণের অনুসন্ধান করে সেই ঘটনার সঙ্গে জড়িত বহু মানুষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে, কোন একটি মানুষের শক্তির মধ্যে নয়।

১৮১৩-র অভিযান অথবা বুরবন-বংশের পুনঃ প্রতিষ্ঠার বর্ণনা দিতে গিয়ে বিশেষজ্ঞ ইতিহাসকাররা স্পষ্টই বলে যে আলেক্সান্দারের ইচ্ছায়ই এইসব ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু সার্বিক ইতিহাসকার জার্ভিনাস প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছে যে ঐ দুটি ঘটনার পিছনে রয়েছে আলেক্সান্দারের ইচ্ছা ছাড়াও আরও অনেক কিছু—যেমন স্তিন, ম্যাটার্নিক, মাদাম দ স্তায়েল, তালের্ঁাদ, ফিক্‌টে, চাতুব্রিয়ঁাদ, ও অন্যদের কাজকর্ম। এইভাবে তাদের মধ্যে বিরোধিতা একান্তই স্পষ্ট।

আর একটি তৃতীয় শ্রেণীর ইতিহাসকার আছে—তথাকথিত সংস্কৃতির ইতিহাসকার—যারা এই শক্তিকে একটা স্বতন্ত্র কিছু বলে মনে করে এই শক্তির মধ্যে তারা আবিষ্কার করে সংস্কৃতিকে—মানসিক ক্রিয়াকলাপকে। তাদের মতে, কতকগুলি ব্যক্তির আচরণের দ্বারা যদি ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যাখ্যা দেওয়া যায়, তাহলে অমুক-অমুক মানুষ অমুক-অমুক বই লিখেছে এই তথ্যের দ্বারা কেন তার ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না? তাদের মতে, প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার পিছনেই তো কাজ করে মানুষের বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তার ফসল। কিন্তু মানুষের বুদ্ধির সঙ্গে ঐতিহাসিক ঘটনাকে সংযুক্ত করার যত চেষ্টাই তারা করুক, সাধারণ মানুষের পক্ষে সেটা বোঝা খুব সহজসাধ্য নয়। ফরাসী বিপ্লবের নির্মম হত্যাকাণ্ড কি মানব-সাম্যের ফল হতে পারে? অথবা নিষ্ঠুর যুদ্ধ ও নরহত্যা মানুষকে ভালবাসার ফল?

কিন্তু এইসব ইতিহাসকারের সুকৌশল যুক্তিকে মেনে নিলেও—ভাবধারা নামক কোন অস্পষ্ট শক্তি জাতিকে পরিচালিত করে একথা মেনে নিলেও—ইতিহাসের মৌলিক প্রশ্নেও উত্তরটা তবু বাকি থেকেই যায়। পূর্বেকার দুটি শক্তি—নরপতিগণের ক্ষমতা এবং উপদেষ্টাও অন্যলোকের ক্ষমতার সঙ্গে আর একটা নতুন শক্তি-ভাবধারার শক্তি—যুক্ত হল মাত্র। নেপোলিয়নের ক্ষমতা ছিল, তাই ঘটনা ঘটেছিল, এটা বোঝা হয় তো সম্ভব; কিছু চেষ্টা করলে এটাও হয় তো বোঝা যায় যে নেপোলিয়ন ও অন্য কিছু শক্তি একত্র হয়ে ঘটনাটি ঘটিয়েছে; কিন্তু le Contract Social নামক একখানি বইয়ের প্রভাবে ফরাসীরা পরস্পরকে ডুবিয়ে মারতে শুরু করে দিল, বিনা ব্যাখ্যায় এটা বোঝা যায় না।

কিন্তু এধরনের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের গুণাগুণ যাই হোক না কেন, আর

একদিক থেকে সে ইতিহাস খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে যে নানা ধর্মীয়, দার্শনিক ও রাজনৈতিক মতবাদের চুল-চেরা বিচারের পরে যেমুহূর্তে তারা কোন সত্যিকারের ঐতিহাসিক ঘটনা—যেমন ১৮১২ সালের অভিযানের বর্ণনা দিতে বসে তখনই তারা সেটা কোন শক্তি প্রয়োগের ফল বলে বর্ণনা করে—পরিষ্কার বলে যে সে অভিযানটি নেপোলিয়নের ইচ্ছার ফলে ঘটেছে। আর সেকথা বলে সাংস্কৃতিক ইতিহাসকাররা অজান্তে নিজেদের মতেরই বিরোধিতা করে বসে; তারাই দেখিয়ে দেয়, যে নতুন শক্তি তারা উদ্ভাবন করেছে তা ইতিহাসের ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে পারে না; ইতিহাসের ব্যাখ্যা একমাত্র সেই শক্তি দিয়েই করা যেতে পারে যাকে তারা স্বীকার করে না।

অধ্যায়—৩

একটা ট্রেন চলছে। একজন প্রশ্ন করল: এটাকে কে চালাচ্ছে? চাষী বলল, শয়তান চালাচ্ছে। আর একজন বলল, চাকাগুলো ঘুরছে বলেই গাড়িটা চলছে। তৃতীয় একজন বলল, বাতাসে যে ধোঁয়া উড়ছে সেটাই গাড়ির চলার কারণ।

চাষীর কথা অকাট্য। তার ব্যাখ্যা পূর্ণাঙ্গ। তাকে খণ্ডন করতে হলে প্রমাণ করতে হবে যে শয়তান বলে কিছু নেই, অথবা অন্য চাষীকে বলতে হবে যে শয়তান নয়, একজন জার্মান গাড়িটাকে চালাচ্ছে। একমাত্র তখনই স্ব-বিরোধিতার ফলে তারা বুঝতে পারবে যে তাদের দুজনেরই ভুল হয়েছে। একমাত্র যে ধারণার দ্বারা গাড়ির গতিকে ব্যাখ্যা করা যায় তা হচ্ছে গতির উপযুক্ত একটি শক্তির ধারণা।

একমাত্র জনগণের অভিযানের উপযুক্ত একটি শক্তির ধারণার দ্বারাই সে ঘটনার ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

অথচ সেই ধারণাটাকে তুলে ধরতে গিয়ে বিভিন্ন ইতিহাসকার এমন সব বিভিন্ন ধরনের শক্তির উল্লেখ করেছে যা অভিযানের পক্ষে উপযোগী নয়। কেউ সেটাকে দেখে নায়কের সহজাত শক্তির মধ্যে, ঠিক যেভাবে গাড়ির বেলায় চাষী দেখে শয়তানকে; কেউ বা সেটাকে দেখে নানা শক্তির সম্মিলনের মধ্যে, চাকার ঘূর্ণনের মত; অন্যরা তাকে দেখে বুদ্ধিগত প্রভাবের মধ্যে, বায়ুতাড়িত ধোঁয়ার মত।

যতদিন পর্যন্ত লেখা হবে আলাদা আলাদা ব্যক্তির ইতিহাস, সিজার, আলেক্সান্দার, লুথার, অথবা ভল্‌তেয়ার, যারই হোক না কেন, যতদিন কোন ঘটনায় অংশগ্রহণকারী সব, সব মানুষের ইতিহাস লেখা না হবে, ততদিন একটা শক্তিকে মেনে না নিলে মানুষের অগ্রগতির বর্ণনা করা অসম্ভব। আর

ইতিহাসকারদের জানা একমাত্র ধারণাই তো সেই শক্তির ধারণা।

মানুষ সম্পর্কে বিচার করতে বসে এখন পর্যন্ত ইতিহাস বিজ্ঞানের অবস্থা বাজার প্রচলিত অর্থ—নোট ও মুদ্রার মত। জীবনীগ্রন্থ এবং বিশেষ জাতীয় ইতিহাস হচ্ছে নোটের মত। যতদিন পর্যন্ত কেউ সে নোটের নিরাপত্তার প্রশ্ন না তুলছে ততদিন পর্যন্ত তাদের ব্যবহার করা চলে, কারও কোন ক্ষতি না করে তাদের উদ্দেশ্যও সার্বিকভাবে সাধিত হতে পারে। নায়কদের ইচ্ছা কেমন করে ঘটনাকে ঘটায় সে প্রশ্ন যদি ভুলে যাওয়া যায় তাহলে থিয়ের্স লিখিত ইতিহাসের অনুরূপ সব ইতিহাসই হৃদয়গ্রাহী ও শিক্ষনীয় হতে পারে, এমন কি কিছুটা কাব্যের ছোঁয়াও তাতে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু নোট যখন অধিক সংখ্যায় ছাপা হয়, অথবা মানুষ যখন তার বিনিময়ে সোনা কিনতে চেষ্টা করে, তখনই যেমন নোটের প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দেয়, তেমনই ঐসব ইতিহাসের প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে তখনই সন্দেহ দেখা দেয় যখন অনেক বেশী ইতিহাসের বই লেখা হয়, অথবা সরল মনে যখন কেউ প্রশ্ন করে বসে: কোন্ শক্তি বলে নেপোলিয়ন একাজ করেছিল?—অর্থাৎ প্রচলিত নোটের বিনিময়ে কেউ যখন বোধাতার প্রকৃত সোনা অর্জন করতে চায়।

সার্বিক ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের লেখকরা হচ্ছে সেইসব লোকের মত যারা নোটের ত্রুটিগুলো বুঝতে পেরে তার জায়গায় এমন ধাতু দিয়ে মুদ্রা তৈরি করতে চায় যাতে সোনার আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুপস্থিত। তাতে মুদ্রার ঠুন্‌ঠুন্ আওয়াজ হতে পারে, কিন্তু তার বেশী কিছু কাজে আসবে না। নোট হয়তো নিবোধ লোকদের ঠকাতে পারে, কিন্তু খারাপ ধাতুর যে মুদ্রার ঠুন্‌ঠুন্ শব্দ ছাড়া আর কোন মূল্য নেই তা দিয়ে কাউকেই ঠকানো যায় না। সোনা যেমন একমাত্র তখনই সোনা যখন শুধু বিনিময়ের ক্ষেত্রে নয়, সাধারণ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও নির্ভরযোগ্য, তেমনই সার্বিক ইতিহাসকারর়া একমাত্র তখনই মূল্যবান হয়ে উঠবে যখন তারা ক্ষমতা কি? —ইতিহাসের এই মৌলিক প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে। সার্বিক ইতিহাসকাররা দেয় সে প্রশ্নের পরস্পরবিরোধী জবাব, আর সাংস্কৃতিক ইতিহাসকাররা প্রশ্নটাকে এড়িয়ে গিয়ে জবাব দেয় অন্য কোন প্রশ্নের। আর নকল সোনার মুদ্রা যেমন ব্যবহার করা যায় শুধু সেই মানুষদের মধ্যে যারা সেটাকে সোনা বলে মেনে নেয় অথবা সোনা চেনেই না, তেমনই সার্বিক ইতিহাসকাররা, এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাস-কাররা, মানুষের মৌলিক প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য, এবং যে সাধারণ পাঠকের "গুরুত্বপূর্ণ" বিষয় পাঠে রুচি আছে তাদের মধ্যে কারেন্সি নোটের মতই কাজ করে।

অধ্যায়—৪

একটি জাতির ইচ্ছাকে একজন নির্বাচিত মানুষের ইচ্ছাধীন করা এবং সেই মানুষটির ইচ্ছাকে দেবতার অধীন করার যে দৈব ব্যবস্থা প্রাচীনরা বিশ্বাস করত তাকে পরিত্যাগ করার ফলে স্ববিরোধিতাকে এড়িয়ে ইতিহাসের পক্ষে একটা পাও চলা সম্ভব নয় যদি না সে দুটোর যেকোন একটা বেছে নেয়: হয় মানবিক ব্যাপারে দেবতার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের প্রাচীন বিশ্বাসে ফিরে যাওয়া, আর না হয় যে শক্তি ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে ঘটায় এবং যাকে বলা হয় "ক্ষমতা" তার তাৎপর্যের একটা নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া।

প্রথমটাতে ফিরে যাওয়া অসম্ভব, কারণ সে বিশ্বাসকে ধ্বংস করা হয়েছে; কাজেই ক্ষমতা বলতে কি বোঝায় সেটা ব্যাখ্যা করা একান্তভাবে প্রয়োজন।

নেপোলিয়ন হুকুম দিল, একটা সেনাবাহিনী গড়ে তুলে যুদ্ধে যাও। এ-কাজে আমরা এতই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে ছ'লক্ষ মানুষ কেন নেপোলিয়নের কথামত যুদ্ধে গেল সে প্রশ্ন করাটাও আমাদের কাছে অর্থহীন মনে হয়। তার হাতে ক্ষমতা ছিল, তাই সে যা হুকুম করেছে তাই করা হয়েছে।

যদি আমরা বিশ্বাস করি যে ঈশ্বরই তাকে ক্ষমতাটা দিয়েছিল তাহলে ব্যাখ্যাটা খুবই সন্তোষজনক হয়। কিন্তু যেমুহূর্তে সেটা স্বীকার করা হল না তখনই একজন মানুষ অপরের উপর যে ক্ষমতা বিস্তার করে আসলে সেটা কি তা নির্ধারণ করাটা জরুরি হয়ে পড়ে।

এটা দুর্বলের উপর সবলের দৈহিক শক্তি প্রয়োগের ব্যাপার হতে পারে না—হারকিউলিসের শক্তির মত দৈহিক শক্তির প্রয়োগ বা তার ভয় দেখিয়ে অন্যের উপর প্রভুত্ব বিস্তারও না, এটা কোন নৈতিক শক্তির উপরেও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, কারণ নেপোলিয়নের মত যে সব নায়কের নৈতিক গুণাগুণ সম্পর্কে যথেষ্ট মতভেদের অবকাশ আছে তাদের কথা ছেড়ে দিলেও ইতিহাসই আমাদের জানিয়েছে, যে একাদশ লুই অথবা মেটারনিক লক্ষ লক্ষ মানুষের উপর শাসন ক্ষমতা চালিয়েছে তাদের কারও কোন বিশেষ নৈতিক গুণ ছিল না, বরং সাধারণভাবে বলা যায়, যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে তারা শাসন করেছে তাদের যেকোন একজনের তুলনায় তারা ছিল নৈতিক দিক থেকে দুর্বলতর।

ক্ষমতার উৎস যদি দৈহিক অথবা নৈতিক গুণাবলীর মধ্যে না থাকে, তাহলে তাকে অবশ্যই অন্যত্র খুঁজতে হবে—খুঁজতে হবে ক্ষমতার অধিকারীর সঙ্গে জনগণের সম্পর্কের মধ্যে।

ক্ষমতা হচ্ছে জনগণের সেই সম্মিলিত ইচ্ছা যা ঘোষণার দ্বারা অথবা মৌন সম্মতির দ্বারা নির্বাচিত শাসকগণের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

ক্ষমতা যদি শাসককে হস্তান্তরিত জনগণের সম্মিলিত ইচ্ছাই হয়, তাহলে পুগাচেভ কি জনগণের ইচ্ছার প্রতিনিধি ছিল? যদি তা না হয়, তাহলে প্রথম নেপোলিয়ন কেন তা হল? তৃতীয় নেপোলিয়নকে যখন বোলনে বন্দী করা হল তখন যদি সে অপরাধী হয়ে থাকে, তাহলে কেন পরবর্তীকালে তারাই অপরাধী হল যাদের সে গ্রেপ্তার করেছিল?

যে রাজপ্রাসাদের বিপ্লবে অনেক সময় মাত্র দু'জন কি তিনজন লোক অংশ গ্রহণ করে তার দ্বারাই কি একজন নতুন শাসকের হাতে জনগণের ইচ্ছাকে হস্তান্তরিত করা হয়? আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও কি জনগণের ইচ্ছাকে বিজয়ীর হাতে তুলে দেওয়া হয়? ১৮০৮ সালে কি রাইন রাষ্ট্রসংঘের ইচ্ছাকে হস্তান্তর করা হয়েছিল নেপোলিয়নকে? ১৮০৯ সালে ফরাসীদের সঙ্গে যোগ-সাজসে আমাদের সেনাবাহিনী যখন অস্ট্রিয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়েছিল, তখন কি রুশ জনগণের ইচ্ছাকে সমর্পণ করা হয়েছিল নেপোলিয়নের হাতে?

এইসব প্রশ্নের তিনটি জবাব সম্ভব?

হয় ধরে নিতে হয় (১) জনগণের ইচ্ছাকে সর্বদাই নিঃশর্তভাবে হস্তান্তর করা হয় পছন্দ-মত শাসক বা শাসকদের হাতে; সুতরাং প্রতিটি নতুন শক্তির আবির্ভাব, একদা ক্ষমতাসীন শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিটি সংগ্রামই প্রকৃত ক্ষমতার বিরুদ্ধাচরণ বলে পরিগণিত হওয়া উচিত; অথবা (২) জনগণের ইচ্ছাকে হস্তান্তর করা হয় কতকগুলি নির্দিষ্ট ও পূর্বজ্ঞাত শর্ত অনুসারে; আর তাতেই প্রমাণ হয় যে ক্ষমতাকে খর্ব করা, তার বিরুদ্ধাচরণ করা, এমন কি তাকে ধ্বংস করা শাসকগণ কর্তৃক তাদের উপর আরোপিত শর্তাবলীকে উপেক্ষা করারই ফল; অথবা (৩) জনগণের ইচ্ছাকে শর্তসাপেক্ষে শাসকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়, কিন্তু সে শর্তগুলি থাকে অজ্ঞাত ও অনির্দিষ্ট; আর শাসকগণ কর্তৃক সেইসব অজ্ঞাত শর্তাবলীকে কম-বেশী পূরণ করার ফলেই আবির্ভূত হয় বিভিন্ন শক্তি, দেখা দেয় তাদের সংঘর্ষ ও পতন।

আর এই তিন পথেই ইতিহাসকাররা শাসকদের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করে থাকে। অবশ্য তাদের মধ্যেও মত-পার্থক্যের অভাব নেই। একেক দল একেকভাবে সেই সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করে। সেই সবরকম ইতিহাসকে যদি একসূত্রে বাঁধা যায়, নতুনতম ইতিহাসকাররা তাই করে থাকে, তাহলে আমরা পাব রাজা-রাজরা ও লেখকদের ইতিহাস, জনগণের জীবনের ইতিহাস নয়।

অধ্যায়—৫

একটা জাতির জীবন অল্প কয়েকটি মানুষের জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ

থাকে না, কারণ ঐসব মানুষ ও জাতির মধ্যে যোগসূত্রটা এখনও আবিষ্কৃত হয় নি।

জনগণের সম্মিলিত ইচ্ছা কয়েকটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের হাতে হস্তান্তরই সেই যোগসূত্রের ভিত্তি—এ মতবাদ ইতিহাসের কষ্টিপাথরে সমর্থিত হয় নি। অবশ্য এই মতবাদকে অখণ্ডনীয় মনে হয় কারণ জনগণের ইচ্ছায় হস্তান্তরের ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখা যায় নি, কারণ সেটা কখনও ঘটে নি।

যাই ঘটুক না কেন এবং যে লোকই পুরোভাগে এসে দাঁড়াক না কেন, এই মতবাদ সব সময়ই বলতে পারে যে অমুক লোক নেতৃত্বে এসেছে কারণ সম্মিলিত ইচ্ছাকে তার হাতেই তুলে দেওয়া হয়েছিল।

ঐতিহাসিক প্রশ্নাবলীর যে উত্তর এই মতবাদ দিয়ে থাকে সেটা সেই লোকের উত্তরেরই অনুরূপ যে গোচারণ ক্ষেত্রের বিভিন্ন অংশের গুণাগুণ অথবা চালকের মনোগত ইচ্ছার দিকে নজর না দিয়ে একদল গরু-মোষের গতি-পথ লক্ষ্য করেই বলে দেয় যে-জন্তুটি সকলের পুরোভাগে আছে সে যেদিকে যাবে গোটা দলই যাবে সেইদিকে।

"পুরোবর্তী জন্তুটি যেপথে চলে গোটা দল সেই পথেই যায়; অন্য জন্তুগুলির সম্মিলিত ইচ্ছা দলনেতার উপরেই অর্পিত হয়।" এই হল এক শ্রেণীর ইতিহাসকারের অভিমত।

আসলে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের হাতে জনগণের ইচ্ছাকে সমর্পণের মতটা কথার মার-প্যাঁচ মাত্র—প্রশ্নটাকেই অন্য কথায় ঘুরিয়ে বলা হয়।

ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিকে কে ঘটায়? ক্ষমতা। ক্ষমতা কাকে বলে? একজনের হাতে ন্যস্ত জনগণের সম্মিলিত ইচ্ছাই ক্ষমতা। কোন্ শর্তে জনগণের ইচ্ছাকে একজনের হাতে তুলে দেওয়া হয়? একমাত্র শর্ত হল, সেই মানুষটি জনগণের ইচ্ছাকে প্রকাশ করবে। অর্থাৎ, ক্ষমতা মানেই ক্ষমতা: অন্য কথায়, ক্ষমতা এমন একটা শব্দ যার অর্থ আমরা বুঝি না।

মানুষের ব্যাপারে ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপ স্বীকার না করে "ক্ষমতা"-কে ঘটনার কারণ হিসাবে গণ্য করতে পারি না।

অভিজ্ঞতার দিক থেকে দেখলে ক্ষমতা কোন একজনের মনোবাসনার প্রকাশ এবং অন্যের দ্বারা সে বাসনা পূর্ণ করার মধ্যেকার সম্পর্ক ছাড়া আর কিছুই নয়।

সে সম্পর্কের শর্তাবলীকে বোঝাতে হলে মানুষের পরিপ্রেক্ষিতে—দেবতার নয়—সেই বাসনা প্রকাশের ধারণাটাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

দেবতা যদি কোন আদেশ ঘোষণা করে, প্রাচীন ইতিহাসের বর্ণনামত তাঁর ইচ্ছাকে প্রকাশ করে, তাহলে সে ইচ্ছার প্রকাশ হবে কালনিরপেক্ষ,

কোন কারণের দ্বারা সেটা ঘটবে না, কারণ দেবতাকে ঘটনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা যায় না। কিন্তু যে আদেশ মানুষের ইচ্ছার প্রকাশ, যা কালের অধীন এবং পরস্পর সম্পর্কিত—সেক্ষেত্রে ঘটনার সঙ্গে সেই আদেশের যোগসূত্রকে বোঝাতে হলে আমাদের নতুন করে জানতে হবে: (১) যা কিছু ঘটে তার শর্ত: ঘটনা এবং ঘোষণা প্রচারকারী উভয়কেই কালের অধীন হয়ে চলতে হয়, এবং (২) যে মানুষ হুকুম করে এবং যারা সে হুকুম তামিল করে তাদের যোগসূত্রের অনিবার্যতা।

অধ্যায়—৬

সময়ের অধীন নয় বলে একমাত্র দেবতার ইচ্ছার প্রকাশই বহু বর্ষ বা শতাব্দীব্যাপী ঘটনা-শৃংখলের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে; একমাত্র দেবতাই পারে তাঁর ইচ্ছার দ্বারা মানুষের অগ্রগতির দিক-নির্দেশ করতে; কিন্তু মানুষ কালের অধীন, আর যা কিছু ঘটে তাতে সে নিজেই অংশ গ্রহণ করে।

প্রথম শর্ত অর্থাৎ কালের কথা বলতে গিয়ে আমরা দেখি, কিছু পূর্ব-ঘোষিত হুকুম ছাড়া কোন হুকুমই কার্যকর করা যায় না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমরা যখন বলি যে নেপোলিয়ন তার সৈন্যদের যুদ্ধে যাবার হুকুম দিয়েছিল, তখন সেই একটি হুকুমের মধ্যে পর পর অনেকগুলি হুকুমকে একত্রিত করে থাকি। নেপোলিয়ন একদিনেই রাশিয়া অভিযানের হুকুম দেয় না, তা দিতে পারে না। আজ হয়তো হুকুম করেছে ভিয়েনা, বার্লিন ও পিতার্সবুর্গে অমুক—অমুক চিঠি লেখা হোক; কাল অমুক-অমুক হুকুম ও নির্দেশ জারি করেছে স্থল-বাহিনীকে, নৌবহরকে, কমিসারিয়েটকে, ইত্যাদি ইত্যাদি—লক্ষ লক্ষ হুকুমের এক আনুপূর্বিক শৃংখলের ফলে ফরাসী বাহিনী রাশিয়াতে ঢুকেছে।

নেপোলিয়ন তার সমগ্র রাজত্বকালে ইংলণ্ড অভিযানের হুকুম ঘোষণা করল, অন্য কোন অভিযানে এত সময় ও প্রচেষ্টা ব্যয় করল না, অথচ পুরো রাজত্বকালে সে পরিকল্পনাকে কখনও কার্যকর না করে বাস্তবক্ষেত্রে রাশিয়াতে অভিযান শুরু করল—তার কারণ প্রথম ক্ষেত্রে তার হুকুমগুলি বাস্তব ঘটনার সঙ্গে মিলল না, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মিলে গেল।

কোন হুকুমকে নিশ্চিতরূপে কার্যকর করতে হলে সেটা এমন হওয়া চাই যাকে কার্যকর করা সম্ভব। কিন্তু কোন্‌টাকে কার্যকর করা যাবে আর কোন্‌-টাকে যাবে না সেটা জানা তো অসম্ভব; লক্ষ লক্ষ মানুষকে নিয়ে নেপোলিয়নের রাশিয়া অভিযানের ক্ষেত্রেই যে একথা সত্য শুধু তাই নয়, সরলতম ঘটনার ক্ষেত্রেও তাই, কারণ উভয়ক্ষেত্রেই লক্ষ লক্ষ বাধা এসে তাকে কার্যকর করার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে। প্রতিটি কার্যকর হুকুম

অকার্যকর অনেক হুকুমের মধ্যে একটিমাত্র। ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন সব অসম্ভব হুকুমই অকার্যকর থেকে যায়। মাত্র স্বল্পসংখ্যক সম্ভবপর হুকুমই কার্যে রূপায়িত হয়।

বস্তুত, যারা হুকুম করে আর যারা হুকুম তামিল করে তাদের সম্পর্কটাই ক্ষমতা নামক ধারণার মূল কথা।

আমরা দেখেছি, কোন হুকুম একমাত্র তখনই কার্যকর হয় যখন একটি ঘটনা শৃংখলের সঙ্গে সেটা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। এই মূল যোগসূত্র থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে যারা হুকুম করে আসল কাজে তারাই অংশ নেয় সব চাইতে কম, তাদের কর্মপ্রচেষ্টা কেবলমাত্র হুকুম করার ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ থাকে।

অধ্যায়—৭

যখন কোন ঘটনা ঘটতে থাকে তখন সে সম্পর্কে মানুষ তাদের মতামত ও মনোভাব ব্যক্ত করে থাকে; আর যেহেতু অনেক মানুষের সম্মিলিত কাজের ফলেই ঘটনাগুলি ঘটে, কোন না কোন মত বা মনোভাব আংশিকভাবে হলেও পূর্ণ হয়েই থাকে। যখন ঘোষিত কোন একটি অভিমত পূর্ণ হয় তখন সেটাকেই ঘটনার পূর্ববর্তী হুকুম হিসাবে গণ্য করা হয়।

অনেক লোক একটা কাঠের গুঁড়িকে টানছে। কিভাবে কোথায় সেটাকে টেনে নেওয়া হবে সে সম্পর্কে নানা জনে নানা কথা বলছে। কাঠটাকে টেনে নেওয়া হয়ে গেলে দেখা গেল যে কোন একজনের কথামতই সেকাজটা হয়েছে। তাহলে তার হুকুমমতই কাজটা সম্পন্ন হল। এখানেই আমরা পাই হুকুম ও ক্ষমতার প্রাথমিক রূপ।

একটা বৃহত্তর জনসমাবেশ যখন একই লক্ষ্যে একটা কাজ করে তখন তাদের মধ্যে এই মতভেদ আরও স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়।

জ্ঞাত বা অজ্ঞাত যেকারণেই হোক ফরাসীরা নিজেদের ডোবাতে ও খুন করতে শুরু করে দিল। সেই সঙ্গে লোকে এও বিশ্বাস করল যে ফ্রান্সের কল্যাণের জন্য, স্বাধীনতার জন্য, সাম্যের জন্য এটার প্রয়োজন ছিল। তারপর মানুষ মানুষকে মারতে মারতে পশ্চিম থেকে পূবে চলল, আর সেই সঙ্গে ফ্রান্সের গৌরব ও ইংলণ্ডের নীচতার অনেক বড় বড় বুলি আওড়াতে লাগল। ইতিহাস আমাদের বুঝিয়েছে যে এসব কথাই অর্থহীন ও পরস্পরবিরোধী, যেমন বিরোধ থাকে নিজের অধিকার রক্ষা ও মানুষকে হত্যার মধ্যে, এবং ইংলণ্ডকে ছোট করা ও রাশিয়াতে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করার মধ্যে।

প্রতিটি ঐতিহাসিক ঘটনার মুখোমুখি দাঁড়ালে একটি সহজ প্রশ্নই দেখা দেয়: এটা কেমন করে সম্ভব যে লক্ষ লক্ষ মানুষ সম্মিলিতভাবে অপরাধ করে

—যুদ্ধ করে, নরহত্যা করে, ইত্যাদি ?

ইয়োরোপের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের বর্তমান জটিল ব্যবস্থার মধ্যে রাজা, মন্ত্রী, পার্লামেণ্ট, অথবা সংবাদপত্রের বিধান, নির্দেশ, অথবা হুকুম ছাড়া কোন ঘটনার কথা কি কল্পনা করা যায় ? রাজনৈতিক ঐক্য, দেশাত্মবোধ, শক্তি-সাম্য, অথবা সভ্যতার দ্বারা সমর্থিত নয় এমন কোন সম্মিলিত কর্ম-প্রয়াস কি থাকতে পারে ? কাজেই প্রতিটি ঘটনা অনিবার্য-ভাবেই কোন ঘোষিত ইচ্ছার সঙ্গে মিলে যায়, একজন বা বহুজনের ইচ্ছার ফলরূপে প্রতিভাত হয়।

জাহাজ যেদিকেই চলুক না কেন যে ঢেউ ভেঙে সেটা অগ্রসর হয় তাকে তো সব সময় জাহাজের সামনেই দেখা যাবে। জাহাজের যাত্রীদের কাছে সেই ঢেউই তো একমাত্র প্রত্যক্ষ গতি।

জাহাজ যখন একদিকে চলে তখন একই ঢেউ থাকে তার সামনে, আবার জাহাজের গতি যখন মাঝেমাঝেই পাল্টে যায় তখন সামনের ঢেউয়ের গতিও যায় পাল্টে।

যখনই যে ঘটনা ঘটে তখনই মনে হয় যে ঠিক ঐ ঘটনাটিই ছিল পূর্বদৃষ্ট ও হুকুমমাফিক। জাহাজ যেদিকেই যাক জলস্রোত সফেন তরঙ্গে একদিকেই চলতে থাকে; দূর থেকে দেখে মনে হয় জলস্রোত শুধু যে নিজের বেগে চলছে তাই নয়, জাহাজের গতিও নির্ধারণ করছে।

ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের যেসব ইচ্ছার প্রকাশ ঘটনাবলীর সঙ্গে হুকুমরূপে সম্পর্কিত সেগুলিকে ভালভাবে পরীক্ষা করে ইতিহাসকাররা ধরে নিয়েছে যে ঘটনাগুলি ঐসব হুকুমের উপরেই নির্ভরশীল। কিন্তু ঘটনাবলী এবং ঐতি-হাসিক ব্যক্তিদের সঙ্গে তার সম্পর্ক বিচার করে আমরা দেখেছি যে সেই সব ব্যক্তি ও তাদের হুকুমই ঘটনার উপর নির্ভরশীল।

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে আমরা ইতিহাসের দুটি মূল প্রশ্নের সরাসরি জবাব দিতে পারি :

(১) ক্ষমতা কি ?

(২) কোন্ শক্তি জাতিসমূহকে পরিচালিত করে ?

(১) ক্ষমতা হচ্ছে কোন বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে অন্যদের এমন একটা সম্পর্ক যার ফলে সেই লোক কোন সম্মিলিত কাজের ক্ষেত্রে যত বেশী মতামত, ভবিষ্যদ্বাণী ও সমর্থন প্রকাশ করে সেই অনুপাতে কম অংশ নেয় সেই কাজে।

(২) জাতিসমূহ পরিচালিত হয় ক্ষমতার দ্বারা নয়, বুদ্ধিগত কাজের দ্বারা নয়, বা দুইয়ের যোগফলের দ্বারাও নয় (যদিও ইতিহাসকাররা তাই মনে করে), তাদের পরিচালিত করে সেই সমগ্র জনগণের কর্মধারা যারা এমন-ভাবে একত্র হয় যে যারা সেই ঘটনায় প্রত্যক্ষভাবে সব চাইতে বেশী অংশ

নেয় তারাই নিজেদের মাথায় বহন করে সব চাইতে কম দায়িত্ব এবং বিপরীৎক্রম।

নীতিগতভাবে ঘটনাকে ঘটায় তারা যাদের করায়ত্ত ক্ষমতা: কিন্তু দৈহিক শক্তির দিক থেকে ঘটায় তারা যারা সেই ক্ষমতাকে মেনে চলে। কিন্তু যেহেতু দৈহিক কর্ম ছাড়া নৈতিক কর্ম অচিন্ত্যনীয়, তাই কোন ঘটনার কারণ এ দুইয়ের কোনটাই নয়, প্রকৃত কারণ এই দুই শক্তির মিলন।

অথবা অন্য কথায়, যে ঘটনার বিচার আমরা করছি তার ক্ষেত্রে কারণের ধারণাটাই প্রযোজ্য নয়।

শেষ পর্যন্ত আমরা একটা অন্তহীন চক্রে পৌছে যাই। বিদ্যুৎ তাপ সৃষ্টি করে, আবার তাপ বিদ্যুৎ সৃষ্টি করে। পরমাণু পরস্পরকে আকর্ষণ করে, আর বিকর্ষণও করে।

তাপ ও বিদ্যুতের এবং পরমাণুর পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার কথা বলতে গিয়ে আমরা বলতে পারি না এটা কেন ঘটে; আমরা বলি যে এই ঘটে কারণ অন্যকিছু ভাবাই যায় না, কারণ এটাই হতে বাধ্য, আর এটাই নিয়ম। ঐতিহাসিক ঘটনার বেলায়ও এই কথাই প্রযোজ্য। যুদ্ধ এবং বিপ্লব কেন ঘটে আমরা জানি না। শুধু জানি, যেকোন একটা কাজ করতে হলে মানুষ এমনভাবে নিজেদের গড়ে তোলে যেখানে সকলেই অংশ নিতে পারে; আর আমরা বলি, এটা এইরকমই হয়, কারণ অন্য কিছু ভাবাই যায় না, অথবা অন্য কথায়, এটাই নিয়ম।

অধ্যায়—৮

যদি বাইরের ঘটনা নিয়ে ইতিহাসের কারবার হত তাহলে এই সরল ও সহজ নিয়ম প্রতিষ্ঠা করাই যথেষ্ট হত, এবং আমাদের যুক্তি-তর্কেরও অবসান ঘটত। কিন্তু ইতিহাসের নিয়ম মানুষকে নিয়ে। একটি পরমাণু বলতে পারে না যে আকর্ষণ-বিকর্ষণের নিয়মকে সে অনুভব করে না, আর তাই সে নিয়মটা অসত্য, কিন্তু ইতিহাসের বিষয় যে মানুষ সে পরিষ্কার বলে দেয়: আমি মুক্ত, স্বাধীন, কাজেই কোন নিয়মের অধীন নই।

অঘোষিত হলেও মানুষের ইচ্ছাশক্তির এই সমস্যা ইতিহাসের প্রতিটি ধাপে অনুভূত হয়।

সব চিন্তাশীল ইতিহাসকারই নিজের অজ্ঞাতে এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। ইতিহাসের সব স্ব-বিরোধিতা ও অস্পষ্টতা, ইতিহাস-বিজ্ঞানের সব ভ্রান্ত পদক্ষেপের মূলেই রয়েছে এই সমস্যা সমাধানের অভাব।

প্রতিটি মানুষের যদি ইচ্ছার স্বাধীনতা থাকত, অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষ যদি নিজের ইচ্ছামত কাজ করতে পারত, তাহলে তো সব ইতিহাসই হয়ে যেত

অসংলগ্ন আকস্মিক ঘটনার একটি শ্রেণীমাত্র।

হাজার বছরের মধ্যে যদি দশ লক্ষের মধ্যে একটি মানুষও স্বাধীনভাবে অর্থাৎ নিজের ইচ্ছামত কাজ করতে পারত, তাহলে তো মানবজাতির কাজ-কর্ম সংক্রান্ত নিয়মকে লংঘন করে সেই মানুষের একটিমাত্র কাজই সমগ্র মানব জাতির উপর প্রযোজ্য সেই নিয়মের অস্তিত্বকেই অসম্ভব করে তুলত।

মানুষের সব কর্মের বিধায়ক হিসাবে যদি একটিমাত্র নিয়ম থাকে তাহলে তো স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু থাকতেই পারে না, কারণ মানুষের ইচ্ছা তো সেই নিয়মেরই অধীন। স্বাধীন ইচ্ছার বহু প্রাচীন সমস্যাটির মূলেই আছে এই স্ববিরোধিতা।

সমস্যাটা হচ্ছে : ধর্মিক, ঐতিহাসিক, নৈতিক বা দার্শনিক—যে দৃষ্টিকোণ থেকেই মানুষকে দেখি না কেন, সর্বত্রই দেখতে পাই এমন একটি বাধ্যতামূলক নিয়ম অন্য সবকিছুর মতই মানুষও যার অধীন, কিন্তু অন্তরের ভিতর থেকে যখন তাকে দেখি তখনই বুঝি যে আমরা মুক্ত, স্বাধীন।

এই বোধ থেকেই নিজেকে জানার সূত্রপাত ; সে জানা বুদ্ধিবহির্ভূত, এমন কি বুদ্ধি-নিরপেক্ষ। বুদ্ধি দিয়ে মানুষ নিজেকে দেখে, আর বোধি দিয়ে মানুষ নিজেকে জানে।

এই আত্ম-জ্ঞান ছাড়া কোন দেখা বা বুদ্ধির প্রয়োগের কথা চিন্তা করাই যায় না।

কোন কিছু বুঝতে হলে, দেখতে হলে, তা থেকে সিদ্ধান্ত টানতে হলে প্রথমেই মানুষকে জীবিত প্রাণী হিসাবে নিজেকে বুঝতে হবে। সে যে ইচ্ছা করতে পারে, নিজের ইচ্ছা-শক্তি সম্পর্কে সে যে সচেতন, একমাত্র এই বোধ দ্বারাই সে নিজেকে জীবিত প্রাণীরূপে জানতে পারে। যে ইচ্ছা তার জীবনের মূলকথা তাকে মানুষ স্বাধীন বলেই জানে।

তুমি বলতে পার : আমি স্বাধীন নই। কিন্তু এই তো আমি আমার হাতটা তুললাম, আবার নামিয়ে নিলাম। সকলেই বোঝে যে এই যুক্তি-বিহীন জবাব ইচ্ছার স্বাধীনতার পক্ষে একটি অখণ্ডনীয় প্রমাণ।

আমাদের চৈতন্যের এই জবাব বুদ্ধির অধীন নয়।

স্বাধীনতার এই চেতনা যদি আত্ম-চেতনার একটি স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ উৎস না হত তাহলে সেটা বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার অধীন হত, কিন্তু আসলে সেরকম কোন অধীনতার অস্তিত্ব নেই, আর সেটা ধারণারও অতীত। মানুষের যদি স্বাধীনতা না থাকে, তাহলে তার মধ্যে জীবনও থাকে না।

স্বাধীনতার এই অভ্রান্ত ও অখণ্ডনীয় চেতনা পরীক্ষা ও যুক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, ব্যতিক্রমবিহীনভাবে সব চিন্তাশীল লোকই এটাকে স্বীকার করে, সব মানুষই অনুভব করে ; এই চেতনা ছাড়া মানুষের কোন ধারণাই সম্ভব নয়।

মানুষ এক সর্বশক্তিমান, সর্বকল্যাণময় ও সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের সৃষ্টি। মানুষের স্বাধীনতার চেতনা থেকে উদ্ভূত যে পাপের ধারণা সেটা কি? এটাই ধর্ম-শাস্ত্রের প্রশ্ন।

সেই একই উৎস থেকে উদ্ভূত আর একটি প্রশ্ন, সমাজে মানুষের দায়িত্ব কি? এটা আইনের প্রশ্ন।

সহজাত চরিত্র এবং উদ্দেশ্যের প্রতিক্রিয়ার ফলে মানুষ কাজ করে। স্বাধীনতার চেতনা থেকে উদ্ভূত স্যায়-অন্যায়ের জ্ঞান কি, বিবেক কি? এটা নীতিশাস্ত্রের প্রশ্ন।

জাতি হিসাবে এবং মানুষ হিসাবে তার অতীত জীবনকে কিভাবে দেখা হবে—স্বাধীন সত্তা হিসাবে, না পূর্বনির্ধারিত কর্মের অধিকারী রূপে? এটা ইতিহাসের প্রশ্ন।

অধ্যায়—৯

ইচ্ছার স্বাধীনতা অথবা অনিবার্যতার সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে জ্ঞানের অন্য সব শাখার তুলনায় ইতিহাসের কিছুটা সুবিধা রয়েছে: ইতিহাসের ক্ষেত্রে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার মূল কথার পরিবর্তে অতীতে তার প্রকাশকে নিয়েই আলোচনা করা হয়।

এব্যাপারে বিমূর্ত বিজ্ঞানের তুলনায় পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের যে ভূমিকা, অন্যসব বিজ্ঞানের তুলনায় ইতিহাসেরও সেই ভূমিকা।

ফলে ইচ্ছার স্বাধীনতা ও অনিবার্যতার মধ্যে বিরোধ ধর্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র এবং দর্শনশাস্ত্রের বেলায় যে সমাধানের অতীত রহস্য হয়ে দেখা দেয়, ইতিহাসের বেলায় তা হয় না। ইতিহাস পর্যালোচনা করে মানুষের সেই জীবনকে যেখানে এই দুটি পরস্পরবিরোধী ধারা আগে থেকেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে আছে।

যদিও জীবনের বাস্তবক্ষেত্রে প্রতিটি ঘটনা অংশত স্বাধীন এবং অংশত বাধ্যতামূলক হয়ে দেখা দেয়, তবু প্রতিটি ঐতিহাসিক ঘটনা, মানুষের প্রতিটি কাজকেই সেই বিরোধিতা ছাড়াই স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে বোঝা যায়।

স্বাধীনতা ও অনিবার্যতা কিভাবে মিলিত হতে পারে, এ দুটি ধারণার মূল কথাই বা কি, সে সমস্যার সমাধান করতে হলে ইতিহাস-বিজ্ঞানকে অন্য সব বিজ্ঞানের চাইতে একটা আলাদা পথ ধরতে হবে।

অনেক মানুষের অথবা মানুষ বিশেষের কোন কাজের বিচার যখন করতে বসি তখন আমরা সব সময়ই সেটাকে দেখি অংশত মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা এবং অংশত অনিবার্যতা নিয়মের ফল রূপে।

মানুষের দেশান্তরে গমন এবং বর্বর মানুষদের আক্রমণ, অথবা তৃতীয়

নেপোলিয়নের নানা বিধান, অথবা এক ঘণ্টা আগে বেড়াতে বেরিয়ে একজন লোকের কোন একটা পথকে বেছে নেওয়া—যার কথাই বলি না কেন কোথাওই কোন স্ববিরোধিতার কথা আমাদের মনে আসে না। এইসব কাজের মধ্যে কতটা স্বাধীনতা থাকে, আর কতটা থাকে অনিবার্যতা তা আমাদের কাছে খুবই পরিষ্কার। যে দৃষ্টিকোণ থেকে একটা কাজকে বিচার করা হয় তদনুসারেই স্বাধীনতা ও অনিবার্যতার আনুপাতিক হারের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে, তবে সেটা সবসময়ই ঘটে বিপরীতক্রম অনুসারে।

ধর্ম, মানুষের সাধারণ জ্ঞান, আইনশাস্ত্র, এবং ইতিহাস—সকলেই স্বাধীনতা ও অনিবার্যতার এই সম্পর্ককে একভাবেই বোঝে।

সকলক্ষেত্রেই স্বাধীনতা ও অনিবার্যতার এই হ্রাস-বৃদ্ধি তিনটি শর্তের উপর নির্ভর করে :

১) কাজটি যে করে বাইরের জগতের সঙ্গে সেই মানুষটির সম্পর্ক।

(২) কালের সঙ্গে তার সম্পর্ক।

(৩) সেই কাজের কারণের সঙ্গে তার সম্পর্ক।

(১) মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকা লোকের তুলনায় যে মানুষটি জলে ডুবে যাচ্ছে তার ক্ষেত্রে অবশ্যই কাজের স্বাধীনতার তুলনায় অনিবার্যতার পরিমাণ অনেক বেশী। অনুরূপভাবেই যে মানুষ নির্জনে একাকি বাস করে তার তুলনায় যারা ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে বাস করে, অথবা যারা পারিবারিক, কর্মস্থলঘটিত, বা ব্যবসাঘটিত দায়-দায়িত্ব দ্বারা আবদ্ধ, তাদের কাজে অবশ্যই স্বাধীনতা কম, অনিবার্যতাই বেশী।

(২) দ্বিতীয় বিবেচনার বিষয় সময়ের পরিবেশ। এই বিচারেই আজকের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ মানুষের তুলনায় প্রথম আদিম মানুষের পতনের ক্ষেত্রে তার স্বাধীনতা ছিল অনেক কম। সেই একই কারণে যেসব মানুষ কয়েক শতাব্দী আগে বাস করত তাদের জীবনযাত্রায় ও কাজে তারা ছিল সাম্প্রতিককালের মানুষের জীবনযাত্রার তুলনায় অনেক কম স্বাধীন।

(৩) বিবেচনার তৃতীয় বিষয়টি হল : কার্য-কারণের যে সীমাহীন শৃংখলের মধ্যে প্রতিটি ঘটনা বিধৃত তার সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান কতদূর পর্যন্ত প্রসারিত। সেই কার্যকারণ শৃংখলার নিয়মে মানুষের প্রতিটি কাজ পূর্ববর্তী ঘটনার ফলস্বরূপ তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি নির্দিষ্টস্থানে প্রতিষ্ঠিত এবং পরবর্তী ঘটনার কারণস্বরূপ।

শারীরবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও ইতিহাসের বিধানগুলির সঙ্গে আমাদের পরিচয় যত বেশী হবে, আলোচ্য কাজটি যত সরল হবে, এবং কর্তার চরিত্র ও মানসিক গঠনের জটিলতা যত কম হবে, তত আমাদের কাজের এবং অন্য সকলের কাজের অনিবার্যতা বৃদ্ধি পাবে আর স্বাধীনতা হ্রাস পাবে।

এই তিনটি শর্তের উপরই মানুষের অপরাধের দায়িত্ব এবং ক্ষমার প্রশ্ন

নির্ভর করে। যে লোকের কাজের বিচার করা হয় তার পরিবেশ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের হ্রাস-বৃদ্ধি, কাজটি করা এবং সেবিষয়ে তদন্তের মধ্যে সময়ের হ্রাস-বৃদ্ধি, এবং সেই কাজের কারণ-শৃংখলার জ্ঞানের হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারেই তার দায়িত্বের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে থাকে।

অধ্যায়—১০

সুতরাং বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগের হ্রাস-বৃদ্ধি, কালের দূরত্বের হ্রাস-বৃদ্ধি, এবং কার্য-কারণ শৃংখলের উপর নির্ভরতার হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই স্বাধীনতা ও অনিবার্যতা সম্পর্কে আমাদের ধারণার হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটে থাকে।

ফলে এমন কোন মানুষকে নিয়ে যদি আমরা আলোচনা করি যার সঙ্গে বহির্জগতের যোগাযোগটা আমাদের ভালভাবে জানা, যার কাজ ও তার বিচারের মধ্যেকার সময়ের ব্যবধানটা অনেক বেশী, এবং যেখানে কাজটার কারণ সম্পর্কে আমরা খুবই অবহিত, সেক্ষেত্রে আমরা পাই সর্বোচ্চ অনিবার্যতা ও সর্বনিম্ন স্বাধীনতার ধারণা। বাইরের পরিবেশের উপর যে মানুষের নির্ভরতা খুবই কম, যার কাজ সংঘটিত হয়েছে খুবই সম্প্রতিকালে, এবং যার কাজের কারণ জানাটা আমাদের সাধ্যের অতীত, সেক্ষেত্রে আমরা পাই সর্বনিম্ন অনিবার্যতা ও সর্বোচ্চ স্বাধীনতার ধারণা।

অবশ্য এ দুইয়ের কোনক্ষেত্রেই পূর্ণ স্বাধীনতা অথবা পূর্ণ অনিবার্যতার ধারণা আমরা পাই না।

অনিবার্যতা নিয়মের সম্পূর্ণ অধীন এবং কোনরকম স্বাধীনতাবিহীন একটি মানুষের কাজের কথা কল্পনা করতে হলে আমাদের অবশ্যই ধরে নিতে হবে যে অসীম সংখ্যক স্থান-সম্পর্কে, অসীম দীর্ঘকাল, এবং অসীম কার্য-শৃংখলের জ্ঞান আমাদের আছে।

আবার সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং অনিবার্যতা নিয়মের অধীন নয় এরকম একটি মানুষকে কল্পনা 'করতে হলে আমাদের কল্পনা করে নিতে হবে যেস্থান ও কালের উর্ধ্বে সে সম্পূর্ণ একা, এবং কার্যের উপর নির্ভরতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যা আমাদের জানা তাকে বলি অনিবার্যতা নিয়ম, আর যেটা আমাদের কাছে অজ্ঞাত তাকে বলি জীবন-শক্তি। জীবনের মূল কথা যতটা জানি তার বাইরে অজ্ঞাত অবশিষ্টাংশ যা থাকে তাকেই ভাষায় বলা হয় জীবন-শক্তি।

সেইরকম ইতিহাসের ক্ষেত্রেও যা আমাদের জানা তাকে বলি অনিবার্যতা নিয়ম, যেটা অজ্ঞাত তাকে বলি স্বাধীন ইচ্ছা। মানব জীবনের নিয়ম সম্পর্কে

যতটা আমাদের জানা তার বাইরে অজ্ঞাত অবশিষ্টাংশ যা থাকে ইতিহাসের দিক থেকে তাকেই ভাষায় বলা হয় স্বাধীন ইচ্ছা।

অধ্যায়—১১

কালানুগ বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ এবং কারণের উপর নির্ভরশীল মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার প্রকাশকেই ইতিহাস পরীক্ষা করে দেখে; অর্থাৎ বুদ্ধির বিধানের দ্বারা ইতিহাস এই স্বাধীন ইচ্ছার সংজ্ঞা নিরূপণ করে, আর সেই কারণেই ইতিহাস একটি বিজ্ঞান।

একটি স্বাধীন শক্তি সৌরজাগতিক বস্তুসমূহকে পরিচালিত করে—একথা স্বীকার করা জ্যোতির্বিজ্ঞানের পক্ষে যতটা প্রয়োজন, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ঐতিহাসিক ঘটনাকে প্রভাবিত করে এ-কথা স্বীকার করাও ইতিহাসের দিক থেকে ততটাই প্রয়োজন।

আবার এটাকে সত্য বলে ধরে নিলে বিধানের অস্তিত্ব অর্থাৎ যেকোন বিজ্ঞানের সম্ভাবনাকেই তো অস্বীকার করতে হয়। একটিমাত্র বস্তুও যদি স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে তাহলে তো কেপ্‌লার ও নিউটনের বিধান সমূহকেই অস্বীকার করা হয়; সেক্ষেত্রে তো সৌরজাগতিক বস্তু-সমূহের গতির কোন ধারণাই গড়ে তোলা সম্ভব নয়। একটিমাত্র কার্যও যদি স্বাধীন ইচ্ছায় পরিচালিত হয় তাহলে তো কোন ঐতিহাসিক বিধানেরই অস্তিত্ব থাকে না; সম্ভব হয় না কোন ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কে একটি ধারণা গড়ে তোলা।

ইতিহাসের বিচারে মানুষের ইচ্ছা চলে একটি রেখা ধরে—সে রেখার একপ্রান্ত থাকে অজ্ঞানতার অন্ধকারে ঢাকা, আর অন্যপ্রান্তে মানুষের ইচ্ছার একটা চেতনা স্থান, কাল ও কার্য-কারণের শৃংখলের মধ্যে কাজ করে চলে।

এই কর্মক্ষেত্রটি যত বেশী আমাদের চোখের সামনে প্রসারিত হয়, ততই তার বিধানাবলী স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়। এইসব বিধানকে আবিষ্কার করা ও তাদের সংজ্ঞা নিরূপণ করাই ইতিহাসের সমস্যা।

এই বিধানের সন্ধান দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে। একাজে ইতিহাসের পুরনো পদ্ধতি যেভাবে কাজ করে চলেছে তারই পাশাপাশি চলেছে তার নতুন পদ্ধতি গড়ে তোলার কাজ।

সব মানবিক বিজ্ঞান এই পথেই এগিয়ে চলেছে। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মে পৌঁছে গণিতশাস্ত্র বিশ্লেষণের পথকে পরিহার করে অতি সূক্ষ্ম, অজ্ঞাত বস্তুর সমন্বয়ের পথে পা রেখেছে। কার্য-কারণের তত্ত্বকে পরিহার করে গণিতশাস্ত্র বিধানের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করেছে।

অন্যভাবে হলেও চিন্তার এই একই পথ ধরেই এগিয়ে চলেছে অন্য সব

বিজ্ঞান। নিউটন যখন মাধ্যাকর্ষণ বিধানের সংজ্ঞা দিল তখন সে একথা বলল না যে সূর্য বা পৃথিবীর আকর্ষণের শক্তি আছে; সে বলল, বৃহত্তম থেকে ক্ষুদ্রতম প্রতিটি বস্তুই পরস্পরকে আকর্ষণ করে। প্রকৃতি-বিজ্ঞান সমূহও সেই একই কাজ করে: কারণের প্রশ্নকে পরিহার করে তারা সকলেই বিধানের সন্ধানে ফেরে। ইতিহাসও সেই একই পথের পথিক। ব্যক্তি-বিশেষের জীবনের ঘটনার বিবরণ না হয়ে ইতিহাসের বিষয়বস্তু যদি হয় জাতিসমূহ ও মানুষের গতিকে জানা, তাহলে কার্য-কারণের তত্ত্বকে একপাশে সরিয়ে রেখে ইতিহাসকেও খুঁজে ফিরতে হবে স্বাধীন ইচ্ছার সঙ্গে ওতঃ-প্রোতভাবে জড়িত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশসমূহকে নিয়ন্ত্রণকারী বিধানকে।

অধ্যায়—১২

কোপার্নিকাসের বিধান আবিষ্কৃত ও প্রমাণিত হবার পর থেকে সূর্যের বদলে পৃথিবীটা ঘোরে এই সত্যের স্বীকৃতিই প্রাচীন মানুষের বিশ্বতত্ত্বকে ধ্বংস করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। সে বিধানকে অপ্রমাণ করতে পারলে হয় তো গ্রহ-উপগ্রহের গতির পুরনো ধারণাকে অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হত, কিন্তু সেটাকে অপ্রমাণ না করে টোলোমীয় বিশ্বতত্ত্বে বিশ্বাস রাখা ছিল একান্তই অসম্ভব। তবু কোপার্নিকাসের বিধান আবিষ্কৃত হবার পরেও অনেককাল পর্যন্ত টোলোমীয় বিশ্বতত্ত্বের পঠন-পাঠন চলেছিল।

যেসময় একটিমাত্র মানুষ প্রমাণ করে দিল যে জন্ম ও অপরাধের সংখ্যা গাণিতিক বিধানের অধীন, এবং রাষ্ট্রের স্বরূপ নির্ধারিত হয় কতকগুলি ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার দ্বারা, এবং জমির সঙ্গে মানুষের কতক-গুলি সম্পর্কের ফলেই মানুষ এক দেশ থেকে দেশান্তরে পাড়ি জমায়, তখন থেকেই সেই সব তত্ত্বের উপর গড়ে তোলা ইতিহাসের মূল ভিত্তিই ধ্বংস হয়ে গেল।

এই নববিধানগুলিকে খণ্ডন করে ইতিহাসের পূর্বতন ধারণাকে হয় তো রক্ষা করা যেত,' কিন্তু সেটাকে খণ্ডন না করে ইতিহাসের ঘটনাবলীকে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার ফলরূপে দেখা একেবারেই অসম্ভব বলে মনে হল। কারণ কতকগুলি বিশেষ ভৌগোলিক, জাতিতাত্ত্বিক ও অর্থনৈতিক কারণের ফলেই যদি কোন বিশেষ শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং কোন বিশেষ জাতির স্থানান্তর-গমন ঘটে, তাহলে কোন ব্যক্তিবিশেষের স্বাধীন ইচ্ছাকে ঐ দুইয়ের কোন ঘটনার কারণ বলেই ধরা যায় না।

অথচ সংখ্যাতত্ত্ব, ভূগোল, রাজনীতিভিত্তিক অর্থনীতি, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও ভূতত্ত্বের বিধানগুলি যখন পূর্ববর্তী ইতিহাসের মূল ধারণাগুলিরই সরাসরি বিরোধিতা করে, তখনও ইতিহাসের নতুন ধারার পাশাপাশি পুরনো ধারার অনুসরণও সমানভাবেই চলতে থাকে।

প্রাকৃতিক দর্শনে প্রাচীন ধারা ও নব্যধারার এই সংঘর্ষ দীর্ঘদিন ধরে বেশ জোরালোভাবেই চলতে লাগল। প্রাচীন ধারার পক্ষ সমর্থন করে ধর্মতত্ত্ব নব্যধারাকে আঘাত করল। কিন্তু সত্যই যখন জয়লাভ করল তখন ধর্মতত্ত্ব নতুন ভিত্তিভূমির উপরেই আসর জাঁকিয়ে বসল।

ইতিহাসের প্রাচীন ও নব্যধারার মধ্যেও সেই একই তীব্র, দীর্ঘ সংঘর্ষ আজও চলেছে; আজও ধর্মতত্ত্ব প্রাচীন ধারাকে সমর্থন করে নব্যধারাকে আঘাত করছে।

উভয়ক্ষেত্রেই ঘটছে চরম উত্তেজনা ও সত্যের অপহ্নব। একদিকে আছে ভীতি ও যুগ যুগ ধরে গড়ে ওঠা হর্ম্যরাজীকে হারাবার আশংকা, আর অন্যদিকে আছে ধ্বংসের নেশা।

প্রাকৃতিক দর্শনের ক্রমবর্ধমান সত্যের বিরুদ্ধে যারা সংগ্রাম করেছে তারা ভেবেছে, সে সত্যকে স্বীকার করার অর্থই ঈশ্বরে বিশ্বাস, সৌরজগতের সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাস, এবং "সন্ন্যাসিনীর পুত্র জোসুয়া"র অলৌকিক ঘটনাবলীতে বিশ্বাসের ধ্বংস। কোপার্নিকাস ও নিউটনের বিধানের সমর্থকদের, যেমন ভল্‌তেয়ারের মনে হয়েছিল যে জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিধানাবলী ধর্মকে ধ্বংস করেছে। তাই মাধ্যাকর্ষণ বিধানকে ধর্মবিরোধী অস্ত্ররূপে ব্যবহার করা হয়েছিল।

ঠিক অনুরূপভাবেই এখন মনে করা হচ্ছে যে আত্মা ও সৎ অসতের তত্ত্ব এবং তার উপর প্রতিষ্ঠিত সব রাষ্ট্র ও গির্জার ধারণাকে নষ্ট করবার, একমাত্র পথই হল অনিবার্যতার বিধানকে মেনে নেওয়া।

ভল্‌তেয়ারের মতই আজকের দিনের অনিবার্যতা বিধানের অবাঞ্ছিত সমর্থকরা সেই বিধানকেই ধর্মের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে হাতে তুলে নিয়েছে; যদিও জ্যোতির্বিজ্ঞানে মাধ্যাকর্ষণ বিধানের মতই ইতিহাসের ক্ষেত্রে অনিবার্যতা বিধানও সেই সব ভিত্তিভূমিকে ধ্বংস করার পরিবর্তে আরও শক্তিশালীই করে তুলেছে যার উপর গড়ে উঠেছে রাষ্ট্র ও গির্জার শাসনব্যবস্থা।

সেদিন যেমন জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, আজও তেমনই ইতিহাসের ক্ষেত্রে, পরিদৃশ্যমান ঘটনাসমূহের মাপকাঠি হিসাবে একটি নিঃশর্ত কিছুকে স্বীকার করা বা না করারই গোটা মত-পার্থক্যের ভিত্তিস্বরূপ। জ্যোতির্বিজ্ঞানে সেটা ছিল পৃথিবীর স্থাবরত্ব, আর ইতিহাসে সেটা হচ্ছে ব্যক্তির স্বাধীনতা—স্বাধীন ইচ্ছা।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে পৃথিবীর জঙ্গমত্বকে স্বীকার করায় বিপদ ছিল তার ফলে পৃথিবীর স্থাবরত্ব ও গ্রহ-নক্ষত্রের জঙ্গমত্বের প্রত্যক্ষ অনুভূতিকে অস্বীকার করতে হত; তেমনই ইতিহাসের ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বকে স্থান, কাল ও কার্যকারণের অধীন করায় বিপদ হয়েছে, স্বীয় ব্যক্তিত্বের স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ

অনুভূতির অস্বীকৃতি। কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন নব্য ধারায় বলা হয়েছিল: "একথা সত্য যে পৃথিবীর জঙ্গমতাকে আমরা অনুভব করি না, কিন্তু তার স্থাবরতাকে স্বীকার করলে আমরা পৌছে যাই একটা স্ব-বিরোধিতায়, আর তার জঙ্গমত্বকে স্বীকার করলে আমরা পাই বিধান," তেমনই ইতিহাসের ক্ষেত্রে নব্যধারায় বলা হয়: "এ কথা সত্য যে আমাদের পরনির্ভরতা সম্পর্কে আমরা সচেতন নই, কিন্তু ইচ্ছার স্বাধীনতাকে স্বীকার করলে আমরা পৌছে যাই একটা স্ববিরোধিতায়, আর বহির্জগতের উপর, স্থান, কাল ও কার্য-কারণের উপর নির্ভরতাকে স্বীকার করলে আমরা পাই বিধান।"

প্রথম ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়েছিল একটি অবাস্তব স্থাবরতাকে পরিহার করে একটি অননুভূত জঙ্গমতাকে স্বীকার করা; বর্তমান ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে প্রয়োজন হয়েছে এমন একটি স্বাধীনতাকে পরিহার করা যার কোন অস্তিত্ব নেই, আর এমন একটি পরনির্ভরতাকে স্বীকার করা যার সম্পর্কে আমরা সচেতন নই।

॥ সমাপ্ত ॥

ক্রয়ৎজার সোনাতা

The Kreutzer Sonata

লিও তলস্তয়

"...কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, যে কেউ কোন স্ত্রীলোককে কামনার দৃষ্টিতে দেখে, সে তখনই মনে মনে তার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়।" ম্যাথু। ৫ ; ২৮

"শিষ্যরা তাঁকে বলল, আপন স্ত্রীর সঙ্গে পুরুষের যদি এই সম্পর্ক হয়, তাহলে বিয়ে না করাই ভাল। কিন্তু তিনি তাদের বললেন, যাদের সে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তারা ছাড়া অপর সকলে এই বাণী গ্রহণ করতে পারে না। কারণ কিছু নপুংসক আছে যারা সেরূপ হয়েই মাতৃগর্ভ হতে জন্মেছে ; আর কিছু নপুংসক আছে যাদের নপুংসক বানানো হয়েছে ; আর কিছু নপুংসক আছে যারা স্বর্গরাজ্যের জন্য নিজেদের নপুংসক করেছে। এই বাণী যে গ্রহণ করতে পারে সে গ্রহণ করুক।"

ম্যাথু। ১৯ ; ১০, ১১, ১২।

এক

প্রথম বসন্তকাল। প্রায় দু'দিন ধরে আমরা পথ চলেছি। অল্প দূরের যাত্রীরা গাড়িতে উঠছে আর নামছে, কিন্তু আমার মত তিনজন যাত্রী ট্রেন ছাড়ার শুরু থেকেই গাড়িতে আছে। তাদের মধ্যে একজন মাঝ-বয়সী স্ত্রীলোক ; দেখতে বিশ্রী, পরনে পুরুষালি কোট ও টুপি, মুখে সিগারেট ; অপরজন তারই পরিচিত, বয়স প্রায় চল্লিশ, বেশী কথা বলে ; সঙ্গে একটা নতুন পরিষ্কার বিছানা ; তৃতীয় ভদ্রলোকটি নিজেকে একটু দূরে রেখেই চলেছে। তার উচ্চতা মাঝারি, চালচলনে ছটফটে, বুড়ো না হলেও কোঁকড়া চুলে অকালে পাক ধরেছে, চোখে একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি, অতি দ্রুত একটা থেকে অন্য একটা জিনিসের উপর চোখ ফেলছে। মাথায় অস্ত্রাখান টুপি, আর পরনে অস্ত্রাখান কলারওয়ালা একটা পুরনো কোট ; দেখলেই বোঝা যায় বেশ দামী দর্জি দিয়ে তৈরি। কোটটা খুলতেই একটা রুশ জ্যাকেট ও কাজ-করা কলারওয়ালা একটা রুশ ব্লাউজ চোখে পড়ল। ভদ্রলোকটির একটা

বৈশিষ্ট্য হল, মাঝে মাঝেই সে এমন শব্দ করছে যা অনেকটা গলা খাঁকারি দেওয়ার মত, অথবা চাপা হাসির মত।

সারাটা পথ এই ভদ্রলোক বেশ চেষ্টা করেই অন্য যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলা বা মেলামেশা করা থেকে বিরত থেকেছে। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে কাটা কাটা জবাব দিয়েছে, আর সময়টা কাটিয়েছে বই পড়ে, জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থেকে, ধূমপান করে, অথবা খাদ্যের জন্য পুরনো থলেটা হাতড়ে এবং চা বা খাবার খেয়ে।

লোকটি নিঃসঙ্গতায় কষ্ট পাচ্ছে মনে করে বারকয়েক তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছি, কিন্তু যখনই আমাদের চোখে চোখ পড়েছে (আর সেটা মাঝে মাঝেই ঘটেছে, কারণ আমরা মুখোমুখিই বসেছিলাম) তখনই সে মুখ ফিরিয়ে হয় একটা বই তুলে নিয়েছে, নয়তো জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছে।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় একটা বড় স্টেশনে গাড়িটা অনেকক্ষণ থেমে থাকায় এই স্নায়ুবিকল ভদ্রলোকটি বাইরে গিয়ে গরম জল এনে নিজের জন্য চা বানাল। নতুন বিস্তারাওয়ালা লোকটি (পরে জেনেছিলাম সে একজন উকিল) এবং তার সিগারেট খাওয়া, পুরুষালি কোট পরা বান্ধবীটি স্টেশনের রেস্তোরাঁতে চা খেতে নেমে গেল।

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রলোকটির অনুপস্থিতিকালে কিছু নতুন যাত্রী গাড়িতে উঠল ; তাদের মধ্যে বৃদ্ধ লোকটি সম্ভবত বণিক ; লম্বা, পরিষ্কার করে কামানো, মুখে বলি-রেখা, পরনে লোমের লাইনিং দেওয়া কোট, আর মস্ত বড় মুখাবরণ সমেত একটা সুতীর টুপি। যেখানে উকিল আর স্ত্রীলোকটি বসেছিল তার ঠিক উল্টো দিকে বণিকটি এসে বসল, আর সঙ্গে সঙ্গে এইমাত্র উঠে-আসা দোকান-কর্মচারির মত দেখতে একটি যুবকের সঙ্গে আলাপ শুরু করে দিল।

আমি তাদের উল্টো দিকে কোণাকুনি জায়গায় বসেছিলাম ; ট্রেনটা দাঁড়িয়েছিল বলেই যখন লোকজন যাওয়া-আসা করছিল না তখন তাদের কিছু কিছু কথাবার্তা আমার কানে আসছিল। বণিকটি জানাল, মাত্র একটি স্টেশন পরে সে তার দেশের বাড়িতে যাচ্ছে ; তারপরই তারা ব্যবসা-বাণিজ্য ও দরদামের আলোচনা শুরু করল এবং কথাপ্রসঙ্গে মস্কোর বাজার ও নিঝনি-নভ্‌গরদ মেলার কথাও স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ল। তার পরিচিত দুজন ধনী ব্যবসায়ী মেলায় যেসব কেলেংকারী কাণ্ড করেছে, দোকান-কর্মচারিটি তারই বর্ণনা দিতে লাগল, কিন্তু বুড়ো লোকটি তাকে বাধা দিয়ে কুনাভিনো-তে সে স্বয়ং যেসব কেলেংকারী কাণ্ড করেছে তাই বলতে শুরু করল।

তার ভাব দেখে মনে হল এসব কাণ্ডকারখানার জন্য সে গর্ববোধ করে ; মুখের উপর একটা খুশি-খুশি ভাব টেনে এনে কিভাবে সে ও তার একজন পরিচিত লোক মাতাল অবস্থায় একটা কুকাজ করেছিল চুপি চুপি তাও বলতে

লাগল : দোকান-কর্মচারিটি এমন অট্টহাসি হেসে উঠল যে সমস্ত গাড়িখানাই গম-গম করে উঠল, আর বুড়ো লোকটিও দুটো লম্বা হল্‌দে দাঁত বের করে হাসতে লাগল।

ভাল কিছু শোনবার আশা নেই বুঝতে পেরে ট্রেনটা না ছাড়া পর্যন্ত প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। দরজাতেই উকিল ও স্ত্রীলোকটির সঙ্গে দেখা হল ; তারা খুব উৎসাহের সঙ্গে কথা বলছে।

মিশুক উকিলটি আমাকে বলল, "পায়চারি করবার সময় নেই। যেকোন মুহূর্তে দ্বিতীয় ঘণ্টাটা বাজবে।"

সত্যি সত্যি আমি ট্রেনের শেষ পর্যন্ত যাবার আগেই শেষ ঘণ্টাটা বেজে উঠল। ফিরে এসে দেখলাম উকিল ও স্ত্রীলোকটি আগের মতই সোৎসাহে কথা বলে চলেছে। বুড়ো বণিকটি একটু দূরে চুপচাপ বসে আছে ; একদৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে মাঝে মাঝেই দাঁতে দাঁত ঘসে তার আপত্তি প্রকাশ করছে।

পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে শুনতে পেলাম উকিলটি হেসে বলছে, "সে শুধু তার স্বামীকে জানিয়ে দিল যে তার সঙ্গে সে আর বসবাস করবে না, কারণ—"

বাকিটা আর শুনতে পেলাম না। আমার পিছনে কিছু যাত্রী এল, তার-পর কণ্ডাক্টর, তারপর একজন মজুর দৌড়ে চলে গেল, এবং কিছু সময় পর্যন্ত এত গোলমাল ও হৈ-চৈ হতে লাগল যে আমি কোন কথাই শুনতে পেলাম না।

অবস্থা শান্ত হয়ে এলে উকিলের গলা আবার যখন আমার কানে এল তখন তার একটি বিশেষ ঘটনার বিবরণ থেকে একটি সাধারণ আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে। উকিলটি বলছিল, বিবাহ-বিচ্ছেদের সমস্যা ইওরোপে সাধারণ মানুষেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, এবং রাশিয়াতেও বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। তার কথাই সকলে শুনছে দেখে সে বৃদ্ধ লোকটির দিকে মুখ ফেরাল।

স্মিত হাসির সঙ্গে বলল, "আগেকার দিনে এরকমটা ছিল না, তাই নয় কি ?"

বুড়ো লোকটি সবে জবাব দিতে যাবে এমন সময় ট্রেনটা চলতে শুরু করল, আর সেও টুপিটা খুলে ক্রুশ-চিহ্ন আঁকল এবং রুদ্ধশ্বাসে প্রার্থনা করতে লাগল। উকিলটি ভদ্রতার সঙ্গে চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে তার জবাবের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। প্রার্থনা শেষ করে তিনবার ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে বুড়ো লোকটি সোজা তার টুপিটা মাথায় দিল, আটো করে নীচে নামিয়ে দিল, এবং আসনে বসে কথা বলতে শুরু করল।

বলল, "আগেকার দিনেও এরকম ঘটনা ঘটত, তবে সেগুলো সংখ্যায় ছিল অল্প। কিন্তু আজকালকার দিনে এটাই তো প্রত্যাশিত। লোকরা অনেক লেখাপড়া শিখছে যে।"

ট্রেনটা একটা জোড়ের উপর দিয়ে সশব্দে চলার জন্য কথাগুলি ঠিক শুনতে পাচ্ছিলাম না, তাই আলোচনাটা ভাল লাগায় আমি বক্তাদের আরও কাছে গিয়ে বসলাম।

আমার পার্শ্ববর্তী স্নায়ু-বিকল ভদ্রলোকটিরও বোধ হয় আলোচনাটি ভাল লাগছিল। কারণ আসন ছেড়ে না এলেও সে কথাগুলি শোনবার জন্য গলাটা বাড়িয়ে দিয়েছিল।

ম্লান হাসি হেসে স্ত্রীলোকটি বলল, "লেখাপড়া শেখা কি অন্যায়? আপনি কি মনে করেন, আগেকার দিনে যে পাত্র-পাত্রীরা বিয়ের আগে পরস্পরকে চোখের দেখাটি পর্যন্ত না দেখে বিয়ে করে বসত সেটাই ভাল ছিল? পরস্পরকে ভালবাসে কি না, অথবা কোনদিন ভালবাসতে পারবে কি না সেটা না জেনেই হাতের কাছে যাকে পেত তাকেই তারা বিয়ে করে বসত, এবং পরে সারাটা জীবন যন্ত্রণা ভোগ করত। আপনি কি মনে করেন, সেটা ভাল ছিল?" স্পষ্টই বোঝা গেল, বৃদ্ধ লোকটির পরিবর্তে সে আমাকে এবং উকিলটিকেই প্রশ্নগুলি করল।

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে স্ত্রীলোকটির দিকে তাকিয়ে তার প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়েই বণিকটি পুনরায় বলল, "আজকাল তারা অনেক লেখাপড়া শিখছে।"

উকিলটি ঈষৎ হেসে প্রশ্ন করল, "লেখাপড়া এবং অসুখী বিয়ের মধ্যে কি কোন সম্পর্ক আছে বলে আপনি মনে করেন?"

বণিকটি জবাব দেবার আগেই স্ত্রীলোকটি বাধা দিয়ে বলল, "না, না। সেসব দিনকাল চিরদিনের মত চলে গেছে।"

উকিলটি বলল, "থাম, ওর মতামতটা বলতে দাও।"

বুড়ো লোকটি সপ্রতিভভাবে বলল, "লেখাপড়ার সঙ্গে অনেক বোকামিরও আমদানি হয়।"

"যারা পরস্পরকে ভালবাসে না তাদের তারা বিয়ে দিয়ে দেয়, আর তারপরে তাদের অসুখী দেখে অবাক হয়ে যায়," আমার এবং উকিলটির দিকে তাকিয়ে স্ত্রীলোকটি দ্রুত কথা বলে উঠল; এমন কি যে দোকান-কর্মচারিটি উঠে গিয়ে সিটে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে আমাদের কথা শুনছিল, স্ত্রীলোকটি তার দিকেও তাকিয়েই কথাগুলি বলল। "জন্তু-জানোয়াররাই প্রভুর ইচ্ছামত সঙ্গী-সাথী পেয়ে থাকে; মানুষেরই থাকে রুচি ও ভাল-লাগার প্রশ্ন," বুড়ো লোকটিকে আঘাত করবার জন্যই সে কথাগুলি বলল।

বুড়ো লোকটি বলল, "দেখ মেয়ে, তুমি যা বললে তা ঠিক নয়। জানোয়াররা পশু; মানুষকেই আইন মেনে চলতে হয়।"

নিজের নতুন ধারণাকে প্রকাশ করবার ব্যস্ততায় স্ত্রীলোকটি বলল, "একটি পুরুষ যাকে ভালবাসে না তার সঙ্গে তাকে আপনি কেমন করে ঘর করতে

বলেন ?”

বুড়ো লোকটি বেশ জোর দিয়েই বলল, “আগেকার দিনে এইসব পার্থক্য ছিল না। এসব ধারণা নতুন মাথা চাড়া দিয়েছে। আগে কোন মেয়ে বলত না, ‘আমি তোমাকে ছেড়ে দেব।’ আজকাল চাষীরাও এই স্টাইল ধরেছে। সে মেয়েটিও বলে, ‘রইল তোমার শার্ট আর ব্রীচেস ; আমি ভানিয়া-র সঙ্গে চললাম—তার চুলটা বেশী কোঁকড়ানো।’ তাহলেই বোঝ। মেয়েদের মনে ভয় থাকা দরকার।”

দোকান-কর্মচারিটি উকিলের দিক থেকে আমার দিকে, এবং সেখান থেকে স্ত্রীলোকটির দিকে তাকাল ; তার ঠোঁটে চাপা হাসি ; যেন বণিকের কথায় সায় দেবে না হাসবে ঠিক বুঝতে পারছে না।

স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করল, “কিসের ভয় ?”

“কিসের ? স্বামীকে ভয় ; তাই তো চাই।”

স্ত্রীলোকটি বলল, “দেখ গো ভালমানুষ, সেসব দিনকাল চলে গেছে।”

“না গো ভালমেয়ে, সেসব দিনকাল কোনকালে চলে যাবে না। পুরুষের বুকের পাঁজড় থেকে ঈভকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, শেষদিন পর্যন্ত তাই সে থাকবে।” স্থির সংকল্পে মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে এমন কঠিন গলায় বুড়ো লোকটি কথা বলল যে দোকান-কর্মচারিটি সঙ্গে সঙ্গে ধরে নিল তারই জয় হয়েছে। আর তাই সে হো-হো করে হেসে উঠল।

স্ত্রীলোকটিও হার মানবার পাত্রী নয় ; সে বলে উঠল, “তোমরা পুরুষরাই শুধু একথা ভাব। সব স্বাধীনতা তোমরা ভোগ করছ, আর আমাদের রাখতে চাও জেলখানায় বন্দী করে। তোমরা নিজেরা যা খুশি তাই করতে পার।”

বুড়ো লোকটি সেই একই ভারী গলায় বলল, “কেউ আমাদের সে অধিকার দান করে নি ; আর মেয়েদের তো সাবধানতা রক্ষা করেই চলতে হয়।”

মনে হল, শ্রোতারা তার কথাই মেনে নিচ্ছে ; স্ত্রীলোকটি বুঝতে পারল যে তার অবস্থা কাহিল, তবু সে হাল ছাড়ল না।

“কিন্তু তোমরা একথা তো নিশ্চয় স্বীকার করবে যে স্ত্রীলোকও মানুষ, মানুষের মত তারও হৃদয়বৃত্তি আছে। নিজের স্বামীকে যদি ভাল না বাসে, তাহলে সে কি করবে ?”

ভুরু ও ঠোঁট নামিয়ে কঠিন গলায় বণিক জবাব দিল, “তাকে ভালবাসবে না ? তাকে ভালবাসতে শিখতে হবে !”

এই অপ্রত্যাশিত জবাবে খুশি হয়ে দোকান-কর্মচারিটি সরবে তাকে সমর্থন জানাল।

স্ত্রীলোকটি বলল, “না, তা সে করবে না। সে যদি স্বামীকে ভালবাসতে না পারে তাহলে তার উপর জোর খাটানো চলবে না।”

“কিন্তু স্ত্রী যদি স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত না হয় তাহলে কি হবে ?” উকিল

প্রশ্ন করল।

বৃদ্ধ বলল, "তা হতে দেওয়া চলবে না। সে ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।"

"কিন্তু যদি হয় তাহলে? যতই হোক, সেরকমটাও তো ঘটে।"

বৃদ্ধ বলল, "হয়তো কোন কোন লোকের মধ্যে এরকমটা ঘটে, কিন্তু আমাদের মত লোকের মধ্যে ঘটে না।"

কেউ কোন কথা বলল না। দোকান-কর্মচারিটি পা সরিয়ে আরও কাছে এগিয়ে গেল; সেও আলোচনার বাইরে থাকতে চায় না; তাই একটু হেসে কথা বলতে শুরু করল।

"একবার আমার মনিবের পরিবারে একটা কেলেংকারি হয়েছিল। দোষ যে কার তা বোঝা শক্ত। ছেলের বৌটার চরিত্র খারাপ ছিল। সে ফাঁকি-বাজী শুরু করল। ছেলেটি ভদ্র। বৌটা প্রথমে হিসাবনবীশের সঙ্গে জমে গেল। ছেলেটি ভালভাবে বোঝাল। কোন ফল হল না। মেয়েটা যাচ্ছেতাই। সে টাকা চুরি করতে শুরু করল। ছেলেটি উত্তম-মধ্যম দিল। ফল আরও খারাপ হল। সে একজন অদীক্ষিতের সঙ্গে—যদি কিছু না মনে করেন তো বলি, একজন ইহুদীর সঙ্গে জমে গেল। ছেলেটি আর কি করবে? বৌকে ত্যাগ করল। আজও পর্যন্ত অবিবাহিতের মতই থাকে, আর বৌটা রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়।"

বৃদ্ধ বলল, "ছেলেটাই বোকা। প্রথম থেকেই যদি বৌকে কড়া শাসনে রাখত, লাগাম ছেড়ে না দিত, তাহলে আজও বৌ তার সঙ্গেই থাকত। গোড়ায় লাগাম ছেড়ে দেওয়াই ভুল। 'মাঠে ঘোড়াকে আর বাড়িতে বৌকে কখনও বিশ্বাস করো না।'"

ঠিক সেইসময় কণ্ডাক্টর এল পরের স্টেশনের টিকিট সংগ্রহ করতে। বুড়ো লোকটি তাকে নিজের টিকিটটা দিল।

"হ্যাঁ, সুন্দরীদের গোড়া থেকেই বাগে আনতে হয়, নইলে সব সর্বনাশ।"

"আর তোমরা বিবাহিতরা এইমাত্র কুনাভিনো-র মেলায় যেসব কাণ্ড-কারখানার বিবরণ দিলে তার বেলায়?" আমি কথাগুলি না বলে পারলাম না।

"ওটা আলাদা ব্যাপার।" এইটুকু বলেই বণিক চুপ করে গেল।

হুইস্‌ল্‌ বাজতেই বুড়ো লোকটি উঠে আসনের নীচ থেকে বস্তাটা টেনে বের করল, গ্রেটকোটটা গায়ে জড়িয়ে নিল, তারপর টুপীটা তুলে বেরিয়ে গেল।

দুই

সে চলে যেতেই কয়েকটি কণ্ঠ একযোগে কথা বলে উঠল

"লোকটা সেকেলে," দোকান-কর্মচারিটি বলল।

"একটি পিতৃতান্ত্রিক শাসক। নারী ও বিবাহ সম্পর্কে কী সব সেকেলে আদিম ধারণা!" স্ত্রীলোকটি বলল।

"হুম, বিয়ের ব্যাপারে আমরা ইওরোপীয়দের :চাইতে অনেক পিছিয়ে আছি," উকিল বলল।

স্ত্রীলোকটি বলল, "এইসব লোকরা আসল কথাটাই বুঝতে পারে না যে, ভালবাসাহীন বিয়ে একটা বিয়েই নয়, ভালবাসাই বিয়েকে পবিত্র করে, আর ভালবাসার দ্বারা যে বিয়ে পবিত্র হয় সেটাই আসল বিয়ে।"

দোকান-কর্মচারিটি হাসিমুখে কথাগুলি শুনল; ভবিষ্যতে সুযোগ মত ব্যবহার করবার জন্য এই ভাল ভাল কথাগুলিকে সে মুখস্ত করতে চেষ্টা করল।

স্ত্রীলোকটির কথার মাঝখানে চাপা হাসি অথবা কান্নার মত একটা শব্দ আমার কানে এল। মুখ ফিরিয়ে আমার পাশের সেই পাকা চুল, চকচকে চোখ ভদ্রলোকটিকে দেখতে পেলাম। আমরা এতক্ষণ খেয়াল করি নি যে, আমাদের কথা শোনবার আগ্রহে সে আরও কাছে সরে এসেছে। সে আসনের পিছনে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে; তাকে খুবই উত্তেজিত মনে হল। তার মুখটা লাল হয়ে উঠেছে। গালের মাংসপেশীগুলি কুঁচকে উঠেছে।

সে আমতা-আমতা করে বলল, "সে ভালবাসাটা কি জিনিস···সেই ভালবাসা···সেই ভালবাসা যা বিয়েকে পবিত্র করে?"

তার উত্তেজনা লক্ষ্য করে স্ত্রীলোকটি শান্ত গম্ভীর স্বরে বলল, "প্রকৃত ভালবাসা। পুরুষ ও নারীর মধ্যে যখন সেই ভালবাসা জন্মে তখনই বিয়েটা সম্ভব হয়।"

"তা ঠিক, কিন্তু কেমন করে বুঝব প্রকৃত ভালবাসা কি?" সচেতন হাসির সঙ্গে চকচকে চোখ ভদ্রলোকটি ইতস্তত গলায় বলল।

এ আলোচনা শেষ করবার ব্যগ্রতায় স্ত্রীলোকটি বলল, "প্রকৃত ভালবাসা যে কি তা সকলেই জানে।"

"আমি জানি না," ভদ্রলোকটি বলল। "আপনার মনের কথাটা পরিষ্কার করে বলা দরকার।"

"খুবই সহজ কথা," বলেই স্ত্রীলোকটি থেমে কি যেন ভাবল। তারপর বলল, "ভালবাসা? অন্য সকলকে ছেড়ে একজনকে ভাল লাগাই ভালবাসা।"

"কতদিনের জন্য ভাল লাগা? এক মাস? দু দিন? আধ ঘণ্টা?" পাকা-চুল ভদ্রলোক হাসতে হাসতে বলল।

"আরে থামুন, আপনি হয় তো সম্পূর্ণ আলাদা কোন কিছু ভাবছেন।"

"না, আমি ঐ একই জিনিস ভাবছি।"

উকিল বুঝিয়ে বলল, "উনি বলতে চান, বিবাহের আবির্ভাব হওয়া উচিত প্রথমত অনুরাগ—ইচ্ছা করলে ভালবাসাও বলতে পারেন—থেকে,

আর একমাত্র যখন সেটা থাকে তখনই বিবাহকে বলা যেতে পারে···মানে··· একটা পবিত্র কিছু। আপনি তো এই কথাই বলতে চেয়েছেন?” স্ত্রীলোকটির দিকে ঘুরে সে বলল।

স্ত্রীলোকটি মাথা নাড়ল।

“আর তারপরে···উকিলটি কথা বলতে শুরু করতেই ভদ্রলোকটি তাকে থামিয়ে দিল। তার চোখ দুটি এবার কয়লার মত জ্বলছে; তার উত্তেজনা এতখানি বেড়েছে যে সে নিজেকে আর সংযত করে রাখতে পারল না।

“আমিও ঠিক ওই কথাই বলছি—অন্য সকলকে ফেলে একটি নর বা নারীকে ভাল লাগা; কিন্তু আমি জানতে চাই,—কতদিনের জন্য?”

“কতদিনের জন্য? দীর্ঘ দিন, অনেক সময় সারা জীবনের জন্য,” কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে স্ত্রীলোকটি বলল।

“কিন্তু সে তো শুধু উপন্যাসেই ঘটে, জীবনে কখনও ঘটে না। জীবনে একজন লোককে এই ভাললাগা খুব অল্প ক্ষেত্রেই বছরের পর বছর ধরে টিকে থাকে, প্রায়শই সেটা টেকে কয়েক মাস, কখনও কয়েক সপ্তাহ, দিন, বা ঘণ্টা মাত্র।” ভদ্রলোকটি বুঝতে পারছে যে তার এই কথা শুনে সকলেই আহত হচ্ছে আর তাতেই সে খুশি হয়ে উঠেছে।

“আপনি কী বলছেন! মোটেই তা নয়। কিন্তু শুনুন—” আমরা তিনজন একবাক্যে প্রতিবাদ জানালাম। এমন কি দোকান-কর্মচারিটি পর্যন্ত সশব্দে তার অসম্মতি জানাল।

“হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি,” পাকা-চুল ভদ্রলোক এত জোরে চেঁচিয়ে উঠল যে আমাদের সকলের গলাই ডুবে গেল। “যা আছে বলে মনে করা হয় আপনারা বলছেন তার কথা, আর আমি বলছি তার কথা যা সত্যি সত্যি আছে। একটি সুন্দরী স্ত্রীলোককে দেখলেই প্রত্যেকটি পুরুষের যে অভিজ্ঞতা হয় তাকেই আপনারা বলছেন ভালবাসা।”

“কিন্তু আপনি যা বলছেন সে তো সাংঘাতিক! যাই বলুন, মানুষের মনে এমন অনুভূতি আছে যাকে বলে ভালবাসা, আর সেটা সারা জীবন টিকে থাকে, শুধু কয়েকটি মাস বা বছর নয়।”

“না, না, সেরকম কিছু নেই! সারা জীবন ধরে একটি পুরুষের কোন একটি নারীকে ভাল লাগে এ সম্ভাবনা যদি স্বীকার করেও নি, তবু সেই নারীর ভাল লাগে অন্য কাউকে এই সম্ভাবনাই আরও অনেক বেশী। এই হচ্ছে আসল কথা, আর চিরদিন এটাই সত্য,” একটি সিগারেট বের করে আগুন ধরাতে ধরাতে সে কথাগুলি বলল।

উকিল বলল, “কিন্তু এ অনুভূতি তো পারস্পরিক হওয়াও সম্ভব।”

“না, সম্ভব নয়,” অপরজন পাল্টা কথা বলল। “একটা গাড়িতে যখন মটর-দানা বোঝাই করা হয় তখন পূর্ব-নির্বাচিত দুটি মটর-দানা ঠিক পর পর

পড়বে সেটা যেমন সম্ভব নয়, এটাও তাই। তাছাড়া, নর-নারীর ব্যাপারে সম্ভাবনার সূত্রের চাইতেও বেশী কাজ করে ক্লান্তি। সারা জীবন ধরে একটি পুরুষ বা নারীকে ভালবাসা—আরে, সে তো একটিমাত্র মোমবাতি সারা জীবন ধরে জ্বলবে এটা আশা করারই সামিল,'' সিগারেটে ঘন ঘন টান দিতে দিতে সে বলল।

"কিন্তু আপনি তো বলছেন শুধু দৈহিক ভালবাসার কথা। ভাবের ঐক্য অথবা আধ্যাত্মিক মিলনের উপর প্রতিষ্ঠিত ভালবাসা কি আপনি স্বীকার করেন না ?'' স্ত্রীলোকটি প্রশ্ন করল।

"আধ্যাত্মিক মিলন। ভাবের ঐক্য !'' লোকটির কণ্ঠে প্রতিধ্বনি বাজল ; আবার সেই একই শব্দ আমি শুনতে পেলাম। "তাহলে তো একসঙ্গে ঘুমোবার কোন কারণই থাকে না (আমার স্থূলতা ক্ষমা করবেন)। ভাবের ঐক্যের বশে মানুষ একসঙ্গে ঘুমুতে গেছে, এমন কথা কে কবে শুনেছে ?" একটা অস্বাভাবিক হাসি হেসে সে কথাগুলি বলল।

উকিল বলল, "আরে থামুন ! বাস্তব ঘটনা আপনার বক্তব্যের বিরোধী। আমরা দেখছি, পৃথিবীতে দাম্পত্য সম্পর্ক আছে, সব মানুষই, অন্তত অধিকাংশ মানুষই এইভাবে জীবনযাপন করে, এবং অনেকেই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিশ্বস্ত বিবাহিত জীবন কাটায়।"

পাকা চুল ভদ্রলোকটি আবার হেসে উঠল।

"প্রথমে আপনি বললেন, বিবাহ ভালবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত, আর আমি যখন দৈহিক ভালবাসা ছাড়া অন্য কোন ভালবাসার অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করলাম, তখন আপনি বিবাহের অস্তিত্বকে দিয়ে ভালবাসার অস্তিত্বকে প্রমাণ করতে চাইলেন। আজকালকার দিনে বিয়েটা তো প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই না।"

উকিল বলে উঠল, "না, না, আমি প্রতিবাদ করছি। আমি শুধু বলেছি, বিবাহ আছে, এবং চিরকাল থাকবে।"

"ঠিক কথা। কিন্তু কিসের ভিত্তিতে আছে ? বিবাহ আছে এবং চিরকাল থাকবে সেইসব মানুষের মধ্যে যারা মনে করে বিবাহ একটি পবিত্র বন্ধন, আর সেই পবিত্রতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে এমন কিছু কর্তব্য যার জন্য তারা ঈশ্বরের কাছে দায়বদ্ধ। সেইসব মানুষের মধ্যে বিবাহ আছে, কিন্তু আমাদের সমাজের লোকদের মধ্যে নেই। আমাদের মধ্যে মানুষ যখন বিয়ে করে তখন তার মধ্যে তারা সহবাস ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না, আর তার ফলে তাদের কাছে বিয়েটা হয় নির্যাতন আর না হয় প্রতারণা। এই দুই পাপের মধ্যে প্রতারণাই অপেক্ষাকৃত ছোট পাপ। স্বামী-স্ত্রী এই ভেবে পরস্পরকে ঠকায় যে তারা এক-বিবাহের জীবন যাপন করছে। কারণ আসলে তারা যাপন করে বহু-বিবাহের জীবন। এটা অন্যায়, কিন্তু সহনীয়।

কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায়, স্বামী-স্ত্রী যখন সারা জীবন একসঙ্গে বাস করবার দায়িত্বকে গ্রহণ করে এবং প্রথম মাসের পর থেকেই পরস্পরকে ঘৃণা করে, বিচ্ছেদের জন্য লালায়িত হয়, অথচ তখনও একসঙ্গেই বাস করতে থাকে, তখন তাদের জীবনে দেখা দেয় সেই অবর্ণনীয় দুঃখ যার ফলে মানুষ মদ খেতে শুরু করে, আত্মহত্যা করে, নিজেদের এবং পরস্পরকে খুন করে এবং বিষ খাওয়ায়," ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার সঙ্গে সে কথাগুলি বলতে লাগল ; পাছে আর কেউ কথা বলে ফেলে সেই ভয়ে তার বাকভঙ্গি দ্রুত হতে দ্রুততর হতে লাগল। সে যখন থামল তখন চারদিকে এক অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা নেমে এল।

এই উত্তেজিত, অশোভন আলোচনার ইতি টানবার আশায় উকিল বলল, "তা তো বটেই ; নিঃসন্দেহে বিবাহিত জীবনেও অনেক সংকট-মুহূর্ত আছে।"

আপাত শান্তভাবে নরম গলায় ভদ্রলোক বলল, "দেখছি আপনি আমাকে চিনতে পেরেছেন ?"

"না, সে সৌভাগ্য আমার হয় নি—"

"সৌভাগ্যের ব্যাপার মোটেই নয়। আমি পজ্‌দ্‌নিশেভ। যে সংকট-মুহূর্তের কথা আপনি বলেছেন তাকেও আমি পার হয়ে এসেছি এবং পার হতে গিয়েই আমার স্ত্রীকে খুন করেছি," আমাদের প্রত্যেকের উপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে সে কথাগুলি বলল।

বলবার মত কিছু না পেয়ে আমরা সকলেই চুপ করে বসে রইলাম।

আর একবার সেইরকম অদ্ভুত শব্দ করে সে বলল, "সে কথা থাক। আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি···মানে···আপনাদের বিরক্ত করতে চাই না।"

"এগিয়ে আসুন, আমি বলছি···", উকিল বলল ; "আমি বলছি," কথা দুটির দ্বারা সে যে কি বলতে চাইল তা সে নিজেই জানে না।

তার কথায় কান না দিয়ে পজ্‌দ্‌নিশেভ দ্রুত ঘুরে গিয়ে বসে পড়ল। উকিল ও স্ত্রীলোকটি নীচু গলায় কথা বলতে লাগল। আমি বসেছিলাম পজ্‌দ্‌নিশেভ-এর ঠিক পাশে। আমিও কিছু বললাম না। কামরাটা এত অন্ধকার যে পড়া যায় না ; কাজেই আমি চোখ বুজে ঘুমের ভান করে পড়ে রইলাম। এইভাবে নিঃশব্দে আমরা পরের স্টেশনটাতে পৌঁছে গেলাম।

কণ্ডাক্টরের সঙ্গে আগে থেকেই ব্যবস্থা করা ছিল ; সেখানে পৌঁছে উকিল ও স্ত্রীলোকটি অন্য গাড়িতে চলে গেল। দোকান-কর্মচারিটি বেঞ্চিতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। পজ্‌দ্‌নিশেভ এন্তার সিগারেট খেতে লাগল, আর আগের স্টেশনে গাড়িটা দাঁড়ালে যে চা-টা তৈরি করেছিল তাই খেতে লাগল।

আমি চোখ মেলে তার দিকে তাকাতেই সে হঠাৎ বিরক্ত গলায় আমাকে বলে উঠল, "আমি কে সেটা জানবার পরে আপনি হয় তো আমার সঙ্গে

থাকতে অস্বস্তি বোধ করছেন ? তা যদি হয়, তাহলে আমি চলে যাচ্ছি।"

"আরে, মোটেই তা নয়।"

"তাহলে তো আপনিও নিশ্চয় একটু খাবেন ? কিন্তু এটা খুবই কড়া," আমার জন্য খানিকটা চা ঢালতে ঢালতেই সে বলল।

"কথা আর কথা · তাও মিথ্যা ছাড়া কথা নেই," সে বলল।

"কিসের কথা বলছেন ?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"ঐ একই ব্যাপার : তাদের ভালবাসার কথা, আর আসলে সেটা কি জিনিস তাই। আপনি কি খুব ক্লান্ত ?"

"মোটেই না।"

"তাহলে ওই একই ভালবাসার জন্য আমি যা করেছি সেটা কেন করলাম তা আপনাকে বলতে চাই।"

"যদি আপনার খুব কষ্ট না হয়।"

"কিছু না বললেই আমার বেশী কষ্ট হয়। চা-টা খান। না কি ওটা খুবই কড়া ?"

চা-টা সত্যি বীয়ারের মত, কিন্তু আমি এক গ্লাস খেলাম। ঠিক সেইসময় কণ্ডাক্টর পাশ দিয়ে চলে গেল। আমার সঙ্গী জ্বলন্ত দৃষ্টি মেলে তার দিকে তাকাল এবং সে চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে গল্পটা শুরু করল।

তিন

"আচ্ছা, তাহলে বলছি। আপনি কি সত্যি চান যে আমি বলি ?"

আমি আমার সম্মতি জানালাম। সে এক মিনিট অপেক্ষা করল, হাত দিয়ে মুখটা ঘষল, তারপর শুরু করল :

"যদি বলতেই হয় একেবারে প্রথম থেকে শুরু করতেই হবে ; আমাকে বলতেই হবে কেন আমি বিয়ে করলাম, আর বিয়ের আগেই বা আমি কেমন ছিলাম।

বিয়ের আগে আমি অন্য যেকোন লোকের মতই দিন কাটাচ্ছিলাম—যে-কোন লোক মানে আমাদের সমাজের যেকোন লোক। আমি একজন জমিদার, বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা মাস্টার্স ডিগ্রি আমার আছে। বিয়ের আগে আমি অন্য যেকোন লোকের মতই দিন কাটাচ্ছিলাম···তার অর্থ আমিও একটি লম্পটের জীবন যাপন করছিলাম এবং আমাদের সমাজের প্রত্যেকের মতই আমিও নিশ্চিত জানতাম যে সে জীবন যাপন করে আমি ঠিক কাজই করছি। নিজেকে আমি বেশ ভাল ভদ্রলোক বলেই মনে করতাম। আমি কাউকে ফুসলাই নি, আমার কোনরকম বিকৃত রুচি ছিল না, আর আমার বয়সের অন্য অনেকের মত এটাকেই জীবনের প্রধান কাজ করে তুলি নি ; স্বাস্থ্যের খাতিরেই রুচি ও মর্যাদামাফিক আমি কামনা

চরিতার্থ করতাম। যেসব স্ত্রীলোক সন্তানের জন্ম দিয়ে অথবা গভীর অনুরাগের সৃষ্টি করে বিঘ্নস্বরূপ হয়ে উঠতে পারে তাদের আমি এড়িয়ে চলতাম। আসলে হয়তো সন্তান এসেছিল বা গভীর অনুরাগ জন্মেছিল, কিন্তু আমি সেসব ব্যাপারে চোখ বুজে থাকতাম। আর একাজকে যে আমি শুধু নীতির থেকে বড় বলে মনে করতাম তাই নয়, এ নিয়ে আমি বেশ গর্ববোধ করতাম।"

সে থামল ; কোন নতুন চিন্তা এলেই যেধরনের একটা শব্দ করতে সে অভ্যস্ত পুনরায় সেইরকম শব্দ করল।

সে চেঁচিয়ে বলল, "আর এইটেই হচ্ছে সব চাইতে খারাপ। দৈহিক কাজের মধ্যে চরিত্রহীনতা প্রকাশ পায় না ; যে নারীর সঙ্গে তোমার দৈহিক সম্পর্ক ঘটেছে তার সম্পর্কে সবরকম নৈতিক দায়িত্বকে অস্বীকার করাই চরিত্রহীনতা—প্রকৃত চরিত্রহীনতা। আর আমি যে এই নৈতিক দায়িত্বকে অস্বীকার করতে পেরেছিলাম তাকেই মনে করতাম আমার বিজয়-মুকুট। একদা একটি নারী আমার প্রেমে পড়ে আমাকে দেহদান করবার পরে তাকে তার প্রাপ্য অর্থ দিতে ভুলে যাওয়ায় আমি যে বিবেক-যন্ত্রণা ভোগ করেছিলাম তা আজও মনে পড়ে। তাকে তার প্রাপ্য টাকাটা পাঠিয়ে দিয়ে তার প্রতি আমার সবরকম নৈতিক দায়িত্ব থেকে মুক্তিলাভ করে তবে আমার মনের প্রশান্তি ফিরে এসেছিল। আপনিও আমার সঙ্গে একমত এরকম ভাব দেখিয়ে মাথা নাড়বেন না," সে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "আমি ভাল করেই জানি। আপনি, আপনারা সবাই—সবাই এক, অবশ্য আপনি যদি কোন বিরল ব্যতিক্রম হয়ে থাকেন সে আলাদা কথা। বড় জোর আপনি আমার সঙ্গে একমত হতে পারেন। কিন্তু তাতে কি ? আমাকে ক্ষমা করুন," সে বলল। "আমার কোন উপায় ছিল না, ব্যাপারটা এতই ভয়ংকর, ভয়ংকর, ভয়ংকর।"

"কি এত ভয়ংকর ?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"নারী এবং তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ব্যাপারে ভুলের যে অতলান্ত অন্ধকারে আমরা বাস করি। না, এবিষয় নিয়ে আমি শান্তভাবে কথা বলতে পারি না, কারণ এই ভদ্রলোক যাকে 'সংকট মুহূর্ত' বললেন সেটা আমার জীবনেও ঘটেছে ; কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা সেই ঘটনার পর থেকেই আমার চোখ খুলে গেছে, সব কিছুকেই আমি নতুন আলোতে দেখতে পেয়েছি। সব কিছুই বদলে গেছে—ভিতর হয়েছে বাহির, আর বাহির হয়েছে ভিতর !"

একটা সিগারেট ধরিয়ে হাঁটুর উপর কনুই রেখে তার উপর ঝুঁকে সে আবার কথা শুরু করল। অন্ধকারে তার মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু রেলগাড়ির ঘট-ঘটাং শব্দকে ছাপিয়ে তার আন্তরিক সুন্দর কণ্ঠস্বর আমার কানে আসছিল।

চার

"হ্যাঁ, যে কষ্ট আমি ভোগ করেছি তারপরেই এবং তার ফলেই আমি বুঝতে পেরেছি এ পাপের মূল কোথায়, বুঝতে পেরেছি কি হওয়া উচিত, এবং সব ব্যাপারটার ভয়াবহতাটাকে যথাযথভাবে দেখতে পেয়েছি।

"এবার আমাকে বলতে অনুমতি করুন, কবে এবং কেমন করে সেই অবস্থাটার সূত্রপাত হল যা আমাকে ঠেলে দিল সেই সংকট মুহূর্তের মধ্যে। আমার ষোল বছর বয়সে ব্যাপারটার শুরু। তখন আমি জিম্‌নাসিয়াম-এর একটি ছাত্র, আর আমার দাদা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ে। তখনও আমি নারী-সঙ্গবর্জিত, কিন্তু আমাদের সমাজের অন্য সব দুর্ভাগা সন্তানদের মতই নিষ্পাপ নই। দুটি বছর ধরে অন্য সব ছেলেদের দুর্নীতির প্রভাব তখন আমার উপর পড়েছে। ইতিমধ্যেই মেয়েরা আমাকে জ্বালাতে শুরু করেছে—কোন বিশেষ মেয়ে নয়, মেয়ে জাতটাই তখন মিষ্টি হাতছানি দিয়ে আমাকে ডাকতে শুরু করেছে—প্রতিটি মেয়ে আর মেয়ে জাতটার আব্রুহীনতা। নির্জন মুহূর্তগুলিও আমি পবিত্রভাবে কাটাতে পারতাম না। আমার মত শতকরা নিরানব্বইটি ছেলে যে কষ্ট ভোগ করে আমিও সেই কষ্ট ভোগ করতাম। আমি আতংকিত হতাম। কষ্ট পেতাম, প্রার্থনা করতাম, শেষ পর্যন্ত পরাজিত হতাম। বাস্তবে ও কল্পনায় পাপ করলেও তখনও আমি চরম পদক্ষেপ করি নি। নিজের সর্বনাশ করলেও অন্য কারও উপর তখন হাত রাখি নি। কিন্তু একদিন সন্ধ্যায় আমার দাদার জনৈক বন্ধু, একটি ছাত্র, বেশ হাসিখুশি, সেইসব 'ভাল ছেলেদের' একজন যারা অন্যকে মদ খেতে ও তাস খেলতে শেখায়, আসলে যারা প্রথম শ্রেণীর শয়তান—দাদার সেই বন্ধু মদের আসরের শেষে প্রস্তাব করল, চল আমরা 'সেখানে' যাই। আমরা গেলাম। আমার দাদাও তখন পর্যন্ত নারীসঙ্গবর্জিতই ছিল, কিন্তু সেই একই রাতে তারও পতন ঘটল। পনেরো বছরের ছেলে আমিও নিজেকে কলঙ্কিত করলাম, কি করছি না বুঝেই একটি স্ত্রীলোককে কলঙ্কিত করবার কাজে অংশীদার হলাম। আমি যা করলাম সেটা যে অন্যায় সেকথা আমার বড়দের কাছ থেকে কখনও শুনি নি। আজও তা কেউ শোনে না। একথা সত্য যে, 'দশ আজ্ঞায়' এটাকে অন্যায় বলা হয়েছে, কিন্তু আমরা তো 'দশ আজ্ঞা'-কে শিখি শুধু একটি উদ্দেশ্যে,—বাইবেল-এর পরীক্ষায় পুরোহিতের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারি, আর সে ব্যাপারেও এ জ্ঞানটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। কাজেই যেসব গুরুজনদের মতামতকে আমি মূল্য দিতাম তাদের কেউ কোনদিন আমাকে বলে দেয় নি যে, আমি যা করছি সেটা অন্যায়। বরং আমার শ্রদ্ধেয় লোকদের বলতে শুনেছি যে কাজটা ঠিক। শুনেছি যে কাজটা করবার পরে আর কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও যন্ত্রণা থাকবে না। একথা শুনেছি এবং

পড়েছি। বড়দের বলতে শুনেছি, এটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল; সঙ্গীসাথীদের বলতে শুনেছি, এটাই ঠিক কাজ, বুদ্ধিমানের কাজ। কাজেই একাজের মধ্যে আমি খারাপ কিছু দেখিনি। রোগ-সংক্রমণের বিপদ? সে তো জানা কথাই। সহৃদয় সরকারই এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। স্কুলের ছেলেরা যাতে নিরাপদে তাদের বাসনা চরিতার্থ করতে পারে সেজন্য পতিতালয়গুলির উপর সতর্ক নজর রাখার ব্যবস্থা সরকারই করেছে। সেটা দেখবার জন্য সরকার থেকে বেতনভুক চিকিৎসক রাখা হয়েছে। আর সেটাই স্বাভাবিক। যেহেতু সরকার ধরে নিয়েছে যে যৌন-সম্ভোগ স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল সেইহেতু শোভন ও সুস্থ যৌনসম্ভোগের ব্যবস্থা তাকে করতেই হয়েছে। অনেক মায়েদের কথা আমি জানি যারা তাদের ছেলেদের জন্য এই ব্যবস্থা করে থাকে। বিজ্ঞানই যুবকদের পতিতালয়ে পাঠায়।"

"বিজ্ঞান?" আমি বললাম।

"চিকিৎসকরা কি বিজ্ঞানী নয়? বিজ্ঞানের পুরোহিত। তাদের স্বাস্থ্যের জন্যই ব্যভিচারের প্রয়োজন একথা বলে কারা আমাদের যুবকদের ব্যভিচারী করে তোলে? তারা। আর তারপরেই তারা মুখ গোমড়া করে উপদংশ রোগের চিকিৎসায় লেগে যায়।"

"সে কি! তাদের কি উপদংশ সারানো উচিত নয়?"

"উপদংশ সারাবার জন্য যত প্রচেষ্টা করা হয় তার দশ ভাগের এক ভাগও যদি ব্যভিচার দমনের কাজে করা হত তাহলে অনেককাল আগেই উপদংশ উধাও হয়ে যেত। কিন্তু আমাদের সব প্রচেষ্টা ব্যয় করা হয় যৌন-মিলনকে উৎসাহ দিতে, তাকে নিরাপদ করতে, তাকে নিশ্চিহ্ন করবার কাজে নয়। কিন্তু আসল কথা তা নয়। কথা হল, কেবল আমাদের সমাজের নয়, চাষী সমাজসহ সব সমাজের দশ ভাগের নয় ভাগ (বেশীও হতে পারে) ছেলের মতই আমি যে পাপ করেছি তার কারণ এ নয় যে কোন একটি বিশেষ নারীর আকর্ষণ আমি জয় করতে পারি নি। কোন স্ত্রীলোক আমাকে ভুলের পথে নামায় নি। আমি পাপ করেছি সেই সমাজের জন্য যে সমাজে আমি বাস করি; আমি পাপ করেছি কারণ আমার চারপাশের কিছু লোক আমার পাপকেই স্বাস্থ্যরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা বলে মনে করে, এবং অন্যরাও মনে করে যে একজন যুবকের পক্ষে এ ধরনের সুখ-সম্ভোগই স্বাভাবিক, এবং এটা শুধু যে ক্ষমার্হ তাই নয়, এটা সম্পূর্ণ নির্দোষ। আমি নিজেও এটাকে পাপ বলে মনে করি নি; আমি একাজ করেছি কিছুটা সুখের জন্য আর কিছুটা (আমাকে সেইরকমই বলা হয়েছে) একটা বিশেষ বয়সের প্রয়োজন মেটাবার তাগিদে; এর আগে যেভাবে ধূমপান করতে বা মদ খেতে শিখেছিলাম, ঠিক সেইভাবেই কামনা চরিতার্থ করতে শুরু করলাম। তবু এই প্রথম পতনকে ঘিরে একটা চমকপ্রদ ব্যতিক্রমের অভিজ্ঞতা আমার হয়ে-

ছিল। মনে পড়ে, সেইসময়, এমন কি ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগেই, একটা প্রচণ্ড দুঃখ আমাকে ঘিরে ধরেছিল, আমার কাঁদতে ইচ্ছা করছিল— সে কান্না আমার হারানো নিষ্পাপের জন্য, নারীর সঙ্গে যে সম্পর্কটা চিরদিনের মত হারিয়ে গেল তার জন্য। সেইদিনটি থেকে সে সম্পর্ক আর কখনও পবিত্রতার সম্পর্ক হতে পারবে না। আমি একটা লম্পট হয়ে গেলাম। আর লম্পট হওয়া মানেই একটা মাতাল, ধূমপায়ী বা নেশাখোরের মত দৈহিক অবস্থায় উপনীত হওয়া। একজন মাতাল, ধূমপায়ী অথবা নেশাখোর যেমন স্বাভাবিক মানুষ নয়, তেমনি যেলোক সুখভোগের জন্য কয়েকটি নারীকে গ্রহণ করেছে সেও স্বাভাবিক মানুষ নয়। সে চিরদিনের মত নষ্ট হয়ে গেছে, সে লম্পট হয়ে গেছে। আর একজন মাতাল বা নেশাখোরকে যেমন মুখ ও আচরণ দেখেই চেনা যায়, ঠিক তেমনি চেনা যায় একজন লম্পটকে। একজন লম্পট পাপকে প্রতিরোধ করতে পারে, তার বিরুদ্ধে লড়তে পারে, কিন্তু আর কোনদিন নারীর সঙ্গে পবিত্র, উজ্জ্বল, সরল সম্পর্ক—ভাই-বোনের সম্পর্কের কথা ভাবতেও পারে না। একজন লম্পট যে চোখে একটি যুবতীর দিকে তাকায় তা দেখেই তাকে তৎক্ষণাৎ চেনা যায়। আর আমিও লম্পট হয়ে গেলাম, আজও তাই আছি, আর সেই থেকেই আমার সর্বনাশের সূত্রপাত।"

পাঁচ

"এইভাবে বেশ কিছুদিন চলল; সেইসময় ঐ একই অভিজ্ঞতার আরও নতুন নতুন দিকের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটল। হা ঈশ্বর! আমার সেইসব পাশবিকতার কথা মনে করতেও আমার আতংক হচ্ছে! মনে পড়ছে, আমার তথাকথিত নির্দোষিতার জন্য বন্ধুরা আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করত। গিল্টি করা যুবকের দল! পদস্থ কর্মচারিবৃন্দ! অভিজাতগণ! মনে পড়ছে এইসব ভদ্রলোক আর আমি স্বয়ং সকলেই ত্রিশ বছর বয়সের ব্যভিচারী, সকলেই স্ত্রীজাতির বিরুদ্ধে নানা ধরনের অত্যন্ত ভয়ংকর শত শত অপরাধে অপরাধী। মনে পড়ছে, আমরা সব ত্রিশ বছর বয়সের ব্যভিচারীর দল সেজেগুজে, পরিষ্কার করে দাঁড়ি-গোঁফ কামিয়ে ধোপদুরস্ত জামাকাপড়ে আতর ছিটিয়ে, ফ্রককোট আর ইউনিফর্ম পরে বসবার ঘরে আর বলনাচের আসরে ঘুর ঘুর করে বেড়াতাম—কী সুন্দর!—যেন সব পবিত্রতার প্রতিমূর্তি!

"মুহূর্তের জন্য ভাবুন তো, কি হওয়া উচিত, আর কি হয়ে থাকে। এই ধরনের কোন ভদ্রলোক যখন আমার বোন বা মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে আসে তখন তার জীবনযাত্রার ধরণ-ধারণ জানি বলেই আমার উচিত তার কাছে গিয়ে তাকে একান্তে ডেকে নিয়ে শান্তভাবে বলা, 'শোন হে বাপু, তুমি কি ধরনের জীবন যাপন কর, কোথায় কার সঙ্গে রাত কাটাও সেসব আমি

জানি। এটা তোমার উপযুক্ত ঠাঁই নয়। এখানে সব পবিত্র, নির্দোষ মেয়েরা থাকে। চলে যাও।' ঠিক এই রকমটাই হওয়া উচিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরকমের কোন ভদ্রলোক এসে যখন আমার মেয়ে বা বোনের সঙ্গে নাচতে শুরু করে, তার কোমর জড়িয়ে ধরে তখন সে ভদ্রলোক যদি বিত্তমান হয়, যদি তার বড় বড় আত্মীয়-বন্ধু থাকে, তাহলেই আমরা আহ্লাদে আটখানা হই। রিলবুসে-তে রাত কাটিয়ে এসেও সে আমার মেয়েকে তার উপস্থিতি দিয়ে কৃতার্থ করতে পারে! সে কলঙ্কিতই হোক, আর রোগগ্রস্তই হোক, তাতে কিছু যায়-আসে না। আজকাল তো রোগ-নিরাময়ের নানারকম ব্যবস্থার কথাও তাদের জানা। আরে, বিখ্যাত পরিবারের এমন অনেক মেয়ের কথা আমি জানি যাদের বাবা-মা উপদংশ-রোগগ্রস্তদের সঙ্গে সানন্দে তাদের বিয়ে দিয়েছে! কী নীচ! কী ঘৃণ্য! একদিন নিশ্চয় আসবে যখন এই নীচতা ও প্রবঞ্চনার মুখোশ খুলে যাবে।"

বেশ কয়েকবার সেই অদ্ভুত শব্দটা করতে করতে সে চা খেতে লাগল: চা-টা ভয়াবহ রকমের কড়া, আর মিশিয়ে নেবার মত জলও সেখানে ছিল না। যে দু গ্লাস আমি খেয়েছি তার ফলই বেশ টের পাচ্ছি। সে নিজেও বেশ বুঝতে পারছে, কারণ সেও ক্রমেই বেশীমাত্রায় উত্তেজিত হয়ে উঠছে। তার কণ্ঠস্বর ক্রমেই সুস্পষ্ট ও সুরেলা হয়ে উঠছে। সে বার বার এ-পাশ ও-পাশ করছে, টুপিটা একবার খুলছে আর পরছে। যে আলো-ছায়ার মধ্যে আমরা বসেছিলাম তাতেই দেখতে পেলাম তার মুখের ভাব-ভঙ্গী বার বার পরিবর্তিত হচ্ছে।

"আর এইভাবে ত্রিশটা বছর কেটে গেল; কিন্তু তার মধ্যে মুহূর্তের জন্যও বিয়ে করার ইচ্ছা এবং একটি পবিত্র উন্নত পারিবারিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার বাসনা পরিত্যাগ করলাম না; বরং সেই উদ্দেশ্য নিয়ে একটি উপযুক্ত মেয়ের খোঁজ করতে লাগলাম। নিজে অবৈধ সঙ্গমের পাঁকে গড়াগড়ি খেতে খেতেই এমন একটি মেয়েকে খুঁজতে লাগলাম যে চারিত্রিক পবিত্রতার গুণে আমার স্ত্রী হবার যোগ্য হবে। তাদের অনেককে ফিরিয়ে দিলাম, কারণ তারা আমার পক্ষে যথেষ্ট পবিত্র নয়। শেষ পর্যন্ত এমন একজনকে পেলাম যাকে আমার উপযুক্ত বলে মনে হল। পেন্‌জা-র এক জমিদারের দুই কন্যার সে অন্যতমা। ভদ্রলোক একসময় খুবই বিত্তশালী থাকলেও তার টাকা-পয়সা প্রায় সবই খুইয়েছেন।

"একদিন রাতে সারাদিন নৌ-বিহার সেরে চাঁদের আলোয় আমরা যখন বাড়ি ফিরছিলাম, এবং একটা আটো পশমি জামা পরা তার সুগঠিত দেহ ও কোঁকড়া চুলের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে তার পাশেই বসেছিলাম, তখনই সহসা আমার মনে হল এই সেই মেয়ে। সেই সন্ধ্যায়ই আমার মনে হল আমার সব ভাবনা ও অনুভূতিকে সে উচ্চস্তরের বস্তু বলে বুঝতে

পেরেছে। আসলে সেই জামা ও কোঁকড়া চুলে তাকে এতই মানিয়েছিল, আর সারাটাদিন তার এত কাছাকাছি ছিলাম যে আমি তার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হতে চাইলাম।"

"সুন্দর মাত্রই ভাল—এই ভ্রান্ত ধারণা যে কত পরিপূর্ণ হতে পারে সেটাই বিস্ময়কর। একটি সুন্দরী নারী হয় তো অত্যন্ত বাজে কথা বলল, অথচ তার কথা শুনে আপনি ভাবছেন যে সে খুবই সুন্দর কথাবার্তা বলছে। সে যখন নীচ কথা বলছে আর নীচ কাজ করছে তখনও সেসব আপনার কাছে মনো-রম লাগছে। আর ঘটনাক্রমে সে যদি বাজে ও নীচ কথার বদলে সত্যি ভাল ভাল কথা বলে, তাহলে তৎক্ষণাৎ আপনার মনে হবে যে সে সততা ও জ্ঞানের রাণীস্বরূপা।

"উচ্ছ্বসিত মনে বাড়ি ফিরলাম; মনে স্থির বিশ্বাস, সে নৈতিক পূর্ণতার প্রতীক, আর তাই আমার স্ত্রী হবার যোগ্য। পরদিনই তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করলাম।"

"কিন্তু এসবই যে কতদূর মিথ্যা সেটা লক্ষ্য করুন। প্রতি এক হাজার বিবাহিত লোকের মধ্যে (দুর্ভাগ্যবশত শুধু আমাদের সমাজেরই নয়, নীচু শ্রেণীর লোকদের মধ্যেও) এমন একজনও পাওয়া যাবে না যে এর আগেই অন্তত দশ বার বিয়ে করে নি, এবং হয়তো ডন জুয়ান-এর মত একশ' বা এক হাজার বার বিয়ে করে নি। একথা সত্য, আমি শুনেছি এবং দেখেছি যে আজকাল এমন সব পবিত্রহৃদয় মানুষ আছে যারা জানে ও অনুভব করে যে এটা একটা মহৎ ও গুরুগম্ভীর কাজ, কোন তুচ্ছ কাজ নয়। ঈশ্বর তাদের প্রতি করুণা বর্ষণ করুন! কিন্তু আমার কালে প্রতি দশ হাজারে সেরকম একজনও ছিল না। একথা সকলেই জানে, অথচ না জানার ভান করে। সমস্ত উপন্যাসেই নায়কের হৃদয়াবেগের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়, যেসব ফুল ও জলাশয়ের পাশে সে ঘুরে বেড়ায় তার বর্ণনা দেওয়া হয়, কিন্তু কোন সুন্দরী যুবতীর প্রতি সুন্দর নায়কের মহৎ প্রেমের বর্ণনা দেবার সময় সেইসব উপন্যাসে এক-বারও বলা হয় না এর আগে সে কিভাবে দিন কাটিয়েছে—বলা হয় না পতিতালয়, বাড়ির দাসী, রাঁধুনি ও অপরের স্ত্রীদের কোন কথা। আর যদি কখনও সেধরনের অশোভন উপন্যাস লেখাও হয় তাহলে সে উপন্যাস পড়া এবং সেসব বিষয় জানা যাদের সব চাইতে বেশী দরকার সেইসব নিষ্পাপ তরুণীদের হাতে সেগুলি তুলে দেওয়া হয় না। প্রথম দিকে গুরুজনরা তরুণীদের বিশ্বাস করাতে চায় যে আমাদের শহর ও গ্রামের অর্ধেক জীবন জুড়েই যে লাম্পট্যের রাজত্ব সেটা সত্য নয়, ক্রমে এই মিথ্যা ধারণায় তারা এতদূর অভ্যস্ত হয়ে পড়ে যে শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের মত তারাও মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে শুরু করে যে তারা একটি উচ্চমানের নৈতিক জগতের উচ্চ নৈতিক ধারণার ধ্বজাধারী মানুষ। আর বেচারী তরুণীরা একান্তভাবে তাই বিশ্বাস

করে। আমার দুর্ভাগিনী স্ত্রীও ছিল এমনি একটি তরুণী। মনে পড়ছে, তার সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তার পরেই আমি তাকে আমার দিন-পঞ্জীখানা দিয়েছিলাম; সেটা পড়ে সে আমার অতীতটা জানতে পারবে, অন্ততঃ আমি যেটা তাকে একান্তভাবেই জানাতে চেয়েছিলাম—আমার সর্বশেষ প্রেমের ঘটনা—সেটা অন্তত সে জানতে পারবে। অন্যরা তো ব্যাপারটা তাকে বলেই দিত; তাই নিজে থেকে তাকে জানানোই আমি ভাল মনে করেছিলাম। মনে পড়ছে, সব জেনে, সব বুঝে তার সে কী আতংক, হতাশা আর বিমূঢ়তা। মনে হল, সে বুঝি সেইমুহূর্তেই সব বন্ধন ছিঁড়ে ফেলতে চাইবে। হায়রে, তাই যদি সে করত!"

সে আবার সেই শব্দটা করল, কথা থামিয়ে দিল। এক চুমুক চা খেল।

ছয়

"কিন্তু না! ভালই হয়েছিল, ভালই হয়েছিল!" সে চেঁচিয়ে বলল। "আমরা ন্যায্য পাওনাই পেয়েছি। কিন্তু এ গল্পে সেটা অবান্তর। আমি বলতে চেয়েছি এইসব দুর্ভাগিনী মেয়েরাই ফাঁকিতে পড়ে। তাদের মায়েরা সবই জানে, বিশেষ করে সেই মায়েরা নিজেদের স্বামীদের কাছ থেকেই সব কিছু জানতে পারে। তারা এমন ভান করে যেন পুরুষের পবিত্রতায় বিশ্বাস করে, কিন্তু ব্যবহার করে ঠিক তার উল্টো। কোন্ টোপ ফেলে নিজেদের জন্য এবং মেয়েদের জন্য পুরুষদের গাঁথতে হবে তাও তারা জানে।

"আমরা পুরুষরাই কিছু জানি না; জানি না কারণ জানতে চাই না; মেয়েরা ভাল করেই জানে, অত্যন্ত প্রশংসিত কাব্যময় তথাকথিত ভালবাসার জন্ম হয় নৈতিক গুণাবলী থেকে নয়, দৈহিক সান্নিধ্য, চুলের পারিপাট্য ও ফ্রকের রং ও কাটছাট থেকে। একটি ভদ্রলোককে মাত করতে ইচ্ছুক কোন অভিজ্ঞ প্রেমিকাকে জিজ্ঞাসা করুন সে কোন্ পথটা বেছে নেবে; তার উপস্থিতিতেই নিষ্ঠুরতা, প্রতারণা, এমন কি ব্যভিচারের অভিযোগ, না একটা কুৎসিত, বেখাপ্পা পোশাকে তার সামনে হাজির হওয়া। সে নির্ঘাৎ প্রথমটাই বেছে নেবে। সে জানে, আমরা পুরুষরা যখন মহৎ ভাবের কথা বলি তখন মিথ্যা বলি, আসলে আমরা চাই দেহ, আর তাই তার পাপকে ক্ষমা করলেও কদাপি তার কুৎসিত, বে-মাপ রুচিহীন পোশাককে ক্ষমা করব না। কোন ছলাকলাময়ী সচেতনভাবেই এটা জানে, আর একটি নির্দোষ যুবতী এটা জানে প্রবৃত্তিবশে, ঠিক যেভাবে জানে একটি পশু।

"এর থেকেই বোঝা যাবে ঐসব ঘৃণ্য পোশাক, ঐ খোলা ঘাড় ও বাহু, এবং প্রায়-খোলা বুকের অর্থ। মেয়েরা, বিশেষ করে যেসব মেয়ে পুরুষদের কাছ থেকে তাদের জ্ঞান আহরণ করে, ভালভাবেই জানে যে মহৎ প্রেমের কথা

শুধু কথাই, পুরুষ আসলে চায় দেহ আর যা কিছু সেই দেহকে আকর্ষণীয় করে তোলে, এবং তাই তারা পুরুষকে উপহার দেয়। সে অভ্যাস আমাদের প্রায় স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে, সেই আতস কাঁচের ভিতর দিয়ে না দেখে উচ্চ শ্রেণীর মানুষদের জীবনকে যদি আমরা এই সত্যের আলোয় দেখতে পারতাম, তাহলে দেখতাম যে সেই সমাজটাই একটা আসল পতিতালয়। আপনি মানেন না? দেখুন, আমি প্রমাণ করে দেব." আমাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়েই সে বলে চলল। "আপনি বলতে চান, আমাদের সমাজের মেয়েরা পতিতালয়ের মেয়েদের চাইতে ভিন্ন স্বার্থের দ্বারা চালিত, কিন্তু আমি বলছি আপনার সে ধারণা ভুল, আর সেটা আমি প্রমাণ করে দেব। মানুষের জীবনে যদি ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য থাকে, তাদের আন্তর-জীবন যদি আলাদা হয়, তাহলে তাদের জীবনের বহিরঙ্গও আলাদা হবে। কিন্তু যে দুর্ভাগিনীদের আমরা ঘৃণা করি, তাদের দিকে তাকিয়ে দেখুন, তারপর তাকান আমাদের উচ্চতম সমাজের যুবতীদের দিকে; সেই একই প্রসাধন, একই ফ্যাশন, একই গন্ধদ্রব্য, একই খোলা বাহু, ঘাড় ও বুক, দেহের পশ্চাৎভাগের সেই একই পোশাক-বাহুল্য, বহুমূল্য রত্নাদি ও দামী ঝকঝকে অলংকারের প্রতি সেই একই আসক্তি, সেই একই প্রমোদ-উপকরণ—নাচ, গান ও বাজনা। পুরুষকে প্রলুব্ধ করতে এক-জনরা যা করে, অন্যরাও ঠিক তাই করে থাকে। কোন পার্থক্য নেই। তাদের মধ্যে যদি একটা অতি সূক্ষ্ম ভেদ-রেখা টানতে হয় তাহলে এইটুকুমাত্র বলা যায় যে, স্বল্পমেয়াদী পতিতাদের সাধারণতই ঘৃণা করা হয়, আর দীর্ঘ-মেয়াদী পতিতাদের প্রতি দেখানো হয় সম্ভ্রম।"

সাত

"আর পোশাক, কোঁকড়া চুল ও পশ্চাতের সজ্জা-বাহুল্যের নাগপাশে আমিও আবদ্ধ হয়েছিলাম। আমাকে ধরা ছিল খুবই সহজ, কারণ কাঁকুড়ের বীজতলার মত এমন একটি বিশেষ আবহাওয়ার মধ্যে আমি মানুষ হয়েছিলাম যেখানে যুবকদের মধ্যে প্রেম-ভাবের আবির্ভাবকে সাহায্য করা হয়ে থাকে। প্রচুর পরিমাণে যে উত্তেজক খাদ্য ও পানীয় আমরা গ্রহণ করি, আর তার সঙ্গে যে পরিমাণ দৈহিক আলস্য উপভোগ করি, সে তো কামনাকে জাগিয়ে তোলারই নামান্তর মাত্র। আপনি অবাক হন আর নাই হন, আসল ব্যাপার তাই। কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমিও এটা বুঝতে পারি নি। কিন্তু আজ আমি সব বুঝেছি, আর বুঝেছি বলেই যখন দেখি যে অন্যরা তা বোঝে না এবং এখানকার ঐ স্ত্রীলোকটির মতই বাহবা পাবার মত সব কথাবার্তা বলে, তখন আমি বড়ই বিচলিত হয়ে পড়ি।

"এই বসন্তকালে আমার বাড়ির কাছেই কিছু চাষী রেলওয়েতে কাজ করছিল। একটি যুবক চাষীর স্বাভাবিক খাদ্য হল রুটি, কৃবাস ও পেঁয়াজ : তার ফলেই সে সজীব, হাসিখুশি ও কর্মক্ষম থাকে। সে যখন রেলওয়েতে কাজ করে তখন তার দৈনিক খাদ্য তালিকায় থাকে পরিজ আর এক পাউণ্ড মাংস। তাই খেয়ে সে দৈনিক ষোল ঘণ্টা ধরে ত্রিশ পুড (রুশ ওজন) ভারী একটা চাকা ঘোড়ায়। তাই এ খাদ্য তার উপযোগী। আর আমাদের বেলায় কি হয়? আমরা খাই দু পাউণ্ড মাংস, ক্যালরি-সমৃদ্ধ নানা খাদ্য ও পানীয়। সে খাওয়াকে কিভাবে কাজে লাগাই? অতিমাত্রায় ইন্দ্রিয়-সম্ভোগে। সবটা যদি সত্যি কাজে লাগান হয় তো ঠিক আছে, কারণ প্রকৃতিই সব ঠিক ঠিক ব্যবস্থা করে নেয়। কিন্তু সম্ভোগের পথটা যদি রুদ্ধ করে দেওয়া হয়, আমার বেলায় যেমন মাঝে মাঝে দেওয়া হত। তাহলে এমন একটা কামের উত্তেজনা দেখা দেয় যেটা আমাদের কৃত্রিম জীবনের আতস কাঁচের ভিতর দিয়ে প্রতি-ফলিত হয়ে একটা অতি-সংস্কৃত প্রেমের রূপে আত্মপ্রকাশ করে, এমন কি কখনও কখনও বিমূর্ত প্রেমের রূপেও দেখা দেয়। আর অন্য সকলের মত আমিও প্রেমে পড়লাম। প্রেমের সব লক্ষণই আমার মধ্যে প্রকাশ পেল : আবেগ, অনুরাগ, কাব্য···। আসলে কিন্তু আমার এই প্রেম সৃষ্টি হয়েছিল একদিকে তার মা ও দর্জির দ্বারা। আর অন্যদিকে অলস জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়েও যে অতিরিক্ত খাদ্য আমি খেতাম তার দ্বারা। একদিকে যদি না থাকত নৌ-বিহার, তার কটি-রেখা ও অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ফুটিয়ে তোলবার জন্য না থাকত কোন দর্জি, যদি আমার ভাবী স্ত্রী একটা বেখাপ্পা ড্রেসিং-গাউন পরে বাড়িই বসে থাকত, আর অন্যদিকে যদি মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার মান অনুযায়ী আমি ঠিক আমার কাজের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যটুকুই গ্রহণ করতাম, যদি আমার সামনে আবেগের বহিঃপ্রকাশের পথটা খোলা থাকত (সেইসময় সেটা বন্ধই ছিল), তাহলে আমিও প্রেমে পড়তাম না, আর তার জেরও আমাকে টানতে হত না।"

আট

কিন্তু ঘটনাচক্রে এসবই একত্র মিলে গেল; আমার শারীরিক অবস্থা, তার প্রসাধন, আর নৌ-বিহার। আগে আরও বিশবার তারা একসঙ্গে বাজে নি, কিন্তু এবার বাজল। ফাঁদে পড়ার মত ব্যাপার। ঠাট্টা নয়। আমাদের কালে ফাঁদ পাতার মত বিয়েটা আগেই ঠিক করা হত। আসলে কি ঘটত? একটি মেয়ের বয়স হয়েছে, তার বিয়ে দিতে হবে। মেয়েটি যদি কদাকার না হয়, আর বিবাহেচ্ছু ছেলে যদি থাকে,—তাহলে কাজটা বেশ সহজ, সরলই বটে। আগেকার দিনে এইভাবেই কাজটা হত। একটি মেয়ের

বয়স হলেই বাবা-মা তার জন্য একটি বর খুঁজে দিত। এই ব্যবস্থাই তখন ছিল, এবং এখনও অনেকের মধ্যেই এটাই প্রচলন—চীনা, ভারতীয়, মুসলমান ও আমাদের চাষীদের বেলায় তাই হয়ে থাকে। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার শতকরা অন্তত নিরানব্বই জনের বেলায় এইভাবেই কাজটা হয়ে থাকে। কিন্তু শতকরা একজন—আমাদের মত ব্যভিচারীরা—ঠিক করল যে এ ব্যবস্থাটা ভুল; তারা একটা নতুন ব্যবস্থার কথা ভাবল। সে নতুন ব্যবস্থাটা কি? সেটা এইরকম, মেয়েরা বসে থাকবে, আর ছেলেরা কোন মেলায় যেমনটি হয়ে থাকে তাদের সামনে আসা-যাওয়া করে মেয়েকে পছন্দ করবে। মেয়েরা সেখানে বসে থাকবে আর উচ্চকণ্ঠে বলবার সাহস না থাকায় মনে মনে বলবে, 'এই, আমাকে নাও! আমাকে! ওকে নয়, আমাকে! দেখ আমার ঘাড় এবং··· মানে···অন্য সবকিছু কত সুন্দর!' আর আমরা পুরুষরা পায়চারি করতে করতে তাদের দেখি, আর আমাদের সুবিধার জন্য এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে খুবই খুশি হই। আমরা হাঁ করে দেখি, আর সতর্ক না হলেই—বাস!—ধরা পড়ে গেলাম!"

"কিন্তু আর কিভাবে এটা হতে পারে?" আমি প্রশ্ন করলাম। "আপনি কি চান যে মেয়েরাই বিয়ের প্রস্তাব করবে?"

"আর কিভাবে হতে পারে আমি জানি না, কিন্তু যদি ধরে নেওয়া যায় যে নারী-পুরুষের সাম্য আছে, তাহলে সত্যিকারের সাম্যই হোক। আর যদি বাবা-মার দ্বারা বিয়ের ব্যবস্থাটা অপমানকর হয়, তাহলে এটা তো হাজারগুণ বেশী অপমানকর। প্রথম ক্ষেত্রে ভাল-মন্দর সম্ভাবনাটা সমান-সমান, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নারী হয় বাজারের পণ্য, ক্রীতদাসী, অথবা ফাঁদের একটা টোপ মাত্র। কিন্তু আপনি যদি সেই মেয়েকে (অথবা তার মাকে) বলেন যে তার একমাত্র কাজ একটি স্বামী পাকড়াও করা—হায় ঈশ্বর; তাহলে সে কী আপত্তি! অথচ আসলে সেই কাজটিই তো সে করছে; তার পক্ষে আর কিছু তো করবারও নেই। একটি তরুণ, নিষ্পাপ প্রাণী এই কাজ করছে দেখলেও খারাপ লাগে। তাও যদি সব ব্যাপারটাই খোলাখুলি করা হত, কিন্তু না, সবই করা হয় তলে তলে! 'আহা, The Orig n of the Species! কী চমৎকার! আমার লিজা ছবি আঁকতে লাগল! তুমিও প্রদর্শনীতে যেতে চাও? খুব ভাল! আর স্লেজ-বিহার, নাটক, ঐকতান-বাদন? অপূর্ব! আমার লিজা তো গানের নামে পাগল! তুমিও কেন তার সঙ্গে একমত হও না? আর নৌ-বিহার!···' অথচ সর্বক্ষণ তার একমাত্র চিন্তা হল; 'আমাকে নাও, আমাকে অথবা আমার লিজাকে! না, আমাকে! একবার দেখই না!' উঃ! মিথ্যাচার! ভয়াবহ!" আর এই কথা বলতে বলতে সবটুকু না শেষ করে সে গ্লাসগুলি সরিয়ে রাখতে লাগল।

নয়

থলেতে চা ও চিনি ভরতে ভরতে সে আবার শুরু করল, "আপনি হয় তো জানেন যে এ সকলেরই মূল কারণ নারীর আধিপত্য—এই পৃথিবীর বর্ণনাতীত দুঃখ-কষ্টের সেটাই তো উৎস।"

আমি বললাম, "নারীর আধিপত্য বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন? আইন তো পুরুষকেই সব সুবিধা দিয়েছে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক তাই," সে আমাকে বাধা দিয়ে বলল। "ঠিক এই কথাটাই আমি আপনাকে বলতে চেয়েছি; অপমানের একেবারে শেষ ধাপে ঠেলে দেওয়া সত্ত্বেও নারীর আধিপত্যের অসাধারণ ঘটনার ব্যাখ্যাও এতেই পাওয়া যাবে। একটি অপরটির ক্ষতিপূরণ করে, ঠিক যেভাবে ইহুদিরা যে উৎপীড়ন সহ্য করে তার ক্ষতিপূরণ তারা পায় টাকার বিনিময়ে অর্জিত ক্ষমতার মধ্যে। ইহুদিরা বলে, 'তাহলে আমরা টাকার বাট্টাদার ছাড়া আর কিছু হই তা তোমরা চাও না তো? ঠিক আছে, টাকার বাট্টাদার হিসাবেই আমরা তোমাদের উপর ক্ষমতার ছড়ি ঘুরাব।' তেমনি মেয়েরাও বলে, 'আহা, আমাদের তোমরা ইন্দ্রিয়-সম্ভোগের জীব বলেই তো মনে কর? খুব ভাল কথা, ইন্দ্রিয়-সম্ভোগের জীব হিসাবেই তোমাদের আমরা ক্রীতদাস করে রাখব।' নারীর যে ভোটের অধিকার নেই, বা সে যে বিচারক হতে পারে না, সেটা তার অধিকারচ্যুতির ব্যাপার নয়—এসব কাজ করতে পারা কোন অধিকারই নয়। তার অধিকারচ্যুতির প্রকৃত ব্যাপার হল যৌন জীবনে সে মানুষের সমান নয়, নিজের ইচ্ছামত কোন পুরুষের কাছে নিজেকে সমর্পণ করবার বা না করবার অধিকার তার নেই, পুরুষ তাকে বেছে নেওয়ার পরিবর্তে পুরুষকে বেছে নেবার অধিকার তার নেই।

"আপনি বলবেন এটা অবৈধ খুব ভাল। তাহলে তো পুরুষেরও সে অধিকার থাকা উচিৎ নয়। বর্তমানে পুরুষ যে অধিকার ভোগ করে নারী তা থেকে বঞ্চিত। আর তাই এই অধিকার হারানোর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ সে পুরুষের ইন্দ্রিয়াসক্তিকে কাজে লাগায়, আর তার ফলে তাকে এতদূর পদানত করে ফেলে যে পুরুষের পছন্দ করাটা তার নামমাত্র অধিকারে পর্যবসিত হয়। আসল পছন্দটা করে স্বয়ং নারী। উদ্দেশ্য সিদ্ধির এই উপায়টা একবার হাতে পাবার পরে সেই সুযোগে সে সমগ্র পুরুষ জাতির উপরেই প্রচণ্ড ক্ষমতা বিস্তার করে থাকে।"

"তার এই প্রচণ্ড ক্ষমতাটা কোথা থেকে আসে?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"কোথা থেকে আসে? সব কিছু থেকে, সব জায়গা থেকে। যেকোন বড় শহরের দোকানগুলোতে যান। সেখানে যেসব জিনিস দেখতে পাবেন

তার জন্য লক্ষ লক্ষ—গণনার অতীত—হাত পরিশ্রম করছে; অথচ দেখুন! এত সব দোকানের দশ ভাগের নয় ভাগ দোকানেও কি পুরুষের ব্যবহারের কোন জিনিস পাবেন? জীবনের যতকিছু বিলাস-সামগ্রী সবই স্ত্রীলোকের প্রয়োজন মেটায়, তারাই ব্যবহার করে। কারখানাগুলোতে যান। তাদের অধিকাংশতেই তৈরি হচ্ছে অপ্রয়োজনীয় গহনাপত্র, গাড়ি, আসবাব, মেয়েদের সব টুকিটাকি জিনিস। নারীর খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ বংশ বংশ ধরে ক্রীতদাসের মত এইসব কারখানার নিষ্ঠুর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে নিজেদের ধ্বংস করে চলেছে। নারীরা রাণীর মত মানবজাতির নয়-দশমাংশকে তাদের ক্রীতদাসের মত পরিশ্রম করতে বাধ্য করেছে। আর এসবের একমাত্র কারণ তাদের লাঞ্ছিত করা হয়েছে, পুরুষের সম-অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে। আর তাই আমাদের ইন্দ্রিয়াসক্তির সুযোগ নিয়ে তারাও আমাদের উপর প্রতিশোধ নিয়েছে—আমাদের ফাঁদে ফেলেছে। হঁ্যা, ঐ একই কারণে সব কিছু ঘটেছে। পুরুষের ইন্দ্রিয়াসক্তির উপর নারীর প্রভাব এতদূর বিস্তৃত হয়েছে যে তার সামনে পুরুষ তার মেজাজ ঠাণ্ডা রাখতে পারে না। নারীর সঙ্গ লাভ করামাত্রই পুরুষ যেন নেশার বশে অবশ হয়ে পড়ে। আগে আগে কোন নারীকে নাচের পোশাকে সুসজ্জিত দেখলেই আমি কেমন কুঁকড়ে যেতাম, অস্বস্তি বোধ করতাম। কিন্তু এখন আমি আতংকিত হয়ে উঠি, কারণ নারীর মধ্যে আমি দেখি ভয়ংকরীকে, নিয়মের অপহ্নবকে; মনে মনে আমি কারও সাহায্য চাই, পুলিশকে ডাকতে চাই, আমি চাই যে এই বিপদকে সরিয়ে নিয়ে হাজতে বন্ধ করে রাখা হোক।

"হাসছেন?" আমার দিকে তাকিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল। "এতে হাসবার কিছু নেই। আমি নিশ্চিত জানি, সে দিন আসবে, হয়তো শীঘ্রই আসবে, যখন সব মানুষ এটা বুঝতে পারবে এবং এই ভেবে বিস্মিত হবে যে একদা এমন সমাজ ছিল, যেখানে পুরুষের ইন্দ্রিয়াসক্তিকে উত্তেজিত করবার প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য নিয়ে নারীদেহকে অলংকারে সজ্জিত করবার মত শান্তি-বিঘ্নকারী ব্যবস্থাকে চলতে দেওয়া হত। আরে, এটা তো যেপথে মানুষ হাঁটে সেই-পথের উপর ফাঁদ পেতে রাখার মতই ব্যাপার। তার চাইতেও খারাপ! এটা কি করে হয় যে জুয়াখেলা নিষিদ্ধ, কিন্তু পুরুষের কামনাকে উত্তেজিত করবার জন্য মেয়েদের বেশ্যাসুলভ সূক্ষ্ম পোশাকে সাজানোটা নিষিদ্ধ নয়? এটা তো আরও হাজার গুণ বেশী বিপজ্জনক!"

দশ

"আর এইভাবে, আগেই বলেছি, আমি ধরা পড়লাম। তাদের ভাষায়, আমি 'প্রেমে পড়লাম।' শুধু যে তাকেই পূর্ণতার পরাকাষ্ঠা বলে মনে হল

তাই নয়, প্রাক-বিবাহ দিনগুলিতে নিজেকেও তাই মনে হতে লাগল। আসলে এমন কদাচারি মানুষ কোথাও নেই যে কোন না কোন বিষয়ে তার চাইতেও খারাপ একটি লোককে খুঁজে পায় না ; কাজেই নিজে গর্ববোধ করবার ও আত্মতুষ্ট থাকবার একটা যুক্তি সে পেয়ে যায়। আমারও সেই অবস্থা হল : আমি টাকার জন্য বিয়ে করছি না ; আমার পরিচিতদের মধ্যে অনেকেই বিয়ে করেছে হয় টাকার জন্য, নয় তো বড় বড় আত্মীয়-স্বজন লাভের জন্য ; কিন্তু কোনরকম লোভ আমাকে বিয়ের দিকে টানে নি ; আমি ধনী, আর সে ছিল গরীব। এই হল একটা দিক। আর একটা দিক হল, অনেকেই বিয়ে করে এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে বিয়ের পরেও তারা আগেকার অভ্যাসমতই বহু নারী-সঙ্গের ভিতর দিয়েই জীবন কাটাবে, কিন্তু আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলাম যে বিয়ের পরে সম্পূর্ণ একনিষ্ঠ জীবন যাপন করব, আর তার ফলে নিজের সম্পর্কে আমি বর্ণনাতীত গর্ববোধ করতে লাগলাম। সত্যি একটা ঘৃণ্য শুয়োরের বাচ্চা হয়েও নিজেকে আমি একজন সন্ত বলে কল্পনা করেছিলাম।

"আমার পূর্বরাগ বেশীদিন স্থায়ী হল না। সেদিনের কথা মনে হলেই লজ্জায় আমি লাল হয়ে উঠি। আমরা ধরে নেই যে এই সময়টা আধ্যাত্মিক প্রেমের কাল, দেহজ ভালবাসার কাল নয় ; কিন্তু এটা যদি আধ্যাত্মিক প্রেম হয়, আধ্যাত্মিক মিলন হয়, তাহলে আমাদের কথা, আমাদের আলোচনা, আমাদের সংলাপেও তো এই আধ্যাত্মিক মিলন প্রতিফলিত হওয়া উচিত। কিন্তু তা তো হত না। যখনই আমরা একাকি থাকতাম তখনই কথা বলাই দুঃসাধ্য হত, অনেক চেষ্টা করে কথা বলতে হত। কি যে বলব তা ভাবতেই অনেক সময় কেটে যেত। সেটা বলেই আবার চুপ করে যেতাম, এবং আবার কি বলা যায় সেটা ভাবতে চেষ্টা করতাম। বলবার মত কোন কথাই থাকত না। আমাদের ভবিষ্যৎ মিলিত জীবনযাত্রা, তার পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা সম্পর্কে যা কিছু বলা যেতে পারত সব তো আগেই বলা হয়ে গেছে। আর কি বলবার আছে? আমরা যদি জানোয়ার হতাম তাহলে জানতাম যে আমরা কথা বলি এটা কেউ আশা করে না ; কিন্তু আমরা তো মানুষ, তাই আমরা কথা বলব এটাই প্রত্যাশিত, অথচ বলবার মত কোন কথা নেই, কারণ যে জিনিস তখন আমাদের মনে জাগত সেটা কোন আলোচনার যোগ্য বিষয়বস্তু নয়। আর এসবের উপরে সেই বিরক্তিকর প্রথা—চকোলেট, পেট-ভর্তি মিষ্টি আর বিবাহসংক্রান্ত যতসব বাজে উদ্যোগ-আয়োজন—বাড়ি ঠিক করা, শোবার ঘর, বিছানাপত্র, ড্রেসিং-গাউন, জামা-কাপড়, পোশাকের ঘর। বুঝতেই তো পারছেন, ঐ বৃদ্ধ লোকটি যে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সমর্থন করে গেলেন তদনুযায়ী যৌতুক, খাট পালংক, পালকের বিছানা—বিবাহ রহস্যকে ঘিরে তো এই সবই থাকে। কিন্তু আজকাল যখন দশজন

বিবাহেচ্ছুর একজনও এই রহস্যে বিশ্বাস করে না, এমন কি সে যেকাজ করতে যাচ্ছে, তার যে কোন দায়িত্ব আছে তাও মনে করে না, যখন প্রতি একশ' জনে একজনও এমন লোক পাওয়া যায় না যে এই বিয়ের আগেই আরও বিয়ে করেছে, এবং প্রতি পঞ্চাশ জনে একজনও পাওয়া যাবে না যে প্রথম সুযোগেই তার স্ত্রীকে ঠকাতে চেষ্টা করবে না, যখন অধিকাংশ লোকই বিয়ের সময়কার গীর্জার অনুষ্ঠানকে একটি স্ত্রীলোকের মালিকানা অর্জনের শর্ত মাত্র বলে মনে করে—এসব কথা যখন আপনি ভাবেন তখনই এইসব প্রস্তুতির ভয়াবহ অর্থ পরিষ্কার হয়ে ওঠে। মনে হয়, এগুলিই আসল কথা। মনে হয়, এ তো একধরনের কেনা-বেচা; একটি নির্দোষ মেয়েকে বিক্রি করে দেওয়া হয় একটি লম্পট পুরুষের কাছে, আর সেই বিক্রয়-ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করা হয় নানা উপযুক্ত অনুষ্ঠান।''

এগার

"এইভাবেই সকলেরই বিয়ে হয়, আর আমিও এইভাবে বিয়ে করে বহু গীত মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে বের হলাম। নামটাই কী অসভ্য!" তীব্র ঘৃণার সঙ্গে সে কথাটা উচ্চারণ করল। "প্যারিসে একবার আমি নানা ধরনের বীভৎস জীবের একটা প্রদর্শনী দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখেছিলাম একটি দাড়িওয়ালা স্ত্রীলোক ও আধা-মৎস একটা কুকুর। পরে জেনেছিলাম, দাড়িওয়ালা স্ত্রীলোকটি আসলে একটি পুরুষ, তাকে মেয়েদের পোশাক পরানো হয়েছে, আর কুকুরটাকে একটা সিল মাছের চামড়ার মধ্যে ঢুকিয়ে বাথ-টবে সাঁতার কাটানো হয়েছে। দেখবার মত বিশেষ কিছুই সেখানে ছিল না, কিন্তু আমি যখন বেরিয়ে আসছিলাম তখন ঘোষক আমাকে দেখিয়ে জনতাকে বলতে লাগল, 'এই যে, এই ভদ্রলোককেই জিজ্ঞেস করুন, সত্যি দেখবার মত জিনিস কি না! টিকিট সংগ্রহ করুন! টিকিট সংগ্রহ করুন! মাত্র এক ফ্রাঁ!' প্রদর্শনীটা যে মোটেই দেখার মত নয় সেটা বলতে আমার লজ্জা করল। আর ঘোষকটিও সেটা ঠিকই জানত। আমার তো মনে হয়, মধুচন্দ্রিমার বিরক্তিকর অভিজ্ঞতা যাদের আছে তাদেরও ঐ অবস্থাই হয়, অন্যের মোহভঙ্গ করতে তারা লজ্জাবোধ করে। আমিও অপরের মোহভঙ্গ করি নি, কিন্তু আজ আর সত্য গোপন করার কোন কারণ দেখছি না। এমন কি সত্যকথা বলাই আমার কর্তব্য বলে মনে করি। আমার মধুচন্দ্রিমা হয়েছিল হতবুদ্ধিকর, লজ্জাজনক, ঘৃণ্য, করুণ, এবং সর্বোপরি—একঘেয়েমিতে ভরা। বর্ণনাতীত একঘেয়েমি। প্রথম যখন ধূমপান করতে শিখেছিলাম অনেকটা সেইরকম; মুখে লালা উঠত, ফেলে দিতে ইচ্ছা করত, কিন্তু লালাটা গিলে ফেলে এমন ভান করতাম যেন খুব মজা পেয়েছি। ধূমপানের

মজাটা আসে পরে, অবশ্য যদি আসে; এব্যাপারটাও সেইরকম : এই পাপ থেকে কোন সুখ পেতে হলে দম্পতিকে ভালভাবে সেটা শিখতে হবে।"

"আপনি বলছেন পাপ?" আমি বললাম। "কিন্তু আপনি তো মানুষের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক একটা কাজের কথাই বলছেন।"

সে বলল, "স্বাভাবিক? না, আমি বলতে বাধ্য যে আমার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বিপরীত—এটা প্রকৃতিবিরুদ্ধ, অত্যন্ত অস্বাভাবিক। ছোট ছেলেমেয়েদের জিজ্ঞাসা করুন। নিষ্পাপ তরুণীদের জিজ্ঞাসা করুন। খুব অল্প বয়সে আমার বোনের বিয়ে হয়েছিল তার দ্বিগুণ বয়সী একটি লম্পট পুরুষের সঙ্গে। আজও মনে পড়ে, বিয়ের রাতে সে যখন ম্লান মুখে কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে চীৎকার করে বলেছিল, সে চায় না. কোন কিছুর জন্যই না, কোন কিছুর জন্যই না. তখন আমরা কতদূর বিস্মিত হয়েছিলাম! স্বামীটি তার কাছে কি চেয়েছিল সেটা বোঝাবার মত ভাষাও সে খুঁজে পায় নি!

"আর আপনি এটাকে বলছেন স্বাভাবিক! অনেক স্বাভাবিক জিনিস আছে। এমন জিনিস আছে যা প্রথম থেকেই সুখকর, আনন্দদায়ক ও লজ্জা-বিহীন। কিন্তু এটা তা নয়। এটা তো ঘৃণ্য, লজ্জাকর, বেদনাদায়ক। না, এটা স্বাভাবিক নয়। এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস একটি নিষ্পাপ বালিকা সব-সময়ই এটাকে ঘৃণা করে।"

আমি বললাম, "কিন্তু তাহলে মানব জাতির অস্তিত্ব অক্ষুণ্ন থাকবে কেমন করে?"

"মানব জাতির অস্তিত্ব অক্ষুণ্ন থাকবে কেমন করে?" এই স্বাভাবিক ও লজ্জাজনক প্রশ্নটাই যেন সে প্রত্যাশা করছিল এমনিভাবে বিদ্রূপের সঙ্গে সে আমার কথাগুলিরই প্রতিধ্বনি করল। ইংরেজ লর্ড মহোদয়গণ যাতে আকণ্ঠ খেতে পারেন সেজন্য জন্ম-নিয়ন্ত্রণের কথা প্রচার করা চলতে পারে; অবাঞ্ছিত ফলের হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে মজা লুটবার জন্যও জন্ম-নিয়ন্ত্রণের কথা প্রচার করা চলতে পারে; কিন্তু যেই নৈতিকতার নামে কেউ জন্ম-নিয়ন্ত্রণের কথা প্রচার করতে মুখ খুলল—আঃ, অমনি কী সোরগোলই না পড়ে যায়! একডজন বা দু'ডজন মানুষ যদি স্থির করে যে শুয়োরের জীবন তো অনেক হয়েছে, আর নয়, তাহলেই মানব জাতির অস্তিত্ব কেমন করে অক্ষুণ্ন থাকবে? কিন্তু আমাকে ক্ষমা করবেন। ঐ আলোটায় আমার কষ্ট হয়। ওটাকে ঢাকা দিলে কি আপনি আপত্তি করবেন?" বাতিটা দেখিয়ে সে বলল।

আমি বললাম যে আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। তখন সে বেঞ্চির উপর উঠে পর্দাটা টেনে দিয়ে আলোটা ঢেকে দিল।

আমি বললাম, "তথাপি প্রত্যেকেই যদি আপনার ধারণা মত চলে তাহলে তো মানব জাতির বিলুপ্তি ঘটবে।"

সঙ্গে সঙ্গে সে কোন জবাব দিল না।

পুনরায় আমার বিপরীত দিককার একটা আসনে বসে পা দুটি ছড়িয়ে দিয়ে হাঁটুর উপর কনুই রাখবার জন্য ঝুঁকে পড়ে সে বলল, "মানব জতির অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে আপনি এত চিন্তিত হয়ে পড়েছেন কেন ?"

"তাও জিজ্ঞাসা করছেন ? নইলে যে আপনি ও আমিও থাকতাম না।"

"আমাদের থাকতেই বা হবে কেন ?"

"বাঁচবার জন্য।"

"আমরা বাঁচবই বা কেন ? জীবনের যদি কোন লক্ষ্য না থাকে, জীবনই যদি জীবনের শেষ কথা হয়, তাহলে তো বেঁচে থাকবার কোন অর্থই থাকে না। একথা যদি সত্য হয় তাহলে শোপেনহাওয়ার এবং হার্টম্যান এবং বৌদ্ধরা তো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু জীবনের যদি কোন লক্ষ্য না থাকে, তাহলে তো সেই লক্ষ্যে পৌছনো মাত্রই জীবনের অবসান ঘটা উচিত। এই তো একমাত্র সিদ্ধান্ত," বেশ উত্তেজিতভাবে সে কথাগুলি বলতে লাগল। "এই তো একমাত্র সিদ্ধান্ত। লক্ষ্য করুন : যদি মানব জীবনের লক্ষ্য হয় কল্যাণ, দয়া, ভালবাসা ; যদি মানব জীবনের লক্ষ্য হয় দৈববাণীর সেই উক্তি যে সব মানুষকে প্রেমে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, তরবারি ফেলে লাঙলের ফলা হাতে তুলে নিতে হবে, ইত্যাদি, তাহলে সে লক্ষ্যে পৌছতে আমাদের কে বাধা দিচ্ছে ? বাধা দিচ্ছে আমাদের কামনা। আর সব কামনার মধ্যে সব চাইতে শক্তিশালী, সব চাইতে দুরন্ত ও অনড় হল যৌন, দেহজ ভালবাসা ; সুতরাং কামনাকে যদি বশীভূত করা যায়, বিশেষ করে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এই দেহজ কামনাকে যদি পরাভূত করা যায়, তাহলে সে দৈববাণী পূর্ণ হবে, মানব জাতি একসূত্রে আবদ্ধ হবে, মানব জীবনের লক্ষ্য অর্জিত হবে, এবং তখন যার জন্য বেঁচে থাকা তেমন কিছুই আর থাকবে না। মানুষ যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিনই সে আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হবে ; কিন্তু সেটা শুয়োর বা খরগোসের মত যত বেশী সংখ্যায় সম্ভব সন্তানের জন্ম দেওয়ার আদর্শ নয়, অথবা যৌন সম্ভোগ থেকে যথাসম্ভব সুস্থ ও সুন্দর আনন্দ লাভের যে আদর্শ বাঁদর বা প্যারিসিয়রা অনুসরণ করে থাকে সে আদর্শও নয়। সে আদর্শ হল সংযম ও পবিত্রতার ভিতর দিয়ে অর্জিত কল্যাণের আদর্শ। এই আদর্শ লাভের জন্য মানুষ এতদিন চেষ্টা করেছে, এবং সর্বদাই চেষ্টা করবে। কিন্তু তার ফল হয়েছে দেখুন।

"ফল তো এই হয়েছে : মনে হয় দেহজ ভালবাসা নিরাপত্তার একটি উপায়। এ যুগের মানুষ মানব জাতির লক্ষ্যে পৌছতে পারে নি, আর পারে নি তার কামনার জন্য, এবং সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হচ্ছে যৌন কামনা। যৌন কামনা থেকে নতুন যুগ জন্মলাভ করে, সেই নতুন যুগের সামনে লক্ষ্যে পৌছবার সুযোগ আসে ; কিন্তু নতুন যুগের মানুষও সে লক্ষ্যে পৌছতে পারে না ; কাজেই পরবর্তী যুগের কাছে সে সুযোগ দেখা দেয়, তারপর পরবর্তী যুগ,

তারও পরবর্তী যুগ, এমনি করে চলতে থাকে যতদিন লক্ষ্য অর্জিত না হয়, যতদিন দৈববাণী পূর্ণ না হয়, যতদিন সমগ্র মানবজাতি ঐক্যবদ্ধ না হয়। এর অন্যথা কেমন করে হবে? কল্পনা করা যাক, একটা বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্য ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করলেন, কিন্তু সৃষ্টি করলেন হয় যৌন প্রবৃত্তিবিহীন মরণশীল করে, অথবা অমর করে। যদি তিনি মানুষকে যৌন প্রবৃত্তিবিহীন মরণশীল জীব করে সৃষ্টি করেন, তাহলে ফল কি দাঁড়াবে? যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিনে লক্ষ্যে না পৌঁছেই তারা মারা যাবে, এবং লক্ষ্য অর্জনের জন্য ঈশ্বরকে নতুন মানুষ সৃষ্টি করতে হবে। যদি তিনি তাদের অমর করে সৃষ্টি করেন তাহলে হয়তো এটা সম্ভব (যদিও একই লোকের পক্ষে নিজেদের ভুল সংশোধন করাটা নতুন নতুন লোকের পক্ষে পূর্ববর্তীদের ভুল সংশোধন করে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হওয়ার চাইতে বেশী শক্ত)—আমি বলছি, হয়তো এটা সম্ভব যে কয়েক হাজার বছর পরে তাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে। কিন্তু তখন ঐ অমর মানুষরা কি করবে? তাদের নিয়ে কি করা হবে? না, অবস্থা যা আছে তাই ভাল। কিন্তু আমার এই সব কথায় হয় তো আপনার আপত্তি আছে? আপনি হয়তো বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী? ফল কিন্তু একই। অন্যান্য জন্তু জানোয়ারের সঙ্গে সংগ্রাম করে বাঁচবার জন্য জীব-জগতের সর্বোচ্চ সৃষ্টি হিসাবে মানুষকে এক ঝাঁক মৌমাছির মত ঐক্যবদ্ধ হতে হবে; সীমাহীন প্রজননের দিকে তাদের ঝোঁকা চলবে না। মৌমাছিদের মতই মানুষকেও যৌনতাহীন ব্যক্তি গড়ে তুলতে হবে, অর্থাৎ আমাদের বর্তমান সমাজের মত যৌন-প্রবৃত্তির কাছে মাথা না নুইয়ে তাদের চারিত্রিক শুদ্ধতার দিকে পা বাড়াতে হবে।" এই পর্যন্ত বলে সে একটু থামল। "মানব জাতির বিলুপ্তি? কিন্তু মতামত যাই হোক, তার অনিবার্যতায় কি কারও সন্দেহ থাকতে পারে? সে তো মৃত্যুর মতই নিশ্চিত। সব পবিত্র বাণীতেই পৃথিবীর ধ্বংসের পূর্বাভাস রয়েছে, আর সব বৈজ্ঞানিক শিক্ষারও সেই একই কথা। তাহলে নীতি-শিক্ষাও যদি সেই একই পরিণামের নির্দেশ দেয় তাহলে সেটা কি খুবই বিস্ময়কর হবে?

এরপরে সে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। আরও চা খেল, সিগারেটটা শেষ করল, থলে থেকে নতুন সিগারেট বের করে পুরনো দাগ লাগা সিগারেটকেসটায় ভরল।

আমি বললাম, "আপনার কথাগুলো আমি বুঝতে পেরেছি। 'শেকার'রাও এই কথাই বলে।"

সে বলল, "তারা ঠিকই বলে। যেকোন রূপেই দেখা দিক না, যৌনকামনা মাত্রই পাপ, ভয়াবহ পাপ; তাকে প্রতিহত করতে হবে, আমাদের মত তাকে উৎসাহ দেওয়া চলবে না। যে পুরুষ কোন স্ত্রীলোকের প্রতি কামনার দৃষ্টিতে তাকায় সেই তার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়—বাইবেল-এর

এই বাণী শুধু অপরের স্ত্রীর বেলায়ই প্রযোজ্য নয়, বরং প্রধানতঃ আমাদের নিজেদের স্ত্রীদের বেলায়ও প্রযোজ্য।"

বারো

"আমাদের জগতের সব কিছুই উল্টো। অবিবাহিত অবস্থায় একটি লোক যদি সংযম অভ্যাস করে, সেও বিয়ে করার সঙ্গে সঙ্গেই সে সংযমকে আর প্রয়োজনীয় বলে মনে করে না। আসলে বিয়ের পরে এই যে প্রমোদ ভ্রমণ, এই যে বাবা-মার সম্মতিক্রমেই যুবক যুবতীরা নির্জন বাসে চলে যায়,—এটা তো লাম্পট্যের অনুমোদন ছাড়া আর কিছুই নয়! কিন্তু নৈতিক নিয়মকে লংঘন করলে তার শাস্তি হবেই। আমাদের ছুটিটাকে মধুচন্দ্রিমা যাপনে রূপান্তরিত করবার জন্য অনেক চেষ্টা করেও আমি সফল হতে পারলাম না। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা লজ্জাজনক, বিরক্তিকর ও একঘেয়ে লাগল। কিন্তু শীঘ্রই ব্যাপারটা কষ্টকর হয়ে উঠল। বড় বেশী তাড়াতাড়ি। তৃতীয় বা হয়তো চতুর্থ দিনেই দেখলাম আমার স্ত্রী বেশ মনমরা হয়ে পড়েছে; এর কারণ জিজ্ঞাসা করে আমি তাকে আদর করতে শুরু করলাম; ভাবলাম সেটাই সে চাইছে; কিন্তু সে আমার হাত সরিয়ে দিয়ে কাঁদতে লাগল। কেন? তা সে আমাকে বলতে পারল না। কিন্তু সে খুব অসুখী, তার অবস্থা শোচনীয়। হয়তো তার স্নায়ুর চাপই তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল আমাদের সম্পর্কটা কতদূর ঘৃণ্য, কিন্তু মুখে সে কিছুই বলতে পারল না। আমি চাপ দেওয়াতে সে কোন-রকমে মায়ের অভাবের কথা বলল। বুঝলাম, সেটা আসল কথা নয়। মা সম্পর্কে সে যা বলল সে কথাকে উপেক্ষা করে আমি তার সঙ্গে খুনশুটি শুরু করে দিলাম। সে যে সত্যি দুঃখিত হয়েছে এবং অজুহাত হিসাবেই মায়ের কথা বলেছে সেটা আমি বুঝতে পারি নি। কিন্তু তার কথায় বিশ্বাস না করার জন্য এবং তার মাকে উপেক্ষা করার জন্য সে আমার উপর চটে গেল। সে জানাল, আমি যে তাকে ভালবাসি না সেবিষয়ে সে নিশ্চিত। এই খামখেয়া-লিপনার জন্য তাকে দোষারোপ করতেই হঠাৎ তার মুখের ভাব সম্পূর্ণ বদলে গেল; দুঃখের বদলে সেখানে বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠল এবং অত্যন্ত তিক্ত ভাষায় সে আমার বিরুদ্ধে স্বার্থপরতা ও নিষ্ঠুরতার অভিযোগ করতে লাগল। তার দিকে তাকালাম; সারা মুখে তীব্র নিস্পৃহতা ও বিরোধিতা—এমন কি আমার প্রাপ্ত ঘৃণারভাব ফুটে উঠেছে, আমি কতদূর মর্মাহত হয়ে-ছিলাম। ভাবলাম, 'এ আবার কি? ভালবাসার বদলে, আত্মার সঙ্গে আত্মার মিলনের বদলে—এই। অসম্ভব! সে আর তাতে নেই।' তাকে শোধরাতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু নিস্পৃহতার এমন একটা তীব্র প্রতিরোধের দেয়াল সে আমার সামনে তুলে ধরল যে নিজের অজান্তেই আমিও খুব রেগে গেলাম এবং

দুজন দুজনকে যাচ্ছেতাই সব কথা বলে ফেললাম। সেই প্রথম ঝগড়া আমার উপর একটা ভয়ংকর প্রভাব বিস্তার করল। আমি এটাকে ঝগড়াই বললাম, কিন্তু আসলে এটা ঝগড়া নয়; আমাদের দুজনের মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান ছিল এটা তারই প্রকাশ। কামনা পরিতৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের ভালবাসা উবে গিয়েছিল। এবার আমরা সত্যিকারের সম্পর্ক নিয়ে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়ালাম; সে সম্পর্ক পরস্পরের কাছ থেকে সর্বাধিক পরিমাণ সুখের প্রত্যাশী দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত ও সম্পূর্ণ স্বার্থপর মানুষের সম্পর্ক।

"যা ঘটেছিল তাকে আমি বললাম ঝগড়া, কিন্তু এটা ঝগড়া নয়; যৌন কামনার নিবৃত্তির ফলে আমাদের সত্যিকারের সম্পর্কটাই তখন উদ্ঘাটিত হয়েছিল। এই উদাসীন বিরোধিতার ভাবটাই যে আমাদের স্বাভাবিক সম্পর্ক সেটা আমি বুঝতে পারি নি; বুঝতে পারি নি কারণ অচিরেই ইন্দ্রিয়াবেগের একটা নতুন ঢেউ, ভালবাসার একটা নতুন ঢেউ এসে এই বিরোধিতার মনোভাবকে চোখের সামনে থেকে আড়াল করে দিয়েছিল।

"ভাবলাম, ঝগড়া হয়েছিল মিটে গেল; এমন কাজ আমরা আর কখনও করব না। কিন্তু মধুচন্দ্রিমা যাপনের সেই প্রথম মাসেই দেখতে দেখতে এমন একটি অতিতৃপ্তির স্তরে গিয়ে আমরা পৌঁছলাম যে পরস্পরকে আমাদের আর কোন দরকারই রইল না, আর তার ফলেই দেখা দিল আর একটা ঝগড়া। প্রথমটা অপেক্ষা দ্বিতীয় ঝগড়াটা আমার কাছে আরও বেদনাদায়ক মনে হল। ভাবলাম, 'তাহলে তো প্রথম ঝগড়াটা মোটেই আকস্মিক ছিল না। সেটাই তো ছিল প্রত্যাশিত এবং বার বারই তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে।' দ্বিতীয় ঝগড়ার ফলে আমি বিশেষভাবে আহত হয়েছিলাম কারণ সেটা ঘটেছিল একটা অত্যন্ত তুচ্ছ কারণে—টাকাপয়সার ব্যাপারে, অথচ সেবিষয়ে আমি কোনদিনই মিতব্যয়ী নই এবং আমার স্ত্রীর খরচপত্র নিয়ে নিশ্চয় কোনরকম আপত্তিও করতাম না। মনে পড়ে, আমার কোন কথার সে এমন বাঁকা অর্থ করে যার মানে দাঁড়ায় যে, টাকার জোরে আমি তার উপর অধিকার অর্জন করেছি এবং আমার টাকা পয়সা খরচ করবার অধিকার একমাত্র আমারই আছে, অথবা এই ধরনেরই কোন নীচ, অর্থহীন মন্তব্য যেটা আমাদের উভয়ের পক্ষে অনুপযুক্ত। রেগে গিয়ে আমি তার বিরুদ্ধে বোকামির অভিযোগ করলাম, সেও পাল্টা জবাব দিল, আর আবার ঝগড়া বেধে গেল। তার কথায়, চোখ মুখের ভাবে আমি আবার দেখতে পেলাম সেই উদাসীন, নিষ্ঠুর বিরোধিতা যা দেখে প্রথমবারে আমি মর্মাহত হয়েছিলাম। মনে পড়ে, দাদার সঙ্গে, বন্ধুদের সঙ্গে, এমন কি বাবার সঙ্গেও আমার ঝগড়া হয়েছে, কিন্তু এখানে যে বিষাক্ত বিদ্বেষের প্রকাশ দেখলাম, তা আগে কখনও দেখি নি।

"যা হোক, সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই ভালবাসার টানে, অর্থাৎ যৌন আকর্ষণের টানে পারস্পরিক ঘৃণার উপর আবারও যবনিকা নেমে এল; আবারও এই-

ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দিলাম যে এ দুটি ঝগড়াই ভুলের ফসল, এবং তাকে সংশোধন করা যাবে। কিন্তু তারপরেও ঘটল তৃতীয় এবং চতুর্থ ঝগড়া ; তখন আমি চিরদিনের মত বুঝতে পারলাম যে এগুলো আকস্মিক ঘটনা নয়, এগুলিকে তখনও পরিহার করা যেত না আর ভবিষ্যতেও পরিহার করা যাবে না ; তাই ভবিষ্যতের চিন্তায় আমি আতংকিত হয়ে উঠলাম। আমার যন্ত্রণা আরও বেড়ে গেল যখন ভাবলাম যে, কেবলমাত্র আমার বিয়ের বেলায়ই অপ্রত্যাশিতভাবে শোচনীয় পরিণতি ঘটেছে, অন্য সব বিয়েই সফল পরিণতিতে পৌঁছে যায়। জানতাম না যে সকলেরই এই একই নিয়তি ; ঠিক আমার মতই সকলেই ভাবে যে তার দুর্ভাগ্য একটি ব্যতিক্রম মাত্র এবং এই সত্যকে স্বীকার না করে শুধু অপরের কাছ থেকেই নয়, নিজের কাছ থেকেও এই লজ্জাজনক ব্যতিক্রম দুর্ভাগ্যকে লুকিয়ে রাখে।

"আমাদের বিরোধ শুরু হয়েছিল বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই, আর সেটা ক্রমেই বাড়তে লাগল, গভীরতর ও প্রতিকারহীন হতে লাগল। প্রথম সপ্তাহ থেকেই মনে মনে বুঝতে পারলাম, আমি ধরা পড়েছি, আমি যা আশা করেছিলাম এ তা নয়, আর বিয়ে ব্যাপারটা পরম সুখের পরিবর্তে এক চরম দুর্ভাগ্য। কিন্তু অন্য সকলের মতই আমি এ সত্যকে স্বীকার করতে চাইতাম না (শেষ ফলাফলের জন্য না হলে কোনদিন স্বীকার করতামও না) এবং শুধু অন্যের কাছ থেকে নয় নিজের কাছ থেকেও এ সত্যকে লুকিয়ে রাখলাম। অতীতের দিকে ফিরে তাকালে এখন অবাক হয়ে যাই যে এত দীর্ঘদিন ধরে আমি আসল সত্যটা দেখতেই পাই নি। এমনি সব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আমাদের ঝগড়া হত যে কিছুদিন পরেই আমরা সেটা ভুলেই যেতাম—এতেই তো সব জিনিসটা আমার কাছে পরিষ্কার হওয়া উচিত ছিল। যে নিয়ত সংঘাতের মধ্যে আমাদের দিন কাটতে লাগল সেটাকে সমর্থন করবার মত কোন ভারী যুক্তি আবিষ্কার করবার সুযোগও আমাদের দেওয়া হত না। কিন্তু তার চাইতেও মর্মঘাতী ছিল আমাদের পুনর্মিলনের বাজে অজুহাতগুলি। কখনও কিছু কথা, কিছু কৈফিয়ৎ, এমন কি চোখের জল পর্যন্ত ; আবার কখনও বা—সে স্মৃতি কী ঘৃণার্হ !—পরস্পরের প্রতি নির্মম সব উক্তি করবার পরেই আমরা পরস্পরের প্রতি সলজ্জ দৃষ্টিপাত করতাম, হাসতাম, চুমো খেতাম, আলিঙ্গনাবদ্ধ হতাম। উঃ কী নীচ ! এ সব কিছুর পাপকে কেমন করে আমি তখন না দেখে পারলাম ?"

তের

দুজন যাত্রী এসে গাড়ির কোণে আসন নিল। তারা ঠিকঠাক হয়ে না বসা পর্যন্ত সে কথা বলা বন্ধ করল ; তারপর আবার শুরু করল ; কিন্তু এতে

তার চিন্তার সূত্র মুহূর্তের জন্যও হারাল না।

সে শুরু করল, "এ প্রসঙ্গে সব চাইতে ঘৃণার কথা এই যে ভালবাসাকে মনে করা হয় একটা আদর্শ, একটা মহৎ কিছু অথবা আসলে সেটা এতই নীচ ও পাশবিক যে তা নিয়ে চিন্তা করা বা আলোচনা করাটাও নীচ ও লজ্জাজনক। ব্যাপারটা যখন নীচ ও লজ্জাজনক তখন সেইভাবেই তো তাকে গ্রহণ করা উচিত, কিন্তু তার পরিবর্তে যা নীচ ও লজ্জাজনক তাকেই মানুষ সুন্দর ও মহৎ বলে ভান করে। আমায় ভালবাসার প্রথম লক্ষণ কি ছিল? পাশবিক কাজের বাড়াবাড়িতেও আমি তিলমাত্র লজ্জাবোধ করতাম না, বরং বাড়াবাড়ি করবার ক্ষমতা আছে বলে গর্ববোধ করতাম এবং সে কাজের সময় তার আত্মিক, এমন কি তার শারীরিক কল্যাণের প্রতিও তিলমাত্র শ্রদ্ধা প্রকাশ করতাম না। কেন যে আমরা পরস্পরের প্রতি বিরূপ হতাম তা আমি বুঝতে পারতাম না, কিন্তু কারণটা খুবই পরিষ্কার: এই বিরূপতা পাশবিক সত্তার কাছে পরাভূত হবার বিরুদ্ধে আমাদের মানবিক সত্তার একটা প্রতিবাদ ছাড়া আর কিছু নয়।

'পরস্পরের প্রতি আমাদের ঘৃণায় আমি অবাক হতাম। কিন্তু এছাড়া আর কিছু তো প্রত্যাশিত ছিল না। একই অপরাধের—সে অপরাধকে প্ররোচিত করা ও জিইয়ে রাখার ব্যাপারের দুই অংশীদারের মধ্যে এটা পারস্পরিক ঘৃণামাত্র। কারণ সে বেচারি প্রথম মাসেই গর্ভবতী হবার পরেও যখন আমাদের জান্তব সম্পর্ক সমানে চলতে লাগল, তখন সেটা কি সত্যি সত্যি অপরাধ নয়? আপনি কি মনে করেন যে এ কাহিনীর পক্ষে এসব কথা অবান্তর? তাহলে আপনি ভুল করছেন। কেমন করে আমার স্ত্রীকে আমি খুন করেছি এ-সবই সেই গল্পের অংশ। বিচারের সময় তারা আমাকে প্রশ্ন করেছিল, কিভাবে আমি তাকে খুন করেছি এবং কি দিয়ে খুন করেছি। বোকার দল! তারা ভেবেছিল ৫ই অক্টোবর তারিখে একখানি ছুরি দিয়ে আমি তাকে খুন করেছিলাম। তখন আমি তাকে খুন করি নি। খুন করেছি আরও অনেক আগে। আর ঠিক সেইভাবেই খুন করেছি যে-ভাবে করছে অন্য সকলে—সব্বাই, সব্বাই!"

"আপনি কি বলতে চান?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"সেটাই তো আশ্চর্যের বিষয়—এই সহজ, সরল সত্যটাকে কেউ স্বীকার করতে চায় না। ডাক্তারদের উচিত এ সত্যকে জানা ও প্রচার করা, কিন্তু তারাও চুপ করে থাকে। নারী-পুরুষদেরও জন্তুদের মতই সৃষ্টি করা হয়: দৈহিক ভালবাসার ফলে গর্ভসঞ্চার হয়, সন্তান-সন্ততিদের খাওয়াতে হয়, তখনকার শরীরের অবস্থায় দৈহিক ভালবাসা প্রসূতি ও সন্তান দুজনের পক্ষেই ক্ষতিকর হয়। পুরুষ ও নারীর সংখ্যা সমান-সমান। তার অর্থ কি? আমি তো মনে করি বিষয়টি খুব পরিষ্কার; এর থেকে যে সিদ্ধান্ত জন্তুরা

করে থাকে সেটা করতে খুব বেশী জ্ঞান-বুদ্ধির দরকার হয় না—সে সিদ্ধান্ত হল যৌন-সংযম। কিন্তু সে সিদ্ধান্ত কেউ নেয় না। রক্তের মধ্যে লিউকো-সাইট্‌স্ ভেসে বেড়াবার মত অনেক অদরকারী জিনিস আবিষ্কার করতে বিজ্ঞানীরা খুব পটু, কিন্তু এটা আবিষ্কার করবার মত কুশলতা তাদের নেই। অন্তত আমি তাদের এবিষয়ে কোন কথা বলতে শুনি নি।

"সুতরাং স্ত্রীলোকদের সামনে মাত্র দুটি পথ খোলা আছে; একটি হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে অথবা ধীরে ধীরে তার নারীত্বের অর্থাৎ মাতৃত্বের ক্ষমতাকে নষ্ট করে দিয়ে নিজেকে বিকৃত করা, যাতে তার স্বামী ইচ্ছামত তাকে ভোগ করতে পারে; অপরটিকে কোন পথই বলা যায় না—সেটা হল প্রকৃতির বিধানকে সরাসরি লংঘন করা, আর আমাদের তথাকথিত ন্যায়বান পরি-বারের লোকেরা সেটাই করে থাকে। তার অর্থ হল, একটি নারী তার প্রকৃতির বিরুদ্ধে একই সঙ্গে আসন্ন মা, শুশ্রূষাকারিণী মা ও তার স্বামীর সঙ্গিনীর কাজ করবে; অথচ সেটা এমন একটা গুরুদায়িত্ব যা কোন একটি জন্তু কখনও মেনে নেবে না। আর কোন নারীর সে শক্তি থাকে না। ওই কারণেই আমাদের সমাজের স্ত্রীলোকরা বিকলস্নায়ু ও মূর্ছারোগগ্রস্ত হয়, এবং চাষী-ঘরের স্ত্রীলোকরা হয় 'ক্লিকুশি' (Klikushi = মূর্ছারোগগ্রস্ত চাষী স্ত্রীলোক)। খেয়াল করে দেখবেন, তরুণীরা, নিষ্পাপ তরুণীরা কখনও 'ক্লিকুশি' হয় না—হয় শুধু সেই স্ত্রীলোকরা যে স্ত্রীলোকদের স্বামী থাকে। আমাদের লোকদের সম্পর্কে সেটাই সত্য। ইওরোপীয়দের সম্পর্কেও। প্রকৃতির নিয়ম লংঘন করে মূর্ছারোগীতে পরিণত হয়েছে এমন স্ত্রীলোকের দ্বারাই সব হাসপাতাল-গুলি পরিপূর্ণ। কিন্তু যেসব স্ত্রীলোক 'ক্লিকুশি' এবং চারকট-এর রোগী তারা তো পুরোপুরি পাগল; যেসব স্ত্রীলোক এখনও সে স্তরে পৌঁছে নি তারাই তো পৃথিবীকে ভরে রেখেছে।

"একটি স্ত্রীলোক কর্তৃক গর্ভস্থ সন্তানকে প্রসব করা ও তাকে লালন-পালন করা কী এক ভীতিপ্রদ কাজ! আমাদের যে বংশধররা মানব জাতির ধারাকে বহন করবে তাদের তো সেই সৃষ্টি করে। আর এই পবিত্র কাজে প্রতিবন্ধ-কতার সৃষ্টি করে কিসে? সেকথা ভাবতেও আতংক হয়! অথচ তারাই নারীর মুক্তি, নারীর অধিকারের কথা বলে! এ যেন একদল নরখাদক বলির আগে শিকারকে খাইয়ে-দাইয়ে মোটা করতে করতেই তাদের ভরসা দিচ্ছে যে তাদের অধিকার ও মুক্তির কথা নিয়েও তারা মাথা ঘামাচ্ছে।"

এই ধারণাটা আমার কাছে নতুন ও মর্মঘাতী বলে মনে হল।

বললাম, "কিন্তু কি করা যাবে? আপনি যা বললেন তা যদি সত্য হয় তাহলে তো একটি পুরুষকে দু'বছরে মাত্র একবার তার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হতে হয়; কিন্তু মানুষ—"

"ও ছাড়া বাঁচতে পারে না," সে বলে উঠল। "আবারও বিজ্ঞানের

শ্রদ্ধেয় পুরোহিতরা সকলকে এই কথাই বুঝিয়েছে। এইসব পণ্ডিতজনেরা যে নারীকে পুরুষের পক্ষে এতই অপরিহার্য বলে মনে করেন তাদের কাজগুলি সম্পন্ন করতে যদি সেই পণ্ডিতদের বাধ্য করা হত তাহলে তারা কি বলতেন আমার শুনতে ইচ্ছা করে। একটি লোককে যদি বোঝান হয় যে ভদ্‌কা, তামাক ও আফিম তার পক্ষে অপরিহার্য তাহলেই সেগুলি তার পক্ষে অপরিহার্য হয়ে উঠবে। মনে হয় ঈশ্বর বুঝি সব কিছুই ভুল সৃষ্টি করেছেন, কারণ তিনি জানতেন না কি অপরিহার্য, আর সেইসব পণ্ডিতদের সঙ্গেও তিনি পরামর্শ করেন নি। দেখতেই তো পাচ্ছেন, সব জিনিস ঠিক খাপ খায় না। মানুষ স্থির করেছে, কামনা চরিতার্থ না করে তারা বাঁচতে পারে না, অথচ তাদের কামনা পূরণের পথে বাধার সৃষ্টি করে এসে দাঁড়াল সন্তানের জন্ম ও লালন-পালন। কি করা হবে? পণ্ডিতদের কাছে আবেদন করুন। তারাই সব ব্যবস্থা করে দেবেন। আর তাই তারা করেন। আঃ, এই সব ডাক্তার ও তাদের মিথ্যার মুখোশ যে কবে খোলা হবে? সেদিন তো এসেছে। জন্তুরাও জানে যে তাদের বংশরক্ষার জন্যই সন্তানের জন্ম, তাই এ সংক্রান্ত নিয়মগুলি তারা মেনে চলে। শুধু মানুষই সেসব জানে না, জানতে চায়ও না। সে শুধু চায় যতদূর সম্ভব নিজের সুখভোগ করতে। আর সে কে? মানুষ; এই বিশ্বের রাজা। ভাবুন তো—জন্তুরা যৌন-সংসর্গ করে শুধুমাত্র যখন সন্তান উৎপাদন করা সম্ভব, অথচ বিশ্বের এই নোংরা রাজা শুধু মাত্র সুখ-ভোগের জন্য যখনই সম্ভব তখনই যৌন-সংসর্গে লিপ্ত হয়। তার চাইতেও বড় কথা, সেকাজকে সে ভালবাসার মত একটি মহৎ ভাবের সঙ্গে একাত্ম করতে চেষ্টা করে। আর এই ভালবাসার নামে—অর্থাৎ এই নীচতার নামে—মানবজাতির অর্ধেককে সে বলি দেয়। মানবজাতিকে কল্যাণ ও সত্য প্রতিষ্ঠার পথে পরিচালিত করবার কাজে যে নারী জাতিকে তার সাহায্য-কারিণী হিসাবে গ্রহণ করা উচিত, নিজের সুখ-ভোগের জন্য তাকেই সে করে তুলেছে তার শত্রু। আমাকে এই কথাটা বলুন: মানবজাতির অগ্রগতিকে কে বাধা দিচ্ছে? নারী। কিন্তু সে যা হয়েছে তা হল কেন? শুধু এই কারণে। হাঁ, হাঁ, একটা সিগারেট খুঁজতে খুঁজতে সে বার বার কথাটা বলল। তারপর ধূমপান করতে লাগল।

চৌদ্দ

সেই একই স্বরে সে বলতে লাগল, "অতএব এমনি পশুর মত জীবনই আমি কাটাচ্ছিলাম। কিন্তু সে জীবনের সব চাইতে খারাপ দিকটা এই যে, এ ধরনের জীবন যাপন করেও আমি কল্পনা করতাম যে, যেহেতু আমি অন্য

স্ত্রীলোকের দ্বারা প্রলুব্ধ হই নি এবং আমার স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত রয়েছি, সুতরাং আমি একজন নীতিবান মানুষ, নির্দোষ মানুষ, আর আমাদের মধ্যে যদি ঝগড়া হয়ে থাকে সেজন্য আমার স্ত্রী, বরং তার চরিত্রই দায়ী।

"কিন্তু তাকে দোষ দেওয়া চলে না। সে তো অন্য স্ত্রীলোকদের থেকে, অন্ততঃ তাদের অধিকাংশের থেকে স্বতন্ত্র কিছু নয়। আমাদের সমাজে মেয়েদের যে স্থান তার দাবী অনুযায়ীই তো সে বড় হয়েছে; সুবিধাভোগী সমাজের মেয়েরা যেভাবে বড় হয়ে থাকে, যেভাবে বড় হওয়া তাদের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক, সেও তো সেইভাবেই বড় হয়েছে। মেয়েদের আধুনিক শিক্ষার অনেক কথাই আমরা শুনে থাকি। ফাঁকা বুলি। যতদিন পর্যন্ত মেয়েদের প্রতি আমাদের বর্তমান মনোভাব (যে মনোভাবের ভান করি সেটা নয়) অপরিবর্তিত থাকবে ততদিন মেয়েদের ঠিক এই শিক্ষাই পাওয়া উচিত।

"নারীর প্রতি পুরুষের মনোভাব অনুসারেই মেয়েদের শিক্ষা-ব্যবস্থা চলবে। পুরুষ নারীকে কি চোখে দেখে তা আমরা সকলেই জানি। কবিরা গেয়ে থাকেন—Wein, Weilber and Gesang (সুরা, সুন্দরী ও সঙ্গীত)। প্রেমের কবিতা ও ভেনাস-এর নগ্ন মূর্তির আবির্ভাব থেকে শুরু করে যত কাব্য, যত চিত্র ও ভাস্কর্য দেখবেন—সর্বত্রই স্ত্রীলোককে দেখা হয় ভোগের বস্তু হিসাবে, কি রাজসভায় বলনাচের আসরে, কি ক্রুব্নায়া, স্কোয়ারে অথবা গ্রাচেভ্কা স্ট্রীট-এ। আরও লক্ষ্য করুন শয়তানের চালাকি: এটা যদি সুখ ও সম্ভোগ ছাড়া আর কিছু না হয় তাহলে এটাকে আমরা ঠিক সেইভাবেই সুখ ও সম্ভোগ হিসাবেই গ্রহণ করব। নারী তো একটি মিষ্টি গ্রাস, আর কিছু না। কিন্তু না, নাইটরাই সর্বপ্রথম নারীকে বড় বলে পূজা করেছিল (তাকে পূজা করেছিল বটে, তবু ভোগের বস্তু হিসাবেই দেখেছিল)। আজকালও পুরুষরা নারীদের শ্রদ্ধা করে। অনেকে তাদের জন্য চেয়ার এগিয়ে দেয়, তাদের রুমাল কুড়িয়ে দেয়, আর একদল শাসনকার্য ও কর্তৃত্ব সংক্রান্ত যেকোন পদে নিয়োগের ব্যাপারে তাদের অধিকারকে স্বীকার করে। তারা মুখে যাই বলুক, কিন্তু নারীর প্রতি তাদের মনোভাব একই আছে। নারী ভোগের নিমিত্ত। তার দেহ সুখলাভের উপাদান। নারীও তা জানে। এ তো এক ধরনের ক্রীতদাস-প্রথা।

"ক্রীতদাস-প্রথা তো এমন একটা অবস্থা ছাড়া আর কিছু নয় যেখানে অপরের বাধ্যতামূলক শ্রমের ফসল ভোগ করে অন্য কিছু লোক। অন্যের বাধ্যতামূলক শ্রমের ফসল কেটে নেওয়াটাকে পাপ বা লজ্জাজনক মনে করে মানুষ যখন সেকাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখবে একমাত্র তখনই ক্রীতদাস-প্রথার অবসান হতে পারে। আসলে মানুষ দাস বিক্রিটাকে নিষিদ্ধ করে দিয়ে ক্রীতদাস-প্রথার বাইরের চেহারাটাকে বদলে দিয়েছে মাত্র; অথচ তারা মনে করে (নিজেদের নিশ্চিতরূপে বোঝায়) যে ক্রীতদাস প্রথার অবসান

ঘটেছে; কিন্তু তারা চেয়েও দেখে না, দেখতে চায় না যে ক্রীতদাস-প্রথা সমানেই চলেছে, কারণ মানুষ এখনও অন্যের পরিশ্রমের ফসল কাটতে ইচ্ছুক, আর সেটাকে তারা সঠিক ও ন্যায্য কাজ বলেই মনে করে। যতদিন একাজ সঠিক বিবেচিত হবে ততদিন এমন কিছু লোক থাকবেই যারা অন্যের চাইতে বেশী শক্তিমান ও বুদ্ধিমান হবার দরুন ক্রীতদাস-প্রথাকে ফিরিয়ে আনবেই।

নারীর মুক্তির ব্যাপারেও সেই একই কথা। যেহেতু পুরুষ মনে করে যে নারীকে ভোগের জন্য ব্যবহার করাই উচিত এবং বাঞ্ছনীয় তাই নারী ক্রীত-দাসী। তারপরে পুরুষ চায় তাকে মুক্তি দিতে—তারা তাকে পুরুষের সমান অধিকার দান করে, কিন্তু তখনও তাকে ভোগের সামগ্রী বলেই মনে করে, শিশুকাল থেকে সেই শিক্ষাই তাকে দেয়, জনমতের সাহায্যেও তাই শেখায়। আর নারীও সেই একই নীচ, চরিত্রহীনা ক্রীতদাসীই থেকে যায়, এবং পুরুষও থাকে সেই একই ভ্রষ্ট-চরিত্র ক্রীতদাস-মালিক।

"তারা কলেজে ও আদালতে মেয়েদের মুক্তি দেয়, অথচ তাকে মনে করে ভোগের বস্তু। নিজেকে এইভাবে দেখবার শিক্ষা সে যতদিন পাবে (আমরা তো সেই শিক্ষাই দেই) ততদিন সে একটি নীচু স্তরের জীব হয়েই থাকবে। হয় কাপুরুষ ডাক্তারদের সহায়তায় সে গর্ভ রোধ করবে, তার মানে একটি বেশ্যা হয়ে উঠবে, আর নেমে যাবে জানোয়ারের স্তরেও নয়, একেবারে (প্রাণহীন) বস্তুর স্তরে; অথবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে তাই হবে —দুঃখী, মৃগীরোগগ্রস্ত, মানসিক ভারসাম্যহীন আত্মিক বিকাশের অনুপযুক্ত।

"এব্যাপারে স্কুল, কলেজ কিছুই করতে পারে না। একমাত্র নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী এবং নিজের প্রতি নারীর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটলেই এ ব্যবস্থা বদলাতে পারে। নারী যখন নিজের কুমারী অবস্থাকে আজকের মত লজ্জা ও নিন্দার জিনিস বলে মনে না করে সেটাকেই শ্রেষ্ঠ অবস্থা বলে ভাবতে শিখবে একমাত্র তখনি এ অবস্থার পরিবর্তন হবে।

"সে যে গণিতের কিছু কিছু জানে বা বেহালা বাজাতে পারে তাতে অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটবে না। একটি পুরুষকে বাগে আনতে পারলে তবেই সে সুখী হবে, তার জীবনের শ্রেষ্ঠ কামনা পূর্ণ হবে. কাজেই পুরুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখাই হল তার জীবনের প্রধান লক্ষ্য। অতীতে তাই হয়েছে, ভবিষ্যতেও তাই হবে। অবিবাহিত বালিকা ও বিবাহিত স্ত্রীলোক উভয়ের বেলায়ই একথা প্রযোজ্য। অবিবাহিত মেয়েরা একাজ করবে একজনকে বেছে নেবার সুবিধার জন্য, আর বিবাহিতারা করবে স্বামীদের উপর প্রভুত্ব খাটাবার জন্য।

"শুধু সন্তানের জন্মকালই তাকে এ চেষ্টা থেকে বিরত রাখে, অন্তত সাময়িকভাবে স্থগিত রাখে; কারণ সে যদি রাক্ষসী না হয় তাহলে তার শিশুকে লালনপালন করে। কিন্তু সেখানেও ডাক্তাররা এসে নাক গলায়।

'আমার স্ত্রী তার সন্তানদের লালনপালন করতে চাইত এবং প্রকৃতপক্ষে পাঁচটি সন্তানকে লালন-পালন করেওছিল; কিন্তু প্রথম সন্তান জন্মের পরে তার শরীরটা ভাল ছিল না। ডাক্তাররা এসে লজ্জাজনকভাবে ওর সব জামা-কাপড় খুলে সারা শরীর টিপে-টিপে দেখল (সেকাজের জন্যও তাদের আমার ধন্যবাদ দেওয়ার কথা, দর্শনী দেবার কথা)—সেই মাননীয় ডাক্তাররা রায় দিল যে প্রথম সন্তানটিকে পালন-পোষণ করাও তার উচিত নয়, আর এই-ভাবে পুরুষকে ভোলানোর হাত থেকে রেহাই পাবার একটিমাত্র উপায় থেকেও তাকে বঞ্চিত করা হল। শিশুর জন্য একটি স্তন্যদায়ী নার্সকে আনা হল; তার অর্থ একটি অপরিচিত স্ত্রীলোকের দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তাকে তার নিজের সন্তানের কাছ থেকে ভুলিয়ে এনে আমাদের সন্তানকে তার হাতে তুলে দেওয়া হল, আর সেজন্য তার মাথায় পরানো হল কড়া ইস্ত্রি-দেওয়া ফিতে-লাগানো টুপি। কিন্তু এসব তো অপ্রাসঙ্গিক কথা। আসল কথা হল, আমার স্ত্রী যখন আতুর-ঘর থেকে বেরিয়ে এল এবং সন্তানকে পালনের দায় থেকে মুক্তি পেল, তখনই তার ভিতরকার সুপ্ত ছলা-কলার ঝোঁকটা অতিরিক্ত মাত্রায় বেড়ে গেল। আর তার সেই ছলাকলার ঝোঁক যত বাড়তে লাগল সেই অনুপাতেই আমি ঈর্ষায় জ্বলতে লাগলাম; বিবাহিত জীবনের প্রথম দিনটি থেকেই সে ঈর্ষা আমাকে মুহূর্তের জন্যও শান্তিতে থাকতে দেয় নি; আমি যেরকম নীতিবিগর্হিতভাবে আমার স্ত্রীর সঙ্গে বাস করতাম যেকোন স্বামীই তার স্ত্রীর সঙ্গে সেইভাবে বসবাস করবে তাকেই অনিবার্যভাবে এই ঈর্ষার আগুনে জ্বলতে হবেই।''

পনের

"সারা বিবাহিত জীবনে এক মিনিটের জন্যও ঈর্ষার যন্ত্রণা থেকে আমি মুক্তি পাই নি। কিন্তু কোন কোন সময়ে যন্ত্রণাটা অত্যন্ত তীব্র হয়ে উঠত। সেইরকম একটি সময় এসেছিল যখন আমাদের প্রথম সন্তানের জন্মের পরে তাকে লালন-পালন করতে ডাক্তাররা আমার স্ত্রীকে নিষেধ করেছেন। সেই সময় আমি বিশেষভাবে ঈর্ষাতুর হয়ে উঠেছিলাম; তার প্রথম কারণ, যথেষ্ট কারণ ছাড়াই স্বাভাবিক ব্যবস্থাটা পাল্টে দেওয়ার ফলে প্রত্যেক মায়েরাই যে উৎকণ্ঠ হয়ে থাকে আমার স্ত্রীকেও সেই উৎকণ্ঠায় ভুগতে হয়েছিল; আর দ্বিতীয় কারণ, আমার স্ত্রী যেভাবে অত্যন্ত সহজে মায়ের কর্তব্যকে ঝেড়ে ফেলে দিল তা দেখে সঙ্গত কারণেই (যদিও অজ্ঞাতসারে) আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম যে সে হয় তো সেই একই সহজভাবে তার দাম্পত্য কর্তব্যকেও ঝেড়ে ফেলে দেবে, বিশেষ করে সে যখন সম্পূর্ণ সুস্থ

এবং মাননীয় ডাক্তারদের নিষেধ সত্ত্বেও নিজের সন্তানদের লালন-পালন করায় কোন খারাপ ফল হয় নি।”

“দেখছি ডাক্তারদের প্রতি কোনরকম প্রীতির অপব্যবহার আপনি করেন না,” আমি মন্তব্য করলাম। আমি লক্ষ্য করছিলাম, যতবার সে ডাক্তারদের কথা বলছিল ততবারই তার চোখে একটা বিদ্বেষের ঝিলিক খেলে যাচ্ছিল।

“তাদের প্রতি প্রীতি বা অপ্রীতির কথা এটা নয়। আমার জীবনটাকে ওরা ছারখার করে দিয়েছে, যেমন ছারখার করে দিয়েছে আরও হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ জীবনকে, আর কারণকে কার্য থেকে আলাদা করে দেখতে আমি পারি না। উকিলদের মত তারাও যে রোগীদের কাছ থেকে টাকা চুষে নিতে চায় সেটা আমি বুঝতে পারি, এবং আনন্দের সঙ্গে আমার অর্ধেক উপার্জন তাদের দিয়ে দিতাম (প্রকৃত অবস্থাটা যারা বুঝতে পারে তাদের সকলেই তাই করত), অবশ্য যদি বুঝতাম যে সেটা দিলেই আমার পারি-বারিক জীবনে হস্তক্ষেপ করা থেকে তাদের বিরত করা যাবে। কোন হিসাব আমি রাখি নি, কিন্তু ডজন ডজন দৃষ্টান্তের কথা (এরকম অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে) আমি জানি যেখানে ডাক্তাররা হয় গর্ভস্থ সন্তানকে মেরে ফেলেছে এবং বলেছে যে প্রসূতি সন্তান-ধারণে অক্ষম (যদিও পরবর্তীকালে সে ভালভাবেই সন্তান প্রসব করেছে), অথবা নানারকম অস্ত্রোপচারের সাহায্যে প্রসূতিকেই মেরে ফেলেছে। এসব মৃত্যুকে কেউ খুন বলে না, যেরকম মধ্য-যুগে ‘ইনকুইজিশন’-এর হত্যাকাণ্ডকেও খুন বলা হত না, কারণ বলা হত যে সেগুলো করা হত মানব কল্যাণের জন্য। ডাক্তাররা যত অপরাধ করে তা সংখ্যাতীত। কিন্তু বিশেষ করে স্ত্রীলোকের মাধ্যমে যে জড়বাদকে তারা পৃথিবীতে আমদানি করে তার দুর্নীতির তুলনায় এসব অপরাধ অতি তুচ্ছ। আসল কথা, তারা মানুষকে, বিশেষ করে স্ত্রীলোকদের, দুর্নীতিগ্রস্ত করে তোলে।

“আজকাল কেউ বলতে পারে না, ‘তোমার চাল-চলন ভাল নয়, ওটা শোধরাতে হবে।’ একথা কেউ নিজেকে বা অপরকে বলতে পারে না। তোমার চাল-চলন যদি খারাপ হয়ে থাকে তার কারণ স্নায়বিক অবস্থার গোলমাল বা ঐ ধরনের একটা কিছু, আর তাই তোমাকে যেতে হবে ডাক্তারদের কাছে, আর তারাও পঁয়ত্রিশ কোপেক দামের ওষুধের ব্যবস্থা দেবে এবং তোমাকে সেটা খেতে হবে। তাতেও যদি অবস্থা খারাপ হতে থাকে, তাহলে আরও ডাক্তারের কাছে যাও, আরও ওষুধ খাও। চমৎকার ব্যবস্থা!

“কিন্তু সেটা কথা নয়। আমি শুধু বলতে চেয়েছি যে, সে বেশ ভাল-ভাবেই তার ছেলেমেয়েদের লালন-পালন করেছে এবং তার গর্ভাবস্থা ও

শিশুকে পালনের সময়টাই শুধু ঈর্ষার যন্ত্রণা থেকে আমি রক্ষা পেয়েছি। তা যদি না হত, তাহলে ঘটনাক্রমে একদিন যা ঘটেছিল সেটা আরও অনেক আগেই ঘটত। ছেলেমেয়েরাই আমাদের দুজনকে রক্ষা করেছে। আট বছরে তার পাঁচটি সন্তান হয়েছিল। আর সে পাঁচটিকেই সে নিজের হাতে লালন-পালন করেছে।

"এখন তারা কোথায়, আপনার ছেলেমেয়েরা ?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"আমার ছেলেমেয়েরা ?" সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে সে কথাগুলি আবৃত্তি করল।

"ক্ষমা করবেন ; তাদের কথা মনে হলে হয় তো আপনি কষ্ট পান ?"

"না, সে কিছু নয়। আমার স্ত্রীর ভাই ও তার বৌ এসে ছেলেমেয়েদের নিয়ে গিয়েছিল। তারা তাদের আমার কাছে থাকতে দেয় নি। আমার সব সম্পত্তি তাদের দিতে চেয়েছিলাম ; তবু তারা ছেলেমেয়েদের আমার কাছে থাকতে দেয় নি। আমাকে তারা পাগল মনে করে। ওদের দেখতেই তো গিয়েছিলাম। তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছি, কিন্তু তারা কিছুতেই ছেলে-মেয়েদের আমার কাছে থাকতে দেবে না। দেখুন, বাপ-মায়ের মত যাতে না হয় সেইভাবেই ওদের মানুষ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ওরা অন্য রকম হতে পারে না। ঠিক আছে, কি আর করা যাবে ? তারা আমার কাছে ওদের ফিরিয়ে দেবে না, আমাকে বিশ্বাস করবে না,—এটাই তো স্বাভাবিক। ওদের মানুষ করে তুলবার মত শক্তি আমার আছে কিনা সেবিষয়েও তো আমি নিশ্চিত নই। আমার তো ভয় হয়, তা আমি পারতাম না। আমি তো একটা ধ্বংসস্তূপ, একটা ভগ্নস্তূপ। কিন্তু একটা জিনিস আমার আছে। জ্ঞান। হাঁা, আমি যা জানি অন্যের তা জানতে অনেক সময় লাগবে।

"আমার ছেলেমেয়েরা বেঁচে আছে ; অন্য সকলের মতই তারাও বড় হয়ে বর্বর হবে। আমি ওদের দেখেছি—তিনবার। ওদের জন্য আমার করবার কিছু নেই। এখন দক্ষিণ দেশে যাচ্ছি। সেখানে আমার একটা ছোট বাড়ি ও বাগান আছে।

"হ্যাঁ, আমি যা জেনেছি তা জানতে অন্য লোকের অনেক সময় লাগবে। সূর্য ও নক্ষত্রমণ্ডলে কতটা লোহা ও অন্য ধাতু আছে সেটা জানতে আমাদের বেশী সময় লাগবে না, কিন্তু যেসব জিনিসের ভিতর দিয়ে আমাদের পশুত্ব প্রকাশ পায় তাকে জানা—সে বড় কঠিন, খুব কঠিন...

"আপনি আমার কথাগুলি মন দিয়ে শুনলেন। সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ।"

ষোল

"আপনি আমার ছেলেমেয়েদের কথা বললেন। আবার দেখুন, ছেলে-

মেয়েদের বেলায়ও কী মিথ্যা মনোভাব নেওয়া হয়ে থাকে! ছেলেমেয়েরা আনন্দময়! ছেলেমেয়েরা ঈশ্বরের আশীর্বাদ! মিথ্যা কথা। একসময় হয় তো তাই ছিল, কিন্তু এখন আর নেই। ছেলেমেয়েরা যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছু নয়। অধিকাংশ মা-ই এবিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন, এবং অসতর্ক মুহূর্তে অনেক সময় সে-কথা বলেও ফেলে। অভিজাত মহলের যেকোন মা-কে জিজ্ঞাসা করুন, সেই আপনাকে বলবে যে পাছে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে বা মারা যায় সেই ভয়ে সে সন্তান চায় না; আর সন্তান হলেও সে তাকে লালন-পালন করতে চায় না, পাছে তার প্রতি অত্যধিক আসক্তিবশত দুঃখ পেতে হয়। একটি শিশুর লাবণ্যকে ঘিরে যে আনন্দ—তার ছোট ছোট হাত, পা, শরীর—এসব কিছু নিয়ে একটি শিশু যে আনন্দ দিতে পারে সেটা শুধু যে তার অসুস্থতা বা মৃত্যুর যন্ত্রণার চাইতে কম তাই নয়, তার অসুস্থতা বা মৃত্যুর ভয়ের চাইতেও কম। ছেলেমেয়ে থাকার সুবিধা ও অসুবিধাগুলি বিচার করলে অসুবিধার পাল্লাই ভারী হয়; আর তাই ছেলেমেয়ে না থাকাই ভাল। একথা স্ত্রীলোকরা বেশ সাহসের সঙ্গে খোলাখুলিই বলে থাকে; তারা মনে করে যে সন্তানের প্রতি মমতাবশতই তাদের মনে এভাব জাগে, আর এভাবের জন্য তারা গর্ববোধ করে। তারা বুঝতে পারে না যে এই ধরনের চিন্তা তাদের মমতাকেই অস্বীকার করে, তাদের স্বার্থপরতাকেই প্রকাশ করে। একটি শিশুর কাছ থেকে তারা যতটা আনন্দ পায়, দুঃখ পায় তার চাইতে বেশী, আর তাই তারা সন্তান চায় না। ভালবাসার ধনের জন্য তারা স্বার্থত্যাগ করে না, বরং নিজেদের স্বার্থের জন্য যে ভালবাসার বস্তু হতে পারে তাকেই ত্যাগ করে।

"স্পষ্টতই এটা ভালবাসা নয়, স্বার্থপরতা। কিন্তু এই স্বার্থপরতার জন্য বড়লোক মায়েদের দোষ দেওয়া কঠিন—অভিজাত সমাজে সন্তানদের স্বাস্থ্যের জন্য একটি মহিলাকে যে মূল্য দিতে হয় (আবার ডাক্তারদের ধন্যবাদ) সেকথা মনে হলে প্রতিবাদের একটি শব্দও কেউ উচ্চারণ করতে পারে না। প্রথম জীবনে যখন তিন-চারটি সন্তান আমার স্ত্রীর জীবনের প্রতিটি মিনিট, তার শক্তির প্রতিটি আউন্সকে অধিকার করে থাকত, তার তখনকার জীবন ও মানসিক অবস্থার কথা মনে হলে আজও আমি শিউরে উঠি। আমাকে দেবার মত কোন সময়ই তার ছিল না; সর্বদাই একটা বিপদের আশংকার মধ্যে দিন কাটত—এই বিপদ কেটে গেল, আবার বিপদ দেখা দিল, আবার সেটাকে দূর করবার বেপরোয়া প্রচেষ্টা, আবার উদ্ধার—যেন একটা ডুবন্ত জাহাজে বাস করছিলাম। কখনও কখনও মনে হত, ইচ্ছা করেই এই পরিবেশটা সৃষ্টি করা হয়েছে, আমার উপর তার জয়কে নিশ্চিত করবার জন্যই আমার স্ত্রী ছেলেমেয়েদের ভাল-মন্দ নিয়ে এতখানি উদ্বেগের ভান করে; নিজের সপক্ষে সব সমস্যার সমাধান করে নেবার এটা একটা সহজ, লোভনীয় পথ। অনেক সময়ই ভাবতাম, আমার স্ত্রী যা কিছু বলে, যা কিছু করে সবই

ভণ্ডামি। কিন্তু আমি ভুল করেছিলাম। সত্যি সে ভয়ংকরভাবে বিপর্যস্ত হত; ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য ও রোগ শোক নিয়ে সে সর্বদাই উদ্বেগে কাটাত। অবস্থাটা ওর পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক ছিল, আমার পক্ষেও। আর যন্ত্রণা না সয়ে তার উপায় ছিল না। ছেলেমেয়েদের নিয়ে ভাবনা, তাদের খাওয়া, তাদের আরাম, বিপদে তাদের রক্ষা করা—এই সব জৈবিক চিন্তা ভাবনা অন্য সব স্ত্রীলোকের মতই তার মধ্যেও যথেষ্টই ছিল, কিন্তু তার মধ্যে আরও এমন কিছু ছিল যা জন্তুদের মধ্যে থাকে না—যুক্তি ও কল্পনা। ভবিষ্যতে বাচ্চার কি হতে পারে তা নিয়ে একটা মুরগির কোন উদ্বেগ থাকে না, তার কত রকমের রোগ হতে পারে তাও সে জানে না, আর রোগ ও মৃত্যুকে রোধ করবার যত রকম ওষুধ আছে বলে মানুষ কল্পনা করে তার খোঁজও সে রাখে না। কাজেই একটা মুরগির কাছে তার বাচ্চা কোন যন্ত্রণা নয়। বাচ্চার জন্য যা অবশ্য করা দরকার, সে শুধু তাই করে, আর সেটা আনন্দের সঙ্গেই করে; কাজেই তার কাছে বাচ্চারা আনন্দের খোরাক। বাচ্চা অসুস্থ হলে ঠিক কি করতে হবে তা সে জানে: সে তাকে খাওয়ায় আর 'তা' দেয়। সেকাজ করবার সময় সে জানে যে সে দরকারী কাজটাই করছে। বাচ্চাটা মরে গেলেও সে শুধায় না কেন মরল বা কোথায় গেল; কিছুক্ষণ ডাকাডাকি করে, তারপর সব ভুলে গিয়ে আগেকার মতই বাঁচতে থাকে। কিন্তু আমাদের ভাগ্যহীন নারীদের বেলায়, বিশেষ করে আমার স্ত্রীর বেলায় সেটাই যথেষ্ট নয়। ছোটদের রোগ ও তার নিরাময়ের কথা যদি নাও বলি, ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদীক্ষা ও লালন-পালন সংক্রান্ত নানাবিধ অসংখ্য বিচিত্র বিধি-বিধানের কথা সে শুনেছে ও পড়েছে। তাদের খাওয়াতে হবে এটা আর ওটা; না, এটা আর ওটা নয়, ওটা আর এটা। কিভাবে তাদের খাওয়াতে হবে, পরাতে হবে, নাওয়াতে হবে, শোয়াতে হবে, বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে ও হাওয়া খাওয়াতে হবে সেসব বিষয়ে আমরা, বিশেষ করে আমার স্ত্রী প্রতি সপ্তাহেই নতুন কিছু আবিষ্কার করতাম। যেন শুধু গতকাল থেকেই ছেলে-মেয়েরা জন্মাতে শুরু করেছে। কোন সন্তানের অসুখ যদি হল অমনি ধরে নেওয়া হল যে তার কারণ তাকে যথাসময়ে ঠিকমত খাওয়ানো হয় নি, বা ঠিক মত নাওয়ানো হয় নি; এক কথায়, অসুখের জন্য আমার স্ত্রীই দোষী, কারণ তার যা করা উচিত ছিল তা সে করে নি।

"ছেলেমেয়েরা যখন সুস্থ থাকত তখনই অবস্থা শোচনীয়, আর তারা অসুস্থ হলে তো সে এক নরক। ধরেই নেওয়া হয় যে রোগ সারানো যায়, বিজ্ঞানের একটা শাখা তা নিয়ে আলোচনা করে এবং এক শ্রেণীর লোক আছে—ডাক্তাররা—যারা কি করে রোগ সারাতে হয় তা জানে। সকলে জানে না, কিন্তু সেরা ডাক্তাররা জানে। এখন ধরুন একটি শিশু অসুস্থ হল, অমনি আমাদের সেই সেরা ডাক্তারটিকে খুঁজে বের করতে হবে যে রোগ

সারাতে জানে, আর তাহলেই শিশুটি বাঁচবে ; কিন্তু যদি আমরা সেই বিশেষ ডাক্তারটিকে খুঁজে না পাই, বা সে যেখানে থাকে আমরা সেখানকার লোক না হই, তাহলেই শিশুটি গেল। শুধু আমার স্ত্রীই যে এসব বিশ্বাস করত তা নয়, আমাদের দলের সব স্ত্রীলোকই বিশ্বাস করত ; তাই প্রত্যেকের কাছেই আমার স্ত্রীকে একই কথা শুনতে হত, 'আগে থেকে আইভান জাখারিচ-কে ডাকে নি বলেই ইয়েকাতেরিণা সেমিয়োনভ্না দুটো বাচ্চাকে হারাল।' 'আইভান জাখারিচ মারিয়া আইভানভ্নার বড় মেয়েটিকে বাঁচিয়েছে!' 'ডাক্তারের পরামর্শে পেত্রভ্-রা নানান হোটেলে ঘুরেছিল বলেই ছেলেমেয়েগুলো বেঁচে গেল ; নইলে সবগুলি মারা যেত।' 'অমুকের সন্তান ছিল খুবই দুর্বল ; ডাক্তারের পরামর্শে তারা দক্ষিণে চলে যাওয়াতেই ছেলেটা বেঁচে গেছে।' আমার স্ত্রী তার ছেলেমেয়েদের ভালর জন্য যেকোন জন্তুর মতই সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকত। এ অবস্থায় তার ছেলেমেয়েদের কোন ব্যাপারে আইভান জাখারিচ কি বলে তড়িঘড়ি সেটা জানার উপরেই যখন তার ছেলেমেয়েদের জীবন নির্ভর করছে, তখন সেজন্য সর্বদাই উদ্বিগ্ন ও শংকিত না হয়ে কি সে পারে? কিন্তু আইভান জাখারিচ যে কি বলবে তা কেউ জানে না ; সে নিজেও জানে না ; কারণ এটা সে ভাল করেই জানে যে সে কিছুই জানে না বা কিছু করতেও পারে না ; একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার হিসাবে লোকে যাতে তার উপর বিশ্বাস না হারায় সেজন্য কিছু আকস্মিক প্রভাবমাত্র সে তাদের উপর বিস্তার করতে পারত। আমার স্ত্রী যদি পুরোপুরি একটা জন্তু হত, তাহলে এইসব যন্ত্রণা তাকে ভুগতে হত না ; সে যদি পুরোপুরি মানুষ হত তাহলেও সে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করত এবং ঈশ্বরবিশ্বাসীদের মতই ভাবতে ও বলতে পারত : 'ঈশ্বর দিয়েছেন, ঈশ্বরই নিয়েছেন ; ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত কোন কিছুই হয় না।' সে ভাবতে পারত যে, তার ছেলেমেয়েসহ সব মানুষের জীবন ও মৃত্যুই ঈশ্বরের ক্ষমতার অধীন, মানুষের নয় ; আর সে-ক্ষেত্রে সে তার ছেলেমেয়েদের রোগ মৃত্যুকে রোধ করতে সক্ষম একথা সে ভাবতই না, এবং সে চেষ্টাও করত না ; কিন্তু সে তো ব্যাপারটাকে এইভাবে দেখত : অত্যন্ত দুর্বল আর অত্যন্ত নরম কয়েকটি জীবের ভার তার উপর দেওয়া হয়েছে ; অসংখ্য রোগের তারা শিকার হতে পারে ; এই সব জীবদের জন্য তার একটা আবেগময় জান্তব ভালবাসা আছে, তাদের সব দায়িত্ব তার, অথচ তাদের বাঁচিয়ে রাখবার উপায়গুলি জনাকয়েক পণ্ডিত ছাড়া আর সকলের কাছ থেকেই লুকিয়ে রাখা হয়েছে ; সেই সব পণ্ডিতদের পরামর্শ ও সেবা পাওয়া যায় শুধু অনেক অর্থের বিনিময়ে ; তাও আবার সব সময় পাওয়া যায় না।

"ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমার স্ত্রীর জীবন, ফলে আমার জীবনও ছিল আনন্দের বদলে যন্ত্রণাময়। অন্যরকম হবে কেমন করে? সে তো সর্বদাই

উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকত। কোন ঈর্ষার ঘটনা বা সাধারণ ঝগড়া ঝাটির পরে হয়তো একটু শান্তি ফিরে এল, আশা হল এবার একটু আরাম করতে পারব, একটু পড়াশুনা করতে পারব। চিন্তা করতে পারব, কিন্তু কোন একটা বিষয়ে মন দিতে না দিতেই খবর এসে যেত যে ভাসিয়া বমি করেছে, অথবা মাশার মলে রক্তের দাগ দেখা গেছে, বা আন্দ্রেই-এর গায়ে গুটি বেরিয়েছে—বাস্, সব আশা চুরমার হয়ে গেল। কোথায় যেতে হবে? কোন্ ডাক্তারকে আনতে হবে? শিশুটিকে কি করে আলাদা রাখা যাবে? আর তারপরে—ওষুধ, থার্মোমিটার, ড্যুশ, ডাক্তার…। একটা শেষ হতে না হতেই আর একটা এসে জুটত। স্বাভাবিক, সুপরিচালিত পারিবারিক জীবন বলে কিছুই ছিল না। তার বদলে ছিল, আগেই তো বলেছি, বাস্তব ও কাল্পনিক বিপদের হাত থেকে নিজেদের উদ্ধার করবার একটা অবিরাম প্রচেষ্টা। অধিকাংশ পরিবারেই এই অবস্থা। কিন্তু আমার পরিবারে এটা ছিল বিশেষভাবে সত্য, কারণ আমার স্ত্রী ছিল অতিমাত্রায় বিশ্বাসপ্রবণ আর ছেলেমেয়েদের প্রতি অনুরক্ত।

"কাজেই সন্তান আসার ফলে আমাদের জীবনে কোন উন্নতি দেখা দিল না। বরং তাকে বিষাক্ত করে তুলল: উপরন্তু তারা মতের অমিলের নতুন কারণ হয়ে দাঁড়াল। তারা আসার সঙ্গে সঙ্গেই এটা স্পষ্ট হয়ে উঠল: আর যত তারা বড় হয়ে উঠতে লাগল ততই তাদের কেন্দ্র করে ঝগড়া ঝাটিও বাড়তে লাগল। শুধু যে তাদের নিয়ে মনের অমিল হত তাই নয়, তারা যুদ্ধের অস্ত্র হয়ে উঠল। ছেলেমেয়েদের নিয়েই আমরা পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করতাম। দু'জনেরই কিছু পেয়ারের ছেলেমেয়ে ছিল, আর তাকেই আমরা অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতাম। আমি সাধারণত আঘাত হানতাম বড় ছেলে ভাসিয়া-কে লক্ষ্য করে, তার আক্রমণের লক্ষ্য ছিল লিজা। তারা যত বড় হয়ে উঠতে লাগল, যত তাদের চরিত্রের বিকাশ ঘটল, ততই তারা মিত্রপক্ষ হবার উপযুক্ত হয়ে উঠল, আর আমরাও প্রত্যেকেই তাদের দলে টানতে চেষ্টা করতাম। এতে বেচারিরা ভীষণ কষ্ট পেত, কিন্তু আমাদের অবিরাম সংগ্রাম নিয়ে আমরা এতই ব্যস্ত থাকতাম যে ওদের কথা ভাববারই সময় হত না। মেয়েটি ছিল আমার দলে, আর আমাদের বড় ছেলেটি (সে দেখতে আমার স্ত্রীর মত এবং তার আদরের ছেলে) ছিল তার মায়ের দলে। প্রায়ই দেখতাম সে আমার প্রতি ঘৃণা পোষণ করে।"

সতের

"এইভাবে আমাদের দিন কাটতে লাগল। আমাদের সম্পর্ক ক্রমেই শত্রুর মত হয়ে উঠল। শেষের দিকে মতভেদ থেকে শত্রুতা ঘটে, শত্রুতা থেকেই

মতভেদ দেখা দিত। সে কিছু বলবার আগেই আমি দ্বিমত পোষণ করতাম, আর সেও তাই করত।

"চতুর্থ বছরে আমরা উভয় পক্ষই স্বাধীনভাবে স্থির করলাম যে আমরা পরস্পরকে বুঝতেও পারব না, আমাদের মধ্যে মতের মিলও হবে না। কোন রকম বোঝাপড়ার চেষ্টাই ছেড়ে দিলাম। অতি সাধারণ সব বিষয়ে, বিশেষ করে ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে, প্রত্যেকেই অবিচলিত মত আঁকড়ে থাকতাম। আজ যখন সেসব কথা মনে হয় তখন বুঝতে পারি যেসব মতামত আমি তখন আঁকড়ে ধরতাম সেগুলি আমার খুব প্রিয় ছিল না এবং আমি সেগুলো ছেড়ে দিতেও পারতাম; কিন্তু যেহেতু আমার স্ত্রীর মতামত ছিল ভিন্ন, সুতরাং আমার মতটা ছেড়ে দেওয়ার অর্থ ই ছিল তার কাছে পরাজয় স্বীকার করা। সেটা আমি কিছুতেই করতাম না। সেও করত না। হয় তো সে ভাবত যে সেই ঠিক, আর আমি ভাবতাম যে আমি ঠিক। দুজন একলা থাকলে হয় চুপচাপ থাকতাম, আর না হয় তো এমন সব কথাবার্তা হত যা একেবারেই জন্তু জানোয়ারের স্তরে: 'এখন কটা বাজে?' 'শোবার সময় হয়েছে।' 'আজ ডিনারে খাবার কি আছে?' 'কোথায় আমরা যাব?' 'খবরের কাগজে সংবাদ কি আছে?' 'ডাক্তার ডাকতে হবে; মাশা-র গলায় ঘা হয়েছে।' আলোচনার এই সব অসম্ভব রকমের সংকীর্ণ বিষয়-বস্তু থেকে একচুল সরে গেলেই আমাদের বিরক্তির একশেষ হত। আমরা রেগে যেতাম; কফি, টেবিল-ঢাকনা, গাড়ি, তাসের একটা চাল—দুজনের কারও কাছেই যার এতটুকু গুরুত্ব নেই তাই নিয়েই গালাগালি শুরু হয়ে যেত। আমার দিক থেকে বলতে পারি, সময় সময় ওর প্রতি আমার ঘৃণা অবিশাস্য রকমের তীব্রতায় পৌঁছে যেত। অনেক সময় তাকে চা ঢালতে, পা দোলাতে, মুখে একটা চামচে তুলতে, অথবা চায়ে চুমুক দিতে দেখলেই সে যেভাবে ঐ কাজগুলি করত সেজন্য তাকে আমি এত ঘৃণা করতাম যেন সেগুলি এক মহা-পাপের কাজ। সেসময় আমি খেয়াল করি নি যে, তথাকথিত ভালবাসার পালার ঠিক পরেই নিয়মিত ও অনিবার্যভাবে শুরু হত আমার ঘৃণার পালা। ভালবাসার পালার পরেই ঘৃণার পালা; দুর্বল ভালবাসার পালার পরেই সংক্ষিপ্ত ঘৃণার পালা; তীব্র ভালবাসার পরেই দীর্ঘস্থায়ী ঘৃণার পালা। তখন আমরা বুঝতে পারি নি যে এই ভালবাসা ও ঘৃণা একই জৈবিক অনুভূতির দুটো স্বতন্ত্র দিক।

"প্রকৃত অবস্থাটা যদি আমরা বুঝতে পারতাম তাহলে জীবনটা দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠত; কিন্তু আমরা বুঝতে পারি নি, কোন জিনিসের আসল চেহারা আমাদের চোখে পড়ে নি। একজন মানুষের জীবনযাত্রা যতই ভুল হোক সেটাকে সে নিজের কাছ থেকে গোপন রাখতে পারে, নিজের অবস্থার শোচনীয়তাকে ঢেকে রাখতে পারে; এখানেই একাধারে মানুষের মুক্তি ও

শান্তি। আমরাও তাই করেছি। ঘর সাজানো, নিজের ও ছেলেমেয়েদের সাজগোজের ব্যবস্থা করা, পড়াশুনা করা, ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখা—সংসারের এই সব ছোটখাট আজেবাজে কাজ নিয়ে সে অন্য সব কিছু ভুলে থাকত। আমারও অন্য নেশা ছিল—কাজের নেশা, শিকারের নেশা, তাসের নেশা। দুজনই সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতাম। দুজনই ভাবতাম, যত বেশী ব্যস্ত থাকতে পারব, ততই অন্যের প্রতি খারাপ ব্যবহারের অধিকার পাব। ওকে উদ্দেশ্য করে আমি মনে মনে বলতাম, 'ও রকম মুখ করা তোমাকেই সাজে, হৈ-চৈ করে সারাটা রাত আমাকে জাগিয়ে রেখেছ।' সে কিন্তু মনে মনের বদলে বেশ উঁচু গলায়ই বলত, 'তুমিই বা কোন্ ভালটা করেছ, বাচ্চা-টাকে নিয়ে আমিও তো সারা রাত জেগে কাটিয়েছি।'

"এইভাবেই আমাদের জীবন কাটতে লাগল; একটা কুয়াশা যেন প্রকৃত অবস্থাটা আমাদের দৃষ্টি থেকে সরিয়ে রাখত। আর পরবর্তীকালে যা ঘটল সেটা যদি না ঘটত তাহলে আমিও হয়তো বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারতাম। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত ভাবতে পারতাম যে আমার জীবনটা ভালই ছিল —খুব ভাল না হলেও যথেষ্ট ভাল—যে ধরনের জীবন সকলেই কাটিয়ে থাকে; দুঃখ-দুর্দশা ও মিথ্যাচারের কোন্ অতল গহ্বরে যে গড়াগড়ি খাচ্ছিলাম তা কোনদিনই বুঝতে পারতাম না।

"আমরা ছিলাম যেন দুটি চরম শত্রু; একটিমাত্র শিকল দিয়ে একত্রে খোঁটায় বাঁধা; পরস্পরের জীবনকে বিষময় করে তুলেছি, অথচ সেটা স্বীকার করি নি। তখনও জানতাম না যে শতকরা নিরানব্বইটি স্বামী-স্ত্রীই এইভাবেই বেঁচে থাকে, আর এটাই অনিবার্য। সেসময়ে কি নিজের ব্যাপারে কি অন্যের ব্যাপারে, এই কথাটা আমার জানা ছিল না।"

"ঠিক পথেই চলি আর ভুল পথেই চলি, জীবনে কী বিচিত্র যোগাযোগই না ঘটে! বাবা-মার পক্ষে জীবন যখন অসহ্য হয়ে ওঠে, তখনই হয় তো ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য শহরে যাওয়ার দরকার দেখা দেয়। এই দরকার আমাদের সামনেও দেখা দিল।"

সে চুপ করল। দু'বার চাপা ফোঁপানির মত শব্দটা করল। একটা স্টেশনের কাছে এসে পড়েছি।

"ক'টা বাজে?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

ঘড়ি দেখলাম। দুটো বাজে।

"আপনার ক্লান্তি লাগছে না?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"না, কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই ক্লান্ত।"

"আমার দম আটকে আসছে। একটু হাঁটব। একটু জল খাব।"

টলতে টলতে পা ফেলে করিডর ধরে সে চলে গেল। একা বসে বসে তার কথাগুলিই ভাবতে লাগলাম। নিজের চিন্তায় এতই মগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম

যে অন্যদিকের দরজা দিয়ে সে কখন ফিরে এসেছে তা খেয়ালই করি নি।

আঠার

সে শুরু করল, "আমি শান্তভাবে কথা বলতে পারি না। এসব কথা ভেবে অনেক সময় কাটিয়েছি, অনেক কিছুকে নতুন চোখে দেখতে শিখেছি; আমার কথা অন্যকে শোনাতে চাই।

"হ্যাঁ, আমরা শহরে বাস করতে লাগলাম। অসুখী লোকদের পক্ষে শহরে বাস করাই সহজ। অনেক আগেই মরে ধুলোয় মিশে গেছি এটা না বুঝেও শহরে একশ' বছর বেঁচে থাকা যায়। 'নিজেকে জানো'-র কোন অবকাশ সেখানে নেই। সকলেই অতিমাত্রায় ব্যস্ত। ব্যবসার কাজকর্ম, সামাজিক দাবী, স্বাস্থ্য, চারুকলা, ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য, তাদের লেখাপড়া। আজ অমুক-অমুককে আপ্যায়িত কর; কাল অমুক-অমুকের সঙ্গে দেখা কর। এটা দেখ, ওটা শোন। শহরে সব সময়ই একজন, বা দুজন, বা তিনজন এমন বিখ্যাত লোক থাকবেই যাদের উপেক্ষা করা যায় না। এটা, ওটি, বা আরেকটির চিকিৎসা করাতে হবে; মাস্টারমশাই আছে, গৃহশিক্ষক আছে, শিক্ষয়িত্রী আছে; মোটের উপর জীবনটা কিন্তু একটা পিপের মতই ফাঁকা।

"এইভাবে চলতে লাগল; একত্রে থাকার যন্ত্রণার খানিকটা উপশম হল। প্রথম মাসটা তো নতুন শহরে, নতুন ফ্ল্যাটে গুছিয়ে বসা এবং শহর থেকে গ্রামে যাওয়া আর গ্রাম থেকে শহরে আসার আকর্ষণীয় কাজেই কেটে গেল।"

"একটা শীত চ'লে গেল; পরের শীতে এমন একটা কিছু ঘটল যেটা দেখতে অতি সাধারণ তুচ্ছ ঘটনা হলেও তার ফলেই পরবর্তীকালের সেই ঘটনাটা ঘটেছিল। আমার স্ত্রীর শরীব ভাল যাচ্ছিল না, আর ঐ রাস্কেলগুলো জানিয়ে দিয়েছিল যে তার সন্তান হওয়া উচিত নয় এবং কিভাবে সন্তানের জন্ম রোধ করা যায় তাও তাকে শিখিয়ে দিয়েছিল। এটা আমার কাছে খুব আপত্তিকর বলে মনে হল। বাধা দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম, কিন্তু ও ছেলেমানুষের মত জেদ ধরল, আর আমিও মেনে নিলাম। আমাদের পাশবিকতার শেষ অজুহাত—সন্তান—তাও আর রইল না; জীবন আরও বিরক্তিকর হয়ে উঠল।

"চাষী ও শ্রমিকদের সন্তানের প্রয়োজন আছে; তাদের খাওয়ানো যত শক্তই হোক, সন্তানের প্রয়োজন তাদের আছেই, আর তাই তাদের দাম্পত্য জীবনেরও একটা যুক্তি আছে। কিন্তু আমরা অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা বিনা প্রয়োজনেই সন্তান লাভ করি, তাদের জন্য বাড়তি ঝঞ্ঝাট ও বাড়তি ব্যয় বহন করি; তারা সম্পত্তির অবাঞ্ছিত ভাগীদার, তারা বোঝাস্বরূপ। কাজেই আমাদের পাশবিকতার কোন যুক্তিই আমরা খুঁজে পাই না। হয়

সন্তানের জন্ম থেকে রেহাই পাবার জন্য কৃত্রিম পন্থা অবলম্বন করি, আর না হয় তো তাদের মনে করি যথেষ্ট সতর্কতার অভাবের ফলস্বরূপ দুর্ভাগ্য ও ভ্রান্তি, আর সেটাই সব চাইতে বিরক্তিকর। কোন যুক্তি নেই। কিন্তু আমরা এতই নীচে নেমে গেছি যে যুক্তির প্রয়োজনীয়তাটাও স্বীকার করি না। আজকের দিনে অধিকাংশ শিক্ষিত লোকই ব্যভিচারের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েও এতটুকু বিবেকের যন্ত্রণা সহ্য করে না।

"আর বিবেকের বালাই-ই যখন নেই তখন বিবেকের যন্ত্রণাই বা আসবে কোথা থেকে? অবশ্য জনমত বা ফৌজদারি দণ্ডবিধিকে যদি এক ধরনের বিবেক বলা হয় সেকথা আলাদা। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে তার কোনটাকেই লংঘন করা হয় না; জনমত এতে বাধা দিতে পারে না, কারণ সকলেই একাজ করে, এমন কি মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না এবং আইভান জাখারিচ-ও। (সে কি? তোমরা কি চাও যে আমরা একগাদা ভিখারিকে জন্ম দেই অথবা সমাজে চলাফেরা করার সুযোগ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করি?) আর ফৌজদারি দণ্ডবিধি? এখানে তো ভয়ের কিছুই নেই। কেবল ইতর মেয়েমানুষ আর সৈনিকদের প্রেয়সীরাই তাদের বাচ্চাকে পুকুরে ও কুয়োয় ফেলে দেয়; ওদের তো কারাগারে ঢোকাতেই হবে, কিন্তু আমরা তো সব কিছুই যথাসময়ে এবং স্বাস্থ্যসম্মতভাবেই করে থাকি।

"এইভাবে আরও দুটি বছর কাটালাম। রাস্কেলদের ব্যবস্থাগুলো কার্যকর হল। আমার স্ত্রী ফুলের মত ফুটে উঠল, শেষ বসন্তের ফুলের মত হয়ে উঠল আরও মজবুত, আরও সুন্দরী। সেটা বুঝতে পেরে সে নিজের দিকে আরও বেশী করে নজর দিতে লাগল। তার রূপে লোককে টানবার, তাকে বিচলিত করবার মত কিছু ছিল। তার তখন ভরন্ত যৌবন, বয়স ত্রিশ, ছেলেপুলে হয় না, দেহ হৃষ্টপুষ্ট, মেজাজ চড়া। তাকে দেখলেই মন উচাটন হয়। যেখানেই যায় পুরুষের নজর টানে। সে যেন একটা হৃষ্টপুষ্ট, সুসজ্জিত ছেড়ে-দেওয়া ঘোড়া যার গলায় হঠাৎ রাশ পরানো হয়েছে। আমাদের মহিলাদের শতকরা নিরানব্বই জনের যেমন কোন রাশ থাকে না, তেমনি তারও কোন রাশ ছিল না! সেটা বুঝতে পেরে আমার ভয় হল।"

উনিশ

উত্তেজিতভাবে উঠে গিয়ে সে জানালার ধারে একটা আসনে বসল।

যেতে যেতে বলল, "মাপ করবেন।" প্রথম মিনিট তিনেক জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বসে রইল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার আমার পাশে এসে বসে পড়ল। মুখটা বদলে গেছে, চোখের দৃষ্টি করুণ হয়ে উঠেছে, হাসির মত একটা কিছুতে ঠোঁট দুটো কুঁচকে গেছে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে সে বলতে লাগল, “একটু ক্লান্ত লাগছে, তবু বলব। এখনও অনেক সময় হাতে আছে, এখনও আলো ফুটতে শুরু করে নি। সত্যি, বাচ্চা হওয়া বন্ধ হবার পর থেকেই আমার স্ত্রী বেশ সুন্দর ও মোটাসোটা হয়ে উঠল, আর তার সেই রোগটাও—ছেলেমেয়েদের নিয়ে অবিরাম দুর্ভোগ—কমে গেল। একেবারে সেরে গেল তা নয়, কিন্তু নেশার ঘোর কেটে যাবার পর হঠাৎ চারপাশের জগৎটাকে আনন্দে ভরা দেখার মত সেও যেন যে-জগৎটাকে ভুলে গিয়েছিল, যে-জগৎটাকে সে ভালবাসতে পারে নি, বুঝতে পারে নি, তাকে যেন নতুন করে দেখতে পেল। ‘একে আমি চলে যেতে দেব না। সময় চলে যাচ্ছে, সে আর কখনও ফিরবে না।’ মনে হল, সে ঠিক এই রকমটাই ভেবেছে, বা অনুভব করেছে, কারণ অন্য কিছু সে ভাবতে বা অনুভব করতে পারে না; সে তো এই বিশ্বাস নিয়েই বড় হয়েছে যে জীবনে একটি-মাত্র কাম্যবস্তু আছে—ভালবাসা। তার বিয়ে হয়েছে, এবং যদিও সে ভাল-বাসা থেকে কিছু না কিছু সে পেয়েছে, তবু সে যা আশা করেছিল, যা দেবার প্রতিশ্রুতি তাকে দেওয়া হয়েছিল, তা সে পায় নি, বরং ছেলেমেয়েদের ভিতর দিয়ে একটা অপ্রত্যাশিত রকমের যন্ত্রণা ছাড়াও বিয়ের ফলে সে পেয়েছে হতাশা ও দুঃখ। এই যন্ত্রণা তাকে ক্ষয় করে দিয়েছে। কিন্তু এখন, হিতৈষী ডাক্তারদের ধন্যবাদ, সে জেনেছে যে সন্তান হবার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। সে খুশি হয়ে উঠল, এই নতুন অনুভূতি তার ভাল লাগল, জীবনের একটিমাত্র উদ্দেশ্যের জন্য সে নবযৌবনবতী হল—সেটি ভালবাসা। কিন্তু একটি নোংরা, ঈর্ষাতুর, ঘৃণিত স্বামীর সঙ্গে ভালবাসা নয়। নতুন, পবিত্র এক আলাদা রকমের ভালবাসার স্বপ্ন সে দেখতে লাগল। অন্তত আমি তাই ভেবেছিলাম। আর যেন কারও প্রতীক্ষায় আছে এইভাবে সে চারদিকে নজর রাখতে লাগল। সবই দেখলাম, আতংকিত হলাম। দিনের পর দিন তার অভ্যাসমত অন্যের মারফতে সে যখন আমার সঙ্গে কথা বলত—অর্থাৎ কথা বলত অন্যের সঙ্গে, কিন্তু কথাগুলি শোনাত আমাকে—তখন সে বেশ সাহসের সঙ্গে আধা তামাসার ভঙ্গীতে বলত ছেলেমেয়ের প্রতি মায়ের আকর্ষণ একটা ফাঁকি, যতদিন যৌবন থাকে, জীবনকে উপভোগ করবার শক্তি থাকে, ততদিন ছেলেমেয়ের জন্য জীবনকে বলি দেবার কোন অর্থ হয় না। কাজেই তার ছেলেমেয়েদের প্রতি নজর দেওয়া কমে গেল, যেটুকু দিত তাতেও আগেকার সেই বেপরোয়া তীব্রতা থাকত না; নিজের ও নিজের চেহারার পিছনেই সে বেশীর ভাগ সময় কাটিয়ে দিত। পিয়ানো বাজনায় আবার হাত দিল। আর এইভাবেই সব কিছুর সূত্রপাত হল।”

তার ক্লান্ত চোখ দুটি আবার জানালার দিকে ফিরে গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে চোখ ফিরিয়ে নিল; মনে হল যেন জোর করেই কথা বলতে শুরু করল।

"আর তারপরেই সেই লোকটি এল।"

একটু থেমে দু'তিনবার সেই অদ্ভুত শব্দটা করল। বুঝতে পারলাম, সে লোকটির নাম বলতে, তার কথা স্মরণ করতে, তার কথা বলতে লোকটির কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু সে জোর করেই বলতে লাগল; কণ্ঠস্বরে দৃঢ়সংকল্প ফুটে উঠল; জোর করেই সব বাধা দূরে সরিয়ে দিল।

"মনে হল, লোকটি অতিশয় নীচ। আমার জীবনে তার যে ভূমিকা সে-জন্য নয়, লোকটি আসলেই নীচ। তার এই নীচতাই প্রমাণ করে আমার স্ত্রী কতখানি কাণ্ডজ্ঞানহীন ছিল। সে না হয়ে যদি আর কেউ হত—তাহলেও এই ঘটত!" আবার সে থামল। "লোকটা ছিল বাজিয়ে, বেহালা বাজাত; পেশাদার বেহালাদার নয়—আধা বাজিয়ে, আধা বাবু মানুষ। তার বাবা ছিলেন একজন জমিদার, আমার বাবার প্রতিবেশী। তার বাবা সব টাকা-পয়সা উড়িয়ে দিয়ে ছেলেদের—তিনটি ছেলে—পাঠিয়ে দিল কাজ করতে, কিন্তু ছোট ছেলেটিকে পাঠাল প্যারিসে তার ধর্ম-মায়ের কাছে। তার গান-বাজনার দিকে ঝোঁক থাকায় তাকে একটা বাজনার স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হল। বেহালাবাজিয়ে হিসাবে শিক্ষা শেষ করে সে কনসার্ট বাজাতে লাগল। মানুষ হিসাবে সে ছিল"—স্পষ্টতই তার সম্পর্কে একটা খারাপ কথা সে বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু নিজেকে সংযত করে সে আবার শুরু করল। "সেখানে সে কি ধরনের জীবন যাপন করত আমি বলতে পারি না; আমি শুধু জানি, সেইবছরই সে রাশিয়ায় ফিরে এসে আমার বাড়িতে এল।

"ভিজে, বাদামের মত চোখ, হাসি-হাসি লাল ঠোঁট, মোমে-মাজা গোঁফ, আধুনিক কায়দার কেশসজ্জা, দেখতে অশ্লীল গোছের ভাল, যাকে মেয়েরা বলে 'মন্দ নয়,' শরীরটা দুর্বল কিন্তু দেখতে খারাপ নয়, পেছনটা মোটাসোটা, যেমনটি মেয়েদের থাকে, বা হটেনটট-দের (দক্ষিণ আফ্রিকার একটি জাতি) থাকে। শুনেছি হটেনটট-রাও গান-বাজনা পছন্দ করে। সুযোগ পেলেই আপনজন হয়ে উঠতে পারে, আবার স্পর্শকাতর হওয়ায় সামান্য বাধা পেলেই মুখ ঘুরিয়ে নেয়। চাল-চলনে মর্যাদার আভাষ, বিশেষ প্যারিসীয় ধরনের বোতাম-আঁটা জুতো পরে, ঝকঝকে নেক-টাই, আরও এমন সব জিনিস যা বিদেশীরা প্যারিসে এলেই রপ্ত করে নেয় এবং অভিনবত্ব ও মৌলিকতার গুণে যা মেয়েদের মনোহরণ করে থাকে। ভাব-ভঙ্গীতে একটা কৃত্রিমতার আভাষ, কথা বলত এমন ঠারে-ঠুরে যেন সে কি বলতে চায় তা সকলেই জানে এবং নিজেরাই বাকিটা বুঝে নিতে পারে।

"সব কিছুর মূলে ঐ লোকটি আর তার বাজনা। বিচারের সময় বোঝানো হয়েছিল যে ঈর্ষার জন্যই সব কিছু ঘটেছিল। মোটেই তা নয়, মানে ঠিক যে ওটা নয় তাও নয়, কিন্তু তবু—ঠিক ওটা নয়। বিচারে স্থির হল, স্বামী হিসাবে আমার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে, আর আমার সম্মান রক্ষার জন্যই

আমার স্ত্রীকে খুন করেছি। কাজেই আমাকে ছেড়ে দেওয়া হল। বিচারের সময় প্রকৃত অবস্থাটা বোঝাবার চেষ্টা আমি করেছিলাম, কিন্তু তারা ভাবল যে আমি আমার স্ত্রীর সুনাম রক্ষার চেষ্টা করছি।

"সেই বাজনাদারের সঙ্গে আমার স্ত্রীর সম্পর্ক যাই হোক, তাতে আমার কিছু যায়-আসে না, আমার স্ত্রীরও না। একমাত্র যেটা ভাববার মত জিনিস তার কথা তো আপনাকে আগেই বলেছি—আমার পশু-ভাব। সব কিছু ঘটেছিল কারণ আমাদের মধ্যে ছিল একটা ভয়ংকর ফাঁক; আমাদের পারস্পরিক ঘৃণার চাপ এত বেশী ছিল যে সামান্যতম উস্কানিতেই তা একেবারে ফেটে পড়ত। আমাদের ঝগড়াঝাটি ভয়ংকর হয়ে দাঁড়িয়েছিল; সেটা আরও ভয়ংকর এই কারণে যে সেইসব ঝগড়াঝাটির ফাঁকে ফাঁকেই চলত আমাদের তীব্র জান্তব কামনার পর্ব।

"সে লোকটির আগমন যদি না ঘটত, তাহলে অন্য কেউ আসত। এর মূল কারণ যদি ঈর্ষা না হয়, তাহলে নিশ্চয় অন্য কিছু। আমার বক্তব্য হল, যারাই আমার মত জীবন যাপন করে তারাই হয় সম্পূর্ণ ভ্রষ্টচরিত্র হবে, নয় তো তাদের স্ত্রীকে পরিত্যাগ করবে, অথবা নিজেদের বা স্ত্রীদের খুন করবে, যেমন আমি করেছি। যদি কেউ এর হাত থেকে রেহাই পায় তাহলে সে একটি বিরল ব্যতিক্রম। কাজটা শেষ করবার আগে অনেকবার আমি আত্মহত্যার মুখোমুখি হয়েছি, আর আমার স্ত্রীও বিষ খাবার চেষ্টা করেছে।"

কুড়ি

"হ্যাঁ, শেষ পরিণতির আগে অবস্থাটা এইরকমই দাঁড়িয়েছিল। এমন একটা যুদ্ধ-বিরতির পরিস্থিতিতে আমরা ছিলাম যেটা আমাদের দুজনেরই মেনে চলা উচিত ছিল। কিন্তু একদিন আমি বললাম যে, প্রদর্শনীতে একটা কুকুর একটা পদক পেয়েছে।

আমার স্ত্রী বলল, 'পদক নয়, প্রশংসাপত্র।'

"তর্কাতর্কি শুরু হল। এক বিষয় থেকে অন্য বিষয় এসে পড়ল। ভর্ৎসনাও শুরু হল: 'আহা, সেকথা সকলেই জানে; সর্বদা তো ওই হয়। তুমি বলেছিলে…'

'ওরকম কোন কথা আমি বলি নি!'

'তার মানে, আমি মিথ্যাবাদী!'

"বুঝতে পারলাম, এমন একটা ভয়ংকর ঝগড়ার একেবারে শেষ প্রান্তে আমরা পৌঁছে গেছি যে আমার ইচ্ছা হল তাকে বা নিজেকে খুন করে ফেলি। আমি ঠিক বুঝেছিলাম, আমরা ততদূর পৌঁছে গেছি, আর তখনি আমি

সেটাকে জলন্ত আগুনের মত ভয় পেলাম। নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু ক্রোধে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছিল। আমার স্ত্রীরও সেই একই অবস্থা, বা আরও খারাপ অবস্থা; ইচ্ছা করেই সে আমার বক্তব্যকে বিকৃত করল, তার ভুল অর্থ করল। তার প্রতিটি কথায় যেন বিষ মাখানো; আমার দুর্বলতম স্থানগুলি বেছে নিয়ে সে সেখানেই আঘাত করতে লাগল। চলল তো চললই। আমি চীৎকার করে উঠলাম, 'রসনা সংযত কর!' অথবা ঐ-রকমই অন্য কোন কথা। সে লাফ দিয়ে উঠে বাচ্চাদের ঘরের দিকে ছুটে গেল। আমার বক্তব্য শেষ করবার জন্য ওকে থামাতে চেষ্টা করলাম। তার হাতটা চেপে ধরলাম। আঘাত লাগার ভান করে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'বাছারা! তোমাদের বাবা আমাকে মারছে!'

আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'মিথ্যা কথা বলো না।'

সেও পাল্টা চীৎকার করে বলল, 'এই তো প্রথম নয়।'

"ছেলেমেয়েরা তার কাছে ছুটে গেল। সে তাদের শান্ত করতে চেষ্টা করল।

'ভনিতা ছাড়ো,' আমি বললাম।

'তোমার কাছে তো সবই ভান; একটা মানুষকে খুন করেও তুমি বলতে পার যে সে খুন হওয়ার ভান করছে। এখন আমি সব বুঝতে পেরেছি—তাই তুমি চাও!'

'তুমি মর তাই আমি দেখতে চাই,' আমি আর্তকণ্ঠে বললাম।

"নিজের কথায় আমি নিজেই যে কতখানি আতংকিত হয়েছিলাম সেটা আজও মনে পড়ে। কখনও ভাবতেও পারি নি যে ওরকম কঠোর, ভয়ংকর কথা আমি বলতে পারি; কথাগুলো আমার মুখ থেকে বেরিয়েছে, তা যেন আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। বাচ্চাদের কান্নাকাটির মধ্যেই আমি দৌড়ে পড়ার ঘরে চলে গেলাম, সেখানে বসে বসে ধূমপান করতে লাগলাম। শুনতে পেলাম, সে হল-এ ঢুকে জামাকাপড় পড়ছে। জিজ্ঞাসা করলাম, সে কোথায় যাচ্ছে। কোন জবাব দিল না। 'গোল্লায় যাক,' নিজের মনেই বললাম, তারপর পড়ার ঘরে গিয়ে শুয়ে শুয়ে ধূমপান করতে লাগলাম।

"তার উপর প্রতিশোধ নেবার, তার হাত থেকে রেহাই পাবার, সব কিছু মিটমাট করে যেন কিছুই হয় নি এমনভাবে চলবার হাজার ফন্দি মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল শুয়ে শুয়ে ভাবছি, আর ধূমপান করছি তো করছি, করছি তো করছি। ভাবলাম, তার কাছ থেকে দূরে চলে যাই, কোথাও গিয়ে লুকিয়ে থাকি, আমেরিকা যাত্রা করি। এমন কি তাকে ছেড়ে জীবন চালাবার কথাও কল্পনা করতে লাগলাম। কী চমৎকারই না হবে, সম্পূর্ণ আলাদা রকমের আর একটি চমৎকার নারীর সঙ্গে আমার জীবনকে কেমনভাবে যুক্ত করে দেব। তার মৃত্যু ঘটিয়ে অথবা তার সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে তার হাত থেকে

মুক্তি পাব। কিভাবে এটা করা যায় তাই ভাবতে লাগলাম।

"বাড়িতে জীবনযাত্রা যেরকম চলছিল সেই রকমই চলতে লাগল। শিক্ষয়িত্রী এসে জানতে চাইল, কর্ত্রী কোথায় গেছেন এবং কখন ফিরবেন। পরিচারক এসে জিজ্ঞাসা করল, চা দেবে কি না। খাবার ঘরে গেলাম। ছেলেমেয়েরা বিশেষ করে লিজার সবকিছু বুঝবার মত বয়স হয়েছে, নিস্পৃহ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাতে লাগল। চুপচাপ বসে চা খেলাম। সে ফিরল না। সন্ধ্যা উত্‌রে গেল, তখনও ফিরল না। আমার মনে দুটো অনুভূতির লড়াই শুরু হল; সে যখন জানে যে ফিরে আসতে হবেই তখন এইভাবে দূরে থেকে আমাকে ও ছেলেমেয়েদের জ্বালাবার জন্য তার উপর রাগ হতে লাগল; আবার ভয়ও হল যে সে আর ফিরবে না, আত্মঘাতী হবে। তাকে খুঁজতেই হয়তো যেতাম, কিন্তু কোথায় যাব? তার বোনের বাড়ি? সেখানে গিয়ে তার খোঁজ করাটাই তো হবে বোকামি, আর সেটাই তো সে চাইছে চুলোয় যাক। কাউকে কষ্ট দেবার যখন এতই ঝোঁক, তখন নিজেই কষ্ট পাক। নইলে পরের ঝগড়াটা তো আরও শোচনীয় হবে। কিন্তু সে যদি বোনের বাড়ি না গিয়ে থাকে, যদি তার আত্মঘাতী হবার ইচ্ছা হয়, বা এর মধ্যেই যদি আত্মঘাতী হয়ে থাকে, তাহলে?

"এগারোটা বাজল, বারোটা…। শোবার ঘরেই গেলাম না—একা একা শুয়ে শুয়ে অপেক্ষা করা তো বোকামি। পড়ার ঘরেও শুয়ে থাকতে পারলাম না। একটা কোন কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে চাইলাম, কিছু লেখা বা পড়া, কিন্তু কিছুই করতে পারলাম না। পড়ার ঘরে একা বসে রইলাম—ক্রুদ্ধ, চিন্তায় জর্জরিত সামান্যতম শব্দের জন্য উৎকণ্ঠিত।

"তিনটে বাজল, চারটে বাজল—সে এল না। ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙল। সে আসে নি।

"বাড়িতে কাজকর্ম যথারীতি চলছে, কিন্তু সকলেই বিচলিত, যেন সব দোষ আমার এমনিভাবে সকলেই আমার দিকে সপ্রশ্ন ও তিরস্কারের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। আর আমার মধ্যে চলেছে সেই একই সংঘাত—আমাকে যন্ত্রণা দেওয়ার জন্য তার উপর রাগ আর তার জন্য উদ্বেগ।

"বেলা এগারোটা নাগাদ তার বোন এল দূত হয়ে। সে যথারীতি শুরু করল: 'তার অবস্থা সাংঘাতিক। কি হয়েছে?'

'কেন, কিছুই হয় নি।' আরও বললাম, 'ওর প্রকৃতিই ওই রকম; আমি কিছুই করি নি।'

'কিন্তু এ অবস্থা তো চলতে পারে না,' তার বোন বলল।

আমি বললাম, 'সেটা তার দেখবার কথা, আমার নয়। আমি আগবাড়িয়ে কিছু করতে পারব না। যদি আলাদা হতে হয়, তো আলাদাই হব।'

"আমার শ্যালিকা অসন্তুষ্ট হয়ে ফিরে গেল। তাকে জোর গলায় বলে-

ছিলাম যে আমি আগ-বাড়িয়ে কিছু করব না, কিন্তু সে চলে গেলে বাইরে এসে ছেলেমেয়েদের ভীত, করুণ মুখগুলি দেখে সে মত পাল্টাতেও রাজী হলাম। নিজে থেকে কিছু করতে পারলে তখন আমি খুশিই হতাম, কিন্তু কি করে কি করব বুঝতে পারলাম না। আবার ঘরময় পায়চারি করতে করতে ধূমপান করতে লাগলাম। প্রাতরাশে ভদ্‌কা ও মদ খেলাম ; নিজের অজ্ঞাতেই যা চাইছিলাম ক্রমে ক্রমে সেই অবস্থাই ফিরে পেলাম : যেপথ ধরেছি তার নীচতা ও নির্বুদ্ধিতার কথা ভুলে গেলাম।

"তিনটে নাগাদ আমার স্ত্রী বাড়ি ফিরল। আমাকে দেখে কিছুই বলল না। সে অনুতপ্ত হয়েছে মনে করে আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম যে তার গালা-গালিতে রেগে গিয়েই কথাগুলি আমি বলে ফেলেছিলাম। কিন্তু সেই একই কঠিন বিকৃত মুখে সে বলল, কৈফিয়ৎ শুনতে সে আসে নি, এসেছে ছেলে-মেয়েদের নিতে ; আমাদের পক্ষে একসঙ্গে থাকা আর সম্ভব নয়। আমি বলতে চাইলাম যে সেটা আমার দোষ নয়, সেই আমাকে বেপরোয়া করে তুলেছিল। মুহূর্তের জন্য সে কঠোর দৃষ্টিতে দৃপ্ত ভঙ্গীতে আমার দিকে তাকাল, তারপর বলল : 'আর কোন কথা নয়, একদিন তোমাকে অনুতাপ করতে হবে।'

"আমি বললাম, নাটুকেপনা আমার সহ্য হয় না এতে সে দুর্বোধ্য ভাষায় চেঁচাতে চেঁচাতে তার ঘরের দিকে চলে গেল। দরজায় চাবি ঘুরাবার শব্দ শুনলাম—দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে। ধাক্কা দিলাম, কোন সাড়া নেই ; রেগে চলে এলাম। আধ ঘণ্টা পরে লিজা কাঁদতে কাঁদতে দৌড়ে এল।

'কি হয়েছে ? কোন কিছু ঘটেছে কি ?'

'মামণির ঘর থেকে কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না।'

"আমরা সেঘরে গেলাম। প্রাণপণে দরজা ধরে টানলাম। তালায় আটকাল না, দরজার দুটো পাল্লাই খুলে গেল। বিছানার কাছে ছুটে গেলাম। স্কার্ট ও বুট পরা অবস্থায়ই অদ্ভুত ভঙ্গীতে সে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। বিছানার পাশের টেবিলে আফিমের একটা খালি শিশি পড়ে আছে। তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনা হল। আবার চোখের জল, এবং শেষ পর্যন্ত মিলন। কিন্তু সত্যিকারের মিলন নয় ; পুরনো তিক্ততা দুজনের মনেই রয়ে গেল ; বরং তার সঙ্গে যুক্ত হল এই ঝগড়ার দুর্ভোগের জন্য আক্রোশ, আর সেজন্য দুজনই দুজনের উপর দোষারোপ করতে লাগলাম। কিন্তু সে আক্রোশ তো চিরদিন পুষে রাখা যায় না, তাই জীবন আবার তার পুরনো খাতেই বয়ে চলল। মাসে একবার, সপ্তাহে একবার, দিনে একবার করে এ-ধরনের এবং এর চাইতেও বাজে ঝগড়া চলতেই লাগল। বারে বারে একই ব্যাপার। একবার বিদেশে চলে যাবার জন্য পাশপোর্টের দরখাস্ত করলাম (ঝগড়াটা তখন দুদিন ধরে চলছিল) কিন্তু তারপরেই কিছুটা বোঝাপড়া

হল, কিছুটা মিল হল, আর আমারও যাওয়া হল না।"

একুশ

সেই লোকটি যখন দর্শন দিল তখন এই ছিল পরিস্থিতি। মস্কোতে পৌঁছেই সে (তার নাম ক্রুখাচেভ্‌স্কি) আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। সকালে সে এল। আমি তাকে অভ্যর্থনা করলাম। একসময়ে আমাদের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। কথাবার্তার সময় সে চেষ্টা করল সেই ঘনিষ্ঠতা ফিরিয়ে আনতে কিন্তু গোড়াতেই বুঝিয়ে দিলাম যে আমি সেটা চাই না, আর সেও তদনুসারেই নিজেকে মানিয়ে নিল। দেখামাত্রই তাকে আমার খারাপ লেগেছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য, একটা অদ্ভুত সর্বনাশা শক্তির তাড়নায় আমি তাকে প্রতিহত করতে পারলাম না, দূরে সরিয়ে দিতে পারলাম না; বরং তাকে উৎসাহই জোগালাম। তাকে যদি নিস্পৃহভাবে অভ্যর্থনা করতাম, আমার স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় না করিয়ে দিয়েই যদি তাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিতাম, তাহলে আমার পক্ষে কী ভালই না হত! কিন্তু না, তার সঙ্গে বাজনার কথা বললাম; কে যেন আমাকে বলেছিল যে সে বেহালা ছেড়ে দিয়েছে—সে কথাও বললাম। কথাটা অস্বীকার করে সে বলল যে সে বরং আগেকার চাইতে বেশী করে বাজাচ্ছে। সে মনে করিয়ে দিল যে একসময় আমিও বাজাতাম। আমি বললাম, এখন আর আমি বাজাই না। তবে আমার স্ত্রী খুব ভাল বাজায়।

"আরও আশ্চর্যের ব্যাপার: তার এই আগমনের ফলাফল আগে থেকে জানতে পারলে তার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা যেরকম হতে পারত, প্রথম দিন থেকেই, প্রথম ঘণ্টা থেকেই তার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা সেইরকম রূপই নিল। আমাদের মধ্যে একটা স্নায়ুর চাপ দেখা দিল; আমাদের প্রতিটি কথা, প্রতিটি ভাব আমি লক্ষ্য করতাম এবং তার বিশেষ অর্থ খুঁজে বার করতাম।

"আমার স্ত্রীর সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলাম। আলোচনাটা সঙ্গে সঙ্গে বাজনার দিকে মোড় নিল, আর সেও এসে তার সঙ্গে বাজাবার প্রস্তাব করল। আমার স্ত্রী সেজেছিল সুন্দরী মনমোহিনী সাজে (আজকাল তাই সে করত), তাকে দেখে মাথা ঘুরে যাবারই কথা। মনে হল, প্রথম থেকেই আমার স্ত্রীর লোকটিকে ভাল লাগল। পিয়ানো ও বেহালার সঙ্গত করবার সম্ভাবনায় সে উল্লসিত হয়ে উঠল, কারণ এই দ্বৈত বাজনাটা সে বিশেষভাবে ভালবাসত এবং একসঙ্গে বাজাবার জন্য প্রায়ই সে থিয়েটার থেকে একজন বেহালাদার ভাড়া করে আনত। তার খুশির ভাবটা মুখেই ফুটে উঠত। আমার মুখের দিকে একনজর তাকিয়েই সে আমার মনের অবস্থাটা বুঝে ফেলল: সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের ভাব বদলে গেল, আর শুরু হল পরস্পরকে

ঠকাবার লুকোচুরি খেলা। খুশির ভান করে আমি উদার হাসি হাসলাম। সব লম্পটরা স্ত্রীলোকদের দিকে যেভাবে তাকায় সেই লোকটিও আমার স্ত্রীর দিকে সেইভাবেই তাকাতে লাগল, কিন্তু এমন ভাব দেখাল যেন আমাদের আলোচনায় তার কত আগ্রহ, অথচ সেসব ব্যাপারে তার কোন আগ্রহই ছিল না। আমার স্ত্রী নির্বিকার থাকতে চেষ্টা করল। কিন্তু তার ঈর্ষাকাতর স্বামীর নকল হাসি (সে-হাসি সে ভাল করেই চেনে) এবং আমাদের অতিথির কামনাভরা দৃষ্টি দেখে সে বিচলিত না হয়ে পারল না। লোকটিকে প্রথম দেখামাত্রই আমার স্ত্রীর চোখে একটা বিশেষ উজ্জ্বলতা আমার চোখে পড়ল, এবং আমার ঈর্ষার জন্যই তাদের দুজনের মধ্যে এমন একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ বয়ে গেল যে তাদের দুজনেরই হাসি, দৃষ্টিপাত ও মুখের ভাব পরস্পরের উপর প্রতিফলিত হতে লাগল। আমার স্ত্রী লজ্জায় লাল হয়ে উঠল—লোক-টিও লজ্জায় লাল হল; লোকটি হাসল—আমার স্ত্রীও হাসল। সঙ্গীত, প্যারিস ও নানা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে তারা কথাবার্তা বলল। তারপর সে যাবার জন্য উঠল এবং টুপিটাকে কম্পিত হাঁটুর উপর রেখে আমরা কি করি সেটা দেখবার জন্য আমার স্ত্রীর দিকে ও আমার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল। সেইমুহূর্তটা বিশেষভাবে আমার স্মৃতির উপর দাগ কেটে আছে কারণ সেইমুহূর্তে আমি তাকে আবার আসবার জন্য আমন্ত্রণ না জানাতে পারতাম, আর তাহলে তো কিছুই ঘটত না। কিন্তু আমি তার দিকে তাকালাম, তারপর আমার স্ত্রীর দিকে তাকালাম এবং মনে মনে তাকে বললাম, 'ভেব না যে আমি ভয় পেয়েছি'; তারপরই কোন সন্ধ্যায় বেহালাটা নিয়ে এসে আমার স্ত্রীর সঙ্গে বাজাবার জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানালাম। আমার স্ত্রী অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল, লাল হয়ে উঠল এবং যেন ভয় পেয়েই আপত্তি জানিয়ে বলল যে সে এত খারাপ বাজায় যে অতিথিটির সঙ্গে বাজানই চলে না। তার এই আপত্তিতে আমি আরও উত্তেজিত হয়ে উঠ-লাম এবং বার বার লোকটিকে আসতে অনুরোধ করলাম। মনে পড়ে, সে যখন ঝুঁকে ঝুঁকে পা ফেলে পাখির মত লাফিয়ে লাফিয়ে ঘর থেকে চলে গেল তখন তার মাথার পিছন দিকে তাকিয়ে কালো চুলের নীচেকার সাদা ঘাড়টাকে উঠতে-নামতে দেখে আমার মনে একটা অদ্ভুতভাব জেগেছিল। নিজের কাছে এ সত্য স্বীকার না করে আমি পারলাম না যে ঐ লোকটার পাশে থাকতে আমার কষ্ট হচ্ছিল। ভাবলাম, 'তার সঙ্গে আবার দেখা হবে কিনা সেটা তো আমার উপরেই নির্ভর করে।' কিন্তু তার সঙ্গে দেখা না করার অর্থই তো তাকে আমি ভয় করি। না, আমি তাকে ভয় করি না। সেটাকে খুবই অপমানজনক বলে মনে হল। আর তাই সেই হলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমার স্ত্রী সব শুনতে পাবে জেনেই লোকটিকে জোর করে বললাম, সেদিনই সন্ধ্যায় তাকে বেহালাটা নিয়ে আসতে হবে। সেও কথা দিয়ে

চলে গেল।

"সেদিন সন্ধ্যায় বেহালা নিয়ে সে এল, দুজনে বাজাল। কিন্তু তেমন জমল না; ঠিকমত বাজানো হল না; সঙ্গীত আমার খুব প্রিয়; যথাসাধ্য তাদের সাহায্য করলাম—লোকটির জন্য একটা 'স্ট্যাণ্ড' এনে দিলাম, স্বরলিপির পাতা উল্টে দিলাম। কিছু কিছু জিনিস তারা বাজাল, কথাহীন কিছু গান আর মোজার্ট-এর একটা সুর। যন্ত্র থেকে সুন্দর সুর বের করে লোকটি চমৎকার বাজাল। এমন একটি সুন্দর রুচির পরিচয়ও সে রাখল যেটা তার চরিত্রের সঙ্গে মোটেই মেলে না।

"স্বভাবতই লোকটির বাজনা আমার স্ত্রীর বাজনার চাইতে অনেক বেশী ভাল; সে একদিকে যেমন আমার স্ত্রীকে সাহায্য করল, আবার তেমনি তাকে সশ্রদ্ধ প্রশংসাও জানাল। তার ব্যবহারও আশ্চর্য রকমের ভাল। আমার স্ত্রীর শুধু বাজাতেই আগ্রহ, তার আচরণও সহজ ও অকপট। আমিও বাজনাতে আগ্রহের ভান করলাম বটে কিন্তু সারাটা সন্ধ্যা ঈর্ষায় জ্বলে মরলাম।

"যেমুহূর্তে তাদের চোখাচোখি হল তখনই আমি দেখলাম, সামাজিক মর্যাদার সমস্ত আইন-কানুনকে নস্যাৎ করে দিয়ে তাদের দুজনকার ভিতরের পশুটা মাথা তুলে যেন প্রশ্ন করছে, 'হবে কি?' আর জবাব দিচ্ছে, 'নিশ্চয় হবে।' বুঝলাম মস্কোর মেয়ে আমার স্ত্রী যে এতদূর মনোরমা হবে তা সে আশা করে নি, তাই তাকে দেখে খুবই উৎফুল্ল হয়ে উঠল। আমার স্ত্রীকে যে সেভাবেই সেবিষয়ে মুহূর্তের জন্যও তার কোন সন্দেহ হয় নি। একমাত্র সমস্যা এই অসহ্য স্বামীটাকে কি করে বাগে আনা যায়। আমি স্বয়ং শুদ্ধচরিত্র হলে এটা বুঝতে পারতাম না, কিন্তু বিয়ের আগে অন্য সকলের মত আমি নিজেও মেয়েদের এই চোখেই দেখতাম, কাজেই খোলা বইয়ের মতই তার মনের কথা আমি পড়তে পারলাম। আমার যন্ত্রণা আরও বেড়ে গেল যখন সন্দেহাতীতভাবে বুঝতে পারলাম যে যৌন-সম্ভোগের কিছু ক্ষণিক মুহূর্ত ছাড়া আমার প্রতি আমার স্ত্রীর একমাত্র মনোভাব তখন বিরক্তিকর, আর এই লোকটি তার নীরবতা ও সুন্দর চেহারার জন্য, বিশেষত তার অসাধারণ সঙ্গীত প্রতিভার জন্য একসঙ্গে বাজাবার ফলে তাদের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠতা জন্মাবে তার জন্য, এবং সংবেদনশীল মনের উপর সঙ্গীতের (বিশেষ করে বেহালা বাজনা) প্রভাবের জন্য—এই লোকটিকে যে আমার স্ত্রীর পছন্দ হবে তাই নয়, নির্দ্বিধায় সে আমার স্ত্রীকে জয় করবে, চমকে দেবে, কড়ে আঙুলে জড়াবে, তাকে নিয়ে যা খুশি তাই করবে। একথা না ভেবে আমি পারলাম না, আর ফলে বর্ণনাতীত কষ্ট পেলাম। আর তা সত্ত্বেও, অথবা হয় তো সেইজন্যই, একটা শক্তি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে, এমন কি তাকে সমাদর করতে আমাকে বাধ্য করল। আমার স্ত্রীর জন্য, আমি যে লোকটিকে

ভয় করি না সেটা তাকে দেখাবার জন্যই আমি একাজ করেছিলাম, না কি আমার জন্য, আমাকে ঠকাবার জন্যই করেছিলাম। তা বলতে পারি না, কিন্তু একেবারে গোড়া থেকেই তার সঙ্গে সহজ, সরল হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সেইখানেই তাকে খুন করবার ইচ্ছাকে আমি দমন করে-ছিলাম তার প্রতি সদয় হয়ে। খাবারের সময় তাকে দামী মদ দিলাম, তার বাজনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলাম, তার সঙ্গে কথা বলার সময় মিষ্টি করে হাসলাম, পরের রবিবারে এসে আমাদের সঙ্গে খেতে এবং আবার আমার স্ত্রীর সঙ্গে বাজাতে আমন্ত্রণ করলাম। আরও বললাম, তার বাজনা শুনবার জন্য আমাদের কয়েকজন সঙ্গীতপ্রিয় বন্ধুকেও আমন্ত্রণ করব। সেখানেই সে সন্ধ্যাটা শেষ হল।"

অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে পজ্দ্নিশেভ নড়েচড়ে বসল; অদ্ভুত শব্দটা করল।

বেশ চেষ্টা করে নিজেকে শান্ত করে সে আবার শুরু করল। "কি আশ্চর্য প্রভাবই না সেই লোকটা আমার উপর বিস্তার করেছিল। তিন চার দিন পরে একটা প্রদর্শনী থেকে ফিরে হল-এ ঢুকতেই অকস্মাৎ আমার হৃদপিণ্ডটা পাথরের মত ভারী হয়ে গেল; কেন যে হল তখন বলতে পারি নি। এরকম হল তার কারণ বারান্দা দিয়ে যাবার সময় এমন কিছু দেখেছিলাম যাতে লোকটির কথা মনে পড়ে গেল। পড়ার ঘরে ঢোকার পরে তবে খেয়াল হল সেটা কি, এবং সেবিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্য আবার বারান্দায় ফিরে গেলাম। না, আমার ভুল হয় নি; তারই কেতাদুরস্ত কোটটা সেখানে ঝুলছে। (কেন করছি না বুঝেই তার প্রত্যেকটি জিনিসের উপর আমি নজর রাখতাম) খোঁজ করলাম। হ্যাঁ, সে এসেছে। বসবার ঘরের ভিতর দিয়ে না গিয়ে ছেলেমেয়েদের পড়ার ঘরের ভিতর দিয়ে অভ্যর্থনা-কক্ষে গেলাম। মেয়ে লিজা তার বইয়ের উপর উপুড় হয়ে আছে, ছোটটিকে কোলে নিয়ে আয়া টেবিলের পাশে বসে একটা ঢাকনা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। অভ্যর্থনা-কক্ষে যাবার দরজাটা বন্ধ, কিন্তু arpeggio (স্বরের সমতাল গৎ) এবং তাদের দুজনের গলা আমার কানে এল। কান পাতলাম, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলাম না। স্পষ্টতই তাদের কণ্ঠস্বর, হয়তো বা তাদের চুম্বনের শব্দকে চাপা দেবার উদ্দেশ্যেই পিয়ানোটা বাজানো হচ্ছে। হায় ঈশ্বর, তখন আমার এ কী হল! সেইমুহূর্তে আমার মধ্যে যে পশুটা বাসা বেঁধেছিল সেকথা ভাবতেও আমার গা শিউরে ওঠে। আমার হৃদপিণ্ড সংকুচিত হয়ে গেল, থেমে গেল, আর তার পরেই হাতুড়ির ঘা পড়ল। নিজের প্রতি বড়ই করুণা হল (ক্রোধে উন্মত্ত হলে মানুষের এইরকমই হয়)। মনে মনে বললাম, 'ছেলেমেয়েদের সামনে! আয়ার সামনে!' নিশ্চয় আমাকে ভয়ংকর দেখাচ্ছিল; লিজা যেভাবে আমার দিকে তাকিয়েছিল তা দেখেই সেটা বুঝতে পারলাম। নিজেকে প্রশ্ন করলাম, 'এখন আমি কি করি? ভিতরে

যাব ? সাহস হয় না। আমি যে কি করে বসব তা কেবল ঈশ্বরই জানেন।' কিন্তু সেখান থেকে চলে যেতেও পারলাম না। আয়া আমার দিকে এমন-ভাবে তাকিয়ে আছে যেন আমার মনের কথা সে বুঝতে পেরেছে। 'ভিতরে যাবই,' মনে মনে বলেই দ্রুত দরজাটা খুলে ফেললাম। বড় পিয়ানোটার পাশে বসে লোকটি সাদা আঙুলের টোকায় arpeggio বাজাচ্ছে। আমার স্ত্রী পিয়ানোর বাঁকটায় দাঁড়িয়ে স্বরলিপিতে চোখ বুলোচ্ছে। সেই আমাকে প্রথম দেখতে পেয়ে চোখ তুলে তাকাল হয় তো সে ভয় পেয়েছিল, কিন্তু এমন ভাব দেখাল যেন ভয় পায় নি, অথবা হয়তো সত্যসত্যই ভয় পায় নি। মোট কথা, সে চমকেও ওঠে নি, কেঁপেও ওঠে নি; শুধু একটু রাঙা হয়ে উঠেছিল, তাও সঙ্গে সঙ্গে নয়।

"আপনি আসায় কী যে খুশি হয়েছি; রবিবারে কি যে বাজাব আমরা তো বুঝতেই পারছি না," এমন স্বরে সে কথাগুলি বলল, যা আমরা দুজন একলা থাকলে সে কখনও বলত না। ওই লোকটাও নিজের সম্পর্কে 'আমরা' কথাটা ব্যবহার করায় আমার মোটেই ভাল লাগল না। কোন কথা না বলেই লোকটিকে অভ্যর্থনা করলাম। সে আমার সঙ্গে করমর্দন করল, এমন একটি হাসি হাসল যেটা আমার কাছে নিছক ঠাট্টা বলে মনে হল। হাসতে হাসতেই সে বুঝিয়ে বলতে লাগল যে, রবিবারের বাজনার স্বরলিপি নিয়ে সে এসেছে কিন্তু কি যে বাজাবে সেবিষয়ে তারা একমত হতে পারছে না—একটা কোন শক্ত শাস্ত্রীয় সুর (বেহালা ও পিয়ানোর জন্য বীঠোভেন-এর কোন 'সোনাতা' না কোন ছোটখাট সুর। এমন সহজ সরলভাবে সে কথাটা বলল যে আমি কোন রকম আপত্তি করতে পারলাম না, অথচ আমি নিশ্চিত জানতাম যে সে যা কিছু বলেছে সব মিথ্যা, তারা দুজনে আমাকে ঠকাবার একটা গোপন মতলব এঁটেছে।

"আমাদের ঐতিহ্যসম্মতভাবে নারী ও পুরুষ যখন দৈহিক সান্নিধ্যে আসে তখনই দেখা দেয় ঈর্ষান্বিতদের পক্ষে (আমাদের মত সমাজে সকলেই তো ঈর্ষান্বিত) চরম যন্ত্রণার কাল। নাচের আসরে দৈহিক সান্নিধ্য, ডাক্তার ও তার রোগিনীর দৈহিক সান্নিধ্য, চারুকলা, চিত্রশিল্প ও বিশেষ করে গান-বাজনার ক্ষেত্রে দৈহিক সান্নিধ্য—এসব ব্যাপারে কেউ যদি বাধা দেবার চেষ্টা করে তাহলেই তো তাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা শুরু হয়ে যায়। এই তো দুটি মানুষ শ্রেষ্ঠ শিল্প সঙ্গীতের চর্চায় মগ্ন; সে চর্চার জন্য দৈহিক সান্নিধ্য একান্ত দরকার, আর এ দৈহিক সান্নিধ্যের মধ্যে নিন্দারও কিছু নেই; কেবল-মাত্র অতিমাত্রায় নির্বোধ ও ঈর্ষাকাতর স্বামীরাই এতে আপত্তি খুঁজে পেতে পারে। অথচ একথা সকলেই জানে যে এই সব চর্চা, বিশেষ করে সঙ্গীতের চর্চার ফলেই আমাদের মত মানুষদের মধ্যে ব্যভিচারের সূত্রপাত হয়ে থাকে।

"মনে হল আমার বিরক্তির ভাবটা ওরা বুঝতে পেরেছে; কিছুক্ষণ আমি

কোন কথাই বলতে পারলাম না। একটা সম্পূর্ণ ভরা বোতল উল্টে ধরলে তার ভিতর থেকে যেমন কিছুই বেরতে পারে না আমার অবস্থাও সেইরকম। ইচ্ছা হল ওকে ধমকে দেই, বাড়ি থেকে বের করে দেই, কিন্তু তবু বুঝলাম যে, আমাকে ভদ্র ব্যবহার করতে হবে। তাই করলাম। সব কিছু অনুমোদন করার ভান করলাম, অথচ যেহেতু আমার আসল মনোভাবটা ঠিক উল্টো তাই আমার ব্যবহার অতিমাত্রায় সদয় হয়ে উঠল, আর তার ফলে লোকটার উপস্থিতি আমার কাছে আরও বেদনাদায়ক হয়ে দেখা দিল ; তবু আমাকে বলতে হল যে তার বিচারের উপর আমার পুরো ভরসা আছে, আর আমার স্ত্রীকেও ব্যাপারটা তার হাতে ছেড়ে দিতেই পরামর্শ দিলাম। আমার আকস্মিক প্রবেশ ও বিরক্তিকর নীরবতার দরুন যে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল সেটা দূর না হওয়া পর্যন্তই সে আমাদের বাড়িতে কাটাল, এবং ঠিক তার পরেই যেন এরই মধ্যে পরের দিন কি বাজানো হবে সেটা স্থির হয়ে গেছে এমনি ভাব দেখিয়ে সে বিদায় নিল।

"তাকে বিদায় জানাবার সময় আমি তার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিলাম (একজনের বাড়ির সুখ ও শান্তিকে ধ্বংস করতেই যে এসেছে তাকে বিদায় দিতে ওরকম তো করতেই হবে)! বিশেষ সমাদরে তার নরম সাদা হাতটা চেপে ধরলাম।"

বাইশ

"সারাদিন আমার স্ত্রীর সঙ্গে একটি কথাও বললাম না। বলতে পারলাম না। সে সামনে এলেই আমার মধ্যে ঘৃণা এতই তীব্র হয়ে ওঠে যে আমার ভয় হল কখন কি করে বসি। খাবার সময় বাচ্চাদের সামনেই সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আমি কখন যাচ্ছি (পরের সপ্তাহে আমার একটি আঞ্চলিক সম্মেলনে যোগ দেবার কথা)। বললাম। সে জানতে চাইল, কোন কিছু গোছগাছ করে দিতে হবে কিনা। কোন জবাব দিলাম না। কিছুক্ষণ চুপচাপ টেবিলেই বসে রইলাম, তারপর কোন কথা না বলেই পড়ার ঘরে চলে গেলাম। ইদানীং সে আর পড়ার ঘরে আমার কাছে আসে না, বিশেষ করে এরকম সময়ে। শুয়ে শুয়ে রাগটাকে মনের মধ্যে পুষতে লাগলাম। হঠাৎ তার পায়ের শব্দ কানে এল। মনের মধ্যে জেগে উঠল সেই ভয়ংকর, বীভৎস চিন্তাটা—'উরিয়া'র (বাইবেল-এর একটি চরিত্র) স্ত্রীর মত কি আমার কাছে এই অসময়ে আসছে তার পাপকে ঢাকতে! তার পায়ের শব্দ শুনতে শুনতে আমি মনে মনে ভাবলাম, 'সে কি সত্যি আমার কাছে কিছু বলতে আসছে? তা যদি হয় তাহলে আমি ঠিক ধরেছি।' তার প্রতি অকথ্য ঘৃণায় আমার মন

ভরে উঠল। পায়ের শব্দ আরও, আরও কাছে এল। ও পায়ের শব্দ কি দরজা পেরিয়ে অভ্যর্থনা-কক্ষে ঢুকবে? না, দরজায় কাঁ্যাচ করে শব্দ হল; সেখানে দাঁড়িয়ে আমার স্ত্রী—দীর্ঘকায়া, সুন্দরী, দুটি ভীরু চোখে মিনতিভরা দৃষ্টি; সে চেষ্টা করল সে দৃষ্টি লুকিয়ে রাখতে কিন্তু সেটা আমার চোখ এড়াল না, সে দৃষ্টির অর্থ আমি জানি। অনেকক্ষণ শ্বাসরোধ করে থাকায় আমার দম বন্ধ হবার উপক্রম। তার দিকে চোখ রেখেই একটা সিগারেট ধরালাম।

"সোফায় আমার খুব কাছে বসে আমার দিকে ঝুঁকে সে বলল, 'তোমার সঙ্গে কথা বলতে এলাম আর তুমি সিগারেট ধরালে, এটা কি ভাল হল?'

"যাতে তার ছোঁয়া না লাগে সেজন্য আমি সরে গেলাম।

"সে বলল, 'বুঝতে পারছি, রবিবারে আমি যে বাজাব সেজন্য তুমি রাগ করেছ।'

"আমি বললাম, 'মোটেই না।'

'হুঃ, আমি যেন বুঝি না।'

'যদি বুঝতে তাহলে তো আমি খুশি হতাম। আমার কথা যদি বল, আমি তো দেখছি তুমি একটা কুত্তির মত ব্যবহার করছ…!'

'তুমি যদি গাড়োয়ানদের মত গালাগালি শুরু কর তাহলে আমি চলে যাচ্ছি।'

'তাই যাও! শুধু মনে রেখ, পরিবারের মর্যাদা তোমার কাছে কিছু না হলেও আমার কাছে অনেকখানি—তোমার জন্য আমার মাথা ব্যথা নেই—তুমি গোল্লায় যাও—আমার ভাবনা যত পরিবারের মর্যাদাকে নিয়ে।'

'কী? কী বললে?'

'চলে যাও! ঈশ্বরের দোহাই, চলে যাও।'

'না বোঝার ভান করে (অথবা হয়তো সত্যি সে বুঝল না) আহত, ক্রুদ্ধ হয়ে সে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু বেরিয়ে না গিয়ে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল।

বলল, 'সত্যি তুমি অসম্ভব হয়ে উঠেছ। কোন দেবদূতও তোমার সঙ্গে বাস করতে পারবে না।' আমার সব চাইতে দুর্বল জায়গায় আঘাত করবার জন্যই আমার বোনের ব্যাপারে একটা ঘটনার কথা সে স্মরণ করিয়ে দিল (একবার রাগের মাথায় তাকে আমি অনেক কটু কথা বলেছিলাম; সে স্মৃতি আমার কাছে খুবই বেদনাদায়ক; আমার স্ত্রী তা জানে, আর সেইজন্যই এই মুহূর্তে সেকথার উল্লেখ করল)। সে বলল, 'সেই থেকে তোমার কোন কিছুতেই আমি অবাক হই না।'

"নিজের মনে ভাবলাম, 'তুমি আমাকে অপমান করবে, বিদ্রূপ করবে, দুর্নাম করবে, আর তার পরে বলবে যে আমি দোষী।' হঠাৎ এত তীব্র ঘৃণা আমার মধ্যে জাগল যেরকমটা আগে কখনও হয় নি; জীবনে এই প্রথম ঘৃণাকে বাইরে প্রকাশ করবার ইচ্ছা জাগল মনে। লাফ দিয়ে তার দিকে ধেয়ে

গেলাম; কিন্তু মনে পড়ে, লাফ দেবার সঙ্গে সঙ্গেই কি করতে যাচ্ছি সেটা বুঝতে পারলাম, আর নিজেকে প্রশ্ন করলাম, মনের তীব্রতাকে এভাবে প্রকাশ করা ঠিক কি না, আবার নিজেই জবাব দিলাম, হ্যাঁ ঠিক, কারণ এইভাবেই তাকে ভয় দেখানো যাবে। কাজেই ঘৃণাকে মনের মধ্যে চেপে না রেখে তার হাতে নিজেকে ছেড়ে দিলাম আর সেই ঘৃণা যখন আমার ভিতরটাকে তোলপাড় করে তুলল তখন আমি উল্লসিত হয়ে উঠলাম।

"ছুটে গিয়ে তার হাতটা চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'চলে যাও, নইলে খুন করে ফেলব।' ইচ্ছা করেই কথার মধ্যে সবটা ঘৃণা উজাড় করে দিলাম। তখন আমাকে নিশ্চয় ভয়ংকর দেখাচ্ছিল, কারণ ভয়ে সে নড়তেও পারছিল না।

"সে বলল, 'ভাসিয়া, তোমার কি হয়েছে?'

'বেরিয়ে যাও!' আরও জোর গলায় আমি গর্জে উঠলাম। 'তুমিই আমাকে রাগে অন্ধ করে তুলেছ। যদি কিছু করে বসি আমাকে দোষ দিও না।'

"ক্রোধের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠলাম। মনের তিক্ততাকে বোঝাবার জন্য একটা অসাধারণ কিছু করবার ইচ্ছা হল। তীব্র বাসনা হল তাকে আঘাত করি, খুন করে ফেলি; কিন্তু আমি জানতাম সে-কাজ আমি করতে পারি না, আর তাই রাগ দেখাবার জন্য একটা কাগজ-চাপা তুলে নিয়ে তার পাশ দিয়ে ছুঁড়ে দিয়ে চেঁচিয়ে বললাম, 'বেরিয়ে যাও।' আমার নিশানা ভালই ছিল, তাই কাগজ-চাপাটা তার গায়ে না লেগে পাশ দিয়ে চলে গেল। সে বেরিয়ে গেল, তবে যাবার আগে দরজার কাছে দাঁড়াল। সে এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছিল যেখান থেকে আমাকে দেখা যায় (সে সব কিছু যাতে দেখতে পায় আমি ইচ্ছা করেই সেইভাবে কাজটা করে-ছিলাম); তাই আমি লেখার টেবিলে যা কিছু ছিল—মোমবাতিদান, দোয়াত—সব তুলে তুলে মেঝেতে আছড়ে ফেলতে লাগলাম।

"চীৎকার করে বললাম, 'বেরিয়ে যাও! বেরিয়ে যাও! যদি কিছু করে বসি তখন আমাকে দায়ী করো না!'

"সে চলে গেল; সঙ্গে সঙ্গে আমিও শান্ত হলাম।

"এক ঘণ্টা পরে আয়া এসে খবর দিল, আমার স্ত্রীর মৃগীরোগ হয়েছে। তার কাছে গেলাম। সে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, হাসছে, কোন কথা বলছে না, সারা শরীর এঁকে-বেঁকে উঠছে। সত্যি সে তখন অসুস্থ।

"সকালে সে অনেকটা সেরে উঠল; যাকে ভালবাসা বলে তার প্রভাবে আবার আমাদের মধ্যে মিটমাট হল। মিটমাটের পর যখন তার কাছে স্বীকার করলাম যে ক্রখাচেভ্স্কিকে আমি ঈর্ষা করি, তখন সে মোটেই ঘাবড়াল না, অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে হেসে উঠে বলল, 'ওরকম একটা মানুষের প্রতি সে অনুরক্ত হতে পারে এটা ভাবাই তো হাস্যকর।'

'কোন ভদ্র স্ত্রীলোক কি ওরকম একটা মানুষের প্রতি অনুরক্ত হতে

পারে? গান-বাজনার আনন্দ ছাড়া আর কোন টান আমার নেই। তুমি যদি চাও, আর কখনও তার সঙ্গে দেখা করব না; এমন কি যদিও রবিবারের জন্য অতিথিদের আমন্ত্রণ করা হয়েছে তবু রবিবারেও নয়। তাকে চিঠি লিখে জানিয়ে দাও যে আমি অসুস্থ, বাস, তাহলেই সব চুকে যাবে। আমার দুঃখ শুধু এইখানে যে কোন পুরুষ ভাবতে পারে যে আমার সর্বনাশ করবার ক্ষমতা তার আছে। একথা স্বীকার করতেও আমার গর্বে বাধে।'

"সে কিন্তু মিথ্যা বলে নি; যা বলেছে তা সে বিশ্বাস করে। সে আশা করেছিল এই সব কথা দিয়ে সে তাকে ঘৃণা করতে পারবে, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারবে, কিন্তু সে ব্যর্থ হল। সব কিছুই যে তার বিরুদ্ধে, বিশেষ করে সেই অভিশপ্ত গান বাজনা। এ বিষয়ে আর কোন কথা হল না। রবিবারে অতিথিরা এল এবং আমার স্ত্রী ও সেই লোকটি তাদের বাজনা শোনাল।

তেইশ

"আমার মনে হয় আমি যে একজন অহংকারী লোক সেকথা বলাই বাহুল্য; আমাদের সমাজে অহংকার ছাড়া আর কি নিয়েই বা বেঁচে থাকা যায়? কাজেই সে বাজনার সন্ধ্যা ও তার খাবারের আয়োজন যাতে আমাদের উপযুক্ত হয় সেই ব্যবস্থার দিকেই আমি নজর দিলাম। নিজেই খাবার কিনে আনলাম, অতিথিদের আমন্ত্রণ করে এলাম।

'ছটা নাগাদ সকলে এল; সান্ধ্য পোশাকে সেজে সেও এল; জামার হীরের বোতামে কুরুচির পরিচয়। সব সময়ই তার একটা হামবড়াই ভাব, কেউ কথা বললে একটু হেসে যেন তাকে কৃতার্থ করে, যেন যে যাই বলুক বা করুক সবই তার আগে থেকেই জানা। তার শিক্ষা-দীক্ষার অভাবের প্রতিটি লক্ষণ আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম, কারণ তাতে এই ভেবে আমি সান্ত্বনা পেলাম যে, আমার স্ত্রী নিজের মুখে যকথা বলেছিল অর্থাৎ এই লোকটি তার আসক্তির সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত সেকথার প্রমাণ এতেই আমি পেয়েছিলাম। তখন আমি ঈর্ষাকাতর হওয়া ছেড়ে দিয়েছি। প্রথমত, ঈর্ষার দরুণ কষ্ট পেয়ে পেয়ে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, তাই তখন আমার বিশ্রামের দরকার; দ্বিতীয়ত, আমার স্ত্রীর কথায় তখন আমি বিশ্বাস করতেই চাইছিলাম এবং বিশ্বাস করেওছিলাম। কিন্তু আমার মনে ঈর্ষা না থাকলেও খাবার সময়টা এবং গান-বাজনার আগের সময়টা তাদের কাছে আমি স্বস্তিতে কাটাতে পারছিলাম না; সারাক্ষণ তাদের গতিবিধি ও দৃষ্টি বিনিময়ের দিকেই আমার নজর ছিল।

"খাওয়া-দাওয়ার পর্বটা যেমন হয়ে থাকে সেইরকমই হয়েছিল—আড়ষ্ট

ও একঘেয়ে। একটু আগেভাগেই বাজনা শুরু হয়ে গেল। সে সন্ধ্যার প্রতিটি বিবরণ আমার মনে আঁকা আছে! মনে পড়ে, সে বেহালাটা নিয়ে এল, বাক্সটা খুলল, কোন মেয়ের হাতের কাজ-করা ঢাকনাটা সরিয়ে বাদ্যযন্ত্রটা বের করল, তাতে সুর বাঁধল মনে পড়ে, নিজের সলজ্জ ভাবটা (প্রধানত বাজনার জন্যই লজ্জার ভাবটা এসেছিল) চাপা দেবার জন্য আমার স্ত্রী কি রকম উদাসীনতার ভাব দেখাচ্ছিল, মুখের উপর কপটভাব ফুটিয়ে বাজনা নিয়ে বসেছিল। তারপর শুরু হল মধ্যম স্বর তোলা, তারগুলি বাঁধা, ঠিক মত স্বরলিপি অনুসরণ করা। মনে পড়ে, তাদের দৃষ্টি-বিনিময়, সমবেত অতিথিদের দিকে তাকানো, দুজনে চুপিচুপি কথা, তারপর বাজনা শুরু। প্রথম গৎটা বাজাল আমার স্ত্রী। মনে পড়ে, লোকটির মুখে কী গম্ভীর সুন্দর ভাব ফুটে উঠেছিল তখন। কান পেতে শুনতে শুনতে সতর্ক আঙুলে সেও বেহালায় ছড় টানল পিয়ানোর সঙ্গে সুর মিলিয়ে। তারা বাজনা শুরু করল।"

সে থামল। পর পর বারকয়েক সেই অদ্ভুত শব্দটা করল। কথা বলতে গেলেই তার গলা ধরে আসছিল। তাই সে অপেক্ষা করল। তারপর :

"তারা বীঠোভেন-এর 'ক্রয়ত্জার সোনাতা বাজাল। 'সেই প্রথম প্রেস্টো'টি আপনার মনে আছে? আছে?' সে চেঁচিয়ে উঠল। উঃ! কী ভয়ংকর জিনিস সেই সোনাতা। সেটা কি? আমি জানি না। সঙ্গীত জিনিসটাই বা ঠিক কি? লোকের কি কাজে আসে? আর কেনই বা কাজে লাগে? লোকে বলে, সঙ্গীত মানুষের আত্মাকে উন্নত করে। বাজে কথা। মিথ্যা কথা। সঙ্গীতের একটা প্রভাব নিশ্চয় আছে, ভয়ংকর প্রভাব (আমার নিজের কথাই শুধু বলতে পারি), কিন্তু সে প্রভাব মানুষের আত্মাকে উন্নত করে না। উন্নতও করে না, নীচেও নামায় না; শুধু উত্তেজিত করে। কি করে যে বোঝাব? সঙ্গীত আমাকে, আমার প্রকৃত অবস্থাকে ভুলিয়ে দেয়; এমন একটা অবস্থায় আমাকে নিয়ে যায় যেটা আমার নিজের অবস্থা নয়। সঙ্গীতের প্রভাবে আমি কল্পনা করি যে, এমন জিনিস আমি অনুভব করি যা সত্যি আমি অনুভব করি না, এমন জিনিস বুঝি যা সত্যি আমি বুঝি না, এমন কাজ করতে পারি যা করতে সত্যি আমি অক্ষম। ব্যাপারটা আমি এইভাবে বোঝাতে পারি যে, আমার উপর সঙ্গীতের প্রতিক্রিয়া হাই তোলার মত, হাসির মত: ঘুম না পেলেও অন্যকে হাই তুলতে দেখে আমিও হাই তুলি; হাসবার কিছু নেই, তবু অন্যের হাসি শুনে আমি হেসে উঠি।

"রচয়িতা স্বরলিপি লিখবার সময় যে আত্মিক অবস্থার মধ্যে ডুবে গিয়েছিল সঙ্গীত আমাকেও শোনার সঙ্গে সঙ্গে সেই অবস্থার মধ্যে নিয়ে যায়। আমার আত্মা তার আত্মার সঙ্গে মিশে যায়, আর তার সঙ্গেই আমি এক ভাব থেকে ভাবান্তরে চলে যাই, কিন্তু কেন যে ঐসব ভাবের ভিতর দিয়ে আমি যাব তা বলতে পারি না। অপর পক্ষে রচয়িতা—যেমন ধরুন ক্রয়ত্জার

সোনাতা-র রচয়িতা বীঠোভেন) কিন্তু জানত কেন তার মনে ঐ ভাবটি দেখা দিয়েছিল। ঐ ভাবের বশেই সে কতকগুলি নির্দিষ্ট কাজও করেছিল, কাজেই তার কাছে ঐ ভাবের একটা অর্থ ছিল, কিন্তু আমার কাছে সে ভাবের কোন অর্থই থাকতে পারে না। সঙ্গীত উদ্দেশ্যবিহীনভাবে মানুষকে উত্তেজিত করে। ঠিক মত বলতে গেলে, সামরিক বাজনা বাজালেই সৈন্যরা মার্চ করতে শুরু করে, কাজেই সে বাজনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়; নাচের বাজনা বাজালে আমি নাচি, সেখানেও বাজনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। ধর্ম-সঙ্গীতের বেলায়ও একথা সত্যি; সেটা বাজানো হলেই আমি ধর্মানুষ্ঠানে যোগ দিই। কিন্তু অন্য সব ক্ষেত্রে সঙ্গীত শুধুই উত্তেজনার সৃষ্টি করে, তার বহিঃপ্রকাশের কোন পথ বাত্‌লে দেয় না। সেইজন্যই সঙ্গীতের প্রভাব এত ভয়াবহ, অনেক সময় এতদূর ভয়ংকর। চীন দেশে সঙ্গীত রাষ্ট্রের এক্তিয়ারভুক্ত। আর সেটাই হওয়া উচিত। যেকোন লোক অপর একটি লোককে সম্মোহিত করবে (এমন কি আরও অনেক লোককে) এবং তাকে দিয়ে যা ইচ্ছা তাই করাবে, এটা কি চলতে দেওয়া উচিত? সব চাইতে খারাপ হল, অনেক সময়ই সেই যাদুকরের কোন নীতির বালাই থাকে না।

"যার তার হাতে পড়লে এটা বড় ভয়ংকর অস্ত্র হয়ে ওঠে। ক্রয়েত্‌জার সোনাতা-র কথাই ধরুন না—তার প্রথম গৎটা। বসবার ঘরে গলা-খোলা জামা পরা মেয়েদের সামনে কি কারও 'প্রেস্টো'-টা বাজানো উচিত?—সেটা বাজানো হবে, হাততালি পড়বে, আর তারপরেই চলবে আইসক্রিম খাওয়া এবং নানান গল্প-গুজব? একমাত্র একটি নির্দিষ্ট অর্থপূর্ণ পরিবেশে এই সঙ্গীতের পরিপোষক কোন নির্দিষ্ট অর্থপূর্ণ কর্তব্য সম্পাদনের জন্যই এ ধরনের সঙ্গীত বাজানো উচিত। বাজানোর ফলে যেসব কাজের মনোভাব সৃষ্টি হবে তা তো করা চাই। অন্যথায় স্থান ও কালের পক্ষে অনুপযোগী যেসব ভাব ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে তারা সহজ প্রকাশের সুযোগ না পেয়ে সর্বনাশ ডেকে আনবে। অন্তত আমার বেলায় এই সঙ্গীতের ফল হয়েছে সর্বনাশা। এর ফলে এমন সব অনুভূতি ও উদ্দীপনা আমার কাছে আত্মপ্রকাশ করেছে যাদের সম্পর্কে আমি ছিলাম সম্পূর্ণ সচেতন। সে সঙ্গীত যেন আমাকে বলল, 'এই হল আসল কথা; তুমি যেভাবে আছ, যেভাবে ভেবেছ সেটা মোটেই ঠিক নয়, এটাই ঠিক।' সে নতুন পথটা যে কি তা আমি বলতে পারব না, কিন্তু সেই নতুনত্ব সম্পর্কে সচেতনতা আমাকে আনন্দ দিয়েছিল। আমার স্ত্রীকে এবং সেই লোকটিকেও যেন সম্পূর্ণ নতুন আলোয় দেখতে পেলাম।

"প্রেস্টো-র পরে তারা সাধারণ হলেও বেশ মিষ্টি 'আন্দান্তে' (ধীর লয়ের বাজনা) সুরটা বাজাল, তার নীচু স্তরের বিস্তার ও কাঁচা উপসংহারটাও বাদ দিল না। অতিথিদের অনুরোধে আরও কয়েকটি সুর বাজালো,—আর্নস্ট-এর (বিখ্যাত অস্ট্রীয় বেহালা-বাদক) একটি শোক-গাথা এবং অন্য কিছু সুর।

সবগুলিই বেশ ভাল, কিন্তু প্রথম বাজনার প্রভাব আমার উপর পড়েছিল। এ-গুলোতে তার দশ ভাগের একভাগও পড়ল না। প্রথমটা শুনে আমার মনে যে ভাবের উদয় হয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতেই আমি সেগুলি শুনেছিলাম। তারপর সারাটা সন্ধ্যা বেশ হাসিখুশি ও হাল্কা মনে ছিলাম. আগে কখনও আমার স্ত্রীকে সেদিনের মত দেখি নি। চোখের দীপ্তি, বাজাবার সময় গম্ভীর ও অর্থপূর্ণ মুখের ভাব, শেষ করবার পরে তার অসহায়তা এবং স্বর্গীয় অথচ সকরুণ ম্লান হাসি। সব কিছুই দেখলাম; সেসবের একটিমাত্র অর্থই আমি খুঁজে পেলাম; আমার মতই তার কাছেও খুলে গেছে স্মৃতির অতল থেকে বেরিয়ে আসা নতুন আর অপরিচিত সব অনুভূতি।

"সন্ধ্যাটা ভালভাবেই কাটল; সকলেই বাড়ি চলে গেল।

"দুদিনের মধ্যেই আমি সম্মেলনে যোগ দিতে চলে যাচ্ছি একথা জেনে ক্রখাচেভ্স্কি বিদায় নেবার সময় জানাল যে, সেদিন সন্ধ্যায় যে আনন্দ সে পেয়েছে পরের বার আমাদের শহ'র যখন সে আসবে তখন আবার সেই আনন্দ লাভের আশা সে রাখে। আমি ধরে নিলাম, আমার অবর্তমানে যে আমার বাড়িতে তার পক্ষে আসা অসম্ভব এটাই সে ভেবে নিয়েছে। এতে আমি বেশ খুশিই হলাম।

"এই প্রথম সত্যিকারের খুশির সঙ্গে তার করমর্দন করলাম এবং আনন্দ দানের জন্য ধন্যবাদ জানালাম। যেন অনেক দিনের মত চলে যাচ্ছে সেই-ভাবেই সে আমার স্ত্রীর কাছ থেকেও বিদায় নিল। আমার মনে হল, তাদের আচরণে স্বাভাবিক ও ভব্যতাবহির্ভূত কিছু ছিল না। সবই চমৎকার। সে সন্ধ্যাটার জন্য আমার স্ত্রী ও আমি দুজনেই খুব খুশি।"

চব্বিশ

"দুদিন পরেই খোলা মনে ও বহাল তবিয়তে স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গ্রামে চলে গেলাম।

"গ্রামে গেলে তো কাজের অন্ত থাকে না; তার নিজস্ব জীবনযাত্রা নিয়ে সে এক আলাদা জগৎ। প্রথম দু'দিনই একটানা দশ ঘণ্টা ধরে সম্মেলনে যোগ দিলাম। তার পরদিন ওরা আমার স্ত্রীর একটা চিঠি এনে দিল। সঙ্গে সঙ্গে পড়লাম। চিঠিতে ছেলেমেয়েদের কথা, তার কাকার কথা, দাসীর কথা, কি কি জিনিস কিনেছে সে সব কথা লেখার পর যেন একটা তুচ্ছ কথা লিখছে এইভাবেই হঠাৎ জানিয়েছে যে, ক্রখাচেভ্স্কি যে স্বরগুলি তাকে দেবে বলে কথা দিয়েছিল সেগুলি নিয়ে একদিন এসেছিল, আর সেগুলি বাজাতেও চেয়েছিল, কিন্তু সে রাজী হয় নি। সে আমার স্ত্রীকে কোন স্বরলিপি দিতে চেয়েছিল বলে তো আমার মনে পড়ল না। আমার ধারণা হয়েছিল সে

আমার স্ত্রীর কাছ থেকে চিরদিনের মত বিদায় নিয়ে গিয়েছিল, কাজেই এ খবরে আমি বিস্মিত ও দুঃখিত বোধ করলাম। কিন্তু আমি তখন এত ব্যস্ত ছিলাম যে সেকথা নিয়ে আর ভাববার সময় পেলাম না। সন্ধ্যায় আমার ঘরে ফিরে চিঠিটা আবার পড়লাম। তখন আমার মনে হল, আমার অনুপস্থিতিতে ত্রুখাচেভ্‌স্কির বাড়িতে আসার অপ্রীতিকর সংবাদ ছাড়াও চিঠিটার পুরো স্বরটাই যেন কেমন বেখাপ্পা। ঈর্ষার উন্মাদ জন্তুটা তার গুহার মধ্যে গর্জে উঠল, ছুটে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করল, কিন্তু আমি জোর করে তাকে আটকে রাখলাম; তার পশু-শক্তিকে আমি ভয় পেলাম। মনে মনে বললাম, 'ঈর্ষা কী নীচ মনোবৃত্তি! সে আমাকে যা যা লিখেছে তার চাইতে স্বাভাবিক আর কি হতে পারত!'

"বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম এবং পরদিনের কাজকর্মের কথা ভাবতে লাগলাম। সাধারণত অপরিচিত বিছানায় ঘুমুতে আমার কষ্ট হয়, কিন্তু সে-রাতে খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, যেন বিদ্যুতের ছোঁয়া লেগে জেগে উঠলাম। মনের মধ্যে তখন আমার স্ত্রীর চিন্তা, তার প্রতি আমার কামনার চিন্তা, আর ত্রুখাচেভ্‌স্কির চিন্তা; নিশ্চিত মনে হল, আমার স্ত্রীর কাছে সে যা চেয়েছিল তা পেয়েছে। ক্রোধে, ত্রাসে আমি তখন কঠিন হয়ে গেছি। কিন্তু তখনই নিজেকে বোঝাতে লাগলাম, 'এসবই বাজে চিন্তা। এরকম ভাববার কোন কারণই নেই; তাদের দুজনের মধ্যে কখনও কিছু ছিল না, আজও নেই। এরকম ভয়ংকর কিছু অনুমান করে কেন তুমি তাকে ও নিজেকে ছোট করছ? একজন স্বল্পখ্যাত ভাড়াটে বেহালাদার, আর একটি সম্ভ্রান্ত মহিলা, একটি পরিবারের মা, তোমার নিজের স্ত্রী। কী অসঙ্গতি!' এই হল একদিককার যুক্তি, কিন্তু অন্য যুক্তিও ছিল: 'ও ছাড়া আর কি থাকতে পারে? যার জন্য আমি তাকে বিয়ে করেছি, যার জন্য আমি তার সঙ্গে বাস করি, সেই সহজ, সাধারণ জিনিস ছাড়া আর কি থাকতে পারে? তার কাছে আমি ঐ একটি জিনিসই চাই, আর ঐ বাজনাদারসহ অন্য সব পুরুষই তার কাছে ঐ একটি জিনিসই চায়। সে অবিবাহিত, তার স্বাস্থ্য ভাল (মনে পড়ল, চপের একটা হাড় সে কিভাবে দাঁত দিয়ে চিবিয়ে খেয়েছিল, আর কিভাবে তার লাল ঠোঁট দিয়ে লোভীর মত এক গ্লাস মদ চুমুক দিয়ে শেষ করেছিল)—চিকণ, সুঠাম, যখন যে সুবিধা পাওয়া যাবে তার সুযোগ গ্রহণ করাই তার জীবনের একমাত্র নীতি। আর সে ও আমার স্ত্রী সেই সঙ্গীতের বন্ধনে বাঁধা পড়েছে কামনাকে বাড়িয়ে তুলবার পক্ষে যার মত সূক্ষ্ম উপায় আর কিছু নেই। তাকে সংযত করবার কি আছে? কিছুই নেই। উপরন্তু, সব কিছুই তাকে সেইদিকেই ঠেলে দিয়েছে। আমার স্ত্রী? সে কে? একটি রহস্য—চিরদিনই সে রহস্যময়ী। আমি তাকে চিনি না। তার পশু-প্রকৃতিটাকেই আমি চিনি। আর সংযম কাকে বলে তা তো একটা পশু

জানে না—তার জানবার কথাও নয়।

"তখনই আমার মনে পড়ে গেল আর একটি সন্ধ্যায় তাদের মুখের সেই দৃষ্টির কথা: সেদিন ক্রয়ত্জার সোনাতা-র পরে আর একটি আবেগ-ভরা ছোট সুর তারা বাজিয়েছিল; সেটা কার সুর আমি ভুলে গেছি; তবে সে সুরে ছিল ইন্দ্রিয়াসক্তি ও ভোগবাসনার তীব্র উত্তেজনা; সেই দৃষ্টি মনে পড়তে আমি বলে উঠলাম, 'তারপরেও আমি দূরে চলে এলাম কেমন করে? এটা কি স্পষ্ট নয় যে তাদের মধ্যে যা ঘটবার তা সেই সন্ধ্যায়ই ঘটেছিল? এটা কি স্পষ্ট নয় যে, সেদিন সন্ধ্যায় কোন প্রাচীর তাদের আলাদা করে রাখে নি, তারা দুজনই, বিশেষ করে আমার স্ত্রী, তাদের মধ্যে যা ঘটেছে তারজন্য লজ্জাবোধ করেছিল?' মনে পড়ল, আমাকে দেখে কী অস্পষ্ট, করুণ, মধুর হাসি সে হেসেছিল, আর আমি যখন পিয়ানোর কাছে গেলাম তখন কীভাবে তার ঘর্মাক্ত রাঙা মুখটা সে মুছেছিল। তখনও তারা কেউ কারও চোখের দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারে নি; শুধু রাতে খাবার সময় যখন সে আমার স্ত্রীর জন্য এক গ্লাস সোডার জল ঢেলে দিয়েছিল তখনই পরস্পরের দিকে তাকিয়ে তারা মৃদু মৃদু হেসেছিল। সে দৃষ্টি, সেই চকিত হাসির কথা মনে হতেই আমি আঁতকে উঠলাম। একটি কণ্ঠস্বর আমাকে বলল, 'সব শেষ হয়ে গেছে,' আবার অন্য কণ্ঠস্বর বলল ভিন্ন কথা। সে বলল, 'তোমাকে কিসে যেন পেয়েছে। যা সত্য হতে পারে না তাই নিয়ে ভেবে তুমি মরছ।' অন্ধকারে আর শুয়ে থাকতে পারলাম না। দেশলাই জ্বালালাম। হলদে দেয়াল-কাগজে মোড়া ছোট ঘরটার মধ্যে আমার ভয় করতে লাগল। একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগলাম। সমাধানের অতীত কোন সমস্যা যখন আমার মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকে তখনই আমি একাজ করে থাকি। সমস্যাটা যে সমাধানের অতীত সেই বোধটা মন থেকে মুছে ফেলবার জন্য আমি একটার পর একটা সিগারেট খেতে লাগলাম।

'সেরাতে আর ঘুম হল না। পাঁচটার সময় স্থির করলাম, এ চাপ আমি আর সহ্য করতে পারছি না; কাজেই অবিলম্বে বাড়ি ফিরে যাব। উঠে পড়লাম। যে লোকটি আমার কাজে নিযুক্ত ছিল তাকে জাগিয়ে তুলে ঘোড়া আনতে বললাম। একটা চিরকুট লিখে সহকর্মীদের জানিয়ে দিলাম, অপ্রত্যাশিতভাবে একটা জরুরী কাজের জন্য মস্কো থেকে ডাক এসেছে; কাজেই তারা যেন আমার জায়গায় অন্য কাউকে নিয়োগ করেন।

"আটটার সময় একটা চার-চাকার গাড়িতে চেপে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম।"

পঁচিশ

কণ্ডাক্টর এল। আমাদের মোমবাতিটা পুড়ে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে দেখে

সেটা নিভিয়ে দিল, কিন্তু নতুন কোন মোমবাতি সেখানে বসাল না। বাইরে আলো ফুটে উঠেছে। পজ্‌দনিশেভ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, কিন্তু কণ্ডাক্টর যতক্ষণ গাড়িতে ছিল ততক্ষণ কোন কথাই বলল না। সে চলে গেল; ছায়াচ্ছন্ন কামরাটার মধ্যে ট্রেনের ঝাঁকুনিতে জানালার খট-খট শব্দ আর দোকান-কর্মচারিটির নাক ডাকার শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। তখন সে আবার গল্প বলতে শুরু করল। ভোরের আবছা আলোয় আমি তাকে মোটেই দেখতে পাচ্ছিলাম না; শুধু শুনতে পাচ্ছিলাম তার কণ্ঠস্বর—তার মধ্যে উত্তেজনা ও যন্ত্রণা উত্তরোত্তর বেড়েই চলছিল।

"আমাকে পঁয়ত্রিশ ভার্স্ট ঘোড়ায় এবং আট ঘণ্টা ট্রেনে চেপে যেতে হয়েছিল। গাড়িতে চেপে যেতে বেশ ভালই লাগছিল। কুয়াশা-ঢাকা হেমন্তের সকালে সূর্যের আলো ঝরে পড়ছে, ভিজে রাস্তার উপর চাকার দাগ আঁকা পড়ছে—সে সকাল যে কেমন তা তো আপনি জানেন; রাস্তা ভাল, উজ্জ্বল আলো, বাতাসে উত্তেজনা। একা একা গাড়ি চেপে যেতে অপূর্ব লাগছিল। সকাল হতেই পথ চলতে চলতে আমি যেন অনেক ভাল বোধ করতে লাগলাম। ঘোড়া, মাঠঘাট, লোকজন—এসব দেখতে দেখতে ভুলেই গিয়েছিলাম কোথায় চলেছি। এ সময় মনে হল, বুঝি বেড়াতেই বেড়িয়েছি, আর যেজন্য এইপথযাত্রা সেটা নেহাৎইকাল্পনিক। ভুলে যেতেই যেন বিশেষ করে ভাল লাগছিল। যখনই মনে পড়েছে কোথায় চলেছি তখনই নিজেকে বলেছি, 'কিছু ভেব না, সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে।' যাত্রার মাঝপথে এমন একটা ঘটনা ঘটল যাতে বিলম্ব ঘটে গেল আর আমার মনোযোগও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল: আমার গাড়িটা ভেঙে গেল; সেটাকে মেরামত করতে হবে। এই আকস্মিক ঘটনার ফল হল মারাত্মক; আমি এক্সপ্রেস ট্রেনটা ধরতে পারলাম না; পরের ট্রেনে চাপতে হল; আর তার ফলে পূর্ব ব্যবস্থা মত পাঁচটার বদলে মস্কো পৌঁছলাম রাত বারোটায়।

"গাড়িতে চাপা, মেরামত করা, হিসাবপত্র করা, পথের পাশের একটা সরাইখানায় খাওয়া-দাওয়া, একটা কুলির সঙ্গে কথাবার্তা বলা—এসব নিয়েই মশ্‌গুল ছিলাম। সন্ধ্যা নাগাদ সব ঠিক হয়ে গেলে আবার যাত্রা করলাম। দিনের আলোর চাইতেও গোধূলির আলোতে পথ চলতে আরও মনোরম লাগছিল। আকাশে নতুন চাঁদ, সামান্য বরফ পড়ছে, চমৎকার রাস্তা, ভাল ঘোড়া, আমুদে কোচয়ান—এসব নিয়ে খুশিতে মনটা এতই ভরে উঠেছিল যে আমার জন্য কি অপেক্ষা করে আছে সেকথা ভাবতেই ভুলে গিয়েছিলাম; অথবা এও হতে পারে যে আমি জানতাম আমার কপালে কি আছে, আর তাই জীবনের আনন্দকে শেষবারের মত ভোগ করবার জন্যই মনটাকে খুশিতে ভরে তুলেছিলাম।

"কিন্তু এই আত্ম-তুষ্টি, মনের ভাবকে চেপে রাখবার এই ক্ষমতা ঘোড়ার

গাড়ির যাত্রার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে গেল। রেলগাড়িতে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতা হল। যতদিন বেঁচে থাকব রেলপথের সেই আট ঘণ্টার যন্ত্রণার কথা ততদিন মনে থাকবে। রেলগাড়িতে ঢুকেই যেন মনে হল—প্রায় বাড়িতে এসে গেছি, হয়তো সেটাই এর কারণ; অথবা এও হতে পারে যে রেল-ভ্রমণ স্নায়ুর উপর চাপ সৃষ্টি করে। কারণ যাই হোক, ট্রেনে উঠে বসবার পরমুহূর্ত থেকেই নিজের কল্পনাকে আর বশে রাখতে পারলাম না; কল্পনায় একটার পর একটা ছবি ফুটে ওঠে আর আমার ঈর্ষাও বাড়তে থাকে; প্রতিটি নতুন ছবি আগের ছবির চাইতে অশ্লীল; আর সব ছবিতেই আমার অনুপস্থিতিতে সে কি করছে, কিভাবে আমাকে প্রতারিত করছে সেই একই দৃশ্য ফুটে উঠছে। ক্রোধে ও ক্ষোভে আমি জ্বলতে লাগলাম; এই সব দৃশ্যের চিন্তা আমার মনকে পরাজয়ের গ্লানিতে ভরে তুলল। সেসব দৃশ্যকে তাড়াতে পারলাম না, আমার চোখও সরিয়ে নিতে পারলাম না, সেগুলোকে মুছে ফেলতেও পারলাম না। সেই সব কাল্পনিক ছবির কথা যত ভাবতে লাগলাম, ততই তাদের বাস্তবতায় বিশ্বাস বাড়তে লাগল। ছবিগুলি এতই স্পষ্ট হয়ে মনের সামনে ভাসতে লাগল যে সেই স্পষ্টতাই তাদের বাস্তবতার প্রমাণ বলে মনে হতে লাগল। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন দানব যেন ভয়ংকর সব গল্প বানিয়ে আমার কানে কানে বলতে লাগল। অনেক বছর আগে ক্রুখাচেভ্স্কির ভাইয়ের সঙ্গে আমার যেকথা হয়েছিল তাও মনে পড়ে গেল সেই আলোচনার বিষয়বস্তুকে এই বাজনাদার ও আমার স্ত্রীর উপর আরোপ করে সেই স্মৃতির কষাঘাতে আমার হৃদয়কে রক্তাক্ত করে তুললাম

"অনেক বছর আগেকার ঘটনা, কিন্তু তখনও আমার পরিষ্কার মনে ছিল। ক্রুখাচেভ্স্কি পতিতালয়ে যায় কি না আমার এই প্রশ্নের জবাবে তার ভাই বলেছিল, সব সময়ই যখন একজন সম্ভ্রান্ত মহিলাকে সে হাতের কাছে পায় তখন কোন ভদ্রলোক কি এমন জায়গায় যেতে চায় যেখানে রোগ-সংক্রমণ ঘটতে পারে, এবং যেসব জায়গা সাধারণতই জঘন্য ও নোংরা। আর কী আশ্চর্য! সেই ভাই আমার স্ত্রীকে পেয়েছে। 'একথা সত্যি যে আমার স্ত্রী এখন আর সেরকম তাজা নেই, বাঁদিকে একটা দাঁত পড়ে গেছে, একটু মোটাও হয়েছে। কিন্তু তা আর কি করা যাবে; যা পাওয়া যাবে তাই তো নিতে হবে।' মনে মনেই বলতে লাগলাম। 'হ্যাঁ, আমার স্ত্রীকে তার রক্ষিতা বানিয়ে লোকটা তাকে করুণাই করছে। কিন্তু, তার কাছ থেকে সংক্রমণের ভয়টা তো নেই।' 'আরে, এসব কি বলছ? এ যে অচিন্ত্যনীয়!' সভয়ে নিজেকে বললাম। 'না, না, এরকম কিছু ঘটে নি। একথা ভাববার মত তিলমাত্র কারণ তোমার নেই। সে কি নিজেই তোমাকে বলে নি যে এ-রকম একটা লোকের সম্পর্কে ঈর্ষান্বিত হওয়া তোমাকে সাজে না? হ্যাঁ, তা বলেছে; কিন্তু সে তখন মিথ্যা বলেছে, মিথ্যা বলেছে।' মনে মনেই চীৎকার

করে উঠলাম।

পজ্‌দ্‌নিশেভ লাফিয়ে উঠে দু'এক পাক ঘুরে আবার এসে বসল।

"রেল গাড়িতে চড়তে আমি ভয় পাই, ভয়ংকর ভয় পাই; রেল গাড়ি দেখলেই আমার ভয় করে। হ্যাঁ, সত্যি ভয় করে", সে বলতে লাগল। "মনে মনে বললাম, 'আমি অন্য কথা ভাবব—যেমন যে সরাইখানায় খেয়ে এলাম তার কথা।' অমনি মনের মধ্যে দেখতে পেলাম সেই দাড়িওয়ালা বুড়ো কুলিটাকে আর তার ছোট নাতিটাকে; আমার ভাসিয়ার বয়সী ছেলেটি। 'আমার ভাসিয়া! একদিন হয় তো সে দেখে ফেলবে, বাজনাদারটা তার মাকে চুমো খাচ্ছে। তখন ছেলেটা কত কষ্ট পাবে। কিন্তু তার মার তো কিছুই হবে না। সে তো প্রেমে পড়েছে!... আবার সেই একই চিন্তা। 'না, না, স্থানীয় হাসপাতাল পর্যবেক্ষণে যাবার কথা ভাবব। গতকাল রোগী ডাক্তারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল। ডাক্তারের গোঁফজোড়া ছিল ক্রুখাচেভ্‌স্কির মত। কী আস্পর্ধা তার—আমার স্ত্রীরও—যে আমাকে ঠকাবার জন্য বলে দিল, সে চলে যাচ্ছে!' আবার সেই একই চিন্তা ঘুরে ফিরে এল। যা কিছু ভাবি শেষ পর্যন্ত তার কথাই এসে পড়ে। ভয়ংকর কষ্ট হতে লাগল। আমার অজ্ঞতা, আমার সন্দেহ, আমার অস্থিরমতি, বুঝতে পারছি না তাকে ভালবাসব না ঘৃণা করব—এসবই আমার কষ্টের কারণ। যন্ত্রণা এতই বেড়ে গেল যে মনে পড়ছে এক সময় একথাও ভেবেছিলাম যে, কামরা থেকে নেমে গিয়ে রেল পথের উপর শুয়ে পড়ে সব শেষ করে দেব। তখন অন্তত এই সন্দেহ ও অনিশ্চয়তার কষ্ট থেকে বাঁচতে পারব। কিন্তু নিজের প্রতি করুণা আর স্ত্রীর প্রতি তীব্র ঘৃণাই আমাকে সেপথ থেকে সরিয়ে আনল। লোকটির প্রতি ঘৃণার সঙ্গে মিশে ছিল নিজের হেরে যাওয়া আর তার জিতে যাওয়া চেতনা। কিন্তু আমার স্ত্রীর প্রতি ছিল শুধুই ঘৃণা, তীব্র ঘৃণা। 'আত্মহত্যা করে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে না; তাকেও কষ্ট পেতে হবে; তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে কী কষ্ট আমি পেয়েছি', নিজের মনেই বললাম। এই সব চিন্তা এড়াবার জন্য প্রতিটি স্টেশনেই ট্রেন থেকে নামতে লাগলাম। একটি স্টেশনের রেস্তোরাঁতে দেখলাম কিছু লোক মদ খাচ্ছে; আমিও ভদ্‌কার অর্ডার দিলাম। আমার পাশে দাঁড়িয়ে একটি ইহুদিও পান করছিল। সে আমার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে দিল, আর আমিও কামরায় একা থাকার বদলে তার সঙ্গে তার তৃতীয় শ্রেণীর নোংরা ধোঁয়াটে কামরায় গিয়ে উঠলাম। কামরায় মেঝেভর্তি সূর্য-মুখী ফলের খোসা ছড়ানো। তার পাশে গিয়ে বসলাম, আর সেও অনর্গল নানা কথা বলতে লাগল। তার কথা কানে গেলেও আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না, কারণ নিজের চিন্তায়ই আমি ডুবেছিলাম। সেটা লক্ষ্য করে সে আরও মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনতে বলল। উঠে নিজের কামরায় ফিরে গেলাম। মনে মনে বললাম, 'এ চিন্তার

শেষ করতে হবে। যা ভাবছি সেটা ঠিক কিনা, আমার কষ্টের সত্যি কোন কারণ আছে কিনা—এসবই আমাকে জানতে হবে।' শান্তভাবে সব কথা ভাবতে বসলাম, কিন্তু ভালভাবে চিন্তা করার বদলে আবার সেই একই দশা হল। সুস্থ চিন্তার বদলে—শুধু ছবি আর কল্পনা। মনে মনে বললাম, 'অতীতে আরও কতবার তো এমন কষ্ট আমি পেয়েছি! কিন্তু প্রত্যেকবারই তো দেখেছি সব বাজে। হয়তো এবারও দেখব—নিশ্চয় দেখব—সে শান্তিতে বিছানায় ঘুমিয়ে আছে; জেগে উঠে আমাকে দেখে কত খুশি হবে, তার কথা শুনে আর চাউনি দেখে বুঝতে পারব যে কিছুই হয় নি, এসবই উদ্ভট কল্পনা। আঃ, কী আনন্দই না হবে!' 'না অনেকবারই এরকম হয়েছে বটে, কিন্তু এবার ব্যাপারটা অন্য রকম হবে, অপর কণ্ঠস্বরটি বলে উঠল; আবার সেই একই চিন্তা শুরু হল। হঁ্যা, সেই তো আমার শাস্তি। কোন যুবকের কাম-বাসনাকে দূর করতে তাকে আমি সিফিলিস রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে যাব না, আমার অন্তরাত্মাকে শুধু তাদের সামনে মেলে ধরব, তাহলেই তারা দেখতে পাবে দানবরা কীভাবে আমার আত্মাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। সব চাইতে দুঃখের কথা হল, তার দেহের উপর সন্দেহাতীত পরিপূর্ণ মালিকানা আমি দাবী করতাম, যেন সেটা আমারই দেহ; আবার সেই সঙ্গে এটাও বুঝতাম যে তার দেহটা আমার নয়, সে যেভাবে খুশি তার দেহটাকে চালাতে পারে এবং সে এমন ভাবেই সেটাকে চালাতে চায় যেটা আমার অভিপ্রেত নয়। আর সেখানে তাদের দুজনের কারোকেই আমার কিছু করবার নেই। 'গানের প্রহরী ভাংকার মত ফাঁসির মঞ্চে যেতে যেতেও সে লোকটিও আমার স্ত্রীর চুম্বনের গানই গাইতে থাকবে। মৃত্যুতেও সে আমাকে এক হাত নেবে। আমার স্ত্রী যদি এ পাপ এখনও না করে থাকে। এটা করতে তো চেয়েছে, আমি জানি তা সে চেয়েছে, আর সেটাই তো আরও খারাপ; সে যদি এ পাপ কাজ করত, আর আমি সেটা জানতাম, যদি আমার মনে কোন সন্দেহ না থাকত, সেও তো ছিল ভাল। আমি যা চাই তা বলতেও পারতাম না। আমি তো চাই—যা না চেয়ে তার উপায় নেই তা যেন সে না চায়। সমস্ত ব্যাপারটাই তো চূড়ান্ত পাগলামি।"

ছাব্বিশ

"পরের স্টেশনে কণ্ডাক্টর যখন টিকিট নিতে এল তখন আমি থলেটা তুলে নিয়ে কামরার প্ল্যাটফর্মে চলে গেলাম; প্রায় পৌঁছে গেছি, যবনিকা পতনের সময় হয়েছে, এই চিন্তায়ই আমার উত্তেজনা আরও বেড়ে গেল। শীত করতে লাগল; এমন কাঁপতে লাগলাম যে দাঁতে-দাঁতে শব্দ হতে লাগল। যন্ত্রের মত যাত্রীদের অনুসরণ করে স্টেশন থেকে বেরিয়ে একটা গাড়িতে বসে ঘোড়া

ছুটিয়ে দিলাম। চলতে চলতেই দেখলাম, রাস্তায় লোকজন চলছে, কুলিরা চলাফেরা করছে, রাস্তার বাতিগুলো আমার সামনে-পিছনে ছায়া ফেলছে। আমার মাথায় কোন চিন্তা ভাবনা নেই। আধ ভার্স্ট যাবার পরে পায়ে ঠাণ্ডা লাগাতে মনে পড়ল ট্রেনের মধ্যে মোজা খুলে থলেতে ভরে রেখেছিলাম। থলেটা কোথায়? এখানে? আমার ঝুড়িটা গেল কোথায়? মনে পড়ল, আমার মালপত্রের কথা ভুলেই গিয়েছি। খুঁজতে খুঁজতে মালের রসিদটা পেলাম; তাই ফিরে না গিয়ে এগিয়েই চললাম।

"যতই চেষ্টা করি, তখনকার অবস্থাটা কিছুতেই মনে করতে পারি না। তখন কি ভাবছিলাম? কি চেয়েছিলাম? একটা ভয়ংকর কিছু, প্রচণ্ড গুরুতর কিছু ঘটতে যাচ্ছে, এই আশংকা ছাড়া আর কিছুই মনে পড়ে না। সেই প্রচণ্ড গুরুতর কিছু যে ঘটল সেটা আমার ইচ্ছায় ঘটল কি আশংকার জন্য ঘটল তা জানি না। অথবা হয় 'তা 'তখন আমার মনটা ফাঁকাই ছিল, আর সেই গুরুগম্ভীর চিন্তাগুলি আমার পরবর্তীকালের কল্পনামাত্র।

'ফটকে পৌছে গেলাম। প্রায় একটা বাজে। বাড়ির সামনে কয়েকটা ছ্যাকরা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে; জানালায় আলো দেখে বোঝা গেল গাড়িতে যাত্রী এসেছে (আলোকিত জানালাগুলি আমাদের ফ্ল্যাটের—বসবার ঘর ও অভ্যর্থনা ঘরের জানালা। এত রাতে আমাদের জানালায় আলো দেখা যাচ্ছে কেন সে চিন্তা না করেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঘণ্টা বাজালাম; তখনও সেই প্রচণ্ড ঘটনার আশংকাটা মনের মধ্যে রয়েছে। পরিচারক ইয়েগর পরিশ্রমী, বোকা-সোকা লোক; সে দরজা খুলে দিল। প্রথমেই চোখে পড়ল, বারান্দায় অন্য জিনিসপত্রের সঙ্গে তার কোটটাও ঝোলানো রয়েছে। আমার বিস্মিত হবারই কথা, কিন্তু হলাম না; যেন এটা আশা করছিলাম। নিজের মনে বললাম, 'তাহলে আমিই ঠিক।' ইয়েগর-এর কাছে যখন জানতে চাইলাম ভিতরে কে আছে, সে বলল ত্রুখাচেভ্স্কি। জানতে চাইলাম, আর কেউ আছে কি না।

'কেউ নেই স্যার,' সে জবাব দিল।

'কেউ নেই, আঃ।' নিজের মনেই আমি বলেছিলাম।

'আর ছেলেমেয়েরা?'

'ঈশ্বরের কৃপায় তারা ভাল আছে। অনেকক্ষণ হল ঘুমিয়েছে।'

"আমার দম আটকে আসতে লাগল; ঠোঁটের কাঁপুনি কিছুতেই থামাতে পারছিলাম না। 'তাহলে এবারের ব্যাপারটা অন্য রকম! অন্য সময় দুর্ভাগ্যের আশংকা করেছি, কিন্তু পাই নি; শেষ পর্যন্ত সব ঠিক হয়ে গেছে। এবারে সব ঠিক নেই। দুর্ভাগ্য দেখা দিয়েছে। এই তো সে…'

"আমি প্রায় ভেঙে পড়লাম; একটা দানব যেন আমার কানে কানে বলল, 'সেকি, তুমি শুধু কাঁদবে, আর আবেগে ভাসবে, আর ওদিকে তারা

চুপচাপ সরে যাবে, তাদের অপরাধের কোন প্রমাণই থাকবে না? তুমি কি চিরকাল শুধু সন্দেহ করবে আর যন্ত্রণা পাবে? সঙ্গে সঙ্গে আমার আত্ম-প্রীতি মিলিয়ে গেল, তার জায়গায় দেখা দিল নতুন অনুভূতি। আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু আমার সে নতুন অনুভূতি ছিল আনন্দের। শেষ পর্যন্ত আমার সব দুঃখের অবসান হতে চলেছে, এবার তাকে শাস্তি দিতে পারব, তার হাত থেকে মুক্তি পাব, আমার ক্রোধকে প্রকাশ করতে পারব—এই আনন্দ। আমি তখন পশুতে পরিণত হয়েছি—একটা হিংস্র, ধূর্ত পশু।

"পরিচারকটি বসবার ঘরের দিকে যাচ্ছিল; তাকে বললাম, 'দাঁড়াও। এই রসিদটা নিয়ে যাও, স্টেশন থেকে আমার মালপত্রগুলো নিয়ে এস। দরজায় গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।'

"কোট আনতে সে তার ঘরে গেল। সে তাদের জানিয়ে দিতে পারে এই আশংকায় আমিও তার সঙ্গে গেলাম। তার কোট পরা পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করলাম। বসবার ঘরের ও-পাশেই অভ্যর্থনা-ঘর; সেদিক থেকে অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর ও কাঁটা-চামচের ঠুং ঠাং শব্দ ভেসে আসছে। তারা খাচ্ছে, তাই দরজার ঘণ্টা শুনতে পায় নি। ভাবলাম, 'তারা এখন বেরিয়ে না এলেই হয়।' অস্ত্রাখান কলার আঁটা কোটটা গায়ে চড়িয়ে ইয়েগর বেরিয়ে গেল। তার সঙ্গে দরজা পর্যন্ত গিয়ে তালা লাগিয়ে দিলাম। এবার আমি একা, এবার কাজের সময় উপস্থিত; একটা ভয় যেন আমাকে পেয়ে বসল। কি কাজ করব ভেবে দেখি নি। শুধু বুঝেছি, সব শেষ হয়ে গেছে, তার নির্দোষিতার আর কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না, তাকে শাস্তি দেবার সময় এসেছে, সময় এসেছে তার সঙ্গে সব সম্পর্ক শেষ করে দেবার।

"এর আগে আমি কেবলই ইতস্তত করেছি, মনকে বুঝিয়েছি, 'হয়তো এ সত্য নয়, হয়তো আমারই ভুল।' কিন্তু এখন আর সে মনোভাব নেই। আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত। আমার অনুপস্থিতিতে সেই লোকটার সঙ্গে একা! এতো সব বিচার বিবেচনাকে হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়া। হয়তো তার চাইতেও শোচনীয়; নির্দোষিতার প্রমাণ হিসাবেই হয়তো ইচ্ছা করে এই দুঃসাহসিকতা, এই বেপরোয়াভাবের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। সবই পরিষ্কার। সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। শুধু একটিমাত্র ভয়: এখনও তারা পালিয়ে যেতে পারে, সব প্রমাণ মুছে ফেলে শাস্তি দেবার সুযোগ থেকে আমাকে বঞ্চিত করবার কোন নতুন কৌশলের কথা ভাবতে পারে। আর তাই তাড়াতাড়ি তাদের ধরে ফেলবার জন্য পা টিপে টিপে অভ্যর্থনা ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম।

বসবার ঘরের ভিতর দিয়ে না গিয়ে গেলাম হল ও নার্সারির ভিতর দিয়ে।

"ছেলেরা ঘুমিয়ে আছে। ধাই-র শরীরটা নড়ে উঠল, বুঝি জেগে উঠবে। সব কিছু জানাজানি হয়ে গেলে সে কি ভাববে, সেকথা কল্পনা করে নিজের

প্রতি এতখানি করুণা হল যে আমি চোখের জল রুখতে পারলাম না। পাছে ছেলেমেয়েরা জেগে ওঠে এই ভয়ে পা টিপে টিপে হল পেরিয়ে পড়ার ঘরে চলে গেলাম। সোফায় শরীরটাকে এলিয়ে দিয়ে অনেক কথাই ভাবতে লাগলাম।

"আমি একটি সৎ লোক, বাপ-মায়ের সন্তান ; সারা জীবন একটি সুখী পরিবারের স্বপ্ন দেখেছি ; স্বামী হিসাবে কখনও স্ত্রীকে প্রতারণা করি নি ; আর সে পাঁচটি সন্তানের মা হয়েও একটা বাজনাদারের সঙ্গে প্রেম করছে। কারণ তার ঠোঁট দুখানি রাঙা! সে তো মানুষ নয়, একটা কুক্করী, ঘৃণিত কুক্করী! পাশের ঘরে ছেলেমেয়েরা—তার নিজের ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে আছে ; চিরদিন সে তাদের ভালবাসার ভান করেছে। আর আমাকে লিখেছে ঐ চিঠি! নির্লজ্জের মত লোকটার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছে! কিন্তু আমি আর কতটুকু জানি ? হয়তো আগাগোড়াই তাই করেছে। হয়তো পরিচারক-দের সন্তানকে পেটে ধরে তাদের আমার সন্তান বলে চালিয়েছে। যদি আমি আগামীকাল বাড়ি ফিরতাম, তাহলেই তো পরিপাটি করে চুল বেঁধে, কোমর দুলিয়ে, সুন্দর শরীরটা নাচিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াত, আর 'আর ঈর্ষার পশুটা আমার বুকের মধ্যে লুকিয়ে থেকে আমাকে কুরে কুরে খেত।' ধাই কি ভাববে ? ইয়েগর কি মনে করবে ? আর ছোট্ট লিজা! সে তো কিছু কিছু বুঝতে শিখেছে। কী নির্লজ্জ ব্যাপার! কী মিথ্যাচার! এ পশুর কামনা তো আমি চিনি।'

"উঠতে চেষ্টা করলাম। পারলাম না। বুকের ভিতরে এমন ধড়াস-ধড়াস করতে লাগল যে দাঁড়াতে পারছিলাম না। বুঝি সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ব। সেই আমাকে মেরে ফেলবে। ঠিক তাই তো সে চায়। আমি কি তাকে খুন করব ? না, না, তাহলে তো সোজা হয়ে গেল। এত সহজে তাকে ছেড়ে দেব না। কিন্তু আমি তো এখানে বসে আছি, আর তারা খাচ্ছে হাসছে, আর—হ্যাঁ, তাকে কাছে টেনে নিতে লোকটার কোন সংকোচ নেই যদিও এখন সে ততটা তাজা নেই, তবু সে তো মনোরমা বটেই ; তাছাড়া সব চাইতে বড় কথা মূল্যবান স্বাস্থ্যকে সে নষ্ট হতে দেয় নি। আগের সপ্তাহে তার সঙ্গে একটা ঝগড়া হলে তাকে আমি পড়ার ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়ে-ছিলাম, জিনিসপত্র তছনছ করেছিলাম। সেকথা মনে হতেই নিজেকে প্রশ্ন করলাম,'তখনই কেন তাকে খুন করি নি ?' তখনকার মনের অবস্থাটা স্পষ্ট মনে পড়ল ; এখনও সব কিছু ভেঙে তছনছ করবার সেই একই ইচ্ছা মনে জাগল। মনে পড়ে, কাজের কী প্রচণ্ড প্রেরণা তখন অনুভব করেছিলাম—কাজ ছাড়া আর সব কিছু মন থেকে মুছে গিয়েছিল। আমার অবস্থা তখন সেই জন্তু বা মানুষের মত যার সমস্ত ইন্দ্রিয় বিপদের আশংকায় সজাগ হয়ে উঠেছে ; এরকম অবস্থায় সে কাজ করে সঠিকভাবে ধীরেসুস্থে, একটি মিনিট নষ্ট না করে, সব কিছুকে একটিমাত্র লক্ষ্যের অধীনে এনে।"

সাতাশ

"প্রথমেই পায়ের জুতো খুলে মোজা পায়ে সোফার ঠিক উপরে দেয়ালে ঝোলানো অস্ত্রগুলোর দিকে এগিয়ে গেলাম এবং একটা ফুট-কাটা ছোরা নামিয়ে আনলাম; ছোরাটা খুব ধারালো, আর আগে কখনও ব্যবহার করা হয় নি। খাপ থেকে ছোরাটা টেনে বার করলাম। খাপটা সোফার পিছনে পড়ে গেল। তখন কোটটা খুলে ফেলে সোজা নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলাম।

"হামাগুড়ি দিয়ে দরজা পর্যন্ত গিয়েই হঠাৎ দরজাটা সপাটে খুলে ফেললাম। তাদের মুখের ভাবটা এখনও মনে আছে। মনে থাকার কারণ তাদের মুখ দেখে আমি একটা সানন্দনির্যাতনের যন্ত্রণা বোধ করেছিলাম। সে মুখে লেখা ছিল আতংক। আমিও ঠিক তাই চেয়েছিলাম। আমাকে দেখার প্রথম মুহূর্তে তাদের দুজনের মুখে যে ত্রাস ও হতাশা ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল তা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমার মনে থাকবে। মনে হল, লোকটি তখন টেবিলে বসেছিল; আমাকে দেখেই বা শব্দ শুনেই সে লাফ দিয়ে উঠে বুক-কেসটার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। তার মুখে ত্রাসের নিঃসন্দেহ প্রকাশ; আমার স্ত্রীর মুখেও ত্রাসই ফুটে উঠেছিল, কিন্তু সে ত্রাসের সঙ্গে আরও কিছু মিশে ছিল। যদি শুধু ত্রাস হত, তাহলে হয়তো যা ঘটেছিল তা ঘটত না। আমার স্ত্রীর মুখে আরও ছিল। অন্তত সেইমুহূর্তে আমার তাই মনে হয়েছিল। একটা হতাশার ভাব, তাদের ভালবাসার খেলায় ও তাদের সুখের ব্যাঘাত ঘটায় একটা বিরক্তির ভাব। কিন্তু তাদের দুজনেরই মুখের সেই ভাব ছিল ক্ষণস্থায়ী। সেই মুহূর্তের সুখটুকু ছাড়া সে বুঝি আর কিছুই চায় না। মুহূর্তের মধ্যেই লোকটির দৃষ্টিতে ত্রাসের বদলে ফুটে উঠল জিজ্ঞাসা: 'এই মানুষটির কাছে মিথ্যা বলা সম্ভব কি না? সম্ভব হলে আমাকে এখনই শুরু করতে হবে। সম্ভব না হলে একটা কিছু ঘটবেই। কিন্তু সেটা কি? জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সে আমার স্ত্রীর দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ত্রীর চোখে হতাশা ও বিরক্তির বদলে ফুটে উঠল লোকটির জন্য উৎকণ্ঠা।

"ছোরাটাকে পিছনে রেখে একমুহূর্ত দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। ঠিক তখনই সে হেসে উঠল, এবং প্রায় কৌতুকের সুরে বলে ফেলল:

'আমরা একটুখানি গান-বাজনা করছিলাম···'

"তার সুরের নকল করে আমার স্ত্রীও বলল, 'এটা খুবই অপ্রত্যাশিত···

"তাদের কাউকেই কথা শেষ করবার সুযোগ দেওয়া হল না। গত সপ্তাহের মতই একটা প্রচণ্ড ক্রোধ আমাকে পেয়ে বসল। আবার সেই সব কিছু ভেঙে তছনছ করবার ইচ্ছা। একটা বদ্ধ উন্মত্ততা আমাকে গ্রাস করল; সেই উন্মত্ততার হাতে নিজেকে ছেড়ে দিলাম।"

"কথা শেষ করবার সুযোগ তারা কেউই পেল না। লোকটি যে ঘটনার আশংকা করছিল তাই ঘটল ; সে ঘটনা তৎক্ষণাৎ তাদের মুখের কথাকে স্তব্ধ করে দিল। স্ত্রীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম ; তার বুকের ঠিক নীচে বাঁদিকটায় ছোরাটা আমূল বসিয়ে দেবার কাজে পাছে লোকটা বাধা দেয় তাই ছোরাটা তখনও লুকিয়েই রেখেছিলাম। প্রথম থেকেই আঘাত করবার ওই স্থানটা আমি বেছে নিয়েছিলাম। কিন্তু আমার স্ত্রীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই লোকটা আমার উদ্দেশ্য ধরতে পেরে আমার হাতটা চেপে ধরল। এটা যে সে করতে পারে তা আমি ভাবতে পারি নি।"

'ভেবে দেখুন, আপনি কি করছেন! বাঁচান।' লোকটি চেঁচিয়ে উঠল।

"হাতটা টেনে নিয়ে তার দিকে রুখে দাঁড়ালাম। চোখাচোখি হল। তার সারা মুখ, এমন কি ঠোঁট দুটো পর্যন্ত, কাগজের মত সাদা হয়ে গেছে ; তার চোখে একটা অদ্ভুত আভা ফুটে উঠেছে ; বড় পিয়ানোটার আড়ালে লুকিয়ে সে দরজার দিকে ছুটে গেল। সে যে এরকম একটা কাজ করবে তাও আমি ভাবি নি। হয়তো তার পিছু নিতাম, কিন্তু কে যেন আমার বাঁ হাতটা ধরে ফেলল। আমার স্ত্রী। নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করলাম। সে আরও চেপে ধরল : আমাকে কিছুতেই যেতে দেবে না। এই অপ্রত্যাশিত বাধা, হাতের উপর তার চাপ, তার বিরক্তিকর স্পর্শ—সবই আমার ক্রোধে ইন্ধন যোগাল। আমি বুঝি পাগল হয়ে গেলাম ; বুঝলাম, আমাকে ভয়ংকর দেখাচ্ছে, আর সেটা বুঝতে পেরে ভালই লাগল। সর্বশক্তি নিয়োগ করে বাঁ হাতটা ছাড়িয়ে নিলাম, আর ধ্বস্তাধ্বস্তিতে আমার কনুইয়ের আঘাত লাগল তার মুখে। চীৎকার করে সে আমার হাত ছেড়ে দিল। তখন লোকটাকে তাড়া করতে চাইলাম, কিন্তু তখনই মনে হল, সোজা পায়ে স্ত্রীর প্রেমিকের পিছনে ধাওয়া করাটা একান্তই অস্বাভাবিক। আমি অস্বাভাবিক হতে চাই না। হতে চাই ভয়ংকর। তখন আমাকে পাগলামিতে পেয়েছে ; তবু তাদের উপর আমার প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে আমি সব সময়ই সচেতন ছিলাম, আর সেই প্রতি-ক্রিয়াই আমাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল।"

"তার দিকে ফিরে দাঁড়ালাম। সোফায় বসে সে আমার দিকে তাকিয়ে আছে ; যে চোখটায় আমি আঘাত দিয়েছি সে চোখটাকে এক হাত দিয়ে ঢেকে রেখেছে। তার মুখে ফুটে উঠেছে আমার প্রতি ভয় ও ঘৃণা ; আমি তার শত্রু। ফাঁদের মুখ তুলে দিলে ফাঁদে-পড়া ইঁদুরের যে অবস্থা হয়, তেমনই অবস্থা তার। অন্তত আমি তো তার মুখে ভয় ও ঘৃণা ছাড়া আর কিছু দেখি নি। আর একজনের প্রতি ভালবাসাই তার মনে আমার প্রতি এই ভয় ও ঘৃণা জাগিয়ে তুলেছে। কিন্তু সে যদি তখনও চুপ করে থাকত, তাহলে হয়তো আমি নিজেকে সংযত করতাম, হয়তো যা করেছিলাম তা করতাম না। কিন্তু হঠাৎ সে কথা বলতে বলতে আমার হাতটা চেপে ধরল।"

"ভেবে দেখ তুমি কি করছ! এসব কি? তোমাকে কি সে পেয়েছে? আমাদের কিছুই হয় নি, কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, কিচ্ছু না! আমি শপথ করে বলছি!"

"তখনও হয়তো ইতস্তত করতাম, কিন্তু এই কথাগুলি আমার কাছে ঠিক বিপরীত অর্থ নিয়ে হাজির হল: তাদের দুজনের মধ্যে সত্যি কিছু আছে; আর তাই তার একটা মনের মত জবাবও আমাকে দিতেই হবে। আমার মনের অবস্থাটাও তখন একেবারে তুঙ্গে উঠে গেছে। উন্মত্ততারও তো একটা নিজস্ব নিয়ম আছে।"

"মিথ্যা কথা বলো না, নোংরা মেয়েমানুষ!" চীৎকার করে বাঁ হাতে তাকে চেপে ধরলাম। সে ফসকে গেল। ছোরাটা ফেলে না দিয়ে বাঁ হাতেই তার গলাটা চেপে ধরলাম; চিৎ করে ফেলে দিয়ে টুঁটি টিপে ধরলাম। তার গলাটা কী শক্ত! গলাটা ছাড়াবার জন্য সে আমার হাতটা চেপে ধরল। সেই সুযোগের জন্যই যেন আমি অপেক্ষা করেছিলাম; সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শক্তি এক করে তার বাঁদিকের পাঁজরার নীচে ছোরাটা বসিয়ে দিলাম।

"লোকে বলে যে রাগের মাথায় তারা কি করে তা বুঝতে পারে না, সেটা বাজে কথা, মিথ্যা কথা। আমি তো সব বুঝতে পারছিলাম, একমুহূর্তের জন্য বুঝতে আমার অসুবিধা হয় নি। মনের মধ্যে রাগ যত জমতে লাগল, বুদ্ধির দীপ্তিও ততই বাড়তে লাগল; আমি যা করলাম তার কোনটাই বুঝতে আমার অসুবিধা হবার কথা নয়। সময়ের প্রতিটি ভগ্নাংশে আমি কি করেছি তা বুঝতে পারছিলাম। পরমুহূর্তে কি করব সেটা আগে থেকেই জানতে পেরে-ছিলাম তা বলছি না। কিন্তু ঠিক কাজ করার মুহূর্তে আমি সেটা বুঝতে পারছিলাম; হয় তো বা সামান্য আগেই বুঝতে পারছিলাম। আমি জানতাম যে পাঁজরের নীচেই আঘাত করছি, আর ছোরাটা ঠিক সেখানেই ঢুকে যাবে। পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম আমি যা করছি তা ভয়ংকর, তেমন কাজ আগে কখনও করি নি, আর তার ফলাফল হবে ভয়াবহ। কিন্তু সে বোধ মনের মধ্যে ঝিলিক দিয়ে উঠত বিদ্যুৎ চমকের মত; বোধটা হত কাজটি শেষ হবার ঠিক পরমুহূর্তে। অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই সমস্ত কাজটাকে অনুভব করতে পেরেছিলাম। মনে পড়ে, জামায় বা ঐ রকম কিছুতে মুহূর্তের জন্য বাধা পড়েছিল, আর তারপরেই ফলাটা নরম কিছুর মধ্যে ঢুকে গেল। দুই হাত দিয়ে সে ছোরাটা চেপে ধরল, তার হাত কেটে গেল, কিন্তু ছোরাটা থামল না। পরবর্তীকালে জেলে থাকতে মনের নৈতিক পরিবর্তন ঘটবার পরে এই মুহূর্তটার কথা অনেক ভেবেছি; বার বার মনে করেছি আর তার অর্থ বুঝতে চেষ্টা করেছি। মনে পড়ে, কাজটা করবার এক সেকেণ্ড, একটি সংক্ষিপ্ত সেকেণ্ডের জন্য আমি ভীষণভাবে উপলব্ধি করেছিলাম যে আমি একটি নারীকে খুন করছি, খুন তাকে আগেই করেছি, একটি অসহায় নারী, আমার

স্ত্রী। সেই উপলব্ধির ভীষণতা আজও মনে পড়ে; অস্পষ্টভাবে আরও মনে পড়ে যে সেই উপলব্ধির জন্যই ছোরাটা ঢুকিয়ে দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে টেনে তুলেছিলাম, হয়তো যা করে ফেলেছি তাকে ফিরিয়ে নিতে চেয়েছিলাম। এক সেকেণ্ডের জন্য নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম কি ঘটে; সবিস্ময়ে ভাবছিলাম যা ঘটে গেছে তার অন্যথা হতে পারে কিনা। আমার স্ত্রী লাফ দিয়ে উঠে চীৎকার করে বলল:

'আয়া! ও আমাকে খুন করে ফেলেছে!'

"সেই শব্দে জেগে উঠে আয়া দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। আমি সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম; যেন কিছুই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কিন্তু ওর জামার নীচ দিয়ে তখন গল্ গল্ করে রক্ত বেরুচ্ছে। একমাত্র তখনই বুঝতে পারলাম যে যা করে ফেলেছি তাকে আর ফেরানো যাবে না; সঙ্গে সঙ্গে স্থির করলাম, একাজকে ফেরানো উচিতও নয়; এই তো আমি চেয়েছিলাম, এটাই তো ঘটা উচিত। আমি দাঁড়িয়েই রইলাম। এবার সে লুটিয়ে পড়ল; আয়া তার কাছে ছুটে গিয়ে বলল, 'হা ঈশ্বর!' তখনই ছোরাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমি দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম।

তার দিকে বা আমার দিকে ফিরেও তাকালাম না। নিজেকে বললাম, 'আমি উত্তেজিত হব না; কি করছি সেটা শান্তভাবে চিন্তা করব।' আয়া কাঁদতে কাঁদতে দাসীকে ডাকল। হল পেরিয়ে গিয়ে দাসীকে পাঠিয়ে দিয়ে আমার ঘরে চলে গেলাম। আমি জানতাম আমাকে কি করতে হবে, তবু নিজেকে প্রশ্ন করলাম, 'এখন আমাকে কি করতে হবে?' পড়ার ঘরে ঢুকে সোজা দেয়ালের কাছে গেলাম, একটা রিভলবার নামিয়ে নিলাম, সেটাকে পরীক্ষা করে দেখলাম—গুলি ভরাই ছিল—এবং সেটাকে লেখার ডেস্কের উপর রাখলাম তারপর সোফার পিছন থেকে ছোরার খাপটা তুলে নিলাম।

"অনেকক্ষণ বসে রইলাম। কোন চিন্তা নেই। কিছু মনেও পড়ছে না। পাশের ঘরের গোলমাল কানে আসছে। কে যেন গাড়িতে এসে বাড়িতে ঢুকল। আর একজন কে এল। আমার মালপত্র নিয়ে ইয়েগর ঘরে ঢুকল। যেন মালপত্রগুলোর এখন কোন দরকার আছে!

বললাম, "কি হয়েছে জান? দরোয়ানকে বল, পুলিশকে খবর দিতে।"

কোন কথা না বলে সে চলে গেল। আমি উঠলাম, দরজায় তালা দিলাম, সিগারেট ও দেশলাই বের করে ধূমপান করতে লাগলাম। একটা সিগারেট শেষ করবার আগেই ঘুম পেয়ে গেল। দুটি ঘণ্টা ঘুমলাম। মনে পড়ে, স্বপ্ন দেখেছিলাম তার আর আমার মধ্যে ভাব হয়েছে; ঝগড়া হয়েছিল, মিটে গেছে; মনকষাকষি হয়েছিল, কিন্তু আবার ভাব হয়েছে। দরজায় ঠক-ঠক শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। জেগেই মনে হল পুলিশ। আমি হয়তো ওকে খুন করে ফেলেছি। কিন্তু হয়তো আমার স্ত্রীই এসেছে, কিছুই হয় নি। দরজায়

আবার শব্দ হল। জবাব দিলাম না; ব্যাপারটা সত্যি ঘটেছে কিনা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। হ্যাঁ ঘটেছে। তার জামায় আটকে যাবার পরে ছোরাটা যে ঢুকে গিয়েছিল সেটা মনে পড়ল। আমার শিরদাঁড়ার ভিতর দিয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে যেতে লাগল। বলে উঠলাম, 'হ্যাঁ, ঠিকই ঘটেছে। এবার আমার পালা।' কিন্তু সেকথা বলবার সময়ও আমি জানতাম যে, আমি নিজেকে খুন করব না। উঠে দাঁড়িয়ে রিভলবারটা তুলে নিলাম। আর কী আশ্চর্য: সেইদিনই ট্রেনের মধ্যে যেমন হয়েছিল তেমনি আরও কতবার যে আমি আত্মহত্যা করার কথা ভেবেছি সেসব মনে পড়ে গেল। তখন মনে হত ব্যাপারটা তো খুবই সহজ—এতে তার যে কত বড় শাস্তি হবে সেটা জানতাম বলেই সহজ। করা তো দূরের কথা, এমন কি আমি আত্মহত্যার কথা ভাবতেও পারি না। নিজেকে প্রশ্ন করলাম, "কেন করব?" কোন জবাব পেলাম না। দরজায় আবার টোকা পড়ল। "আগে দেখি কে শব্দ করছে। এটা তো পরেও করা যাবে।" রিভলবারটা রেখে খবরের কাগজ দিয়ে ঢেকে দিলাম। দরজার কাছে গিয়ে হুড়কোটা নামিয়ে দিলাম। আমার স্ত্রীর বোন, একটি বোকা, দয়াবতী বিধবা।

"ভাসিয়া! এসব কী ব্যাপার?" বলতে বলতেই তার চোখের জল ঝরতে লাগল।

কড়া গলায় বললাম, "তুমি কি চাও?" বুঝলাম এরকম কঠোর হওয়া যেমন বোকামি তেমনি অপ্রয়োজন, কিন্তু নিজেকে ঠিক রাখতে পারলাম না।

"ভাসিয়া! ও যে মরতে বসেছে! আইভান ফিওদরোভিচ তাই বললেন।" আইভান ফিওদরোভিচ ডাক্তার, আমার স্ত্রীর ডাক্তার, তার পরামর্শদাতা।

"তাহলে তিনিও হাজির হয়েছেন।" আমি বললাম। আবার আমার রাগ চড়ে গেল। "বেশ তো, তাতে কি হয়েছে?"

"ভাসিয়া, ওর কাছে যাও! ইস্! কী ভয়ানক! কী ভয়ানক!" সে বিলাপ করতে লাগল।

নিজে নিজেই বললাম, "তার কাছে যাব?" জবাবও দিলাম, "যাবই তো, অবশ্য যাব; যেতেই তো হবে; আমার মতই কেউ যখন তার স্ত্রীকে খুন করে তখন তো তাকে স্ত্রীর কাছে যেতেই হয়। তাই যদি হয়ে থাকে, আমাকেও যেতে হবে। অপর কাজটি যদি করতেই হয়, তার জন্য তো প্রচুর সময় পাওয়া যাবে।" নিজেকে গুলি করার কথা মনে রেখেই এ-কথা ভাবলাম। "সেখানে অনেক কথা হবে, মুখভঙ্গী হবে, কিন্তু সেসব আমাকে স্পর্শ করবে না।" নিজে নিজেই বললাম।

"দাঁড়াও," শ্যালিকাকে বললাম। "মোজা পায়ে গেলে বড়ই বোকা-বোকা দেখাবে। অন্তত চটিজোড়া পায়ে গলিয়ে নি।"

আঠাশ

"শুনতে আশ্চর্য মনে হলেও ঘর থেকে বেরিয়ে অন্য সব পরিচিত ঘর-দরজার ভিতর দিয়ে যেতে যেতে মনে আশা জাগল যে হয়তো কিছুই হয় নি। কিন্তু আয়োডোফর্ম ও কার্বলিক এসিড-এর তীব্র গন্ধ নাকে আসতেই একটা ধাক্কা খেলাম। হ্যাঁ, ঘটেছে। ছেলেমেয়েদের পড়ার ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় লিজাকে দেখতে পেলাম। ভয়ার্ত চোখে সে আমার দিকে তাকাল। আমি যেন কল্পনায় দেখতে পেলাম। সেখান থেকে পাঁচটি ছেলেমেয়েই আমার দিকে তাকিয়ে আছে। দরজার কাছে গেলাম। দরজাটা খুলে দিয়ে দাসী বেরিয়ে গেল। প্রথমেই চোখে পড়ল মুক্তো-সাদা পোশাকটা রক্ত-মাখা অবস্থায় চেয়ারের উপর পড়ে আছে। হাঁটু তুলে আমাদের জোড়াখাটে সে শুয়ে আছে; আমার দিকটাতেই শুয়েছে, কারণ তার দিকটা দেয়াল ঘেঁষে। একগাদা বালিশের স্তূপের উপর উঁচু হয়ে শুয়ে আছে, পরনের জ্যাকেটটা বাঁধা হয়নি। ক্ষতের উপরে কি যেন চাপা দেওয়া রয়েছে। বাতাসে আয়োডোফর্মের তীব্র গন্ধ। ওর গালটা ছড়ে গিয়ে ফুলে উঠেছে, নাক ও চোখের অবস্থাও তাই—আমাকে বাধা দিতে গিয়ে আমার কনুইর ধাক্কা লেগেই এ-রকম হয়েছে। কোথায় গেল তার রূপ। বরং আমার কাছে তো বিরক্তিকরই মনে হল।

আয়া বলল, "যান, ওঁর কাছে যান।"

ভাবলাম, "হয় তো ও ক্ষমা চাইবে। আমি কি ক্ষমা করব? হঁা, ও মরতে চলেছে। কাজেই ক্ষমা করতে পারি।" আমি উদার হতে চাইলাম। সোজা তার কাছে এগিয়ে গেলাম। অনেক কষ্টে সে চোখ মেলল। একটা চোখ ফুলে উঠেছে। অনেক কষ্টে থেমে থেমে বলল:

'তুমি যা চেয়েছিলে তা তো পেয়েছ···আমাকে খুন করেছ।' আর সেই শারীরিক যন্ত্রণা, সেই মৃত্যুর চেতনার মধ্যেও চিরদিনের সেই তীব্র জান্তব ঘৃণা ঝলক দিয়ে উঠল: 'না···ছেলেমেয়েদের···তোমাকে দেব না··· তাদের নিয়ে যাবে···ও (তার বোনকে দেখাল।'

"আমি যেটাকে আসল জিনিস ভেবেছিলাম—তার দোষ, তার প্রতারণা—সেটাকে উল্লেখযোগ্য বলেই মনে করল না।"

'আশা করি তোমার এই কীর্তি দেখে তোমার ভালই লাগছে,' এই কথা বলে দরজার দিকে তাকিয়েই সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। দরজার কাছে তার বোন ও ছেলেমেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে। 'দেখ, তুমি কি করেছ।'

"ছেলেমেয়েদের দেখলাম; তারপর আবার তার ছড়ে-যাওয়া ফুলে-ওঠা মুখের দিকে তাকালাম; বুঝি এই প্রথম নিজেকে ভুলে গেলাম; ভুলে গেলাম

আমার অধিকার, আমার অহংকার ; এই প্রথম তাকে দেখলাম একটি মানুষ হিসাবে। আর আমার সব ঈর্ষা, সব আহত অহংকারকে এতই তুচ্ছ মনে হতে লাগল, আর যা করে ফেলেছি সেটাকে এতই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হল যে, তার পাশে নতজানু হয়ে বসে তার হাতের উপর মুখ রেখে বুঝি বা বলতে চেয়েছিলাম, 'আমাকে ক্ষমা কর !' কিন্তু বলতে পারলাম না।"

"সে চুপ করে রইল ; চোখ বুজল ; আর একটি কথা বলারও শক্তি তার ছিল না। তারপর তার বিকৃত মুখটা কাঁপতে লাগল, সংকুচিত হয়ে উঠল। ধীরে সে আমাকে সরিয়ে দিল।"

'একাজ কেন করলে ? কেন ?'

'আমাকে ক্ষমা কর,' আমি বললাম।

'তোমাকে ক্ষমা করব ? বাজে কথা। শুধু যদি না মরি !' সে চেঁচিয়ে বলল ; নিজেকে একটু তুলে বিকারের রোগীর মত স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। 'হ্যাঁ, যা চেয়েছিলে তা তো পেয়েছ ! আমি তোমাকে ঘৃণা করি ! ওঃ ! ওঃ !' যেন বিকারের ঘোরে কিছু একটা দেখে ভয় পেয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল। 'আমাকে মেরে ফেল ! মেরে ফেল ! আমি ভয় পাই না ! কিন্তু সবাইকে, সবাইকে ! ওকেও ! ও যে চলে গেল ! চলে গেল।'

'সে বিকার আর কাটল না। কাউকে চিনতে পারত না। সেদিন দুপুরেই সে মারা গেল। তার অনেক আগেই বেলা আটটা নাগাদ আমাকে পুলিশের হেড কোয়ার্টারে নিয়ে গেল, আর সেখান থেকে জেলে। সেখানে এগারোটি মাস আমাকে বিচারের জন্য অপেক্ষা করে থাকতে হল। সেই সময় নিজের কথা, আমার অতীতের কথা ভেবে ভেবে সব কিছু বুঝতে পারলাম। তৃতীয় দিনেই আমি বুঝতে শুরু করলাম। তৃতীয় দিনে তারা আমাকে আবার সেখানে নিয়ে গেল…"

সে আরও কথা বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু কান্না চেপে রাখতে না পেরে থেমে গেল। অনেক চেষ্টায় নিজেকে সংযত করে আবার শুরু করল :

"তাকে শবাধারে শায়িত দেখার পরেই সব বুঝতে শুরু করলাম। "দম বন্ধ করে সে দ্রুত বলতে লাগল। "তার মৃত্যুশীতল মুখখানি দেখেই বুঝলাম আমি কি করেছি। বুঝলাম, আমি—আমিই তাকে খুন করেছি ; একদিন সে ছিল জীবন্ত, উষ্ণ, সচল, আর আমার জন্যই আজ সে নিশ্চল, শীতল, মোমের মত ; আর কখনও এর অন্যথা হবে না—কখনও, কোথাও, কেউ এর অন্যথা করতে পারবে না। এই অবস্থার ভিতর দিয়ে যে গেছে একমাত্র সেই এটা বুঝতে পারবে। ওঃ, ওঃ, ওঃ, !" বার কয়েক আর্তনাদ করে সে চুপ করল।

অনেকক্ষণ আমরা নিঃশব্দে বসে রইলাম। চাপা কান্নার আবেগে তাঁর শরীরটা কাঁপতে লাগল।

"আমাকে ক্ষমা করবেন…"

পাশ ফিরে একটা কম্বল মুড়ি দিয়ে সে শুয়ে পড়ল। সকাল আটটার সময় আমরা গন্তব্য স্টেশনে পৌঁছে গেলাম। বিদায় নেবার জন্ম তার কাছে এগিয়ে গেলাম। সে ঘুমিয়ে আছে, কি ঘুমের ভান করে আছে বুঝতে পারলাম না। তবে একটুও নড়াচড়া ছিল না। তার হাতটা স্পর্শ করলাম। সে কম্বলটা সরিয়ে রাখল; দেখলাম সে ঘুমোয় নি।

হাত বাড়িয়ে বললাম, 'বিদায়।'

ম্লান হাসি হেসে সেও হাতটা বাড়িয়ে দিল। সে হাসিটি এতই করুণ যে আমার চোখে জল এসে গেল।

যে কথাগুলি দিয়ে তার গল্পটা শেষ করেছিল তারই পুনরাবৃত্তি করে সে বলল, "আমাকে ক্ষমা করবেন।"

কসাক

THE COSSACKS

(A Story of the Caucasus)

অধ্যায়—১

মস্কো এখন শান্ত। শীতের রাজপথে কচিৎ কখনও চাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে। জানালায় কোন আলো নেই, রাস্তার আলোগুলো নিভে গেছে। গির্জার চূড়া থেকে ঘণ্টার শব্দ ঘুমন্ত শহরের উপর দিয়ে ভেসে এসে জানিয়ে দিল যে সকাল হয়েছে। রাস্তাগুলি জনশূন্য। মাঝে মাঝে দু'একটা স্লেজ-গাড়ি বরফ ও বালির ভিতর দিয়ে পথ কেটে চলেছে, আর কোচয়ান রাস্তার পরবর্তী মোড়ে পৌছে দ্বিতীয় সওয়ারির জন্য অপেক্ষা করে করে ঘুমিয়ে পড়েছে। একটি বুড়ি গির্জার দিকে চলেছে; গির্জায় এখানে-ওখানে কয়েকটি মোমবাতি জ্বলছে; দেবমূর্তির সোনালী ফ্রেমের উপর তার লাল আলো পড়ে চিকচিক করছে। শীতের লম্বা রাতের পরে মজুররা এর মধ্যেই উঠে পড়ে কাজে বেরিয়ে পড়েছে।

কিন্তু ভদ্রলোকদের কাছে সময়টা এখনও সন্ধ্যা।

শেভালিয়ার্স রেস্তোরাঁর খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে এত রাতের পক্ষে বে-আইনী হলেও এখনও আলো দেখা যাচ্ছে। ফটকে একখানা গাড়ি ও অনেকগুলি স্লেজ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। একটা তিন-ঘোড়ার ডাক-স্লেজও আছে। উঠোনের দরোয়ান শীতে জড়সড় হয়ে বাড়িটার এক কোণে লুকিয়ে পড়েছে।

রেস্তোরাঁর ওয়েটারটি বিশ্রী মুখ করে হলে বসে আছে; মনে মনে বলছে, "এভাবে বসে বসে হাই তুলে লাভটা কি? যখনই আমার ডিউটি পরে তখনই এই অবস্থা হয়!"

পাশের উজ্জ্বল আলোকিত ছোট ঘরটা থেকে তিনটি যুবকের কথা শোনা যাচ্ছে। ঘরের মধ্যে টেবিলে ভুক্তাবশিষ্ট ও মদ পড়ে আছে। তাদের একজনের বেশ ফিটফাট পোশাক; আসনে বসে ক্লান্ত চোখে সে আসন্ন যাত্রার জন্য প্রস্তুত বন্ধুটির দিকে তাকিয়ে আছে। অপরজন বেশ লম্বা; খালি বোতল ভর্তি টেবিলের পাশে একটা সোফায় শুয়ে সে ঘড়ির চাবিটা নিয়ে খেলা করছে। তৃতীয় জন ভেড়ার চামড়ার কোট পরে পায়চারি করছে। মাঝে মাঝেই আঙুলের চাপ দিয়ে বাদাম ভাঙছে। সে অনবরত হাসছে, তার চোখ-মুখ জ্বল্ জ্বল্ করছে। কথা বলার সময় নানারকম অঙ্গভঙ্গী করছে; দেখে মনে হয় সঠিক কথাটা খুঁজে পাচ্ছে না; যা ঠোঁটে আসছে তা

মনের ভাব প্রকাশের পক্ষে উপযুক্ত বলে মনে হচ্ছে না।

যাত্রীটি বলল, "এবার খোলাখুলি কথা বলতে পারি। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বলছি না, কিন্তু আমি চাই তোমরা অন্তত আমাকে আমার মত করেই বুঝতে চেষ্টা কর, সাধারণের মত ইতর দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটাকে দেখো না। তোমরা বলছ তার প্রতি আমি খারাপ ব্যবহার করেছি?" যে লোকটি সদয় চোখে তাকে দেখছিল তাকে সম্বোধন করেই সে কথাগুলি বলল।

লোকটি জবাবে বলল, "হ্যাঁ, তোমারই দোষ।" তার চোখ দুটিতে আরও করুণা ও ক্লান্তি ফুটে উঠল।

যাত্রীটি বলতে লাগল, "আমি জানি কেন তোমরা একথা বলছ। তোমরা ভাব ভালবাসা পাওয়া ভালবাসার মতই বড় ব্যাপার; একবার সেটা পেলে সারা জীবনটাই তাতে কুলিয়ে যায়।"

ছোটখাট সাদাসিদে লোকটি চোখ মিটমিট করে বলল, "হ্যাঁ ভাই, খুব কুলিয়ে যায়, বরং উপচে পড়ে।"

"কিন্তু তাই বলে মানুষ ভালবাসবে না?" যেন করুণার চোখে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে যাত্রীটি চিন্তিতভাবে বলল। "কেন ভালবাসবে না? ভালবাসা তো এমনি আসে না...না, ভালবাসা পাওয়াটা দুর্ভাগ্য! যা পেয়েছ তা যদি ফিরিয়ে দিতে না পার তাহলে নিজেকেই তো দোষী বলে মনে হবে, আর সেটাই তো দুর্ভাগ্য। হে আমার ঈশ্বর।" সে হাতটা তুলে ধরল। "এসব জিনিস যদি যুক্তি-বুদ্ধি মেনে চলত! কিন্তু সবই যেন কেমন ওলোট-পালোট, আমাদের উপর মোটেই নির্ভর করে না—খুশিমত আসে। কেন, মনে হয় আমি যেন ভালবাসা চুরি করেছি। তোমরাও তাই মনে কর। অস্বীকার করো না, এরকমটা চিন্তা করতে তোমরা বাধ্য। কিন্তু তোমরা কি বিশ্বাস করবে, এ জীবনে যত কিছু অর্থহীন ঘৃণ্য কাজ করেছি তার মধ্যে এটাই একমাত্র কাজ যার জন্য আমি অনুতাপ করি না, করতে পারি না। কি গোড়ায়, কি পরবর্তীকালে, সজ্ঞানে আমি কখনও নিজেকে বা তাকে প্রতারণা করি নি। একসময় মনে হয়েছিল যে শেষ পর্যন্ত আমি প্রেমে পড়েছি, কিন্তু পরে বুঝতে পারলাম নিজের অজান্তেই আমি নিজেকে ঠকিয়েছি—এভাবে ভালবাসা অসম্ভব—তাই আমি আর চালাতে পারলাম না, কিন্তু সে চালিয়েই গেল। আমি যে চালাতে পারি নি সেটা কি আমার দোষ? আমি কি করতে পারতাম?"

ঘুম তাড়াবার জন্য একটা চুরুট ধরিয়ে বন্ধুটি বলল, "সে যাই হোক, ও পাট তো চুকেই গেছে! শুধু আজ পর্যন্ত তুমি কখনও ভালবাস নি; ভালবাসা কাকে বলে তাও জান না!"

ভেড়ার চামড়া পরা লোকটি আবারও কি যেন বলতে গিয়ে মাথায় হাত রাখল, কিন্তু যেকথা বলতে চায় তা বলতে পারল না।

কোনদিন ভালবাসি নি।···হ্যাঁ, ঠিক কথা, আমি কখনও ভালবাসি নি! কিন্তু যাই বল, ভালবাসার ইচ্ছা তো আমার মনে আছে, আর সে ইচ্ছার চাইতে বেশী শক্তিশালী আর কিছুই হতে পারে না! কিন্তু আবার সেই কথা, সেরকম ভালবাসা কি সত্যি আছে? সব কিছুই কেমন যেন অসম্পূর্ণ। যাক গে, এসব কথা বলে কি লাভ? জীবনটাকেই কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে ফেলেছি! কিন্তু, এখন তো সবই চুকে গেছে; তুমি ঠিকই বলেছ। আর আমারও মনে হচ্ছে, নতুন করে জীবন শুরু করছি।"

যে লোকটি সোফায় শুয়ে ঘড়ির চাবি নিয়ে খেলা করছিল সে বলল, "সে জীবনটাকেও আবার তালগোল পাকিয়ে ফেলবে।'' কিন্তু যাত্রীটি সেকথা শুনতে পেল না।

সে বলতে লাগল, "আমি দুঃখিত, আবার চলে যেতে পারায় খুশিও। কেন যে দুঃখিত তাও জানি না।''

অপর দুজন যে তার কথায় কোন আগ্রহ দেখাচ্ছে না সেটা খেয়াল না করে যাত্রীটি নিজের কথাই বলতে লাগল। আত্মিক উচ্ছ্বাসের মুহূর্তে মানুষ যতটা আত্মকেন্দ্রিক হয় তেমন আর কখনও হয় না: সেইমুহূর্তে তার মনে হয়, তার মত চমৎকার ও আকর্ষণীয় পৃথিবীতে আর কিছুই নেই।

ভেড়ার চামড়ার কোট পরা ও মাথায় ফেটি জড়ানো অল্পবয়সী ভূমিদাসটি ঘরে ঢুকে বলল, "দিমিত্রি আন্দ্রেয়েভিচ! কোচয়ান আর অপেক্ষা করতে চাইছে না। এগারোটা থেকে ঘোড়াগুলো দাঁড়িয়ে আছে, আর এখন চারটে বাজে!''

দিমিত্রি আন্দ্রেয়েভিচ তার ভূমিদাস ভানিয়ুশার দিকে তাকাল। ভানিয়ুশার মাথায় জড়ানো পট্টি, তার সুতীর বুট, ঘুম-জড়ানো চোখে তার মনিব যেন শুনতে পেল পরিশ্রম, কঠোরতা, ও কর্মময়তার এক নব জীবনের আহ্বান।

কোটের খোলা হুকটা ধরে সে বলল, "ঠিক কথা! বিদায়!''

কোচয়ানকে আর এক প্রস্থ বকশিস দিয়ে শান্ত করার পরামর্শ দিয়েও সে টুপিটা মাথায় দিয়ে ঘরের মাঝখানে দাঁড়াল। বন্ধুরা তাকে চুমো খেল, আবার খেল, একটু থেমে তৃতীয়বার খেল। যাত্রীটি টেবিলের কাছে গিয়ে একটা গ্লাস খালি করে ফেলল, তারপর সাদাসিদে ছোট মানুষটির হাত ধরল; তার মুখটা লাল হয়ে উঠল।

"দেখ, যত যাই বল, আমি খোলাখুলিই কথা বলব। তোমাদের কাছে মন খুলেই কথা বলব, বলা উচিত, কারণ তোমরা আমার প্রিয়জন।··· তোমরাও তো তাকে ভালবাস—চিরদিনই আমার তাই ধারণা—কি বল, তাই তো?''

আরও শান্তভাবে হেসে বন্ধু বলল, "হ্যাঁ।"

"আর হয়তো…"

"এবার দয়া করুন স্যার, আমার উপর মোমবাতিগুলো নিভিয়ে দেবার হুকুম হয়েছে," ঘুম-ঘুম ওয়েটারটি বলল। এদের কথাবার্তার শেষাংশটা শুনে লোকটা এই ভেবে অবাক হয়েছে যে ভদ্রলোকরা সব সময় একই বিষয় নিয়ে কথা বলে কেমন করে। তারপর ঢ্যাঙা লোকটির দিকে ফিরে শুধাল, "বিলটা কাকে দেব? আপনাকে কি স্যার?"

"হ্যাঁ, আমাকে," ঢ্যাঙা লোকটি জবাব দিল। "কত হয়েছে?"

"ছাব্বিশ রুবল।"

ঢ্যাঙা লোকটি একমুহূর্ত কি ভাবল, কিন্তু কোন কথা না বলে বিলটা পকেটে রেখে দিল।

অপর দুজন তখনও কথা বলে চলেছে।

শান্ত চোখের সাদাসিধে ছোট লোকটি বলল, "বিদায়, তুমি তো চমৎকার লোক!"

দুজনের চোখই জলে ভরে উঠল। তারা বারান্দায় নেমে এল।

মুখটা লাল করে যাত্রীটি ঢ্যাঙা লোকটির দিকে ফিরে বলল, "ভাল কথা, তুমি কি শেভালিয়ারের বিলটা মিটিয়ে দিয়ে আমাকে লিখে জানিয়ে দেবে?"

দস্তানা পড়তে পড়তে ঢ্যাঙা লোকটি বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে!" তারপরই সে অপ্রত্যাশিতভাবে বলে উঠল, "তোমাকে আমার হিংসা হয়!"

যাত্রীটি স্লেজে চেপে ভেড়ার চামড়ায় শরীর ঢেকে বলল: "আচ্ছা, তাহলে উঠে এস!" যে লোকটি বলল তাকে হিংসা করে তারজন্য স্লেজে জায়গা করে দিতে সে একটু সরেও বসল। তার গলা কাঁপছে।'

"বিদায় মিত্যা! আশা করি ঈশ্বরের ইচ্ছায় তুমি…" ঢ্যাঙা লোকটি বলল। কিন্তু তখন তার একমাত্র অভিলাষ লোকটি যত তাড়াতাড়ি পারে চলে যাক; তাই সে মুখের কথা শেষও করতে পারল না।

একমুহূর্ত সকলেই চুপ। তারপর একজন বলল, "বিদায়"; আর একজন কেঁদে ফেলল। "প্রস্তুত" বলেই কোচয়ান ঘোড়ার গায়ে হাত দিল।

এক বন্ধু বলে উঠল, "চলে এস ইয়েলিজার!"

জিভ দিয়ে চুক্‌চুক শব্দ করে ও লাগামে টান দিয়ে কোচয়ান ও স্লেজের চালকরা গাড়ি ছেড়ে দিল। চাকাগুলো জমাট বরফের উপর দিয়ে সশব্দে চলতে লাগল।

এক বন্ধু বলল, "এই ওলোমিন বড় ভাল মানুষ! কিন্তু কী যে ওর মাথায় ঢুকেছে, যাচ্ছে ককেসাসে—তাও শিক্ষার্থী হিসাবে। আমাকে তো ভাড়া করে নিলেও যেতাম না।…কাল কি ক্লাবে ডিনার খাচ্ছ?"

"হ্যাঁ।"

দুজন দুদিকে চলে গেল।

যাত্রীটির গরম লাগতে লাগল; লোমের কোটটাও গরম হয়ে উঠেছে। স্লেজের নীচে বসে কোটের বোতাম খুলে ফেলল। তিনটে লোমশ ডাক-ঘোড়া তাদের নিয়ে এক অন্ধকার রাস্তা থেকে অন্য অন্ধকার রাস্তা ধরে ছুটে চলল; এমন সব বাড়ির পাশ দিয়ে তারা চলতে লাগল যা সে আগে কখনও দেখে নি। ওলেনিনের মনে হল, একমাত্র দূর পাল্লার যাত্রীরাইএই সব রাস্তা ধরে চলছে। চারদিকে সবই অন্ধকার, নিঃশব্দ ও একঘেয়ে, কিন্তু অন্তর ভরে আছে স্মৃতি, ভালবাসা, অনুতাপ ও চাপা অশ্রুজলের সুখের অনুভূতিতে।

অধ্যায়—২

"ওদের আমার ভাল লাগে, খুব ভাল লাগে।...চমৎকার মানুষ!... সুন্দর!" সে বার বার বলতে লাগল। মনে হল, এখনই কেঁদে ফেলবে। কিন্তু কেন যে তার কান্না পেল, কারা এই সব চমৎকার মানুষ; কাদের তার এত ভাল লাগে—কিছুই কিন্তু সে ভাল করে জানেও না। মাঝে মাঝে চার-দিকে তাকিয়ে কয়েকটা বাড়ি দেখে অবাক হয়ে ভাবছে, এ বাড়িগুলো এমন অদ্ভুতভাবে তৈরি করা হয়েছে কেন; আবার মাঝে মাঝে এই ভেবে অবাক হচ্ছে, তার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়েও গাড়ির চালকরা ও ভানিয়ুশা কেন তার এত কাছে বসেছে, আর কেনই বা তার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ির ঝাঁকুনিতে দুলছে; সে আর একবার বলে উঠল: "চমৎকার...খুব ভাল লাগে!" এমন কি আর একবার বলল: "বেশ করেছ...চমৎকার!" আর সঙ্গে সঙ্গে অবাক হয়ে ভাবল, কেন সে কথাটা বলল। কী আশ্চর্য, আমি কি মাতাল হয়েছি? নিজেকেই প্রশ্ন করল। দু' বোতল মদ সে খেয়েছে, কিন্তু ওলেনিনের উপর এই প্রভাব শুধুই মদের নয়। যাত্রার কালে যেসব বন্ধুত্বের কথা আন্তরিকতার সঙ্গে সলজ্জ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাকে বলা হয়েছিল সেসবই তার মনে পড়ে গেল। স্লেজে চাপবার পরেই কর-মর্দন। চাউনি, কিছু নীরব মুহূর্ত, ও "বিদায় মিত্য়া" সম্বোধন—সব মনে পড়ল। নিজের খোলা মনের কথাও মনে পড়ল। সবই তার কাছে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। আত্মদোষের স্বীকৃতি অথবা মৃত্যুর আগে মানুষ যেরকম করে থাকে, সেই একইভাবে তার যাত্রার মুহূর্তে শুধু তার বন্ধু ও আত্মীয়স্বজনরাই নয়, যারা তাকে পছন্দ করে না তারা পর্যন্ত তার প্রতি সদয় হয়েছে, তাকে ক্ষমা করেছে।

"হয় তো আমি ককেসাস থেকে কোনদিন ফিরব না," সে ভাবল। আর সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল, সে তার বন্ধুদের ভালবাসে, আরও একজনকেও ভালবাসে। নিজের জন্য তার দুঃখ হল। কিন্তু শুধু বন্ধুদের প্রতি ভালবাসাই তার অন্তরকে এভাবে উদ্বেলিত ও উচ্ছ্বসিত করে তোলে নি যার ফলে

আপনা থেকেই যে অর্থহীন কথাগুলি তার ঠোঁটের কাছে উঠে এসেছে তাদের সে চেপে রাখতে পারে নি ; আবার একটি নারীর প্রতি ভালবাসাও (এখনও পর্যন্ত সে প্রেমে পড়ে নি) তার এই মনোভাব এনে দেয় নি। আত্মপ্রীতি, আশায় ও উত্তাপে ভরা ভালবাসা, নিজের অন্তরে যা কিছু ভাল তার প্রতি সত্যজাত ভালবাসাই তাকে বাধ্য করেছে কাঁদতে, অসংলগ্ন কথা বলতে।

ওলেনিন বিশ্ববিত্যালয়ের পড়া কোন দিন শেষ করে নি, কোথাও চাকরি করে নি (কোন না কোন সরকারী আপিসে নামমাত্র যোগ দিয়েছে মাত্র) টাকা পয়সা সব উড়িয়ে দিয়েছে, এবং কোন কিছু না করে বা একটা কোন জীবিকা বেছে না নিয়েই চব্বিশ বছরে পৌঁছে গেছে। মস্কো সমাজে যাকে বলে Un Jeune homme সে ঠিক তাই।

আঠারো বছর বয়সেই সে স্বাধীন হয়েছিল—একমাত্র ধনী রুশ যুবকরাই অল্প বয়সে বাবা-মাকে হারালে সে স্বাধীনতা পেয়ে থাকে। তার সামনে বাহ্যিক বা নৈতিক কোন বন্ধনই ছিল না; সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারত, কোন কিছুরই তার দরকার ছিল না, কোন কিছুই তাকে বাঁধতেও পারে নি। পরিবার, পিতৃভূমি, ধর্ম, অভাব—কিছুই তার ছিল না। কোন কিছুই সে বিশ্বাস করত না, স্বীকার করত না। কিন্তু কোন কিছুতে বিশ্বাস না করলেও সে কিন্তু মন-মরা বা ভোগক্লান্ত যুবক ছিল না, অন্যের পক্ষে বিরক্তিকরও নয়, বরং সর্বদাই সে শরীর ভাসিয়ে দিত স্রোতের টানে। সে ধরেই নিয়েছিল যে ভালবাসা বলে কোন বস্তু নেই, অথচ কোন মনোরমা তরুণীর সান্নিধ্যে এলেই তার অন্তর কূলে কূলে ভরে উঠত। অনেকদিন থেকেই সে বুঝেছে সম্মান ও পদমর্যাদা একান্তই অর্থহীন, অথচ প্রিন্স সের্গেই যখন কোন নাচের আসরে তার কাছে এসে ভদ্রভাবে কথা বলে তখন সে খুশি না হয়ে পারে না। কিন্তু এই সব আবেগের কাছে সে ততটুকুই নতি স্বীকার করে যাতে তার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ না হয়।

কোনরকম প্রভাবের কাছে নতি স্বীকার করে যখনই সে বুঝতে পারে যে সে প্রভাব তাকে ঠেলে দিচ্ছে পরিশ্রম ও সংগ্রামের পথে, জীবনের তুচ্ছ সংগ্রামের পথে, তখনই সে স্বতস্ফূর্তভাবে সেই মনোভাব ও কাজকর্ম থেকে নিজেকে মুক্ত করে আনে ; স্বাধীন জীবনে ফিরে যায়। এইভাবে সে সমাজ-জীবন, সরকারী চাকরি, কৃষিকাজ, সঙ্গীত—সব কিছুই পরীক্ষা করে দেখেছে ; এমন কি যে নারীর প্রেমকে সে বিশ্বাসই করে না তাকে নিয়েও সে পরীক্ষা করেছে। যৌবনের যে শক্তি মানুষ জীবনে মাত্র একবারই পায় তাকে কোন্ কাজে ব্যবহার করবে তা নিয়েও সে চিন্তা-ভাবনা করেছে : কলা-চর্চায়, বিজ্ঞান-চর্চায়, না কি নারীর প্রেমে, অথবা অন্য কোন বাস্তব কর্মসাধনায় ? এ কথা সত্য যে এমন কিছু লোক আছে যাদের এই আবেগটাই থাকে না, জীবনের পথে পা দিয়ে প্রথম যে জোয়ালটাকে হাতের কাছে পায়

তার নীচেই কাঁধটা পেতে দেয়, এবং সারাটা জীবন সেই জোয়ালই টেনে বেড়ায়। কিন্তু যৌবনের এই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের উপস্থিতি সম্পর্কে, একটি-মাত্র আকাংখা বা ধারণার দিকে সম্পূর্ণভাবে আকৃষ্ট হবার ক্ষমতা সম্পর্কে, কেন বা কোথায় চলেছে না জেনেই একটা অতল গহ্বরে সবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ার ক্ষমতা সম্পর্কে ওলেনিন খুবই সচেতন ছিল। এই সচেতনতাকে সে নিজের মধ্যে বয়ে নিয়ে চলত, তাকে নিয়ে গর্ববোধ করত, এবং অজান্তেই তার দ্বারা সুখীও হত। সেই সময় পর্যন্ত সে শুধু নিজেকেই ভালবেসেছে, নিজেকে ভাল না বেসে তার উপায় ছিল না, কারণ নিজের ভাল ছাড়া আর কোন প্রত্যাশাই তখন তার ছিল না, আর তা নিয়ে তখনও তার মোহভঙ্গের সময় আসে নি। আজ পর্যন্ত সে সত্যিকারের বাঁচার মত বাঁচতে চেষ্টা করে নি, কিন্তু এখন মস্কো ছেড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে একটা নতুন জীবন শুরু হতে চলেছে—সে জীবনে পুরনো ভুলভ্রান্তি কিছুই থাকবে না, থাকবে না কোন অনুশোচনা, আর সম্ভবত সুখ ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।

দীর্ঘ পথযাত্রায় সব সময় এটাই ঘটে থাকে যে, প্রথম দু' তিনটে স্তর পার না হওয়া পর্যন্ত ছেড়ে-আসা জায়গাটাকে ঘিরেই কল্পনার জাল বোনা চলতে থাকে, কিন্তু পথের বুকে প্রথম সকাল দেখা দিতেই কল্পনার মুখ ঘুরে যায় যাত্রার শেষ লক্ষ্যে, এবং সেখানেই চলতে থাকে শূন্যে সৌধ নির্মাণের কাজ। ওলেনিনের বেলায়ও তাই ঘটল।

শহরটাকে পিছনে ফেলে বরফঢাকা ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে তার মাঝ-খানে নিজেকে একাকি পেয়ে তার মন খুশিতে ভরে উঠল। কোটটাকে ভাল করে গায়ে জড়িয়ে স্লেজের তলায় শুয়ে শান্ত মনে ঝিমুতে শুরু করল। বন্ধুদের ছেড়ে আসতে তার খুব কষ্ট হয়েছে, মস্কোতে অতিবাহিত বিগত শীতকালের নানা স্মৃতি, অস্পষ্ট চিন্তা ও অনুশোচনার সঙ্গে মিশে তার কল্পনাকে অধিকার করে নিল।

যে বন্ধুরা তাকে বিদায় দিল, আর যে মেয়েটির কথা তারা বলল তার সঙ্গে সম্পর্কের কথা তার মনে পড়ল। মেয়েটি ধনী। "মেয়েটি তাকে ভাল-বাসে জেনেও কেমন করে সে তাকে ভালবাসবে?" এই কথা ভেবে নানা অশুভ সন্দেহ তার মনে জাগল। "চিন্তা করলেই বোঝা যায় পুরুষদের মধ্যে অনেক অসাধুতা থাকে।" তারপরেই মনে প্রশ্ন জাগল: "সত্যি তো, এটা কি করে হল যে আমি আজও কারও প্রেমে পড়ি নি? সকলেই বলে আমি কখনও প্রেমে পড়ি নি। এও কি হতে পারে যে আমি নীতিবাতিকগ্রস্ত?" মন-হারানোর অনেক কথাই তার মনে পড়তে লাগল। সমাজে চলাফেরা করার সময় এক বন্ধুর বোনের সঙ্গে বেশ কয়েকটি সন্ধ্যা সে কাটিয়েছিল। তারপর মনে পড়ল একটা বল-নাচের কথা। সুন্দরী ডি-র সঙ্গে সে মাজুর্কা নেচেছিল। "সেরাতে আমি কী গভীর প্রেমে পড়েছিলাম, আর কত

সুখীই না হয়েছিলাম! আর পরদিন ঘুম থেকে উঠে যখন মনে হল আমি সম্পূর্ণ মুক্ত, তখন কত আহত ও বিরক্তই না হয়েছিলাম! ভালবাসা এসে কেন আমাকে হাত-পা বেঁধে ফেলে না?···না, ভালবাসা বলে কিছু নেই। যে প্রতিবেশিনী দুব্রোভিন এবং মার্শালের মত আমাকেও বলত যে সে আকাশের তারাগুলোকে ভালবাসে, সেটাও ভালবাসা নয়।"

এবার তার মনে পড়ল গ্রামে গিয়ে কৃষি ও অন্যান্য কাজের কথা, আর সে-সব স্মৃতিতে সুখের কিছু ছিল না। তারপরই এমন একটা কথা মনে পড়ল যাতে সে সংকোচ বোধ করতে লাগল, বিড় বিড় করে অসংলগ্ন সব কথা বলতে লাগল। দর্জি এম· চ্যাপেলের কাছে ৬৭৮ রুবল ধারের কথাটা মনে পড়ে গেল; মনে পড়ল, সে দর্জিকে আরও এক বছর অপেক্ষা করতে বলায় তার মুখে একটা অসহায় বিব্রত ভাব ফুটে উঠেছিল। সসংকোচে এই দুঃসহ চিন্তাটাকে মন থেকে তাড়াবার চেষ্টায় সে বার বার বলতে লাগল, "হে ঈশ্বর, ঈশ্বর আমার!" সেই মেয়েটির কথাই ঘুরে ফিরে আবার তার মনে এল। "তবু, সব কিছু সত্ত্বেও সে আমাকে ভালবাসত।" "হ্যাঁ, তাকে বিয়ে করলে আজ আমার ধার-কর্জ কিছুই থাকত না, আর এখন ভাসিলিয়েভের কাছে আমার অনেক ধার।" আবার সে তার সব ধার-দেনা তারিখসমেত হিসাব করতে শুরু করল। যেরাতে তার অনেক টাকা ধার হয়েছিল তার কথা স্মরণ করে সে ভাবল, "মোরেল ও শেভালিয়েরের কাছেও আমার কিছু ধার আছে।" সে রাতটায় জিপ্‌সিদের নিয়ে একটা পান-ভোজনের ব্যবস্থা করেছিল পিতার্সবুর্গ থেকে আগত কয়েকটি লোক: সম্রাটের এড্-ডি-কং সাশ্‌কা বি,—প্রিন্স ডি,—আর সেই জাঁকজমকওয়ালা বুড়োটি। সে ভাবল, "এই ভদ্রলোকরা এত আত্মতৃপ্ত থাকে কেমন করে? নিজেরা একটা দল গড়ে অন্যদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে তাতে ভর্তি করার কী অধিকার তাদের আছে? তারা সম্রাটের দালালের সঙ্গে যুক্ত বলেই কি? আরে, অন্য সকলকেই তারা বোকা ও শয়তান মনে করবে, এটা খুবই বিরক্তিকর! যাই হোক, আমি তাদের বুঝিয়ে দিয়েছি যে তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার কোন ইচ্ছাই আমার নেই। হ্যাঁ, সেই সন্ধ্যায় আমার মত এত বেশী মদ আর কেউ খায় নি, আমি জিপ্‌সিদের একটা নতুন গান শিখিয়েছিলাম, সকলেই মন দিয়ে সে গান শুনেছিল। আমি হয় তো অনেক বোকামি করেছিলাম, কিন্তু তবু আমি একজন ভাল মানুষ।"

সকালে সে তৃতীয় ডাক-ঘাঁটিতে পৌঁছে গেল। চা খেল, পোটলা-পুটলি ও ট্রাংক খুলতে ভানিয়ুশাকে সাহায্য করল, সকলের মাঝখানে ঠাণ্ডা মাথায় খাড়া হয়ে বসে সব জিনিসের হিসাব-নিকাশ করল: তার কত টাকা ছিল, টাকাটা কোথায় আছে, পাসপোর্ট ও ডাক-ঘোড়ার হুকুমনামা, ও ফটক-শুল্কের কাগজ কোথায় আছে—সব। সব কিছুরই অত্যন্ত সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে

দেখে সম্মুখের দীর্ঘ পথযাত্রাটা তার কাছে একটা প্রমোদ-ভ্রমণ বলেই মনে হতে লাগল।

সারাটা সকাল ও দুপুর বসে বসে হিসাব করল, কত ভার্স্ট পথ পার হয়ে এসেছে, পরবর্তী ঘাঁটিতে পৌছতে কত ভার্স্ট বাকি, প্রথম শহরটা কত ভার্স্ট দূরে, প্রথম যেখানে ডিনার খাবে, চা খাবে সেটাই বা কতদূরে, কতদূরে আছে স্তাভ্রোপল, আর সর্বমোট পথের কত অংশ ভ্রমণ শেষ হয়েছে। আরও হিসাব করল, তার সঙ্গে কত টাকা আছে, কত টাকা বাড়তি থাকবে, কত টাকা হলে সব ধার-কর্জ শোধ হবে; আর উপার্জনের কত অংশ প্রতিমাসে খরচ করতে পারবে। চা খাওয়ার পরে সন্ধ্যানাগাদ হিসাব করে বের করল, মোট পথের এগারো-সাত ভাগ এখনও বাকি; ধার-কর্জ শোধ করতে লাগবে সাত মাস খুব টানাটানি করে চলা আর মোট সম্পত্তির আটের এক ভাগ; তারপর সুস্থির মনে শরীরটা ঢেকেঢুকে স্লেজের মধ্যে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। এখন তার কল্পনা প্রসারিত ভবিষ্যতের দিকে: ককেসাসের দিকে। তার ভবিষ্যতের সব স্বপ্নের মধ্যে দেখা দিল আমালৎবেক-এর মত বীররা, সার্কাসিয়ান নারীরা, কত পাহাড়-পর্বত, ভয়ংকর নদী ও নানা বিঘ্ন-বিপদ। এসব কিছুই আবছা-আবছা দেখা দিল, খ্যাতির আকাংখা ও মৃত্যুর বিপদকে ঘিরেই তার ভবিষ্যতের যত কিছু আগ্রহ। এই অভূতপূর্ব সাহস ও বিস্ময়কর শক্তিতে সে শত শত পাহাড়ী মানুষকে হত্যা করছে, পরাজিত করছে; আবার কখনও নিজেই পাহাড়ী মানুষ হয়ে তাদের সঙ্গে একযোগে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য রুশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। এসব ছাড়াও আছে যুবক-হৃদয়ের মধুরতম স্বপ্ন—নারীর স্বপ্ন। আর সেখানে সেই পাহাড়ের মাঝখানে কল্পনায় তার সেই নারী দেখা দেয় একটি সার্কাসিয়ান ক্রীতদাসীরূপে—কী সুন্দর তার তনুলতা, দীর্ঘ কেশরাশি, আর গভীর বিনীত চোখ দুটি। তার কল্পনায় দেখা দিল একটি ছোট্ট কুড়ে, সেই কুড়ে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে এক নারী তারই প্রতীক্ষায়, আর ক্লান্ত, ধূলিধূসরিত রক্তমাখা দেহে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করে সে ফিরে এল তার কাছে। সেই নারীর চুম্বন, তার দুটি কাঁধ, মধুর কণ্ঠস্বর; আত্মনিবেদন—সবই সে অনুভব করে। সে মনোহারিণী, কিন্তু অশিক্ষিত, বন্য উন্মত্ত। দীর্ঘ শীতের সন্ধ্যায় সেই নারীকে সে লেখাপড়া শেখাতে শুরু করে। সেও বুদ্ধিমতী, প্রতিভাময়ী, খুব তাড়াতাড়ি প্রয়োজনীয় সব কিছু শিখে ফেলে। না পারবে কেন? খুব সহজেই সে বিদেশী ভাষা শিখে ফেলল, ফরাসী মহাগ্রন্থগুলি পড়ে বুঝতে লাগল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, "নতরদাম দ্য প্যারি" বইটা পড়ে সে খুব খুশি হল। সে ফরাসী ভাষায় কথা বলতেও শিখল। সরলভাবে গভীর আবেগের সঙ্গে সে খুব ভাল গান গাইতে শিখল।…"আঃ, কী সব বাজে চিন্তা!" সে নিজেকেই বলে উঠল। এখানে সে একটা ডাক-ঘাঁটিতে পৌছে গেল। এবার আর একটা স্লেজ নিতে হবে,

কিছু বখশিস দিতে হবে। কিন্তু আবার সেই স্বপ্নের “বাজে চিন্তা” তাকে পেয়ে বসল। আবার সেই সুন্দরী সার্কাসীয় নারী, সেই গৌরব, এড্-ডি-কং-এর চাকরি নিয়ে মনোরমা স্ত্রীসহ রাশিয়ায় প্রত্যাবর্তন,—সকলেই কল্পনায় তার সামনে দেখা দিতে লাগল। নিজের মনেই বলল : “কিন্তু ভালবাসা বলে কিছু নেই। খ্যাতি একেবারেই বাজে।…কিন্তু ৬৭৮ রুবল ?…তখন বিজিত রাজ্যগুলি কি আমাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ এনে দেবে না ? সে-সব অর্থ নিজের জন্য রাখাটা ঠিক হবে না। বিলিয়ে দিতে হবে। কিন্তু কাকে দেব ? বেশ তো, ৬৭৮ রুবল চ্যাপেলকে, তারপর দেখা যাবে।…” এমনি সব অস্পষ্ট ছবি তার মনকে আচ্ছন্ন করে তুলল। আর তখনই ভানিয়ুশার গলা ও স্লেজ থামার শব্দে তার আরামের ঘুমটা ভেঙে গেল। কোনরকমে স্লেজটা পাল্টে আবার যাত্রা শুরু করল।

পরদিন সবকিছু সেই একইভাবে চলল : সেই ডাক-ঘাঁটি আর চা খাওয়া, সেই চলমান ঘোড়ার লেজ, ভানিয়ুশার সাথে সেই একই কথাবার্তা, একই অস্পষ্ট স্বপ্ন ও ঝিমুনি, আর রাত হলে সেই একই যৌবনসুলভ গভীর ঘুম।

অধ্যায়—৩

মধ্য রাশিয়া ছেড়ে যত এগোতে লাগল ওলেনিনের স্মৃতিগুলো ততই পিছনে পড়ে রইল ; ককেসাসের যত কাছে যাচ্ছে ততই মনটা হাল্কা হয়ে উঠছে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে, “চিরদিনের মত ওখানেই থাকব, আর কখনও সমাজে মুখ দেখাব না। এই সব যাদের এখানে দেখছি তারা কেউ যেন ঠিক মানুষ নয়। এরা কেউ আমাকে চেনে না, মস্কোর যে সমাজে আমি ছিলাম এরা কেউ কোন দিন সেখানে ঢুকতে পারবে না। বা আমার অতীত-কেও জানতে পারবে না।” রাস্তায় যেসব রুক্ষ মানুষের সঙ্গে তার দেখা হল, যে অর্থে তার মস্কোর পরিচিত জনরা মানুষ সেই অর্থে যাদের সে মানুষ বলেই মনে করে না, তাদের মধ্যে আসতে পেরে সে যেন সমস্ত অতীত থেকে মুক্ত একটা নতুন জীবনের স্বাদ পেয়েছে।

লোকগুলি যত বেশী অমার্জিত, সভ্যতার লক্ষণ যত কম, ততই তার মুক্তির অনুভূতি তীব্রতর। স্তাভ্রোপলের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে সে বিরক্তি বোধ করতে লাগল। দু'পাশের সাইনবোর্ডগুলো, তার কোন কোনটা আবার ফরাসীতে লেখা, গাড়িতে উপবিষ্ট মহিলারা, বাজারের ছ্যাকরা গাড়িগুলো, জোব্বা ও লম্বা টুপি পরা যে ভদ্রলোকটি বুল্‌ভার্দ ধরে যেতে যেতে পথ-চারীদের দিকে তাকাচ্ছে—সবকিছুই তাকে বিচলিত করে তুলল। ভাবল, “হয়তো এই লোকরা আমার কোন পরিচিত জনকে চেনে” ; আবার তার মনেপড়ল সেই ক্লাব, দর্জি, তাস, সমাজ…কিন্তু স্তাভ্রোপলের পরে সবকিছুই

মনের মত—বন্য অথচ সুন্দর ও সৈনিকোচিত; ওলেনিনের মন ক্রমেই অধিকতর সুখী হয়ে উঠতে লাগল। এই সব কসাক, গাড়ির চালক ও ডাক-ঘাঁটির কর্মচারি সকলকেই বেশ সরল মনে হচ্ছে; তাদের সঙ্গে সে রসিকতা করতে পারবে, খোলাখুলি কথা বলতে পারবে যে তারা কোন্ শ্রেণীর লোক সেকথা ভাবতে হবে না। তারা সকলেই সেই মানব জাতির অন্তর্ভূক্ত যাদের ওলেনিন সহজাতভাবেই ভালবাসে; আর তারাও তার সঙ্গে বন্ধুর মতই ব্যবহার করছে।

ডন কসাকদের অঞ্চলে পৌঁছে ইতিমধ্যেই স্লেজের বদলে সে একটা চাকাওয়ালা গাড়ি নিয়েছে; স্তাভ্রোপল ছাড়িয়ে এত গরম লাগছে যে ওলেনিন ভারী কোটটা না পরেই পথ চলছে। এখন বসন্তকাল—ওলেনিনের কাছে এক অপ্রত্যাশিত আনন্দময় বসন্ত। রাত হলে তাকে আর কসাক গ্রাম থেকে ছেড়ে দেয় না; সকলেই বলে যে সন্ধ্যার পরে ভ্রমণ করা বিপজ্জনক। ভানিয়ুশা কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছে; তাই তারা ত্রয়কায় একটা গুলি-ভরা বন্দুক নিয়ে চলে। ওলেনিন ক্রমেই খুশি হয়ে উঠছে। একটা ডাক-ঘাঁটিতে ঘাঁটি-বাবু বলল, সম্প্রতি বড় রাস্তায় একটা ভয়ংকর খুন হয়ে গেছে। প্রায়ই সশস্ত্র লোকদের সঙ্গে তাদের দেখা হতে লাগল। ওলেনিন ভাবল "তাহলে এবার শুরু হল!" যে তুষারাবৃত পাহাড়ের কথা সে অনেক শুনেছে এবার তার দেখা পাওয়া যাবে বলে তার আশা হল। একদিন সন্ধ্যায় নোগাই চালকটি হাতের চাবুক তুলে মেঘে-ঢাকা পাহাড়গুলি দেখাল। ধূসর, সাদা ও লোমের মত কিছু একটা ওলেনিনের চোখে পড়ল, কিন্তু যে সৌন্দর্যের কথা সে এত পড়েছে ও শুনেছে তার দেখা কোথাও খুঁজে পেল না। পাহাড় ও মেঘ তার কাছে একই রকম লাগল; ভাবল তুষারমণ্ডিত যে-সব পাহাড়-চূড়ার কথা সে এত শুনেছে সেগুলি বাক-এর সঙ্গীত আর নারীর ভালবাসার মতই লোকের মন-গড়া কথা মাত্র। তাই সামনে তাকিয়ে পাহাড় দেখাই সে ছেড়ে দিল।

কিন্তু পরদিন সকালে খোলা হাওয়ায় ত্রয়কার মধ্যে ঘুম ভাঙতেই সে আলস্যভরে ডান দিকে একবার তাকাল। সকাল বেলাটা একেবারে ঝক-ঝক করছে। হঠাৎ সে দেখতে পেল প্রায় বিশ পা দূরে, প্রথম দৃষ্টিতে তার সেইরকমই মনে হয়েছিল, অকলংক শুভ্রতায় ঢাকা একটা বিরাট স্তূপ বহুদূর আকাশের পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে আছে—তার নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও চূড়াগুলির আশ্চর্য রূপরেখা অত্যন্ত স্পষ্ট। তার নিজের এবং ঐ পাহাড় ও আকাশের মধ্যেকার প্রকৃত দূরত্বটা যখন সে বুঝতে পারল, বুঝতে পারল পর্বতমালার সামগ্রিক বিরাটত্ব, অনুভব করল তার অসীম সৌন্দর্য, তখন তার ভয় হল যে ওটা একটা কল্পনা বা স্বপ্ন মাত্র। নিজেকে জাগিয়ে তোলার জন্য শরীর-টাকে একটা ঝাঁকুনি দিল, কিন্তু পর্বতমালা ঠিক তেমনি দাঁড়িয়ে রইল।

"ওটা কি? এটা কি?" সে গাড়ির চালককে শুধাল।

নোগাই চালক অন্যমনস্কভাবেই জবাব দিল, "কেন পাহাড়।"

ভানিয়ুশা বলল, "আমিও অনেকক্ষণ ধরে দেখছি। খুব সুন্দর, না? দেশে একথা কেউ বিশ্বাস করবে না।"

মসৃণ পথে ত্রয়কার দ্রুতগতির ফলে মনে হচ্ছে, পাহাড়গুলো যেন দিগন্ত বরাবর ছুটে চলেছে, নবোদিত সূর্যের আলোয় তাদের গোলাপী শিখরগুলি ঝকঝক করছে। এদৃশ্য দেখে ওলেনিন প্রথমে অবাক হয়ে গেল, পরে পেল আনন্দ; কিন্তু আরও পরে একেবারে সমতল ভূমি থেকে উঠে যাওয়া ঐসব তুষার-কিরীট পর্বত-শৃঙ্গের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটু একটু করে সেই সৌন্দর্য-সুধা যেন পান করতে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত গোটা পর্বতমালাকেই যেন সে মনের মধ্যে অনুভব করতে লাগল। সেইমুহূর্ত থেকে সে যা কিছু দেখে, যা কিছু ভাবে, সবই যেন ঐ পর্বতমালার মতই একটা কঠোর, গম্ভীর নতুন বৈশিষ্ট্য নিয়ে তার সামনে হাজির হয়! মস্কো-জীবনের সব স্মৃতি, তার লজ্জা ও অনুতাপ, ককেসাস সম্পর্কে তার তুচ্ছ স্বপ্ন—সব মিলিয়ে গেল, আর ফিরে এল না। একটা গম্ভীর কণ্ঠস্বর যেন তাকে বলল, "এবার শুরু হয়েছে।" পথ-ঘাট, সত্য দৃষ্টিগোচর দূরের তেরেক নদী, কসাক-দের গ্রাম, লোকজন, কিছুই আর এখন তার কাছে তামাসা বলে মনে হচ্ছে না। আকাশের দিকে তাকাল, আর পর্বতমালাকে মনে পড়ে গেল। নিজের দিকে বা ভানিয়ুশার দিকে তাকাল, আবার সেই পর্বতমালার চিন্তা…দুটি কসাক ঘোড়ায় চড়ে চলেছে, তাদের পিঠের উপর বন্দুকের খাপ দুটি তালে তালে দুলছে, তাদের ঘোড়ার সাদা ও বাঁকা পাগুলি এলোমেলোভাবে চলছে …আবার পর্বতমালা! তেরেকের ওপার একটা "আউল" (চেচেন কুটির) থেকে ধোঁয়া উঠছে…আবার পর্বতমালা! নলখাগড়ার বনের ভিতর দিয়ে বয়ে যাওয়া তেরেক নদীর উপর উদয়-সূর্যের আলো পড়ে ঝিকমিক করছে… আবার পর্বতমালা! গ্রাম থেকে একটা মহিষের গাড়ি আসছে, সুন্দরী তরুণীরা চলেছে…আবার পর্বতমালা! বিদ্রোহী চেচেন এব্রেকরা মাঠের ভিতর দিয়ে দ্রুত ছুটে যাচ্ছে, আর আমি এখানে নির্ভয়ে গাড়ি চালাচ্ছি! আমার আছে বন্দুক, আর শক্তি, আর যৌবন…আর আছে পর্বতমালা।"

অধ্যায়—৪

তেরেক নদীর গতিপথে বরাবরই গ্রেবেন কসাকদের গ্রামগুলি গড়ে উঠেছে। তাই কি প্রাকৃতিক পরিবেশে, কি অধিবাসীদের চরিত্রে গোটা তেরেক অঞ্চলটায় একই বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট। কসাক ও পার্বত্য জাতিদের দুই ভাগ করে মাঝখান দিয়ে দ্রুত গতিতে বয়ে যাচ্ছে তেরেক নদী; ডাইনের

নল-ঝোপে ঢাকা তীরে অবিরাম জমছে ধূসর বালি, আর বাঁ দিকের খাড়া তীরটাকে ধুয়ে নিয়ে যাচ্ছে; ফলে সেদিককার শতাব্দীকালের পুরনো ওক গাছ, শুকিয়ে যাওয়া প্লেন গাছ, ও ছোট গাছপালার শিকড় বেরিয়ে পড়েছে। এখনও কিছুটা চঞ্চল মনে হলেও স্বভাবত শান্ত চেচেনদের গ্রামগুলো নদীর ডান তীরে অবস্থিত। বাঁ তীর বরাবর নদী থেকে আধ ভার্স্ট দূরে সাত-আট ভার্স্ট ফাঁকে ফাঁকে কসাকদের গ্রাম। অনেককাল আগে অধিকাংশ গ্রামই ছিল নদীর তীরে তীরে; কিন্তু বছরের পর বছর তেরেকের খাত পাহাড় থেকে উত্তর দিকে সরে যাওয়ায় তীরভূমি ভেঙে গেছে; এখন সেখানে আছে শুধু পুরনো গ্রামের ধ্বংসাবশেষ, নাসপাতি, কুল ও পপলার গাছের বাগান; সবকিছুই ঢেকে গেছে কাঁটা ঝোপ ও বুনো আঙুরের লতায়। এখন আর কেউ সেখানে বাস করে না; শুধু চোখে পড়ে হরিণ, নেকড়ে, খরগোস ও পাখিদের চলাচলের পথ; জায়গাটা এখন তাদেরই মন-পছন্দ। এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে যেতে বনের ভিতর দিয়ে ছোট ছোট পথ আছে। পথের ধারে ধারে কসাকদের রক্ষী-বেষ্টনী আছে, আছে শান্ত্রীসহ বুরুজ-ঘর। সাতশ' গজের মত এক ফালি জঙ্গলে ঘেরা উর্বরা জমিটা শুধু আছে কসাকদের দখলে। তার উত্তর থেকেই শুরু হয়েছে মোগাই বা মজ্‌দক তৃণভূমির বালির খাঁড়ি; সেই তৃণভূমি আরও উত্তরে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে ক্রুথ্‌মেন, অস্ত্রাখান ও কির্‌ঘিজ—কাইসাব্ব তৃণভূমি পর্যন্ত চলে গেছে। দক্ষিণে তেরেকের ওপারে আছে বিরাট চেচ্‌নিয়া পর্বতমালা, কচ্‌কালিকভ্‌স্কি পাহাড়শ্রেণী, কৃষ্ণ পর্বতমালা, আরও একটা পাহাড়শ্রেণী, এবং সব শেষে বরফ-ঢাকা পর্বতমালা; সেটাকে দূর থেকে দেখা যায় মাত্র, আজ পর্যন্ত কেউ সেটা পার হয় নি। এই জঙ্গল ঘেরা উর্বরা শস্য-শ্যামলা জমিটুকুতেই অনাদিকাল থেকে বাস করছে প্রাচীন অস্তিবাদী শ্রেণীর একটি রুশ উপজাতি; তারা রণনিপুণ, সুদর্শন ও সমৃদ্ধিশালী; তাদের বলা হয় গ্রেবেন কসাক।

অনেক, অনেককাল আগে তাদের প্রাচীন অস্তিবাদী পূর্বপুরুষরা রাশিয়া থেকে পালিয়ে এসে বসতি স্থাপন করেছিল বিরাট চেচ্‌নিয়া পর্বতমালার প্রথম পাহাড় গ্রেবেন-এ, তেরেক নদী পেরিয়ে চেচেন্‌দের সঙ্গে। চেচেন্‌দের সঙ্গে বসবাসের ফলে তাদের সঙ্গে বিয়ে-থার প্রচলন হলেও এবং পার্বত্য উপজাতিদের আচার-অনুষ্ঠান ও রীতিনীতিকে গ্রহণ করলেও তারা কিন্তু নিজেদের রুশ ভাষাকেই অক্ষুন্ন রাখল এবং নিজেদের প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসেও অবিচল রইল। তাদের মধ্যে একটা জনশ্রুতি এখনও প্রচলিত আছে যে, জার ভয়ংকর আইভান তেরেক-এ এসে তাদের প্রধানদের ডেকে নিয়ে নদীর এপারের জমি তাদের দিয়ে দিল, আর সেই সঙ্গে তাদের অনুরোধ করল রাশিয়ার বন্ধু হয়ে থাকতে; জার আরও কথা দিল যে তাদের উপর জারের

শাসন চাপিয়ে দেওয়া হবে না, আবার তাদের ধর্ম ত্যাগ করতেও বাধ্য করা হবে না। এখনও পর্যন্ত কসাক পরিবাররা চেচেনদের সঙ্গে আত্মীয়তা দাবী করে, এবং মুক্তি, বিশ্রাম, লুঠ, ও যুদ্ধের প্রতি আকর্ষণ এখনও তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। শুধু রুশ প্রভাবের বিরূপ দিকটাও প্রকট হয়ে উঠেছে—নির্বাচনে হস্তক্ষেপ, গির্জার ঘণ্টাগুলি বাজেয়াপ্ত করা, এ অঞ্চলে সেনাদল মোতায়েন রাখা বা তাদের চলাচল।

যে দিজিঘিৎ (দুঃসাহসী অশ্বারোহী) লোকটি হয়তো তার ভাইকে খুন করেছে তার চাইতে যে সৈনিকটি তার গ্রামকে রক্ষা করতে তার ঘাড়ে এসে আস্তানা পেতে তামাকের ধোঁয়ায় তার ঘরকেই নষ্ট করছে তার প্রতি এক-জন কসাকের ঘৃণা অনেক বেশী। তার শত্রু পাহাড়ী লোকটিকে সে শ্রদ্ধা করে, কিন্তু যে সৈনিকটি তার চোখে বিদেশী ও অত্যাচারী তাকে সে ঘৃণা করে। বস্তুত, একজন কসাকের দৃষ্টিতে যেকোন রুশ চাষী বিদেশী, বর্বর, ও ঘৃণ্য জীব ; যেসব ফেরিওয়ালারা এদেশে আসে, অথবা ছোট রাশিয়া থেকে আগত যেসব লোককে কসাকরা ঘৃণাভরে "তুলোওয়ালা" বলে ডাকে, তাদের মধ্যেই কসাকরা রুশ চাষীদের নমুনা দেখতে পায়। তার কাছে ভাল পোশাক-পরা মানেই সার্কাসীয়দের মত পোশাক পরা। সব চাইতে ভাল অস্ত্র পাওয়া যায় পাহাড়ীদের কাছে, আবার সব চাইতে সেরা ঘোড়াও পাহাড়ীদের কাছ থেকেই কিনতে হয়, অথবা চুরি করতে হয়। যেকোন উদ্যমশীল কসাক যুবকই তার তাতার ভাষার জ্ঞানকে প্রকাশ করতে চায়, এবং মদ খেতে বসে সঙ্গী কসাকদের সঙ্গেও তাতার ভাষাতেই কথা বলে।

এসব সত্ত্বেও পৃথিবীর একটি ছোট্ট কোণে নির্বাসিত এই ছোট খৃষ্টীয় সম্প্রদায়টি চারদিকে মহম্মদীয় উপজাতি ও সৈনিকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েও নিজেদের অত্যন্ত উন্নত বলে মনে করে, কসাক ছাড়া অন্য কাউকে মানুষ বলেই মনে করে না, অন্য সব কিছুকেই ঘৃণা করে। কসাকদের অধিকাংশ সময় কাটে রক্ষী-বেষ্টনীতে, যুদ্ধে, অথবা শিকারে ও মাছধরায়। বাড়িতে সে কদাচিৎ কোন কাজ করে। গ্রামে বসবাস করা তার কাছে একটা ব্যতিক্রম মাত্র, আর থাকলেও সেসময়টা সে ফুর্তি করেই কাটায়। নিজেদের প্রয়োজনীয় মদ কসাকরা নিজেরাই তৈরি করে ; মাতাল হওয়া অপেক্ষা আচার পালনের জন্যই মদ খায়, আর আচার মেনে না চলাটা তাদের কাছে ধর্মত্যাগেরই সামিল। কসাক নারীকে দেখে নিজের কল্যাণের যন্ত্র হিসাবে ; একমাত্র অবিবাহিতা মেয়েদেরই ফূর্তি করতে দেওয়া হয়। বিবাহিতা নারীকে যৌবন থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত স্বামীর জন্য কাজ করতে হয় ; স্ত্রীর উপর স্বামীর দাবী প্রাচ্য ব্যবস্থার অনুরূপ আনুগত্য ও শ্রম। এই দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে নারীরা দেহে ও মনে বেশ শক্তিময়ী হয়ে গড়ে ওঠে ; আর প্রাচ্য দেশের সব জায়গার মতই তারা নামেমাত্র অধীন হলেও পরিবারের উপর তাদের প্রভাব ও মর্যাদা

পাশ্চাত্য নারীদের চাইতে অনেক বেশী। অপরিচিত লোকের সামনে সস্নেহে অথবা অপ্রয়োজনে কথা বলাটা অনুচিত মনে করলেও তার সঙ্গে যখন একাকি থাকে তখন কিন্তু স্বামীটি মনে-প্রাণে জানে যে স্ত্রী তার চাইতে অনেক বড়। তার বাড়ি, সম্পত্তি, বস্তুত গোটা গৃহস্থালী তো স্ত্রীই গড়ে তুলেছে, আর সেই তো সেবা-যত্ন দিয়ে তাকে একত্র ধরে রেখেছে। পুরুষের ভারী কাজ ও গুরুদায়িত্ব পালন করার ফলে অধিকাংশক্ষেত্রে নারীরাই হয়ে ওঠে পুরুষদের চাইতে অধিকতর শক্তিময়ী, বুদ্ধিমতী ও সুন্দরী। কসাক রমণীরা পরে সার্কাসীয় পোশাক : একটা তাতার ঘাঘরা, বেসমেৎ, ও নরম চটি ; কিন্তু তারা রুশ কায়দায় মাথায় রুমাল বাঁধে। পোশাক-পরিচ্ছদে ও গৃহস্থালীর কাজে চটপটে, পরিচ্ছন্ন ও রুচিসম্পন্ন হওয়া তাদের কাছে একই সঙ্গে চিরাচরিত প্রথাও প্রয়োজন। পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে নারীরা —বিশেষ করে অবিবাহিতা মেয়েরা—পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে।

নভম্লিনস্কায়া গ্রামটিকে গ্রেবেন কসাকরাজ্যের কেন্দ্রমণি বলে গণ্য করা হয়। অন্য সব জায়গার তুলনায় প্রাচীন গ্রেবেন আচার-অনুষ্ঠানগুলি এখানেই বেশী করে প্রতিপালিত হয় ; স্মরণাতীত কাল থেকে সারা ককেসাস জুড়ে এখানকার নারীদেরই সৌন্দর্যের খ্যাতি। দ্রাক্ষাক্ষেত, ফলের বাগান, তরমুজ ও কুমড়োর চাষ, মাছ ধরা, শিকার করা, ভুট্টা ও জোয়ার ফলানো, এবং যুদ্ধে লুটতরাজ—এই সব থেকেই কসাকদের জীবিকানির্বাহ হয়। নভম্লিনস্কায়া গ্রামটি তেরেক নদী থেকে তিন ভার্স্ট দূরে অবস্থিত ; দুয়ের মাঝখানে একটা ঘন জঙ্গল। গ্রামের ভিতর দিয়ে যে রাস্তাটা চলে গেছে তার একদিকে নদী, অপর দিকে সবুজ দ্রাক্ষাক্ষেত ও ফল-বাগান, তারও ওপারে দেখা যায় নোগাই তৃণভূমির খাঁড়িগুলো। মাটির দেয়াল ও কাঁটাগাছের জঙ্গলে গ্রামটা ঘেরা ; নল-খাগড়ার ছোট ছাদে ঢাকা উঁচু ফটক দিয়ে গ্রামে ঢোকার পথ। তার পাশেই কাঠের গাড়ির উপর বসানো আছে একটা ভারী কামান ; কোন একসময় কসাকরা সেটা দখল করে নিয়েছে, কিন্তু গত এক শ' বছরেও তা থেকে গোলা ছোঁড়া হয় নি। ইউনিফর্মধারী একটি কসাক শান্ত্রী ছোরা ও বন্দুক নিয়ে ফটকের পাশে দাঁড়িয়ে কখনও সেটাকে পাহারা দেয়, কখনও বা সেটা অরক্ষিতই থাকে।

ফটকের ছাদের নীচে একটা সাদা বোর্ডের উপর কালো হরফে লেখা আছে : বাড়ি ২৬৬ ; পুরুষ অধিবাসী ৮৯৭ ; নারী ১.০১২। কসাকদের সব বাড়িই মাটি থেকে দু'তিন ফুট উঁচুতে খুঁটির উপর তৈরি। নল-খাগরা দিয়ে যত্ন করে ছাওয়া, বড় বড় ফুল-কাটা পাশ-কপালী বসানো। নতুন না হলেও সবগুলি বাড়ি খাড়া ও পরিচ্ছন্ন, নানা আকারের সংলগ্ন বারান্দা ; বাড়িগুলো ঘেঁষাঘেঁষি করেও তৈরি নয়, চারদিকে অনেকটা খোলা জায়গা, আর সব বাড়িই চওড়া রাস্তা বা গলির উপর সুন্দরভাবে সাজানো। অনেক বাড়ির

বড় বড় জানালার সামনে, বেড়ার বাইরে, ঘন সবুজ পপলার ও বাবলা গাছ সুগন্ধী সাদা ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর তার পাশে পাশেই আছে হলুদ সূর্যমুখী, নানান লতা ও দ্রাক্ষালতা। চওড়া, খোলা স্কোয়ারের মধ্যে তিনটে দোকান; সেখানে কাপড়-চোপড়, সূর্যমুখী ও কুমড়োর বীজ, বীন ও আদা-দেওয়া রুটি বিক্রি হয়। একসারি উঁচু পপলার গাছের পিছনে উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, অন্য সব বাড়ি থেকে বড় ও উঁচু রেজিমেন্ট-কম্যাণ্ডারের বাড়িটা অবস্থিত। সপ্তাহের কাজের দিনগুলিতে, বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে, খুব অল্প লোককেই পথে দেখা যায়। যুবকরা আছে রক্ষীবেষ্টনীতে অথবা যুদ্ধে চলে গেছে; বৃদ্ধরা মাছ ধরছে, নয়তো ফল-বাগানে ও ফুল-বাগানে মেয়েদের কাজে সাহায্য করছে। শুধু অতি-বৃদ্ধ, রুগ্ন, ও শিশুরাই বাড়িতে থাকে।

অধ্যায়—৫

একটি বিরল সন্ধ্যা নেমে আসছে; এদৃশ্য একমাত্র ককেসাসেই দেখা যায়। সূর্য অস্ত গেছে পাহাড়ের ওপারে, কিন্তু এখনও আলো আছে। সন্ধ্যার আভা আকাশের এক-তৃতীয়াংশে ছড়িয়ে পড়েছে; সেই আলোয় পর্বতশ্রেণীর বহুদূর-প্রসারিত একটানা সাদার রাজত্ব পরিষ্কার চোখে পড়ছে। বাতাস নিশ্চল, শব্দময়। তৃণভূমির উপর কয়েক ভার্স্ট পর্যন্ত পাহাড়ের ছায়া পড়েছে। তৃণভূমি, নদীর ওপার, পথ-ঘাট সবই জনশূন্য: কদাচিৎ কোন অশ্বারোহী এসে পড়লে রক্ষী-বেষ্টনীর কসাকরা এবং চেসেনরা তাদের "আউল" (গ্রাম) থেকে সবিস্ময় কৌতূহলে তার দিকে তাকিয়ে থাকে আর এ হেন সন্দেহভাজন ব্যক্তি কে হতে পারে সেটা অনুমান করতে চেষ্টা করে।

রাত নামলেই পরস্পরের প্রতি ভয়ে সকলে যার যার বাড়িতে ঢুকে পড়ে; একমাত্র পশুপাখিরাই মানুষ সম্পর্কে নির্ভয় হয়ে সেই জনহীন অঞ্চলে ঘুরে বেড়ায়। সূর্যাস্তের আগেই আঙুর ক্ষেতে কর্মরত মেয়েরা তাড়াতাড়ি বাগান থেকে ফিরে আসে। আশপাশের অঞ্চলের মত আঙুরের ক্ষেতগুলোও জনহীন হয়ে পড়ে, কিন্তু সেই সন্ধ্যার সময়টাতে গ্রামগুলো বেশ সজীব হয়ে ওঠে। পায়ে হেঁটে, ঘোড়ায় চড়ে, ক্যাঁচড়-ক্যাঁচড় করে গাড়ি চালিয়ে চার-দিক থেকে সকলে গ্রামে ফিরতে থাকে। খুশির হৈ-হল্লা-হাসির শব্দ মিশে যায় গরু-মোষের ডাকের সঙ্গে। এখানে দেখা যায়, একটি সশস্ত্র অশ্বারোহী কসাক রক্ষীবেষ্টনী থেকে ছুটি নিয়ে বাড়ির কাছে এসে জানালায় টোকা মারল। প্রত্যুত্তরে একটি তরুণীর সুন্দর মুখ জানালায় দেখা দিল, আর শোনা গেল তাদের ভালবাসাবাসি ও হাসাহাসি। ওখানে দেখা যায়, ছিন্নবাস ও উঁচু চোয়াল একটি নোগাই মজুর তৃণভূমি থেকে একবোঝা নলখাগড়া গাড়িতে বোঝাই করে কসাক ক্যাপ্টেনের পরিষ্কার প্রশস্ত উঠোনে ঢুকে

জোয়াল থেকে মোষ ছুটোকে খুলে দিল, আর তারপরই মনিব-ভৃত্য তাতার ভাষায় চীৎকার করে কথা বলতে শুরু করল। ওদিকে একটি কসাক স্ত্রীলোক খালি পায়ে একবোঝা জ্বালানী নিয়ে আসবার সময় পথের জল-কাদা পার হতে পরনের ঘাঘরাটা উঁচু করে তুলে ধরায় তার সাদা পা ছুটি বেরিয়ে পড়ল। তাই দেখে শিকার-ফেরৎ জনৈক কসাক রসিকতা করে বলে উঠল : "আরও একটু তোল সুন্দরী!" বলেই বন্দুকটা তার দিকে তাক করল। একজন বুড়ো কসাক মাছ ধরে ফিরছে; তার ট্রাউজার গোটানো, লোমশ ধূসর বুকটা খোলা; কাঁধের উপর রাখা জালের ভিতরকার মাছগুলো তখনও লাফাচ্ছে; সোজাসুজি যাবার জন্য একজন প্রতিবেশীর ভাঙা বেড়া পার হতে গিয়ে তার কোটটা আটকে গেল। কসাক ছেলেমেয়েরা রাস্তার শুকনো জায়গা খুঁজে পেতে সেখানেই লাটিম ঘোরাচ্ছে আর হল্লা করছে। প্রতিটি চিমনি থেকে "কিজিয়াক" (ঘুঁটে) এর ধোঁয়া উঠছে। সব বাড়িতেই সোরগোল উঠেছে; এ যেন রাতের নিস্তব্ধতারই পূর্বাভাষ।

জনৈক কসাক কর্ণেটের (পতাকাবাহী অশ্বারোহী সৈনিক) স্ত্রী উলিৎকা গিন্নি বাড়ির ফটকে দাঁড়িয়ে মেয়ে মারিৎকা কখন গরু-ছাগল নিয়ে বাড়ি ফিরবে তারজন্য অপেক্ষা করছে। কসাক কর্ণেটটি আবার একজন স্কুল-মাস্টারও বটে। সুঠাম, সুন্দরী মারিয়াংকা পশুর পাল নিয়ে উঠোনে ঢুকেই সেগুলোকে চালায় ঢুকিয়ে দিতে ছুটে চলে গেল।

উল্টোদিকের বাড়ি থেকে একটি কসাক স্ত্রী বেরিয়ে এল। সে বুড়ি, ঢ্যাঙা, আর মদ্দা-মদ্দা দেখতে। উলিৎকা গিন্নির কাছে এগিয়ে এসে একটা আলো চাইল। হাতে একটুকরো ন্যাকড়া।

"আচ্ছা, কাজকর্ম শেষ হল?"

উলিৎকা গিন্নি বলল, "মেয়েটা আগুন জ্বালাচ্ছে। তোমার কি আলো চাই?"

ছুজনই ঘরে ঢুকল। ককেসাসে দেশলাইয়ের বাক্স দুষ্প্রাপ্য বস্তু। গিন্নি কাঁপা হাতে মূল্যবান দেশলাই-বাক্সের ঢাকনাটা খুলল।

মদ্দা মতন নবাগতা স্ত্রীলোকটি দরজার সিঁড়িতে বসে পড়ল; তার মনে একটু গল্প করার ইচ্ছা।

"তোমার কর্তাটি কোথায়—স্কুলে?" সে শুধাল।

"হ্যাঁ, ও তো সব সময়ই ছেলেমেয়েদের পড়াচ্ছে। তবে চিঠি লিখেছে, উৎসবের সময় বাড়ি আসবে," উলিৎকা গিন্নি বলল।

"হ্যাঁ, খুব চালাক-চতুর মানুষ; আর সেটা তো ভালই।"

"তা তো বটেই।"

"আর আমার লুকাশ্‌কা পড়ে আছে রক্ষী-বেষ্টনীতে; তাকে বাড়ি আসতেই দেবে না," নবাগতা সংবাদটা জানাল, যদিও উলিৎকা গিন্নি অনেক

আগে থেকেই সেটা জানে। লুকাশ্‌কার কথা বলাই নবাগতার মনের ইচ্ছা ; সেই তো তাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে কসাক রেজিমেণ্টের চাকরিতে পাঠিয়েছে। উলিৎকা গিন্নির মেয়ে মারিয়াংকার সাথে তার বিয়ে দেবার ইচ্ছা আছে তার মনে।

"তাহলে সে এখন রক্ষী-বেষ্টনীতে আছে ?"

"হ্যাঁ গো। গত উৎসব থেকেই তো বাড়িতে নেই। এই তো সেদিন কোমুশ্‌কিনের হাত দিয়ে তাকে কয়েকটা শার্ট পাঠিয়ে দিলাম। সে তো বলছে, বেশ ভাল আছে, আর উপরওয়ালারাও তার উপর সন্তুষ্ট। তারা নাকি আবার "এব্রেক"দের খুঁজে বেড়াচ্ছে। সে বলল, লুকাশ্‌কা খুব সুখে আছে।"

পতাকাবাহীর গিন্নি বলল, "সেজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও। উর্‌ভানই তার উপযুক্ত নাম।" লুকাশ্‌কার ডাক-নাম উর্‌ভান, অর্থাৎ উদ্ধারকর্তা, কারণ সাহসের সঙ্গে সে একটা ছেলেকে জলে ডোবার হাত থেকে উদ্ধার করেছিল। উলিৎকা গিন্নি ইচ্ছা করেই কথাটা তুলল।

লুকাশ্‌কার মা বলল, "সে যে এত ভাল ছেলে সেজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ. সে সাহসী ছেলে, সকলেই তাকে প্রশংসা করে। এখন তার একটা বিয়ে দিতে চাই ; তাহলেই আমি শান্তিতে মরতে পারি।"

তীক্ষ্ণবুদ্ধি উলিৎকা গিন্নি জবাবে বলল, "আরে, গ্রামে কি যুবতী মেয়ের অভাব আছে না কি ?"

মাথা নেড়ে লুকাশ্‌কার মা বলল, "সে তো কত—কত আছে। এই তো তোমার মেয়েই তো আছে—তোমার মারিয়াংকা—ঐরকম মেয়েই তো চাই ! সারা অঞ্চলে তার মত জুটি নেই !"

লুকাশ্‌কার মার মনের কথা উলিৎকা গিন্নি ভালই জানে ; কিন্তু যদিও সে বিশ্বাস করে যে লুকাশ্‌কা একজন সৎ কসাক, তবু সে পিছিয়ে আছে : তার প্রথম কারণ, সে একজন কর্ণেটের স্ত্রী ও ধনী, আর লুকাশ্‌কা একজন সাধারণ কসাকের ছেলে ও পিতৃহীন ; দ্বিতীয় কারণ, এখনই সে মেয়েকে ছেড়ে থাকতে চায় না।

তাই সবিনয়ে গম্ভীরভাবে বলল, "তা, সে যখন বড় হবে তখন বিয়ের যোগ্য তো হবেই।"

"তোমার কাছে ঘটক পাঠাব—অবশ্য পাঠাব ! শুধু আঙুরের চাষটা শেষ করতে দাও, তখনই আমরা গিয়ে তোমাকে অভিবাদন জানিয়ে আসব," লুকাশ্‌কার মা বলল। "আর ইলিয়া ভাসিলিয়েভিচকে অভিবাদন জানাব।"

"ইলিয়া, সত্যি !" কর্ণেটের স্ত্রী গর্বের সঙ্গে বলে উঠল। "আমার সঙ্গে তোমাকে কথা বলতেই হবে। সব যথাসময়ে হবে।"

কর্ণেটের স্ত্রীর কঠিন মুখ দেখে লুকাশ্‌কার মা বুঝল আর বেশী কিছু

বলার সময় এখন নয় ; তাই দেশলাই দিয়ে ন্যাকড়াটা ধরিয়ে উঠতে উঠতে বলল, "আমাকে ফিরিয়ে দিও না কিন্তু, যা বললে তা মনে রেখো। আচ্ছা, এবার চলি ; আগুন জ্বালাবার সময় হয়েছে।"

ন্যাকড়াটা দোলাতে দোলাতে রাস্তা পার হয়েই তার সঙ্গে মারিয়াংকার দেখা হয়ে গেল। মারিয়াংকা মাথা নোয়াল।

সুন্দরী মেয়েটির দিকে তাকিয়ে সে ভাবল, "আঃ, ঠিক যেন রাণী ; মেয়েটি কাজকর্মেও চমৎকার। আর বড় হবার কি দরকার? কোন ভাল ঘর দেখে এখনই তো বিয়ে দেবার সময় ; বিয়েটা লুকাশ্‌কার সঙ্গে!"

কিন্তু উলিৎকা গিন্নির অনেক জ্বালা ; চৌকাঠের উপর বসেই সে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল ; চমক ভাঙল মেয়ের ডাকে।

অধ্যায়—৬

গ্রামের পুরুষ অধিবাসীরা সময় কাটায় সামরিক অভিযানে এবং রক্ষী-বেষ্টনীতে—যাকে কসাকরা বলে "ঘাঁটিতে।" যে লুকাশ্‌কাকে নিয়ে দুই বুড়িতে এত কথা হল সন্ধ্যার দিকে সে দাঁড়িয়েছিল তেরেক নদীর একেবারে তীরে অবস্থিত নিঝ্‌নে-প্রতেৎস্কি ঘাঁটির পাহারা-বুরুজে। বুরুজের রেলিং-এর উপর ঝুঁকে দুই চোখ কুঁচকে সে তাকাচ্ছে কখনও অনেক দূরে তেরেকের ওপারে, আবার কখনও নীচের সহকর্মী বন্ধুদের দিকে, কখনও বা তাদের সঙ্গে দু' একটা কথাও বলছে। সূর্য বরফ-ঢাকা পাহাড়ের কাছে এসে পড়েছে ; ছেঁড়া মেঘের উপরে বরফ-ঢাকা চূড়াগুলো চকচক করছে। পাহাড়ের পাদদেশে মেঘগুলো দুলতে দুলতে ক্রমেই অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে। বাতাসে সন্ধ্যার পরিচ্ছন্নতা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। ঘাঁটির চারদিকটা এখনও গরম হলেও জঙ্গলের ভিতর থেকে তাজা বাতাস আসছে। কসাকদের কথাবার্তার শব্দ আগের চাইতে বেশী গম্ভীর হয়ে কাঁপছে। দুই নিশ্চল তীরের ভিতর দিয়ে তেরেকের ধূসর স্রোতধারা স্পষ্টতর বৈপরিত্যের সৃষ্টি করেছে। নদীর অপর পারে ঘাঁটির ঠিক উল্টো দিকে নীচু নল-খাগরার ঝোপ পাহাড়ের পাদ-দেশ পর্যন্ত প্রসারিত। নীচু তীরের একদিকে দেখা যাচ্ছে চেচেন গ্রামের মাটির ঘরবাড়ি আর ফোঁদল-আকারের চিমনিগুলো। পাহারা-বুরুজের কসাকটির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি শান্ত গ্রামের সন্ধ্যাকালীন ধোঁয়াকে ভেদ করে লাল-নীল পোশাক-পরা চেচেন মেয়েদের চলমান শরীরগুলোর উপর গিয়ে পড়ল।

যদিও কসাকরা আশংকা করছে যে এব্রেকরা তাতারের দিক থেকে নদী পেরিয়ে যেকোন মুহূর্তে তাদের আক্রমণ করতে পারে, বিশেষ করে এখন যে মাসে তেরেকের তীরবর্তী জঙ্গল এত ঘন যে পায়ে হেঁটে তার ভিতর দিয়ে

চলা খুব কঠিন আর নদীটাও অনেক জায়গায় এত অগভীর যে অশ্বারোহীদের পক্ষে পার হওয়াটা সহজ, যদিও দুদিন আগেই জনৈক কসাক রেজিমেণ্ট-কম্যাণ্ডারের ইস্তাহার নিয়ে এসে জানিয়ে গেছে যে স্কাউটদের প্রতিবেদন অনুসারে আটজন লোক তেরেক পার হবার তালে আছে, আর সেইজন্য বিশেষ সতর্ক পাহারার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে—তবু রক্ষী-বেষ্টনীতে কোন বিশেষ সতর্কতাই অবলম্বন করা হয় নি। কসাকরা নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র রেখে দিয়েছে, ঘোড়ার সাজ খুলে ফেলেছে। এমনভাব দেখাচ্ছে যেন তারা বাড়িতেই আছে ; কেউ মাছ ধরে, কেউ মদ খেয়ে, কেউ বা শিকার করে সময় কাটাচ্ছে।

পাহারা-বুরুজে দণ্ডায়মান লুকাশ্‌কা ছেলেটি লম্বা ও সুদর্শন, বয়স বছর কুড়ি, দেখতে ঠিক তার মার মত। তার মুখ, বস্তুত তার শরীরের গঠনই বুঝিয়ে দেয় সে প্রচুর দৈহিক ও নৈতিক শক্তির অধিকারী। যদিও সে সবে-মাত্র সীমান্তে এসে কসাকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে, তবু তার মুখের ভাব ও শান্ত আত্মবিশ্বাসের ভঙ্গী দেখে মনে হয়, যে গর্বিত যোদ্ধাসুলভ মনোভাব কসাকদের বৈশিষ্ট্য সেটা সে ইতিমধ্যেই অর্জন করে ফেলেছে। সে যে একজন কসাক ; নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে সে সচেতন। তার ঢোলা সার্কাসিয়ান কোটটা কিছু কিছু ছিঁড়ে গেছে ; টুপিটা রয়েছে চেচেন-ফ্যাসনমাফিক মাথার পিছনে ; পায়ের পট্টি জড়ানো হয়েছে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত। শুধু তার অস্ত্রগুলি দামী। তাকে দেখতে ঠিক একজন দিঝিগিৎ-এর মত। তরবারিতে হাত রেখে, চোখ দুটো প্রায় বুজে সে তাকিয়ে আছে দূরের আউল-এর দিকে। আলাদা করে বিচার করলে তার চোখ-নাক-মুখ কিছুই সুন্দর নয়, কিন্তু যেই তার দিকে ভাল করে তাকাবে সেই বলে উঠবে, "কী সুন্দর ছেলেটি !"

আপন মনেই সে তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠল, "ঐ মেয়েদের দিকে চেয়ে দেখ, তারা অনেকে গ্রামের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।" নাজার্কা ছিল নীচে শুয়ে। সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা তুলে সে বলল, "ওরা নিশ্চয় জল আনতে যাচ্ছে।"

লুকাশ্‌কা হেসে বলল, "ধরো, আমি যদি একটা গুলি করে ওদের চমকে দেই, তাহলে কি ওরা ভয় পাবে না ?"

"গুলি পৌছবেই না।"

"কী ! আমার গুলি ওদের ছাড়িয়ে যাবে। একটু সবুর কর, ওদের ভোজ শেষ হলেই আমি গিয়ে গিরেই খানের সঙ্গে দেখা করে তার সঙ্গে বুজা (দেশী বীয়ার) খেয়ে আসব," মশা তাড়াতে তাড়াতে লুকাশ্‌কা রেগে বলল।

ঝোপের মধ্যে খস্‌খস্ শব্দে সেদিকে তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। একটা ছিট ছিট কুকুর মাটিতে নাক রেখে লোমবিহীন লেজ নাড়তে বেষ্টনীর দিকে ছুটে

এল। প্রতিবেশী শিকারী ইয়েরশ্‌কা খুড়োর কুকুরটাকে সে চিনতে পারল, আর অচিরেই শিকারী স্বয়ং ঝোপটা পেরিয়ে এসে হাজির হল।

ইয়েরশ্‌কা খুড়ো কসাকদের মধ্যে এক দৈত্য বিশেষ; চওড়া সাদা দাড়ি, চওড়া কাঁধ ও বুক; সেখানে তার সঙ্গে তুলনা করা চলে এমন আর কেউ ছিল না। পরনে একটা ছেঁড়া কোট, হরিণের কাঁচা চামড়ার স্যাণ্ডেল পায়ে, মাথায় একটা ছোট সাদা টুপি। এক কাঁধে একটা পর্দা, পাখি শিকারের সময় সেটার পিছনে লুকিয়ে পড়ে; বাজপাখিকে ভুলিয়ে আনার জন্য থলের মধ্যে আছে একটা মুরগি; আর আছে একটা ছোট বাজপাখি; অন্য কাঁধে দড়ির সঙ্গে ঝোলানো আছে শিকার করা একটা বন-বিড়াল। কোমরবন্ধের সঙ্গে বাঁধা থলেটাতে আছে বুলেট, বারুদ, ও রুটি; মশা তাড়াবার জন্য একটা ঘোড়ার লেজ; ছেঁড়া খামে ভরা পুরনো রক্তের দাগ-লাগা একটা বড় ছোরা, আর দুটো মরা পাখি। রক্ষী-বেষ্টনীর দিকে তাকিয়ে সে থামল।

"হাই লিয়াম!" এমন গম্ভীর সুরেলা গলায় সে কুকুরটাকে ডাকল যে বনের মধ্যে অনেক দূর পর্যন্ত সেটা প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। মস্ত বড় গাদা বন্দুকটাকে (কসাকরা এগুলোকে "ফ্লিন্তা' বলে) কাঁধের উপর ফেলে সে টুপিটা তুলল।

যেন নদীর ওপারের কারও সঙ্গে কথা বলছে এমনিভাবে চীৎকার করে খুশিভরা জোরালো গলায় কসাকদের সম্বোধন করে বলল, "ভাল আছ তো সকলে, ভাল মানুষের দল?"

চারদিক থেকে কসাক যুবকরা সমস্বরে বলে উঠল, "খুব ভাল আছি খুড়ো!"

কোটের আস্তিন দিয়ে চওড়া লাল কপাল থেকে ঘাম মুছে ইয়েরশ্‌কা খুড়ো চেঁচিয়ে বলল, "কি দেখেছ তোমরা? সব কথা আমাদের বল।"

চোখ মিটমিট করে কাঁধ ও পা নাড়াতে নাড়াতে নাজার্কা বলল, "এখানকার গাছে একটা বাজপাখি বাস করে খুড়ো।"

"সত্যি নাকি?" বুড়ো অবিশ্বাসের সুরে বলল।

"সত্যি খুড়ো! একটু অপেক্ষা করেই দেখ না," নাজার্কা হেসে জবাব দিল।

অন্য কসাকরাও হাসতে লাগল।

কোন বাজপাখি কেউ আদপেই দেখে নি; আসলে ইয়েরশ্‌কা খুড়ো যখনই আসে তখনই কসাক যুবকরা তাকে নানাভাবে বিরক্ত করে, ভুল কথা বলে ফাঁকি দেয়; এ রেওয়াজ অনেকদিন থেকেই চলে আসছে।

বুরুজের উপর থেকে নাজার্কাকে ডেকে লুকাশ্‌কা বলল, "এই বোকা, আবার মিথ্যা কথা বলছ?"

নাজার্কা সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে গেল।

"ভাল করে খুঁজে দেখতে হবে। আমি নজর রাখব," বুড়োলোকটি বলল। কসাকরা তা শুনে খুব মজা পেল। "ভাল কথা, তোমরা কোন শুয়োর দেখেছ ?"

কর্পোরাল বলে উঠল, "শুয়োরের খোঁজ করছ ? আমরা খুঁজছি এব্রেকদের, শুয়োরদের নয় ! তাদের কথা কিছু শুনেছ কি খুড়ো ?"

বুড়ো বলল, "এব্রেক ? না, শুনি নি। আচ্ছা, তোমাদের কাছে "চিখির" (দেশী মদ) আছে ? লক্ষ্মীসোনা, আমাকে একটু খেতে দাও। বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। সময় মত আমি না হয় তোমাদের কিছু তাজা মাংস এনে দেব। বিশ্বাস কর। সত্যি দেব। একটু চিখির খেতে দাও।"

যেন তার কথাগুলি কানে যায় নি এমনি ভাব দেখিয়ে কর্পোরাল বলল, "আচ্ছা, তুমি কি পাহারায় যাচ্ছ ?"

ইয়েরশ্‌কা খুড়ো বলল, "আজ রাতে পাহারায় যাবার ইচ্ছা ছিল। ঈশ্বরের ইচ্ছায় হয় তো উৎসবের জন্য কিছু শিকার মারতে পারব। তখন তোমাদের ভাগটা পেয়ে যাবে, সত্যি পাবে !"

উপর থেকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লুকাশ্‌কা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল. "খুড়ো ! হুল্লো খুড়ো !" কসাকরা সকলেই তার দিকে তাকাল। "নদীর উজানে চলে যাও, সেখানে একদল শুয়োর রয়েছে। না, বানিয়ে বলছি না। সেদিন আমাদের একজন একটাকে গুলি করে মেরেছে। সত্যি বলছি।" তার গলার স্বরে বোঝা গেল সে ঠাট্টা করছে না।

উপরে তাকিয়ে বুড়ো বলল, "আরে, লুকাশ্‌কা উরভান যে ! তোমাদের কসাকটি কোথায় গুলি চালিয়েছিল ?"

লুকাশ্‌কা বলল, "আমাকে দেখতে পাচ্ছ না ? মনে হচ্ছে আমাকে খুব ছোট দেখাচ্ছে !" তারপর মাথা নেড়ে গম্ভীরভাবে বলল, "খানাটার কাছে। আমরা খানার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, এমন সময় খস্‌খস্‌ শব্দ শুনতে পেলাম, কিন্তু আমার বন্দুকটা ছিল খাপের মধ্যে। তারপর ইলিয়া…কিন্তু আমি তোমাকে জায়গাটা দেখিয়ে দেব। এখান থেকে বেশী দূর নয়। একটু অপেক্ষা কর। ওদের যাতায়াতের সব পথ আমি চিনি।…মোসেভ খুড়ো," কর্পোরালের দিকে ঘুরে প্রায় আদেশের সুরে বলল, "পাহারাকে ছুটি দেবার সময় হয়েছে।" হুকুমের জন্য অপেক্ষা না করেই কাঁধের উপর বন্দুকটা ঝুলিয়ে সে পাহারা-বুরুজ থেকে নামতে লাগল।

কর্পোরাল লুকাশ্‌কে নেমে আসতে দেখে বলল, "নেমে এস ! গুর্কা, এবার তোমার পালা কি ? তুমি উঠে যাও।…সত্যি, তোমাদের লুকাশ্‌কা সত্যিকারের শিকারী হয়ে উঠেছে," বুড়ো লোকটিকে উদ্দেশ করে সে বলে যেতে লাগল। "সে ঠিক তোমার মত হয়েছে, কখনও বাড়িতে থাকে না। সেদিন একটা শুয়োর মেরেছে।"

অধ্যায়—৭

সূর্য অস্ত গেছে ; বনের প্রান্ত থেকে রাতের ছায়া দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। রক্ষী-বেষ্টনীর কাজ শেষ করে কসাকরা রাতের খাবারের জন্য কুড়ের মধ্যে একত্র হল। বুড়ো লোকটি কিন্তু দেবদারু গাছটার নীচেই দাঁড়িয়ে রইল। একটা বাজপাখির খোঁজ করতে করতে সঙ্গের পাখিটার পায়ের সঙ্গে বাঁধা দড়িতে টান দিতে লাগল। একটা বাজপাখি গাছের উপর বসেছিল ঠিকই, কিন্তু সে টোপের উপর ছোঁ মারল না। একটার পর একটা গান গাইতে গাইতে লুকাশ্‌কা পাখি ধরবার জন্য খুব ঘন ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে জালটাকে টেনে নিয়ে চলল। তার দীর্ঘ দেহ ও বড় বড় হাত সত্ত্বেও ছোট-বড় যে কাজেই সে হাত দেয় তার আঙুলের ছোঁয়ায় তাতেই সোনা ফলে।

কাছাকাছি একটা ঝোপ থেকে নাজার্কার তীক্ষ্ণ, কর্কশ ডাক ভেসে এল, "হুল্লো লুকা! কসাকরা খেতে চলে গেছে।" পরক্ষণেই একটা জীবন্ত পাখি হাতে নিয়ে নাজার্কা ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে পায়ে-চলা পথে এসে দাঁড়াল।

গান থামিয়ে লুকাশ্‌কা বলল, "ওহো! এ মোরগটা কোথায় পেলে? মনে হচ্ছে এটা আমার ফাঁদে পড়েছিল?"

নাজার্কা ও লুকাশ্‌কা সমবয়সী। মাত্র গত বসন্তকালেই সেও সীমান্তে যোগ দিয়েছে। তার চেহারা সাধারণ, শীর্ণ, ও দুর্বল, গলার স্বর এত কর্কশ যে কানে লাগে। দুজন প্রতিবেশী ও সহকর্মী। তাতারদের মত জোড়াসন হয়ে ঘাসের উপর বসে লুকাশ্‌কা জালটা ঠিক করছিল।

"এটা কার তা আমি জানি না—হয়তো তোমারই হবে।"

"দেবদারু গাছের পাশে খাদটার ওপারে পেয়েছ কি? তাহলে ওটা আমার! কাল রাতে আমি জাল পেতে রেখেছিলাম।"

লুকাশ্‌কা উঠে পাখিটাকে খুটিয়ে দেখল। পাখিটার বার্নিশ করা মাথায় টোকা দিল, পাখিটা ভয়ে চোখ ঘুরিয়ে গলাটা বের করল, লুকাশ্‌কা সেটাকে হাতে নিল।

"আজ রাতে এটাকে দিয়ে ভোজ হবে। তুমি চলে যাও, এটাকে মেরে পালক ছাড়িয়ে ফেল।"

"আমরা নিজেরাই খাব, না কর্পোরালকে দিয়ে দেব?"

"তার অনেক আছে।"

"পাখি মারতে আমার ভাল লাগে না," নাজার্কা বলল।

"এখানে দিয়ে দাও!"

ছোরার নীচ থেকে একটা ছোট ছুরি টেনে বের করে সেটাকে একটানে বসিয়ে দিল। পাখিটা ছটফট করতে লাগল, কিন্তু পাখা মেলবার আগেই

রক্তাক্ত মাথাটি ঝুলে পড়ে থর্‌থর্‌ করে কাঁপতে লাগল। পাখিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, "এইভাবে কাজটা করতে হয়। এটাকে দিয়ে আচ্ছা খানা হবে।"

পাখিটার দিকে তাকিয়ে নাজার্কা শিউরে উঠল।

সেটাকে তুলে নিয়ে বলল, "আমি বলছি লুকাশ্‌কা, শয়তানটা আজ রাতে আবার আমাদের ঘাপটি মেরে বসে থাকতে পাঠাবে। (সে কর্পো-রালের কথা বলল। কোমুশ্‌কিনকে পাঠিয়েছে মদ আনতে, অথচ আজ তার পালা হওয়া উচিত। আমাদেরই রাতের পর রাতে যেতে হবে। একাজটা সে সব সময় আমাদের উপর চাপায়।"

লুকাশ্‌কা শিস্‌ দিতে দিতে চলতে লাগল। চেঁচিয়ে বলল, "দড়িটা সঙ্গে নিয়ে যাও।" নাজার্কা তার কথামত কাজ করল।

মুখে বলল, "আজ তাকে খোলাখুলিই বলব; সত্যি বলব। চল আমরা গিয়ে বলি, আমরা যাব না; আমরা ক্লান্ত; সব কিছুরই একটা শেষ আছে। না, সত্যি বলছি, তুমি গিয়ে তাকে বল; তোমার কথা সে শুনবে। এটা খুব খারাপ!"

লুকাশ্‌কা কি যেন ভাবছিল; বলল, "এখন যাও তো! এ নিয়ে এত হৈ-চৈ করার কি আছে! যত সব বাজে! এই রাতে সে যদি আমাদের গাঁয়ের বাইরে পাঠাত তাহলে সেটা আপত্তিকর হত। কিন্তু এখানে করবার আছেটা কি? এখানে বেষ্টনীতেই থাকি আর ওঁৎ পেতেই থাকি, সবই সমান। কী যে ছেলেমানুষী কর!"

"তুমি কি গ্রামে যাচ্ছ?"

"উৎসবের সময় যাব।"

নাজার্কা হঠাৎ বলে উঠল, "গুর্কা বলছে, তোমার দুনাইকা কোমুশ্‌কিনের সঙ্গে বেশ চালাচ্ছে।"

না হেসেও সাদা দাঁত বের করে লুকাশ্‌কা বলল, "আরে, তাকে জাহান্নামে যেতে দাও! আমি যেন আর একটাকে খুঁজে নিতে পারব না!"

"গুর্কা বলেছে, সে দুনাইকাদের বাড়ি গিয়েছিল। তার স্বামী বাড়ি ছিল না, আর কোমুশ্‌কিন বসে বসে পিঠে খাচ্ছিল। কিছুক্ষণ থেকে গুর্কা উঠে পড়ল; জানালার পাশ দিয়ে যাবার সময় শুনতে পেল দুনাইকা বলছে, 'সে চলে গেছে, সেই শয়তানটা··পিঠে খাচ্ছ না কেন সোনা? আজ রাতে আর বাড়ি যেও না।'"

"তুমি বানিয়ে বলছ।"

"না, ঠিক বলছি।"

একটু চুপ করে থেকে লুকাশ্‌কা বলল, "বেশ, সে যদি আর কাউকে নিয়ে পড়ে থাকে তো জাহান্নামে যাক। মেয়ের তো আর আকাল পড়ে নি।

তাছাড়া, ওকে আর আমার ভালও লাগছে না।”

নাজার্কা বলল, “আচ্ছা, তুমি কী শয়তান বল তো! তোমার উচিত কর্নেটের মেয়ে মারিয়াংকার সঙ্গে মেলামেশা করা। আরে, সেও কি যার-তার সঙ্গে বেরিয়ে যায় না?”

লুকাশ্‌কার চোখে ভ্রূকুটি। বলল, “হুঃ, মারিয়াংকা! ওরা সব সমান।”

“আরে, চেষ্টা করে তো দেখ...”

“তুমি ভেবেছ কি? গ্রামে কি মেয়ের অভাব আছে?”

লুকাশ্‌কা শিস দিতে দিতে গাছের পাতা ছিঁড়তে ছিঁড়তে বেষ্টনী বরাবর হাঁটতে লাগল। হঠাৎ একটা কচি ডাল দেখতে পেয়ে ছোরার হাতল থেকে একটা ছুরি টেনে বের করে সেটাকে কেটে ফেলল। ডালটাকে হিস্‌-হিস্‌ শব্দ করে বাতাসে ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, “এটা দিয়ে ভাল বন্দুক গাদবার শিস হবে।”

একটা কুটিরের মাটি-লেপা বাইরের ঘরের মাটির মেঝেতে পাতা নীচু তাতার টেবিলের চারপাশে কসাকরা গোল হয়ে বসেছে। ক্রমে এবার কে ওৎ পেতে লুকিয়ে বসে থাকবে সেই প্রশ্নটা তোলা হল।

খোলা দরজা দিয়ে পাশের ঘরের কর্পোরালকে উদ্দেশ করে জনৈক কসাক চেঁচিয়ে বলল, “আজ রাতে কে যাবে?”

কর্পোরাল পাল্টা চেঁচিয়ে বলল, “হ্যাঁ, কে যাবে? বুর্লাক খুড়ো গিয়েছিল, ফোমুশ্‌কিনও গিয়েছিল। এবার বরং তোমরা দু'জন যাও—তুমি আর নাজার্কা।” সে লুকাশ্‌কাকে বলল। “আর ইয়েরগুসভও যাবে; এতক্ষণে নিশ্চয় তার ঘুম ভেঙেছে।”

কসাক ইয়েরগুসভ এতক্ষণ কুটিরের কাছে মাতাল হয়ে পড়ে ঘুমচ্ছিল। এইমাত্র টলতে টলতে ঘরে ঢুকে চোখ মুছতে লাগল।

লুকাশ্‌কা এর মধ্যেই উঠে বন্দুক নিয়ে তৈরি হচ্ছে।

কর্পোরাল বলল, “এবার চলে যাও। খাওয়া সেরেই চলে যাও তোমরা!” তারপর তাদের মতামতের জন্য অপেক্ষা না করেই দরজাটা বন্ধ করে দিল। “অবশ্য আমার উপর হুকুম না হলে আমি কাউকে পাঠাতাম না; কিন্তু যেকোন মুহূর্তে একজন অফিসার এসে পড়তে পারে। যা খবর, তাতে তো আটজন এব্রেক নদী পার হয়েছে।”

ইয়েরগুসভ বলল, “বেশ তো, আমরাও যাচ্ছি। নিয়ম তো মানতেই হবে। এখন যা দিনকাল পড়েছে, তাতে আর উপায় কি। আমি বলছি, যেতেই হবে।”

ইতিমধ্যে একটা পাখির ঠ্যাং দুই হাতে মুখে পুরে লুকাশ্‌কা একবার নাজার্কার দিকে, একবার কর্পোরালের দিকে তাকাচ্ছে; কি ঘটছে না ঘটছে সে ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ উদাসীন; দুজনের দিকে তাকিয়ে শুধু হাসছে।

কসাকরা ওৎ পেতে লুকিয়ে থাকার জন্য তৈরি হবার আগেই ইয়েরশ্‌কা খুড়ো অন্ধকার ঘরে ঢুকে পড়ল।

"দেখ বাপুরা, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি। তোমরা নজর রাখবে চেচেনদের উপর, আর আমি নজর রাখব শুয়োরের উপর," নীচু ছাদওয়ালা ঘরের মধ্যে তার গম্ভীর ভারী গলা অন্য সকলের কথাকে ডুবিয়ে দিয়ে গম্‌গম্‌ করতে লাগল।

অধ্যায়—৮

ইয়েরশ্‌কা ও তিন কসাক যখন জোব্বা পরে বন্দুক কাঁধে ফেলে রক্ষী-বেষ্টনী ছেড়ে ওৎ পেতে লুকিয়ে থাকার জন্য তেরেক নদীর দিকে যাত্রা করল তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে।

নাজার্কার মোটেই যাবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু লুকাশ্‌কা ডাকাডাকি করায় সকলের সঙ্গে পা মেলাল। নীরবে কয়েক পা যাবার পরে কসাকরা খানার একপাশে সরে গিয়ে নল-খাগরায় ঢাকা একটা পথ ধরে নদীর তীরে পৌঁছে গেল। তীরের উপর একটা চওড়া কালো কাঠ পড়েছিল। তার চার পাশের নল-খাগরার জঙ্গলটাও সম্প্রতি কেটে রাখা হয়েছে।

"আমরা কি এখানে শুয়ে পড়ব?" নাজার্কা শুধাল।

লুকাশ্‌কা বলল, "মন্দ কি? এখানে বস, আমি এক মিনিটের মধ্যেই আসছি। খুড়োকে কোথায় যেতে হবে সেটা দেখিয়ে দিয়ে আসি।"

ইয়েরগুসভ বলল, "এটাই সেরা জায়গা; এখান থেকে আমরা সব দেখতে পাব কিন্তু কেউ আমাদের দেখতে পাবে না। কাজেই আমরা এখানেই শুয়ে থাকব। এটাই উপযুক্ত জায়গা।"

নাজার্কা ও ইয়েরগুসভ জোব্বা পেতে কাঠের আড়ালে বসে পড়ল, আর লুকাশ্‌কা ইয়েরশ্‌কা খুড়োকে নিয়ে এগিয়ে গেল।

আস্তে বুড়োর সামনে গিয়ে লুকাশ্‌কা বলল, "এখান থেকে বেশী দূর নয় খুড়ো; সেগুলো কোথায় আছে আমি তোমাকে দেখিয়ে দেব—একমাত্র আমিই তা জানি।"

বুড়ো ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, "এই তো চাই! তুমি খুব ভাল ছেলে, আসল উরভান!"

কয়েক পা এগিয়ে লুকাশ্‌কা থামল, একটা পগারের উপর ঝুঁকে পড়ে শিস দিল। "দেখতে পাচ্ছ ওখানেই জল খেতে আসে?" নতুন ক্ষুরের দাগ দেখিয়ে সে ফিসফিসিয়ে বলল।

বুড়ো বলল, "প্রভু তোমার ভাল করুন। খানার ওপারে ওই গর্তের

মধ্যেই শুয়োর আসবে। আমি নজর রাখব ; তুমি যেতে পার।"

জোব্বাটাকে আরও তুলে দিয়ে লুকাশ্‌কা একাই হাঁটতে লাগল। কখনও বাঁ দিকের নল-খাগড়ার বনের দিকে, কখনও নীচের খরস্রোতা তেরেকের দিকে তাকাচ্ছে। চেচেন পাহাড়ীর কথা মনে হতেই সে ভাবল, "তারা কেউ যে এখানে লুকিয়ে নজর রাখছে না বা হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে না তা আমি জোর গলায় বলতে পারি।" হঠাৎ নল-খাগড়ার খস্‌খস্‌ ও জলের মধ্যে ছলাৎ শব্দ শুনে চমকে উঠে সে গাদা বন্দুকটা চেপে ধরল। তীরের নীচ থেকে একটা শুয়োর ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে লাফিয়ে উঠল, তার কালো দেহটা মুহূর্তের জন্য কাঁচ-স্বচ্ছ জলের উপর দেখা গেল, পরমুহূর্তেই সেটা নল-বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। লুকাশ্‌কা বন্দুক তুলে তাক করল, কিন্তু গুলি করার আগেই শুয়োরটা ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। বিরক্তিভরে থুথু ফেলে সে হাঁটতে শুরু করল। গুপ্ত স্থানে পৌঁছে সে শিস দিল। পাল্টা শিস শুনে সহকর্মীদের দিকে এগিয়ে গেল।

নাজার্কা এর মধ্যেই জোব্বার উপর গুড়িশুড়ি মেরে ঘুমিয়ে পড়েছে। ইয়েরগুসভ আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে আছে ; একটু সরে লুকাশ্‌কার জন্য জায়গা করে দিল।

বলল, "ওৎ পেতে থাকাটা ভারী মজার! জায়গাটাও সত্যি ভাল। খুড়োকে পৌঁছে দিয়েছ?"

নিজের জোব্বাটা বিছিয়ে লুকাশ্‌কা জবাব দিল, "জায়গামত দিয়ে এসেছি। কিন্তু এইমাত্র ইয়া বড় একটা শুয়োর দেখে এলাম ঠিক জলের ধারে। মনে হচ্ছে, সেটাই হবে! তুমিও নিশ্চয় তার গর্জন শুনেছ?"

"ঠিকই শুনতে পেয়েছি। বুঝলাম সেটাই আসল শিকার। ভাবলাম : লুকাশ্‌কা ঠিক পাত্তা করেছে।" জোব্বায় গা ঢাকতে ঢাকতে ইয়েরগুসভ বলল। "এবার আমি ঘুমিয়ে পড়ছি। মোরগ ডাকলে আমাকে জাগিয়ে দিও। সকলকেই নিয়মমাফিক চলতে হবে। আমি একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছি ; পরে তুমি ঘুমবে আর আমি পাহারা দেব—সেটাই তো নিয়ম।"

"আমার ঘুমতে ইচ্ছা করছে না," লুকাশ্‌কা জবাব দিল।

রাতটা অন্ধকার, আতপ্ত ও স্তব্ধ। আকাশের এককোণে তারারা ঝিক-মিক করছে ; বাকি সবটা আকাশ জুড়েই কালো মেঘ পর্বত-শিখর থেকে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত। বাতাস নেই ; পাহাড়ের গায়ে মিশে মেঘগুলি ধীরে ধীরে তারকাখচিত আকাশের বুক বেয়ে সামনে এগিয়ে চলেছে। সামনে দেখা যাচ্ছে শুধু তেরেক ও তার ওপারের জমি। একেবারে পায়ের কাছেই তীর, তার নীচ দিয়ে বয়ে চলেছে খরস্রোতা নদী। আরও দূরে জল, তীর ও মেঘ মিলে-মিশে একাকার। তালে তালে দুই পাখা ঝাপ্‌টাতে ঝাপ্‌টাতে একটা পেঁচা উড়ে গেল তেরেকের উপর দিয়ে। কসাকদের মাথার উপরে

এসে সেটা ঘুরে গেল জঙ্গলের দিকে, তারপর একটা প্রাচীন গাছের ডালে পাখা নামিয়ে বসে পড়ল। এরকম যেকোন শব্দ হতেই পাহারারত কসাক কান খাড়া করে শোনে, চোখ কুঁচকে চারদিকে তাকায়, হাতটা আপনা থেকেই বন্দুকটাকে স্পর্শ করে।

রাত প্রায় শেষ হয়ে এল। কালো মেঘ পশ্চিমদিকে যেতে যেতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল, দেখা দিল তারায় ভরা পরিষ্কার আকাশ, আর সোনালী বাঁকা চাঁদ পাহাড়ের উপরে উঠে রক্তিম আলো ছড়াতে লাগল। ঠাণ্ডা তীক্ষ্ণতর হল। ঘুম থেকে জেগে নাজার্কা বিড়বিড় করে কি যেন বলে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। লুকাশ্‌কা বিরক্ত হয়ে উঠে বসল, ছোট ছুরিটা বের করে লাঠিটাকে বারুদ ঠাসবার শিক বানাতে লাগল। তার মাথায় তখনও চেচেনদের কথাই ঘুরপাক খাচ্ছে। বারকয়েক গুপ্ত-ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে এসে নদী বরাবর তাকাল, কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। ক্রমে আসন্ন ঊষার বার্তাবহ রূপোলী কুয়াশা জলের উপর ঝিলমিল করে উঠল, অদূরে ছোট ঈগলরা শিস দিতে লাগল, পাখা ঝাপটাতে লাগল; অবশেষে দূরের গ্রাম থেকে ভেসে এল মোরগের ডাক, তারপর আর একটা একটানা ডাক, তার জবাবে আরও অনেক মোরগের ডাক।

"ওদের জাগাবার সময় হয়েছে," লুকাশ্‌কা ভাবল; তার চোখও ভারী হয়ে এসেছে। বন্ধুদের দিকে সবে চোখ ফিরিয়েছে এমন সময় হঠাৎ তার মনে হল তেরেকের অপর পারে জলের ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ যেন তার কানে এল। আবার সে ফিরে তাকাল পাহাড়ের ওপারে দিগন্তের দিকে, ওল্টানো বাঁকা চাঁদের নীচে তখন ভোরের আলো ফুটছে, তাকাল অপর তীরের দিকে, তেরেকের দিকে, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে অনেক কাঠ ভেসে চলেছে তেরেকের বুকে। মুহূর্তের জন্য তার মনে হল, সেও ভেসে চলেছে আর তেরেক ও তার বুকের কাঠগুলো আছে স্থির হয়ে। আবার ভাল করে তাকাল। ডালপালা-ওয়ালা একটা বড় কাঠের গুড়ি বিশেষ করে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। কাঠটা একটু অদ্ভুতভাবে ভেসে চলেছে স্রোতের একেবারে মাঝ বরাবর; দুলছেও না, ঘুরপাকও খাচ্ছে না। এমন কি তার মনে হল, কাঠটা স্রোতের সঙ্গে না ভেসে নদীটা পেরিয়ে অল্প জলের দিকে এগিয়ে আসছে। গলা বাড়িয়ে লুকাশ্‌কা সাগ্রহে দেখতে লাগল। কাঠটা অল্প জলে এসে থামল, অদ্ভুতভাবে সরে গেল। লুকাশ্‌কার মনে হল, তার নীচ থেকে বাড়ানো একটা হাত সে দেখতে পেল।

"নিজেই একজন এব্রেককে মারলে কেমন হয়!" এই কথা ভেবে দ্রুত-গতিতে বন্দুকটা কাঁধ থেকে নামিয়ে সেটাকে ঠিক জায়গায় রাখল। ঘোড়াটা টেনে শ্বাসরোধ করে নিশানা স্থির করতে লাগল; সজাগ দুই চোখ মেলে ধরল অন্ধকারে।

ভাবল, "ওদের জাগাব না।" কিন্তু তার বুকটা এত দ্রুত ধুকধুক করতে লাগল যে কান পেতে সে ইতস্তত করতে লাগল। হঠাৎ কাঠটা যেন ঝলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আবার স্রোত কাটিয়ে তার দিকেই এগোতে শুরু করল।

"ফসকালে চলবে না!…" সে ভাবল; এবার চাঁদের ম্লান আলোয় ভাসমান কাঠটার সামনে একজন তাতারের মাথাটা সে দেখতে পেল। মাথা লক্ষ্য করে বন্দুক তাক করল। মনে হল খুব কাছে—একেবারে তার বন্দুকের নলের মুখে। চোখ তুলে তাকাল। "ঠিক যা ভেবেছি, একজন এব্রেক।" খুশি মনে হাঁটুর উপর ভর করে আবার নিশানা স্থির করল। লম্বা বন্দুকের একেবারে মাথায় লক্ষ্যটাকে পেয়ে ছেলেবেলার শিক্ষামত "পিতা-পুত্রের নামে" বলেই ঘোড়াটা টিপল। আগুনের ঝলকানিতে মুহূর্তের জন্য নলবন ও জল ঝল্‌সে উঠল, গুলির তীক্ষ্ণ শব্দ নদী পেরিয়ে একটানা সুরে বহুদূরে মিলিয়ে গেল। কাঠের গুড়িটা এবার আড়াআড়ি আসার বদলে স্রোতের মুখে দুলতে দুলতে, পাক খেতে খেতে ভেসে চলল।

ইয়ের্‌গুসভ যেখানে শুয়েছিল সেখান থেকেই মাথাটা তুলে বন্দুকে হাত রেখে চেঁচিয়ে বলল, "আমি বলছি, ওকে ধর!"

দাঁত কিড়মিড় করে লুকাশ্‌কা ফিসফিসিয়ে বলে উঠল। "তুমি চুপ কর শয়তান! এব্রেকের দল!"

নাজার্কা শুধাল, "কাকে গুলি করলে লুকাশ্‌কা? ও কে?"

লুকাশ্‌কা জবাব দিল না। বন্দুকে বারুদ ভরতে ভরতে ভাসমান কাঠটাকে দেখতে লাগল। একটু গিয়েই সেটা একটা বালির চড়ায় আটকে গেল, আর তার পিছনে দেখা গেল একটা বড় মত কি যেন দুলছে।

"তুমি কাকে গুলি করলে? কথা বলছ না কেন?" কসাকরা প্রশ্ন করতে লাগল।

"বলেছি তো, এব্রেক!" লুকাশ্‌কা বলল।

"বাজে কথা বলো না! আপনা থেকেই গুলিটা বেরিয়ে গেছে কি?…"

আবেগে চাপা গলায় লুকাশ্‌কা বিড়বিড় করে বলল, "একটা এব্রেককে মেরেছি, বাস, ঐ পর্যন্ত!" বালির চড়াটা দেখিয়ে বলল, "একটা লোক সাঁতরে আসছিল। তাকে মেরেছি। ঐ দেখ।"

চোখ মুছে ইয়েরগুশভ আবার বলল, "বাজে কথা বলো না!"

"কি বললে? ওখানে দেখ," তার ঘাড় ধরে সজোরে টানতে টানতে লুকাশ্‌কা বলল।

লুকাশ্‌কার কথামত তাকিয়ে মৃতদেহটা দেখতে পেয়ে তার গলার স্বর বদলে গেল।

"তাই তো! কিন্তু তাহলে তো আরও আসবে। একটি স্কাউট সাঁতরে আসছিল; বাকিরা হয় ইতিমধ্যেই এখানে এসে গেছে, আর নয় তো

ওপারেই কাছাকাছি কোথাও আছে। বিশ্বাস কর!"

লুকাশ্‌কা সার্কাসীয়ান কোটটা খুলে কোমরবন্ধটা খুলতে লাগল।

ইয়েরগুশভ চেঁচিয়ে বলল, "কি করছ মুখ্যু কোথাকার? তোমাকে দেখতে পেলেই শেষ করে ফেলবে, অথচ লাভ কিছুই হবে না; বিশ্বাস কর! ওকে যদি মেরে থাক তো তোমার রেহাই নেই। আমার বন্দুকের জন্য কিছুটা বারুদ দাও তো। আছে তো? নাজার, তুমি রক্ষী-বেষ্টনীতে ফিরে যাও; কিন্তু তীর বরাবর যেয়ো না, বিশ্বাস কর!"

নাজার্কা রেগে বলল, "একা গেলে আমাকে ধরবে। তুমি নিজে যাও!"

কোটটা খুলে লুকাশ্‌কা নদীর পারের দিকে নেমে গেল।

বন্দুকে বারুদ ঠাসতে ঠাসতে ইয়েরগুশভ বলল, "আমি বলছি ওদিকে যেয়ো না। দেখ, লোকটা নড়ছে না। আমি দেখতে পাচ্ছি। প্রায় সকাল হয়ে এসেছে; ওরা রক্ষী-বেষ্টনী থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। নাজার্কা, তুমি বরং ফিরে যাও। ভয় পেয়েছ! কোন ভয় নেই, আমি বলছি।"

"লুকা, আমি বলছি লুকাশ্‌কা! বলতো, কেমন করে কাজটা করলে!"

লুকাশ্‌কা নদীর দিকে যাবার মতলবটা ত্যাগ করল।

"তাড়াতাড়ি রক্ষী-বেষ্টনীতে চলে যাও, আমি পাহারায় আছি। কসাকদের গিয়ে বল, পাহারাদার-বাহিনীকে পাঠিয়ে দিতে। এব্রেকরা যদি এপারে এসে থাকে তো তাদের পাকড়াও করতে হবে।"

ইয়েরগুশভ উঠে বলল, "আমিও তাই বলি। ওরা পালিয়ে যাবে; কিন্তু ওদের পাকড়াও করতেই হবে।"

ইয়েরগুশভ ও নাজার্কা ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে রক্ষী-বেষ্টনীতে যাত্রা করল—নদীতীর ধরে নয়, ঝোপ-ঝাড় পেরিয়ে জঙ্গলের ভিতরকার একটা পথ ধরতে।

যেতে যেতেই ইয়েরগুশভ বলল, "মনে রেখো লুকাশ্‌কা। এক পাও নড়ো না—এখানেই তোমাকে তারা কচু-কাটা করতে পারে, কাজেই খুব কড়া নজর রেখো।"

লুকাশ্‌কা বিড়বিড় করে বলল, "আমি জানি; এখন যাবে তো যাও।" বন্দুকটাকে ভাল করে দেখে নিয়ে সে আবার কাঠের আড়ালে বসে পড়ল।

লুকাশ্‌কা একা। সে বসে বসে চড়ার দিকে তাকাচ্ছে, আর কসাকদের পায়ের শব্দ শোনার জন্য কান পেতে আছে; কিন্তু রক্ষী-বেষ্টনী বেশ কিছুটা দূরে; তার ধৈর্য আর থাকছে না। তার একমাত্র চিন্তা, যাকে মেরেছে তার সঙ্গী এব্রেকরা হয় তো পালিয়ে যাবে। সে চারদিকে নজর রাখছে, বিশেষ করে নদীর ওপারে; প্রতি মুহূর্তে আশা করছে, কাউকে দেখতে পাবে; বন্দুকটা ঠিক মত বসিয়ে সে গুলি করার জন্য প্রস্তুত হয়ে রইল। সে যে নিজেও মারা যেতে পারে সেকথা তার মাথায়ই এল না।

অধ্যায়—৯

ক্রমেই আলো ফুটে উঠছে। চেচেনের মৃতদেহটা এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, অল্প জলে ঈষৎ কাঁপছে। হঠাৎ অদূরে নল-খাগড়ার মধ্যে একটা খস্-খস্ শব্দ হল ; লুকা পায়ের শব্দ শুনতে পেল, নল-খাগড়ার মাথাগুলো নড়তেও দেখল। বন্দুকের ঘোড়াটা পুরো টেনে ফিসফিসিয়ে বলল : "পিতা-পুত্রের নামে।" খুট্ করে বন্দুকের শব্দ হতেই পায়ের শব্দ থেমে গেল।

গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল : "হুল্লো কসাক ! তোমাদের খুড়োকে মেরে ফেলো না !" সঙ্গে সঙ্গে নল-খাগড়া দু'পাশে সরিয়ে ইয়েরশ্কা খুড়ো লুকোর সামনে এসে হাজির হল।

লুকাশ্কা বলল, "তোমাকে তো প্রায় মেরেই ফেলেছিলাম ; সত্যি তাই !"

বুড়ো জিজ্ঞাসা করল, "কাকে গুলি করলে ?" তার গুরু-গম্ভীর গলা বনের ভিতর দিয়ে নদী পেরিয়ে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল ; রাতের রহস্যময় স্তব্ধতা যেন সহসা দূর হয়ে গেল ; সবকিছুই আলোকিত ও স্পষ্টতর হয়ে দেখা দিল।

লুকাশ্কা বলল, "এই যে খুড়ো, তুমি তো কিছুই দেখতে পাও নি, আমি কিন্তু একটা জানোয়ার মেরেছি।"

বুড়ো একদৃষ্টিতে কালো পিঠটার দিকে তাকিয়ে রইল ; তাকে ঘিরে তেরেকের জল তির তির করে বয়ে চলেছে।

"পিঠের উপর একটা কাঠের গুড়ি নিয়ে লোকটা সাঁতরে আসছিল। কিন্তু আমি ঠিক দেখতে পেয়েছিলাম, আর তারপরেই···ওই দেখ। ওখানে ! লোকটার পরনে নীল ট্রাউজার, আর হাতে একটা বন্দুক বলে মনে হয়। দেখতে পাচ্ছ ?" লুকা শুধাল।

"নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছি !" বুড়ো রেগে বলল ; তার মুখে একটা গম্ভীর কঠোরভাব ফুটে উঠল। যেন অনুতাপের সুরে বলল, "তুমি একজন দিঝিগিৎকে মেরেছ !"

"দেখ, আমি এখানে বসেছিলাম, হঠাৎ ওপারে একটা কালো মত কিছু চোখে পড়ল। ওই অত দূরে থাকতেই তাকে দেখতে পেলাম। মনে হল, একটা লোক ওখানে এসে জলে পড়ে গেছে। মনে হল, আশ্চর্য তো ! তার-পরই বেশ বড় একটা কাঠের গুড়ি ভেসে আসতে লাগল, কিন্তু স্রোতের টানে না গিয়ে নদীটা পার হয়ে আসতে লাগল, আর তারপরই কাঠের নীচ থেকে একটা মাথাকে উঠতে দেখলাম। অবাক কাণ্ড ! নলবনের ভিতর থেকেই তাকালাম, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না ; তখন উঠে দাঁড়ালাম ;

লোকটা, শয়তানটা নিশ্চয় কোনরকম শব্দ শুনতে পেয়েছিল; গুঁড়ি মেরে অল্প জলে হামাগুঁড়ি দিয়ে চারদিকে তাকাতে লাগল। সে মাটিতে পা রাখতেই আমি বললাম, "না। সেটি হবে না! তোমাকে পালাতে দেব না!" মনে হল, আমার যেন গলা আটকে আসছে! বন্দুকটা হাতে নিয়ে চুপ করে দাঁড়ালাম। একটু অপেক্ষা করে সে আবার সাঁতার দিল; চাঁদের আলোয় যেতেই তার পুরো পিঠটা দেখতে পেলাম। "পিতা-পুত্র, ও পবিত্র আত্মার নামে"···ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে দেখলাম, সে হাত-পা ছুঁড়ছে। মনে হল যেন তার আর্তনাদও শুনতে পেলাম। ভাবলাম, "হে প্রভু, তোমাকে ধন্যবাদ, ওকে ঠিক মেরেছি!" ভাসতে ভাসতে চড়ায় পৌছলে তাকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম; উঠতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না? কিছুক্ষণ হাত-পা ছুঁড়ে চুপ করে পড়ে রইল। সবই চোখের সামনে দেখলাম। চেয়ে দেখ, সে নড়ছে না —নিশ্চয় মরে গেছে! দলে যদি আরও লোক থাকে তাই ওরা রক্ষী-বেষ্টনীতে খবর দিতে গেছে।"

বুড়ো বলল, "তাহলে তাকে ঠিক ধরেছ! এতক্ষণ তো সে অনেক দূরে চলে গেছে বাবা।···" খুড়ো আবারও বিষণ্ণ মনে মাথাটা নাড়তে লাগল।

ঠিক সেইসময় ডালপালা ভাঙার এবং ঘোড়ায় চেপে ও পায়ে হেঁটে নদীর তীর বরাবর এগিয়ে আসা কসাকদের হৈ-চৈর শব্দ তাদের কানে এল।

লুকাশ্কা চেঁচিয়ে বলল, "নৌকোটা এনেছ কি?"

জনৈক কসাক চেঁচিয়ে উঠল, "তুমি তো রঙের গোলাম হে লুকা! ওটাকে তীরে টেনে নিয়ে এস!"

নৌকোর জন্য অপেক্ষা না করেই লুকাশ্কা পোশাক খুলতে শুরু করল: তার চোখ সারাক্ষণ শিকারের উপর নিবদ্ধ।

কর্পোরাল চেঁচিয়ে বলল, "একটু অপেক্ষা কর, নাজার্কা নৌকো নিয়ে আসছে।"

আর একটি কসাক বলল, "আরে আহাম্মক! হয়তো লোকটা বেঁচে আছে, কেবল মরার ভান করে পড়ে আছে। ছোরাটা সঙ্গে নাও।"

"রেখে দাও!" ট্রাউজার খুলে লুকা চেঁচিয়ে বলল। তাড়াতাড়ি পোশাক ছেড়ে ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে নদীতে ঝাঁপ দিল। তারপর বড় বড় হাত ফেলে পিঠটাকে জলের উপর ভাসিয়ে রেখে তেরেক নদী সাঁতরে চরের দিকে এগোতে লাগল। একদল কসাক তীরে দাঁড়িয়ে হল্লা করতে লাগল। তিনজন অশ্বারোহী তাকে পাহারা দিতে এগিয়ে গেল। বাঁক ঘুরে নৌকোটা দেখা দিল। লুকাশ্কা চরের উপর দাঁড়িয়ে মৃতদেহটার উপর ঝুঁকে দুবার নাড়া দিল। তারপর কর্কশ গলায় বলে উঠল, "মরে কাঠ হয়ে গেছে!"

চেচেনটির মাথায় গুলি লেগেছে। তার পরনে নীল ট্রাউজার, শার্ট ও সার্কাসিয়ান কোট। পিঠের সঙ্গে একটা বন্দুক ও ছোরা বাঁধা। তার উপরে

বাঁধা রয়েছে একটা বড় গাছের ডাল। সেটা দেখেই প্রথমে লুকাশ্‌কার ধোঁকা লাগছিল।

মৃতদেহটাকে নৌকো থেকে তুলে নদীর তীরে ঘাসের উপর শুইয়ে দেওয়া হল। কসাকরা গোল হয়ে সেটাকে ঘিরে দাঁড়াল। একজন বলে উঠল, "আহা কী মাছই ডাঙায় তুলেছ হে!"

আর একজন বলল, "লোকটা কী হলদে!"

তৃতীয় একজন বলল, "আমাদের লোকজন কোথায় খুঁজতে গেছে? মনে হচ্ছে, বাকিরা নদীর ওপারেই আছে। স্কাউট না হলে এ লোকটা এ-ভাবে সাঁতরে আসত না। নইলে সে একাকি সাঁতার দেবে কেন?"

নদীর তীরে নীচে দাঁড়িয়ে ভেজা কাপড় নিঙরাতে নিঙরাতে শীতে কাঁপতে কাঁপতে লুকাশ্‌কা ঠাট্টার সুরে বলল, "সকলের আগে নিজেই চলে এসেছে; লোকটা চটপটে আছে; সত্যিকারের দিঝিগিৎ! ওর দাড়িতে কলপ লাগানো, মাথার চুল ছাঁটা।"

একজন বলল, "আর সাঁতরাবার সুবিধার জন্য কোটটা থলিতে ভরে সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়েছে।"

মৃত লোকটার ছোরা ও বন্দুক হাতে নিয়ে কর্পোরাল বলল, "শোন লুকাশ্‌কা, ছোরাটা আর কোটটা তুমিই রাখ; কিন্তু বন্দুকটার জন্য আমি তোমাকে তিনটি রৌপ্য রুবল দিচ্ছি। দেখছই তো, নলটা খুব ভাল নয়। শুধু স্মারক হিসাবেই এটা আমি নিতে চাই।"

লুকাশ্‌কা জবাব দিল না। এধরনের চাওয়ার জন্য সে বিরক্ত হয়েছে। কিন্তু সে জানে কোন উপায় নেই।

চেচেনের কোটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ভুরু কুঁচকে বলে উঠল, "শয়তান। একটা ভাল কোটও তো পরতে পারত। এটা যে শতছিন্ন।"

একজন কসাক বলল, "ওটাতে করে জ্বালানী কাঠ আনা যাবে।"

লুকাশ্‌কা বলল, "মোসেভ, আমি বাড়ি যাব।"

"ঠিক আছে, তুমি যেতে পার।"

বন্দুকটা পরখ করতে করতে কর্পোরাল বলল, "লাশটাকে রক্ষী-বেষ্টনীতে নিয়ে যাও তোমরা। রোদের জন্য উপরে একটা ঢাকা দিয়ে দিও। পাহাড়ের উপর থেকে ওরা কিছু মুক্তি-পণ পাঠাতে পারে।"

"এখনও তাপ বাড়ে নি," একজন বলল।

আর একজন বলল, "আর একটা শেয়াল যদি ছোবল বসায় সেটা কি ভাল হবে?"

"একটা পাহারা বসাও; তারা যদি ওকে কিনে নিতে আসে তাহলে দেহটা ছেঁড়াছেঁড়ি হলে চলবে না।"

কর্পোরাল খুশিমনে বলল, "আচ্ছা লুকাশ্‌কা তুমি কি বল; ওদের এক

বালতি ভদ্‌কা খাওয়াবার ভার তুমি নাও।"

কসাকরা সমস্বরে বলে উঠল, "নিশ্চয়। সেটাই তো রীতি। দেখ, ঈশ্বর তোমাকে কী সৌভাগ্য এনে দিয়েছেন! জীবনের কতটুকুই বা দেখেছ, অথচ এর মধ্যেই একজন এব্রেককে মেরে ফেললে।"

লুকাশ্‌কা বলল, "ছোরা ও কোটটা কিনে নাও; কৃপণতা করো না। ট্রাউজারটাও তোমাদের দিয়ে দেব। আমার গায়ে আঁট হচ্ছে; শয়তানটা একেবারে হাড়সর্বস্ব।"

একজন কোটটা কিনে নিল এক রুবল দিয়ে; আর একজন ছোরার দাম হিসাবে দিল দুই বালতি ভদ্‌কার দাম।

লুকাশ্‌কা বলল, "আচ্ছা করে খাও হে। আমিও এক বালতি দেব। গ্রাম থেকে নিজেই নিয়ে আসব।"

"আর ট্রাউজারটা কেটে মেয়েদের জন্য রুমাল বানিয়ে দাও," নাজার্কা বলল।

কসাকরা হো-হো করে হেসে উঠল।

কর্পোরাল বলল, "যথেষ্ট হাসি হয়েছে! লাশটা সরিয়ে নিয়ে যাও। এই পচা দেহটা কি কুটিরের কাছে ফেলে যাবে না কি?"

"ওখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন? ওকে টেনে নিয়ে চল।" লুকাশ্‌কা আদেশের সুরে কসাকদের বলল, আর তারাও তাকেই বড় কর্তার মত মান্য করে অনিচ্ছাসত্ত্বেও লাশটাকে ধরল। কয়েক পা টেনে নিয়েই কসাকরা পা দুটো ছেড়ে দিল। পা দুটো ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেল। কয়েক পা সরে গিয়ে কসাকরা কয়েক মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। নাজার্কা এগিয়ে গিয়ে মাথাটাকে সোজা করে ধরল; কপালের উপরকার গোল ক্ষতটা এবং মৃত লোকটির পুরো মুখটাই তাতে দৃষ্টিগোচর হল।

বলল, "দেখ, সোজা গিয়ে কেমন মস্তিষ্কটাই ফুঁটো করে দিয়েছে। কখনও হারিয়ে যাবে না। মালিকরা ঠিক চিনতে পারবে।"

কেউ কোন কথা বলল না; নীরবতার দেবদূত আর একবার কসাকদের উপর দিয়ে উড়ে গেল।

সূর্য অনেকটা উপরে উঠে এসেছে; তার ছিন্ন রশ্মি ঝিকমিক করছে শিশির ভেজা ঘাসের বুকে। পাশেই বনভূমিকে মুখরিত করে বয়ে চলেছে তেরেক, প্রাতঃকালকে অভিবাদন জানিয়ে পাখিরা কলকূজনে মেতে উঠেছে। কসাকরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে মৃতদেহের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়েই আছে। বাদামী দেহটাতে ভেজা সবুজ ট্রাউজার ছাড়া আর কিছু নেই; চুপ্‌সে-যাওয়া পেটের উপর সেটা পট্টি দিয়ে বাঁধা; দেহটা সুগঠিত ও সুদর্শন। পেশীবহুল হাত দুটো দুই পাশে পড়ে আছে; সদ্য-কামানো নীলাভ মাথায় রক্ত জমাট বেঁধে গেছে। মসৃণ বাদামী ভুরু কামানো মাথার একেবারে

বিপরীত দেখাচ্ছে। কাঁচ-স্বচ্ছ খোলা চোখ দুটি এমনভাবে স্থির দৃষ্টিতে উপরে নিবদ্ধ যেন গোটা অতীতটাকেই দেখছে। পাকানো লাল গোঁফের নীচে সুন্দর ঠোঁট দুটি যেন তীক্ষ্ণ অথচ সহজ পরিহাসে কঠিন হয়ে আছে। সরু কব্জি দুটো লাল লোমে ঢাকা, আঙুলগুলি ভিতরের দিকে বাঁকানো, নখে লাল রং করা।

লুকাস্‌কা তখনও পোশাক পরে নি। সব ভিজে গেছে। তার গলা অস্বাভাবিক রকমের লাল, আর চোখ দুটোও অধিকতর উজ্জ্বল; চওড়া গাল দুটো কাঁপছে, সকালের তাজা বাতাস লেগে তার স্বাস্থ্যপূর্ণ শরীর থেকে ঈষৎ ধোঁয়া বের হচ্ছে।

যেন লাশটার প্রশংসায়ই সে বলে উঠল, "সেও তো মানুষই ছিল!"

জনৈক কসাক বলল, "তা ঠিক, তবে তুমি ওর হাতে পড়লে কোনরকম করুণা পেতে না।"

নীরবতার দেবদূত পাখা মেলল। কসাকরা কথাবার্তা শুরু করল। দুজন গেল গাছের ডাল কেটে আনতে, একটা আস্তানা বানাবার জন্য; অন্যরা পা চালিয়ে দিল রক্ষী-বেষ্টনীর দিকে। লুকাশ্‌কা ও নাজার্কা বাড়ি যাবার জন্য তৈরি হতে দৌড় দিল।

আধঘণ্টা পরে দেখা গেল, লুকাশ্‌কা ও নাজার্কা গাঁয়ের দিকে চলেছে। অনবরত কথা বলতে বলতে তারা তেরেক ও গাঁয়ের মধ্যবর্তী জঙ্গলের ভিতর দিয়ে প্রায় ছুটে চলল।

"মনে থাকে যেন, আমি যে তোমাকে পাঠিয়েছি সেটা তাকে বলো না। সেখানে গিয়ে দেখ তার স্বামী বাড়ি আছে কিনা," লুকাশ্‌কা বলল।

অনুগত নাজার্কা বলল, "আমি একবার ইয়াম্‌কার কাছেও যাব। মদের আসরটা বসছে তো?"

"আজ না বসলে আর কবে বসবে?" লুকাশ্‌কা জবাব দিল।

গ্রামে পৌঁছে দুই কসাক মদ খেয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুম দিল।

অধ্যায়—১০

উপরে বর্ণিত ঘটনার দু'দিন পরে দুই কোম্পানি ককেসীয় পদাতিক রেজিমেণ্ট কসাকদের গ্রাম নভম্‌লিন্‌স্কায়াতে হাজির হল। ঘোড়াগুলো খুলে দেওয়া হয়েছে; কোম্পানির মালগাড়িগুলো স্কোয়ারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। রাঁধুনিরা উনুন খুঁড়ে নানা উঠোন থেকে জ্বালানী যোগাড় করে রান্না চাপিয়ে দিয়েছে; সার্জেণ্ট-মেজররা নাম ডাকছে। সার্ভিস কোরের লোকরা ঘোড়া বাঁধবার জন্য মাটিতে খোঁটা পুঁতছে; আর ভাণ্ডারীরা যেন

নিজের নিজের বাড়িতে এসেছে এমনিভাবে অফিসারদের তাদের বাসস্থান দেখিয়ে বেড়াচ্ছে।

বারুদের সবুজ বাক্সগুলো সারি দিয়ে রাখা হয়েছে, কোম্পানির গাড়ি ও ঘোড়াগুলো রয়েছে, বড় বড় কড়াইতে পরিজ রান্না হচ্ছে। দলে আছে একজন ক্যাপ্টেন, একজন লেফ্‌টেনাণ্ট ও সার্জেণ্ট-মেজর ওনিসিম মিখাই-লোভিচ। যেহেতু এটা একটা কসাক গ্রাম এবং কোম্পানি দুটিকে এখানেই আস্তানা বানাবার হুকুম দেওয়া হয়েছে, তাই সকলেরই মনে হল তারা যেন বাড়িতেই এসেছে।

কসাকদের বিরূপ মনোভাবকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে খোশ মেজাজে গল্প করতে করতে এবং বন্দুকের ঠুং-ঠাং শব্দ তুলে তারা দুজন-দুজন ও তিনজন-তিনজন করে কুটিরে গিয়ে ঢুকল, জিনিসপত্র ঝুলিয়ে রাখল, থলিগুলো খুলে ফেলল, আর মেয়েদের সঙ্গে রসিকতা জুড়ে দিল। বেশীর ভাগ গিয়ে জমা হল পরিজের কড়াইয়ের পাশে; দাঁতের ফাঁকে ছোট ছোট পাইপ চেপে ধরে কখনও ধোঁয়ার কুণ্ডলির দিকে, কখনও বা শিবির-আগুনের কম্পিত শিখার দিকে তাকিয়ে কসাক নরনারীদের সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগল, কারণ তাদের জীবনযাত্রা মোটেই রুশদের মত নয়। সব উঠোনেই দেখা যাচ্ছে সৈনিকরা চলাফেরা করছে, হো-হো করে হাসছে, আর কসাক রমণীরা বেপরোয়াভাবে চেঁচামেচি করছে; তারা নিজেদের ঘরবাড়ি সামলাতে ব্যস্ত; সৈনিকদের জল বা রান্নার বাসনপত্র দিতে আপত্তি করছে।

বুড়ো কসাকরা নিঃশব্দে বেরিয়ে এসে মাটির বেড়ার উপর বসে সৈনিক-দের ক্রিয়াকলাপ দেখছে, যেন এর ফলাফল কি হবে তা বোঝে না, বা বুঝতে চায়ও না।

ওলেনিন তিনমাস আগে শিক্ষার্থী হিসাবে রিজিমেণ্টে যোগ দিয়েছে; সে বাসা পেয়েছে গাঁয়ের একটা সেরা বাড়িতে; বাড়িটা কর্ণেট ইলিয়া ভাসিলিয়েভিচের—অর্থাৎ উলিৎকা গিন্নির।

ওলেনিনের গায়ে একটা সার্কাসিয়ান কোট; গ্রোজ্‌নায়া থেকে কেনা একটা কাবার্দা ঘোড়ায় চড়ে পাঁচ মাইল পথ পার হয়ে নিজের জন্য নির্দিষ্ট বাসায় ঢুকতে যাচ্ছে এমন সময় ভানিয়ুশা হাঁপাতে হাঁপাতে তাকে বলল, "দিমিত্রি আন্দ্রেয়েভিচ, বাসাটা যে কেমন হবে তা ঈশ্বরই জানেন।"

ভানিয়ুশার গা থেকে ঘাম ঝরছে, চেহারা উস্কোখুস্কো, মুখে বিরক্তির ছাপ। মালগাড়ির সঙ্গে এসে সে এখন জিনিসপত্র গোছাতে ব্যস্ত। ঘোড়া-টাকে আদর করতে করতে ওলেনিন শুধাল, "কেন, ব্যাপার কি?"

ওলেনিনের চেহারা বেশ বদলে গেছে। পরিষ্কার কামানো ঠোঁট ও থুতনির বদলে গোঁফ ও ছোট দাড়ি দেখা দিয়েছে। ফ্যাকাশে চেহারার বদলে রাতকে দিন করার ফলে স্বাস্থ্যপ্রদ রোদে পুড়ে তার গাল, কপাল ও

কানের পিছনের চামড়া লাল্‌চে হয়ে উঠেছে। নতুন, পরিচ্ছন্ন, কালো লেজওয়ালা কোটের বদলে পরনে একটা ময়লা সার্কাসিয়ান কোট, ঘন ভাঁজ করা ঘাঘ্‌রা আর কাঁধের উপর বন্দুক। সদ্য মাড়-দেওয়া কলারের বদলে রেশমী "বেশমেৎ"-এর লাল ফিতে গলায় জড়ানো। সে পরেছে সার্কাসিয়ান পোশাক, কিন্তু ভালভাবে পরতে পারে নি, যে কেউ দেখলেই বুঝবে সে এক-জন রুশ, দিঝিগিৎ নয়। কিন্তু সে যাই হোক, এখন সে যেন স্বাস্থ্য, আনন্দ ও আত্মতুষ্টির জীবন্ত প্রতীক।

ভানিয়ুশা বলল, "হু, আপনি তো হাসাবেনই, কিন্তু নিজে একবার ওদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে দেখুন না। ওরা একেবারে তিরিক্ষি হয়ে আছে। এরকম তো চলতে পারে না। মুখের একটা কথাও বের করতে পারবেন না।" রাগে ভানিয়ুশা এক বালতি জলই চৌকাঠের উপর ঢেলে দিল। "যাই বলুন, ওরা মোটেই রুশদের মত নয়।"

"গ্রাম-প্রধানের সঙ্গে কথা বল।"

"কিন্তু সে কোথায় থাকে আমি জানি না," ভানিয়ুশা আহত গলায় বলল।

চারদিকে তাকিয়ে ওলেনিন শুধাল, "কে তোমাকে এভাবে খচিয়ে দিয়েছে?"

"তা শুধু শয়তানই জানে! ফুঃ! এখানে মনিব বলে কেউ নেই। সকলে বলছে, সে নাকি কোথায় কোন্ "ক্রিগা"য় (মাছ ধরার ঘেরা জায়গা) গেছে, আর বুড়িটা তো সাক্ষাৎ শয়তানী। ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন!" দুই হাত মাথায় তুলে ভানিয়ুশা জবাব দিল। "এখানে যে কি করে থাকব জানি না। ওরা তো তাতারদের চাইতেও খারাপ—অথচ নিজেদের বলে খৃস্টান! একটা তাতার যথেষ্ট খারাপ, কিন্তু তবু সে মহান। ক্রিগায়ই গেছে বটে! এই ক্রিগাটা যে কি বস্তু তাও জানি না" কথা শেষ করে ভানিয়ুশা মুখ ফেরাল।

ঘোড়া থেকে না নেমেই ওলেনিন বলল, "এ যে দেখছি বাড়ির চাকরদের বাসার মতও নয়।"

ভানিয়ুশা যেন ভাগ্যকে মেনে নিয়েই বলল, "ঘোড়াটা ধরব কি?"

ঘোড়া থেকে নেমে জিনের উপর একটা থাপ্পড় মেরে ওলেনিন বলল, "তাহলে তাতারই মহান, কি বল ভানিয়ুশা?"

"আপনি তো হাসবেনই! আপনার তো মজা লাগবেই," ভানিয়ুশা রেগে বিড়বিড় করে বলল।

ওলেনিন তবু হেসে বলল, "শোন ভানিয়ুশা, রাগ করো না। এক মিনিট সবুর কর, আমি গিয়ে বাড়ির লোকজনের সঙ্গে কথা বলছি। দেখো, আমি সব ব্যবস্থা করে ফেলব। তুমি জান না, এখানে আমরা কী মজায় কাটাব। শুধু খচে যেয়ো না।"

ভানিয়ুশা কোন জবাব দিল না। ভুরু কুঁচকে তাচ্ছিল্যভরে মনিবের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। ভানিয়ুশা ওলেনিনকে মনিব বলেই মানে, ওলেনিনও ভানিয়ুশাকে ভৃত্য বলেই জানে। তবু কেউ যদি তাদের বলে দেয় যে তারা দুজন বন্ধু তাহলে তারা অবাক হয়ে যাবে, যদিও নিজেদের অজ্ঞাতেই তারা বন্ধুই হয়ে গেছে। ভানিয়ুশা যখন মনিবের বাড়ি এসেছিল তখন তার বয়স ছিল এগারো, আর ওলেনিন ছিল তার সমবয়সী। ওলেনিনের বয়স যখন পনেরো তখন কিছুদিন সে ভানিয়ুশাকে লেখাপড়া শিখিয়েছিল, ফরাসী ভাষাও শিখিয়েছিল; পরবর্তীকালে তা নিয়ে ভানিয়ুশার গর্বের অন্ত নেই; এখনও মেজাজ ভাল থাকলে তার মুখ থেকে ফরাসী কথা বেরিয়ে যায়, আর তখনই সে বোকার মত হাসতে থাকে।

বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে ছুটে গিয়ে ওলেনিন কুটিরের দরজাটা একধাক্কায় খুলে ফেলল। যেমন সকলেই বাড়িতে পরে সেই রকম একটিমাত্র গোলাপী ফ্রক পরেছিল বলে মারিয়াংকা সভয়ে একলাফে দেয়ালের সঙ্গে লেপ্টে দাঁড়িয়ে চওড়া আস্তিন দিয়ে মুখের নীচের দিকটা ঢেকে ফেলল। দরজাটা হাট করে খুলেই বারান্দার আধো-অন্ধকারে কসাক তরুণীর লম্বা, সুগঠিত দেহটি ওলেনিনের নজরে পড়ল। যৌবনের ত্বরিত সাগ্রহ কৌতুহলবশত নিজের অজ্ঞাতেই পাতলা ছাপা ফ্রকের ভিতর দিয়ে একটি উদ্ধত নারীদেহ তার চোখের সামনে পরিস্ফুট হয়ে উঠল; দুটি সুন্দর কালো চোখ শিশুসুলভ ত্রাস ও বন্য কৌতুহল নিয়ে তার দিকেই তাকিয়ে আছে।

"তাহলে এই সে। কিন্তু তার মত তো আরও অনেকে থাকতে পারে," এই কথা মনে হতেই সে ভিতরের দরজাটাও খুলে ফেলল।

বুড়ি উলিৎকা-গিন্নিও একটিমাত্র ফ্রক পরে তার দিকে পিছন ফিরে উপুড় হয়ে ঘরে ঝাঁটা দিচ্ছিল।

"তোমার দিনটি ভাল যাক মাগো! আমি বাসার খোঁজে এসেছি," ওলেনিন শুরু করল।

কসাক রমণীটি সেই অবস্থায়ই কঠোর কিন্তু সুন্দর মুখখানি তার দিকে ফেরাল।

"কিসের জন্য এখানে এসেছ শুনি? আমাদের নিয়ে তামাশা করতে, অ্যা? তামাশা করার মজা তোমাকে শিখিয়ে দেব: কালো প্লেগ তোমাকে ধরুক!" জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নবাগতের দিকে তাকিয়ে সে চেঁচিয়ে বলল।

ওলেনিন প্রথমে ভেবেছিল, পথশ্রমে ক্লান্ত, বীর ককেসীয় বাহিনী (সেও তাদেরই একজন) এখানে এসে সর্বত্র, বিশেষ করে যুদ্ধে তাদের সহযোগী কসাকদের কাছে সাদর অভ্যর্থনাই পাবে; তাই এই অভ্যর্থনার নমুনা দেখে সে কিছুটা বিমূঢ় বোধ করল। তবু উপস্থিত বুদ্ধি না হারিয়ে সে বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করল যে সে বাসার জন্য ভাড়া দেবে, কিন্তু বুড়ি তার কথা

কানেই নিল না।

"তুমি কেন এসেছ? চাঁছা গালওয়ালা তোমার মত ফড়িংকে কে চায়? একটু সবুর কর; বাড়ির কর্তা ফিরে এলে তোমাকে বিশ্ব-ভুবন দেখিয়ে ছাড়বে। তোমার নোংরা টাকা আমি চাই না! টাকাই বটে! আমরা যেন কোনদিন টাকা দেখি নি! পচা তামাকের গন্ধে বাড়ি ভরে তুলবে, আর টাকা দিয়ে তাকে শুদ্ধি করতে চাও! তোমার মত ফড়িং বুঝি আগে কখনও দেখি নি! তোমার বুকে-পেটে গুলি লাগুক!" বুড়ি গিন্নি সমানে তারস্বরে চেঁচাতে লাগল; ওলেনিনকে কথা বলার সুযোগই দিল না।

ওলেনিন ভাবল, "মনে হচ্ছে ভানিয়ুশার কথাই ঠিক! একজন তাতার এর চাইতে ভাল।" উলিৎকা গিন্নির বকুনি খেয়ে সে কুটির থেকে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় দেখল, গোলাপী ফ্রক-পরা মারিয়াংকা সাদা রুমালে চোখ পর্যন্ত ঢেকে হঠাৎ তার পাশ দিয়েই চলে গেল। খালি পায়ে সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নেমে একটু থামল, হাসি-ভরা চোখ ফিরিয়ে যুবকটিকে একবার দেখেই কুটিরের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তার যৌবনদৃপ্ত পদক্ষেপ, সাদা রুমালের নীচ থেকে চিকচিক-করা তার চোখের অবাধ্য চাউনি, আর ছোট্ট সুগঠিত দেহ ওলেনিনকে আগের চাইতেও বেশী জোরে নাড়া দিল।

ভাবল, "হ্যাঁ, এই সে;" বাসার ব্যাপার নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে ভানিয়ুশার দিকে যেতে যেতে সে বারবার মারিয়াংকার দিকেই ফিরে তাকাতে লাগল।

"দেখছেন কি, ও মেয়ে অন্যদের মতই বন্য, ঠিক যেন বুনো ঘোড়া!" ভানিয়ুশা বলল। তখনও পোটলা-পুটলি নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও তার মেজাজ কিছুটা খোশ হয়েছে। "আচ্ছা মেয়ে!" সগর্বে কথাটা বলেই সে হো-হো করে হেসে উঠল।

অধ্যায়—১১

বাড়ির কর্তা সন্ধ্যার দিকে মাছ ধরে ফিরে এল। শিক্ষার্থীটির কাছে যখন জানতে পারল যে বাসার দরুন ভাড়া পাওয়া যাবে তখন সে গিন্নিকে শান্ত করে ভানিয়ুশার দাবী মিটিয়ে দিল।

সবগুলি নতুন বাসার বন্দোবস্তই পাকা হয়ে গেল। বাড়ির অধিবাসীরা শীতকালীন বাসভবনে চলে গেল, আর গ্রীষ্মকালীন কুটিরগুলি শিক্ষার্থীদের ভাড়া দিল মাসে তিন রুবল হিসাবে। ওলেনিন কিছু খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ল। সন্ধ্যানাগাদ ঘুম থেকে উঠে স্নান করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে ডিনার খেল; তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে জানালার ধারে বসে রাস্তার দিকে তাকাল।

এখন অনেকটা ঠাণ্ডা। স্থন্দর বাতাস বইছে। গ্রামের সর্বত্র শান্তি বিরাজিত। সৈন্যরাও সব ব্যবস্থা হয়ে যাওয়ায় চুপচাপ হয়ে গেছে। গরু-মোষ এখনও ঘরে ফেরে নি; লোকজনও কাজ থেকে ফেরে নি।

ওলেনিনের বাসাটা গ্রামের প্রায় শেষ প্রান্তে। তেরেক ছাড়িয়ে বহুদূরে যেদিক থেকে ওলেনিন এসেছে (চেচেন পর্বতমালা অথবা কুমিক প্রান্তরে) সেখান থেকে মাঝে মাঝে বন্দুকের চাপা শব্দ ভেসে আসছে। তিন মাস অস্থায়ী গুপ্ত শিবিরে বাস করার পরে আজ ওলেনিনের খুব ভাল লাগছে। সারা দেহে ও মনে যেন নতুন করে শান্তি ও শক্তি ফিরে পেয়েছে। মস্কোর স্মৃতিকে সে পিছনে ফেলে এসেছে, ঈশ্বর জানেন সে কতদূর! পুরনো জীবন মুছে গেছে, শুরু হয়েছে সম্পূর্ণ নতুন জীবন। আজ পর্যন্ত সেখানে কোন ভুল ভ্রান্তি ঘটে নি। নতুন মানুষদের মধ্যে সেও নতুন; এখন সে নতুন করে স্থনাম অর্জন করতে পারবে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখল, ছেলেরা বাড়ির ছায়ায় লাট্টু ঘোরাচ্ছে; কখনও বা তার নিজের ছোট বাসাটার সামনেই। মাঝে মাঝে পাহাড় ও আকাশের দিকে তাকাচ্ছে; প্রকৃতির গম্ভীর সৌন্দর্য এবং তার স্মৃতি ও স্বপ্ন মিলে-মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। পাহাড়, পাহাড়, আর পাহাড়—তারাই তার সব চিন্তা ও অনুভূতির পশ্চাৎপট।

"লোকটা তার কুকুরকে চুমো খেয়ে বিদায় নিল। সে জগে চুমুক দিল। ...ইয়েরশ্‌কা খুড়ো কুকুরকে চুমো খেল!" যেসব ছেলে জানালার নীচে লাট্টু ঘোরাছিল তারাই পাশের গলির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে বলতে লাগল।

দলবেঁধে পিছন ফিরে ছেলেরা বলতে লাগল, "সে কুকুরকে চুমো খেয়েছে, মদ খাবার জন্য ছোরাটা বিক্রি করে দিয়েছে!"

কথাগুলো বলা হচ্ছে ইয়েরশ্‌কা খুড়োকে দেখে। বন্দুকটা কাঁধে নিয়ে কয়েকটা পাখিকে কোমরের সঙ্গে ঝুলিয়ে সে শিকার অভিযান থেকে ফিরছে।

সজোরে দুই হাত দুলিয়ে রাস্তার দুই পাশের জানালায় তাকাতে তাকাতে সে বলছে, "আমি অন্যায় করে ফেলেছি বাছারা, অন্যায় করে ফেলেছি। কুকুরদের মদ খেতে দিয়েছি; সেটাই তো অন্যায়।" মনে মনে বিরক্ত হলেও বাইরে সেভাব দেখাচ্ছে না।

বুড়ো শিকারীর প্রতি ছেলেদের আচরণ দেখে ওলেনিন বিস্মিত হল; কিন্তু সে আরও বেশী অবাক হল এই লোকটির বুদ্ধিদীপ্ত মুখ ও শক্তিমান শরীরটাকে দেখে যাকে ওরা ইয়েরশ্‌কা খুড়ো বলে ডাকল।

সেও ডাকল, "খুড়ো, এখানে এস, কসাক, এখানে এস।"

জানালায় তাকিয়ে বুড়ো থামল।

ছাঁটা মাথা থেকে ছোট টুপিটা তুলে বলল, "শুভ সন্ধ্যা, ভাল বন্ধু।"

ওলেনিন উত্তরে বলল, "শুভ সন্ধ্যা, ভাল বন্ধু। বাচ্চারা তোমাকে দেখে চেঁচাচ্ছে কেন?"

ইয়েরশ্‌কা খুড়ো জানালার কাছে গেল। "আরে, ওরা বুড়োকে একটু ক্ষেপাচ্ছে। ও কিছু না। আমি ওসব ভালবাসি। বুড়ো খুড়োকে নিয়ে ওদের একটু আমোদ করতে দাও," এমন দৃঢ় সুরেলা গলায় সে কথাগুলি বলল যা বৃদ্ধ ও শ্রদ্ধেয় লোকেরাই বলতে পারে। "আপনি বুঝি সেনাদলের ক্যাপ্টেন?"

"না, আমি একজন শিক্ষার্থী। কিন্তু ঐ পাখিগুলো কোথায় মেরেছ?" ওলেনিন শুধাল।

"এই তিনটে মুরগি শিকার করেছি জঙ্গলের মধ্যে," বুড়ো জবাব দিল; তারপর পিছন ফিরে পাখিগুলো দেখাল। সেগুলি তার কোমরবন্ধ থেকে ঝুলছে; তার কোটটায় রক্ত লেগেছে।

লোকটি শুধাল, "আগে কখনও দেখেন নি? ইচ্ছা হলে এক জোড়া নিতে পারেন! এই নিন।" দুটো পাখি জানালার দিকে তুলে ধরল। "আপনি নিজেও কি শিকারী?"

"তা বটে। এই অভিযানে চারটেকে গুলি করেছি।"

"চারটে? বেশ বড় সংখ্যা!" বুড়ো বিদ্রূপ করে বলল। "মদ খান তো? চিকির খাওয়া অভ্যাস আছে?"

"খাব না কেন? মদ খেতে আমি ভালবাসি।"

"আচ্ছা, আপনি দেখছি বেশ ভাল ছেলে। আমরা কুনাক (ঘনিষ্ঠ বন্ধু যার জন্য সব ত্যাগ করা চলে) হব—তুমি ও আমি," ইয়েরশ্‌কা বলে উঠল।

ওলেনিন বলল, "ভিতরে এস। এক ফোঁটা চিকির হোক।"

বুড়ো বলল, "আমারও তাই ইচ্ছা, কিন্তু তার আগে পাখিগুলো নাও।" বুড়োর মুখ দেখেই বোঝা গেল শিক্ষার্থীটিকে তার ভাল লেগেছে। সে সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরেছে, এর কাছ থেকে বিনা পয়সায় মদ খাওয়া যাবে, আবার মুরগি দুটোও মাঠে মারা যাবে না।"

অচিরেই ইয়েরশকো খুড়োর মূর্তিটি দ্বার-পথে দেখা দিল, আর তখনই ওলেনিন এই লোকটির প্রকাণ্ড আকার ও প্রচণ্ড দেহ সম্পর্কে সচেতন হল; তার একেবারে সাদা চওড়া দাড়িওয়ালা লাল-বাদামী মুখে বার্ধক্য ও পরিশ্রমের অনেক গভীর আঁকিবুকি। তার পা, হাত ও কাঁধের মাংসপেশী-গুলো একজন বুড়ো মানুষের পক্ষে অসাধারণ রকমের বড় ও বিশিষ্ট। মাথার ছোট করে ছাঁটা চুলের নীচে অনেক গভীর ক্ষতের দাগ। মোটা পেশীবহুল গলায় ষাঁড়ের মত অনেক গভীর ভাঁজ। শক্ত হাতের অনেক জায়গা ছড়ে গেছে, কেটে গেছে। হাল্কা পায়ে সহজভাবে চৌকাঠ ডিঙিয়ে বন্দুকটাকে

ঘরের কোণে রেখে দিল ; চারদিকে চোখ বুলিয়ে সবকিছু দেখে নিয়ে ঘরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল। সঙ্গে নিয়ে এল চিকির, ভদ্‌কা, বারুদ ও জমাট রক্তের গন্ধ ; গন্ধটা কড়া হলেও একেবারে মন্দ নয়।

ইয়েরশ্‌কা খুড়ো দেবমূর্তিগুলির সামনে মাথা নোয়াল, দাড়িতে হাত বুলাল, তারপর ওলেনিনের দিকে এগিয়ে মোটা বাদামী হাতখানা এগিয়ে দিল। বলল "'কোশ্‌কিল্‌দি।' এটা শুভ কামনার তাতার প্রতিশব্দ—তাদের ভাষায় এর অর্থ 'তুমি শান্তিলাভ কর।"

করমর্দন করে ওলেনিন বলল, "কোশ্‌কিল্‌দি! আমি জানি।"

তিরস্কারের ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে ইয়েরশ্‌কা খুড়ো বলল, "না, তুমি জান না, ঠিক-ঠিক জান না। কেউ যদি বলে 'কোশ্‌কিল্‌দি,' তাহলে তুমি উত্তরে বলবে 'আল্লা রসি বো স্থন,' অর্থাৎ 'ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন।' এটাই হল ঠিক জবাব, বুঝলে চাঁদ, 'কোশ্‌কিল্‌দি' নয়। কিন্তু আমি তোমাকে সব শিখিয়ে দেব। এখানে একজন ছিল, নাম ইলিয়া মোসিক, তোমাদেরই মত রুশ, সে আর আমি ছিলাম কুনাক। খুব ভাল লোক ছিল! মাতাল, চোর, শিকারী—আর সে কী শিকারী! আমি তাকে সব শিখিয়েছিলাম।"

লোকটির প্রতি ওলেনিনের আগ্রহ ক্রমেই বাড়ছে। শুধাল, "তুমি আমাকে কি শেখাবে?"

"তোমাকে শিকারে নিয়ে যাব, মাছ ধরতে শেখাব। চেচেনদের চেনাব, তোমার জন্য একটি মেয়ে খুঁজে দেব, তুমি যদি চাও তো—তাও! আমি ঐ রকমই! একটা ভাঁড়!—" বলেই বুড়ো হেসে উঠল। "বসছি। বড়ই ক্লান্ত। 'কার্গা'?" সে জিজ্ঞাসা করল।

ওলেনিন পাল্টা শুধাল, "কার্গা মানে কি?"

"কেন, জর্জীয় ভাষায় এর অর্থ ঠিক আছে।' কিন্তু আমি এমনিতেই বলি। এটা আমার অভ্যাস, কথাটা আমার প্রিয়। কার্গা, কার্গা। এমনিতেই বলি, একটু মজা পাই আর কি। আরে বাবা, চিকির বোলাও। তোমার তো একটি আর্দালি আছে, তাই না? হে আইভান!" বুড়ো চেঁচিয়ে ডাকল। "তোমাদের সব সৈনিকরাই তো আইভান। তোমারটিও আইভান তো?"

"ঠিক ধরেছ, তার নামও আইভান—ভানিয়ুশা। এই যে ভানিয়ুশা! বাড়িওলীর কাছ থেকে আমাদের জন্য খানিকটা চিকির নিয়ে এস তো।"

"আইভান আর ভানিয়ুশা, ও একই কথা। তোমাদের সব সৈনিকরাই আইভান হয় কেন বল তো? দেখ আইভান বুড়ো, ওদের বলো যে পিপেটা নতুন খুলেছে তার থেকে যেন দেয়। এ গাঁয়ে এদের চিকিরই সব চাইতে ভাল! কিন্তু খবরদার, ত্রিশ কোপেকের বেশী দিও না যেন, ডাইনি বুড়িটা তাতেই খুশি হবে।..." ভানিয়ুশা বেরিয়ে গেলে ইয়েরশ্‌কা খুড়ো কথায়

ঘনিষ্ঠতার সুর এনে বলতে লাগল, "আমাদের লোকগুলো একেবারে হতচ্ছাড়া! তারা তোমাদের মানুষ বলেই গণ্য করে না; তাদের চোখে তোমরা তাতারদের চাইতেও খারাপ; বলে, 'রুশরা বড় বেশী সংসারী!' কিন্তু আমার কাছে, সৈনিক হলেও তুমি মানুষ, তোমারও প্রাণ আছে। ঠিক কি না? ইলিয়া মাসিকও তো সৈনিক ছিল, কিন্তু কী সোনার মানুষই সে ছিল! তাই নয় কি বন্ধু? এইজন্যই আমার লোকরা আমাকে পছন্দ করে না; কিন্তু আমি গ্রাহ্য করি না। আমি ফুর্তিবাজ মানুষ, সকলকেই পছন্দ করি। আমি ইয়েরশ্‌কা; হ্যাঁ বন্ধু।"

বুড়ো কসাক যুবকটির কাঁধে সাদরে চাপড় দিতে লাগল।

অধ্যায়—১২

ইতিমধ্যে ভানিয়ুশা গৃহস্থালির কাজকর্ম শেষ করে ফেলেছে; এমন কি কোম্পানির নাপিতকে দিয়ে দাড়িও কামিয়ে নিয়েছে; উঁচু বুট থেকে ট্রাউজারকে এমনভাবে টেনে তুলেছে যাতে বোঝা যায় যে কোম্পানি এখানে বেশ আরামেই আছে। ফলে তার মেজাজও বেশ ভালই আছে। সে এমনভাবে ইয়েরশ্‌কার দিকে তাকাল যেন একটা বুনো পশুকে দেখছে, মেঝের যে জায়গাটা বুড়ো নোংরা করেছে সেদিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল, তারপর বেঞ্চির তলা থেকে দুটো বোতল তুলে নিয়ে বাড়িওলীর কাছে চলে গেল।

খুব ভদ্র ব্যবহার করবে বলে স্থির করেই গেল। বলল, "শুভ সন্ধ্যা গো ভালমানুষ। মনিব তোমার কাছে পাঠালেন খানিকটা চিকিরের জন্য। কিছুটা ঢেলে দেবে কি?"

বুড়ি জবাব দিল না। একটা ছোট তাতার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মেয়েটি মাথায় রুমাল বাঁধছিল। মুখ ফিরিয়ে সে নীরবে ভানিয়ুশার দিকে তাকাল।

পকেটের মধ্যে রুবলের শব্দ করে ভানিয়ুশা বলল, "দাম দেব গো মাননীয়া। আমাদের প্রতি সদয় হও, আমরাও তোমাদের প্রতি সদয় থাকব।"

বুড়ি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, "কতটা চাই?"

"এক পাঁইট।"

উলিৎকা গিন্নি মেয়েকে বলল, "যাও তো লক্ষ্মী, কিছুটা নিয়ে এস। যে পিপেটা নতুন খোলা হয়েছে তার থেকে নিও সোনা।"

চাবি ও পাত্র নিয়ে ভানিয়ুশাকে সঙ্গে করে মেয়েটি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

মারিয়াংকাকে জানালার পাশ দিয়ে যেতে দেখে ওলেনিন শুধাল, "ওই মেয়েটি কে বল তো?" ইয়েরশ্‌কা খুড়ো চোখ টিপে যুবকটিকে কনুই দিয়ে একটা খোঁচা মারল।

"একটু সবুর কর," বলে সে জানালার কাছে গেল: "আহেম," বলে কেশে হাঁক দিল, "লক্ষ্মী মারিয়াংকা। ছল্লো সোনা মেয়ে মারিয়াংকা, তুমি কি আমাকে ভালবাস না? আমি তো ভাঁড়," শেষের কথাটা সে ফিস্‌ফিস্ করে ওলেনিনকে বলল।

মেয়েটি মুখ না ফিরিয়েই দুই হাত সজোরে দোলাতে দোলাতে সুন্দরী সাহসিকা কসাক রমণীর বিশেষ ভঙ্গীমায় জানালার পাশ দিয়ে যেতে যেতে ঘন কালো চোখ তুলে শুধু বুড়োটির দিকে তাকাল।

"আরে, ভালবেসেই দেখ, সুখ পাবে," বলেই চোখ টিপে ইয়েরশ্‌কা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে শিক্ষার্থীর দিকে তাকাল। বলল, "আমি লোক ভাল, আমি যে ভাঁড়! আর ঐ মেয়ে তো একেবারে রাণী। কি বল?"

ওলেনিন বলল, "সত্যি মনোরমা। ওকে ডাক এখানে "

বুড়ো বলল, "না, না। ওর তো লুকাশ্‌কার সঙ্গে বিয়ে হবে। খুব ভাল কসাক ছেলে, সাহসী, এই তো সেদিন একজন এব্রেককে মেরেছে। তোমার জন্ত আরও ভাল মেয়ে দেখে দেব সে মেয়ে রেশম ও রূপোয় গা মুড়ে আসবে। একবার যখন বলেছি, তখন ঠিক তা করব। একটি সত্যি-কারের সুন্দরী এনে দেব তোমাকে।"

ওলেনিন বলল, "তুমি বুড়ো মানুষ—তাই এসব কথা বলছ। আরে, এ তো পাপ!"

"পাপ? কিসের পাপ?" বুড়ো বেশ জোর দিয়ে বলে উঠল। "সুন্দরী মেয়ের দিকে তাকানো পাপ? তার সঙ্গে একটু মজা করা পাপ? বা, তাকে ভালবাসা পাপ? তোমাদের দেশে তাই হয় বুঝি?… না বন্ধু, এ পাপ নয়, এ তো মুক্তি! ঈশ্বর তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, মেয়েটিকেও সৃষ্টি করেছেন। সবই তাঁর সৃষ্টি; কাজেই একটি সুন্দরী মেয়ের দিকে তাকানো পাপ নয়। ভালবাসা পাবে, লোককে আনন্দ দেবে—এইজন্যই তো তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আমি তো এইভাবেই বিচার করি বন্ধু।"

উঠোন পেরিয়ে মারিয়াংকা পিপে-ভর্তি একটা অন্ধকার, ঠাণ্ডা ভাঁড়ার ঘরে ঢুকল; যথারীতি প্রার্থনা করে একটা পিপের মধ্যে একটা হাতা ডুবিয়ে দিল। দরজায় দাঁড়িয়ে ভানিয়ুশা তার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগল। তার পরনে একটিমাত্র ফ্রক, তাও বেশ আঁটো-শাটো, আবার গলায় একটা রূপোর মুদ্রার নেকলেস। তার মনে হল, রুশরা কখনও এরকম পোশাক পরে না; দেশে ভূমিদাসদের বাসায় কোন মেয়েকে এ বেশে দেখলে হাসাহাসি পড়ে যেত। "ব্যাপারটা মনিবকে বলতে হবে," সে ভাবল।

মেয়েটি হঠাৎ চীৎকার করে বলল, "তুমি আবার আলোয় দাঁড়িয়ে আছ কেন, ব্যাটা শয়তান! পাত্রটা আমার হাতে দাও!"

ঠাণ্ডা লাল মদে পাত্রটা ভরে মারিয়াংকা সেটা ভানিয়ুশার হাতে দিল। তার টাকাশুদ্ধ হাতটা ঠেলে দিয়ে বলল, "টাকাটা যাকে দিও।"

ভানিয়ুশা হেসে উঠল। "তুমি রাগ করছ কেন লক্ষ্মীটি?"

মেয়েটিও হেসে উঠল।

"তুমি! তুমি সত্যি ভাল?"

ভানিয়ুশা জবাব দিল, "আমরা, মনিব ও আমি, দুজনই ভাল মানুষ। আমরা যেখানেই থেকেছি সেখানেই বাড়ির লোকরা কৃতজ্ঞ বোধ করেছে। তার কারণ তিনি খুব ভাল লোক।"

মেয়েটি দাঁড়িয়ে শুনল।

"আর তোমার মনিব কি বিবাহিত?" সে শুধাল।

"না, মনিব যুবক ও অবিবাহিত, কারণ ভদ্দর লোকরা অল্প বয়সে বিয়ে করে না," ভানিয়ুশা জ্ঞান দেবার ভঙ্গীতে বলল।

"অল্প বয়স! ওই ষাঁড়ের মত মোটা লোকটার এখনও বিয়ের বয়স হয় নি! উনি বুঝি তোমাদের বড় কর্তা?" মেয়েটি শুধাল।

"আমার মনিব একজন শিক্ষার্থী; তার মানে এখনও অফিসার হন নি, কিন্তু একজন জেনারেলের চাইতে বড়—বেশ ভারিক্কী লোক! আমাদের কর্ণেল, এমন কি জারও তাকে চেনেন।" ভানিয়ুশা সগর্বে বলতে লাগল। "রেজিমেণ্টের অন্য হ্যাংলাদের মত লোক নই আমরা; ওর বাবা একজন সেনেটর ছিলেন। তার এক হাজারের বেশী ভূমিদাস ছিল, আর তারা আমাদের একবারে হাজার রুবল পাঠায়। সেজন্য সকলেই আমাদের পছন্দ করে। অন্য একজন ক্যাপ্টেন হতে পারে, কিন্তু তার টাকা নেই। তাতে আর কি লাভ বল?"

তাকে বাধা দিয়ে মেয়েটি বলল, "এবার যাও, আমি তালা দেব।"

ওলেনিনকে মদটা দিয়ে ভানিয়ুশা বলল, "La fille c' esttres Jolie" তারপরই বোকার মত হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল।

অধ্যায়—১৩

ইতিমধ্যে গ্রামের স্কোয়ারে উৎসবের বাজনা বেজে উঠেছে। লোকজন সব কাজ থেকে ফিরেছে। সোনালী ধুলোর মেঘ উড়িয়ে গরুষ-মোষ এসে ফটকে হাজির হয়েছে। মেয়েছেলেরা সব উঠোনে ও রাস্তায় ছুটাছুটি করছে। দূরের বরফ-ঢাকা পাহাড়-চূড়ার আড়ালে সূর্য ঢাকা পড়েছে। আকাশে ও

মাটিতে ছড়িয়ে পড়েছে একটা ম্লান নীলাভ ছায়া। অন্ধকার বাগানের মাথার উপরে অস্পষ্ট তারাগুলি জ্বলছে, গ্রামের হৈ-চৈ ক্রমেই শান্ত হয়ে আসছে। মেয়েরা সব সূর্যমুখীর বীচি চিবুতে চিবুতে রাস্তার মোড়ে এসে বাড়ির দাওয়ায় বসে পড়েছে। একটু পরে একটা মোষ ও দুটো গরুর দুধ দুয়ে মারিয়াংকা একটা দলে এসে ভিড়ে গেল। সে দলে মেয়েদের সঙ্গে একটি বুড়ো কসাকও ছিল। যে এব্রেকটিকে মারা হয়েছে তার সম্পর্কেই কথা হচ্ছিল। কসাকটি বলছে আর মেয়েরা নানা প্রশ্ন করছে।

একজন বলল, "সে নিশ্চয় একটা ভাল পুরস্কার পাবে।"

"অবশ্যই। শুনছি, তাকে একটা ক্রুশ দেওয়া হবে।"

"মোসেভ যদিও তার প্রতি অন্যায় করতে চেষ্টা করছে। তার বন্দুকটা নিয়ে নিয়েছে; কিন্তু কিজ্‌লিয়ারের কর্তৃপক্ষ সেকথা জেনে ফেলেছে।"

"মোসেভটা খুব ছোট লোক।"

একটি মেয়ে বলল, "শুনলাম লুকাশ্‌কা বাড়ি এসেছে।"

"সে আর নাজার্কা ইয়াম্‌কার বাড়িতে মজা করছে। (ইয়াম্‌কা একটি অবিবাহিত কুখ্যাত স্ত্রীলোক; সে একটা মদের দোকান চালায়।) লোকে বলছে, তারা নাকি আধ বালতি টেনেছে।"

আর একজন বলল, "উরুভানটির কী কপাল! কিন্তু একথা তো অস্বীকার করার জো নেই যে খুব ভাল ছেলে, যেকোন কাজের উপযুক্ত, মনটাও ভাল! ওর বাবাও ঐরকম ছিল, কিরিয়াক খুড়োর কথা বলছি; বাপ্‌কা বেটাই হয়েছে। সে যখন মারা গেল তখন গোটা গ্রামের মানুষ কেঁদেছিল।" একদল কসাক রাস্তা দিয়ে তাদের দিকেই আসছে; তাদের দেখিয়ে বলল, "দেখ, ওরা আসছে। আর ইয়েরুগুশভও কেমন ওদের দলে ভিড়ে গেছে। ব্যাটা মাতাল!"

লুকাশ্‌কা, নাজার্কা ও ইয়েরগুশভ আধ বালতি ভদ্‌কা শেষ করে মেয়েদের কাছে আসছে। তিনজনেরই মুখ, বিশেষ করে বুড়ো কসাকটির, অস্বাভাবিক লাল হয়ে উঠেছে। ইয়েরুগুশভ টলছে আর হাসতে হাসতে বার বার নাজার্কার পাঁজড়ায় খোঁচা মারছে।

চেঁচিয়ে মেয়েদের বলল, "তোমরা গাইছ না কেন? আমি বলছি, আমাদের ফুর্তির দিনে তোমরা গাও।"

"শুভদিন! শুভদিন!" বলে সকলকে অভ্যর্থনা জানানো হল।

একটি স্ত্রীলোক বলল, "আমরা গাইব কেন? আজ তো ছুটির দিন নয়। তোমরা মাতাল হয়েছ, তোমরাই গাও গে।"

ইয়েরগুশভ হো-হো করে হেসে উঠে নাজার্কার পেটে খোঁচা মারল। "তুমি বরং গান ধর। আমিও ধরছি। আমি ভাল গাইতে পারি। আমি বলছি!"

নাজার্কা বলল, "কী, আমার সুন্দরীরা ঘুমতে চলে গেছে ? আর আমরা রক্ষী-বেষ্টনী থেকে এলাম উৎসব করতে। ইতিমধ্যেই আমরা লুকাশ্কার স্বাস্থ্য পান করেছি।"

লুকাশ্কা এগিয়ে এসে ধীরে ধীরে টুপিটা খুলে মেয়েদের সামনে থামল। তার চওড়া চোয়াল ও গলা লাল হয়ে উঠেছে। নরম, গম্ভীর গলায় সে কথা বলতে লাগল, কিন্তু তার এই প্রশান্তি ও গাম্ভীর্য নাজার্কার বক্‌বকানি ও হৈ-হল্লার তুলনায় অনেক বেশী প্রাণবন্ত ও শক্তিশালী।

মারিয়াংকা যখন দলে এসে মিশল লুকাশ্কা তখন টুপিটা তুলে তাকে পথ করে দিল, এবং একটা পা ঈষৎ সামনে এগিয়ে বুড়ো আঙুলটা দিয়ে কোমরবন্ধের ছোরাটাকে নাড়াতে নাড়াতে মারিয়াংকার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। আস্তে মাথাটা নুইয়ে মারিয়াংকা প্রতি-অভিবাদন জানিয়ে দাওয়ায় বসে পড়ে ফ্রকের ভিতর থেকে কিছু বীচি বের করে নিল। লুকাশ্কা তার উপর স্থির দৃষ্টি রেখে ধীরে ধীরে বীচিগুলি ভেঙে খোসাগুলি থু-থু করে ফেলে দিতে লাগল। মারিয়াংকা আসতেই সকলে চুপ হয়ে গেল।

নিস্তব্ধতা ভেঙে একজন শুধাল, "তুমি কি বেশকিছুদিন থাকবে ?"

"কাল সকাল পর্যন্ত," লুকাশ্কা গম্ভীরভাবে জবাব দিল।

বুড়ো কসাক বলল, "ভাল, ঈশ্বর তোমাকে সৌভাগ্য দান করুন। তোমার জন্য আমি খুব খুশি, সেই কথাই বলছিলাম।"

মাতাল ইয়েরগুশভ হাসতে হাসতে বলল, "আমিও তাই বলছি। কত অতিথিকে আমরা পেয়েছি," একটি সৈনিককে যেতে দেখে সে বলল। "সৈনিকদের ভদ্‌কা ভাল—আমার খুব পছন্দ।"

একটি স্ত্রীলোক বলল, "তিনটে শয়তানকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছে। বুড়ো-দাদু গ্রাম-প্রধানদের কাছে গিয়েছিল, কিন্তু তারা বলেছে কিছুই করার নেই।"

"আহা! তোমাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে কি ?" ইয়েরগুশভ বলল।

আর একটি স্ত্রীলোক বলল, "আশা করি তামাক খাইয়েই তারা তোমাকে কাৎ করেছে ? উঠোনে বসে যত খুশি তামাক খাও, কিন্তু ঘরের মধ্যে খেতে দেব না। না, স্বয়ং গ্রাম-প্রধান এলেও না; তা হতে দেব না। তাছাড়া, তারা তোমার সব কিছু লুটে নিতে পারে। সে তো নিজে কাউকে বাসায় থাকতে দেয় নি, তাই তার কোন ভয় নেই; গ্রাম-প্রধানটা শয়তানের বাচ্চা।"

"তোমার এসব পছন্দ নয়, না ?" ইয়েরগুশভ আবার শুরু করল।

নাজার্কাও লুকাশ্কার মতই এক পা এগিয়ে টুপিটা নাচাতে নাচাতে বলল, "আমিও শুনেছি, মেয়েদের সৈনিকদের বিছানা করে দিতে হবে, তাদের চিকির ও মধু দিতে হবে।"

ইয়েরগুশভ হো-হো করে হেসে কাছের মেয়েটিকে ধরে আলিঙ্গন করল।

"আমিও বলছি, ঠিক কথা।"

মেয়েটি কর্কশ গলায় বলল, "তবে রে হতচ্ছাড়া! তোমার বুড়িকে সব বলে দেব।"

সেও চীৎকার করে বলল, "তা বলে দিও। নাজার্কা ঠিকই বলেছে; একটা ইস্তাহার বিলি করা হয়েছে। সে তো পড়তে পারে। তাই ঠিকই বলেছে।" সে আর একটি মেয়েকে ধরে আলিঙ্গন করল।

হাসতে হাসতে হাত তুলে তাকে মারতে গিয়ে গোল-মুখ, গোলাপী উস্তেংকা কড়া গলায় বলল, "কদ্দূর এগিয়েছ জানোয়ার?"

কসাক সরে গেল, প্রায় পড়েই যাচ্ছিল। "আরে, লোকে বলে মেয়েরা অবলা, আর তুমি তো আমাকে প্রায় মেরেই ফেলছিলে।"

"দূর হয়ে যাও হতচ্ছাড়া! কেন রক্ষী-বেষ্টনী থেকে চলে এলে?" কথা বলেই উস্তেংকা মুখ ঘুরিয়ে আবারও হেসে উঠল। "তুমি তো ঘুমিয়েছিলে, তাই এব্রেককে দেখতে পাও নি, তাই না? ধর, সে যদি তোমাকে সাবাড় করে দিত, তাহলেই আরও ভাল হত।"

নাজার্কা হেসে বলল, "আশা করি তুমি সোরগোল তুলেছিলে।"

"সোরগোল! সেটাই সম্ভব।"

"দেখ নাজার্কা, ও এসব গ্রাহ্য করে না। ও হলেও সোরগোল তুলত, তাই না?" ইয়েরুগুশভ বলল।

লুকাশ্‌কা এতক্ষণ ধরে নীরবে মারিয়াংকার দিকেই তাকিয়ে আছে। তাতে মেয়েটি বিব্রতবোধ করল। আরও কাছে গিয়ে লুকাশ্‌কা বলল, "আচ্ছা মারিয়াংকা, শুনলাম একজন সেনাপতিকে ওরা তোমাদের বাড়িতে বাসা দিয়েছে?"

মারিয়াংকা ধীরে ধীরে চোখ তুলে কসাকদের দিকে তাকাল। লুকাশ্‌কার চোখ দুটি হাসছে; যেন তার কথার বাইরেও তার ও মেয়েটির মধ্যে একটা কিছু ঘটে চলেছে।

মারিয়াংকার পক্ষ হয়ে একটি বুড়ি জবাব দিল, "হ্যাঁ, তারা ঠিকই করেছে, ওদের তো দুটো বাড়ি আছে; কিন্তু ফোমুশ্‌কিনদের কথা ভাব, তাদের ঘাড়েও একজন কর্তাব্যক্তিকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে; তারা বলছে, বাড়ির একটা দিক মালপত্রে একেবারে ঠাসা, অথচ বাড়ির লোকদের যাবার মত কোন ঠাঁই নেই। এরকম কথা কেউ কখনও শুনেছে? এভাবে একটা গোটা দলকে একটা গ্রামের মধ্যে ছেড়ে দিয়েছে? আর এখানে থেকে তারা কোন্ কর্মটাই বা করবে?"

একটি মেয়ে বলল, "শুনেছি, তেরেকের উপর তারা একটা সেতু বানাবে।"

উস্তেংকার দিকে এগিয়ে নাজার্কা বলল, "আর আমি শুনেছি, মেয়েদের

পুঁতে ফেলবার জন্য তারা একটা গর্ত খুঁড়বে, কারণ তারা ছেলেগুলোকে ভালবাসে না ;" সে আবার এমন একটা অঙ্গ-ভঙ্গী করল যে সকলেই হেসে উঠল ; আর ইয়েরুশকা পাশের মেয়েটিকে পেরিয়ে এবার একটি বুড়িকে আলিঙ্গন করল।

নাজার্কা বলল, "মারিয়াংকাকে জড়িয়ে ধরছ না কেন ? সে তো পাশেই রয়েছে।"

"না, আমার বুড়িই বেশী মিষ্টি," বলে কসাকটি জোর করে বুড়িকে চুমো খেতে শুরু করল।

বুড়ি হেসে বলল, "আরে, তুমি যে আমাকে গলা টিপেই মেরে ফেলবে দেখছি ।"

রাস্তার অপর প্রান্তে তালে তালে পা ফেলার শব্দে তাদের হাসিতে বাধা পড়ল। জোব্বা-পরা তিনটি সৈনিক কাঁধে বন্দুক নিয়ে তালে তালে পা ফেলে চলেছে বারুদের গাড়ির পাহারা বদলি করতে।

কর্পোরালটি অশ্বারোহী বাহিনীর প্রবীণ লোক। ক্রুদ্ধ চোখে কসাকদের দিকে তাকিয়ে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়ানো লুকাশ্‌কা ও নাজার্কার দিকে এমনভাবে সৈনিকদের চালিয়ে নিয়ে এল যাতে তাদের দুজনকেই জায়গা ছেড়ে সরে যেতে হয়। নাজার্কা সরে গেল, কিন্তু লুকাশ্‌কা ভুরু কুঁচকে পিছন ফিরে দাঁড়াল, জায়গা থেকে সরল না। মাথাটা অর্ধেক ঘুরিয়ে সৈন্যদের দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "এখানে লোকজন দাঁড়িয়ে আছে, কাজেই তোমরা একটু ঘরে যাও।" সৈন্যরা নিঃশব্দ পায়ে পা মিলিয়ে চলে গেল। মারিয়াংকা হাসতে শুরু করল ; অন্য মেয়েরাও সে হাসিতে যোগ দিল।

নাজার্কা বলল, "কী ভুঁড়ি ! ঠিক একদল পুরুতের মত !" সৈন্যদের নকল করে সে কয়েক পা হেঁটে গেল। সকলে হো-হো করে হেসে উঠল।

লুকাশ্‌কা ধীরে ধীরে মারিয়াংকার কাছে গেল। শুধাল, "সে কর্তা-ব্যক্তিটিকে কোথায় রেখেছ ?"

মারিয়াংকা একটু ভাবল। বলল, "তাকে নতুন কুটিরটা দিয়েছি।"

তার পাশে বসে লুকাশ্‌কা শুধাল, "সে কি বৃদ্ধ, না যুবক ?"

মেয়েটি বলল, "আমি কি সেকথা শুধিয়েছি না কি ? চিকির আনতে যাচ্ছিলাম, দেখলাম ইয়েরশ্‌কা খুড়োর সঙ্গে জানালার ধারে বসে আছে। মনে হল মাথার চুল লাল। এক গাড়ি বোঝাই মালপত্র এনেছে।" বলে সে চোখ নামাল।

মেয়েটির আরও কাছে ঘেঁসে সোজা তার চোখের দিকে তাকিয়ে লুকাশ্‌কা বলল, "রক্ষী-বাহিনী থেকে চলে আসতে পেরেছি বলে খুব ভাল লাগছে !"

ঈষৎ হেসে মারিয়াংকা শুধাল, "তুমি কি অনেক দিনের জন্য এসেছ?"

"সকাল পর্যন্ত। আমাকে কিছু বীচি দাও," সে হাতটা বাড়াল।

এবার মারিয়াংকা সোজাসুজি হাসল; ফ্রকের গলার ফিতেটা খুলে বলল, "সবগুলি নিও না যেন।"

"তোমাকে ছেড়ে সবসময় এত একা-একা লাগত! সত্যি বলছি," সংযত শান্ত গলায় লুকাশ্কা ফিস্‌ফিস্ করে বলল; মেয়েটির ফ্রকের ভিতর থেকে কিছু বীচি তুলে নিল; আরও কাছে ঘেঁসে হাসি-হাসি চোখে নীচু গলায় তাকে অনেক কথা বলতে লাগল।

"আমি কিন্তু যাব না তা বলে রাখছি," হঠাৎ মারিয়াংকা গলা চড়িয়ে কথাটা বলে সরে বসল।

"সত্যি যাবে না···তোমাকে কিছু বলার ছিল।" লুকাশ্কা নীচু গলায় বলল। "দোহাই তোমার! এস কিন্তু!"

মারিয়াংকা মাথা নাড়ল, কিন্তু হেসে হেসে।

"মারিয়াংকা! মারিয়াংকা! মামণি ডাকছে। খাবার সময় হয়েছে!" মারিয়াংকার ছোট ভাই তাকে ডাকতে ডাকতে ছুটে এল।

মেয়েটি বলল, "যাচ্ছি। লক্ষ্মীভাইটি, তুমি চলে যাও—আমি এক মিনিটের মধ্যেই আসছি।"

লুকাশ্কা উঠে টুপিটা তুলে নিল।

"আমিও বাড়িই যাই, সেটাই ভাল," যেন কিছুই হয় নি এমনি ভাব দেখিয়ে হাসি চেপে লুকাশ্কা বাড়িটার মোড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ততক্ষণ গ্রামের বুকে রাত নেমেছে। কালো আকাশের বুকে উজ্জ্বল তারারা ছড়িয়ে আছে। রাস্তাঘাট অন্ধকার ও জনশূন্য। নাজার্কা মেয়েদের সঙ্গেই থেকে গেল; তাদের হাসি এখনও শোনা যাচ্ছে। লুকাশ্কা কিন্তু ধীর পায়ে মেয়েদের কাছ থেকে সরে এসে হঠাৎ বিড়ালের মত ওৎ পাতল। তার-পর হঠাৎ ছোরাটাকে চেপে ধরে ছুটতে শুরু করল; কিন্তু বাড়ির দিকে না গিয়ে চলল কর্ণেটের বাড়ির দিকে। দুটো রাস্তা পার হয়ে একটা গলিতে পড়ল। কোটের তলাটা তুলে ধরে একটা বেড়ার ছায়ায় মাটির উপর বসে পড়ল। মারিয়াংকার কথাই মনে এল। "খাঁটি কর্ণেটের মেয়ে। একটু হাসি-তামাশাও জানে না—শয়তান। কিন্তু একটু অপেক্ষা কর।"

একটি মেয়ের পায়ের শব্দ কানে এল। কান পেতেই নিজের মনে হেসে উঠল।

মারিয়াংকা মাথাটা নীচু করে জোরে জোরে পা ফেলে তার দিকেই এগিয়ে আসছে। লুকাশ্কা উঠে দাঁড়াল। মারিয়াংকা চমকে থেমে গেল।

"ওঃ, হতভাগা তুমি! কী ভয়ই পাইয়ে দিয়েছিলে! তাহলে বাড়ি যাও নি?" বলেই মারিয়াংকা হো-হো করে হেসে উঠল।

লুকাশ্‌কা একহাতে তাকে জড়িয়ে ধরে আর একহাতে মুখটা তুলে ধরল। "ঈশ্বরের দোহাই, তোমাকে কি যেন বলতে চেয়েছিলাম!" তার কণ্ঠস্বর কাঁপছে।

মারিয়াংকা জবাব দিল, "এই রাতের বেলা কী সব বলছ! মামণি আমার জন্য অপেক্ষা করছে, আর তুমিও বরং তোমার প্রেয়সীর কাছে যাও।" তার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে মারিয়াংকা কয়েক পা ছুটে গেল। বাড়ির বাঁশের বেড়ার কাছে পৌঁছে হঠাৎ থেমে ফিরে তাকাল। কসাকটি তখনও তার পাশে পাশে ছুটছে আর তাকে আরও কিছুক্ষণ থাকতে বলছে পাশে।

"আচ্ছা, তুমি কি কথা বলতে চাও রাতের পাখি?" বলেই মারিয়াংকা হাসতে লাগল।

"হেসো না মারিয়াংকা! ঈশ্বরের দোহাই। আচ্ছা, আমার যদি একটি প্রেয়সী থাকে তাতে হয়েছে কি? সে জাহান্নামে যাক। শুধু একটি কথা বল, তাহলেই আমি তোমাকে ভালবাসব—তুমি যা চাও তাই করব। এটা শোন।" সে পকেটের মধ্যে টাকা বাজাল। "এখন আমরা ভালভাবে বাস করতে পারি। অন্যরা কত মজা করছে, আর আমি? তোমার কাছ থেকে আমি কোন সুখ পাই না মারিয়াংকা সোনা।"

মেয়েটি জবাব দিল না।

হঠাৎ লুকাশ্‌কা দাঁত কিড়মিড় করে ঘুষি পাকাল। "কেন এই প্রতীক্ষা! আমি কি তোমাকে ভালবাসি না নারী! তুমি তো আমাকে নিয়ে যা খুশি তাই করতে পার," রাগে ভুরু কুঁচকে তার দুই হাত চেপে ধরে সে কথাগুলি বলল।

তাতে মারিয়াংকার মুখের শান্ত ভাব, তার শান্ত কণ্ঠস্বরের কোন পরিবর্তন হল না।

নিজের হাতটা টেনে না নিয়ে কসাককে একহাত দূরে রেখে মেয়েটি বলল, "হৈ-চৈ করো না লুকাশ্‌কা। আমার কথা শোন। আমি একটি ছোট মেয়ে একথা ঠিক, তবু আমার কথা শোন। আমি তো কর্তব্য স্থির করতে পারি না, কিন্তু তুমি যদি আমাকে ভালবাস তো তোমাকে একটা কথা বলব। হাত ছেড়ে দাও, এমনিতেই বলছি। আমি তোমাকে বিয়ে করব, কিন্তু কোন বাজে জিনিস আমার কাছ থেকে পাবে না," মুখ না ঘুরিয়েই মারিয়াংকা বলল।

"বিয়ে করবে? বিয়েটা তো আমাদের উপর নির্ভর করে না। আমাকে ভালবাস মারিয়াংকা সোনা," লুকাশ্‌কা বলল। তার রুদ্র মূর্তি আবার শান্ত হল; মৃদু হেসে সে তার চোখে চোখ রাখল। মারিয়াংকা তাকে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটের উপর চুমো খেল। লুকাশ্‌কাকে সবেগে বুকে চেপে ধরে মারিয়াংকা

ফিসফিসিয়ে ডাকল, "সোনা আমার।" তারপরই হঠাৎ নিজেকে সরিয়ে নিয়ে বাড়ির ফটকের দিকে দৌড় দিল ; একবার ফিরেও তাকাল না।

তার কথাগুলি শুনবাব জন্য আর একটি মিনিট অপেক্ষা করতে কসাকটির শত অনুনয় সত্ত্বেও মারিয়াংকা থামল না।

চেঁচিয়ে বলল, "চলে যাও। কেউ দেখে ফেলবে! আমার বিশ্বাস নতুন ভাড়াটেটি উঠোনে চলাফেরা করছে।"

"কর্ণেটের তো মেয়ে," লুকাশ্‌কা ভাবল। "ও আমাকে বিয়ে করবে। বিয়ে খুব ভাল, কিন্তু ও আমাকে কেন ঠিক ভালবাসতে পারে না!"

ইয়াম্‌কার বাড়িতেই সে নাজার্কার দেখা পেল। তার সঙ্গে কিছুক্ষণ মদ খেয়ে গেল দুনাইকার বাড়ি। দুনাইকা তার প্রতি বিশ্বাসঘাতিনী জেনেও তার কাছেই রাতটা কাটাল।

অধ্যায়—১৪

একথা সম্পূর্ণ সত্য যে মারিয়াংকা যখন ফটকে ঢুকছিল তখন ওলেনিন উঠোনে পায়চারি করছিল, আর "নতুন ভাড়াটে" সম্পর্কে যে উক্তি করেছিল তাও সে শুনেছে। সারাটা সন্ধ্যা সে কাটিয়েছে নতুন বাসার বারান্দায় ইয়েরশ্‌কা খুড়োর সঙ্গে। টেবিলে ছিল একটা সামোভার, মদ ও জ্বলন্ত মোমবাতি; এক গ্লাস মদ ও একটা চুরুট খেতে খেতে সে শুনেছে বুড়ো মানুষটির কাহিনী ; পায়ের কাছে চৌকাঠে বসে সে বলছিল তার নিজের কথা। বাতাস শান্ত, মোমবাতিটা কেঁপে কেঁপে জ্বলছে, তার আলো পড়ছে কখনও বারান্দার থামে, কখনও টেবিলে ও কাঁচের বাসনে, কখনও বুড়ো মানুষটির সাদা ছাঁটা ফুলের উপর। আগুনকে ঘিরে ফড়িংগুলো ঘুরছে, তাদের পাখা থেকে ধুলো ঝরছে টেবিলে ও গ্লাসে। সেগুলো কখনও উড়ে যাচ্ছে মোমবাতির শিখার কাছে, কখনও অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে দূরের অন্ধকারে। ওলেনিন ও ইয়েরশ্‌কা পাঁচ বোতল চিকির শেষ করেছে। ইয়েরশ্‌কা একটার পর একটা গ্লাস ভরছে, ওলেনিনকে দিচ্ছে, তার স্বাস্থ্য পান করছে, আর অবিশ্রাম বক্‌বক্‌ করছে। সে বলছে প্রাচীনকালের কসাকদের জীবন-কথা ; তার বাবা "মোটাদা'র কথা—সে একাই তিন হন্দর ওজনের একটা শুয়োরের মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যেত, এক আসনে বসে দুই বালতি চিকির খেতে পারত। আর বলছে কেমন করে একদিন সকালে সে দুটো হরিণ মেরেছিল, আর তার প্রেয়সী রাতের বেলা রক্ষী-বেষ্টনীতে তার কাছে ছুটে যেত। এত সোচ্চারে ও সুন্দরভাবে এই সব কথা সে বলছে যে কখন যে সময় কেটে গেছে ওলেনিন তা খেয়ালই করে নি। "হায় বন্ধু, যৌবনকালে তো তুমি আমাকে দেখ নি ; তখন হলে অনেক খেলই তোমাকে দেখাতে পারতাম।

আজ যা দেখছ এ তো 'ইয়েরশ্‌কার কংকাল' ; কিন্তু তখন গোটা রেজিমেন্টে ইয়েরশ্‌কার কত খ্যাতি। সব চাইতে ভাল ঘোড়া ছিল কার? কার ছিল গুর্দা—বন্দুক? কার সঙ্গে মদ খেয়ে, ফুর্তি করে সুখ ছিল? আজেদ খানকে মারতে কাকে পাঠানো হত পাহাড়ে? আরে, সব এই ইয়েরশ্‌কা। মেয়েরা কাকে ভালবাসত? তার জবাবও ইয়েরশ্‌কাকেই সব সময় দিতে হত। কারণ আমি ছিলাম সত্যিকারে দিঝিগিৎ; মাতাল; চোর; গায়ক; সব কাজেই আমার হাত ছিল পাকা! সেরকম কসাক আজকাল আর দেখা যায় না! তাদের দেখলে আমার দুঃখ হয়। আর আমি? রাজপুত্ররা আসত আমার সঙ্গে দেখা করতে! তারা ছিল আমার কুনাক। আমি সকলেরই কুনাক। সে যদি তাতার হয় তো—তাতারের কুনাক; আর্মেনীয় হয় তো—আর্মেনীয়ের কুনাক; সৈন্য হয় তো—সৈন্যের; অফিসার হয় তো—অফিসারের! সে মাতাল হলেই হল, আর কিছু আমি গ্রাহ্য করতাম না। ওরা বলে, "সংসার থেকে মুক্ত থাক। সৈনিকদের সঙ্গে মদ খেয়ো না, তাতারের সঙ্গে খাবার খেয়ো না।"

"একথা কারা বলে?" ওলেনিন শুধাল।

"কেন, আমাদের পুরুতরা! কিন্তু মোল্লা বা তাতার বিচারকের কথা শোন। সে বলে: 'হে অবিশ্বাসী গিয়াউর, তোমরা কেন শূকর-মাংস খাও?' তাতেই বোঝা যায় প্রত্যেকেরই নিজ নিজ বিধান আছে। কিন্তু আমি মনে করি সবই সমান। মানুষের সুখের জন্যই ঈশ্বর সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। এর কোন কিছুতেই পাপ নেই। একটা জন্তুর কথাই ধর। সে তো তাতার-দের নলবনেও বাঁচে, আবার আমাদের নলবনেও বাঁচে! যেখানে যায় সেখানেই তার ঘর! ঈশ্বর যা দেন তাই সে খায়! কিন্তু আমাদের লোকরা বলে, সেকাজ করলে আমাদের নরকে গিয়ে হাঁড়ি চাটতে হবে। আমি তো মনে করি, এসবই ধোঁকাবাজি।" একটু থেমে সে কথাটা যোগ করল।

"কোন্‌টা ধোঁকাবাজি?" ওলেনিন শুধাল।

"কেন, প্রচারকরা যা বলে বেড়ায়। চেব্‌ভ্‌লেনায়াতে একজন সেনাদলের ক্যাপ্টেন আমার কুনাক ছিল; খুব ভাল মানুষ, ঠিক আমার মত। চেচনিয়াতে তাকে মেরে ফেলে। দেখ, সে বলত, প্রচারকরা এসবই তাদের মাথা থেকে বের করে। সে বলত, "তুমি মরে গেলে তোমার কবরের উপর ঘাস গজাবে; বাস, সেখানেই সব শেষ!" বুড়ো হেসে উঠল। "লোকটি ছিল বেপরোয়া গোছের।"

"তোমার বয়স কত?" ওলেনিন শুধাল।

"সেকথা একমাত্র প্রভুই জানেন! তা বছর সত্তর হবে। একজন জারিনা যখন সিংহাসনে ছিলেন তখন আমি খুব ছোট নয়। তা থেকেই হিসাব করে নাও। সত্তরই হবে, কি বল?"

"হ্যাঁ, তা হবে, কিন্তু এখনও তুমি বেশ ভাল আছ।"

"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি এখনও ভাল আছি, আগাগোড়া ভাল, শুধু একটা মেয়েমানুষই সব ভেস্তে দিল, একটা ডাইনি···"

"ব্যাপার কি ?"

"হ্যাঁ, সেই সব ভেস্তে দিল।"

"তাহলে তুমি যখন মারা যাবে তখন তোমার কবরের উপরেও ঘাস গজাবে ?" ওলেনিন আবার কথাটা বলল।

মনের কথাটা স্পষ্ট করে বলার ইচ্ছা ইয়েরশ্‌কার ছিল না। কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর হাসতে হাসতে খানিকটা মদ ওলেনিনের হাতে দিয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল, "কী ভাবছ ? খেয়ে নাও !"

অধ্যায়—১৫

মনে করবার চেষ্টা করে সে আবার শুরু করল : "আচ্ছা, কি যেন বলছিলাম ? হাঁা, আমি কি রকম মানুষ। আমি একজন শিকারী। রেজিমেণ্টে আমার সমকক্ষ শিকারী আর কেউ নেই। যে কোন জন্তু, যে কোন পাখি খুঁজে এনে তোমাকে দেখাতে পারি। তারা কি করে—কোথায় যায়,—সব আমি জানি! আমার কুকুর আছে, দুটো বন্দুক আছে, জাল আছে, পর্দা আছে, একটা বাজপাখি আছে। প্রভুকে ধন্যবাদ, আমার সব আছে! তুমি যদি সত্যিকারের শিকারী হও, শুধু বাক্যবাগীশ না হও, তো তোমাকে সব দেখাব। তুমি কি জান আমি কী ধরনের মানুষ ? পায়ের ছাপ দেখলেই আমি জন্তুটাকে চিনতে পারি। সে কোথায় শোবে, কোথায় জল খাবে, কোথায় কাদায় গড়াগড়ি যাবে—সব জানি। একটা বাসা বানিয়ে সারা রাত সেখানে পাহারায় থাকি। বাড়িতে বসে থেকে লাভটা কি! শুধুই নিজের ক্ষতি করা, মাতাল হওয়া। তারপরই মেয়েছেলেরা বক্‌বক্‌ শুরু করবে, আর ছোট ছেলেরা আমাকে দেখে চেঁচাতে শুরু করবে। একটা মানুষকে পাগল করে তুলতে সেটাই তো যথেষ্ট।

"তার চাইতে অনেক ভাল ভোরে উঠে বেরিয়ে যাওয়া : পছন্দমত একটা জায়গা বেছে নাও, নল-খাগড়া পেতে বসে পড়, আর ভাল মানুষের মত অপেক্ষা করে থাক। জঙ্গলের মধ্যে কি হয় না হয় সবই তো তুমি জান। আকাশের দিকে তাকাও : তারাদের গতিবিধি লক্ষ্য কর, তারাই বলে দেবে এখন সময় কত। চারদিকে তাকাও—নলবনে সর্‌সর্‌ শব্দ হচ্ছে ; তুমি অপেক্ষা করেই থাক ; হঠাৎ ঝোপের মধ্যে একটা খস্‌খস্‌ আওয়াজ ; তুমি মনে করলে—একটা শুয়োর আসবে কাদায় গড়াগড়ি দিতে। বাচ্চা ঈগলরা কিচিরমিচির করবে, গ্রামে মোরগ ডেকে উঠবে, বা রাজহংসীরা প্যাঁক-প্যাঁক

করে ডাকবে। সে ডাক শুনলেই বুঝতে পারবে এখনও মাঝরাত হয় নি। এ সব কিছুই আমি জানি! অথবা, অনেক দূরে কোথাও একটা গুলির শব্দ শুনলে, আর অমনি তুমি ভাবতে শুরু করলে। কে গুলি করল? তোমার মতই আর একটি কসাক যে শিকারের অপেক্ষায় ছিল? সে কি জন্তুটাকে মেরেছে? অথবা, শুধু আহত করে ছেড়ে দিয়েছে, আর বেচারি রক্তের দাগ রেখে রেখে নলবনের ভিতর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ছুটছে? ওটা আমি পছন্দ করি না। খুব অপছন্দ করি। বৃথা একটা প্রাণীকে আঘাত দেওয়া কেন? বোকা! বোকা! অথবা তুমি হয় তো ভাবলে, 'কোন এব্রেক একটা বোকা কসাক যুবককে মেরে ফেলেছে।' এরকম নানা চিন্তা তোমার মনে। আবার হয়তো ঝোপের মধ্যে খড় ভাঙার শব্দ শুনতে পেলে; বুকের ভিতরে কি যেন ধ্বক্ করে উঠল। এই পথে এস গো সুন্দরীরা! তারপরই তোমার মনে হল, ওরা আমার গন্ধ পেয়ে যাবে; তাই তুমি চুপচাপ বসে থাকলে, বুকের মধ্যে ধুক-ধুক করতে লাগল। এই বসন্তকালেই এরকম একটা শব্দ কানে আসতেই একটা কালো কিছু আমার নজরে পড়ল। "পিতা-পুত্রের নামে" উচ্চারণ করে গুলি করতে যাব এমন সময় শুকরীটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বাচ্চাগুলোকে জানিয়ে দিল, 'বিপদ বাছারা, ওখানে একটা মানুষ আছে,' আর অমনি ঝোপ-ঝাড় ভেঙে সব্বাই পালিয়ে গেল। আমার মনে হল, বেটির গায়ে দাঁত বসিয়ে দেই।"

ওলেনিন শুধাল, "কি করে শূকরী তার বাচ্চাদের বলল যে ওখানে একটা মানুষ আছে?"

"কেন পারবে না? তুমি কি মনে কর জন্তুরা বোকা? না, তোমরা শুয়োরের বাচ্চা বললেও ওরা মানুষের চাইতে জ্ঞানী! ও বেটি সব জানে! একটা দৃষ্টান্ত নাও। একটা লোক তোমার পথ ধরে গেলেও কিছুই বুঝতে পারে না, কিন্তু একটা শুয়োরের ছানা তোমার পথে পা রাখা মাত্রই একবার শুঁকে দেখবে, তারপরই ছুটে পালিয়ে যাবে। এতেই বোঝা যায় তার বুদ্ধি আছে, কেমন কি না? তুমি তোমার নিজের গন্ধ চিনতে পার না, কিন্তু সে পারে। সে শুয়োর হতে পারে, কিন্তু তোমার চাইতে খারাপ জীব নয়—আমরা সকলেই তো ঈশ্বরের জীব। দেখ, মানুষ বোকা! বোকা! বোকা!" কথাটা বার বার বলে মাথাটা নীচু করে সে বসে ভাবতে লাগল।

ওলেনিনকেও চিন্তায় পেল; বারান্দা থেকে নেমে দুই হাত পিছনে রেখে সে উঠোনে পায়চারি করতে লাগল।

ইয়েরশ্কা চমকে মাথাটা তুলে মোমবাতির কম্পিত শিখার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল; ফড়িংগুলো তার চারদিকে ঘুরছে আর পুড়ে মরছে।

"বোকা! বোকা!" সে বলল। "কোথায় উড়ে যাচ্ছিস? বোকা! বোকা!" উঠে মোটা মোটা আঙুল দিয়ে ফড়িংগুলোকে তাড়িয়ে দিতে লাগল।

"পুড়ে মরবি যে বোকা বাচ্চারা! এদিকে উড়ে যা, এদিকে তো প্রচুর জায়গা রয়েছে। তোরা নিজেদের মারছিস, আর আমার দুঃখ হচ্ছে!"

বসে বসে অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে বক্‌বক্‌ করল আর মদ খেল। ওলেনিন উঠোনে পায়চারি করতে লাগল। হঠাৎ ফটকের বাইরে ফিস্‌ফিস্‌ শব্দে চমকে উঠল। আপনা থেকেই নিঃশ্বাস বন্ধ করে সে শুনতে পেল একটি নারীকণ্ঠের হাসি, একটি পুরুষের কণ্ঠ, আর চুমোখাবার শব্দ। ইচ্ছা করেই ঘাসের উপর পা ঘসার শব্দ করে সে উঠোনের অন্য কোণে চলে গেল; কিন্তু একটু পরেই বাঁশের বেড়াটায় ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ হল। কালো সার্কাসিয়ান কোট গায়ে ও ভেড়ার চামড়ার সাদা টুপি মাথায় একটি কসাক বেড়ার ও-পাশ দিয়ে চলে গেল (সে লুকাশ্‌কা), আর মাথায় সাদা রুমাল বাঁধা একটি দীর্ঘাঙ্গী নারী ওলেনিনের পাশ দিয়ে চলে গেল। মারিয়াংকার দৃঢ়পদক্ষেপ যেন বলল, "তোমার বা আমার এব্যাপারে কিছু করার নেই।" ওলেনিন দুটি চোখ মেলে দেখল সে বারান্দায় উঠল, জানালা দিয়ে তাকাল, মাথার রুমাল খুলে বসে পড়ল। আর সহসা একটা নিঃসঙ্গতার অবসাদ, একটা অস্পষ্ট বাসনা ও আশা, কারও প্রতি ঈর্ষা যেন যুবকটির মনকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

ঘরে ঘরে শেষ আলোগুলি নিভে গেল। শেষ শব্দ মিলিয়ে গেল দূরে। বাঁশের বেড়া আর উঠোনের সাদা গরু-মোষ, বাড়ির ছাদ, আর দীর্ঘ পপলার গাছের শ্রেণী—সব যেন ঘুমিয়ে পড়েছে, পরিশ্রমক্লান্ত দিন শেষের শান্তির ঘুম। শুধু দূর থেকে ভেসে আসছে অবিশ্রাম ব্যাঙের ডাক। পূর্ব দিগন্তে তারার সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছে, যেন ক্রমবর্ধমান আলোর মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে; কিন্তু মাথার উপরে অনেক উজ্জ্বল তারার মেলা। বুড়ো মানুষটি হাতের উপর মাথা রেখে ঝিমুচ্ছে। উল্টো দিকে উঠোনে একটা মোরগ ডাকল, কিন্তু ওলেনিন তখনও উঠোনে পায়চারি করছে, কি যেন ভাবছে। অনেক কণ্ঠের মিলিত গানের শব্দ কানে এল। সে বেড়ার কাছে এগিয়ে গিয়ে কান পাতল। কয়েকটি কসাক যুবক মনের আনন্দে গান করছে; একজনের গলা উঠেছে সকলের গলা ছাড়িয়ে।

জেগে উঠে বুড়ো বলল, "ওখানে কে গাইছে জান? ওই হল সাহসী লুকাশ্‌কা। একজন চেচেনকে মেরেছে, তাই এখন আনন্দ করছে। কিন্তু এর মধ্যে আনন্দ করার কি আছে?...বোকা, বোকা!"

"তুমি কখনও মানুষ মেরেছ?" ওলেনিন শুধাল।

বুড়ো লোকটি সহসা দুই কনুইতে ভর দিয়ে উঠে নিজের মুখটাকে ওলেনিনের মুখের কাছে তুলে ধরল।

চীৎকার করে বলল, "তুমি একটা শয়তান! কি প্রশ্ন করছ? ওসব কথা বলো না। মানুষকে হত্যা করা সাংঘাতিক কাজ...আঃ; ভীষণ কাজ।...

আচ্ছা, শুভরাত্রি বন্ধু। তোমার খাদ্য-পানীয়ে পেট ভরে গেছে। শিকারের জন্য কাল আসব কি?"

"হ্যাঁ, এসো।"

"মনে থাকে যেন, ভোরে উঠবে; বেশীক্ষণ ঘুমলে জরিমানা হবে!"

"কোন ভয় নেই, তোমার আগেই উঠব," ওলেনিন বলল।

বুড়ো লোকটি চলে গেল। গান থেমেছে, কিন্তু পায়ের শব্দ ও খুশির কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। একটু পরে আবার গান শুরু হল, কিন্তু অনেক দূরে; ইয়েরশ্‌কার জোরালো গলাও শোনা যাচ্ছে।

"কী মানুষ, কী জীবন।" দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভাবতে ভাবতে ওলেনিন একাকি কুটিরে ফিরে গেল।

অধ্যায়—১৬

ইয়েরশ্‌কা খুড়ো এখন আর কাজকর্ম কিছু করে না; একলা থাকে। বিশ বছর আগে তার স্ত্রী ধর্মান্তর গ্রহণ করে তাকে ছেড়ে জনৈক রুশ সার্জেন্ট-মেজরকে বিয়ে করেছে। খুড়োর কোন ছেলেমেয়ে নেই। সে যখন বলে, যে যৌবনে সে গাঁয়ের সব চাইতে দুঃসাহসী বেপরোয়া মানুষ ছিল সেটা বৃথা আস্ফালন নয়। তার সেকালের বীরত্বের কথা রেজিমেণ্টের সকলেই জানে। একাধিক রুশ ও চেচেনের মৃত্যু তার বিবেকের উপর চেপে বসে আছে। সে লুটতরাজ করতে পাহাড়ে যেত, রুশদেরও লুটপাট করত; দু'বার কারাগারেও গেছে। জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে জঙ্গলে শিকার করে। সেখানে দিনের পর দিন শুধু রুটি আর জল খেয়ে কাটিয়েছে। আবার যখন গ্রামে থেকেছে তখন দিনরাত কাটিয়েছে কেবল ফুর্তি করে। ওলেনিনের কাছ থেকে এসে মাত্র ঘণ্টা দুই ঘুমিয়ে আলো ফুটবার আগেই উঠে পড়ল। বিছানায় বসে আগের দিন যে লোকটির সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তার কথাই ভাবতে লাগল। ওলেনিনের সরলতা (সে যে তাকে সানন্দে মদ খাইয়েছে এটাই তার সরলতা) তাকে খুব খুশি করেছে; ওলেনিনও তাকে খুশি করেছে। রুশরা সব লই এত "সরল" ও ধনী হয় কেমন করে, আর শিক্ষিত হয়েও কিছুই জানে না কেন তা ভেবে সে অবাক হল। এই সব কথা এবং ওলেনিনের কাছ থেকে আর কি পাওয়া যেতে পারে তাই সে ভাবতে লাগল।

ইয়েরশ্‌কা খুড়োর কুটিরটা বেশ বড়, আর পুরনোও নয়, কিন্তু একটি মেয়েমানুষের অভাব বাড়ির সর্বত্র পরিস্ফুট। কসাকরা সাধারণতই খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়, কিন্তু এ কুটিরটা নোংরা ও অত্যন্ত অপরিষ্কার। রক্ত-মাখা একটা কোট পড়ে আছে টেবিলে; তার পাশেই পড়ে আছে অর্ধেকটা

ভাজা পিঠে ও একটা পালক-ছাড়ানো দাঁড়কাক; পোষা বাজপাখিটাকে এগুলো খাওয়ায়। বেঞ্চির উপর ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে কাঁচা চামড়ার খ্যাওাল, বন্দুক, ছোরা, ছোট থলে, ভেজা পোশাক ও টুকিটাকি জিনিসপত্র। এক কোণে আছে নোংরা জলের একটা টব, তাতে একজোড়া খ্যাওাল ডোবানো; পাশেই একটা বন্দুক ও শিকারের জাল। মেঝেতেও একটা জাল ছড়ানো; তার উপর কয়েকটা মরা পাখি পড়ে আছে, আর ঠ্যাং-বাঁধা একটা মুরগি খুটে খুটে নোংরা খাচ্ছে। নেভানো স্টোভের উপর একটা ভাঙা পাত্রে দুধের মত কিছুটা তরল পদার্থ দেখা যাচ্ছে। স্টোভের মাথার উপরে একটা বাজপাখি অনবরত চেঁচাচ্ছে আর পায়ের বেড়িটা কাটার চেষ্টা করছে; আর একটা পালক ওঠা বাজপাখি স্টোভটার পাশে বসে মুরগিটার দিকে তাকাচ্ছে আর মাথাটাকে ডাইনে ও বাঁয়ে নোয়াচ্ছে।

ইয়েরশ্‌কা খুড়ো শার্ট গায়ে দিয়ে ছোট বিছানাটায় শুয়ে দুই পা স্টোভের উপর তুলে দিয়েছে। মোটা মোটা আঙুল দিয়ে হাতের উপরকার বাজপাখির খোঁচার দাগগুলো খুটছে। গোটা ঘরটা, বিশেষ করে বুড়োর আশপাশটা, একটা কড়া অথচ মন্দ-নয় গোছের গন্ধে ভরপুর।

"উইদে মা খুড়ো" (খুড়ো বাড়ি আছ?) জানালা দিয়ে একটা কর্কশ গলা শোনা গেল। খুড়ো সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল, লুকাশ্‌কার গলা।

"উইদে, উইদে, উইদে! ভিতরেই আছি!" বুড়ো চেঁচিয়ে বলল। "ভিতরে এস মার্কা, লুকা মার্কা। খুড়ো তোমার জন্য কি করতে পারে বল? রক্ষী-বেষ্টনীতে ফিরে যাচ্ছ নাকি?"

মনিবের চীৎকার শুনে বাজপাখিটা পাখা ঝাপ্‌টে বেড়িটা টানতে লাগল।

লুকাশ্‌কা বুড়োর খুব প্রিয়। কসাকদের নতুন প্রজন্মকে যে ঘৃণা করে; তার একমাত্র ব্যতিক্রম লুকাশ্‌কা। তাছাড়া, লুকাশ্‌কা ও তার মা প্রায়ই প্রতিবেশী বৃদ্ধটিকে মদ, জমাট সর, ও অন্যান্য ঘরের তৈরি জিনিস দিয়ে থাকে। ইয়েরশ্‌কা খুড়ো সব কিছুকেই তার নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে। সে নিজেকে বোঝায়, "বেশ তো, দিল তাতে কি? ওরা দিতে পারে। আমিও ওদের কিছু টাটকা মাংস বা একটা পাখি দিয়ে দেব, বাস, তাহলেই তারা তাদের খুড়োকে ভুলে যাবে না: মাঝে মাঝে একটা পিঠে বা একটা মটর-দানা এনে দেবে।"

"শুভ সকাল মার্কা! তোমাকে দেখে খুশি হলাম," বুড়ো সানন্দে চেঁচিয়ে বলল; পরমুহূর্তে খালি পা নামিয়ে লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে পড়ল, কয়েক পা এগিয়ে পা দুটোকে বার কয়েক মেঝেতে ঠুকে এক পাক ঘুরে গেল।

"কি রকম দেখালাম বল?" সে শুধাল; তার ক্ষুদে চোখ দুটি চক্‌চক্‌ করছে।

লুকাশ্‌কা মৃদু হাসল।

"রক্ষী-বেষ্টনীতে ফিরে যাচ্ছ নাকি?" বুড়ো শুধাল।

"রক্ষী-বেষ্টনীতে থাকতে তোমাকে কথা দিয়েছিলাম, তাই তোমার জন্ত চিকির নিয়ে এসেছি।"

"খৃস্ট তোমাকে রক্ষা করুন!" বলে বুড়ো মেঝের উপর থেকে অত্যন্ত ঢোলা ট্রাউজার ও বেশ্‌মেৎ তুলে নিয়ে গায় চড়াল, কোমরে একটা পট্টি বাঁধল, মাটির পাত্র থেকে খানিকটা জল নিয়ে হাতে ঢালল, পুরনো ট্রাউজারে হাত মুছল, একটা ছোট চিরুণি দিয়ে দাড়ি পালিশ করল, এবং লুকাশ্‌কার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি প্রস্তুত।"

লুকাশ্‌কা একটা পাত্র নিয়ে ভাল করে মুছে তাতে মদ ঢেলে বুড়োর হাতে দিল।

গম্ভীরভাবে মদের পাত্রটি হাতে নিয়ে বুড়ো বলল, "তোমার স্বাস্থ্য পান করছি! পিতা-পুত্রের স্বাস্থ্য পান করছি! তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক, তুমি চির বীর হও, ক্রুশ-চিহ্ন লাভ কর।"

প্রার্থনা উচ্চারণ করে লুকাশ্‌কাও কিছুটা মদ খেয়ে সেটা টেবিলে রেখে দিল।

বুড়ো উঠে চৌকাঠের কাছ থেকে খানিকটা শুটকি মাছ এনে একটা লাঠি দিয়ে পিটে সেটাকে নরম করল, এবং একটি মাত্র নীল পাত্রে সেই মাছ রেখে পাত্রটা টেবিলের উপর রাখল।

"যা চাই সেসব আমার আছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, খাদ্যপূর্ণ ভাণ্ডারও আমার কাছে," বুড়ো সঙ্গে সঙ্গে বলল। "আচ্ছা, মোসেভের খবর কি?"

বুড়ো মানুষটির মতামত জানবার উদ্দেশ্যে কর্পোরাল যে তার বন্দুকটা নিয়ে নিয়েছে সে কথাটা তাকে বলল।

বুড়ো বলল, "ও নিয়ে ভেবোনা। বন্দুক যদি না দাও তাহলে কোন পুরস্কারই তোমার জুটবে না!"

"কিন্তু খুড়ো, সকলেই বলে অশ্বারোহী কসাক না হওয়া পর্যন্ত থোরাই পুরস্কার মেলে; আর বন্দুকটা খুব ভাল, আশী রুবল তার দাম।"

"আরে যেতে দাও! একজন অফিসারের সঙ্গে আমারও এই রকম একটা গোলমাল বেঁধেছিল; সে চেয়েছিল আমার ঘোড়া। 'আমাকে ঘোড়াটা দাও, আমি তোমাকে কর্ণেট বানিয়ে দেব,' সে বলল। আমি দিলাম না, আর তাই কিছুই পেলাম না!"

"ঠিক কথা খুড়ো, কিন্তু কি জান একটা ঘোড়া আমাকে কিনতেই হবে, আর নদীর ওপারে পঞ্চাশ রুবলের কমে ঘোড়া পাওয়া যাবে না, অথচ মা এখনও মদ বিক্রি করে নি।"

বুড়ো বলল, "আরে, আমরা ও নিয়ে মাথা ঘামাই নি। ইয়েরশ্‌কা

খুড়োর যখন তোমার মত বয়স ছিল তখন নোগাইদের কাছ থেকে দলে দলে ঘোড়া চুরি করে তেরেক পার করে নিয়ে আসত। অনেক সময় আমরা তো তিনপো ভদ্‌কা বা একটা জোব্বার বদলে একটা ভাল ঘোড়াই দিয়ে দিতাম।"

"এত সস্তায় দিতে কেন?" লুকাশ্‌কা শুধাল।

বুড়ো তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, "তুমি বোকা, বোকা হে মার্কা। আরে, যাতে কিপ্টে হতে না হয় সেইজন্যই তো লোকে চুরি করে! আর তুমি, আমার তো মনে হয় সেকাজটা কেমন করে করে তা তুমি কখনও চোখেও দেখ নি? কি হল, কথা বলছ না কেন?"

লুকাশ্‌কা জবাব দিল, "কি বলব খুড়ো? মনে হচ্ছে, তুমি আমাদের মত করে মানুষ হও নি।"

"তুমি একটি মুখ্‌খু মার্কা, মুখ্‌খু! আমাদেব মত করে মানুষ হও নি!" কসাক ছেলেটির কথাকে নকল করে বুড়ো বলল। "তোমার বয়সে আমিও সেরকম কসাক ছিলাম না।"

"কি রকম?" লুকাশ্‌কা শুধাল।

বুড়ো তাচ্ছিল্যভরে মাথা নাডতে লাগল। "ইয়েরশ্‌কা খুড়ো ছিল সরল মানুষ; সে কাউকে হিংসা করত না! তাই তো আমি ছিলাম সব চেচেনদের কুনাক। কুনাক আসত আমার সঙ্গে দেখা করতে, আমি তাকে ভদ্‌কা খাওয়াতাম, তাকে খুশি করতাম। আমার বিছানায় শুতে দিতাম; আর যখন তার সঙ্গে দেখা করতে যেতাম একটা উপহার নিয়ে যেতাম। এই ভাবেই চলত, তোমরা আজকাল যা কর সেভাবে নয়। তোমাদের তো একমাত্র ফুর্তি হচ্ছে বীচি ভাঙা আর খোসাগুলো থু-থু করে ফেলে দেওয়া।"

লুকাশ্‌কা বলল, "ঠিক, আমিও তা জানি। তুমি খুব ঠিক কথা বলেছ।"

"যদি সত্যিকারের মানুষ হতে চাও তো দিঝিগিৎ হও, নেহাৎ চাষী হয়ো না! ঘোড়া কিনতে তো একটা চাষীও পারে—টাকা ফেলে দিয়ে ঘোড়াটা নিয়ে নাও।"

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

"দেখ খুড়ো, এই গাঁয়ের মধ্যে আর রক্ষী-বেষ্টনীতে দিন কাটাতে বড়ই একঘেয়ে লাগে; কিন্তু একটু হৈ চৈ করতে যাবার মত কোন জায়গাও তো নেই। আমাদের ছেলেগুলো এত ভীতু। যেমন নাজার্কা। সেদিন আউলে গেলে গিরেই খান আমাদের ঘোড়ার জন্য নোগাই যেতে বলল, কিন্তু কেউ গেল না; আমি একা যাই কেমন করে বল?"

"তোমার খুড়ো আছে কিসের জন্য? তুমি কি মনে কর আমি একেবারে কাঠ হয়ে গেছি?···আরে, তা হই নি। একটা ঘোড়া এনে দাও, এক্ষুণি নোগাই চলে যাচ্ছি।"

লুকাশ্‌কা বলল, "এসব বাজে কথা বলে কি লাভ! বরং বল গিরেই

খানকে নিয়ে কি করি। সে বলছে, 'কোন রকমে ঘোড়াগুলোকে তেরেক পার করে এনে দাও, তারপর ঘোড়ার পাল এসে হাজির হলেও আমি তাদের রাখবার জায়গা দেব। তুমি তো জান সেও চেচেন, তার কথায় বিশ্বাস করা চলে।"

"গিরেই খানকে তুমি বিশ্বাস করতে পার, তার আত্মীয়রা সকলেই ভাল লোক ছিল। তার বাবা ছিল আমার খুব বিশ্বস্ত বন্ধু। কিন্তু তোমার খুড়োর কথা শোন, সে তোমাকে ভুল কথা বলবে না। গিরেই খানকে শপথ করতে বল, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আর তার সঙ্গে গেলে সব সময় পিস্তলটাকে হাতের কাছে রেখ, বিশেষ করে ঘোড়া ভাগা-ভাগির সময়। আমি তো একবার এক চেচেনের হাতে প্রায় মরতে বসে ছিলাম। একটা ঘোড়ার জন্য তার কাছে দশ রুবল দাবী করেছিলাম। বিশ্বাস করা ভাল কাজ, কিন্তু বন্দুক ছাড়া কখনও ঘুমতে যেয়ো না।"

লুকাশ্‌কা মন দিয়ে বুড়োর কথাগুলি শুনল।

একটু চুপ করে থেকে শুধাল, "আচ্ছা খুড়ো, তোমার কাছে পাথর-ভাঙা ঘাস আছে কি?"

"আমার কাছে নেই, কিন্তু কেমন করে তা পাওয়া যায় সেটা তোমাকে শিখিয়ে দিতে পারি। তুমি ভাল ছেলে, বুড়ো মানুষকে যেন ভুলে যেয়ো না···বলব কি?"

"বল খুড়ো।"

"তুমি কাছিম দেখেছ? একটা শয়তানী!"

"নিশ্চয় দেখেছি।"

"তার বাসা খুঁজে বের করে বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেল, যাতে সে ভিতরে ঢুকতে না পারে। তারপর, সে আসবে, বেড়ার চারদিকে ঘুরবে, তারপর পাথর-ভাঙা ঘাসের খোঁজে চলে যাবে। আর অচিরেই কিছু ঘাস নিয়ে এসে বেড়া ভেঙে বাসায় ঢুকবে। মনে রেখো, পরদিন সকালে যথাসময়ে সেখানে যাবে, আর বেড়াটা যেখানে ভাঙা সেখানেই দেখবে পাথর-ভাঙা ঘাস পড়ে আছে। সেটাকে নিয়ে তুমি যেখানে ইচ্ছা চলে যাবে। কোন তালা, কোন শিক তোমার গতিরোধ করতে পারবে না।"

"তুমি নিজে পরীক্ষা করে দেখেছ খুড়ো?"

"পরীক্ষা করে অবশ্য দেখি নি, তবে যারা আমাকে একথা বলেছে তারা ভাল লোক। আমি শুধু একটা তুকই জানি—সেটা হচ্ছে ঘোড়ায় চড়লেই "সকলে শোন" এই বাণী উচ্চারণ করা; তাই তো কেউ কোন দিন আমাকে মারতে পারে নি!"

"সকলে শোন! ব্যাপারটা কি খুড়ো?"

"কি তা তুমি জান না? তোমরা কেমন ধারা মানুষ হে! খুড়োকে

জিজ্ঞাসা করে ভালই করেছ। শোন, আর আমার সাথে সাথে বল :

"সকলে শোন ! হে জিয়নের অধিবাসীরা,
তোমাদের রাজাকে দেখ।
আমরা চড়ি ঘোড়ায়,
সফোনিয়া কাঁদে।
জাকারিয়াস কথা বলে,
বাবা মান্দ্রিচ,
মানুষ চির মমতাময়।"

বুড়ো আবার বলল, "মানুষ চিরমমতাময়। এখন জানলে তো ? বলতে চেষ্টা কর।"

লুকাশ্‌কা হাসতে লাগল।

"বলে যাও খুড়ো। এইজন্যই কি কেউ তোমাকে কোনদিন মারতে পারে নি ? হয়তো এরকমটা ঘটে গিয়েছিল !"

"তোমরা বড় বেশী চালাক হয়ে গেছ ! এটাকে মুখস্ত কর, আর বল। এতে তোমার কোন ক্ষতি করবে না। কেবল "সকলে শোন," গান করবে, তাহলেই ভাল থাকবে। বলে বুড়ো নিজেই হাসতে লাগল। তুমি বরং নোগাই যেয়ো না লুক !"

"কেন ?"

"দিনকাল বদলে গেছে। তোমরা এখন সে মানুষ নও। তোমরা, আজকালকার কসাকরা একেবারে অপদার্থ ! আর দেখ কত রুশ আমাদের ঘাড়ে এসে চেপেছে ! তারা তোমাদের আদালতে নিয়ে যাবে। দেখ, এসব ছেড়ে দাও ! এসব তোমাদের জন্য নয়। গিরচিক ও আমি, আমরা···" বুড়ো লোকটি আবার তার আর একটি অন্তহীন কাহিনী শুরু করতে যাচ্ছিল, কিন্তু জানালায় তাকিয়ে লুকাশ্‌কা তার কথায় বাধা দিল।

"পরিষ্কার দিনের আলো দেখা দিয়েছে খুড়ো। আমি যাচ্ছি। একদিন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসো।"

"খৃস্ট তোমার সহায় হোন। আমি সৈনিক লোকটির কাছে যাচ্ছি : তাকে কথা দিয়েছি শিকারে নিয়ে যাব। তাকে বেশ ভাল লোক বলেই মনে হচ্ছে।"

অধ্যায়—১৭

ইয়েরশ্‌কার কুটির থেকে লুকাশ্‌কা বাড়ি গেল। শিশির-ভেজা কুয়াশা মাটি থেকে উঠে গ্রামটাকে ঢেকে ফেলছে। চোখে দেখা না গেলেও চারদিকে গোরু-মোষের চলাচলের শব্দ শোনা যাচ্ছে। মোরগগুলো বার বার

ডাকছে। ক্রমেই বেশী করে আলো ফুটছে, গ্রামের লোকজনও জেগে উঠছে। একেবারে কাছে পৌঁছে তবে লুকাশ্‌কার নজরে এল তার উঠোনের শিশির-ভেজা বেড়া, কুটিরের বারান্দা ও খোলা চালাঘর। কুয়াশাঢাকা উঠোনে কাঠ কাটার শব্দ হচ্ছে। লুকাশ্‌কা কুটিরে ঢুকল। মা ঘুম থেকে উঠেছে, স্টোভের পাশে দাঁড়িয়ে তাতে কাঠ ঠেলে দিচ্ছে। ছোট বোনটি তখনও বিছানায় শুয়ে আছে।

মা শান্ত গলায় বলল, "আরে লুকাশকা, ফুর্তি শেষ হল? রাতটা কোথায় কাটালে?"

"গ্রামেই ছিলাম," অনিচ্ছাসত্ত্বেও জবাব দিয়ে ছেলে হাত বাড়িয়ে বন্দুকটা নামাল, খাপ থেকে খুলে ভাল করে পরীক্ষা করল।

মা ঘাড় নাড়তে লাগল।

লুকাশ্‌কা কিছুটা বারুদ পাত্রে ঢালল, একটা থলে এনে তার ভিতর থেকে কয়েকটা খালি কার্তুজের খাপ বের করে প্রত্যেকটার মধ্যে বারুদ ভরে ন্যাকড়ায় জড়ানো একটা বুলেট দিয়ে সাবধানে মুখ বন্ধ করে দিল।

"মা, আমার থলেটা মেরামত করতে বলেছিলাম; সেটা হয়েছে?" সে শুধাল।

"হ্যাঁ, বোবা মেয়েটাকে কাল রাতে কি যেন মেরামত করতে দেখেছি। কেন, রক্ষী-বেষ্টনীতে ফিরে যাবার সময় হয়ে গেল নাকি? তোমার তো দেখাই পাওয়া ভার।"

"হ্যাঁ, তৈরি হওয়ামাত্রই আমাকে যেতে হবে," বারুদের থলেটা বাঁধতে বাঁধতে লুকাশ্‌কা বলল। "বুবিটা কোথায় মা? বাইরে?"

"মনে হয় কাঠ কাটছে। তোমার উপর রেগে আছে। বলেছে, 'তার সঙ্গে দেখাই করব না!' মুখের উপর এইভাবে হাত রেখে জিভ্‌ দিয়ে চুক্‌চুক্‌ শব্দ করে, আর বুকের উপর হাতটা চেপে ধরে, যেন বলতে চায়, 'তাকে দেখতে বড় সাধ হয়।' তাকে ডাকব কি? এব্রেকের ব্যাপারটাও সে জেনেছে।"

লুকাশ্‌কা বলল, "ডাক। ওখানে খানিকটা চর্বি রেখেছিলাম; নিয়ে এস তো, তলোয়ারটায় লাগাতে হবে।"

বুড়ি বেরিয়ে গেল; কয়েক মিনিট পরে সিঁড়িতে শব্দ করে লুকাশ্‌কার মূক-বধির দিদিটি কুটিরে ঢুকল। বয়সে ভাইয়ের চাইতে ছ' বছরের বড়; মুখের বোকা-বোকা পরিবর্তনশীল ভাবটা না থাকলে দেখতে ঠিক তার মতই হত।

পরনে মোটা কাপড়ের তালি-দেওয়া একটা ফ্রক; খালি পায়ে কাদা লেগে আছে, মাথায় একটা পুরনো নীল রুমাল। গলা, হাত, মুখ সবই ছেলেদের মত পেশীবহুল। পোশাক ও চেহারা দেখলেই বোঝা যায় সে

কঠোর পুরুষালি কাজকর্মে অভ্যস্ত।

হাত-ভর্তি কাঠ এনে স্টোভের নীচে রেখে দিল। তারপর ভাইয়ের কাছে গিয়ে খুশির হাসি হাসল; তাতে গোটা মুখটাই কুঁচকে গেল। ভাইয়ের কাঁধে হাত রেখে খুব তাড়াতাড়ি হাত, মুখ ও সারা শরীর দিয়ে নানারকম ইসারা করতে লাগল।

ভাই মাথা নেড়ে বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে, স্তেপ্‌কা লক্ষ্মী মেয়ে! তুমি তো সবকিছু এনেছ, সবকিছু ঠিক করে রেখেছ, ভাল মেয়ে! এই নাও, এটা তোমার।' পকেট থেকে দু-টুকরো আদা-রুটি বের করে তাকে দিল।

খুশিতে বোবা মেয়েটির মুখ লাল হয়ে উঠল, আনন্দ প্রকাশের জন্য নানারকম উৎকট অঙ্গভঙ্গী করতে লাগল। আদা-রুটিটা হাতে নিয়ে বার বার একটি দিকে আঙুল দেখিয়ে আরও দ্রুত অঙ্গভঙ্গী করে ভুরু ও মুখের উপর আঙুল বুলাতে লাগল। তার কথা বুঝতে পেরে লুকাশ্‌কা হেসে মাথা নাড়তে লাগল। সে বলছে, মেয়েদের জন্য ভাল ভাল জিনিস নিয়ে এস, মেয়েরা লুকাশ্‌কাকে ভালবাসে, আর তাদের মধ্যে আবার মারিয়াংকা তাকে ভালবাসে সকলের চাইতে বেশী। "সে তোমাকে ভালবাসে" এই কথাটা বোঝাবার জন্য সে তার বুকের উপর হাত রেখে সেই হাতে চুমো খেল আর কাউকে আলিঙ্গন করার ভঙ্গী করল। মা ফিরে এসে বোবা মেয়ের কাণ্ড দেখে হেসে মাথা নাড়তে লাগল। মেয়েটা তাকেও রুটিটা দেখিয়ে খুশির আওয়াজ করতে শুরু করল।

মা বলল, "সেদিন উলিৎকাকে বলেছি একজন ঘটক পাঠাব। সে তো আমার কথা বেশ ভালভাবেই নিয়েছে।"

মার দিকে তাকিয়ে লুকাশ্‌কা নিঃশব্দে হাসল। "কিন্তু মদ বিক্রির কি করলে মা? আমার যে একটা ঘোড়া দরকার।"

"সময় হলেই গাড়িতে বোঝাই করব। আগে পিপেগুলো তৈরি হোক। দেখ, যাবার সময় বারান্দায় একটা থলে পাবে; একজন প্রতিবেশীর কাছ থেকে ধার করে এনেছি; সঙ্গে করে রক্ষী-বেষ্টনীতে নিয়ে যেও; না কি আমিই তোমার থলেতে ভরে দেব?"

"ঠিক আছে," লুকাশ্‌কা বলল। "আর নদীর ওপার থেকে যদি গিরেই খান আসে তো তাকে রক্ষী-বেষ্টনীতে পাঠিয়ে দিও। এখন অনেক দিন আর ছুটি পাব না; তার সঙ্গে একটা কাজের কথা আছে।"

বুড়ি বলল, "তা পাঠিয়ে দেব। সারাক্ষণ তোইয়ানকার বাড়িতেই ফুর্তি করে কাটালে, তাই নয় কি? রাতে একবার গোরু-বাছুরের খোঁজ নিতে বেরিয়েছিলাম, মনে হল তখন তোমার গান শুনতে পেলাম।"

লুকাশ্‌কা জবাব দিল না বারান্দায় গিয়ে থলেগুলি কাঁধে ফেলল, কোটের

তলাটা গুঁজে নিল, বন্দুকটা হাতে নিল, তারপর একমুহূর্তের জন্ম দরজায় দাঁড়াল।

দরজাটা বন্ধ করতে করতে বলল, "চলি মা! নাজার্কার সঙ্গে আমার জন্য একটা ছোট পিপে পাঠিয়ো। সকলকে আমি কথা দিয়েছি। সেই তোমার কাছ থেকে চেয়ে নেব!"

"খৃস্ট তোমাকে রক্ষা করুন লুকাশ্‌কা। ঈশ্বর তোমার সহায় হোন!" বেড়ার ধারে গিয়ে মা বলল, "নতুন পিপে থেকেই তোমাকে কিছুটা পাঠিয়ে দেব। কিন্তু শোন," মা বেড়ার উপর ঝুঁকে দাঁড়াল।

কসাকটি থামল।

"এখানে তুমি ফূর্তি করেছ, সেটা ঠিক আছে। অল্প বয়সে কেনই বা আনন্দ করবে না? ভগবান তোমাকে সুদিন দিয়েছেন, খুব ভাল কথা। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো বাবা। কোনরকম গোলমালে যেন জড়িয়ে পড়ো না। আর, বড়দের সম্মান করে চলো। সেটা করতেই হবে। আমি মদ বিক্রি করে তোমার ঘোড়ার টাকা যোগাড় করে দেব, আর তোমার বিয়ের ব্যবস্থাও পাকা করে ফেলব।"

ভুরু কুঁচকে ছেলে জবাব দিল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে!"

বোবা দিদিটি একটা শব্দ করে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। নিজের মাথা ও হাতের তালু দেখিয়ে একটি মাথা-কামানো চেচেনকে বোঝাতে চাইল। তারপর ভুরু কুঁচকে বন্দুকের নিশানা করার ভান করল, তারপর চীৎকার করে গুন্‌গুন্ করতে করতে মাথাটা দোলাতে লাগল। তার অর্থ, লুকাশ্‌কার আরও একজন চেচেনকে মারা উচিত।

লুকাশ্‌কা সেটা বুঝল। একটু হেসে বন্দুকটাকে জোব্বার নীচে কাঁধে ফেলে ধীর পায়ে ঘন কুয়াশার দিকে এগিয়ে গেল।

বুড়িটি নিঃশব্দে কিছুক্ষণ ফটকে দাঁড়িয়ে থেকে কুটিরে ফিরে গিয়ে কাজ-কর্মে মন দিল।

অধ্যায়—১৮

লুকাশ্‌কা যখন রক্ষী-বেষ্টনীর উদ্দেশে যাত্রা করল, ঠিক সেইসময় ইয়েরশ্‌কা খুড়ো শিস্ দিয়ে কুকুরগুলোকে ডেকে বেড়া ডিঙিয়ে পিছনের গলি দিয়ে ওলেনিনের বাসায় গিয়ে হাজির হল; পশু শিকারে বা পাখি মারতে যাবার আগে মেয়েদের সঙ্গে দেখা হওয়াটা সে পছন্দ করে না।

ওলেনিন তখনও ঘুমিয়ে আছে; ঘুম ভাঙলেও ভানিয়ুশা তখনও বিছানায় শুয়ে চারদিক তাকিয়ে দেখছে উঠবার সময় হয়েছে কি না। এমন

সময় বন্দুক কাঁধে নিয়ে পুরো শিকারীর পোশাক পরে ইয়েরশ্‌কা খুড়ো দরজা খুলে দাঁড়াল। গম্ভীর গলায় চীৎকার করে বলল, "একটা মুগুর! সাবধান! চেচেনরা এসে পড়েছে! আইভান! মনিবের জন্য সামোভারটা ঠিক কর; আর নিজে উঠে পড়—চটপট! ভাল মানুষের ছেলে, এটাই আমাদের অভ্যাস! আরে, মেয়েরাও তো উঠে পড়েছে! জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখ। দেখ, সে জল আনতে যাচ্ছে, আর তুমি এখনও বিছানায় পড়ে আছ!"

ওলেনিন ঘুম ভেঙে লাফ দিয়ে উঠল। বলল, "তাড়াতাড়ি কর ভানিয়ুশা, তাড়াতাড়ি।"

বুড়ো বলল, "এমনি করেই তোমরা শিকারে যাও বুঝি? অন্য সকলে প্রাতরাশ খাচ্ছে, আর তোমরা এখনও ঘুমিয়ে আছ! লিয়াম! এদিকে!" সে কুকুরটাকে ডাকল।

"তোমার বন্দুকটা তৈরি তো?" কথাটা সে এত জোরে বলল যেন ঘরের মধ্যে একগাদা লোক জমা হয়েছে।

"আহা, আমি তো স্বীকার করছি যে আমার দোষ হয়েছে, কিন্তু কিছুই করার ছিল না। ভানিয়ুশা, বারুদ আর টিপ্‌লি," ওলেনিন বলল।

"চমৎকার!" বুড়ো চেঁচিয়ে বলল।

"Du the voulez—vous?" মুখ বেঁকিয়ে ভানিয়ুশা শুধাল।

তার দিকে দাঁত খিঁচিয়ে বুড়ো চেঁচিয়ে বলল, "তুমি আমাদের দলের লোক নও, তোমার প্যাঁক-প্যাঁক কথাও আমরা বুঝি না, ব্যাটা শয়তান!"

হাই বুট পরতে পরতে ওলেনিন বলল, "আরে, প্রথম অপরাধ ক্ষমা করতেই হয়।"

ইয়েরশ্‌কা বলল, "প্রথম অপরাধ ক্ষমা করা হল, কিন্তু আবার যদি বেশী সময় ঘুমোও তাহলে এক বাল্‌তি চিকির জরিমানা হবে। একটু গরম পড়ে গেলে একটাও হরিণ পাবে না।"

"আর পাওয়া গেলেও সে তো আমাদের চাইতেও বেশী চালাক, তাকে ঠকাতে পারবে না!" ওলেনিন বলল।

"তুমি তো হাসবেই! আগে একটাকে মার, তারপর কথা বলো। কিন্তু এখন তাড়াতাড়ি কর! ঐ দেখ, বাড়ির কর্তা নিজেই তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসছে," জানালা দিয়ে তাকিয়ে ইয়েরশ্‌কা বলল। "দেখ, সে কেমন ঠিক উঠে পড়েছে। সে যে একজন অফিসার সেটা দেখাবার জন্য একটা নতুন কোট চড়িয়েছে। আর এরা, এই সব লোকরা!" সত্যি সত্যি ভানিয়ুশা এসে জানাল যে বাড়ির কর্তা ওলেনিনের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

তার আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মনিবকে সতর্ক করে দেবার জন্য ভানিয়ুশা গম্ভীর মুখে বলল, "L'argent!" তার পিছন পিছন বাড়ির কর্তা ঘরে

ঢুকল। পরনে অফিসারের দাগ-টানা নতুন সার্কাসীয়ান কোট ও ঝকঝকে বুট (কসাকদের বেলা এটা ব্যতিক্রম)। দুলতে দুলতে এসে সে নবাগত ভাড়াটেকে অভ্যর্থনা জানাল।

কর্ণেট ইলিয়া ভাসিলিয়েভিচ একজন শিক্ষিত কসাক। সে খাস রাশিয়ায় গেছে। একজন স্কুল-শিক্ষক, আর সর্বোপরি সে একজন সম্ভ্রান্ত লোক। সে নিজেকে সম্ভ্রান্ত দেখাতে চায়, কিন্তু তার বাইরের বিচিত্র পালিশ, এই ভনিতা, আত্মবিশ্বাস, ও অবাস্তব বাকভঙ্গী সত্ত্বেও যে কেউই তাকে দেখে বুঝতে পারবে যে আসলে সে ইয়েরশ্‌কা খুড়োরই সমগোত্রীয়। তার রোদে-পোড়া মুখ, হাত ও লাল নাক দেখেও সেটা বোঝা যায়। ওলেনিন তাকে বসতে বলল।

"শুভ সকাল ইলিয়া ভাসিলিয়েভিচ বাবা," ইয়েরশ্‌কা এমনভাবে নীচু হয়ে অভিবাদন জানাল যে ওলেনিনের কাছে সেটাকে ঠাট্টা বলে মনে হল।

কোনরকমে মাথাটা নেড়ে কর্ণেট বলল, "শুভ সকাল খুড়ো। তুমি দেখছি এর মধ্যেই এখানে হাজির হয়েছ।"

কর্ণেটের বয়স প্রায় চল্লিশ, ধূসর ছুঁচলো দাড়ি, শুকনো ও সরু চেহারা, তবু সুদর্শন এবং বয়সের তুলনায় বেশ তাজা। পাছে ওলেনিন তাকে একজন সাধারণ কসাক ভাবে সেই ভয়ে প্রথম থেকেই সে একটা কেউ-কেটা ভাব দেখাতে লাগল।

আত্মতুষ্ট হাসি হেসে কর্ণেট বুড়োকে দেখিয়ে বলল, "এই আমাদের মিশরীয় নিমরড। একজন প্রচণ্ড শিকারী! সব ব্যাপারেই আমাদের মধ্যে সেরা। এর মধ্যেই তার সঙ্গে পরিচিত হয়ে বেশখুশি হয়েছেন দেখছি।"

ওলেনিন বলল, "হ্যাঁ, আমরা শিকারে যাবার কথা ভাবছি।",

কর্ণেট বলল, "সেটা ঠিক বুঝতে পেরেছি, কিন্তু আমার যে আপনার সঙ্গে একটু কাজের কথা আছে।"

"বলুন, কি করতে পারি?"

কর্ণেট বলতে শুরু করল' "যেহেতু আপনি একজন ভদ্রলোক এবং আমিও নিজেকে একজন অফিসারের মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি বলে মনে করি, এবং সেই হেতু আমরা সব সময়ই ভদ্রলোকদের মতই সব আলোচনা চালিয়ে যেতে পারব···কিন্তু আপনি যদি আমার মতামত চান তো বলি যে আমার স্ত্রী একটি নির্বোধ নারী বলে সে গতকাল আপনার কথাগুলিকে সম্যক অনুধাবন করতে পারে নি। সুতরাং আস্তাবলটা বাদে আমার বাসাটা রেজিমেণ্ট-অ্যাডজুটাণ্টকে ছ রুবল ভাড়ায় ভাড়া দেওয়া যেতে পারে; কিন্তু আমি সব সময়ই বিনা ভাড়ায় সেটা ছেড়ে দিতে পারি। কিন্তু, বুঝতেই পারছেন, আমি নিজে একজন অফিসারের মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে সব ব্যাপারেই ব্যক্তিগতভাবে, এই অঞ্চলের একজন অধিবাসী হিসাবে, আপনার সঙ্গে

একটা সমঝোতায় আসতে পারি ; প্রচলিত প্রথামত নয়, সব রকম শর্তকে মেনে…”

“খোলসা করে বল,” বুড়ো বিড়বিড় করে বলল।

কর্ণেট কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে সেই একই ভঙ্গীতে কথা বলে চলল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত ওলেনিন সহজেই বুঝতে পারল যে মাসিক ছ' রুবল ভাড়ায় কর্ণেট ওলেনিনকে বাসাটা ভাড়া দিতে রাজী আছে। সানন্দে সে প্রস্তাব মেনে নিয়ে ওলেনিন তাকে এক গ্লাস চা খেতে বলল। কর্ণেট আপত্তি জানাল। বলল, “আমাদের অর্থহীন প্রথামতে 'জাগতিক' গ্লাস থেকে কোন কিছু পান করাকে আমরা পাপ বলে মনে করি। অবশ্য লেখাপড়া শিখেছি বলে আমি বুঝতে পারি, কিন্তু মানবিক দুর্বলতাবশত আমার স্ত্রী…”

“তাহলে চা খাবেন তো ?”

“যদি অনুমতি করেন তো আমার নিজের বিশেষ গ্লাসটি নিয়ে আসছি,” এই কথা বলে কর্ণেট বারান্দায় বেরিয়ে গেল।

চেঁচিয়ে বলল, “আমার গ্লাসটা দিয়ে যাও।”

কয়েক মিনিটের মধ্যেই দরজাটা খুলে গেল, আর গোলাপী আস্তিনে ঢাকা একখানি হাত একটা গ্লাস বাড়িয়ে ধরল। কর্ণেট এগিয়ে গিয়ে গ্লাসটা নিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে মেয়েকে কি যেন বলল। ওলেনিন কর্ণেটের জন্য চা ঢেলে দিল তার নিজস্ব বিশেষ গ্লাসে, আর ইয়েরশ্‌কার জন্য চা ঢেলে দিল একটা “জাগতিক” গ্লাসে।

চায়ে চুমুক দিয়ে গ্লাসটা খালি করে কর্ণেট বলল, “যাইহোক, আপনাকে আর আটকে রাখব না. মাছ ধরতে আমিও খুব ভালবাসি, আর ছুটি নিয়ে এখানে এসেছি তো অবসর বিনোদনের জন্যই। ভাগ্যের সামনে টোপ ফেলে তেরেকের কিছু উপহার আমার কপালে জোটে কিনা সেটা পরখ করে দেখার ইচ্ছা আমারও আছে। আশা করি, আমাদের গ্রামের প্রথামত আপনিও এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন, আমাদের মদে চুমুক দেবেন।” কর্ণেট মাথা নুইয়ে ওলেনিনের সঙ্গে করমর্দন করে বেরিয়ে গেল। তৈরি হতে হতেই ওলেনিন শুনতে পেল, কর্ণেট ভারিক্কী চালে পরিবারকে নানা-রকম হুকুম করছে, এবং কয়েক মিনিট পরেই দেখল, একটা ছেঁড়া কোট পরে, হাঁটু পর্যন্ত ট্রাউজার গুটিয়ে, মাছ-ধরা জালটা কাঁধে ফেলে কর্ণেট জানালার পাশ দিয়ে চলে গেল।

“জাগতিক” গ্লাসটা শেষ করে ইয়েরশ্‌কা খুড়ো বলে উঠল. “রাস্কেল ! আর সত্যি কি তুমি ওকে ছ' রুবল দেবে নাকি ? এমন কথা কে কবে শুনেছে ? দু' রুবল দিয়ে তো গ্রামের সেরা কুটিরটা পাওয়া যেত। স্কাউণ্ড্রেল ! আরে, আমার বাড়িই তো তোমাকে তিনে দিতে পারতাম।”

“না, আমি এখানেই থাকব,” ওলেনিন বলল।

"ছয় রুবল!...এ তো টাকা-পয়সা ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া।" বুড়ো দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "আইভান, একটু চিকির দাও তো!"

রাস্তায় খাড়া থাকবার জন্য কিছু বিস্কুট ও এক গ্লাস ভদ্‌কা খেয়ে ওলেনিন ও বুড়ো আটটার আগেই বেরিয়ে পড়ল। ফটকেই দেখতে পেল, একটা ষাঁড়ের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। একটা লম্বা ছড়ি হাতে নিয়ে মারিয়াংকা শিঙে বাঁধা দড়ি ধরে ষাঁড়টাকে টেনে নিয়ে চলেছে। একটা সাদা রুমাল প্রায় চোখ পর্যন্ত টেনে দিয়ে মাথায় বেঁধেছে, পায়ে পরেছে হাই বুট।

তাকে ধরবার ভান করে বুড়ো বলে উঠল, "কী রূপ!"

মারিয়াংকা তার দিকে ছড়িটা ঘোরাল, আর খুশি-ভরা সুন্দর চোখে দুজনের দিকেই তাকাল।

ওলেনিনের মনটা আরও হাল্কা হল।

মেয়েটি তাকেই দেখছে বুঝতে পেরে বন্দুকটা কাঁধের উপর ফেলে বলল, "আরে, চলে এস; চলে এস।"

পিছন থেকে মারিয়াংকার গলা শোনা গেল; শোনা গেল চলতি গাড়ির ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ।

গ্রামের পিছনের গো-চারণ ভূমির ভিতর দিয়ে যেতে যেতে ইয়েরশ্‌কা অনবরত বকতে লাগল। সে কিছুতেই কর্ণেটকে ভুলতে পারছে না; তাকে বকেই চলেছে।

"ওর উপর এত চটেছ কেন?" ওলেনিন শুধাল।

"ছোট লোক। আমি এটা পছন্দ করি না," বুড়ো জবাব দিল। "মরলে তো সবই পড়ে থাকবে! তাহলে কার জন্য পয়সা জমাচ্ছে? দুটো বাড়ি করেছে, মামলা করে ভাইয়ের কাছ থেকে দু'নম্বর ফলের বাগানটা বাগিয়েছে। আর এই দালালের ব্যবসাতে কী কুকুরের মত কাজই না করছে! অন্য গ্রাম থেকে লোকরা আসে তাকে দিয়ে কাগজপত্র লিখিয়ে নিতে। আর সে কি না যা খুশি তাই লিখে দিচ্ছে। এই কাজই তো সে করে! কিন্তু কার জন্য জমাচ্ছে? শুধু তো একটা ছেলে আর ঐ মেয়েটি, তার বিয়ে হয়ে গেলে আর কে থাকবে?"

"বেশ তো, তাহলে মেয়ের যৌতুকের জন্য জমাচ্ছে," ওলেনিন বলল।

"যৌতুক কিসের? মেয়েটি ভাল, অনেকেই তাকে চায়। কিন্তু ও শয়তানটা চায় তাকে একটা ধনীলোকের সঙ্গে বিয়ে দিতে। মেয়ের জন্য অনেক টাকা পণ আদায় করতে চায়। ঐ তো লুকাই আছে, সেও কসাক, আমার প্রতিবেশী ও ভাই-পো, চমৎকার ছেলে। ওই তো চেচেনটাকে মেরেছে—ছেলেটা অনেকদিন থেকে ওর আশায় আছে, কিন্তু লোকটা তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চাইছে না। নানান ওজুহাত দেখাচ্ছে। বলছে, 'মেয়ে এখনও ছোট।' কিন্তু তার মনের কথা আমি তো জানি। সে চাইছে

সকলকে পায়ের নীচে রাখতে। তথাপি লুকাশ্‌কার জন্তই তাকে ওরা পাবে কারণ গ্রামের সেই সেরা কসাক, একটি দিঝিগিৎ; সে একটা এব্রেককে মেরেছে, আর ক্রুশ ও পুরস্কার পাবে।"

"কিন্তু তা হলে এসব কি? গত রাতে উঠোনে বেড়াতে বেড়াতে দেখেছি, আমার বাড়িওয়ালার মেয়ে ও একটি কসাক পরস্পরকে চুমো খাচ্ছে," ওলেনিন বলল।

"তোমার কথা বিশ্বাস করি না," বুড়ো দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বলল।

"শপথ করে বলছি," ওলেনিন বলল।

"বড় শয়তানী মেয়ে তো," ইয়েরশ্‌কা বলল; তারপর গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। "কিন্তু কসাকটি কে?"

"সেটা দেখতে পাই নি।"

"আচ্ছা, ছেলেটা দেখতে কেমন, ফর্সা?"

"হ্যাঁ।"

"লাল কোট? তোমার মত লম্বা?"

"না, আর একটু লম্বা।"

"আরে, এ তো সেই।" ইয়েরশ্‌কা হো-হো করে হেসে উঠল। "এ তো স্বয়ং মার্কা! তার নাম লুকা, কিন্তু আমি ঠাট্টা করে মার্কা বলে ডাকি। স্বয়ং মার্কা! আমি ওকে ভালবাসি। আমিও ঠিক ওইরকম ছিলাম। আমার প্রেয়সী ঘুমত তার মা ও বৌদির সঙ্গে, কিন্তু আমি ঠিক চলে যেতাম। সে ঘুমত দোতলায়, আর তার মা ছিল সাক্ষাৎ ডাইনী। আমাকে কী যেন্নাই করত। দেখ, আমি যেতাম বন্ধু গিরচিককে সঙ্গে নিয়ে। দুজনে জানালার নীচে হাজির হতাম, আর আমি তার কাঁধের উপর উঠে জানালাটা তুলে দিয়ে অন্ধকারে হাতড়াতে শুরু করতাম। সেখানেই একটা বেঞ্চিতে সে ঘুমত। একদিন তো সে জেগে উঠে হাঁক ডাকই শুরু করে দিয়েছিল। আমাকে চিনতেই পারে নি। হাঁক দিয়ে বলল, 'কে?' আমিও জবাব দিতে পারি না। তার মারও জেগে ওঠার উপক্রম। তাড়াতাড়ি টুপিটা খুলে তার মুখের উপর চেপে ধরলাম, আর সেও চিনতে পারল, কারণ টুপিটা ছেঁড়া ছিল; তারপর সে ছুটে বেরিয়ে এল। সে সময়ে যা চাইতাম সে সব কিছু পেয়ে যেতাম। জমাট মাখন, আঙুর, সব কিছু নিয়ে আসত। আর শুধু সে একাই তো নয়। আহা, সে কী জীবন!"

"আর এখন?"

"এখন কুকুরের পিছনে ছোট, একটা পাখি এসে গাছের ডালে বসুক, আর তুমি গুলি কর।"

"একবার মারিয়াংকার জন্ত চেষ্টা করছ না কেন?"

"কুকুরের উপর নজর রাখ। আজ রাতেই তোমাকে দেখাব," প্রিয় কুকুর

লিয়ামকে দেখিয়ে বুড়ো বলল।

একটু চুপ করে থেকে দুজনে আবার কথা বলতে শুরু করল। শ'খানেক পা গিয়ে বুড়ো থেমে গিয়ে পথের উপরে একটা গাছের ডাল দেখাল।

বলল, "ওটা দেখে কি মনে হয়? কিচ্ছু না? ওই ডালটার তো ওখানে পড়ে থাকা উচিত নয়। এটা খারাপ!"

"কেন?"

"আরে, তুমি কিচ্ছু জান না। শোন। ওভাবে কোন ডাল পড়ে থাকলে কখনও সেটাকে পেরিয়ে যাবে না। হয় ওটাকে ঘুরে যাবে, অথবা এইভাবে পথ থেকে সরিয়ে ফেলে বলবে, 'পিতা, পুত্র, ও পবিত্র আত্মা,' আর তারপর ঈশ্বরের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে চলে যাবে। তোমার কিচ্ছু হবে না। বুড়োরা আমাকে তাই শিখিয়েছে।"

"চল, যত সব বাজে কথা!" ওলেনিন বলল। "তার চাইতে মারিয়াংকার কথা বল। সে কি লুকাশ্‌কার সঙ্গেই চালিয়ে যাচ্ছে?"

"চুপ···এখন চুপ কর!" বুড়ো ফিস্‌ফিস্ করে বাধা দিল। "এখন শুধু শোন। আমরা জঙ্গলটাকে ঘুরে যাব।"

বুড়োর পায়ে নরম জুতো। আস্তে পা ফেলে একটা সরু পথ ধরে সে গভীর জঙ্গলে ঢুকে গেল। ওলেনিন তার ভারী বুটের শব্দ করতে করতে চলল; বার কয়েক তার বন্দুকটা অসাবধানে গাছের ডালপালায় জড়িয়েও গেল। বুড়ো ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে দেখল।

রেগে ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, "ওরকম শব্দ করো না। আস্তে পা ফেল!"

মনে হচ্ছে সূর্য উঠে গেছে। কুয়াসা মিলিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু গাছের মাথা এখনও কুয়াসায় ঢাকা। বনটাকে অত্যন্ত উঁচু দেখাচ্ছে। প্রতি পদক্ষেপে দৃশ্যপট বদলে যাচ্ছে। যাকে গাছ মনে হচ্ছিল, দেখা গেল সেটা একটা ঝোপ, আর একটা নল-খাগড়াকে দেখে মনে হচ্ছে একটা গাছ।

অধ্যায়—১৯

চারদিক নিস্তব্ধ। প্রথমে গ্রাম থেকে যেসব শব্দ আসছিল এখন আর শিকারীরা তা শুনতে পাচ্ছে না। শুধু কুকুরের পায়ের নীচে শুকনো পাতার খচ্‌মচ্‌ আর মাঝে মাঝে পাখিদের ডাক শোনা যাচ্ছে। ওলেনিন জানে, জঙ্গলে পদে পদে বিপদ, এব্রেকরা লুকিয়ে থাকে সর্বত্র। কিন্তু সে এও জানে যে জঙ্গলে পায়ে-হাঁটা মানুষের বড় ভরসা তার বন্দুক। সে যে ভয় পেয়েছে তা নয়, তবে তার জায়গায় অন্য কেউ হলে ভয় পেতে পারত। কুয়াশা-ঢাকা স্যাঁতসেতে বনের দিকে তাকিয়ে এবং কান পেতে দু'একটা অস্পষ্ট আওয়াজ শুনে সে বন্দুকটাকে কঠিন মুঠিতে চেপে ধরল; তার মনে জাগল একটা মধুর

নতুন অনুভূতি। আগে আগে চলেছে ইয়েরশ্‌কা খুড়ো। যেখানেই জলা আয়গা দেখছে সেখানেই থেমে কোন জন্তুর জোড়া পায়ের দাগ ভাল করে পরীক্ষা করছে আর ওলেনিনকে দেখাচ্ছে। মুখে কোন কথা নেই; শুধু মাঝে মাঝে ফিস্‌ফিস্ করে দু' একটা মন্তব্য করছে। সে গভীর জঙ্গলে কখনও গৃহপালিত পশুর পায়ের দাগ পড়ে নি প্রতিটি বাঁকে তা দেখে ওলেনিন অবাক হয়ে যাচ্ছে, কারণ এরকম সে আগে কখনও দেখে নি। এই জঙ্গল, বিপদ, বুড়ো মানুষটি ও তার ফিস্‌ফিস্ কথা, মারিয়াংকার যৌবনপুষ্ট খাড়া দেহ, পাহাড়—সবই তার কাছে স্বপ্নের মত মনে হতে লাগল।

চারদিকে তাকিয়ে টুপিটাকে মুখের উপর টেনে নামিয়ে বুড়ো ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "একটা পাখি বসেছে। তোমার মুখটা ঢাক! একটা পাখি! ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ওলেনিনের দিকে তাকিয়ে সে চার হাত-পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে লাগল। "পাখিরা মানুষের মুখ পছন্দ করে না।"

বুড়ো একটা গাছের কাছে থেমে ভাল করে নজর করল। ওলেনিন একটু পিছিয়ে পড়েছে। একটা মোরগকে দেখে কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে উঠল, পাখিটাও ডাকল। ওলেনিনও পাখিটাকে দেখতে পেল, আর ঠিক সেই মুহূর্তে ইয়েরশ্‌কার মস্ত বড় বন্দুকটা কামানের মত গর্জে উঠল। পাখিটা পাখা ঝটপটিয়ে একটু উড়েই মাটিতে পড়ে গেল। বুড়োর দিকে এগিয়ে যেতে ওলেনিন একটা পাখিকে উড়িয়ে দিল। তাড়াতাড়ি বন্দুক তুলে নিশানা ঠিক করে গুলি ছুঁড়ল। পাখিটা মুহূর্তের জন্য উড়ে গিয়ে গাছের ডালে ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

বুড়ো হাসতে হাসতে চেঁচিয়ে বলল, "সাবাস ব্যাটা!" সে নিজে উড়ন্ত পাখিকে গুলি করতে পারে না।

পাখিগুলোকে তুলে নিয়ে তারা হাঁটতে লাগল। সাফল্য ও প্রশংসার উত্তেজনায় ওলেনিন অনবরত কথা বলতে লাগল।

"থাম! এদিকে এস," ইয়েরশ্‌কা বাধা দিল! "কাল এখানে হরিণের পায়ের দাগ দেখেছি।"

ছোট ঝোপের পথ ধরে শ' তিনেক পা যাবার পরে তারা নল-খাগড়ায় ঢাকা একটা নালার মধ্যে নামল। ওলেনিন বুড়ো শিকারীর চলার সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না। তার থেকে প্রায় বিশ পা দূরে ইয়েরশ্‌কা খুড়ো থেমে গেল; হাত নেড়ে তাকে ইসারা করল। কাছে গিয়ে ওলেনিন দেখল, ইয়েরশ্‌কা মানুষের পায়ের দাগ দেখাচ্চে।

"দেখতে পাচ্ছ?"

"আচ্ছা?" যথাসম্ভব শান্ত গলায় ওলেনিন বলতে চেষ্টা করল। "মানুষের পায়ের দাগ দেখছি।"

আপনা থেকেই কুপারের "পথিকৃৎ" এবং এব্রেকদের কথা ওলেনিনের

মনে ঝিলিক দিয়ে উঠল ; কিন্তু বুড়োর রহস্যময় ভাবভঙ্গী দেখে তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে ইতস্তত করল ; সে বুঝতেই পারল না এই রহস্যময়তার কারণ বিপদের আশংকা না শিকারের মজা।

বুড়ো সহজ গলায় বলল, "না, এটা আমার নিজেরই পায়ের দাগ।" সে ঘাসের উপর একটা পায়ের দাগ দেখাল।

বুড়ো চলতে লাগল ; ওলেনিনও সঙ্গে সঙ্গে চলল। প্রায় বিশ পা নীচে নেমে একটা ঝাঁকড়া ন্যাসপাতি গাছের নীচে কালো মাটির উপর কোন জন্তুর তাজা মল দেখতে পেল। জায়গাটা বুনো আঙুরলতায় ছাওয়া ; অন্ধকার, ঠাণ্ডা।

বুড়ো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আজ সকালেই ওটা এখানে এসেছিল ; মাটি এখনও ভেজা রয়েছে।"

হঠাৎ প্রায় দশ পা দূরে জঙ্গলের মধ্যে তারা একটা প্রচণ্ড শব্দ শুনতে পেল। চমকে উঠে দুজনই বন্দুকে হাত দিল, কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না, শুধু শুনতে পেল ডাল ভাঙার শব্দ। একমুহূর্তের জন্য দ্রুতগতিতে তালে তালে লাফাবার একটা শব্দ শোনা গেল, আর তারপরেই একটা ফাঁকা আওয়াজ জঙ্গলের মধ্যে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ক্রমাগত দূরে মিলিয়ে গেল। ওলেনিনের মনে হল, কেউ যেন তার বুকে সজোরে আঘাত করেছে। বৃথাই সবুজ ঝোপঝাড়ের দিকে তাকিয়ে সে বুড়ো লোকটির দিকে মুখ ফেরাল। ইয়েরশ্‌কা খুড়ো তখনও বন্দুকটা ঘাড়ে নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে ; টুপিটা পিছনে সরে গেছে, চোখ দুটো অস্বাভাবিকভাবে জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে, আর হাঁ-করা মুখের ভিতর থেকে পোকায় খাওয়া হল্‌দে দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে।

"একটা শিংওলা হরিণ!" বিড়বিড় করে কথাটা বলে হতাশ হয়ে বন্দুকটা নামিয়ে রেখে সে পাকা দাড়িতে হাত বুলোতে লাগল। "ঠিক এখানেই দাঁড়িয়েছিল। আমাদের পথ ধরে ঘুরে আসা উচিত ছিল।... বোকা! বোকা!" রাগে নিজের দাড়িতে টান দিয়ে যন্ত্রণাকাতর গলায় বলল, "বোকা! শুয়োরের বাচ্চা!"

মনে হল জঙ্গলের মাথার উপরে কুয়াসার ভিতর দিয়ে কিছু একটা উড়ে যাচ্ছে ; পলায়মান হরিণের শব্দ দূর হতে দূরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত, কিন্তু উৎসাহে ভরপুর হয়ে ওলেনিন যখন বুড়োকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। খাবার প্রস্তুত। দুজনে বসে পান-ভোজন শেষ করে বেশ খুশি হয়ে উঠল। সে বারান্দায় গেল। সূর্যাস্তের আভায় আবার তার চোখের সামনে দেখা দিল পর্বতশ্রেণী। বুড়ো মানুষটি আর একবার বলতে লাগল শিকার, এব্রেক, প্রেয়সী, ও একটি অসমসাহসিক উচ্ছৃংখল বন্য জীবনের নানা গল্প। ওদিকে মারিয়াংকাও আবার উঠান

পেরিয়ে বাইরে আসা-যাওয়া করতে লাগল ; তার ফ্রকের রেখাচিত্রে দেখা গেল তার দে'হর যৌবনপুষ্ট কুমারী সৌন্দর্য।

অধ্যায়—২০

যেখানে দুজনে হরিণটাকে চমকে দিয়েছিল, পরদিন ওলেনিন একাই সেখানে গেল। ফটক দিয়ে ঘুরে না গিয়ে সে অন্য সকলের মতই কাঁটাগাছের বেড়াটা ডিঙিয়ে ভিতরে ঢুকল এবং কোটটাকে কাঁটা থেকে ছাড়িয়ে নেবার আগেই তার কুকুরটা ছুটে গিয়ে দুটো পাখিকে সজাগ করে দিল। ঝোপের কাছে পৌছবার আগেই পাখিগুলো ছুটতে শুরু করল। ওলেনিন বারো বার গুলি ছুঁড়ে পাঁচটা পাখি মারল। কিন্তু ঝোপের ভিতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে ক্লান্তিতে তার সারা শরীর থেকে ঘাম ঝরতে লাগল। কুকুরগুলোকে ডেকে নিয়ে সে ধীরে ধীরে আগের দিনের জায়গাটাতে ফিরে চলল। পথে আরও দুটো পাখি শিকার করা হল।

দিনটা পরিষ্কার, শান্ত, খুব গরম। জঙ্গলের মধ্যেও সকাল বেলাকার ভিজে ভাবটা শুকিয়ে গেছে। লাখ লাখ মশা এসে তার মুখ, পিঠ ও দুই হাত একেবারে ঢেকে ফেলছে। পিঠটা মশাতে ছেয়ে যাওয়ায় তার কালো কুকুরটা ধূসর হয়ে গেছে ; ওলেনিনের কোটেরও সেই অবস্থা ; কোটের ভিতর দিয়েই মশারা হুল ফোটাচ্ছে। ওলেনিনের মনে হল ছুটে পালিয়ে যাবে ; গ্রীষ্মকালে এই গ্রামে বাস করা তার পক্ষে অসম্ভব। বাড়ি ফিরবার কথা ভাবতেই তার মনে পড়ল, অন্যরা তো এই যন্ত্রণা সহ্য করেই এখানে থাকে, তাই সেও মশাদের হাতে নিজেকে ছেড়ে দেওয়াই স্থির করল। আর কী আশ্চর্য, দুপুর নাগাদই সব কিছু তার বেশ ভাল লেগে গেল। তার একথাও মনে হল যে, চারদিকে এই মশার ঝাঁক, হাতের চাপে মুখময় মশা ও ঘামের মাখামাখি, সারা শরীরে এই অবিরাম অস্বস্তি, এসব না থাকলে বুঝি জঙ্গলের আকর্ষণ ও রূপই কমে যেত। হঠাৎ সে ভাবতে লাগল : "আমি দিমিত্রি ওলেনিন অন্য সব রকম জীব থেকে আলাদা হয়েও এখন একাকি কোথায় আছি— যেখানে থাকত একটি হরিণ। এখানে আমি বসে আছি, আর আমার চারদিকে দাঁড়িয়ে আছে ছোট-বড় কত গাছ ; একটা গাছকে জড়িয়ে উঠেছে বুনো দ্রাক্ষালতা ; পাখিরা উড়ছে ; হয়তো নিহত সঙ্গীদের গন্ধ তারা পেয়েছে। আর আছে মশার দল ; বাতাসে ভেসে ভেসে তারা গুনগুন করছে ; একটি, দুটি, তিনটি, চারটি, একশ, এক হাজার, লক্ষ লক্ষ মশা গুনগুন করে ফিরছে ; তারাও প্রত্যেকেই এক একটি দিমিত্রি ওলেনিন, আমার মতই অন্য সকলের চাইতে আলাদা।" মশারা গুনগুন করে কি বলছে তা যেন সে স্পষ্ট শুনতে পেল : "এই পথে, এই পথে বাছারা! এই তো আমাদের খাদ্য!" গুনগুন

করে তারা তাকে ছেঁকে ধরল। আর অমনি তার স্পষ্ট মনে হল যে সে এক-জন রুশ সম্ভ্রান্ত লোক নয়, মস্কো সমাজের লোক নয়, অমুক-তমুকের বন্ধু বা আত্মীয়ও নয়; এইমুহূর্তে তার চারপাশে যেসব মশা, পাখি, বা হরিণ বাস করছে সেও তাদেরই একজন। "ঠিক তাদের মতই, ইয়েরশ্‌কা খুড়োর মতই, আমিও কিছুদিন বেঁচে থেকে মরে যাব, আর খুড়ো ঠিকই বলেছে—ঘাস গজিয়ে উঠবে, আর কিছুই হবে না।'

সে ভেবেই চলল: "ঘাস গজিয়ে উঠলেই বা কি? তবু আমাকে বাঁচতে হবে, সুখী হতে হবে, কারণ আমি শুধু সুখই চাই। অন্যের মত আমিও একটি জীব, আমার উপরে ঘাস গজাবে, আর কিছুই নয়; অথবা আমিও ঈশ্বরের একটি ক্ষুদ্র অংশ,—কিন্তু তাতে কি! তবু আমাকে ভাল-ভাবে বাঁচতে হবে। তাহলে সুখী হতে হলে আমাকে কিভাবে বাঁচতে হবে, আর আগেই বা আমি সুখী হতে পারি নি কেন?" নিজের পূর্ব জীবনের কথা মনে করে সে নিজের উপরই বিরক্ত হয়ে উঠল। আবার তার চোখ পড়ল গাছপালাগুলোর দিকে; তার ভিতর দিয়ে সূর্যের আলো ঠিকরে পড়ছে; সূর্য অস্ত যাচ্ছে; আকাশ পরিষ্কার। আবার সে আগেকার মতই সুখী হয়ে উঠল।

সহসা একটা নতুন আলো যেন তার চোখের সামনে ফুটে উঠল। নিজের মনেই বলল, "এই তো সুখ! অন্যের জন্য বেঁচে থাকাতেই তো সুখ। এটা তো স্পষ্ট সত্য। প্রতিটি মানুষের অন্তরেই আছে সুখের বাসনা; কাজেই সেটা সঙ্গত। স্বার্থপরের মত সে বাসনা পূর্ণ করতে চেষ্টা করলেই—অর্থাৎ নিজের জন্য অর্থ, খ্যাতি, আরাম অথবা ভালবাসা চাইলেই—এমন অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে যাতে সে বাসনাকে পূর্ণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাহলেই দেখা যাচ্ছে, এই সব বাসনাই অসঙ্গত, সুখের দাবীটা নয়। কিন্তু পারি-পার্শ্বিক অবস্থা সত্ত্বেও কোন্ বাসনাকে সব সময়ই পূর্ণ করা যায়? সেগুলি কি? ভালবাসা, আত্মত্যাগ।" এ সত্যকে উপলব্ধি করে সে এত খুশি ও উত্তেজিত হয়ে উঠল যে লাফিয়ে উঠে এমন কাউকে খুঁজতে লাগল যার কাছে সে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারে, যার কল্যাণ করতে পারে, যাকে ভালবাসতে পারে। সে ভাবতে লাগল, "নিজের জন্য যখন কেউ কিছু চায় না, তখন অন্যের জন্য বাঁচতে দোষ কি?"

তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এ নিয়ে আরও ভাবনা-চিন্তা করতে এবং অপরের কল্যাণ সাধনের সুযোগ খুঁজে নিতে সে বন্দুকটা হাতে নিয়ে জঙ্গলের ভিতর থেকে বের হতে লাগল।

একটা খোলা জায়গায় পৌঁছে চারদিকে তাকাতে লাগল। গাছের মাথায় সূর্যকে আর দেখা যাচ্ছে না। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। জায়গাটাকে কেমন যেন নতুন লাগছে, চারদিকের গ্রামগুলোর মত নয়। সব কিছুই যেন বদলে গেছে

—আবহাওয়া ও বনের বৈশিষ্ট্য; আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, গাছের মাথায় বাতাসের শন্‌শন্‌ শব্দ, চারদিকে নলবন ও শুকনো ভাঙা গাছ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছে না। একটা জন্তুকে তাড়া করে কুকুরটা দূরে চলে গিয়েছিল। সেটাকে ডাকল, আর মরুভূমির মত তার নিজের স্বরটাই ফিরে এল। হঠাৎ একটা ভীষণ ভয় তাকে পেয়ে বসল। এব্রেকদের মনে পড়ল, মনে হল, যেকোন মুহূর্তে একটা ঝোপের পিছন থেকে একটি এব্রেক তার উপর লাফিয়ে পড়তে পারে, তখন তো তাকে আত্মরক্ষা করতে হবে, মরতে হবে, অথবা ভীরু সাজতে হবে। ঈশ্বর ও পরজন্মের কথা তার মাথায় এল, অথচ অনেকদিন সেসব কথা সে ভাবে নি। চারদিকে একটা বিষণ্ণ, কঠিন, বন্য প্রকৃতি। সে ভাবতে লাগল, "যখন যে কোন মুহূর্তে তুমি মরতে পার, কারও কোন ভাল না করেই মরতে পার, আর এমনভাবে মরতে পার যে কেউ সেকথা জানতেও পারবে না, তখন নিজের জন্য বেঁচে থাকার কি কোন দাম আছে?" যেদিকে গ্রাম আছে বলে মনে হল সেইদিকেই সে পা চালিয়ে দিল। হঠাৎ পিছনের নলবনে খচ্‌মচ্‌ শব্দ হল। ভয়ে শিউরে উঠে সে বন্দুকটা চেপে ধরল। পরমুহূর্তেই লজ্জায় অভিভূত হল। অতি উত্তেজনায় হাঁপাতে হাঁপাতে তার কুকুরটাই নালার ঠাণ্ডা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কাটছে।

সেও জল খেল; তারপর কুকুরটার পিছু পিছু হাঁটতে লাগল; মনে হল, কুকুরটাই তাকে গ্রামে পৌছে দেবে। কিন্তু কুকুর সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও সব কিছুর মধ্যেই সে যেন বিপদের ছায়া দেখতে পেল। ক্রমেই অন্ধকার হয়ে আসছে, পুরনো ভাঙা গাছগুলোর মাথায় বাতাস ক্রমেই জোরে বইছে। সেই-সব গাছে বড় পাখিরা কিচির-মিচির করে বাসার চারদিকে ঘুরছে। বাতাসের হাহাকারের সঙ্গে মিশেছে আর একটা নিরানন্দ একঘেয়ে গর্জন। তার মনটা একেবারেই ভেঙে পড়ল। পিছনে হাত দিয়ে কোমরে ঝোলানো পাখির হিসাব করতে গিয়ে বুঝল একটা খোয়া গেছে। শরীরটা ছিঁড়ে পড়ে গেছে, শুধু রক্তাক্ত গলা ও মাথাটা কোমরবন্ধের সঙ্গে বাঁধা আছে। সে আরও ভয় পেল। এত ভয় সে কখনও পায় নি। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগল; সব চাইতে বড় ভয়, কারও কিছু ভাল করার আগেই পাছে তার মৃত্যু হয়; সে যে বেঁচে থাকতে চায়, একটা বিরাট আত্মোৎসর্গের জন্যই বাঁচতে চায়।

অধ্যায়—২১

হঠাৎ যেন তার বুকের মধ্যেই নতুন সূর্য ঝলমলিয়ে উঠল। কানে এল রুশ ভাষার কথা, তেরেখের খরস্রোতের ধ্বনি; কয়েক পা এগিয়ে সামনেই দেখতে পেল স্রোতস্বতী নদীর বুক ও দুই তীরের ভিজে বালি, দূরের তৃণ-

ভূমি, নদীর উপরে রক্ষী-বেষ্টনীর পাহারা—বুরুজ, ঝোপের মধ্যে জিন-পরা একটা ঘোড়া, আর তারপরেই দূর বিস্তার পর্বতমালা। মুহূর্তের জন্য মেঘের আড়াল থেকে দেখা দিল লাল সূর্য, তার শেষ রশ্মিপাতে ঝিলমিল্ করে উঠল নদীর জল, নলবন, পাহারা—বুরুজ, ও একদল কসাক; তার চোখ পড়ল লুকাশ্কার দীপ্ত মূর্তির উপর।

ওলেনিনের মনে হল কোন আপাত কারণ ছাড়াই সে আবার সম্পূর্ণ সুখী হয়েছে। ততক্ষণে সে তেরেক নদীর অপর তীরবর্তী একটা শান্ত আউলের বিপরীত দিককার নিঝনে-প্রতৎস্কি ঘাঁটিতে পৌঁছে গেছে। কসাকদের সঙ্গে দেখা হল, কিন্তু কারও কোন উপকার করবার মত সুযোগ খুঁজে পেল না; কুটিরের মধ্যে ঢুকেও সে সুযোগ মিলল না। কসাকরা তাকে উদাসীনভাবেই গ্রহণ করল। মাটির ঘরে ঢুকে সে একটা সিগারেট ধরাল। কসাকরা তার দিকে কোনরকম নজরই দিল না, তার কারণ প্রথমত সে সিগারেট খাচ্ছে, আর দ্বিতীয়ত তাদের সামনে তখন অন্য আকর্ষণ ছিল। নিহত এব্রেকের আত্মীয় কয়েকজন বিরোধী চেচেন পাহাড়ি অঞ্চল থেকে এসেছে মুক্তি-পণ দিয়ে মৃতদেহটা নিয়ে যেতে; অফিসার-কম্যাণ্ডিং কখন গ্রাম থেকে ফিরবে তার জন্যই কসাকরা অপেক্ষা করে আছে। মৃত লোকটির দাদা যেমন লম্বা তেমনই সুঠাম দেহের অধিকারী; ছোট করে ছাঁটা দাড়িতে লাল কলপ লাগানো, কোট ও টুপি ছেঁড়া হলেও তার চাল-চলন রাজার মতই শান্ত ও গম্ভীর। মুখটা মৃত এব্রেকের মতই দেখতে। কারও দিকে একবারও তাকাচ্ছে না; মৃতদেহের দিকেও তাকায় নি; গাছের ছায়ায় গোড়ালির উপর ভর দিয়ে বসে ছোট পাইপটা টানছে আর থুথু ফেলছে; মাঝে মাঝে গলার ভিতর থেকে আওয়াজ করে যেসব নির্দেশ দিচ্ছে সঙ্গের লোকরা সশ্রদ্ধভাবে তা পালন করছে। সে নিশ্চয় একটি দিঝিগিৎ; নিশ্চয় নানা পরিস্থিতিতে অনেকবারই রুশদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছে; তাই তাদের কোন কিছুই তাকে অবাক করছে না, আকর্ষণও করছে না। ওলেনিন মৃতদেহের কাছে গিয়ে সেদিকে তাকাতেই লোকটি শান্ত ঘৃণার সঙ্গে তার পাশ দিয়ে তাকিয়ে ক্রুদ্ধ, তীক্ষ্ণ গলায় কি যেন বলল, আর একটি স্কাউট তাড়াতাড়ি তার কোট দিয়ে মৃতদেহটাকে ঢেকে দিল। দিঝিগিৎটির মুখের মর্যাদাসম্পন্ন কঠিনভাব দেখে ওলেনিন অবাক হয়ে গেল। সে কোন্ গ্রাম থেকে এসেছে জিজ্ঞাসা করায় চেচেনটি ওলেনিনের দিকে না তাকিয়েই তাচ্ছিল্যভরে থুথু ফেলে মুখটা ঘুরিয়ে নিল। ওলেনিন ভাবল, লোকটি বোকা ও রুশ ভাষা জানে না বলেই এরকম ব্যবহার করেছে; তাই সে স্কাউটটির দিকে ফিরে তাকাল; সে লোকটি দোভাষীর কাজও করছে। স্কাউটটির পরনেও একই রকম ছেঁড়া পোশাক, কিন্তু তার মাথার চুল কালো, চঞ্চল, ঝকমকে সাদা দাঁত, চকচকে কালো চোখ। সে সাগ্রহে কথাবার্তা শুরু করল এবং একটা সিগারেট চাইল।

ভাঙা-ভাঙা রুশ ভাষায় বলতে শুরু করল, "ওরা ছিলেন পাঁচ ভাই; এই নিয়ে তিনজনকে রুশরা মেরে ফেলল; আর বাকি আছে দুজন। ইনি একজন দিঝিগিৎ, মস্তবড় দিঝিগিৎ!" চেচেনকে দেখিয়ে বলল। "ওরা যখন আহমেৎ খানকে খুন করল, ইনি তখন অপর তীরে নলবনের মধ্যে বসেছিলেন। সবই দেখেছেন। নৌকোতে তুলে তীরে আনাও দেখেছেন। সারারাত সেখানেই বসেছিলেন; বুড়ো লোকটিকে খুন করতেই চেয়েছিলেন, কিন্তু অন্যরা তা করতে দেয় নি।"

লুকাশ্‌কা বক্তার কাছে এগিয়ে গিয়ে বসল।

জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কোন্ আউল থেকে এসেছ?"

তেরেকের ওপারে কুয়াসা ঢাকা নীলাভ খাঁড়ির দিকে আঙুল তুলে স্কাউট বলল, "ওই পাহাড় থেকে স্যুয়ুক্‌-স্যু চেন তো? সেখান থেকে আট মাইল দূরে।"

লুকাশ্‌কা শুধাল, "স্যুয়ুক্‌-স্যুর গিরাই খানকে চেন? সে আমার কুনাক।"

"সে আমার প্রতিবেশী," স্কাউট জবাব দিল।

"খুব ভাল লোক!" লুকাশ্‌কা তাতার ভাষায় স্কাউটের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিল।

ইতিমধ্যে একজন কসাক লেফ্‌টেনাণ্ট ও গ্রাম-প্রধান ঘোড়ায় চড়ে এসে হাজির হল; সঙ্গে দুজন কসাক। সম্প্রতি কমিশন-প্রাপ্ত কসাক অফিসারটি কসাকদের "সুস্বাস্থ্য কামনা" করল, কিন্তু রুশ সেনাদলের প্রথা অনুযায়ী কেউ "সুস্বাস্থ্য, ইয়োর অনার" বলে প্রত্যুত্তরে অভিবাদন জানাল না; শুধু লুকাশ্‌কাসহ অল্প কয়েকজন দাঁড়িয়ে ঈষৎ মাথা নোয়াল। ওলেনিনের কাছে সবই হাস্যকর লাগল; এই কসাকরা যেন সৈনিক-সৈনিক খেলা করছে। অচিরেই কাজের কথা শুরু হয়ে গেল। একটা দলিল তৈরি করে স্কাউটকে দেওয়া হল, তার কাছ থেকে কিছু টাকা নেওয়া হল, তারপর সকলে মৃতদেহটার দিকে এগিয়ে গেল।

লেফটেনাণ্ট শুধাল, "তোমাদের মধ্যে লুকা গাভ্রিলভ কে?" লুকাশ্‌কা টুপি খুলে এগিয়ে এল।

"তোমার কাজের খবর আমি কম্যাণ্ডারকে জানিয়েছি। ফল কি হবে তা জানি না। আমি একটা ক্রুশের জন্য তোমার নাম সুপারিশ করেছি। কর্পোরাল হবার পক্ষে তোমার বয়স বড়ই অল্প। পড়তে জান?"

"না, জানি না।"

কম্যাণ্ডারোচিত ভঙ্গীতে লেফ্‌টেনাণ্ট বলল, "কিন্তু তুমি তো দেখতে খুব সুন্দর! টুপিটা মাথায় দাও। ছেলেটি কোন্ গাভ্রিলভ পরিবার থেকে এসেছে?...ব্রড, অ্যা?"

"তার ভাইপো," কর্পোরাল জবাব দিল।

"বুঝেছি, বুঝেছি। আচ্ছা, তোমরাও হাত লাগাও," কসাকদের দিকে ফিরে বলল।

লুকাশ্‌কার মুখটা খুশিতে ঝলমল করে উঠল; তাকে আগের চাইতেও সুন্দর দেখাচ্ছে। কর্পোরালের কাছ থেকে সরে এসে টুপিটা মাথায় দিয়ে সে ওলেনিনের পাশে বসে পড়ল।

মৃতদেহ নৌকোতে তোলা হলে দাদা চেচেন তীর বেয়ে নেমে গেল। কসাকরা সরে গিয়ে তাকে পথ করে দিল। লাফিয়ে নৌকোয় পা দিয়ে সজোরে ঠেলে দিয়ে তীর থেকে সরে গেল, এবং এই প্রথম কসাকদের উপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে হঠাৎ সঙ্গীকে কি যেন প্রশ্ন করল। সেও জবাব দিয়ে আঙুল তুলে লুকাশ্‌কাকে দেখাল। চেচেন একবার তার দিকে তাকিয়ে চলে যেতে যেতে নদীর অপর তীরের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। সে দৃষ্টিতে প্রকাশ পেল ঘৃণা নয়, একটা নিরুচ্ছ্বাস তাচ্ছিল্য। কি যেন বলল।

ওলেনিন স্কাউটকে জিজ্ঞাসা করল, "ও কি বলছে?"

"তোমরা আমাদের খুন কর, আমরা তোমাদের খুন করি। সেই একই ব্যাপার," স্কাউট জবাব দিল। বোঝাই গেল জবাবটা সে নিজেই বানিয়েছে। সাদা দাঁত বের করে হেসে সেও লাফিয়ে নৌকোতে উঠল।

মৃতের দাদা অপর তীরের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে আছে। বিদ্বেষে ও ঘৃণায় তার মন এত বেশী ভরে উঠেছে যে নদীর এপারে কিছুই তার কৌতুহল জাগাতে পারছে না। নৌকোর শেষ প্রান্তে বসে একবার এ-পাশে একবার ও-পাশে দাঁড় ফেলতে ফেলতে সে অবিরাম কথা বলতে লাগল। নৌকোটা ক্রমেই ছোট হতে হতে কাৎ হয়ে স্রোত কেটে এগিয়ে চলল; তাদের কথাবার্তা ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে এল; অবশেষে তারা নদীর ওপারে গিয়ে নামল। সেখানে তাদের ঘোড়া দাঁড়িয়েছিল। শবটা তুলে নিয়ে একটা ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে তারা ধীর গতিতে একটা আউলের পাশ দিয়ে অগ্রসর হল; তাদের দেখতে আউলের ভিতর থেকে অনেক লোক বেরিয়ে এল।

নদীর রুশদের দিককার তীরের কসাকরা সকলেই খুব খুশি। চারদিকে হাসি ও তামাসার শব্দ। লেফ্‌টেনাণ্ট ও গ্রাম-প্রধান বিশ্রামের জন্য মাটির কুটিরে ঢুকল। হাঁটুর উপর কনুই রেখে লুকাশ্‌কা ওলেনিনের পাশেই বসে রইল।

বলল, "তুমি তামাক খাও কেন? এটা কি ভাল?"

ওলেনিন জবাব দিল, "অভ্যাস হয়ে গেছে আর কি। কেন বলতো?"

"হুম, আমরা তামাক খেলেই যত দোষ!" লুকাশ্‌কা বলতে লাগল, "ওদিকে দেখ, পাহাড় এখান থেকে বেশী দূরে নয়, অথচ তুমি ওখানে যেতে পার না! তুমি একা ফিরবে কেমন করে? অন্ধকার হয়ে আসছে। যদি চাও তো আমি তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারি। কর্পোরালকে বল

আমাকে ছুটি দিতে।"

কসাকটির হাসিখুশি মুখের দিকে তাকিয়ে ওলেনিন ভাবল, "কী সুন্দর মানুষ!" ফটকের পাশে মারিয়াংকার চুমো খাওয়ার শব্দের কথা তার মনে পড়ে গেল; লুকাশ্‌কা ও তার সংস্কৃতির অভাবের কথা মনে করে তার খারাপ লাগল। "এ কী কাণ্ড! একজন আর একজনকে খুন করল, আর তাতেই সে এত খুশি ও পরিতুষ্ট যেন চমৎকার একটা কাজ করেছে। সে কি বুঝতে পারে না যে তার আনন্দ করার কোন হেতু নেই, কাউকে খুন করার মধ্যে সুখ নেই, সুখ শুধু আত্মত্যাগে?"

জনৈক কসাক লুকাশ্‌কাকে বলল, "দেখ বন্ধু, এখন কিছুদিন ওর সঙ্গে যেন তোমার দেখা সাক্ষাৎ না ঘটে! শুনলে তো সে তোমার কথাই জিজ্ঞাসা করছিল?"

লুকাশ্‌কা মাথা তুলে বলল, "আমার ধর্মছেলে?" সে মৃত চেচেনকেই বোঝাতে চাইল।

"তোমার ধর্মছেলে আর উঠে আসবে না, কিন্তু ওই লাল মানুষটা ধর্ম-ছেলের দাদা!"

"সে নিজে যে বেঁচে গেছে সেজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিক," লুকাশ্‌কা জবাব দিল।

"তুমি এত খুশি হয়েছ কেন?" ওলেনিন শুধাল। "ধর, তোমার ভাই যদি খুন হত, তুমি কি খুশি হতে?"

হাসি-হাসি চোখে কসাকটি ওলেনিনের দিকে তাকাল। ওলেনিনের কথা সে বুঝতে পেরেছে, কিন্তু এসব কথার সে ধার ধারে না।

"দেখ, তাও ঘটে। আমাদের লোকরা কি মাঝে মাঝে মারা পড়ে না?"

অধ্যায়—২২

লেফ্‌টেনান্ট ও গ্রাম-প্রধান ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। লুকাশ্‌কাকে খুশি করতে এবং অন্ধকার বনের ভিতর দিয়ে একলা যাওয়াটা এড়াতে ওলেনিন কর্পোরালকে বলল লুকাশ্‌কাকে ছুটি দিতে, আর ছুটি মঞ্জুরও হল। ওলেনিন ভাবল, লুকাশ্‌কা মারিয়াংকাকে দেখতে চায়; এরকম একটি সুদর্শন মিশুকে কসাককে সঙ্গী পেয়ে সে নিজেও খুশি হল। তার মনে হয় লুকাশ্‌কা ও মারিয়াংকা একসূত্রে বাঁধা পড়েছে; তাদের কথা ভাবতেও তার ভাল লাগে। ভাবে, "ও মারিয়াংকাকে ভালবাসে; আমিও তাকে ভাল-বাসতে পারতাম।" অন্ধকার বনের ভিতর দিয়ে বাড়ির দিকে যেতে যেতে একটা গভীর মমতার অনুভূতি তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। লুকাশ্‌কাও বেশ খুশি; এই দুটি স্বতন্ত্র স্বভাবের যুবকের মধ্যে ভালবাসার মত একটা

কিছু গড়ে উঠেছে। যতবার পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে ততবারই তাদের হাসি পাচ্ছে।

"তুমি কোন্ ফটক দিয়ে ঢুকবে?" ওলেনিন শুধাল।

"মাঝখানের ফটক দিয়ে। কিন্তু আমি তোমাকে জলাভূমি পর্যন্ত এগিয়ে দেব। তারপরে আর ভয়ের কিছু নেই।"

ওলেনিন হাসল।

"তুমি কি ভেবেছ আমি ভয় পেয়েছি? ফিরে যাও, অনেক ধন্যবাদ। আমি একাই যেতে পারব।"

"ঠিক আছে। আমি আর কি করব? তোমারই বা ভয় না পাবার কি আছে? আমরাও তো ভয় পাই," ওলেনিনের আত্মমর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে কথাগুলি বলে লুকাশ্‌কা হাসতে লাগল।

"তাহলে আমার সঙ্গে বাড়িতে চল। কথা বলা যাবে, একটু পানও করা যাবে, তারপর সকাল হলে চলে যেয়ো।"

লুকাশ্‌কা হেসে বলল, "তুমি কি মনে কর রাত কাটাবার মত কোন জায়গা আমার নেই! কিন্তু কর্পোরাল আমাকে ফিরে যেতে বলেছে।"

"কাল রাতে তোমার গান শুনেছি, আর তোমাকে দেখতেও পেয়েছিলাম।"

"আচ্ছা।..." লুকাশ্‌কা মাথা নাড়তে লাগল।

"তোমার বিয়ে হচ্ছে কথাটা কি সত্যি?" ওলেনিন শুধাল।

"মা আমার বিয়ে দিতে চাইছে। কিন্তু আমার যে এখনও একটা ঘোড়াই নেই।"

"তুমি কি নিয়মিত সৈনিক নও?"

"অনেকদিন হতে পারব না। আমি তো সবে যোগ দিয়েছি। এখনও একটা ঘোড়া যোগাড় করতে পারি নি। সেইজন্যই তো বিয়েটা হচ্ছে না।"

"একটা ঘোড়া কিনতে কত লাগে?"

"এই তো সেদিন নদীর ওপারে একটা দর করেছিলাম; কিন্তু তারা ষাট রুবলেও দিতে রাজী না, যদিও সেটা একটা নোগাই ঘোড়ামাত্র।"

"তুমি কি আমার 'দ্রাবাস্ত' হতে পারবে? (দ্রাবাস্ত্ এক ধরনের সাময়িক আর্দালি।) আমি সব ব্যবস্থা করে তোমাকে একটা ঘোড়া দেব। সত্যি বলতে কি, আমার এখন দুটো ঘোড়া আছে, আর দুটো ঘোড়ার আমার কোন দরকার নেই।"

লুকাশ্‌কা হেসে বলল, "দুটো ঘোড়ার দরকার নেই? কিন্তু তুমি কেন আমাকে উপহার দেবে? ঈশ্বরের দয়া হলে আমরা নিজেরাই ব্যবস্থা করে নেব।"

"না, সত্যি বলছি। না কি তুমি আমার দ্রাবাস্ত্ হতে চাও না?"

ওলেনিন বলল। কথাটা মাথায় আসাতে সে খুশি হয়েছে, আবার কেন কে জানে কিছুটা অস্বস্তিও বোধ করছে। কথা বলতে গিয়ে বুঝল কি বলবে তাই জানে না।

লুকাশ্‌কাই প্রথমে সে নীরবতা ভাঙল।

শুধাল, "রাশিয়াতে কি তোমার নিজের বাড়ি আছে?"

ওলেনিন না বলে পারল না যে একটা নয়, তাদের বেশ কয়েকটা বাড়ি আছে।

"ভাল বাড়ি? আমাদের বাড়ির চাইতে বড়?" লুকাশ্‌কা ভালমানুষের মত শুধাল।

"অনেক বড়; দশ গুণ বড়, আর তিনতলা বাড়ি," ওলেনিন জবাব দিল।

"আমাদের মত তোমাদেরও ঘোড়া আছে?"

"ঘোড়া আছে তিন শ', প্রত্যেকটার দাম তিন শ' চারশ' রুবল, কিন্তু সেসব ঘোড়া তোমাদের ঘোড়ার মত নয়। তিন শ' রৌপ্য রুবল! জোর কদমে চলে!…কিন্তু তবু, এখানকার ঘোড়া আমার খুব পছন্দ।"

"আচ্ছা, তুমি কি স্বেচ্ছায় এখানে এসেছ, না কি কেউ তোমাকে পাঠিয়েছে?" লুকাশ্‌কাকে হেসে প্রশ্ন করল। "এই দেখ, তুমি পথ ভুমি করেছ। ডান দিকে মোড় নিতে হবে।"

ওলেনিন জবাব দিল, "আমি নিজের ইচ্ছায়ই এসেছি। তোমাদের দেশটা দেখবার ও কিছু অভিযান চালাবার সাধ হয়েছিল।"

"আমি তো যে কোন দিন যুদ্ধে যেতে পারি," লুকাশ্‌কা বলল; তারপর কান পেতে বলে উঠল, "শেয়াল ডাকছে শুনতে পাচ্ছ কি?"

"আমি বলছি কি, একটা লোককে খুন করার জন্য তোমার মনে ভয় হচ্ছে না?" ওলেনিন শুধাল।

'ভয় হবার কি আছে? কিন্তু যুদ্ধে আমি যাবই। নিশ্চয় যাব।"

"হয় তো আমরা একসঙ্গেই যাব। ছুটির আগেই আমাদের কোম্পানি যাত্রা করবে; আর তোমাদের একশ' জনও।"

"তুমি কি জন্য এখানে এসেছ? তোমার বাড়ি আছে, ঘোড়া আছে, ভূমিদাস আছে। তোমার জায়গায় হলে আমি তো ফুর্তি করা ছাড়া আর কিছুই করতাম না! তুমি কোন্ পদে আছ?"

"আমি একজন শিক্ষার্থী, কিন্তু কমিশনের জন্য আমার নাম সুপারিশ করা হয়েছে।"

"দেখ, তোমার বাড়ির কথা নিয়ে তুমি যদি অযথা আস্ফালন না করে থাক, তাহলে আমি যদি তুমি হতাম তো কখনও সে বাড়ি ছেড়ে আসতাম না। হ্যাঁ, আমি কোথাও যেতাম না। তুমি কি আমাদের সঙ্গে থাকতে

চাও ?''

"হাঁ, চাই," ওলেনিন জবাব দিল।

ইতিমধ্যেই বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। কথা বলতে বলতে তারা গ্রামের কাছাকাছি এসে পড়েছে। তাদের চারদিকে এখনও বনের গভীর বিষণ্ণতা ছড়িয়ে আছে। গাছের মাথায় বাতাসের হাহাকার। শেয়ালগুলো হঠাৎ যেন খুব কাছেই ডাকতে শুরু করে দিল। তারও ওদিক থেকে ভেসে এল মেয়ে মানুষের গলা আর কুকুরের ডাক। বাড়িগুলো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আলো জ্বলছে। বাতাসে একটা বিচিত্র ধোঁয়ার গন্ধ। হঠাৎ, বিশেষ করে সেই রাতে, ওলেনিনের মনে হল, এই গ্রামেই আছে তার বাড়ি, তার পরিবার, তার সব সুখ; এই কসাকদের গ্রামে সে যত সুখে আছে তত সুখে সে কোনদিন ছিল না, আর ভবিষ্যতেও কোনদিন থাকবে না। সকলকে, বিশেষ করে এই রাতে লুকাশ্‌কাকে তার বড় ভাল লাগছে। বাড়ি পৌঁছে ওলেনিন যখন নিজের হাতে একটা ঘোড়াকে চালার ভিতর থেকে বের করে এনে লুকাশ্‌কাকে দিয়ে দিল, তখন লুকাশ্‌কা একেবারে অবাক হয়ে গেল। যদিও ঘোড়াটাতে সে সাধারণত সওয়ার হয় না, তবু ঘোড়াটা খারাপ নয়।

লুকাশ্‌কা বলল, "তুমি আমাকে উপহার দেবে কেন? আমি তো এখনও তোমার জন্য কিছু করি নি।"

ওলেনিন জবাব দিল, "আরে, এ কিছু নয়। এটা তো নাও, কোনদিন তুমিও আমাকে একটা কিছু উপহার দিও।...আমরা একসঙ্গে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাব।"

লুকাশ্‌কা গোলমালে পড়ে গেল।

"কিন্তু এসবের অর্থ কি? একটা ঘোড়ার দাম যে অনেক টাকা তা তো তুমি জান," ঘোড়াটার দিকে না তাকিয়েই সে বলল।

"তুমি নাও, তুমি এটা নাও! যদি না নাও, আমি অসন্তুষ্ট হব। ভানিয়ুশা, এই ধূসর ঘোড়াটাকে ওর বাড়িতে নিয়ে যাও।"

লুকাশ্‌কা ঘোড়াটাকে ধরল।

"আচ্ছা, তাহলে তোমাকে ধন্যবাদ! সত্যি বলছি, এটা আমি আশাই করি নি।"

ওলেনিন যেন বারো বছরের ছেলের মত খুশি।

"এইখানে বাঁধো। খুব ভাল ঘোড়া। গ্রোজ্‌নায়া থেকে কিনেছিলাম। অদ্ভুত ছোটে! ভানিয়ুশা, আমাদের জন্য খানিকটা চিকির্‌নিয়ে এস। ভিতরে চল।"

মদ এল। লুকাশ্‌কা বসে মদের পাত্রটা নিল।

মদ গলায় ঢেলে বলল, "ঈশ্বরের কৃপা হলে তোমার ঋণ শোধ করার একটা উপায় হবেই। তোমার নাম কি?"

"দিমিত্রি আন্দ্রীচ।"

"বেশ। দিমিত্রি আন্দ্রীচ, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। আমরা কুনাক হলাম। এখন তোমাকে আমাদের দেখতে আসতেই হবে আমরা বড়লোক না হতে পারি, কিন্তু কুনাকের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হয় তা জানি। তোমার যদি কোন কিছুর দরকার হয়—যেমন জমাট মাখন অথবা আঙুর—তোমাকে বলে দেব; আর তুমি যদি রক্ষী-বেষ্টনীতে আস তো চাকরের মত তোমার সঙ্গে শিকারে যাব, নদীর ওপারে যাব, তুমি যেখানে যাবে সেখানেই যাব! কি জান, এই তো সেদিন একটা শুয়োর মারলাম, কসাকদের সব্বাইকে তার ভাগ দিলাম; একটুও জানা থাকলে তোমাকেও দিতাম।"

"ঠিক আছে, তোমাকে ধন্যবাদ! কিন্তু ঘোড়াটাকে সাজ পরিয়ো না, ওকে কখনও সাজ পরানো হয় নি।"

"সাজ পরাব কেন?" বলেই লুকাশ্‌কা গলা নামিয়ে আবার বলল, "তোমার মত হলে তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। আমার একজন কুনাক আছে, নাম গিরেই খান। সে আমাকে বলেছে, ওরা যেখানে পাহাড় থেকে নামে সেই পথের ধারে তার সঙ্গে লুকিয়ে ওৎ পেতে থাকতে। তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে? তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করব না। আমি তোমার মুরিদ্ (উপদেষ্টা) হব।"

"হ্যাঁ, দুজনই যাব; যেকোন দিন যাব।"

অনেক আলাপ-আলোচনার পরে পেটে অনেক মদ ঢেলে লুকাশ্‌কা ওলেনিনের সঙ্গে করমর্দন করে বিদায় নিল। সে কি করে দেখবার জন্য ওলেনিন জানালা দিয়ে মুখ বাড়াল। লুকাশ্‌কা মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে। তারপর ফটকটা পেরিয়ে হঠাৎ মাথায় ঝাঁকি দিয়ে একলাফে বিড়ালের মত ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে লাগামটা ধরেই চীৎকার করে জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

ওলেনিন আশা করেছিল, লুকাশ্‌কা তাকে নিয়ে মারিয়াংকার সঙ্গে ফুর্তি করতে যাবে, কিন্তু তা সে গেল না, তবু ওলেনিনের এত ভাল লাগছে যেমনটি আগে কখনও লাগে নি। সে ছেলেমানুষের মত খুশিতে ডগমগ হয়ে ভানিয়ুশাকে সব কথা খুলে বলল। ভানিয়ুশা অবশ্য তার কাজকে মোটেই সমর্থন করল না, বরং জানাল যে মনিবের এসব কাজের কোন অর্থই হয় না।

লুকাশ্‌কা বাড়ি পৌঁছে লাফ দিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে সেটাকে মার হাতে দিয়ে বলল, সেটাকে যেন কসাকদের সমবেত ঘোড়ার পালের সঙ্গে ঘাস খেতে পাঠানো হয়। সেই রাতেই তাকে রক্ষী-বেষ্টনীতে ফিরে যেতে হবে। তার বোবা দিদি ঘোড়াটার দেখাশোনার ভার নিল; আকারে-ইঙ্গিতে জানাল, যে লোক তাকে ঘোড়াটা দিয়েছে তার সঙ্গে দেখা হলে সে তাকে আভূমি নত হয়ে অভিবাদন করবে। বুড়ি অবশ্য ছেলের মুখে গল্পটা

শুনে শুধু মাথাই নাড়ল, মনে মনে ধরেই নিল যে ঘোড়াটাকে সে চুরি করে এনেছে। তাই মেয়েকে বলল, দিনের আলো ফুটবার আগেই সেটাকে যেন দলের সঙ্গে ভিড়িয়ে দিয়ে আসে।

একা একা রক্ষী-বেষ্টনীর দিকে যেতে যেতে লুকাশ্‌কা ওলেনিনের আচরণের কথাই ভাবতে লাগল। ঘোড়াটা যে খুব ভাল তা সে মনে করে না, তবু অন্তত চল্লিশ রুবল তো দাম হবেই, তাই উপহারটি পেয়ে সে খুব খুশিই হয়েছে। কিন্তু কেন যে ঘোড়াটা তাকে দেওয়া হল তা সে বুঝতেই পারছে না, আর তাই সেজন্য কোনরকম কৃতজ্ঞতাও বোধ করছে না। বরং শিক্ষার্থীটির মনে হয়তো কোন দুরভিসন্ধি আছে এই সন্দেহই অস্পষ্টভাবে তার মনের মধ্যে উঁকি দিতে লাগল। সে দুরভিসন্ধি যে কি তা সে বলতে পারে না, আবার একজন অপরিচিত মানুষ নেহাৎ দয়াপরবশ হয়ে একটা চল্লিশ রুবল দামের ঘোড়া তাকে দিয়ে দেবে এটাও সে মেনে নিতে পারছে না; এ তো অসম্ভব ব্যাপার। সে যদি মাতাল হত, তাহলেও না হয় বোঝা যেত! হয়তো সে একটা বাহাদুরি দেখাতে চেয়েছিল। কিন্তু শিক্ষার্থীটি তো বেশ বহাল তবিয়তেই ছিল, অতএব নির্ঘাৎ তাকে দিয়ে কোন খারাপ কাজ করিয়ে নেবার ইচ্ছাতেই তাকে ওটা ঘুষ দিয়েছে। "এঃ, বাহাদুর!" লুকাশ্‌কা ভাবল। "ঘোড়াটা তো পেয়েছি, পরে দেখা যাবে। আমি বোকা নই, দেখাই যাক কে কার উপর টেক্কা দেয়।" তার মনের মধ্যে ওলেনিনের প্রতি একটা বিরূপভাব জেগে উঠল। কেমন করে ঘোড়াটা পেয়েছে সেকথা কাউকে বলল না। কাউকে বলল কিনেছে, আবার কাউকে একটা ভাসা-ভাসা জবাব দিল। যাই হোক, আসল কথাটা কিন্তু গ্রামের মধ্যে রটে গেল, আর লুকাশ্‌কার মা, মারিয়াংকা, এমন কি ইলিয়া ভাসিলিয়েভিচ এবং অন্য সব কসাকরা ওলেনিনের এই অকারণ দানের কথা শুনে বিচলিত বোধ করল এবং শিক্ষার্থীটি সম্পর্কে সতর্ক হয়ে উঠল। কিন্তু নানা আশংকা সত্ত্বেও তার এই কাজের ফলে তাদের মনে ওলেনিনের সরলতা ও সমৃদ্ধির প্রতি প্রচণ্ড শ্রদ্ধা দেখা দিল।

একজন বলল, "আরে শুনেছ, যে শিক্ষার্থীটি ইলিয়া ভাসিলিচের বাড়িতে বাসা নিয়েছে সে লুকাশ্‌কাকে পঞ্চাশ রুবল দামের একটা ঘোড়া দান করে দিয়েছে? লোকটা নিশ্চয় খুব ধনী!..."

আর একজন জবাব দিল, "হ্যাঁ, তা শুনেছি। লোকটি ওর খুব উপকার করেছে। দেখা যাক এখন কি হয়। আঃ, উরভানের কী কপাল!"

তৃতীয় একজন বলল, "এই সব শিক্ষার্থীরা ভারী চালাক। দেখই না, কারও ঘরে আগুন লাগায় কি না!"

অধ্যায়—২৩

নিয়ম-বাঁধা একঘেয়েমির ভিতর দিয়ে ওলেনিনের দিন কাটতে লাগল। কম্যাণ্ডিং-অফিসার বা তাদের সমগোত্রীয়দের সঙ্গে তার নিজের বিশেষ কোন যোগাযোগ নেই। ককেসাসে ধনী শিক্ষার্থীদের এই একটা সুবিধা। কাজ করতে বা শিক্ষা নিতে তাকে পাঠানো হয় নি। যুদ্ধে যোগদানের পুরস্কার স্বরূপ তাকে কমিশনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে, আর ততদিন তাকে শান্তিতেই রাখা হয়েছে। অফিসাররা তাকে একজন অভিজাত বলে মনে করে, আর তার সঙ্গে ব্যবহারও করে মর্যাদার সঙ্গে। তার অবশ্য তাসখেলা অথবা সৈনিক-গায়কদের সঙ্গে যোগ দিয়ে অফিসারদের হৈ-হল্লা কোনটাই ভাল লাগে না, আর তাই গ্রামে এসে অফিসারদের সমাজ ও জীবনযাত্রাকে সে এড়িয়েই চলছে। কসাক গ্রামে এসে প্রতিটি শিক্ষার্থীই নিয়মিত বাড়ি-ওলাদের নিয়ে চিকির খায়, মেয়েদের মিষ্টি ও মধু খাওয়ায়, কসাক রমণীদের পেছনে ছোটে, তাদের সঙ্গে প্রেম করে, মাঝে মধ্যে সেখানেই বিয়েও করে। ওলেনিন তার নিজের পথে চলে; নিজের অজান্তেই প্রচলিত পথকে এড়িয়ে চলে। আর এখানেও যেকোন ককেসীয় অফিসারের বাঁধা পথে সে পথ দিল না।

সে সাধারণতই ভোরে ওঠে। চা খাওয়া শেষ করে বারান্দায় দাঁড়িয়ে পুবের পাহাড়, সকাল বেলাটা ও মারিয়াংকার প্রশংসা করে, তারপর ষাঁড়ের চামড়ার ছেঁড়া কোটটা গায়ে দিয়ে, জলে-ভেজানো কাঁচা চামড়ার স্যাণ্ডেল পরে, কোমরে ছোরা ঝুলিয়ে, বন্দুক নিয়ে, একটা ছোট থলেতে কিছু সিগারেট ও খাবার ভরে নেয়, এবং কুকুরটাকে ডেকে পাঁচটার ঠিক পরেই গ্রাম ছাড়িয়ে দূরের জঙ্গলের দিকে যাত্রা করে। সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে ফিরে আসে, পাঁচ ছ'টা পাখি—কখনও কখনও অন্য কোন জন্তু—কোমরবন্ধ থেকে ঝুলতে থাকে, আর থলের ভিতরকার খাবার ও সিগারেটে হাতও পড়ে না। থলের সিগারেটের মতই তার মাথার ভিতরকার চিন্তাগুলিতেও যদি কারও হাত না পড়ত, তাহলে দেখা যেত যে এই চোদ্দ ঘণ্টার মধ্যে একটা চিন্তাও তার মাথায় ঢোকে নি।

সন্ধ্যা হলেই ইয়েরশ্কা খুড়ো এসে হাজির হয়। ভানিয়ুশা এক কুঁজো চিকির এনে দেয়, আর তারা শান্ত মনে কথাবার্তা বলে, চিকির খায়, তারপর বিদায় নিয়ে খুশি-মনে শুতে যায়। পরদিন সে আবার শিকারে যায়, আবার ক্লান্ত অথচ সুস্থ হয়ে ফেরে, আবার দুজনে বসে গল্প করে, পেট ভরে চিকির খায়, আবার সুখী হয়। কখনও ছুটির দিনে বা বিশ্রামের দিনে ওলেনিন সারাটাদিন বাড়িতেই কাটায়। সেদিন তার প্রধান কাজ মারিয়াংকাকে দেখা, নিজের অজান্তেই তার প্রতিটি চলাফেরাকে সে জানালা দিয়ে বা বারান্দা থেকে লোভীর মত অনুসরণ করে। মারিয়াংকাকে

সে শ্রদ্ধা করে, তাকে ভালবাসে, ঠিক যেরকম সে ভালবাসে পাহাড়ের রূপকে, আকাশকে ; তার সঙ্গে কোনরকম সম্পর্ক পাতাবার কথা তার মাথায় আসে নি। তার মনে হয়, মারিয়াংকার সঙ্গে কসাক লুকাশ্‌কার যে-রকম সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তার সঙ্গে মারিয়াংকার সেরকম কোন সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না ; আর ধনী অফিসার ও কসাক মেয়েদের মধ্যে প্রায়ই যে ধরনের সম্পর্ক গড়ে ওঠে সেটা তো আরও নয়। তার মনে হয়, সেও যদি অন্য অফিসারদের মত আচরণ করতে চেষ্টা করে তাহলে কল্পনার পরিপূর্ণ আনন্দের জগৎ থেকে সে ছিটকে পড়বে দুঃখ, স্বপ্নভঙ্গ, ও বিষণ্ণতার এক অতলস্পর্শ গহ্বরে। তাছাড়া, মারিয়াংকা সম্পর্কে ইতিমধ্যেই সে আত্মত্যাগের গৌরব অর্জন করেছে, তাতে পেয়েছে সুখের স্বাদ ; আর সর্বোপরি মারিয়াংকাকে তার কেমন যেন ভয় করে, কোন কিছুর জন্যই হাল্কাভাবে তাকে একটিও ভালবাসার কথা বলতে সাহস করে না।

একদিন গ্রীষ্মকালে ওলেনিন শিকারে যায় নি ; বাড়িতেই বসে আছে। এমন সময় মস্কোর পূর্ব-পরিচিত একটি তরুণ অপ্রত্যাশিতভাবে এসে হাজির।

মস্কো-ফরাসীতে সে বলতে শুরু করল, "আরে, মন চের, প্রিয় বন্ধু, তুমি এখানে আছ শুনে কী খুশিই না হয়েছি।" প্রতিটি কথার মধ্যে ফরাসী শব্দ যোগ করে সে একটানা বলতে লাগল, "ওরা বলল, 'ওলেনিন'। কোন্‌ ওলেনিন ? শুনে কী যে ভাল লাগল।…ভাব তো, ভাগ্য আমাদের আবার এখানে মিলিয়ে দিয়েছে! তারপর, কেমন আছ ? কেমন ? কেন ?" প্রিন্স বেলেৎস্কি একে একে নিজের সব কথা বলে গেল : সে অস্থায়ীভাবে রেজিমেণ্টে ঢুকেছে, প্রধান সেনাপতি তাকে এড্‌-ডি-কং করে নেবার প্রস্তাব করেছে, এই যুদ্ধের পরেই সেই পদটা সে নেবে, অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে সে পদের প্রতি তার কোন আকর্ষণ নেই।

"এখানে, এই গর্তের মধ্যে কাটাতে হলে জীবনে উন্নতি করতেই হবে—একটা ক্রুশ—অথবা উচ্চপদ—রক্ষী বাহিনীতে বদলি হতেই হবে। সেটা একেবারে অপরিহার্য, নিজের জন্য নয়, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের জন্য। প্রিন্স আমাকে সাদরে গ্রহণ করেছেন ; লোকটি খুব ভাল। "প্রিন্স বেলেৎস্কি অনবরত বকবক করে চলল : "সেণ্ট আন্‌'স ক্রুশের জন্য আমার নাম সুপারিশ করা হয়েছে। যুদ্ধে যাবার আগে আমি এখানে কিছুদিন থাকব। জায়গাটা চমৎকার। কী সব মেয়ে। আচ্ছা, তোমার দিন কেমন কাটছে ? আমাদের ক্যাপ্টেন স্তার্তসেভ, জান তো সেই যে দয়ালু, বোকা-বোকা লোকটি…হ্যাঁ, সেই বলেছে তুমি নাকি অসভ্যের মত দিন কাটাচ্ছ…কারও সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ পর্যন্ত কর না। আমি জানি, এখানে যেসব অফিসারেরা আছে তাদের সঙ্গে তুমি মেলামেশা করতে চাও না। এখন আমরা পরস্পরের কাজে লাগতে পারব বলে আমার খুব ভাল লাগছে। এখানে আমি কর্পো-

রালের বাড়িতে উঠেছি। সেখানে যা একখানা মেয়ে আছে, উস্তেংকা! বিশ্বাস কর, একেবারে মনোহারিণী!"

যে জগৎকে ওলেনিন চিরদিনের মত ছেড়ে এসেছে বলে তার ধারণা সেখান থেকে ফরাসী ও রুশ শব্দগুলি একের পর এক ঝরে পড়তে লাগল।

বেলেৎস্কি সম্পর্কে সাধারণের ধারণা যে সে একটি মোটামুটি ভাল মানুষ। হয় তো তাই, কিন্তু ওলেনিনের তাকে মোটেই ভাল লাগল না। যে নীচতাকে ওলেনিন বর্জন করেছে, সেই নীচতাই ঝরে পড়ছে বেলেৎস্কির নিঃশ্বাসে। আর সেই জগৎ থেকে আসা এই লোকটিকে যে সে আঘাত দিতে পারছে না তাতেই ওলেনিন আরও বিরক্ত বোধ করছে। একদিন যে জগতের বাসিন্দা সে ছিল তার উপরে যেন সেই জগতের একটা অনিবার্য দাবী আছে। বেলেৎস্কির উপর, এমন কি নিজের উপরেও তার রাগ হল, তবু নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে নিজেও কথার মধ্যে ফরাসী শব্দ যোগ করল, প্রধান সেনাপতি ও মস্কোর অন্য পরিচিতজন সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করল, বেলেৎস্কির সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করল, তার সঙ্গে দেখা করতে যাবে বলে কথা দিল, আর তাকেও এখানে মাঝে মাঝে আসার আমন্ত্রণ জানাল। অবশ্য ওলেনিন নিজে বেলেৎস্কির সঙ্গে দেখা করতে গেল না।

ভানিয়ুশার কিন্তু বেলেৎস্কিকে ভাল লাগল; মুখে বলল, সে একজন সত্যিকারের ভদ্রলোক।

বেলেৎস্কি এখানে এসেই কসাক গ্রামের ধনী অফিসারদের চিরাচরিত জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ল।

ওলেনিনের চোখের সামনে এক মাসের মধ্যেই সে গ্রামের একজন পুরনো বাসিন্দার মত হয়ে উঠল; গ্রামের বুড়োদের মদ খাওয়াল, সান্ধ্য উৎসবের আয়োজন করল, মেয়েদের উৎসবে যোগ দিল, নিজের যুদ্ধজয়ের কথা নিয়ে আস্ফালন করল; এমন কি সে এতদূর পর্যন্ত গেল যে কেন কে জানে স্ত্রীলোক ও বালিকারা তাকে "দাদু" বলে ডাকতে শুরু করল, আর যে মানুষ নারী ও সুরা ভালবাসে তাকে সহজেই বোঝা যায় বলে কসাকরাও তার সঙ্গে বেশ মিশে গেল। ওলেনিন তাদের কাছে একটি ধাঁধার মত; তাই তারা ওলেনিনের চাইতে বেলেৎস্কিকেই বেশী ভালবাসে।

অধ্যায়—২৪

কাল পাঁচটা। ভানিয়ুশা বারান্দায় সামোভারে আগুন দিয়ে একটা লম্বা বুটের পা দিয়ে হাওয়া করছে। ওলেনিন এর মধ্যেই ঘোড়ায় চেপে তেরেকে স্নান করতে গেছে। (সম্প্রতি সে এই একটা নতুন মজা আবিষ্কার করেছে—নদীতে নিয়ে ঘোড়াকে স্নান করানো।) বাড়ির কর্ত্রী বাইরের

ঘরে ; জলন্ত উনুনের ধোঁয়া বেরুচ্ছে চিমনি দিয়ে। মেয়েটি মোষের দুধ দুইছে। গরু দুইবার শব্দের তালে তালে অধৈর্য হয়ে বলছে, "একটু চুপচাপ থাকতে পারিস না হতভাগা।"

রাস্তা থেকে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শোনা গেল। একটা সুন্দর গাঢ় ধূসর ঘোড়ায় চেপে ওলেনিন ফটকে হাজির হল। ভিজে ঘোড়াটা এখনও চকচক করছে। লাল রুমালে বাঁধা মারিয়াংকার সুডৌল মাথাটা একবার দেখা দিয়েই অদৃশ্য হয়ে গেল। ওলেনিনের পরনে লাল রেশমী শার্ট, সাদা সার্কাসীয়ান কোট, কোমরের পটির সঙ্গে একটা ছোরা ঝোলানো, মাথায় উঁচু টুপি। ভিজে, গোলগাল ঘোড়ার পিঠে বেশ আরাম করে বসে আছে, বন্দুকটা পিঠের উপর ; ফটক খোলবার জন্য একটু ঝুঁকল। মাথার চুল এখনও ভিজে, যৌবনদীপ্ত স্বাস্থ্যের জন্য মুখটা ঝলমল করছে। নিজেকে সে সুদর্শন, সক্ষম, একজন দিগ্বিজিতের মতই মনে করে, কিন্তু তার সে ধারণা ভুল। যেকোন অভিজ্ঞ ককেসীয়ের চোখে সে এখন একজন সৈনিক মাত্র।

ঘরে ঢোকার একটু পরেই আবার বারান্দায় বেরিয়ে এসে চায়ের গ্লাস নিয়ে বসল। মুখে পাইপ, পাশে একটা বই। বারান্দার এদিকটায় এখনও রোদ পড়ে নি। স্থির করেছে, ডিনারের পরে কোথাও যাবে না, অনেকদিন থেকে জমে-ওঠা কিছু চিঠিপত্র লিখবে ; কিন্তু বারান্দাটা ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করছে না, ঘরটাকে যেন জেলখানা বলে মনে হতে লাগল। বাড়ির গিন্নি স্টোভটা গরম করেছে। মেয়েটি গোরু-মোষকে চরাতে দিয়ে বাড়ি ফিরেছে। ওলেনিন পড়ছে। কিন্তু সামনে খোলা বইয়ের একটা শব্দও সে বুঝতে পারছে না। বই থেকে মুখ তুলে মেয়েটির বলিষ্ঠ দেহের দিকেই বারবার তাকাচ্ছে।

"এই যে ওলেনিন, অনেকক্ষণ উঠেছ না কি?" উঠোনে ঢুকতে ঢুকতে বেলেৎস্কি শুধাল। একটা ককেসীয় অফিসারের কোট পরে সে এসেছে।

হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে ওলেনিন বলল, "আরে বেলেৎস্কি ; তুমি এত সকালে?"

"আসতেই হল। আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে ; আজ রাতে আমাদের একটা বল-নাচ হচ্ছে। মারিয়াংকা—তুমি নিশ্চয় উস্তেংকাদের বাড়িতে আসছ?" মেয়েটির দিকে মুখ ফিরিয়ে সে বলল। বেলেৎস্কিকে এত সহজ-ভাবে মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে দেখে ওলেনিন অবাক হয়ে গেল। মারিয়াংকা কিন্তু তার কথা না শোনার ভাব দেখিয়ে কোদালটা পিঠের উপর ফেলে পুরুষোচিত দৃপ্ত পদক্ষেপে বাইরের ঘরের দিকে চলে গেল।

তার দিকে তাকিয়ে বেলেৎস্কি বলল, "মেয়েটি লজ্জাবতী, বড়ই লজ্জাবতী।…তোমাকে দেখে লজ্জা পেয়েছে," বলে ঈষৎ হেসে বারান্দার সিঁড়ির দিকে ছুটে গেল।

"এটা কি রকম কথা? বল নাচের আসর বসছে। আর তোমাকে তাড়িয়ে

দিয়েছে ?”

“ব্যাপারটা হবে আমার বাড়িওলী উস্তেংকাদের বাড়িতে, আর তোমার সেখানে নেমন্তন্ন। বল-নাচ মানেই তো খানাপিনা আর মেয়েদের ভিড়।”

“কিন্তু আমরা সেখানে কি করব ?”

বেলেৎস্কি সবজান্তার ভঙ্গীতে হাসল; বাইরের যে ঘরে মারিয়াংকা ঢুকেছে সেদিকে মাথাটা ঝাঁকিয়ে চোখ টিপল।

ওলেনিন কাঁধ ঝাঁকুনি দিল; লজ্জায় লাল হল; বলল, “সত্যি, তুমি একটি আশ্চর্য মানুষ!”

“দেখ, ভাল মানুষের ভান করো না!”

ওলেনিনের চোখে ভ্রূকুটি দেখে বেলেৎস্কি হেসে বলল, “আরে বাবা, কি বলতে চাও তুমি ? এক বাড়িতে থাক—আর এমন সুন্দরী কন্যা, চমৎকার কন্যা, অপরূপ সুন্দরী—”

“আশ্চর্য সুন্দর! এমন মেয়ে আমি কখনও দেখি নি” ওলেনিন জবাব দিল।

“তাহলে ?” অবস্থাটা বুঝতে না পেরে বেলেৎস্কি বলল।

ওলেনিন জবাব দিল, “অদ্ভুত হতে পারে, কিন্তু যা সত্যি তা বলব না কেন ? এখানে আসার পর থেকে আমার কাছে মেয়ে মানুষ বলে কিছু নেই। আর সত্যি, এটা খুব ভাল! আর এইসব মেয়ে মানুষ আর আমাদের মধ্যে কোথায় মিল আছে বল ? ইয়েরশ্‌কা—সেটা আলাদা ব্যাপার! তার আর আমার মধ্যে আছে নেশার মিল—শিকার।”

“এই দেখ! মিল! আমালিয়া আইভানভ্‌নার সঙ্গে আমার কিসের মিল ? এও একই ব্যাপার! বলতে পার, এরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নয়; সেটা আলাদা কথা···যার সঙ্গে যার মজে মন···”

ওলেনিন জবাব দিল, “কখনও কোন আমালিয়া আইভানভ্‌নার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি, সেধরনের মেয়েদের সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তাও আমি জানি না। তাদের কেউ শ্রদ্ধা করতে পারে না; কিন্তু এদের আমি শ্রদ্ধা করি।”

“বেশ তো, শ্রদ্ধাই কর! কে তোমাকে আটকাচ্ছে ?”

ওলেনিন জবাব দিল না। যেকথা বলতে শুরু করেছিল সেটা শেষ করতেই সে চেয়েছিল। সেটাই তার মনের কথা।

“আমি জানি আমি দলছুট···” স্পষ্টতই সে বিব্রত বোধ করছে। “আমার জীবনটাই এমনভাবে গড়ে উঠেছে যে আমার নিজস্ব নিয়ম-কানুনগুলো পরিত্যাগ করার প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করি না, বরং তোমাদের মত করে বাস করতে হলে আমি এখানে বাস করতেই পারতাম না, আর এখনকার মত সুখে বাস করার তো কথাই ওঠে না। কাজেই তাদের মধ্যে তোমরা

যা দেখ আমি তার চাইতে আলাদা কিছু খুঁজি এবং দেখতে চাই।"

বেলেৎস্কি অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে ভুরু দুটো তুলল। "যাই হোক, আজ সন্ধ্যায় আমার কাছে চলে এস। মারিয়াংকা সেখানে থাকবে, আমি তোমাদের পরিচয় করিয়ে দেব। দয়া করে এস কিন্তু। একঘেয়ে লাগে, চলে যেয়ো। আসছ তো?"

"তা যাব, তবে খোলাখুলি বলতে কি, আমার ভয় হয় সে হয়তো অভিভূত হয়ে পড়বে।"

"আ—হা—হা।" বেলেৎস্কি চেঁচিয়ে উঠল। "এস তো, তারপর সব ভার আমার। আসছ তো? কথা দিলে?"

"যাব; কিন্তু সত্যি বলছি আমরা যে কি করব তাই জানি না; আমাদের ভূমিকাই বা কি হবে।"

"দোহাই তোমার। আমি মিনতি করছি। আসছ তো?"

"হ্যাঁ, হয় তো যাব," ওলেনিন বলল।

"দেখালে বটে! এমন সব মনোহারিণী যাদের আর কোথাও দেখা যায় না, আর তোমার কিনা সন্ন্যাসীর জীবন। কী সব্বধারণা। জীবনটা নষ্ট করছ কেন, আর হাতের কাছে যা পাচ্ছ তাকে ব্যবহার করছ না কেন? শুনেছ কি আমাদের কোম্পানির ভজ্‌দ্‌ভিবোনস্কায়া যাবার হুকুম এসেছে?"

"তা তো হবার কথা নয়। আমি শুনেছিলাম অষ্টম কোম্পানিকে সেখানে পাঠানো হবে," ওলেনিন বলল।

"না। এড্‌-ডি-কংয়ের কাছ থেকে আমি একটা চিঠি পেয়েছি। তিনি লিখেছেন, প্রিন্স স্বয়ং এই অভিযানে অংশ নেবেন। তাকে ভাল করে দেখতে পাব জেনে বড় ভাল লাগছে। এ জায়গাটা আর ভাল লাগছে না।"

"আমি শুনেছি, শীঘ্রই আমরা একটা হামলা করব।"

"আমি সে কথা শুনি নি; আমি শুনেছি, একটা হামলার জন্য ক্রিনোভিৎসিন 'সেন্ট আন্না পদক' পেয়েছে। সে আশা করেছিল লেফ্‌টেনাণ্টের পদ পাবে," বেলেৎস্কি হাসতে হাসতে বলল। "বরং নীচেই নামতে হল, কি বল! এ ব্যাপারেই তাকে প্রধান ঘাঁটিতে যেতে হল…"

সন্ধ্যা হয়ে আসছে; ওলেনিন সান্ধ্য পার্টির কথা ভাবতে লাগল। যে নিমন্ত্রণ সে গ্রহণ করেছে সেটা তাকে চিন্তিত করে তুলেছে। যেতেও ইচ্ছা করছে, কিন্তু সেখানে যা ঘটতে পারে সেটাকে মনে হচ্ছে অদ্ভুত, অবাস্তব, এমন কি ভীতিপ্রদ। সে জানে, একমাত্র মেয়েরা ছাড়া কোন কসাক পুরুষ অথবা বয়োবৃদ্ধা নারী সেখানে থাকবে না। সেখানে কি হবে? সেই বা কি করবে? তারা কি নিয়ে আলোচনা করবে? এই সব উচ্ছৃংখল কসাক মেয়ের সঙ্গে তার কিসের সম্পর্ক? বেলেৎস্কি অবশ্য নানান সম্পর্কের কথা তাকে বলেছে। কিন্তু সেখানে সে হয় তো মারিয়াংকার সঙ্গে একঘরে থাকবে

এবং হয়তো তার সঙ্গে কথা বলবে—সে যে অদ্ভুত ব্যাপার। মেয়েটির গুরু-গম্ভীর আচরণের কথা স্মরণ করে সেটা তার কাছে অসম্ভব বলেই মনে হল। কিন্তু বেলেৎস্কি এমনভাবে কথাটা বলেছে যেন কাজটা একেবারেই সহজ, সরল। "এও কি সম্ভব যে বেলেৎস্কি মারিয়াংকার সঙ্গেও সেই একই ব্যবহার করবে?···না, না যাওয়াই ভাল। এ সবই তো ভয়ানক, বড় ইতর, আর সর্বোপরি—এতে কোন লাভ নেই।" কিন্তু সেখানে কি ঘটবে সেই চিন্তাই আমার তাকে ব্যাকুল করে তুলল; তাছাড়া, সে যে কথা দিয়েছে। কি করবে স্থির না করেই সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল, এবং হাঁটতে হাঁটতে একসময় বেলেৎস্কির বাসায় পৌঁছে ভিতরে ঢুকল।

বেলেৎস্কির বাসাটা ওলেনিনের বাসার মতই। কাঠের খুঁটির উপর প্রায় পাঁচ ফুট উঁচুতে বাড়িটা তৈরি। দুটো ঘর। খাড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠে ওলেনিন প্রথম যে ঘরটায় ঢুকল তাতে পালকের বিছানা, কম্বল, কুশন দেয়াল বরাবর কসাক-ফ্যাশান অনুযায়ী বেশ সুন্দরভাবে সাজানো। পাশের দেয়ালে পেতলের ছোঠ পাত্র ও অস্ত্রশস্ত্র ঝোলানো; মেঝেতে একটা বেঞ্চির নীচে রয়েছে তরমুজ ও লাউ। দ্বিতীয় ঘরটাতে আছে একটা বড় মাটির উনোন, একটা টেবিল, কয়েকটা বেঞ্চি ও দেবমূর্তি। একটা ক্যাম্প-খাট, জিনিসপত্র ও ট্রাংক নিয়ে এই ঘরেই বেলেৎস্কি সংসার পেতেছে। তার অস্ত্রশস্ত্র দেয়ালে ঝোলানো, আর টেবিলে রয়েছে সাজের জিনিসপত্র ও কয়েকটা প্রতিকৃতি। একটা রেশমী ড্রেসিং-গাউন বেঞ্চিটার উপর পড়ে আছে। বেলেৎস্কি নিজে তলবাস পরে বিছানায় শুয়ে Let Trois Mousquetaires পড়ছে।

সে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল।

"এই যে, দেখ কেমন সব সাজিয়েছি। খুব ভাল হয়েছে, তাই না? তুমি আসায় খুব খুশি হয়েছি। তারা প্রচণ্ড কাজ করছে। জান, রান্না কি হচ্ছে? শুয়োরের মাংস আর আঙুরের পুর দেওয়া পিঠে। কিন্তু সেটাই শেষ নয়। বাইরে কেমন সোরগোল হচ্ছে তাকিয়ে দেখ!"

সত্যি, জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখা গেল কুটিরের মধ্যে অসম্ভব কর্মব্যস্ততা চলেছে। এটা-ওটা আনতে মেয়েরা এই ছুটে ভিতরে ঢুকছে, আবার বেরিয়ে যাচ্ছে।" শিগগিরই সব তৈরি হয়ে যাবে তো?" বেলেৎস্কি হেঁকে বলল।

"শিগ্‌গির! কেন? দাদুর কি ক্ষিধে পেয়েছে?" কুটিরের মধ্যে হাসির হর্‌রা উঠল।

কয়েকটা প্লেট নেবার জন্য উস্তেংকা দৌড়ে এসে বেলেৎস্কির ঘরে ঢুকল; মোটা, ছোটখাট, গোলাপী, সুন্দরী উস্তেংকা; হাতের আস্তিন দুটো গোটানো।

বেলেৎস্কির হাত থেকে পালিয়ে গিয়ে মেয়েটি চেঁচিয়ে বলল, "সরে যান,

নইলে সব প্লেট গুঁড়ো করে ফেলব!" তারপর হেসে ওলেনিনকে বলল, "আপনি বরং এসে আমাদের একটু সাহায্য করুন। আর মেয়েদের জন্য কিছু খাবার আনতে ভুলবেন না।" (খাবার বলতে মশলা-রুটি আর মিষ্টি।)

"মারিয়াংকা এসেছে কি?"

"নিশ্চয়! সেই তো ময়দার তাল এনেছে। কি জান, উস্তেংকাকে যদি একটু সাজিয়ে-গুছিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে পালিশ করে নেওয়া যায় তাহলে তাকে আমাদের সুন্দরীদের চাইতেও ভাল দেখাবে। যে কসাক মেয়ে একজন কর্ণেলকে বিয়ে করেছে তাকে দেখেছ; একেবারে মনোহরা! বর্শ্‌চেভা। কী ভঙ্গিমা! ওরা এটা পায় কোথায়?..."

"বর্শ্‌চেভাকে আমি দেখি নি, কিন্তু আমি তো মনে করি এখানে ওরা যে পোশাক পরে তার চাইতে ভাল পোশাক হতেই পারে না।"

খুশির নিঃশ্বাস ফেলে বেলেৎস্কি বলল, "আরে, আমি তো যেকোন রকম জীবনযাত্রার সঙ্গে মানিয়ে নিতে এক নম্বরের ওস্তাদ। যাই, ওরা কি করছে একবার দেখে আসি।" ড্রেসিং-গাউনটা কাঁধের উপর ফেলে যেতে যেতে বলল, "তুমি জলযোগের ব্যবস্থাটা দেখো।"

ওলেনিন মশলা-রুটি ও মধু কিনতে বেলেৎস্কির আর্দালিকে পাঠাল; কিন্তু হঠাৎ টাকা দেবার সময় ব্যাপারটা তার কাছে এতই বিরক্তিকর লাগল (মনে হল সে যেন ঘুষ দিচ্ছে) যে আর্দালি যখন শুধাল: 'পিপারমেণ্ট দেওয়া মশলা-রুটি কতটা আর মধু দেওয়া কতটা আনব?' তখন সে কোন স্পষ্ট জবাবই দিল না।

"তোমার যেমন খুশি।"

"সব টাকাটা খরচ করব কি?" সৈনিকটি অর্থপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করল। "পিপারমেণ্টের খুব দাম। ষোল কোপেক।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, সবটাই খরচ করবে," বলে ওলেনিন জানালার ধারে গিয়ে বসল। যেন কোন গুরুতর অপরাধ করতে যাচ্ছে এমনিভাবে তার বুকটা টিপ্‌টিপ্ করছে দেখে সে অবাক হয়ে গেল। বেলেৎস্কি যাবার পরেই মেয়েদের ঘর থেকে চেঁচামেচি ও হৈ-হল্লা শোনা গেল। কয়েক মিনিট পরেই দেখা গেল, চারদিকের হাসি ও হল্লার মধ্যে বেলেৎস্কি লাফ দিয়ে বেরিয়ে ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নামছে। বলল, "তাড়িয়ে দিল।"

একটু পরে উস্তেংকা ঘরে ঢুকে অতিথিদের আমন্ত্রণ জানিয়ে বলল, সব কিছু তৈরি।

সকলে ঘরে ঢুকে দেখল, সত্যি সব কিছু তৈরি। উস্তেংকা দেয়াল বরাবর কুশনগুলো সাজিয়ে দিচ্ছে। একটা বে-মাপের ছোট চাদর দিয়ে ঢাকা টেবিলের উপর এক ডিকেণ্টার চিকির ও কিছু শুট্‌কি মাছ রাখা হয়েছে। ঘরময় পিঠে ও আঙুরের গন্ধ। সুদৃশ্য বেশ্‌মেৎ পরা রুমালবিহীন খোলা

মাথায় আধ ডজন খানেক মেয়ে উনুনের পিছনে এক কোণে জড়ো হয়ে ফিস্‌-ফিস্‌ করছে, আর খিল্‌খিল্‌ হেসে গড়িয়ে পড়ছে।

ওলেনিন লক্ষ্য করল, মেয়েদের দলে মারিয়াংকাও আছে। সকলেই সুন্দরী, তবু এরকম একটা ইতর ও অদ্ভুত পরিবেশে তাকে দেখে ওলেনিন বিরক্ত হল, তার মনে যেন আঘাত লাগল। যাই হোক, সে স্থির করল, বেলেৎস্কি যা যা করবে সেও তাই করবে। বেলেৎস্কি গম্ভীরভাবে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল, উস্তেংকার স্বাস্থ্য কামনা করে এক গ্লাস মদ খেল, আর অন্যদেরও মদ খেতে অনুরোধ জানাল। উস্তেংকা জানাল, মেয়েরা মদ খায় না।

দলের ভিতর থেকে একটি মেয়ে বলে উঠল, "খেতে পারি, তবে একটু মধু মিশিয়ে।"

মধু ও মশলা-কেক নিয়ে আর্দালি সবে ফিরেছে; ভদ্রজনদের সকলেরই নেশা হয়েছে মনে করে সন্দিগ্ধ চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে আর্দালি কাগজে মোড়া একটুকরো মৌচাক ও কেক তাদের হাতে হাতে দিল। সে দামের কথা বোঝাতে যাচ্ছিল, কিন্তু বেলেৎস্কি তাকে বাইরে পাঠিয়ে দিল। মদের গ্লাসে গ্লাসে মধু মিশিয়ে এবং তিন পাউণ্ড মশলা-কেক টেবিলের উপর ছড়িয়ে দিয়ে বেলেৎস্কি ঘরের কোণ থেকে মেয়েদের জোর করে টেনে এনে টেবিলে বসিয়ে দিল এবং প্রত্যেকের হাতে কেক তুলে দিল। উস্তেংকা ও বেলেৎস্কির সহজ, সরল আচরণ সত্ত্বেও আলোচনা থেমে থেমে চলতে লাগল। কিছু বলতে গিয়ে ওলেনিনও হোঁচট খেল; তার মনে হল, সে হয় তো অন্যদের মনে কৌতূহল ও বিদ্রূপ জাগিয়ে তুলছে। সে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল; তার মনে হল, মারিয়াংকা অস্বস্তি বোধ করছে। ওলেনিন ভাবল, "ওরা হয়তো আমাদের কাছ থেকে কিছু টাকা আশা করছে। কেমন করে দেওয়া যায়? টাকাটা দিয়ে এখান থেকে সরে পড়ার দ্রুততম পথটা কি?"

অধ্যায়—২৫

"কি ব্যাপার? তুমি তোমার নিজের ভাড়াটেকে চেন না?" বেলেৎস্কি মারিয়াংকাকে বলল।

ওলেনিনের দিকে একবার তাকিয়ে মারিয়াংকা জবাব দিল, "তিনি যদি আমাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎই না করেন তো চিনব কেমন করে?"

ওলেনিনের ভয় হল; কিন্তু কিসের ভয় তা সে জানে না। কি যে বলছে তা না বুঝেই বলল, "তোমার মাকে আমার বড় ভয়। প্রথম দিন ঘরে ঢুকতেই যা একখানা বকুনি দিয়েছেন।"

মারিয়াংকা হো-হো করে হেসে উঠল।

"আর তাতেই আপনি ভয় পেয়ে গেলেন?" বলে মারিয়াংকা তার দিকে তাকিয়ে সরে গেল।

ওলেনিন এই প্রথম তার সুন্দর মুখখানির সবটা দেখতে পেল। এতদিন পর্যন্ত তাকে দেখেছে চোখ পর্যন্ত রুমালে ঢাকা অবস্থায়। তাকে যে গ্রামের সেরা সুন্দরী বলা হয় তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

উস্তেংকা সুশ্রী, ছোটখাট, মোটা, গোলাপী, খুশি-ভরা বাদামী চোখ, আর লাল ঠোঁট; সে ঠোঁটে হাসি ও কথার ফুলঝুরি সারাক্ষণই লেগে আছে। অপর দিকে, মারিয়াংকা সুশ্রী নয়, কিন্তু সুন্দরী। তার দেহ-গঠন কিছুটা পুরুষালি, কঠোর; কিন্তু তার দীর্ঘ সমানুপাতিক শরীর, পরিপুষ্ট বুক ও কাঁধ, দীর্ঘায়ত কালো চোখের মিষ্টি চাউনি, মুখের মধুর ভাব ও হাসি তার মধ্যে এনেছে সৌন্দর্যের হাতছানি। সে অল্প হাসে, কিন্তু সে হাসি মনকে টানে। মেয়েরা সকলেই দেখতে ভাল, কিন্তু কেউ যদি ওদের সঙ্গে কথা বলতে চায় তো মারিয়াংকার সঙ্গেই কথা বলবে। সে যেন দলের মধ্যে গর্বোন্নতা এক সুখী রাণী।

মজলিস জমিয়ে তুলতে বেলেৎস্কি অনবরত বক্‌বক্ করতে লাগল, মেয়েদের দিয়ে চিকির পরিবেশন করাল, মারিয়াংকার রূপ সম্পর্কে ফরাসী ভাষায় ওলেনিনকে অনেক ইতর কথা শোনাল। ওলেনিনের অস্বস্তি বেড়েই চলল। কি করে এখান থেকে বেরিয়ে পড়া যায় সেই কথাই ভাবছে, এমন সময় বেলেৎস্কি ঘোষণা করল, যেহেতু সে দিনটা উস্তেংকার নামকরণ দিবস, সেই হেতু তাকেই পুরুষদের হাতে চিকির তুলে দিতে হবে একটি করে চুম্বনের সঙ্গে। উস্তেংকা রাজী হয়ে গেল, তবে এক শর্তে—বিবাহ-বাসরের প্রথামত সকলকেই একটা পাত্রে টাকা ফেলতে হবে।

"কেন যে এই ভোজসভায় মরতে এসেছিলাম!" ওলেনিন বেরিয়ে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল।

"তুমি কোথায় চললে?"

পালাবার মতলব করেই ওলেনিন বলল, "কিছুটা তামাক নিয়ে আসছি," কিন্তু বেলেৎস্কি তার হাত চেপে ধরে বলল, "আমার সঙ্গে টাকা আছে।" তখন ওলেনিনের মনে হল, "এখানে এলেই কিছু দিতে হয়, কাজেই পালানো চলে না। আচ্ছা, আমি কেন বেলেৎস্কির মত চলতে পারি না? আমার এখানে আসা হয় তো ঠিক হয় নি, কিন্তু এসে যখন পড়েছি তখন ওদের স্ফূর্তিটা মাটি করা উচিত নয়। আমাকেও একজন কসাকের মতই মদ টানতে হবে।" কাঠের পাত্রটা (প্রায় আট গ্লাস মদ ধরে) তুলে নিয়ে চিকির ঢেলে প্রায় পূর্ণ করে সবটা খেয়ে ফেলল। তার মদ খাওয়া দেখে মেয়েরা অবাক হয়ে গেল, কিছুটা ভয়ও পেল। তাদের কাছে ব্যাপারটা যেমন

বিস্ময়কর তেমনই অস্বাভাবিক মনে হল। উস্তেংকা তাদের দুজনকেই এক গ্লাস করে মদ এনে দিল, আর দিল একটা করে চুমো।

পাত্রে যে চারটে রৌপ্য রুবল পড়ে ছিল সেগুলি টুংটাং করে বাজিয়ে উস্তেংকা বলল, "এই যে মেয়েরা, এবার আমরা একটা মজা করব।" ওলেনিনের এখন আর অস্বস্তি বোধ হচ্ছে না, সেও বেশ বাচাল হয়ে উঠেছে।

মারিয়াংকার হাতটা ধরে বেলেৎস্কি বলল, "মারিয়াংকা, এবার তোমার পালা। তুমি আমাদের মদ দাও আর চুমো খাও।"

তাকে মারবার ভঙ্গী করে মারিয়াংকা বলল, "হ্যাঁ, ঠিক এই রকম চুমোই খাব।"

আর একটি মেয়ে বলল, "দাদুকে তুমি টাকা ছাড়াই চুমো খেতে পার।"

মেয়েটিকে জোর করে চুমো খেয়ে বেলেৎস্কি বলল, "আচ্ছা, এই তো লক্ষ্মী মেয়ে।" মারিয়াংকার দিকে ঘুরে বলল, "এবার তোমার পালা। তোমার ভাড়াটেকে এক গ্লাস দাও।"

হাত ধরে তাকে নিয়ে গিয়ে ওলেনিনের পাশে বেঞ্চিতে বসিয়ে দিল।

মাথাটা ঘুরিয়ে ধরে ভাল করে দেখে ওলেনিন বলল, "কী রূপ!"

মারিয়াংকা বাধা দিল না; সগর্ব হাসি হেসে দীর্ঘায়ত চোখ মেলে ওলেনিনের দিকে তাকাল।

বেলেৎস্কি বলল, "মেয়েটি সুন্দরী।" মারিয়াংকার চোখদুটিও যেন সেই কথার সমর্থনে বলল, "হ্যাঁ, চেয়ে দেখ আমি কত সুন্দরী।"

কি করছে না ভেবেই ওলেনিন মারিয়াংকাকে আলিঙ্গন করল; চুমোও খেত, কিন্তু হঠাৎ মেয়েটি নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বেলেৎস্কিকে প্রায় ঠেলে ফেলে দিয়ে এক লাফে উনুনের দিকে ছুটে গেল। সকলে হৈ-হৈ করে হেসে উঠল। বেলেৎস্কি মেয়েদের কানে কানে কি যেন বলল, আর হঠাৎ সকলে ছুটে বারান্দায় গিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে দিল।

"তুমি বেলেৎস্কিকে চুমো খেলে, আর আমাকে চুমো খাবে না কেন?" ওলেনিন শুধাল।

"ওঃ, শুধু তাই। আমার ইচ্ছা হল না; বাস্।" ঠোঁট কামড়ে ভুরু কুঁচকে মেয়েটি বলল। তারপর হেসে বলল, "উনি তো দাদু।" মারিয়াংকা দরজার কাছে গিয়ে সশব্দে ধাক্কা মারল। "এই শয়তানীরা, দরজায় তালা দিয়েছিস কেন?"

তার কাছে গিয়ে ওলেনিন বলল, "আহা, ওদের ওখানেই থাকতে দাও, আমরা থাকি এখানে।"

ভ্রূকুটি করে মারিয়াংকা তাকে ঠেলে দিল। পুনরায় ওলেনিনের চোখে সে যেন মহিমান্বিতা হয়ে দেখা দিল, তার সুবুদ্ধি ফিরে এল, নিজের কাজের

অন্য লজ্জা পেল। দরজার কাছে গিয়ে নিজেই টানতে লাগল।

"বেলেৎস্কি! দরজা খোল! বোকার মত কাজ করো না!"

মারিয়াংকা আরও খুশিতে হেসে উঠল; বলল, "একি, আপনি আমাকে ভয় পাচ্ছেন?"

"সত্যি ভয় পাচ্ছি; তুমিও তো তোমার মায়ের মতই বিরূপ।"

"আপনার উচিত আরও বেশী সময় ইয়েরশ্‌কার সঙ্গে কাটানো; তাহলেই মেয়েরা আপনাকে ভালবাসবে!" ওলেনিনের চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে মারিয়াংকা হাসল। কি যে বলবে ওলেনিন জানে না।

কোনরকমে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "আর আমি যদি তোমাকে দেখতে যাই।"

"তাহলে তো আলাদা ব্যাপার হবে," মাথা দুলিয়ে মেয়েটি বলল।

সেই মুহূর্তে বেলেৎস্কি দরজাটা খুলে দিল, আর মারিয়াংকা একলাফে সরে গেল, আর তার ফলে তার উরুর ধাক্কা লাগল ওলেনিনের পায়ে। চকিতে ওলেনিনের মনে হল, "ভালবাসা, আত্মত্যাগ, লুকাশ্‌কা—এ সবই তো অর্থহীন চিন্তা। আসল কথা সুখ। যে সুখী, সেই ঠিক।" অপ্রত্যাশিত শক্তিতে সে মারিয়াংকাকে জড়িয়ে ধরে তার কপালে ও গালে চুমো খেল। মারিয়াংকা রাগ করল না, শুধু হো-হো করে হেসে অন্য মেয়েদের কাছে ছুটে গেল।

মজলিস সেখানেই শেষ হল। উস্তেংকার মা কাজ থেকে ফিরে এসে আচ্ছা করে বকুনি দিয়ে মেয়েদের বাড়ি থেকে বের করে দিল।

অধ্যায়—২৬

বাড়ির পথে হাঁটতে হাঁটতে ওলেনিন ভাবতে লাগল, "ঠিক কথা। আমার দিক থেকে রাশটা একটু আলগা দেওয়া দরকার; তাহলেই কসাক মেয়েটির সঙ্গে আমি ভয়ানকভাবে প্রেমে পড়ে যেতে পারি।" এই চিন্তা নিয়েই সে শুতে গেল; কিন্তু মনের আশা, সে আগের মতই জীবন চালাতে থাকবে। মারিয়াংকার সঙ্গে তার সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটেছে। দু'জনের মধ্যে যে প্রাচীর ছিল সেটা ভেঙে পড়েছে। তার সঙ্গে দেখা হলেই ওলেনিন তাকে ডাকে।

বাড়ির কর্তা ভাড়া নিতে এসে ওলেনিনের সম্পদ ও উদারতার কথা শুনে তাকে নিজের কুটিরে আমন্ত্রণ করল। এবার বৃদ্ধাও তাকে সাদরে গ্রহণ করল। মজলিসের দিন থেকেই ওলেনিন প্রায়ই সন্ধ্যার দিকে তাদের বাড়িতে যায় এবং অনেক রাত পর্যন্ত কাটায়। গ্রামে তার জীবনযাত্রা আগেকার মতই

চলছে, কিন্তু তার ভিতরটা একেবারেই বদলে গেছে। দিনগুলি জঙ্গলে কাটায়, আর আটটা নাগাদ অন্ধকার হয়ে এলেই একাকি অথবা ইয়েরশ্‌কা খুড়োকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির মালিকদের সঙ্গে দেখা করতে যায়। এতে বাড়ির সকলে এতই অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে সে একদিন না গেলেই তারা অবাক হয়। সে মদের জন্য ভাল দাম দেয়, আর এমনিতেও বেশ শান্তশিষ্ট। চা বা চিকির খেতে খেতে সকলে গল্প করে—কসাকদের কথা, প্রতিবেশীদের কথা অথবা রাশিয়ার কথা বলে; ওলেনিন বলে, অন্য সকলে নানান প্রশ্ন করে। কখনও বা সে একটা বই নিয়ে যায়, আর নিজে নিজেই পড়ে। মারিয়াংকা বুনো ছাগলের মত পা গুটিয়ে কখনও উনুনের উপরকার তাকে, কখনও বা ঘরের অন্ধকার কোণে বসে থাকে। কোন কথা বলে না, আলোচনায় যোগ দেয় না, কিন্তু ওলেনিনের দিকেই সারাক্ষণ তাকিয়ে থাকে। চুপচাপ বই পড়তে পড়তেও ওলেনিন তার উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন থাকে। মারিয়াংকার কাছে সে কিছু চায় না, তাকে নিয়ে তার মনে কোন বাসনাও নেই, তবু যত দিন যাচ্ছে ততই যেন তার উপস্থিতি ওলেনিনের কাছে একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠছে।

কসাক গ্রামের জীবনযাত্রার মধ্যে ওলেনিন এত বেশী ঢুকে পড়েছে যে তার অতীত যেন অনেক দূরে সরে গেছে। ভবিষ্যৎ জীবন, বিশেষ করে যে জগতে এখন সে বাস করছে তার বাইরের ভবিষ্যৎ নিয়ে সে আর মাথা ঘামায় না। বাড়ি থেকে, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে যে সব চিঠি আসে তাতে সে একেবারেই বিপথগামী হয়ে গেছে বলে যে আশংকা প্রকাশ করা হয় তাতে সে অসন্তুষ্ট হয়; আবার এই গ্রামে থেকে সে যে ভাবে জীবন চালাচ্ছে সেভাবে যারা জীবন চালায় না তাদেরও সে মনে করে বিপথগামী। তার নিশ্চিত বিশ্বাস, সে যে আগেকার পরিবেশকে ভেঙে তা থেকে বেরিয়ে এসে এই গ্রামের একটি নির্জন ও মৌলিক জীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে সেজন্য তাকে কোনদিন অনুতাপ করতে হবে না। এখানে সে প্রতিদিন নিজেকে অধিকতর মুক্ত, অধিকতর মানুষ বলে অনুভব করছে। কল্পনায় ককেসাসের যে ছবি সে এঁকেছিল এখনকার ককেসাস তার চাইতে অনেক স্বতন্ত্র বলে মনে হচ্ছে। এখানে এমন কিছুই সে দেখতে পায় নি যা তার স্বপ্নের অনুরূপ, অথবা ককেসাস সম্পর্কে সে যা কিছু শুনেছে বা পড়েছে তার অনুরূপ। সে ভাবে, "এখানে তো সেই সব ককেসীয় জোব্বা, পাহাড়, আমালৎ বেক, নায়ক ও খল-নায়করা নেই। মানুষ প্রকৃতির মতই বাঁচে: তাদের মৃত্যু হয়, জন্ম হয়, মিলন হয়, জন্মের সংখ্যা বাড়ে; তারা লড়াই করে, পান-ভোজন করে, আনন্দ করে, একসময় মরে; সূর্য ও ঘাসের উপর, জীবজন্তু ও উদ্ভিদের উপর প্রকৃতি যেসব বিধি-নিষেধ আরোপ করে তার বেশী আর কোন বিধি-নিষেধ থাকে না তাদের উপর। অন্য কোন

আইন-কানুনও তাদের নেই।" আর তাই নিজের সঙ্গে তুলনায় এই লোক-গুলিকে তার মনে হয় সুন্দর, শক্তিমান ও স্বাধীন; তাদের দেখলে নিজের জন্য তার লজ্জা হয়, দুঃখ হয়। মাঝে মাঝেই তার মনে হয়, সবকিছু ছেড়ে দিয়ে কসাকদের দলে নাম লেখাবে, একটা বাড়ি ও গরু-মোষ কিনবে, একটি কসাক নারীকে (মারিয়াংকা নয়, তাকে সে দিয়েছে লুকাশ্‌কাকে) বিয়ে করবে, ইয়েরশ্‌কা খুড়োর সঙ্গে থাকবে, তাকে নিয়ে শিকারে যাবে, মাছ ধরবে, আর যুদ্ধ বাঁধলে কসাকদের সঙ্গেই যুদ্ধ করতে যাবে। "তাহলে সে কাজ আমি করছি না কেন? কিসের জন্য অপেক্ষা করে আছি?···যে কাজকে যুক্তিযুক্ত ও সঠিক বলে মনে করি তা করতে কি আমি ভয় পাচ্ছি? এই যে সরল কসাক হবার বাসনা, প্রকৃতির কাছাকাছি বাস করা, কারও ক্ষতি না করা, বরং অন্যের উপকার করা, এসব কি আমার আগেকার স্বপ্ন অর্থাৎ কোন রাজ্যের মন্ত্রী বা কর্ণেল হওয়ার চাইতেও অর্থহীন?" কিন্তু একটি কণ্ঠস্বর যেন বলে ওঠে, কোন সিদ্ধান্ত না নিয়ে তার অপেক্ষা করাই উচিত। সে কখনও পুরোপুরিভাবে ইয়েরশ্‌কা ও লুকাশ্‌কার মত বাস করতে পারবে না —এই চিন্তাই তার পথরোধ করে দাঁড়ায়; আবার সুখ সম্পর্কে তার ধারণাটাও তো আলাদা; সে মনে করে আত্মত্যাগেই সুখ,—এই চিন্তাও তার পথরোধ করে। লুকাশ্‌কার জন্য সে যা করেছে তাতেই তার আনন্দ। কবে অপরের জন্য নিজেকে বলি দিতে পারবে তারই অপেক্ষায় সে আছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত সেরকম কারও দেখা পায় নি। কখনও কখনও সুখের এই নব-আবিষ্কৃত ব্যবস্থাপত্রের কথা সে ভুলে যায়, মনে ভাবে যে ইয়েরশ্‌কা খুড়োর জীবনের সঙ্গে একাত্ম হবার ক্ষমতা তার আছে; কিন্তু অচিরেই তার সে ভুল ভেঙে যায়, সচেতন আত্মত্যাগের ধারণাকে আঁকড়ে ধরে, আর সেই ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়িয়ে শান্ত, সগর্ব দৃষ্টিতে সব মানুষের দিকে, অপরের সুখের দিকে তাকায়।

অধ্যায়—২৭

আঙুর তোলার ঠিক আগে ঘোড়ায় চেপে লুকাশ্‌কা এল ওলেনিনের সঙ্গে দেখা করতে। সে আগের চাইতেও উদ্যমশীল হয়ে উঠেছে।

সানন্দ অভিনন্দন জানিয়ে ওলেনিন তাকে শুধাল, "আচ্ছা? তুমি নাকি বিয়ে করছ?"

লুকাশ্‌কা সরাসরি কোন জবাব দিল না। "এই দেখ নদীর ওপার থেকে আমি ঘোড়াটাকে পাল্টে এনেছি। একটা ঘোড়ার মত ঘোড়া! লড্‌ আস্তাবলের কাবার্দা ঘোড়া। আমি ঘোড়া চিনি।"

তারা ঘোড়াটাকে খুঁটিয়ে দেখল, উঠোনে এক পাক ঘোরালো। ঘোড়াটা

সত্যি খুব ভাল ; শরীরটা চওড়া ও লম্বা, গাটা চকচকে, ঘন রেশমী লেজ, আর চমৎকার নরম ঘাড়ের লোম। লুকাশ্‌কার ভাষায়, এতই পুরুষ্টু যে "তার পিঠে শুয়ে ঘুমানো যায়।" ক্ষুর, চোখ, দাঁত খুবই পরিপাটি ও সুদৃশ্য। ওলেনিন ঘোড়াটার প্রশংসা না করে পারল না ; এত সুন্দর ঘোড়া সে ককেসাসে আগে দেখে নি।

ঘোড়ার গলা চাপড়ে দিয়ে লুকাশ্‌কা বলল, "আর কী চলন ! পা ফেলার কী ভঙ্গী ! আর তেমনি চটপটে—মনিবের পিছনে যেন ছুটে চলে।"

"ঘোড়া পাল্টাতে খুব বেশী খরচ হয়েছে কি ?" ওলেনিন শুধাল।

লুকাশ্‌কা হেসে বলল, "অত হিসাব করি নি ; একজন কুনাকের কাছ থেকে পেয়েছি।"

"আশ্চর্য সুন্দর ঘোড়াটা ! ওটার জন্য কত দাম চাও ?" ওলেনিন শুধাল।

"একশ' পঞ্চাশ রুবল দর পেয়েছি, কিন্তু তোমাকে অমনি দেব," খুশি হয়ে লুকাশ্‌কা বলল। "মুখের কথা খসালেই ওটা তোমার। শুধু জিনটা খুলে নেব, ঘোড়াটা তোমার। শুধু কাজ চালাবার মত যে কোন একটা ঘোড়া আমাকে দিও।"

"না, তা হবে না।"

"বেশ তো, তাহলে এটা আমি তোমাকে উপহার দিলাম," বলে লুকাশ্‌কা লাগামটা খুলে নিল এবং তাতে ঝোলানো দুটো ছোরার একটা তুলে নিল। "এটাকে এনেছিলাম নদীর ওপার থেকে।"

"ওঃ, ধন্যবাদ।"

"আর মা বলেছে নিজেই তোমাকে কিছু আঙুর এনে দেবে।"

"তার কোনই দরকার নেই। একদিন হিসাব করলেই হবে। দেখছ তো, ছোরাটার জন্য তোমাকে কোন টাকা দিচ্ছি না।"

"কি করে দেবে, আমরা তো কুনাক। ঠিক নদীর ওপারের গিরেই খানের মত। সে আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে বলল, 'তোমার যা ইচ্ছা বেছে নাও !' আর আমি এই তলোয়ারটা নিলাম। এটাই আমাদের রীতি।"

কুটিরের ভিতরে গিয়ে তারা কিছুটা চিকির পান করল।

"কিছুক্ষণ এখানে আছ তো ?" ওলেনিন শুধাল।

"না, আমি বিদায় নিতে এসেছি। রক্ষী-বেষ্টনী থেকে আমাকে ওরা তেরেকের ওপারে একটা কোম্পানিতে পাঠাচ্ছে। সহকর্মী নাজার্কার সঙ্গে আজ রাতেই আমি চলে যাচ্ছি।"

"তাহলে বিয়েটা কবে হবে ?"

"বাক্‌দানের জন্য ফিরে আসব, তারপর আবার কোম্পানিতে ফিরে যাব," অনিচ্ছাভরে লুকাশ্‌কা জবাব দিল।

"সে কি—বাক্‌দত্তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎও হবে না ?"

"ঠিক তাই—দেখে কি লাভ? যদি যুদ্ধে যাও তো আমাদের কোম্পানিতে মোটা লুকাশ্‌কার খোঁজ করো। ওখানে অনেক শুয়োর আছে! আমি দুটোকে মেরেছি। তোমাকে নিয়ে যাব।"

"আচ্ছা, বিদায়! খৃস্ট তোমার সহায় হোন।"

লুকাশ্‌কা সওয়ার হল; মারিয়াংকার সঙ্গে দেখা না করেই ঘোড়াটাকে আধ পাক ঘুরিয়ে রাস্তা বরাবর ছুটে চলে গেল; সেখানে নাজার্কা তার জন্য অপেক্ষা করছে।

চোখ টিপে ইয়াম্‌কার বাড়িটা দেখিয়ে নাজার্কা শুধাল, "বলি কি, এক-বার দেখা করে যাব না?"

লুকাশ্‌কা বলল, "ঠিক আছে। আমার ঘোড়াটা নিয়ে চলে যাও। আমি যদি শিগ্‌গির না পৌঁছি তো কিছু খড় খেতে দিও। যেভাবেই হোক, সকাল নাগাদ আমি কোম্পানিতে পৌঁছে যাব।"

"শিক্ষার্থী কি তোমাকে এর বেশী কিছু দেয় নি?"

ঘোড়া থেকে নেমে সেটাকে নাজার্কার হাতে দিয়ে লুকাশ্‌কা বলল, "আমার ভাগ্য ভাল যে একটা ছুরি দিয়েই মিটিয়ে ফেলতে পেরেছি—সে তো ঘোড়াটাই চাইতে যাচ্ছিল।"

ওলেনিনের জানালার পাশ দিয়েই সে ছুটে উঠোনে নামল; তারপর কর্ণেটের ঘরের জানালার নীচে পৌঁছে গেল। বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। শুধুমাত্র একটা ফ্রক পরে মারিয়াংকা চুল বাঁধছে; এখনি শুতে যাবে।

"আমি এসেছি," কসাক ফিস্‌ফিস্ করে বলল।

নিজের নাম শুনেই মারিয়াংকার মুখখানা হঠাৎ ঝলমলিয়ে উঠল। জানালা খুলে মুখ বাড়াল; দুই চোখে ভয় ও আনন্দ।

"কি—কি চাও তুমি?" সে বলল।

লুকাশ্‌কা ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "খোল! এক মিনিটের জন্য ভিতরে ঢুকতে দাও। অপেক্ষা করে করে পাগল হয়ে গেলাম!"

জানালার ভিতর দিয়ে মারিয়াংকার মাথাটা চেপে ধরে চুমো খেল।

"সত্যি, খুলে দাও!"

"কেন বাজে কথা বলছ? বলেছি তো খুলব না। তুমি কি অনেক দিনের জন্য এসেছ?"

লুকাশ্‌কা জবাব দিল না, চুমো খেতে লাগল। মারিয়াংকাও আর কিছু বলল না।

লুকাশ্‌কা বলল, "দেখ তো, জানালার ভিতর দিয়ে তোমাকে ভাল করে জড়িয়ে ধরতেও পারছি না।"

"মারিয়াংকা সোনা!" তার মার গলা শোনা গেল; "তোমার সঙ্গে আর কে আছে?"

পাছে কেউ দেখে ফেলে তাই লুকাশ্‌কা টুপিটা খুলে ফেলে জানালার পাশে হামাগুড়ি দিয়ে বসে পড়ল।

"সরে যাও, তাড়াতাড়ি!" মারিয়াংকা চাপা গলায় বলল। মাকে শুনিয়ে বলল; "লুকাশ্‌কা এসেছে, বাবার খোঁজ করছে।"

"বেশ তো, তাকে এখানে পাঠিয়ে দাও!"

"সে তো চলে গেল; বলল, তার খুব তাড়া আছে।"

আসলে নীচু হয়ে বড় বড় পা ফেলে লুকাশ্‌কা ছুটে উঠোনটা পার হয়ে ইয়াম্‌কার বাড়ির দিকে চলে গেল; একমাত্র ওলেনিন ছাড়া আর কেউ তাকে দেখতে পায় নি। দুই পাত্র চিকির টেনে সেও নাজার্কা ঘোড়ায় চেপে ঘাঁটির দিকে চলে গেল। গরম, অন্ধকার, শান্ত রাত। তারা নিঃশব্দে চলেছে; শুধু শোনা যাচ্ছে তাদের ঘোড়ার পা ফেলার শব্দ। লুকাশ্‌কা কসাক মিংগালের গান গাইতে শুরু করে দিল। প্রথম কলিটা শেষ না করেই সে একবার থামল; তারপর নাজার্কার দিকে ফিরে বলল:

"আমি বলছি, সে আমাকে ঘরে ঢুকতে দিল না!"

"ও?" নাজার্কা বলল। "আমি জানতাম দেবে না। ইয়াম্‌কা আমাকে কি বলেছে জান? শিক্ষার্থীটি তাদের বাড়িতে যাতায়াত করছে। ইয়েরশ্‌কা খুড়ো তো বলেই বেড়াচ্ছে, মারিয়াংকাকে পাইয়ে দেবার জন্য শিক্ষার্থীর কাছ থেকে সে একটা বন্দুকই বাগিয়েছে।"

লুকাশ্‌কা রেগে বলল, "সে একটা মিথ্যাবাদী, বুড়ো শয়তান! সে ও ধরনের মেয়ে নয়। বুড়ো শয়তানটা যদি সরে না যায় তো মজা বুঝিয়ে দেব।" তারপরেই সে আবার গান ধরল:

"ইজ্‌মাইলোভো গ্রাম থেকে,
মালিকের প্রিয় বাগান থেকে,
জলজ্বল-চোখ একটা বাজপাখি
একদা উড়ে গেল তার খাঁচা থেকে,
আর তখনই এক তরুণ শিকারী এল ঘোড়ায় চেপে।
জলজ্বল্‌-চোখ বাজপাখিকে ইসারায় ডাকল:
"এস বাজপাখি, বস আমার ডান হাতে,
তুমি যদি না আস, তো খৃস্টান জার
আমাকে ফাঁসি দেবে, ঝোলাবে অনেক উঁচুতে।"
জলজ্বল-চোখ বাজপাখি জবাব দিল:
"তুমি তো জানতে না সোনার খাঁচায় কেমন করে আমাকে রাখতে হয়,
ডান হাতে কেমন করে আমাকে ধরতে হয় তাও জানতে না।
এবার আমি উড়ে যাব সুনীল সাগরে, দূরে, বহুদূরে,

সেখানে মারব একটা সাদা হাঁস,
আর পেট ভরে খাব সেই সাদা হাঁসের মিষ্টি মাংস।"

অধ্যায়—২৮

কর্ণেটের বাড়িতে বাকদান-অনুষ্ঠান চলছে। লুকাশ্‌কা গ্রামে ফিরেছে, কিন্তু ওলেনিনের সঙ্গে দেখা করতে যায় নি; আর নিমন্ত্রিত হয়েও ওলেনিনও যায় নি বাকদান-অনুষ্ঠানে। তার মন খুব খারাপ, এই কসাক গ্রামে আসার পর থেকে কোন দিন তার মন এত খারাপ হয় নি। সে দেখেছে, সন্ধ্যার দিকে লুকাশ্‌কা ভাল পোশাক পরে মাকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেল; তার প্রতি লুকাশ্‌কার এই বিরূপ ব্যবহারে সে খুবই দুঃখিত। নিজের কুটিরে বসে ওলেনিন দিনপঞ্জী লিখতে বসল।

লিখল, 'ইদানীং আমি অনেক কিছু ভেবেছি, অনেক বদলে গেছি; আবার ফিরে গেছি সেই পুঁথি-লিখিত বিধানে: সুখী হবার একমাত্র পথ ভালবাসা, ত্যাগের পথে ভালবাসা, সব মানুষকে সব কিছুকে ভালবাসা; চারদিকে ভালবাসার জাল ছড়িয়ে দেওয়া, আর সেই জালের মধ্যে যে আসবে তাকেই গ্রহণ করা। এই পথেই আমি পেয়েছি ভানিয়ুশাকে, ইয়েরশ্‌কা খুড়োকে, লুকাশ্‌কাকে, আর মারিয়াংকাকে।"

এই পর্যন্ত লেখা হতেই ঘরে ঢুকল ইয়েরশ্‌কা খুড়ো।

ইয়েরশ্‌কা খুব খোস মেজাজে আছে। কয়েকদিন আগে সন্ধ্যাবেলা ওলেনিন তাকে দেখতে গিয়েছিল; সে তখন উঠোনে বসে একটা ছোট ছুরি দিয়ে বেশ সুকৌশলে একটা শুয়োরের চামড়া ছাড়াচ্ছিল; তার মুখে ছিল গর্ব ও খুশির ভাব। আদরের কুকুর লিয়ামসহ বেশ কয়েকটি কুকুর কাছেই শুয়ে তার হাতের কাজ দেখছিল আর ধীরে ধীরে লেজ নাড়ছিল। ছোট ছেলেগুলি সমীহ করে তাকে বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখছিল, অন্য দিনের মত মোটেই বিরক্ত করছিল না। প্রতিবেশিনীরা সাধারণতই তাকে ভাল চোখে দেখে না, কিন্তু সেদিন তারাও তার প্রতি সদয়—কেউ এনে দিল একপাত্র চিকির, কেউ খানিকটা জমাট মাখন, আবার কেউ বা কিছুটা ময়দা। পরদিন ইয়েরশ্‌কা রক্তমাখা হাতে বসে গেল তার ভাঁড়ার ঘরে, সকলকে ভাগ করে দিল শুয়োরের মাংস, আর কারও কাছ থেকে নিল টাকা, কারও কাছ থেকে মদ। তার চোখে-মুখে যেন ফুটে উঠেছে: 'ঈশ্বর আমাকে সুদিন দিয়েছেন, আমি একটা শুয়োর মেরেছি; তাই আমার এত খাতির।' তার ফলে চারদিন ধরে সে মদ খেয়েই কাটাল, গ্রাম ছেড়ে কোথাও গেল না। তাছাড়া, বাকদান-অনুষ্ঠানেও কিছু পানীয় জুটেছিল।

মাতাল হয়েই ওলেনিনের কাছে এসেছে ; মুখ লাল, দাড়ি এলোমেলো, সোনালী পাড়-বসানো একটা নতুন লাল রংয়ের বেশ্‌মেত্‌ পরা, হাতে একটা বালালাইকা (বাদ্যযন্ত্র), নদীর ওপার থেকে যোগাড় করেছে। অনেক দিন থেকে ওলেনিনকে কথা দিয়ে রেখেছে, ওটা বাজিয়ে শোনাবে। সেই মেজাজ নিয়েই এসেছে, কাজেই ওলেনিনকে লিখতে দেখে দুঃখিত হল।

ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, "লিখে যাও, লিখে যাও বন্ধু" চুপচাপ সে মেঝেতেই বসে পড়ল। মাতাল হলে মেঝেটাই তার প্রিয় আসন। চারদিকে তাকিয়ে ওলেনিন মদ আনতে বলে আবার লিখতে লাগল। একা একা মদ খেতে ইয়েরশ্‌কার ভাল লাগল না, সে চায় কথা বলতে।

"কর্ণেটের বাড়িতে বাকদানে গিয়েছিলাম। কিন্তু তারা! সব ব্যাটা শুয়োরের বাচ্চা!—নেই মাংতা!—তাই তোমার কাছে চলে এলাম।"

লিখতে লিখতেই ওলেনিন শুধাল, "তোমার বালালাইকাটা কোথায় পেলে?"

শান্তভাবেই সে জবাব দিল, "নদী পেরিয়ে গিয়েছিলাম হে বন্ধু, সেখানেই জুটিয়েছি। এ যন্ত্রে আমি ওস্তাদ। তাতার বা কসাক, ভদ্রলোক বা চাষীর গান, যা তুমি চাও।"

আর একবার তার দিকে তাকিয়ে ওলেনিন হাসল ; তারপর লিখতে লাগল।

তার হাসি দেখে বুড়োর সাহস বেড়ে গেল।

হঠাৎ দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠল, "এস, ওসব রেখে দাও বাপু, রেখে দাও! কেউ তোমার প্রতি অন্যায় করেছে। সে সব ভুলে যাও, থুথু দাও তাদের মুখে! এস, খালি লেখা আর লেখা, কি হবে অত লিখে?"

মোটা মোটা আঙুলগুলি মেঝের উপর ঘুরিয়ে সে ওলেনিনের নকল করতে চেষ্টা করল, মস্ত বড় মুখটা বেঁকিয়ে প্রকাশ করল অন্তরের ঘৃণা।

"ওসব হেঁয়ালি লিখে কি হবে? তার চাইতে ফূর্তি কর, বুঝিয়ে দাও যে তুমি একটা মানুষ!"

আইনের মার-প্যাঁচ ছাড়া লেখার আর কোন অর্থ তার মাথায়ই আসে না। ওলেনিন হো-হো করে হেসে উঠল ; ইয়েরশ্‌কাও। তারপরই লাফ দিয়ে মেঝে থেকে উঠে ইয়েরশ্‌কা বালালাইকাটা বাজাতে বাজাতে তাতার সঙ্গীত গাইতে লাগল।

"কেন লিখছ হে বন্ধু! তার চাইতে আমার গান শোন। মরে গেলে তো আর শুনতে পাবে না। যত পার ফূর্তি করে নাও!"

প্রথমে নেচে নেচে গাইল নিজের রচিত একটা গান :

আঃ, ডি, ডি, ডি, ডি,
যখন তাকে দেখা গেল, করছিল সে কি?

মেলায় ছিল দোকানটি,
বেচতে ছিলেন পিনটি।

তারপর সে গাইল তার প্রাক্তন সার্জেন্ট-মেজর বন্ধুর কাছে শেখা একটা গান :

পড়লাম প্রেমে সোমবারে,
মঙ্গলবারে তাইরে-নাই,
বুধবারে প্রেম পেল ভাষা,
বেস্পতিতে জবাব চাই।
শুক্রবারে জবাব এল,
আমার তখন আশাই নাই।
মানুষ আমি, নই তো মেষ,
শনিবারেই হোক জীবন শেষ—
কিন্তু এ কী নসিব রে হায়,
রবিবারের সকাল বেলায়
বদলে গেল মতটা—
পেলাম বাঁচার পথটা!

তারপর আবার গাইল :

আঃ, ডি, ডি, ডি, ডি, ডি,
যখন তাকে দেখা পেল, করছিল সে কি?

তারপর চোখ টিপে, কাঁধ ঝাঁকিয়ে, তালে তালে পা ঠুকে সে গাইতে লাগল :

তোমাকে চুমো খাব, ধরব জড়িয়ে,
বাঁধব ঘিরে লাল ফিতে দিয়ে;
ডাকব তোমায় ছোট্ট সুন্দরী।
আহা, সুন্দরী লো সুন্দরী,
বল দেখি, আমায় তুমি সত্যি ভালবাসবে কি?

তারপর হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে সারা ঘরময় একলাই নেচে বেড়াতে লাগল।

"ডি, ডি, ডি-র মত ভদ্রলোকদের গান গাইল ওলেনিনের কল্যাণে, কিন্তু আরও তিন পাত্র চিকির গেলবার পরে তার মনে পড়ে গেল পুরনো দিনের কথা, আর তখন সে গাইতে শুরু করল খাঁটি কসাক ও তাতার সঙ্গীত। তার একটা প্রিয় গানের মাঝামাঝি পৌঁছে সহসা তার গলাটা কেঁপে উঠল; গান থামিয়ে সে একটানা বালালাইকাতে ছড় টানতে লাগল।

"আহা, প্রিয় বন্ধু আমার!" সে বলল।

তার অদ্ভুত গলা শুনে ওলেনিন ফিরে তাকাল। বুড়ো মানুষটি কাঁদছে।

তার চোখে জল, একটি অশ্রুবিন্দু গাল বেয়ে নামছে। "হায় আমার যৌবনের দিনগুলি। কোথায় গেলে তোমরা? আর কখনও তোমরা ফিরে আসবে না।" থেমে থেমে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে বলল। চোখের জল না মুছেই হঠাৎ সে কাক-কাটানো চীৎকার করে বলল, "পান কর, কেন তুমি পান করছ না!"

একটা তাতার গান তাকে বিশেষভাবে অভিভূত করল। গানটাতে কথা কম, কিন্তু তার প্রধান আকর্ষণ বিষণ্ণ সুরের ধুয়াটি: "আই দাই, দালালাই!" ইয়েরশ্‌কা গানটাকে ভাষান্তরিত করে নিয়েছে: "একটি যুবক ভেড়ার পাল নিয়ে 'আউল' থেকে পাহাড়ে গেল, আর রুশরা এসে 'আউল' জ্বালিয়ে দিল, সব পুরুষদের মেরে ফেলল, সব মেয়েদের বন্দী করে নিয়ে গেল। যুবকটি পাহাড় থেকে ফিরে এল। যেখানে 'আউল' ছিল সে জায়গাটা খা-খা করছে; সেখানে তার মা নেই, ভাইরা নেই, বাড়িও নেই, শুধু দাঁড়িয়ে আছে একটা গাছ। যুবক গাছটার নীচে বসে কাঁদতে লাগল, 'তোমার মতই একা' আমি একেবারে একা!' সে গাইতে লাগল: "আই দাই, দালালাই!" এই ক্রন্দন-মুখর, হৃদয়বিদারী ধুয়াটা বুড়ো বার বার ফিরে ফিরে গাইতে লাগল।

ধুয়াটা শেষ করেই ইয়েরশ্‌কা হঠাৎ দেয়ালে ঝোলানো বন্দুকটা তুলে নিয়ে ছুটে উঠোনে বেরিয়ে গেল, দুটো নল থেকেই শূন্যে গুলি ছুঁড়ল। তারপর করুণ সুরে গাইতে লাগল, "আই দাই, দালালাই—আঃ, আঃ", তারপর থামল।

তার পিছন পিছন ওলেনিনও বারান্দায় গেল; যেদিকে গুলি ছোঁড়া হয়েছিল সেইদিক লক্ষ্য করে তারা ভরা আকাশের পানে তাকাল। কর্ণেটের বাড়িতে আলো জ্বলছে; নানা শব্দ ভেসে আসছে। বারান্দায় ও জানালায় মেয়েরা ভিড় করে আছে; বাড়ি ও বাহির-বাড়ির মধ্যে ছুটাছুটি করছে।

ওলেনিন শুধাল, "তুমি কেন বাকদান-অনুষ্ঠানে যাও নি?"

নিশ্চয় বুড়ো মানুষটি ওখানকার কোন কিছুতে অসন্তুষ্ট হয়েছে; সে বিড়-বিড় করে বলল, "ওদের কথা ছাড়! ওদের কথা ছাড়। ওদের পছন্দ করি না, মোটেই না। কী সব মানুষ! কুটিরের ভিতরে চল! ওরা ওদের মত ফুর্তি করুক, আমরা আমাদের মত ফুর্তি করি গে।"

ওলেনিন ভিতরে গেল।

"লুকাশ্‌কা এখন সুখী তো? সে কি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে না?" সে শুধাল।

বুড়ো ফিস্‌ফিসিয়ে বলে উঠল, "কী, লুকাশ্‌কা? তারা ওকে মিথ্যা কথা বলেছে; বলেছে, আমি নাকি তোমার জন্য ওই মেয়েকে ভজাবার চেষ্টা করছি। কিন্তু সে মেয়েই বা কি? আমরা তো চাইলেই তাকে পেতে পারি। যথেষ্ট টাকা ঢাল—সে আমাদের হয়ে যাবে। আমিই সব ব্যবস্থা

করে দেব। বিশ্বাস কর, ঠিক ব্যবস্থা করে দেব!"

"না খুড়ো, সে যদি আমাকে ভাল না বাসে তো টাকায় কিছু হবে না। ও রকম কথা তুমি বলো না!"

"ওরা তোমাকে, আমাকে—কাউকে ভালবাসে না। আমরা যে অনাথ," হঠাৎ কথাগুলো বলে ইয়েরশ্‌কা খুড়ো আবার কাঁদতে শুরু করল।

বুড়োর কথা শুনতে শুনতে ওলেনিন স্বাভাবিকের চাইতে অনেক বেশী মদ খেয়ে ফেলেছে। সে ভাবল, "এবার আমার লুকাশ্‌কা তো সুখী হয়েছে;" তবু তার দুঃখ গেল না। সেদিন সন্ধ্যায় বুড়ো এত বেশী মদ খেল যে শেষ পর্যন্ত মেঝের উপর শটান হয়ে শুয়ে পড়ল। ভানিয়ুশা সৈন্যদের ডেকে আনল; তারা বুড়োকে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেলে ভানিয়ুশা সেখানে থুথু ছিটিয়ে দিল। বুড়োর খারাপ ব্যবহারে সে এতই চটে গেছে যে তাকে ফরাসীতে কিছু বলতেও ভুলে গেল।

অধ্যায়—২৯

আগস্ট মাস। দিনের পর দিন আকাশ নির্মেঘ; সূর্যের অগ্নিদহন অসহ্য; ভোর সকাল থেকে একটা শুকনো গরম বাতাস খাড়ি ও পথের ধূলো উড়িয়ে এনে নলবন, গাছগাছালি, গ্রামের উপর ছড়িয়ে দিচ্ছে।

ঘাস ও গাছের পাতা ধূলোয় ঢেকে গেছে; রাস্তাঘাট ও শুকিয়ে-যাওয়া নোনা জলাভূমি হাওয়ায় খটখটে হয়ে গেছে, হাঁটতে পায়ের নীচে শব্দ হয়। তেরেকের জল অনেক আগেই নেমে গেছে; খাল-বিলের জল দ্রুত শুকিয়ে যাচ্ছে। গ্রামের নিকটবর্তী পুকুরের কর্দমাক্ত পাড়ে গরু-মোষ অবাধে চরে বেড়াচ্ছে; স্নানরত ছেলেমেয়েদের চেঁচামেচি ও জল ছিটানোর শব্দ সারাদিন কানে আসছে। বন্য জন্তুরা সব দূরের নলবনে ও তেরেকের ওপারে পাহাড়ে চলে গেছে। নীচু জমি ও গ্রামের মাথার উপরে মশা ও মাছিরা ঘন মেঘের মত দল বেঁধে উড়ে বেড়াচ্ছে। ধূসর কুয়াসায় ঢেকে গেছে বরফ-ঢাকা পাহাড়-চূড়া। ঘন বাতাসে দম আটকে আসে। সকলে বলাবলি করছে, এব্রেকরা এখন অগভীর নদী পার হয়ে এপারে এসে ওৎ পেতে আছে। প্রতি সন্ধ্যায় জলন্ত লাল আলো ছড়িয়ে সূর্য অস্ত যায়।

বছরের সব চাইতে কর্মব্যস্ত সময় এখন। তরমুজের ক্ষেতে ও দ্রাক্ষা-বাগানে গ্রামবাসীদের ভিড়। কালো কালো আঙুরে বোঝাই হয়ে গাড়িগুলো ক্যাচর-ক্যাচর শব্দ তুলে ধীর গতিতে চলেছে ধূলোভরা পথ বেয়ে। চাকার নীচে গুঁড়িয়ে যাওয়া থোকা থোকা আঙুর ধুলোয় পড়ে আছে। আঙুর-রসের দাগ-লাগা ফ্রক পরা ছেলেমেয়েরা হাতে ও মুখে আঙুর নিয়ে

মায়েদের পিছনে ছুটছে। রাস্তায় অনবরত চোখে পড়ে, ঝুড়ি-ভর্তি আঙুর কাঁধে নিয়ে ছেঁড়া পোশাক পরা মজুররা রাস্তায় চলেছে। চোখ পর্যন্ত রুমালে ঢেকে কসাক মেয়েরা ফল বোঝাই গাড়ির বলদগুলোকে চালাচ্ছে। পথে যেতে যেতে সৈনিকরা আঙুরের জন্য হাত পাতছে, আর মেয়েগুলো মুঠো-মুঠো আঙুর তাদের পোশাকের ঘাঘরার মধ্যে ফেলে দিচ্ছে।

সকলে খুশি মনে সারা বছরের ফসল তুলছে; এ বছর ফলনও হয়েছে খুব ভাল ও প্রচুর।

সবুজ দ্রাক্ষাক্ষেতের ছায়ায়, আঙুরলতার সমুদ্রের মধ্যে, চারদিকে শুধু হাসি, গান, ফূর্তি ও মেয়েদের গলা শোনা যাচ্ছে, তাদের উজ্জ্বল পোশাকের ঝলকানি চোখে পড়ছে।

ঠিক দুপুরবেলা নিজেদের দ্রাক্ষাক্ষেতে একটা পিচগাছের ছায়ায় বসে মারিয়াংকা গাড়ি থেকে সকলের খাবার নামিয়ে নিচ্ছে। তার উল্টোদিকে একখানা ঘোড়ার চামড়ায় বসে কর্ণেট ছোট কুজো থেকে জল ঢেলে হাত ধুচ্ছে। ছোট ভাইটি এইমাত্র পুকুর থেকে উঠে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে আস্তিন দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে ডিনারের অপেক্ষায় একদৃষ্টিতে দিদি ও মার দিকে তাকিয়ে আছে। রোদ-পোড়া সবল হাতের আস্তিন গুটিয়ে মা আঙুর, শুকনো মাছ, জমাট মাখন ও রুটি সাজিয়ে দিচ্ছে একটা নীচু, ছোট, গোল তাতার টেবিলে। কর্ণেট হাত মুছে, টুপি খুলে, ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে টেবিলের দিকে সরে বসল। ছেলেটি একটা পাত্র তুলে নিয়ে সাগ্রহে চুমুক দিল। মা ও মেয়ে পা গুটিয়ে টেবিলের পাশে বসল। ছায়ায় বসেও অসহ্য গরম লাগছে। আর একবার ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে দ্রাক্ষা-পাতা দিয়ে ঢাকা চিকিরের ছোট পাত্রটা তুলে নিয়ে কর্ণেট একটা চুমুক দিয়ে সেটা বুড়ির হাতে তুলে দিল।

ভিজে দাড়ি মুছতে মুছতে শুধাল, "চালার ওপাশ পর্যন্ত কি আজ রাতে শেষ করা যাবে?"

স্ত্রী জবাব দিল, "শেষ তো করতেই হবে, অবশ্য আবহাওয়া যদি বাদ না সাধে। দেমকিনদের কাজ এখনও অর্ধেক শেষ হয় নি। সেখানে তো উস্তেংকা একাই খেটে মরছে।"

বুড়ো সগর্বে বলল, "তাদের কাছ থেকে আর বেশী কি আশা করতে পার?"

হাতের পাত্রটা মেয়ের হাতে দিয়ে বুড়ি বলল, "মারিয়াংকা সোনা, এটুকু খেয়ে নাও! ঈশ্বরের ইচ্ছায় বিয়ের উৎসবে খরচ করার মত টাকা আমরা পেয়ে যাব।"

ভ্রূকুটা ঈষৎ কুঁচকে কর্ণেট বলল, "সেটা তো এখনই হচ্ছে না।"

মেয়ে মাথা নীচু করল।

বুড়ি বলল, "কথা তুলব না কেন? কথা তো পাকা হয়েই আছে, সময়ও

কাছিয়ে আসছে।"

কর্ণেট বলল, "এত আগে ওসব কথা বলো না। এখন ফসল তোলার সময়।"

বুড়ি আবার বলল, "লুকাশ্‌কার নতুন ঘোড়াটা কি তুমি দেখেছ? দিমিত্রি আন্দ্রীচ যেটা দিয়েছিল সেটা নেই—সেটার বদলে আর একটা এনেছে।"

কর্ণেট বলল, "না, দেখি নি, কিন্তু আজই চাকরটির সঙ্গে কথা হয়েছে। সেই বলল, তার মনিব আবার এক হাজার রুবল পেয়েছে।"

বুড়ি বলল, "একেবারে টাকার উপর গড়াচ্ছে; তাছাড়া আর কিছু বলাই যায় না।"

গোটা পরিবারই খুশি ও তুষ্ট। কাজকর্ম ভালই চলছে। আঙুরের ফলন আশাতিরিক্ত ভাল হয়েছে। ডিনারের পরে মারিয়াংকা ষাঁড়টাকে কিছু ঘাস খেতে দিল, বেশ্‌মেৎটাকে ভাঁজ করে বালিশ বানিয়ে নিল, তারপর গাড়ির নীচে বিছানো রসালো ঘাসের উপর শুয়ে পড়ল। মাথায় একটা লাল রেশমী রুমাল বাঁধা, পরনে শুধু একটা নীল ছাপার ফ্রক; তবু অসহ্য গরম লাগছে। মুখটা পুড়ে যাচ্ছে, পা দুটো যে কোথায় রাখবে বুঝতে পারছে না। ঘুমে ও ক্লান্তিতে চোখের পাতা জড়িয়ে আসছে; আপনা থেকেই ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে গেল; বুকটা ঘন ঘন উঠতে নামতে লাগল।

একপক্ষ আগে থেকেই কাজের চাপ পড়েছে। মেয়েটিকে সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। ভোরে ঘুম থেকে উঠেই ঠাণ্ডা জলে হাত-মুখ ধুয়ে, গায়ে একটা শাল জড়িয়ে খালি পায়ে ছুটে যায় গোয়ালে। তারপর তাড়াতাড়ি জুতো পরে গাড়ি চালিয়ে সারাদিনের মত চলে যায় দ্রাক্ষাক্ষেতে। সেখানে সারাক্ষণ কাজ, শুধু এক ঘণ্টার বিশ্রাম। তারপর সন্ধ্যা হতেই বাড়ি ফিরে আসে, বাবা-মা ও ভাইকে নিয়ে বাইরের ঘরে খেতে বসে। খাওয়া শেষ হলে কুটিরে ঢোকে, স্টোভের তাকে উঠে ঘুম-ঘুম চোখে ভাড়াটের কথাবার্তা কান পেতে শোনে। সেও যখন চলে যায়, তখন বিছানায় শুয়ে গভীর ঘুমে ডুবে যায়। সে ঘুম ভাঙে সকালে। এইরকম চলছে দিনের পর দিন। বাকদানের পরদিন থেকে লুকাশ্‌কার সঙ্গে আর দেখা হয় নি, কিন্তু শান্ত হৃদয়ে সে বিয়ের জন্য অপেক্ষা করে আছে।

ভাড়াটের সঙ্গেও সে মানিয়ে নিয়েছে; লোকটির সাগ্রহ দৃষ্টিতে সে খুশিই হয়।

অধ্যায়—৩০

গরমের হাত থেকে রেহাই নেই; গাড়ির ঠাণ্ডা ছায়ায় মাছিরা ভন্‌-ভন্‌ করছে; ছোট ভাইটা পাশে শুয়ে ঠেলছে; তবু মাথার উপর রুমাল চাপা

দিয়ে মারিয়াংকা সবে একটু ঘুমিয়েছে, এমন সময় প্রতিবেশিনী উস্তেংকা হঠাৎ ছুটে এসে এক লাফে গাড়ির নীচে ঢুকে তার পাশেই শুয়ে পড়ল।

গাড়ির নীচে আরাম করে শুয়ে উস্তেংকা বলল, "ঘুমোও মেয়েরা, ঘুমোও! একটু সবুর কর, এভাবে হবে না!" লাফিয়ে উঠে কয়েকটা গাছের ডাল কুড়িয়ে এনে গাড়ির দুদিকের চাকার মধ্যে গুঁজে দিয়ে নিজের বেশ্‌মেৎটা তার উপর ছড়িয়ে দিল। গাড়ির নীচে ঢুকতে ঢুকতে ছোট ছেলেটিকে হেঁকে বলল, "এই, আমাকে ঢুকতে দে। এটা কি একজন কসাকের পক্ষে মেয়েদের সঙ্গে থাকার জায়গা?" একথা শুনে ছেলেটি বেরিয়ে গেলে উস্তেংকা হঠাৎ দুই হাতে বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে কাছে টেনে এনে তার গালে ও গলায় চুমো খেতে লাগল।

তারই ফাঁকে ফাঁকে উচ্চ কণ্ঠে হাসতে হাসতে বার বার বলতে লাগল, "সোনা আমার, সোনা আমার।"

নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করে মারিয়াংকা বলল, "আরে, তুমি দেখছি এসব দাদুর কাছে শিখেছ। থাম, থাম!"

দুজন এমনভাবে হো-হো করে হেসে উঠল যে মারিয়াংকার মা চীৎকার করে তাদের চুপ করতে বলল।

উস্তেংকা ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, "তোমার কি ঈর্ষা হচ্ছে?"

"যত সব বাজে কথা। এস, ঘুমিয়ে পড়ি। তুমি কেন এসেছ?"

উস্তেংকা বলল, "সবুর কর, সব বলছি।"

মারিয়াংকা কনুইতে ভর দিয়ে রুমালটা ঠিক করে নিল।

"এবার বল, কি ব্যাপার?"

"তোমাদের ভাড়াটে সম্পর্কে কিছু খবর জেনেছি!"

"জানবার তো কিছু নেই" মারিয়াংকা বলল।

কনুই দিয়ে খোঁচা মেরে উস্তেংকা হেসে বলল, "কী দুষ্টু মেয়েরে বাবা! কিছুতেই মুখ খুলবে না। সে কি তোমার কাছে আসে?"

"আসেই তো। তাতে কি হল?" বলেই মারিয়াংকার মুখখানা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল।

"দেখ, আমি সাদাসিধে মেয়ে। সকলকেই মনের কথা বলি। মিথ্যা ভান করে কি লাভ?" উস্তেংকা বলল, তার উজ্জ্বল গোলাপী মুখটা সহসা মলিন হয়ে গেল। "আমি তো কারও ক্ষতি করছি না, করছি কি? আমি তাকে ভালবাসি, বাস, ঐ পর্যন্তই।"

"মানে বুড়ো দাদুকে?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু সেটা তো পাপ।"

"আঃ, মারিয়াংকা! যতদিন স্বাধীন আছি ততদিন যদি একটু ফুর্তি না

করি তো আর কবে করব? যখন কোন কসাককে বিয়ে করব তখন তো ছেলেপুলে হবে, আর তাই নিয়েই জড়িয়ে পড়ব। ধর, তোমার যখন লুকাশ্‌কার সঙ্গে বিয়ে হবে, তখন তো ফুর্তির চিন্তাও তোমার মাথায় আসবে না: ছেলেপুলে আর কাজকর্ম নিয়েই দিন কেটে যাবে।"

"তাই বুঝি? অনেকে তো বিয়ে করে বেশ সুখেই থাকে। তফাৎ তো কিছু হয় না!" মারিয়াংকা শান্ত গলায় বলল।

"আমাকে শুধু এইটুকু বল, তোমার আর লুকাশ্‌কার ব্যাপারটা কতদূর গড়িয়েছে?"

"কতদূর? সে বিয়ের প্রস্তাব করেছিল। বাবা বিয়েটা এক বছর পিছিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এখন সব পাকা; হেমন্তেই তারা আমাদের বিয়ে দেবে।"

"আর সে তোমাকে কি বলেছে?"

মারিয়াংকা হাসল।

"কি আর বলবে? বলেছে, সে আমাকে ভালবাসে। বারবার তার সঙ্গে দ্রাক্ষাক্ষেতে যেতে বলেছে।"

"একেবারে আঠার মত লেগে আছে। তুমি তো যাও নি, তাই না? আর সে কী বেপরোয়া হয়ে উঠেছে! সে তো সারা গাঁয়ের গর্ব। সে তো সেনাদলে ফূর্তি করেই কাটায়! এই তো সেদিন আমাদের কির্কা বাড়ি এসেছে। সেই তো বলল, লুকাশ্‌কা কী সুন্দর একটা ঘোড়া জুটিয়েছে! কিন্তু তা হলেও তোমার পিছনে লেগেই আছে। সে আর কি বলেছে?"

"সব জানতে চাও?" মারিয়াংকা হেসে বলল। "একদিন রাতে মাতাল হয়ে আমার জানালার নীচে এসে বলল, তাকে ঘরে ঢুকতে দিতে হবে।"

"আর তুমিও ঢুকতে দিলে?"

"ঢুকতে দেব! তাই বটে! আমি একবার যেকথা বলি তার আর নড়চড় হয় না—একেবারে পাহাড়ের মত," মারিয়াংকা গম্ভীর হয়ে জবাব দিল।

"কিন্তু সে তো খাসা ছেলে। সে চাইলে কোন মেয়ে তাকে ফিরিয়ে দিত না।"

মারিয়াংকা সগর্বে জবাব দিল, "বেশ তো, ইচ্ছা হয় সে অন্য মেয়ের কাছেই যাক।"

"তার জন্য তোমার কষ্ট হয় না?"

"তা হয়, কিন্তু কোনরকম বাজে কাজের মধ্যে আমি নেই। ওটা অন্যায়।"

উস্তেংকা হঠাৎ বন্ধুর বুকের উপর মাথাটা রেখে তাকে জড়িয়ে ধরে চাপা হাসিতে কাঁপতে লাগল। বলল, "তুমি একটা বোকা। সুখী হতেও চাও না।" সে মারিয়াংকাকে কাতুকুতু দিতে লাগল।

হেসে চেঁচাতে চেঁচাতে মারিয়াংকা বলল, "এই ! ছেড়ে দাও।"

"শোন দুষ্টুদের হাসির বহরটা শোন। ওরা কি ক্লান্তও হয় না।" গাড়ির কাছ থেকে বুড়ির ঘুম-জড়ানো গলা শোনা গেল।

একটু উঠে উস্তেংকা ফিস্‌ফিস্ করে আবার বলল, "তুমি সুখ চাও না। কিন্তু তোমার কপালই ভাল ! সকলে তোমাকে কত ভালবাসে ! তুমি এমন খিট্‌খিটে, অথচ সকলে তোমাকেই ভালবাসে। তোমার জায়গায় যদি আমি হতাম তো তোমাদের ভাড়াটের মুণ্ডুটাই ঘুরিয়ে দিতাম। তুমি যখন আমাদের বাড়িতে গিয়েছিলে তখন আমি তার উপর চোখ রেখেছিলাম। তোমাকে যেন চোখ দিয়ে গিলে খাচ্ছিল। ঠিক বুড়ো দাদু আমাকে যে রকম করে। লোকে তো বলে, তোমারটি রুশদের মধ্যে সব চাইতে ধনী। তার আর্দালি বলেছে, তাদের নাকি অনেক নিজস্ব ভূমিদাস আছে।"

মারিয়াংকা উঠে কি যেন ভাবল ; তার মুখে হাসি ফুটল।

একটা ঘাসের শিস দাঁতে কাটতে কাটতে বলল, "একদিন সে—মানে আমাদের ঐ ভাড়াটে—আমাকে কি বলেছে জান ? বলেছে : 'আমার ইচ্ছা করে লুকাশ্‌কার মত বা তোমার দাদা লাজুৎকার মত কসাক হয়ে যাই।' বল তো সে কি বলতে চায় ?"

উস্তেংকা জবাব দিল, "আরে, যা মাথায় এসেছে তাই বলে ফেলেছে। আর আমারটি কী না বলে ! যেন একেবারে বখে গেছে।"

ভাঁজ-করা বেশ্‌মেতের উপর মাথাটা রেখে উস্তেংকার গলা জড়িয়ে ধরে মারিয়াংকা চোখ বুজল। একটু চুপ করে থেকে বলল, "আজ সে দ্রাক্ষাক্ষেতে এসে কাজ করবে। বাবা তাকে আসতে বলেছে।"

তারপরেই সে ঘুমিয়ে পড়ল।

অধ্যায়—৩১

যে ন্যাসপাতির গাছের ছায়া গাড়ির উপর পড়েছিল তার পিছন থেকে সূর্য উপরে উঠে এসেছে ; আর উস্তেংকা যে গাছের ডালগুলো ঝুলিয়ে দিয়েছিল তার ফাঁক দিয়েও রোদ এসে ঘুমন্ত মেয়েদুটির মুখ পুড়িয়ে দিচ্ছে। মারিয়াংকা জেগে উঠে মাথার রুমালটা ঠিক করে নিল। চারদিকে তাকিয়ে দেখল, ন্যাসপাতি গাছের ওপাশে তাদের ভাড়াটে বন্দুকটা কাঁধে ফেলে দাঁড়িয়ে তার বাবার সঙ্গে কথা বলছে। উস্তেংকাকে কনুইয়ের খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে তুলে হাসতে হাসতে ওলেনিনের দিকে আঙুলটা বাড়িয়ে দেখাল।

ডালপালার ফাঁক দিয়ে মারিয়াংকাকে দেখতে না পেয়ে অস্বস্তির সঙ্গে

চারদিক তাকাতে তাকাতে সে বলছে, "কালও গিয়েছিলাম, কিন্তু কিছুই পাই নি।"

সঙ্গে সঙ্গে কথার ভঙ্গী পাল্টে ফেলে কর্ণেট বলল, "আহা, আপনি ঐ দিকে যাবেন, একটা বৃত্তাংশ আঁকবেন। সেখানে একটা বাতিল দ্রাক্ষাক্ষেত আছে; সেখানে সব সময়ই খরগোস পাওয়া যায়।"

বুড়ি খুশি মনে বলে উঠল, "এখন এত কাজের সময়! খরগোসের পিছনে ছোটার সময়ই বটে! তুমি বরং আমাদের কাজে একটু সাহায্য কর, মেয়েদের সঙ্গে কাজে হাত লাগাও। হেই মেয়েরা, এবার উঠে পড়!"

মারিয়াংকা ও উস্তেংকা গাড়ির নীচেই হাসাহাসি করছিল।

ওলেনিন পঞ্চাশ রুবল দামের একটা ঘোড়া লুকাশ্‌কাকে দিয়ে দিয়েছে, একথা জানাজানি হবার পর থেকেই তার গৃহকর্তাটি আরও অমায়িক হয়ে উঠেছে; ওলেনিনের সঙ্গে মেয়ের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধিতে কর্ণেট মনে মনে খুশিই হয়েছে।

ওলেনিন জবাব দিল, "কিন্তু এসব কাজ করতে তো আমি জানি না।"

বুড়ি বলল, "এস, তোমাকে কিছু পীচফল দিচ্ছি।"

স্ত্রীর কথাগুলি ব্যাখ্যা হিসাবে কর্ণেট বলে উঠল, "সেই পুরনো কসাক আতিথেয়তা; বুড়িরা একটু অবুঝই হয়ে থাকে। আমার তো ধারণা, রাশিয়াতে আপনারা পীচের বদলে আনারসের জ্যাম ও জেলি খেতেই বেশী পছন্দ করেন।

ওলেনিন জিজ্ঞাসা করল, "তাহলে আপনি বলছেন ওই পতিত দ্রাক্ষাক্ষেতে গেলেই খরগোস মিলবে? সেখানেই যাচ্ছি। সবুজ ডালপালার দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে সে টুপিটা তুলে সবুজ দ্রাক্ষালতার সারির ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সূর্য ইতিমধ্যেই দ্রাক্ষাক্ষেতের বেড়ার ওপারে ডুবে গেছে; পাতার ফাঁক দিয়ে তার ভাঙা রশ্মিগুলো ঝিকমিক করছে। বাতাস পড়ে গেছে; একটা শান্ত তাজা ভাব চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কেমন করে কে জানে ওলেনিন বুঝি দূর থেকে মারিয়াংকার নীল ফ্রকটা দেখতে পেয়ে তার দিকে এগিয়ে গেল; তার জন্য কিছু আঙুরও পেড়ে নিল। তার ক্লান্ত কুকুরটাও ঝুলে-পড়া আঙুল খেতে খেতে আগে আগে চলতে লাগল।

মুখ লাল করে, আস্তিন গুটিয়ে, থুতনির নীচে রুমালটা বেঁধে মারিয়াংকা বড় বড় থোকাগুলি কাটছে আর ঝুড়িতে ভরছে। যে লতাটাকে ধরে রেখেছিল সেটাকে না ছেড়েই সে স্মিতহাস্যে একবার ওলেনিনের দিকে তাকিয়ে আবার কাজে মন দিল। ওলেনিন আরও কাছে এগিয়ে গেল, হাত দুটো ফাঁকা রাখবার জন্য বন্দুকটাকে পিঠের উপর ঝুলিয়ে দিল। ইচ্ছা হল বলে: "অন্য সকলে কোথায়? তুমি কি একা?" কিন্তু সেকথা বলল না, নীরবে

শুধু টুপিটা তুলল। মারিয়াংকার পাশে একাকি দাঁড়িয়ে বেশ অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

মারিয়াংকা বলল, "আপনি দেখছি বন্দুক তুলে মেয়েদেরই গুলি করে বসবেন।"

"না, তাদের গুলি করব না।" তারপর দুজনই চুপ। একটু পরে মারিয়াংকা বলল, "আপনার উচিত আমাদের সাহায্য করা।" ওলেনিনও একটা ছুরি বের করে নীরবে থোকা থোকা আঙুর কাটতে লাগল। পাতার নীচে পৌঁছে প্রায় তিন পাউণ্ড ওজনের একটা থোকা কেটে সেটা মারিয়াংকাকে দেখাল।

"সবগুলো কাটব কি? এটা এখনও কাঁচা নয় কি?"

"দিন তো দেখি।"

দুজনের হাতে হাত লাগল। ওলেনিন তার হাতটা ধরল, আর মারিয়াংকা হেসে তার দিকে তাকাল।

জিজ্ঞাসা করল, "তোমার নাকি শিগ্‌গিরই বিয়ে হবে?"

মারিয়াংকা জবাব দিল না। হাসি মিলিয়ে গেল। চোখ সরিয়ে নিল।

"তুমি লুকাশ্‌কাকে ভালবাস?"

"তাতে আপনার কি?"

"আমি তাকে ঈর্ষা করি।"

"খুবই স্বাভাবিক।"

"না, না, সত্যি বলছি। তুমি কত সুন্দরী।"

হঠাৎ নিজের কথায় সে নিজেই ভীষণ লজ্জা পেল; কথাগুলি বড়ই মামুলি। তার মুখ লাল হয়ে উঠল, নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলল, মারিয়াংকার দুখানি হাতই চেপে ধরল।

মারিয়াংকা বলল, "আমি যাই হই না কেন, আপনার উপযুক্ত নই। কেন আমাকে নিয়ে তামাসা করছেন?" মুখে বললেও তার চোখ দেখে বোঝা গেল, ওলেনিন যে মোটেই তামাসা করছে না সেবিষয়ে সে নিশ্চিত।

"তামাসা করছি? তুমি যদি জানতে আমি…"

তার কানে কথাগুলি আরও মামুলি শোনাল; তবু সে বলতে লাগল, "আমি তোমার জন্য সব কিছু করতে পারি।"

"আমাকে একা থাকতে দিন শিকারী মশায়!"

কিন্তু তার মুখ, তার জলজলে দুটি চোখ, তার ফুলে-ওঠা বুক, দুখানি সুদৃঢ় পা—তারা কিন্তু বলল অন্য কথা। ওলেনিনের মনে হল, তার কথাগুলি যত সুন্দরই হোক, মারিয়াংকার তার চাইতেও বড়। তার মনে হল, সে কি বলতে চায় অথচ বলতে পারে না সে সবই মারিয়াংকার জানা কথা, তবু সেই কথাগুলিই তার মুখ থেকে বার বার শুনতে চায়।

ওলেনিন ভাবল, "সে আসলে যা আমি তো তাই বলতে চাই ; কাজেই আমার কথা তার অজানা থাকবে কেন ? কিন্তু সে যে বুঝতে চায় না, জবাব দিতে চায় না।"

"হুল্লো!" দ্রাক্ষালতার আড়াল থেকে হঠাৎ উস্তেংকার উচ্চকিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, আর সেই সঙ্গে তার তীক্ষ্ণ হাসি। দ্রাক্ষালতার ফাঁক দিয়ে সরল, গোল মুখখানি বের করে সে চেঁচিয়ে বলল, "আসুন না দিমিত্রি আন্দ্রীচ, আমাকে একটু সাহায্য করুন। আমি একেবারে একা।"

ওলেনিন জবাব দিল না ; নিজের জায়গা থেকে সরেও গেল না।

মারিয়াংকা আঙুরের থোকা কাটতে লাগল, আর বার বার ওলেনিনের দিকে তাকাতে লাগল। কি যেন বলতে গিয়েও থেমে গেল, কাঁধে ঝাঁকুনি দিল, বন্দুকের ফিতেটা ধরে বড় বড় পা ফেলে দ্রাক্ষাক্ষেতের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল।

অধ্যায়—৩২

মারিয়াংকা ও উস্তেংকার উচ্চকিত মিলিত হাসির শব্দ শুনে সে দু'একবার থামল। সারা সন্ধ্যা কাটাল জঙ্গলে শিকার করে। বাড়ি ফিরল খালি হাতে। উঠোনটা পার হতে গিয়ে বাহির-বাড়ির খোলা দরজার দিকে নজর পড়ল ; সেই ফাঁকে দেখতে পেল একটা নীল ফ্রক। যাতে সকলে জানতে পারে যে সে ফিরেছে সেইজন্য জোর গলায় ভানিয়ুশাকে ডেকে বারান্দায় নিজের জায়গায় গিয়ে বসল। বাড়ির লোকরা দ্রাক্ষাক্ষেত থেকে ফিরেছে, তারা বাহির-বাড়ি থেকে বেরিয়ে কুটিরে ঢুকল, কিন্তু তাকে ভিতরে ডাকল না। মারিয়াংকা দুবার ফটক দিয়ে বেরিয়ে গেল। একবার গোধূলির আলোয় ওলেনিনের মনে হল সে তার দিকে তাকাচ্ছে। সাগ্রহে ওলেনিনও তাকে দেখল, কিন্তু তার দিকে এগিয়ে যেতে পারল না। মারিয়াংকা ঘরে ঢুকে গেলে সে বারান্দা থেকে নেমে উঠোনে পায়চারি করতে লাগল, আর তাদের কুটিরের ভিতরকার সব কথা শুনতে কান পেতে রইল। তাদের সাংসারিক কথাবার্তা, খাওয়ার শব্দ, বিছানা পাতার শব্দ, শুয়ে পড়ার শব্দ—সব শুনতে পেল ; কি জন্য যেন মারিয়াংকা হেসে উঠল একবার ; তারপর ধীরে ধীরে সব চুপ হয়ে গেল।

কর্ণেট ও তার স্ত্রী ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলছে। কার যেন ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ হচ্ছে। ওলেনিন তার কুটিরে ফিরে গেল। ভানিয়ুশা পোশাক পরেই ঘুমিয়ে পড়েছে। তাকে দেখে ওলেনিনের ঈর্ষা হল ; আবার

উঠোনে নেমে পায়চারি শুরু করল ; প্রতি মুহূর্তে একটা কিছু আশা করছে, কিন্তু কেউ এল না, কারও দেখা মিলল না, শুধু কানে এল তিনজনের নিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। সারা গ্রাম চুপচাপ। অনেক রাতে বাঁকা চাঁদ উঠেছে ; উঠোনে গরু-মোষগুলি দেখা যাচ্ছে। "আমি কি চাই ?" ওলেনিন রেগে নিজেকেই প্রশ্ন করল, কিন্তু রাতের মায়া মন থেকে কাটাতে পারল না। হঠাৎ তার মনে হল, মেঝেতে যেন খস্‌খস্‌ আওয়াজ হল, বাড়িওয়ালার কুটিরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। সে দরজার দিকে ছুটে গেল, কিন্তু আবার সব চুপচাপ ; নিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ, উঠোনে মহিষীটার লেজ নাড়ার শব্দ। ওলেনিন নিজেকে প্রশ্ন করল : "আমি কি করব ?" মনে মনে স্থির করল, এবার শুতে যাবে, কিন্তু আবার সেই শব্দ কানে এল ; কল্পনায় চোখের সামনে ভেসে উঠল মারিয়াংকার ছবি—কুয়াশাঢাকা জ্যোৎস্নারাতে সে বাইরে বেরিয়ে এসেছে ; ওলেনিন দরজায় ছুটে গেল, আবার সেই পায়ের শব্দ শুনতে পেল। ঠিক ভোরের আগে সে মারিয়াংকার জানালায় গিয়ে ঠেলা দিল, তারপর ছুটে গেল দরজার কাছে ; এবার সে সত্যিসত্যি শুনতে পেল মারিয়াংকার নিঃশ্বাস ও পায়ের শব্দ। ছিটকিনিটা চেপে ধরে ঠক্‌ঠক্‌ শব্দ করল। মেঝেতে সতর্ক পদক্ষেপের অস্পষ্ট আওয়াজ হল। সিট্‌কিনিটা ক্লিক করতেই দরজাটা ক্যাঁচ করে খুলে গেল ; দরজায় দেখা দিল মারিয়াংকার মূর্তি ; নাকে এল মশলা ও কুমড়োর গন্ধ। চাঁদের আলোয় মুহূর্তের জন্য তাকে দেখা গেল। সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে কি যেন বলতে বলতে মারিয়াংকা আবার ফিরে গেল। ওলেনিন আস্তে দরজায় টোকা দিল, কিন্তু কোন সাড়া মিলল না। জানালার কাছে ছুটে গিয়ে কান পাতল। সহসা কর্কশ পুরুষ-কণ্ঠের শব্দে সে চমকে উঠল।

"চমৎকার!" সাদা টুপি মাথায় একটি কসাক যুবক উঠোন পেরিয়ে ওলেনিনের কাছে এসে চেঁচিয়ে বলে উঠল। "আমি সব কিছু দেখেছি··· চমৎকার!"

ওলেনিন নাজার্কাকে চিনতে পারল ; কি বলবে, কি করবে বুঝতে না পেরে সে চুপ করে রইল।

"চমৎকার! আমি গিয়ে আপিসের সবাইকে বলব, ওর বাবাকেও বলব। আহা, কর্ণেটের মেয়ে কী ভাল! তার একটিতে পোষায় না।"

"আমার কাছে কি চাও তুমি, কেন এসেছ ?" ওলেনিন বলল।

"কিছু চাই না ; শুধু আপিসে সকলকে বলে দেব।"

নাজার্কা তারস্বরেই কথাগুলি বলল, ইচ্ছা করেই বলল ; তারপর যোগ করল : "বাহাদুর শিক্ষার্থী বটে!"

ওলেনিন কাঁপতে লাগল ; মুখ কালো হয়ে গেল। "এদিকে এস, এদিকে!" কঠিন হাতে কসাককে চেপে ধরে তাকে নিজের কুটিরের কাছে নিয়ে

গেল। "কিছুই হয় নি, সে আমাকে ভিতরে ঢুকতে দেয় নি, আমারও কোন দুরভিসন্ধি ছিল না। ও খুব ভাল মেয়ে—"

"সেসব কথায় এখন যাচ্ছি না—"

"কিন্তু তাহলেও তোমাকে একটা জিনিস দেব। একটু অপেক্ষা কর!"

নাজার্কা কিছুই বলল না; ওলেনিন দৌড়ে কুটিরে ঢুকে দশ রুবল এনে কসাককে দিল।

"কিছুই ঘটে নি, তবু দোষটা আমার, তাই এটা তোমাকে দিলাম! ঈশ্বরের দোহাই, একথা কাউকে বলো না, কারণ কিছুই ঘটে নি—"

"তুমি মজা কর তাই আমি চাই," বলে নাজার্কা হাসতে হাসতে চলে গেল।

সে রাতে নাজার্কা গ্রামে এসেছিল লুকাশ্কার হুকুমে একটা চোরাই ঘোড়াকে লুকিয়ে রাখার একটা জায়গার খোঁজে; বাড়ি ফিরবার পথে পায়ের শব্দ তার কানে আসে। পরদিন সকালে দলে ফিরে গিয়ে কেমন বুদ্ধি খাটিয়ে দশ রুবল আদায় করে নিয়েছে সেটা বেশ গর্বভরেই সকলকে শুনিয়ে দিল।

পরদিন সকালে বাড়ির লোকদের সঙ্গে ওলেনিনের দেখা হল; গত রাতের ঘটনা তারা কিছুই জানত না। মারিয়াংকার সঙ্গে তার কোন কথাই হয় নি, একবার শুধু একটুখানি হেসেছিল তাকে দেখে। পরদিন রাতটাও নিদ্রাহীন কাটল; বৃথাই সে উঠোনময় পায়চারি করে বেড়াল। তার পরের দিন সে ইচ্ছা করেই শিকারে গেল; নিজের চিন্তাকে এড়াবার জন্য সন্ধ্যায় গেল বেলেৎস্কির সঙ্গে দেখা করতে। নিজেকে নিয়েই সে ভীত; মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, বাড়িওয়ালাদের কাছে আর যাবে না।

পরদিন রাতে সার্জেণ্ট-মেজর তাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলল। একটা আক্রমণ চালাতে তৎক্ষণাৎ রওনা হবার হুকুম হয়েছে তার কোম্পানির উপর।

এ খবরে ওলেনিন খুশি হল; ভাবল, আর কোন দিন এ গ্রামে ফিরবে না।

আক্রমণটা চারদিন ধরে চলল। দলের কম্যাণ্ডার ওলেনিনের আত্মীয়; সে তাকে ডেকে পাঠাল, তার সঙ্গেই থেকে যেতেও বলল, কিন্তু ওলেনিন সে প্রস্তাবে রাজী হল না। সে ভালই জানে, সে গ্রাম থেকে দূরে সরে থাকতে পারবে না, তাই ফিরে যাবার অনুমতি চাইল। এই আক্রমণে অংশ গ্রহণের জন্য সে বহু-আকাংখিত একটি সৈনিকের ক্রস পেয়েছে; কিন্তু এখন এসব ব্যাপারে সে একেবারেই নির্বিকার।

ভানিয়ুশাকে সঙ্গে নিয়ে সে কোম্পানির বেশ কয়েক ঘণ্টা আগেই নিরাপদে বাসায় ফিরে গেল। সারা সন্ধ্যা বারান্দায় বসে কাটাল মারিয়াংকার দেখা পাবার অপেক্ষায়; সারা রাত কোন কিছু না ভেবেই উদ্দেশ্যহীনভাবে উঠোনে পায়চারি করে বেড়াল।

অধ্যায়—৩৩

পরদিন অনেক বেলায় তার ঘুম ভাঙল। বাড়িওয়ালারা কেউ বাড়ি নেই। শিকারে বের হল না; একবার বই নিয়ে বসল, একবার বারান্দায় গেল, আবার কুটিরে ঢুকে বিছানায় শুয়ে পড়ল। ভানিয়ুশা ভাবল, তার অসুখ করেছে।

সন্ধ্যার দিকে ওলেনিন উঠল; মনস্থির করে লিখতে বসল; অনেক রাত পর্যন্ত লিখল। একটা চিঠি লিখল, কিন্তু ডাকে দিল না, কারণ তার মনে হল সে যা বলতে চেয়েছে তা কেউ বুঝবে না; তাছাড়া, সে নিজে ছাড়া আর কারও সেটা বোঝবার দরকারও নেই।

সে লিখল:

"রাশিয়া থেকে অনেক শোকজ্ঞাপক চিঠি আমি পেয়েছি। সকলেরই ভয় এই বনে-জঙ্গলেই আমি মারা যাব। সকলেই বলে: 'সে কর্কশ হয়ে উঠবে, সব ব্যাপারেই সময়ের অনেক পিছনে পড়ে থাকবে; মদ খেতে শুরু করবে, আর কে জানে হয় তো একটা কসাক মেয়েকেই বিয়ে করে বসবে।' তারা বলে, জেনারেল ইয়ের্মলভ একথা অকারণে বলেন নি যে: 'ককেসাসে যারা দশ বছর চাকরি করে তারা হয় মদ খেয়ে মরে, আর না হয় তো একটা নষ্ট মেয়েমানুষকে বিয়ে করে।' কী ভয়ংকর! সত্যি তো, যেখানে আমার সামনে খোলা রয়েছে কাউণ্টেস বি—র স্বামী হবার, বা রাজকর্মচারি হবার, অথবা আমার জেলার সম্ভ্রান্ত একজন মার্শাল হবার পথ, তখন তো এভাবে নিজেকে নষ্ট করা চলে না। হায়, আমার চোখে তোমরা কত বিরক্তিকর ও করুণার পাত্র! তোমরা জান না সুখ কি বস্তু, আর জীবনের কি অর্থ! সকলেরই উচিত অন্তত একটিবার প্রাকৃতিক পরিবেশে জীবনের রসাস্বাদন করা; প্রতিদিন আমার সামনে আমি যা দেখছি সকলেরই উচিত তাকে দেখা, তাকে বোঝা; অনন্তকালব্যাপী দুরধিগম্য এই সব বরফাচ্ছাদিত পর্বতের চূড়া, আর যে আদিম রূপ নিয়ে নারী প্রথম বেরিয়ে এসেছিল সৃষ্টিকর্তার হাত থেকে সেই রূপে রূপসী একটি মহিমময়ী নারী। তাহলেই একথা পরিষ্কার হয়ে উঠবে, কে নিজেকে নষ্ট করছে, কার জীবন সত্য বা মিথ্যা—তোমাদের, না আমার? শুধু যদি তোমরা জানতে, মিথ্যা কুহকে আবদ্ধ তোমরা সকলে আমার কাছে কত ঘৃণা ও করুণার পাত্র! যখন কল্পনায় দেখি আমার এই কুটির, এই বন-জঙ্গল, ও আমার ভালবাসার পরিবর্তে আমি বাস করছি সেই সব বৈঠকখানায়, চুলে পমেড-মাখা ও নকল বিনুনি-করা সব নারীদের মাঝখানে, আর অনবরত দেখছি তাদের অকারণে বাঁকানো ঠোঁট, লুকিয়ে-রাখা দুর্বল ও বিকৃত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, আর শুনছি তাদের

মাপা-মাপা কথাবার্তা—তখন আমার মন এক অসহ্য বিদ্রোহে ফেটে পড়ে। তোমরা শুধু মাত্র একটি জিনিস বুঝতে ও বিশ্বাস করতে চেষ্টা কর: শুধু দেখ আর বোঝ সত্য ও সুন্দর কাকে বলে, তাহলেই তোমরা যা কিছু বল বা ভাব, আমার জন্য এবং তোমাদের জন্য যত কিছু বাসনা-কামনা সব ধূলোয় গুঁড়িয়ে যাবে।

"প্রকৃতির সঙ্গে থাকা, তাকে দেখা, তার সঙ্গে কথা বলতেই তো সুখ। 'এমন কি—ঈশ্বর না করুন—সে হয়তো একটা কসাক মেয়েকে বিয়ে করে সমাজের কাছ থেকে একেবারেই হারিয়ে যেতেও পারে,'—তারা আন্তরিক করুণায় আমার সম্পর্কে এই কথাগুলি বলছে তাও আমি কল্পনা করতে পারি। তবু তোমরা যাকে 'হারিয়ে' যাওয়া বল সেই অর্থে আমি একেবারে হারিয়েই যেতে চাই। একটি সাধারণ কসাক মেয়েকেই আমি বিয়ে করতে চাই, কিন্তু সাহসে কুলোয় না, কারণ তাহলে সুখের যে উচ্চতম শিখরে আমি উঠতে পারব তার যোগ্য আমি নই।

"তিন মাস আগে এই কসাক মেয়ে মারিয়াংকাকে আমি প্রথম দেখেছি। এ জগতের যে বিশ্বাস ও সংস্কারকে আমি পিছনে ফেলে এসেছি তখনও তা ছিল আমার কাছে সম্পূর্ণ টাটকা। এই মেয়েকে ভালবাসতে পারব সে বিশ্বাসই তখন আমার ছিল না। পর্বতমালা ও আকাশের রূপ যেমন আমাকে আনন্দ দিত, তেমনই আনন্দ দিত তার রূপ; সেও যে তাদের মতই সুন্দরী, তাই তাকে দেখে খুশি না হয়ে আমার উপায় ছিল না। বুঝলাম, তার রূপকে দেখা আমার জীবনের পক্ষে অপরিহার্য; তাই নিজেকে প্রশ্ন করলাম, আমি তাকে ভালবাসি কি না। কিন্তু ভালবাসার কোন লক্ষণই নিজের মধ্যে খুঁজে পেলাম না। আমার মনে সেই একাকিত্বের অস্থিরতা ছিল না, ছিল না কামগন্ধহীন প্রেম, ছিল না রক্তমাংসের ভালবাসা। আমি শুধু চাইতাম তাকে দেখতে, তার কথা শুনতে, সে যে কাছেই আছে সেটা বুঝতে; আমি তখন সুখে ছিলাম কি না জানি না। কিন্তু শান্তিতে ছিলাম।

"যে সান্ধ্য মজলিসে প্রথম তাকে দেখেছিলাম, স্পর্শ করেছিলাম, তার পরেই বুঝেছিলাম তার ও আমার মধ্যে যে অস্বীকৃত অথচ অচ্ছেদ্য বন্ধন আছে তার বিরুদ্ধে আমি লড়াই করতে পারব না; তবু আমি লড়াই করেছি। নিজেকে প্রশ্ন করেছি: 'আমার জীবনের গভীরতম স্বার্থকে যে কখনও বুঝতে পারবে না সেই নারীকে বিয়ে করা কি সম্ভব? শুধু রূপ দেখে তাকে ভালবাসা—একটা পাথরের মূর্তিকে ভালবাসা কি সম্ভব?' কিন্তু তখনও নিজের মনকে বিশ্বাস না করলেও আমি তার প্রেমে পড়ে গিয়েছি

"সেই সন্ধ্যার পরে প্রথম যখন তার সঙ্গে কথা বললাম তখনই আমাদের সম্পর্কটা বদলে গেল। তার আগে আমার কাছে সে ছিল বাহ্য প্রকৃতির একটি সুদূর অথচ মহিমময়ী বস্তু; কিন্তু তার পরেই সে হয়ে উঠল একটি

মানবী। শুরু হল তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ, কথাবার্তা, কখনও তার বাবার কাজ করতে গিয়ে সারা সন্ধ্যা তাদের সঙ্গে কাটানো, এই সব ঘনিষ্ঠতর মেলামেশার সময়েও সে আমার কাছে রয়ে গেল সেই একই রকম পবিত্র, অপ্রাপণীয়া ও মহিমময়ী। সেই একই শান্ত, সগর্ব ও সানন্দ নির্বিকার-ভাবেই সে আমার ডাকে সাড়া দিত। কখনও তার ব্যবহার বন্ধুর মত, কিন্তু সাধারণভাবে তার প্রতিটি চাউনি, প্রতিটি কথা, প্রতিটি চাল-চলনে ফুটে ওঠে সেই একই নির্বিকার ভাব। এ অবস্থা ক্রমে অসহ্য হয়ে উঠল। তাকে আমি ঠকাতে চাই না, যা আমার মনের কথা তাই তাকে বলতে চাই। অর্থহীন স্বপ্নে তাকে দেখি, কখনও সখী রূপে, কখনও পত্নী রূপে; কিন্তু দুইই আমার কাছে সমান বিরক্তিকর। তাকে যদি স্বৈরিণী করতে চাই, সে তো ভয়ংকর কথা। সে তো তাকে খুন করার সামিল। আবার তাকে দিমিত্রি আন্দ্রেয়েভিচ ওলেনিনের স্ত্রী করাটা তো আরও খারাপ। এখন আমি যদি লুকাশ্‌কার মত কসাক হতে পারি, ঘোড়া চুরি করতে পারি, চিকির খেয়ে মাতাল হতে পারি, হল্লা করে গান গাইতে পারি, মানুষ খুন করতে পারি, এবং মাতাল হয়ে আমি কে এবং কি সেকথা না ভেবে জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকে তার সঙ্গে রাত কাটাতে পারি, তাহলে আলাদা কথা; তাহলে হয়তো আমরা পরস্পরকে বুঝতে পারব, আর আমিও সুখী হতে পারব।

"সে ধরনের জীবনের মধ্যে নিজেকে ফেলতে আমি চেষ্টা করেছি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজের দুর্বলতা ও কৃত্রিমতা সম্পর্কে আরও বেশী সচেতন হয়ে উঠেছি। নিজেকে এবং আমার জটিল, বিকৃত অতীতকে আমি তো ভুলতে পারি না; আমার ভবিষ্যৎ তো আরও বেশী নৈরাশ্যে ভরা। প্রতিদিন আমার সম্মুখে দেখি দূরের বরফ-ঢাকা পর্বতমালাকে আর এই মহিমময়ী সুখী নারীকে। কিন্তু এই জগতে একমাত্র সম্ভবপর সুখ তো আমার জন্য নয়; এই নারীকে তো আমি পেতে পারি না। আমি যে তাকে বুঝতে পারি কিন্তু সে আমাকে কোনদিন বুঝতে পারবে না—এই অনুভূতিই এখন আমার পক্ষে সব চাইতে ভয়ংকর, আবার সব চাইতে মধুর। সে তো সুখী, সে তো প্রকৃতির মতই সামঞ্জস্যপূর্ণ, শান্ত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ; আর আমি, দুর্বল ও বিকলাঙ্গ হয়েও আমি চাই সে আমার বিকৃতি ও যন্ত্রণাকে বুঝুক। সারা রাত আমি ঘুমই নি, উদ্দেশ্যহীনভাবে তার জানালার নীচে সময় কাটিয়েছি; আমার মধ্যে কি ঘটছে তারও হিসাব রাখি নি।

"১৮ই তারিখে আমাদের কোম্পানি একটা আক্রমণ শুরু করে; সেই সময় তিন দিন আমি গ্রাম থেকে দূরে ছিলাম। আমি তখন ছিলাম বিষণ্ণ ও সহানুভূতিহীন; চিরাচরিত গান, তাস, পান-ভোজন, আর রেজিমেণ্টের পুরস্কারের আলোচনা,—সব কিছুই আমার কাছে বিরক্তিকর লেগেছে। গতকাল বাড়ি ফিরে আবার দেখলাম তাকে, আমার কুটিরকে, ইয়েরশ্‌কা

খুড়োকে, আর বারান্দায় বসে দেখলাম বরফ-ঢাকা পর্বতমালাকে, সঙ্গে সঙ্গে এসব কিছুকে বুঝতে পারার আনন্দ যেন আমাকে নতুন করে পেয়ে বসেছে। এই নারীকে আমি ভালবাসি; জীবনে এই প্রথম আমি সত্যি-কারের ভালবাসার স্বাদ পেলাম। আমার অবস্থা আমি বুঝি। এই ভালবাসা আমাকে নীচে টেনে নামাবে, সে ভয় করি না; আমার ভালবাসার জন্য আমার কোন লজ্জা নেই, বরং এজন্য আমি গর্ব অনুভব করি। আমি ভাল-বেসেছি এটা তো আমার অপরাধ নয়। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এ ভালবাসা এসেছে। আত্ম-প্রবঞ্চনার দ্বারা এ ভালবাসার কাছ থেকে আমি পালাতে চেষ্টা করেছিলাম; কসাক লুকাশ্‌কা ও মারিয়াংকার ভালবাসার মধ্যে আনন্দ খুঁজতে চেষ্টা করেছিলাম; কিন্তু তার ফলে শুধু আমার ভালবাসা ও ঈর্ষাকেই জাগিয়ে তুলেছি।

"আমার নির্জন জীবনযাত্রা যে নতুন প্রত্যয় আমাকে এনে দিয়েছিল তার কথা আগেই লিখেছি; কিন্তু কত পরিশ্রমের ভিতর দিয়ে যে সে প্রত্যয় আমার মধ্যে গড়ে উঠেছিল, আর তার অনুভূতি যে আমাকে কত আনন্দ দিয়েছিল, সেকথা কেউ জানে না; তখন আমার জীবনে এই প্রত্যয়ের চাইতে প্রিয়তর কিছুই ছিল না···আর এখন···ভালবাসা এসেছে; এখন আর সে প্রত্যয় নেই, আর তারজন্য কোন অনুশোচনাও নেই।

"এমন একটি একপেশে, নির্বিকার ও নিরাকার মানসিক অবস্থাকে যে এত মূল্য দিয়েছিলাম সেকথা বিশ্বাস করাও আজ শক্ত। সৌন্দর্য এসে আমার সে সব পরিশ্রমকে বাতাসে উড়িয়ে দিয়েছে; যা গেছে তার জন্য কোন অনুশোচনাও নেই! আত্ম-প্রবঞ্চনা একান্তই অর্থহীন ও অবাস্তব! অন্যের জন্য বেঁচে থাক, আর অন্যের মঙ্গল কর।'—কেন? আমার অন্তরে তো রয়েছে নিজের প্রতি ভালবাসা, তাকে ভালবাসার বাসনা, তার সঙ্গে একত্রে বাঁচবার ইচ্ছা। এখন আমি অন্যের জন্য, লুকাশ্‌কার জন্য সুখ কামনা করি না। অপরকে ভালবাসি না। আগে হলে বলতাম, এটা অন্যায়। তার কি হবে, আমার কি হবে, লুকাশ্‌কার কি হবে?—এসব প্রশ্ন তুলে নিজেকে কষ্ট দিতাম। এখন আমি পরোয়া করি না। এখন আর আমি নিজের ইচ্ছায় চলি না, আমার চাইতেও শক্তিশালী কেউ আমাকে চালায়। আমি কষ্ট পাই; কিন্তু আগে আমি ছিলাম মৃত, আর এখন আমি বেঁচে আছি। আজই তাদের বাড়ি গিয়ে তাকে সব কথা বলব।"

অধ্যায়—৩৪

সেদিন রাতে চিঠিটা শেষ করে ওলেনিন তার বাড়িওয়ালার বাড়িতে গেল। স্টোভের পিছনে একটা বেঞ্চিতে বসে বুড়ি রেশমের গুটি ছাড়াচ্ছিল।

খোলা মাথায় মোমবাতির পাশে বসে মারিয়াংকা সেলাই করছিল। ওলেনিনকে দেখেই সে একলাফে উঠে রুমালটা নিয়ে স্টোভের কাছে চলে গেল।

মা বলল, "মারিয়াংকা সোনা, আমাদের কাছে এখানে একটু বস না?"

"না, আমার মাথাটা খোলা," বলে সে স্টোভের উপর উঠে গেল।

ওলেনিন দেখতে পেল শুধু তার একটা হাঁটু ও তাক থেকে ঝোলানো দুখানি সুডৌল পা। ওলেনিন বুড়িকে চা পরিবেশন করল, আর বুড়ি অতিথিকে পরিবেশন করল জমাট মাখন। মারিয়াংকা সেটা এনে প্লেটে রেখেই আবার একলাফে স্টোভের উপর উঠে গেল। ওলেনিন বুঝল সে তাকেই দেখছে। নানা রকম সাংসারিক কথা আলোচনা হল। উলিৎকা গিন্নি উৎসাহিত হয়ে অতিথি সেবায় তৎপর হয়ে উঠল। সে ওলেনিনকে এনে দিল শুকনো আঙুর, আঙুরের চাটনি, কিছু সেরা মদ, আর এমন সগর্ব অতিথি-প্রীতির সঙ্গে তাকে সব কিছু খেতে অনুরোধ করতে লাগল যা কেবলমাত্র সেইসব মানুষদের মধ্যেই দেখা যায় যারা নিজের হাতে খাবার ফলায়।

প্রথম সাক্ষাতে বুড়ির কঠোর ব্যবহারে ওলেনিন অবাক হয়েছিল; এখন মেয়ের প্রতি তার সরল, নরম ব্যবহার দেখে সে অভিভূত হয়।

"ঠিক, অকারণে খুঁৎ-খুঁৎ করে আমরা প্রভুকে বিরক্ত করতে চাই না! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমাদের তো সব কিছুই যথেষ্ট আছে। যথেষ্ট পরিমাণে চিকির বানানো হয়েছে, যতটা রাখি করবার তা করা হয়েছে, তিন-চার পিপে আঙুর বিক্রি করার পরেও যা থাকবে তাতে দরকার মত মদও তৈরি করা যাবে। তুমি কিন্তু তাড়াতাড়ি আমাদের ছেড়ে চলে যেয়ো না। বিয়ের সময় সকলে মিলে ফূর্তি করা যাবে।"

হঠাৎ সব রক্ত ওলেনিনের মুখে উঠে এল; বুকের ভিতর ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগল; শুধাল, "বিয়েটা কখন হচ্ছে?" স্টোভের উপরে নড়াচড়ার ও বীচি ভাঙার শব্দ শোনা গেল।

বুড়ি জবাব দিল, "আরে, হওয়া তো উচিত পরের সপ্তাহে। আমরা তো তৈরি। 'মারিয়াংকার জন্য সব কিছু তৈরি করিয়েছি। ভালভাবেই ওর বিয়ে দেব। শুধু একটা ব্যাপার ভাল লাগছে না। আমাদের লুকাশ্কা ইদানীং বড়ই বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। বড় বেশী উচ্ছৃংখল! চালাকি শুরু করে দিয়েছে। সেদিন তার কোম্পানি থেকে একটি কসাক এখানে এসে বলল, সে নাকি নোগাইয়ের কাছে গিয়েছিল।"

"যাতে ধরা না পড়ে সে খেয়াল তো তার রাখা উচিত," ওলেনিন বলল।

"ঠিক, সেইকথা তো আমিও বলি, 'মনে রেখো লুকাশ্কা, কোন বিপদে যেন না পড়।' কি জান, ছেলে-ছোকরারা একটু বেপরোয়া হয়।

কিন্তু সব কিছুরই তো সময়-অসময় আছে। ধর, তুমি কিছু চুরি করেছ, বা দখল করেছ, অথবা একজন এব্রেককে খুন করেছ। বুঝলাম, তুমি খুব বাহাদুর ছেলে! কিন্তু সব কিছু সামাল দিতে হবে তো, নইলে যে বিপদ ঘটবে।"

ওলেনিন বলল, "ঠিক, সেনাদলে দু' একবার তাকে আমি দেখেছি; সে তো বেশ ভালই চালাচ্ছিল। আরও একটা ঘোড়া বিক্রী করেছে।" সে স্টোভের দিকে তাকাল।

এক জোড়া বড় কালো চোখ কঠোর, বিরূপ দৃষ্টিতে তার দিকে ঝিলিক হানছে।

নিজের কথার জন্য ওলেনিনের লজ্জা হল। হঠাৎ মারিয়াংকা বলে উঠল, "তাতে কি হয়েছে? সে তো কারও ক্ষতি করে নি। নিজের পয়সায় ফূর্তি করে।" দুই পা নামিয়ে লাফিয়ে স্টোভ থেকে নেমে সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে সে ছুটে বেরিয়ে গেল। ওলেনিন একদৃষ্টিতে তার যাওয়ার পথের দিকেই তাকিয়ে রইল। উলিৎকা গিন্নির কোন কথাই তার কানে ঢুকল না।

কয়েক মিনিট পরে কয়েকজন নতুন লোক ঘরে ঢুকল: উলিৎকা গিন্নির ভাই এক বুড়ো, সঙ্গে ইয়েরশ্‌কা খুড়ো, আর তাদের পিছনে মারিয়াংকা ও উস্তেংকা।

উস্তেংকা বলল, "শুভ সন্ধ্যা।" ওলেনিনের দিকে ফিরে বলল, "এখনও ছুটিতে আছেন?"

ওলেনিন জবাব দিল, "হ্যাঁ, ছুটিতে।" কেন কে জানে, সে লজ্জিত ও অস্বস্তি বোধ করছে।

ভাবল চলে যাবে কিন্তু পারল না। আবার চুপ করে থাকাও অসম্ভব। বুড়ো লোকটি তাকে মদ খেতে বলে এ বিপদ থেকে বাঁচাল। দুজনে মদ খেল। ওলেনিন ইয়েরশ্‌কার সঙ্গেও মদ খেল, অন্য কসাকটির সঙ্গেও খেল; আবার ইয়েরশ্‌কার সঙ্গে। এইভাবে সে যত মদ খেল ততই তার অন্তরটা ভারী হয়ে উঠল। দুই বুড়ো কিন্তু ততই খুশি। ওলেনিন মুখে কিছু বলল না, শুধু মদ খেয়ে চলল; অন্যদের চাইতে বেশীই খেল। শেষ পর্যন্ত বুড়ি আর চিকির দিল না। তখন তারা সকলেই বারান্দায় বেরিয়ে গেল। বুড়ো লোকটি প্রস্তাব করল, এবার ওলেনিনের বাসায় গিয়ে ফূর্তিটা শেষ করা যাক। উস্তেংকা দৌড়ে বাড়ি চলে গেল, আর ইয়েরশ্‌কা বুড়ো কসাককে নিয়ে চলল ভানিয়ুশার খোঁজে। বুড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল চালাঘরটা পরিষ্কার করতে। কুটিরে মারিয়াংকা একা। হঠাৎ ওলেনিনের মনটা বেশ তাজা ও খুশি হয়ে উঠল, যেন এই মাত্র ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। সব কিছু লক্ষ্য করে বুড়োদের এগিয়ে যেতে দিয়ে সে কুটিরে ফিরে গেল। মারিয়াংকা তখন

বিছানা করছে। তার দিকে এগিয়ে গিয়ে ওলেনিন কিছু বলতে চাইল, কিন্তু মুখে কথা ফুটল না। মারিয়াংকা তার কাছ থেকে সরে গেল, এক কোণে বিছানার উপর পা ভেঙে বসল, ভয়ার্ত চোখে নিঃশব্দে ওলেনিনকে দেখতে লাগল। ওলেনিন সেটা বুঝল। নিজের জন্য তার দুঃখ হল, লজ্জা হল ; আবার সেই সঙ্গে মারিয়াংকার মনে এই অনুভূতিটা জাগাতে পেরেছে বলে গর্বিত হল, খুশি হল।

বলল, "মারিয়াংকা! তুমি কি কোন দিন আমাকে করুণা করবে না? তোমাকে যে আমি কত ভালবাসি তা বলতে পারব না।"

আরও সরে গিয়ে মারিয়াংকা বলল, "মাতালের কথা শোন!···আমার কাছে আপনি কিছু পাবেন না!"

"না, এটা মাতালের কথা নয়। লুকাশ্‌কাকে বিয়ে করো না। আমি তোমাকে বিয়ে করব।"

কথাগুলি বলেই তার মনে হল, "এ আমি কি বলছি? কালও কি এ-কথা বলতে পারব? হ্যাঁ, পারব, নিশ্চয় পারব ; এখনই আবার বলছি।" তার বুকের ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠল।

"তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে?"

মারিয়াংকা গম্ভীর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল ; তার সব ভয় দূর হয়ে গেছে বলে মনে হল।

"মারিয়াংকা, আমার মনটাই হারিয়ে গেছে। আমি আর আমাতে নেই। তুমি যা বলবে আমি তাই করব।" অনুরাগের মিষ্টি কথাগুলি আপনা থেকেই তার জিভে এসে গেল।

হঠাৎ ওলেনিনের বাড়িয়ে দেওয়া হাতটাকে চেপে ধরে মারিয়াংকা বলে উঠল, "আরে, কী সব আজেবাজে কথা বলছেন?" সে ওলেনিনের হাতটাকে ঠেলে সরিয়ে দিল না, নিজের বলিষ্ঠ কঠিন আঙুল দিয়ে সজোরে চেপে ধরল।

"ভদ্দরলোকরা কি কসাক মেয়েদের বিয়ে করে? আপনি চলে যান।"

"কিন্তু তুমি বিয়ে করবে কি? সব কিছুই···"

"আর লুকাশ্‌কাকে নিয়ে আমরা কি করব?" মারিয়াংকা হাসতে হাসতে বলল।

নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ওলেনিন সজোরে মারিয়াংকাকে জড়িয়ে ধরল, কিন্তু মারিয়াংকা হরিণশিশুর মত ছিটকে সরে গিয়ে খালি পায়েই উঠোনে চলে গেল ; ওলেনিন সম্বিত ফিরে পেল ; তার ভয় হল। নিজেকে আবার এই মেয়েটির তুলনায় অনেক ছোট মনে হল, তবু যা বলে ফেলেছে সেজন্য কোনরকম অনুতাপ না করে সে বাড়ি ফিরে গেল। তার ঘরে বসে দুই বুড়ো মদ খাচ্ছিল ; তাদের দিকে দৃকপাত না করে সে শুয়ে পড়ল ;

এমন গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল যা অনেকদিন তার চোখে নামে নি।

অধ্যায়—৩৫

পরের দিনটা উৎসবের দিন। সন্ধ্যায় গ্রামের সব মানুষ পথে বেরিয়ে পড়ল; অস্তসূর্যের আলোয় তাদের উৎসবের পোশাক ঝিল্‌মিল্‌ করতে লাগল এ মরশুমে স্বাভাবিকের চাইতে বেশী মদ তৈরি হয়েছে, তাই সকলেরই এখন ছুটির মেজাজ। এক মাসের মধ্যেই কসাকরা অভিযানে বের হবে; অনেক পরিবারেই তাই বিয়ের উদ্যোগ-আয়োজন শুরু হয়ে গেছে।

গ্রাম-আপিসের সামনেও দোকান দুটোর কাছের স্কোয়ারে গ্রামের লোক-জন এসে ভিড় করেছে। ধূসর বা কালো কোট পরে বুড়োরা আপিস-বাড়ির মাটির দাওয়ায় বসে-দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছে। স্ত্রীলোক ও মেয়েরা সেখান দিয়ে যেতে যেতে থেমে গিয়ে মাথা নীচু করছে। কসাক যুবকরা সেখানে এসে সম্মান দেখাতে গতিবেগ কমিয়ে মাথার টুপি তুলে ধরছে।

কসাক মেয়েরা এখনও "খোরোভদ" (একরকম গোলাকার নৃত্য) নাচতে শুরু করে নি। ঝকঝকে বেশ্‌মেৎ পরে, মাথার সাদা রুমাল চোখ পর্যন্ত নামিয়ে তারা হয় মাটিতে নয় তো মাটির দাওয়ায় বসে হাসতে হাসতে কলগুঞ্জনে মেতে আছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা স্কোয়ারের মধ্যে খেলতে খেলতে বলগুলোকে অনেক উঁচুতে পাঠিয়ে চীৎকার-চেঁচামেচি করছে। সূক্ষ্ম নীল কাপড়ের উপর জরির পাড় বসানো কোট গায়ে আর্মেনীয় দোকান-দারটি দোকানের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে; ভিতরে উজ্জ্বল রংয়ের স্তূপীকৃত রুমাল চোখে পড়ছে। খালি পা, লাল দাড়ি দুই চেচেন এসেছে তেরেক নদী পেরিয়ে উৎসব দেখতে। কোন বন্ধুর বাড়ির বাইরে হাঁটুর উপর বসে তারা গম্ভীরভাবে পাইপ টানছে আর মাঝে মাঝে থুথু ফেলছে। এখানে-ওখানে কিছু কসাক এর মধ্যেই মাতাল হয়ে গান গাইতে শুরু করেছে।

মারিয়াংকাকে দেখার আশায় ওলেনিন সারাটা সকাল উঠোনে পায়চারি করে বেড়াল। কিন্তু মারিয়াংকা সেরা পোশাকটি পরে ভজনালয়ে চলে গেল প্রার্থনা করতে, তারপর মাটির বাঁধের উপর অন্য মেয়েদের সঙ্গে বসে গেল। কখনও বাদাম ভাঙছে, কখনও ছুটে বাড়ি চলে যাচ্ছে, আর প্রতি-বারই দুটি সদয়, উজ্জ্বল চোখে ভাড়াটের দিকে তাকাচ্ছে। অন্য সকলের সামনে তাকে ডাকতে ওলেনিন ভয় পেল।। যে-কথাটি সে রাতে শেষ করতে পারে নি সেটা বলে একটা স্পষ্ট জবাব পাবার ইচ্ছা তার মনে জাগল। গত-কাল রাতের মতই আরও একটি মুহূর্ত অপেক্ষা করল, কিন্তু সে মুহূর্তটি এল না; মনে হল, এই অনিশ্চয়তার মধ্যে সে আর থাকতে পারছে না। মেয়েটি আবার রাস্তায় বেরিয়ে গেল; কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ওলেনিনও বেরিয়ে

পড়ল; কোথায় যাচ্ছে না বুঝেই সে মারিয়াংকার পিছন পিছন চলল। ঝকঝকে নীল সাটিনের বেশ্‌মেৎ পরে মারিয়াংকা যে মোড়টাতে বসেছিল সেখানটা পেরিয়ে যাবার সময় পিছন থেকে মেয়েদের হাসি তার কানে এল; বুকের ভিতরটা ধ্বক্‌ করে উঠল।

স্কোয়ারের ঠিক উপরেই বেলেৎস্কির বাড়ি। সেখান দিয়ে যাবার সময় বেলেৎস্কি তাকে ভিতরে ডাকল; সে ভিতরে ঢুকল।

কিছু কথাবার্তার পরে দুজনে জানালায় গিয়ে বসল। একটু পরেই ইয়েরশ্‌কা এসে হাজির হল; তার পরনে নতুন বেশ্‌মেৎ। সেও তাদের পাশে মেঝেতে বসে পড়ল।

সিগারেটটা বাড়িয়ে মোড়ের একটা রং-বেরংয়ের দলকে দেখিয়ে বেলেৎস্কি হেসে বলল, "ঐ যে, ওটা হল উঁচু মহলের দল। আমারটিও ওখানেই আছে। দেখতে পাচ্ছেন? ওই যে লাল পোশাক পরা।" জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চীৎকার করে বলল, "তোমরা এখনও খোরোভদ শুরু করছ না কেন? একটু সবুর করুন, অন্ধকার হলে আমরাও যাব। সব্বাইকে নেমন্তন্ন করে নিয়ে যাব উস্তেংকার বাড়ি। তাদের জন্য একটা বল-নাচের আয়োজন করতেই হবে!"

ওলেনিন স্থির-সংকল্পের স্বরে বলল, "আমিও যাব উস্তেংকার বাড়ি। মারিয়াংকা সেখানে থাকবে কি?"

"হ্যাঁ, সেও থাকবে। চলে আসবেন!" তিলমাত্র বিস্মিত না হয়ে বেলেৎস্কি বলল। "ওদের কী সুন্দর দেখাচ্ছে, তাই না?"

ওলেনিন বলল, "হ্যাঁ, খুব সুন্দর! এই সব উৎসব দেখলেই আমি অবাক হয়ে ভাবি, মানুষগুলো হঠাৎ এমন সন্তুষ্ট ও ফূর্তিবাজ হয়ে ওঠে কেমন করে। যেমন আজকের দিনটা, মাসের পনেরো তারিখ বলেই সব কিছুতে কেমন উৎসবের আমেজ লেগেছে। চোখে-মুখে, কথায়-চলনে—পোশাকে, বাতাসে ও রোদে—সর্বত্রই উৎসবের মেজাজ। কিন্তু রাশিয়াতে আমরা এখন আর কোন উৎসব করি না!"

এ ধরনের কথা বেলেৎস্কির পছন্দ নয়; বলল, "তা বটে।" ইয়েরশ্‌কার দিকে ফিরে বলল, "কি গো বুড়ো, মদে চুমুক দিচ্ছ না কেন?"

বেলেৎস্কিকে দেখিয়ে ইয়েরশ্‌কা ওলেনিনকে চোখ টিপল; "তোমার এই কুনাকটি খুব অহংকারী।"

বেলেৎস্কি হাতের গ্লাসটা তুলে ধরল।

সেটা শেষ করে বলল, "আল্লাহ্‌ বির্দি!" (একত্রে বসে পান করার সময় ককেশীয়রা বলে "আল্লাহ্‌ বির্দি (ঈশ্বরের দান)।"

"সৌ বুল্‌ (তোমার স্বাস্থ্য)," হেসে কথাটা বলে ইয়েরশ্‌কা তার গ্লাসটাও শেষ করল।

উঠে জানালা দিয়ে তাকিয়ে ওলেনিনের দিকে ফিরে বলল, "একে তুমি উৎসব বল? এটা কি রকম উৎসব? আগেকার দিনেও তো মানুষকে ফ্‌র্তি করতে দেখেছ! মেয়েরা তখন বাইরে আসত জড়ি-দেওয়া 'সারাফান' এক-রকম বহির্বাস) পরে। গলায় ঝুলত দুই নরী মোহর, মাথায় থাকত জরি-কাপড়ের পাগড়ি; যখন তারা পথ দিয়ে যেত কেমন একটা খস্‌খস্‌ আওয়াজ হত।

"সব মেয়েকেই দেখাত রাণীর মত। কখনও তারা সদলে বাইরে চলে আসত, বাতাস ভরে যেত তাদের গানে. সারারাত তারা ফ্‌র্তি করত। কসাকরা একটা পিপেকে গড়িয়ে উঠোনে নিয়ে আসত, আর সকাল না হওয়া পর্যন্ত বসে মদ টানত। আবার কখনও হাতে হাত ধরে সারা গ্রাম চক্কর দিত। যার সঙ্গে দেখা হত তাকেই সঙ্গে নিত, প্রতিটি বাড়িতে যেত। কখনও বা পরপর তিনদিন ধরে আমোদ-আহ্লাদ চলত। এখনও মনে পড়ে—বাবা বাড়ি ফিরত একেবারে লাল হয়ে; চোখ-মুখ ফুলিয়ে; মাথায় টুপি নেই; সবকিছু ফেলে এসেছে। বাড়ি এসেই বিছানায় চিৎপটাং। কি করতে হবে সেটাও মা জানত: কিছুটা টাটকা খাবার আর চিকির এনে তাকে ঠাণ্ডা করত, তারপর গ্রামময় ছুটে বেড়াত টুপিটার খোঁজে। তারপর দু'দিন একনাগাড়ে বাবা ঘুমিয়ে থাকত! তারা তখন এইরকমই ছিল! আর এখন এসব কি হচ্ছে?"

"আচ্ছা, সেইসব সারাফান-পরা মেয়েরা কি করত? তারা কি কেবল নিজেরাই ফ্‌র্তি করত?" বেলেৎস্কি শুধাল।

"তা করতে তাদের বয়েই গেছে! অনেক সময়ই কসাকরাও এসে হাজির হত; কেউ ঘোড়ায় চেপে, কেউ পায়ে হেঁটে; বলত, 'এস আমরা খোরোভদ ভেঙে দেই'; তারা এগিয়ে যেত, আর মেয়েরাও লাঠি নিয়ে তাড়া করত। কিন্তু ছেলেরাও পিছ-পা নয়। একজন ঘোড়া ছুটিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ে ভালবাসার মানুষটিকে নিয়ে উধাও হয়ে যেত। আহা!…ছেলেটি তার মনের মানুষকে কী ভালই না বাসত! সত্যি, আর সেকালের মেয়েরা, তারাও ছিল সব এক একটি রাণী!"

অধ্যায়—৩৬

ঠিক সেই সময় দুজন অশ্বারোহী একটা গলি থেকে বেরিয়ে স্কোয়ারের ভিতরে ঢুকল। একজন নাজার্কা, অপরজন লুকাশ্‌কা। ভোজন-পরিপুষ্ট একটা কাবার্দা ঘোড়ার উপর লুকাশ্‌কা ঈষৎ কাৎ হয়ে বসেছে। খাপে-ভরা বন্দুক, পিঠে পিস্তল, জিনের উপর ছড়ানো জোব্বা দেখেই বোঝা গেল

লুকাশ্‌কা কোন শান্তিপূর্ণ বা কাছাকাছি জায়গা থেকে আসে নি। তার হাবভাবে ফুটে উঠেছে যৌবনের সচেতন শক্তি ও আত্মবিশ্বাস। এপাশ থেকে ওপাশে তাকানো তার চোখ দুটি যেন বলছে: "এমন চমৎকার ছেলে কখনও দেখেছ?" নাজার্কা কৃশকায় ও ছোটখাট; তাকে সুবেশও বলা চলে না। বুড়ো মানুষগুলির পাশ দিয়ে যাবার সময় লুকাশ্‌কা একটু থামল, মাথা থেকে ভেড়ার চামড়ার সাদা টুপিটা তুলে ধরল।

তাদের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে একটি শুকনো চেহারার বুড়ো শুধাল, "আচ্ছা, তোমরা নাকি অনেক নোগাই ঘোড়া হাতিয়েছ?"

মুখ ফিরিয়ে লুকাশ্‌কা জবাব দিল, "তুমি কি গুণে দেখেছ বুড়ো দাদু যে প্রশ্নটা করলো?"

"যা করেছ বেশ করেছ, কিন্তু ছেলেটাকেও সঙ্গে নেবার কোন দরকার দেখি না," ভুরু দুটো আরও কুঁচকে বুড়ো মানুষটি বলল।

"বুড়ো শয়তানের কথা শোন, ও তো সবই জানে," লুকাশ্‌কা নিজের মনেই বলল। তারপর মোড়ের মাথায় অনেকগুলি কসাক মেয়েকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঘোড়ার মুখটা সেইদিকে ঘুরিয়ে দিল।

ঘোড়া থামিয়ে হঠাৎ গলা ছেড়ে বলে উঠল, "শুভ সন্ধ্যা গো মেয়েরা! আরে, তোমরা দেখছি আমাকে ছাড়াই বেশ বড় হয়ে উঠেছ।" সে হেসে উঠল।

"শুভ সন্ধ্যা লুকাশ্‌কা! শুভ সন্ধ্যা, বাহাদুর ছেলে!" অনেকগুলি খুশিভরা গলায় জবাব এল।

"অনেক টাকা নিয়ে এসেছ তো? মেয়েদের জন্য কিছু মিষ্টি কিনে আন! ...অনেকদিন থাকছ তো? সত্যি, অনেকদিন পরে তোমাকে দেখলাম..."

"রাতটা ভালভাবে কাটাবার জন্য নাজার্কা ও আমি সোজা উড়ে চলে এসেছি।"

মারিয়াংকাকে কনুই দিয়ে খোঁচা মেরে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠে উস্তেংকা বলল, "সে কি, মারিয়াংকা তো তোমাকে একেবারেই ভুলে গেছে।"

মারিয়াংকা ঘোড়াটার কাছ থেকে সরে এসে মাথাটা ঘুরিয়ে বড় বড় চোখ মেলে কসাকের দিকে তাকাল।

"সত্যি তো, অনেকদিন তোমার দেখা পাই নি! কেন তুমি আমাদের ঘোড়ার পায়ের নীচে পিষে মারছ?" কড়া গলায় কথাটা বলে সে মুখ ফেরাল।

লুকাশ্‌কার মেজাজ আজ ভাল। খুশিতে তার মুখটা জল্‌জল্ করছে। মারিয়াংকার জবাব শুনে সে থতমত খেয়ে গেল; হঠাৎ তার ভুরু জোড়া এক হয়ে মিলে গেল।

"আমার রেকাবে পা দাও, আমি তোমাকে ঐ পাহাড়ে নিয়ে যাব সুন্দরী!" যেন নিজের খারাপ চিন্তাকে দূর করতেই লুকাশ্‌কা হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল। মারিয়াংকার কাছে গিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, "তোমাকে চুমো খাব, আহা, কেমন করে চুমো খাব!"

তার চোখে চোখ রেখে মারিয়াংকার মুখখানা হঠাৎ রাঙা হয়ে উঠল; সে কয়েক পা পিছিয়ে গেল।

"আঃ, বকবকানি রাখ! তুমি দেখছি আমার পা মাড়িয়ে দেবে," মারিয়াংকা বলল।

লুকাশ্‌কা উস্তেংকার দিকে এগিয়ে গেল। মারিয়াংকাও সরে ছেলে-কোলে একটি স্ত্রীলোকের পাশে গিয়ে বসল। ছেলেটির দিকে ঝুঁকে মারিয়াংকা বাঁকা চোখে লুকাশ্‌কার দিকে তাকাল। সে তখন তার কালো বেশ্‌মেতের পকেট থেকে এক বাণ্ডিল মিষ্টি ও বাদাম বের করে উস্তেংকার হাতে দিয়ে মারিয়াংকার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল।

"এখনই গিয়ে ঘোড়াটার ব্যবস্থা করতে হবে; তারপর নাজার্কা ও আমি আবার ফিরে আসব, সারারাত ফুর্তি করব।" এই কথা বলে হাতের চাবুক দিয়ে ঘোড়াটাকে ছুঁয়ে দুজনই ঘোড়ায় উঠে বসল। একটা গলির পথ ধরে তারা পাশাপাশি দুটো বাড়ির সামনে গিয়ে থামল।

"এতক্ষণে জায়গামত এসে গেছি হে! তাড়াতাড়ি ফিরে এস!" বন্ধুকে কথাটা বলে লুকাশ্‌কা তার নিজের বাড়ির সামনে নেমে ঘোড়াটাকে ফটক পার করে ভিতরে নিয়ে গেল।

বোবা বোনটি ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, "হুল্লো স্তেপ্‌কা!" ইসারায় বুঝিয়ে দিল, সে যেন ঘোড়াটাকে খড়ের গাদার কাছে নিয়ে যায়, কিন্তু তার সাজ না খোলে।

বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে উঠে বন্দুকটাকে যথাস্থানে রেখে লুকাশ্‌কা চেঁচিয়ে বলল, "কেমন আছ মা? এখনও যে তুমি বাইরে যাও নি?"

বুড়ি মা দরজা খুলে দিয়ে বলল, "সোনা আমার! তুমি আসবে এতো আমি আশা করি নি, ভাবতেও পারি নি। আরে, কির্কাই তো বলল যে তুমি আসবে না।"

"খানিকটা চিকির নিয়ে এস তো মা। নাজার্কা আসছে। আমরা ভোজ-উৎসব পালন করব।"

বুড়ি বলল, "এক্ষুণি নিয়ে আসছি লুকাশ্‌কা, এক্ষুণি! সব মেয়েরাই তো ফুর্তি করছে। আমি ভেবেছিলাম আমাদের বোবা মেয়েটাও গেছে।"

চাবিটা নিয়ে মা তাড়াতাড়ি বাহির-বাড়িতে গেল।

নাজার্কাও ঘোড়াটার ব্যবস্থা করে বন্দুকটা কাঁধ থেকে নামিয়ে রেখে লুকাশ্‌কাদের বাড়িতে পৌছে ভিতরে ঢুকল।

অধ্যায়—৩৭

কানায় কানায় ভর্তি চিকিরের পেয়ালাটা মার হাত থেকে নিয়ে সযত্নে মাথার কাছে তুলে লুকাশ্‌কা বলল, "তোমার স্বাস্থ্য !"

নাজার্কা বলল, "এটা খুব খারাপ ! শুনলে তো বুরিয়াক খুড়ো বলল, 'তোমরা কি অনেক ঘোড়া চুরি করেছ ?' মনে হচ্ছে সে সব জানে।"

লুকাশকা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, "সে তো একটি বুড়ো যাদুকর। কিন্তু তাতে কি হল ? তারা তো এতক্ষণ নদীর ওপারে। যাক না, তাদের খুঁজে দেখুক।'

"তবু, এ ধরনের খোঁজ-খবর করা ভাল নয়।"

"আরে, তাতে কি হয়েছে ? কাল তাকে খানিকটা চিকির দিয়ে এস, তাহলেই সব মিটে যাবে। এখন এস, একটু ফূর্তি করা যাক। একটু টেনে নাও !" বুড়ো ইয়েরশ্‌কার মত করেই লুকাশ্‌কা চেঁচিয়ে বলল। "তারপর রাস্তায় বেরিয়ে মেয়েদের সঙ্গে ফূর্তি করা যাবে। যাও তো, কিছুটা মধু নিয়ে এস ; না থাক, আমাদের বুবিকেই পাঠাব। সকাল পর্যন্ত ফূর্তি চালাব।"

নাজার্কা হাসছিল। শুধাল, "তুমি কি এবার অনেকদিন থাকবে ?"

"যত দিন মজা না ফুরোয়। ছুটে যাও, কিছুটা ভদ্‌কা নিয়ে এস। এই নাও টাকা।"

ইয়াম্‌কার বাড়ি থেকে ভদ্‌কা আনতে নাজার্কা ছুটে চলে গেল।

শিকারী পাখির মতই ফূর্তির গন্ধ পেয়ে ইয়েরশ্‌কা খুড়ো ও ইয়েগুশব টলতে টলতে পর পর এসে হাজির হল। দুজনই মাতাল।

তাদের শুভ কামনার জবাবে লুকাশ্‌কা মাকে হেঁকে বলল, "আরও আধ-বালতি নিয়ে এস মা।"

ইয়েরশ্‌কা চেঁচিয়ে বলল, "এবার বলতো, তাদের কোথায় লুকিয়ে রেখেছ ? তুমি তো ভাল ছেলে ; আমি তোমাকে ভালবাসি।"

"ভালবাসাই বটে !..." লুকাশ্‌কা হেসে জবাব দিল। "শিক্ষার্থীর কাছ থেকে মিষ্টি বয়ে নিয়ে যাচ্ছ সুন্দরী মেয়েদের কাছে ! বুড়ো হলে, তবু..."

"কথাটা সত্যি নয়, সত্যি নয় !...ওঃ, মার্কা !' বুড়ো হো-হো করে হেসে উঠল। "আরে সে ব্যাটাই তো বলল, 'যাও, আমার হয়ে কাজটা করে দাও।' সে তো আমাকে একটা বন্দুকও দিতে চেয়েছে। কিন্তু না, সে ব্যবস্থা আমি করতাম, কিন্তু তোমার কথাও তো আমি ভাবি। তারপর বলতো, কোথায় ছিলে ?" বুড়ো এবার তাতার ভাষায় কথা বলতে লাগল।

লুকাশ্‌কা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল।

ইয়েস্ত'সব ভাল তাতার জানে না, মাঝে মাঝে দু'একটা রুশ শব্দ যোগ করে দিল।

স্বর মিলিয়ে বলল, "আমি বলতে চাই, ঘোড়াগুলোকে সে তাড়িয়ে দিয়েছে। এটা আমি ঠিক জানি।"

"গিরেই ও আমি একসঙ্গেই গিয়েছিলাম। নদী পেরিয়ে সে তো বাহাদুরি করে বলল যে গোটা তৃণাঞ্চল সে চেনে, আমাকে সোজা নিয়ে যাবে; কিন্তু ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে যেতে রাত গভীর হয়ে গেল, গিরেই পথ হারিয়ে বার বার একই পথে ঘুরতে লাগল, কিন্তু আমরা গন্তব্যস্থলের হদিসই পেলাম না: গ্রামটাও খুঁজে পেলাম না। এই হল বৃত্তান্ত। আমরা হয় তো ডান দিকে খুব বেশী এগিয়ে গিয়েছিলাম। মাঝ রাত পর্যন্ত অনেক ঘুরলাম। তারপর, ভাগ্য ভাল যে কুকুরের ডাক শুনতে পেলাম।'

ইয়েরশ্‌কা খুড়ো দুম্‌ করে বলে উঠল, "বোকার দল! তৃণাঞ্চলে আমরা তো পথ হারিয়েছি। কে না হারায়? কিন্তু আমরা একটা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে দলছাড়া নেকড়ের মত এই ভাবে চীৎকার করতাম!" মুখের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে একপাল নেকড়ে যেভাবে ডাকে সেই রকম শব্দ সে মুখ থেকে বের করতে লাগল। "সঙ্গে সঙ্গে কুকুরগুলো ডেকে উঠত···যাক, বলে যাও—শেষ পর্যন্ত খোঁজ পেলে?"

"পেয়েই তাড়িয়ে নিয়ে এলাম! কয়েকটি নোগাই মেয়েমানুষ তো নাজার্কাকে প্রায় ধরে ফেলেছিল।"

"তাই নাকি?" আহত গলায় নাজার্কা বলল; ঠিক তখনই সে এসে হাজির হয়েছে।

"আমরা আবার ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম, আবার গিরেই পথ হারাল; আমাদের প্রায় পৌঁছে দিল বালিয়াড়ির মধ্যে। আমরা ভেবেছিলাম তেরেকের দিকেই যাচ্ছি, কিন্তু আসলে যাচ্ছিলাম তেরেকের উল্টো দিকে!"

"আকাশের তারা দেখে তোমাদের পথ চলা উচিত ছিল," ইয়েরশ্‌কা খুড়ো বলল।

"আমিও তাই বলি," ইয়েরগু'সভ সোৎসাহে বলল।

"হ্যাঁ, চারদিক যখন অন্ধকার তখন তো তারা দেখে পথ চলাই উচিত। আমি তো বার বার চেষ্টা করলাম···তারপর লাগাম খুলে আমার ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিলাম—ভাবলাম, সেই আমাদের জায়গামত পৌঁছে দেবে: আর কি রকম মনে কর। মাটিতে দু' একবার নাকটা ঝেড়েই সে জোড়কদমে ছুটল সোজা নাকবরাবর, আর আমাদের পৌঁছে দিল বাড়িতে। আমাদের ভাগ্য ভাল যে সে পৌঁছে দিল, কারণ ততক্ষণে দিনের আলো ফুটতে শুরু করেছে। কোনরকমে তাদের বনের মধ্যে লুকিয়ে রাখলাম। নাগিম নদী পেরিয়ে এসে তাদের নিয়ে গেল।"

ইয়েগুশ্‌ভ মাথা নাড়তে লাগল। "আমিও তো তাই বলছি, খুব চালাক। অনেক পেয়েছ তো?"

"সবই এখানে আছে," লুকাশ্‌কা পকেটে চাপড় মারল।

"ঠিক সেই সময় মা ঘুরে ঢুকল;" লুকাশ্‌কা কথা শেষ করল না।

চেঁচিয়ে বলল, "এবার পান কর।"

ইয়েরশ্‌কা বলতে শুরু করল, "ঠিক, গির্চিক ও আমি অনেক রাতে ঘোড়ায় চেপে..."

লুকাশ্‌কা বলল, "আঃ, তোমার ও গল্পের কি শেষ নেই! আমি যাচ্ছি।" পেয়ালাটা শেষ করে, কোমর-বন্ধ্‌টা ভাল করে এঁটে সে বেরিয়ে গেল।

অধ্যায়—৩৮

লুকাশ্‌কা যখন পথে নামল তখন বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। হেমন্তের রাত ঝরঝরে ও শান্ত। স্কোয়ারের একদিককার দীর্ঘ অন্ধকার পপলার গাছগুলির পিছন থেকে সোনালী ভরাচাঁদ উঠছে। বাহির-বাড়ির চিমনিগুলো থেকে ধোঁয়া উঠে কুয়াশার সঙ্গে মিশে গ্রামের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। এখানে-ওখানে জানালায় আলো দেখা যাচ্ছে; কিজ্‌য়াক, আঙুর-চূর্ণ ও কুয়াশার গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। দিনের বেলাকার মতই নানা কথা, হাসি, গান, ও বাদাম ভাঙার শব্দ ভেসে আসছে, তবে এখন সেই মিলিত শব্দটা আরও স্পষ্ট। বাড়ির চারদিকে অন্ধকারের মধ্যে সাদা রুমাল ও টুপির ঝিলিক দেখা যাচ্ছে।

দোকানের আলোকিত খোলা দরজার সামনে স্কোয়ারের মধ্যে কসাক স্ত্রী-পুরুষদের সাদা-কালো মূর্তিগুলো চোখে পড়ছে; অনেক দূর থেকে শোনা যাচ্ছে তাদের গান, হাসি ও কথা। মেয়েরা হাতে হাত ধরে ধুলোভর্তি স্কোয়ারে হাল্কা পা ফেলে ঘুরে ঘুরে নাচছে। একটি শীর্ণকায়, সাদাসিধে মেয়ে গান ধরেছে:

জঙ্গলটা পেরিয়ে, পার হয়ে বনের অন্ধকার,
সবুজ বাগানে, আর ছায়া-ঢাকা পার্কে পা ফেলে,
এল—এল দুটি খুশিভরা যুবক,
তারা সাহসী ও চটপটে, দুজনই তখনও কুমার!
অনেক পথ হেঁটে এসে দুজনই থামল,
আর তখনই দেখা দিল দ্বন্দ্ব!

বেরিয়ে এল একটি কুমারী ; এসেই বলল,
"অচিরেই আমি হব তোমাদের যে কোন একজনের!"
সুন্দরীকে পেল সেই ছেলেটি যার মুখখানি সুন্দর,
হ্যাঁ, সুন্দর মুখের ছেলেটির মাথায় সোনালী চুল!
মেয়েটির সাদা ডান হাতটা নিজের হাতে নিয়ে
ছেলেটি তাকে নিয়ে গেল বন্ধুদের দেখাতে।
বলল, "আমার এই ছোট্ট স্ত্রীটির মত
কোন সুন্দরী মেয়েকে কি তোমরা জীবনে দেখেছ?"

বুড়িরা সব গোল হয়ে দাঁড়িয়ে গান শুনছে। ছোট ছেলেমেয়েরা অন্ধকারে একজন আর একজনকে তাড়া করছে। পুরুষরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কখনও নৃত্য-রতা মেয়েদের হাত ধরে টানছে, কখনও বা বেষ্টনী ভেঙে ভিতরে ঢুকছে। দরজার অন্ধকার দিকটাতে দাঁড়িয়ে আছে বেলেৎস্কি ও ওলেনিন। তাদের পরিধানে সির্কাসীয় কোট ও ভেড়ার চামড়ার টুপি ; সকলেই তাদের দেখছে বুঝতে পেরে তারা নীচু গলায় নিজেদের ভাষাতেই কথা বলছে।

লাল বেশ্‌মেৎ পরে ছোট্ট মোটা উস্তেংকা আর নতুন বেশ্‌মেৎ ও ফ্রক পরে সুগঠনা মারিয়াংকা হাতে হাত ধরে গোল হয়ে ঘুরছে। উস্তেংকা ও মারিয়াংকাকে কেমন করে নাচের বৃত্ত থেকে ছিনিয়ে আনা যায় সেই কথাই আলোচনা করছে ওলেনিন ও বেলেৎস্কি। বেলেৎস্কি ভাবছে, ওলেনিন শুধু একটু মজা লুটতে চাইছে, আর ওলেনিন আশা করছে নিজের ভাগ্য নির্ধারণের। সে চাইছে, যেমন করেই হোক, সেইদিনই মারিয়াংকাকে একলা পেতে হবে, তাকে সব কথা বলতে হবে, জানতে হবে সে তার স্ত্রী হতে রাজী কি না, স্ত্রী হবে কি না। উত্তরটা যদিও আগাগোড়াই নেতিবাচক হয়েছে, তবু সে স্থির করেছে নিজের মনের সব কথা তাকে বলতে পারবে, আর মারিয়াংকাও সেকথা বুঝবে।

বেলেৎস্কি বলল, "একথা আমাকে আগে বল নি কেন? উস্তেংকাকে দিয়ে আমি সব ব্যবস্থা করে দিতাম। তুমি একটি অদ্ভুত চীজ!…"

"কি আর করা যাবে!…অচিরেই তোমাকে সব কথা খুলে বলব। কিন্তু ঈশ্বরের দোহাই, সে যাতে এখনই উস্তেংকার কাছে আসে তার ব্যবস্থা কর।"

"ঠিক আছে, সে ব্যবস্থা সহজেই করা যাবে।"

সৌজন্যের খাতিরে বেলেৎস্কি প্রথমে মারিয়াংকাকেই শুধাল, "আচ্ছা মারিয়াংকা, লুকাশ্‌কার বদলে তুমি কি 'এই সুন্দর মুখের ছেলেটি'-র হবে?" কিন্তু তার কাছ থেকে কোন জবাব না পেয়ে উস্তেংকার কাছে গিয়ে মিনতি জানাল, সে যেন মারিয়াংকাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িতে ফিরে যায়। তার কথা শেষ হবার আগেই দলনেত্রী আর একটা গান ধরল, আর মেয়েরা হাত ধরা-ধরি করে গোল হয়ে তার সঙ্গে গলা মেলাল। তারা গাইল :

একটি যুবক এল বাগানটা পেরিয়ে,
শহরের মাঝে এল রাস্তাটা ছাড়িয়ে,
প্রথম যাবার বেলা ডান হাত নাড়ল,
দ্বিতীয় বারেতে তার টুপিটাকে তুলল।
তৃতীয় বারেতে এসে স্থির হয়ে দাঁড়াল।
নড়ল না, চড়ল না, গেল না তো চলে,
চটপট মুখে শুধু দুটি কথা বলে।
"আমি তো এসেছি শুধু দুটি কথা বলতে,
প্রিয়া, তুমি এলে না তো মোর সাথে চলতে?
এস, এস, কথা বল, আবছা আলোকে,
তুমি তো দেখ না মোরে ঘৃণা-ভরা চোখে?
তুমি তো আমাকে জান, যদি দেরি কর,
আমাকে স্মরিয়া পরে দুঃখ পাবে বড়।
তোমাতে—আমাতে যবে হইবে মিলন,
আমার লাগিয়া তুমি করিবে ক্রন্দন।"
আমি তো জানি না তারে কি জবাব দেব,
সাহস তো নাই তারে ফিরাইয়া দেব।
না, না, তারে আমি পারি নি ফেরাতে।
পাশে থেকে তার সাথে একটু বেড়াতে
গেলাম পার্কে যেই
দেখা হল সেখানেই।
মাথা নত করতেই রুমালখানা
ভূমি তলে পড়ে গেল; আর হাতখানা
বাড়িয়ে সে তুলে দিল। "আজ শুভ দিন,
দয়া করে এ রুমাল নিন, তুলে নিন।
মুখে শুধু একবার দিন—বলে দিন—
আপনার ভালবাসা পেয়েছে এ দীন।
ভয় হয়, ওগো প্রিয়া, আমি তো না জানি,
প্রতিদানে আপনারে কিবা দেব আমি।
মনে তো ভেবেছি প্রিয়া একখানি শাল
দেব তোমা উপহার—আজ নয় কাল।
বিনিময়ে তার
গুণে গুণে পাঁচখানি চুমো নেব আর।"

লুকাশ্‌কা ও নাজার্কা বেষ্টনী ভেঙে মেয়েদের মধ্যে ঢুকে গেল। লুকাশ্‌কা

তাদের সঙ্গে গানও জুড়ে দিল।

বলল, "এস, তোমাদের মধ্যে যেকোন একজন এস।" মেয়েরা মারিয়াংকাকে ঠেলে দিল, কিন্তু সে কিছুতেই বৃত্তের মধ্যে ঢুকবে না। উচ্চ হাসি, চড়-চাপড়, চুমো ও ফিস্‌ফিস্‌ শব্দ গানের সঙ্গে মিশে একাকার। ওলেনিনের পাশ দিয়ে যাবার সময় লুকাশ্‌কা তাকে দেখে ঘাড় নাড়ল।

বলল, "দিমিত্রি আন্দ্রীচ, তুমি কি দেখতে এসেছ?"

"হ্যাঁ," ওলেনিন জবাব দিল।

বেলেৎস্কি নীচু হয়ে উস্তেংকার কানে কানে কি যেন বলল। আর এক পাক ঘুরে না আসা পর্যন্ত উস্তেংকা জবাব দেবার সময় পেল না। ঘুরে এসে বলল, "ঠিক আছে, আমরা যাচ্ছি।"

"আর মারিয়াংকাও যাচ্ছে তো?"

মারিয়াংকার পাশে নীচু হয়ে ওলেনিন বলল, "তুমি আসছ তো? এক মিনিটের জন্য হলেও দয়া করে এসো। তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

"যদি অন্য মেয়েরা যায় তো আমিও যাব।"

তার উপর ঝুঁকে পড়ে ওলেনিন বলল, "আমার প্রশ্নের জবাব দেবে কি?"

মারিয়াংকা সরে গেল। ওলেনিন তার পিছু নিল। "দেবে কি?"

"কি প্রশ্ন?"

তার কানের কাছে মুখ নিয়ে ওলেনিন বলল, "সেদিন তোমাকে যে প্রশ্ন করেছিলাম। তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে?"

মারিয়াংকা একমুহূর্ত ভাবল। বলল, "তোমাকে বলব—আজ রাতেই বলব।" অন্ধকারের ভিতরেও তার চোখের প্রসন্ন দৃষ্টি জ্বলজ্বল্‌ করতে লাগল।

ওলেনিন তবু তার পিছনে চলতে লাগল। মারিয়াংকার কাছে থাকতে পারলেই তার আনন্দ।

কিন্তু গান না থামিয়েই লুকাশ্‌কা হঠাৎ মারিয়াংকার হাতটা সজোরে চেপে ধরে তাকে টানতে টানতে বেষ্টনীর মাঝখানে নিয়ে গেল। "উস্তেংকাদের বাড়িতে এসো," কোনরকমে কথাটা বলে ওলেনিন পিছু হটে বন্ধুর কাছে ফিরে গেল। গান শেষ হল। লুকাশ্‌কা ঠোঁট মুছল; মারিয়াংকাও তাই করল; তারপর তারা চুমো খেল।

লুকাশ্‌কা বলল, "না, না, গুণে গুণে পাঁচখানি চুমো!" নাচগানের রেশ কেটে যেতেই শুরু হল বকবকানি, উচ্চহাসি, আর ছুটাছুটি। মনে হল, লুকাশ্‌কা অনেক মদ গিলেছে; সেই মেয়েদের হাতে মিষ্টি বিতরণ করতে শুরু করল। বলল, "সকলেই পারে।" তারপর ওলেনিনের দিকে ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "কিন্তু যে সৈন্যদের পিছনে ধাওয়া করে, সে বেষ্টনী থেকে

বেরিয়ে যাক !"

মেয়েরা তার হাত থেকে মিষ্টিগুলো কেড়ে নিয়ে তাই নিয়ে হাসতে হাসতে নিজেদের মধ্যে লড়াই শুরু করে দিল। বেলেৎস্কি ও ওলেনিন এক-পাশে সরে দাঁড়াল।

যেন নিজের উদারতার জন্য লজ্জা পেয়েই লুকাশ্‌কা টুপিটা খুলে আস্তিন দিয়ে কপাল মুছে মারিয়াংকা ও উস্তেংকার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। এতক্ষণ যে গানটা তারা গাইছিল তার কথা দিয়েই বলল, "জবাব দাও, তোমরা কি আমাকে 'ঘৃণা-ভরা চোখে' দেখ ?'' মারিয়াংকার দিকে ঘুরে সক্রোধে সেই কথাগুলিই আর একবার বলল, "তুমি কি আমাকে 'ঘৃণা-ভরা চোখে' দেখ ? তোমাতে-আমাতে যবে হইবে মিলন, আমার লাগিয়া তুমি করিবে ক্রন্দন !" উস্তেংকা ও মারিয়াংকা দুজনকেই সে জড়িয়ে ধরল। নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে উস্তেংকা হাতটা ঘুরিয়ে লুকাশ্‌কার পিঠে এত জোরে একটা কিল বসাল যে তার নিজের হাতেই ব্যথা লাগল।

লুকাশ্‌কা শুধাল, "আচ্ছা, আর এক পাক হবে নাকি ?"

উস্তেংকা জবাব দিল, "অন্য মেয়েরা নাচতে চায় নাচুক, কিন্তু আমি বাড়ি যাচ্ছি, আর মারিয়াংকাও যাচ্ছে।"

লুকাশ্‌কার হাত তখনও মারিয়াংকাকে জড়িয়ে ধরে আছে; সে তাকে সঙ্গে করে ভিড় থেকে অনেকটা দূরে একটা অন্ধকার কোণে নিয়ে গেল।

বলল, "তুমি যেয়ো না মারিয়াংকা; শেষবারের মত একটু মজা করা যাক। তুমি বাড়ি যাও; আমি তোমার কাছে যাব।"

"বাড়ি গিয়ে কি করব ? উৎসবের দিন তো ফূর্তি করার জন্যই। আমি উস্তেংকাদের বাড়ি যাচ্ছি," মারিয়াংকা জবাব দিল।

"তুমি তো জান, যাই কর না কেন আমি তোমাকে বিয়ে করবই !"

মারিয়াংকা বলল, "ঠিক আছে; সেটা সময় হলে দেখা যাবে।"

"তুমি তাহলে যাবেই," তীক্ষ্ণ গলায় কথাটা বলে মারিয়াংকাকে বুকের আরও কাছে চেপে ধরে লুকাশ্‌কা তার গালে চুমো খেল।

"এই, ছেড়ে দাও ! আমাকে বিরক্ত করো না।" লুকাশ্‌কার বাহু-বন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মারিয়াংকা সরে গেল।

"আহারে মেয়ে, এর ফল খুব খারাপ হবে," তিরস্কারের সুরে কথাটা বলে লুকাশ্‌কা মাথা নাড়তে লাগল। "আমার জন্য তোমাকে কাঁদতে হবে…" তার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে সে অন্য মেয়েদের ডেকে বলল, "তাহলে এবার ! এস, আর একটা গান গাওয়া যাক !"

তার কথাগুলি শুনে মারিয়াংকা ভয় পেল, বিরক্ত হল। সে থামল। "কি খারাপ হবে ?"

"সেটা !"

"কোন্‌টা ?"

"এই যে তুমি সৈনিক-ভাড়াটের সঙ্গে মেলামেশা কর, আর আমার তোয়াক্কাই কর না !"

"আমার যতদিন খুশি তোয়াক্কা করব। তুমি আমার বাবা নও, মা নও। আমার কাছে তুমি কি চাও ? আমার যাকে ইচ্ছা তাকে তোয়াক্কা করব !"

লুকাশ্‌কা বলল, "বেশ, ঠিক আছে···কিন্তু মনে রেখো !" সে দোকানের দিকে এগিয়ে গেল। হাঁক দিয়ে বলল, "মেয়েরা ! থামলে কেন ? নাচ চালিয়ে যাও। নাজার্কা, আরও খানিকটা চিকির নিয়ে এস।"

ওলেনিন বেলেৎস্কিকে শুধাল, "আচ্ছা, ওরা আসবে তো ?"

বেলেৎস্কি জবাব দিল, "এখনই আসবে। চলে এস, বল-নাচের আয়োজন করতেই হবে।"

অধ্যায়—৩৯

মারিয়াংকা ও উস্তেংকাকে অনুসরণ করে ওলেনিন যখন বেলেৎস্কির কুটির থেকে বেরিয়ে এল তখন রাত অনেক হয়েছে। সামনের অন্ধকার রাস্তায় সে মেয়েটির সাদা রুমালের ঝিলিক দেখতে পেল। সোনালী চাঁদ ডুবছে তৃণাঞ্চলের বুকে। একটা রূপোলি কুয়াশা ছড়িয়ে পড়েছে গ্রামের উপরে। চারদিক স্তব্ধ ; কোথাও আলো নেই ; শুধু শোনা যাচ্ছে বাড়ি-ফেরা মেয়েদের পায়ের শব্দ। ওলেনিনের হৃদ্‌পিণ্ডের গতি দ্রুততর হল। রাতের ঠাণ্ডা বাতাস তার জ্বলন্ত মুখখানার উপর শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিল। একবার আকাশের দিকে তাকাল, তারপর তাকাল যে বাড়িটি ছেড়ে এসেছে তার দিকে ; মোমবাতিটা ইতিমধ্যেই নিভে গেছে। অন্ধকারের ভিতর দিয়ে আবার তাকাল দুটি মেয়ের চলমান ছায়ার দিকে। কুয়াশায় সাদা রুমালটাও অদৃশ্য হয়ে গেছে। সে এখন এত সুখী যে একলা থাকতে ভয় করছে। বারান্দা থেকে লাফিয়ে নেমে মেয়েদের পিছন পিছন ছুটল।

"করছ কি ? কেউ দেখে ফেলতে পারে···" উস্তেংকা বলল।

"ঠিক আছে।"

মারিয়াংকার কাছে ছুটে গিয়ে ওলেনিন তাকে জড়িয়ে ধরল। মারিয়াংকা বাধা দিল না।

"যথেষ্ট চুমো খাওয়া কি এখনও হয় নি ?" উস্তেংকা বলল। "আগে বিয়ে কর, তারপর চুমো খেয়ো। কিন্তু এখনকার মত অপেক্ষা করাই ভাল।"

"শুভরাত্রি মারিয়াংকা, কাল আমি তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাব, তাকে সব কথা বলব। তুমি কিছু বলো না।"

"আমি কেন বলতে যাব!" মারিয়াংকা জবাব দিল।

ছুটি মেয়েই দৌড়তে শুরু করল। যা কিছু ঘটেছে তাই ভাবতে ভাবতে ওলেনিন একাই চলেছে। ঘরের কোণে স্টোভের পাশে তাকে কাছে নিয়ে সারাটা সন্ধ্যা একাই কাটিয়েছে। একমুহূর্তের জন্যও উস্তেংকা কুটির ছেড়ে যায় নি, অন্য সব মেয়ে ও বেলেৎস্কির সঙ্গে সারাক্ষণ হৈ-হৈ করে কাটিয়েছে। ওলোনিন কথা বলেছে মারিয়াংকার কানে কানে।

প্রশ্ন করেছে, "তুমি আমাকে বিয়ে করবে?"

মারিয়াংকা খুশিমনে জবাব দিয়েছে, "তুমি আমাকে ঠকাবে, গ্রহণ করবে না।"

"কিন্তু তুমি কি আমাকে ভালবাস? ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে বল।"

"কেন ভালবাসব না! তুমি তো বাঁকা চোখে তাকাও না," মারিয়াংকা হেসে জবাব দিল; তার শক্ত হাত ওলেনিনের হাতটাকে চেপে ধরল। বলল, "তোমার হাত কত সাদা ও নরম—একেবারে মাখনের মত।"

"মন থেকেই বলছি। বল, তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে?"

"বাবা যদি আমাকে তোমার হাতে দেয় তাহলে বিয়ে করব না কেন?"

"বেশ, তাহলে মনে রেখো, আমাকে যদি ঠকাও তাহলে আমি পাগল হয়ে যাব। কালই তোমার বাবা-মাকে বলব। নিজে গিয়ে বিয়ের প্রস্তাব করব।"

মারিয়াংকা হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠল।

"ব্যাপার কি!"

"ব্যাপারটা খুব মজার মনে হচ্ছে!"

"এটা সত্য! একটা দ্রাক্ষাক্ষেত ও একটা বাড়ি কিনব, কসাক হিসাবে নিজের নাম লেখাব।"

"মনে রেখো, তখন কিন্তু অন্য মেয়ে মানুষের পিছনে ছুটতে পারবে না। সে ব্যাপারে আমি বড়ই কড়া।"

ওলেনিন সানন্দে নিজের মনে কথাগুলি আর একবার উচ্চারণ করল। সে স্মৃতি তার কাছে কখনও এতই বেদনাদায়ক, আবার কখনও এতই আনন্দময় যে তার দম বন্ধ হবার উপক্রম হল। তার সঙ্গে কথা বলার সময় মারিয়াংকা যে আগেকার মতই শান্ত ছিল, মোটেই উত্তেজিত হয়ে ওঠে নি, এটাই তার বেদনার কারণ। মারিয়াংকা যেন তাকে বিশ্বাসই করে নি, ভবিষ্যতের কথা একবারও ভাবে নি। ওলেনিনের মনে হল, মারিয়াংকা তাকে শুধু এই মুহূর্তেই ভালবেসেছে, তাকে নিয়ে ভবিষ্যতে ঘর বাঁধার কথা তার মনেই আসে নি। তবু মারিয়াংকার কথাগুলি তার কাছে সত্য বলে মনে হয়েছে, সে তার হতে সম্মত হয়েছে, এতেই তার যত আনন্দ।

নিজের মনেই বলল, "ঠিক, সে যখন আমার হবে একমাত্র তখনই আমরা

পরস্পরকে বুঝতে পারব। কারণ এ ভালবাসাকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তার জন্ম দরকার জীবন—সারাটা জীবন। কাল সবই পরিষ্কার হয়ে যাবে। এভাবে আর থাকতে পারি না। আগামীকাল সব কথাই বলব তার বাবাকে, বেলেৎস্কিকে, আর গ্রামবাসী সব্বাইকে।"

দুটি বিনিদ্র রজনী কাটাবার পরে সেদিনকার উৎসবে লুকাশ্‌কা এত বেশী মদ গিলল যে জীবনে এই প্রথম তার দুটি পা তাকে ঠিক মত বইতে পারল না, ইয়াশ্‌কার বাড়িতেই সে রাতটা ঘুমিয়ে কাটাল।

অধ্যায়—৪০

পরদিন একটু সকাল-সকালই ওলেনিনের ঘুম ভাঙল; সঙ্গে সঙ্গে আসন্ন কর্তব্যের কথা মনে পড়ে গেল; মনে পড়ল মারিয়াংকাকে চুমো খাবার কথা, তার অমসৃণ হাতের চাপের কথা, আর তার মুখের কথাগুলি: "তোমার হাত দু'খানি কত সাদা!"

লাফ দিয়ে উঠে পড়ল; ইচ্ছা হল, তখনই বাড়িওয়ালার কুটিরে গিয়ে মারিয়াংকার সঙ্গে তার বিয়েতে তাদের সম্মতি প্রার্থনা করবে। এখনও সূর্য ওঠে নি, কিন্তু রাস্তায় যেন বড় বেশী সোরগোল শোনা যাচ্ছে: লোকজন সব কেউ পায়ে হেঁটে, কেউ বা ঘোড়ায় চেপে কথা বলতে বলতে চলেছে। সার্কাসিয়ান কোটটা গায়ে চাপিয়ে সে তাড়াতাড়ি বারান্দায় বেরিয়ে এল। বাড়িওয়ালারা কেউ এখনও জাগে নি। পাঁচজন কসাক উঁচু গলায় কথা বলতে বলতে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। তাদের সামনে তার কাবার্দা ঘোড়ার পিঠে লুকাশ্‌কা। কসাকরা সকলেই হৈ-হৈ করে কথাবার্তা বলছে; ফলে তাদের কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

একজন বলল, "উপরের ঘাঁটিতে ঘোড়া ছুটিয়ে দাও।"

আর একজন বলল, "তাড়াতাড়ি কর; আমাদের ধরে ফেলতে চেষ্টা কর।"

"অন্য ফটক দিয়ে গেলে কাছে হবে।"

"কী যা তা বলছ!" লুকাশ্‌কা চেঁচিয়ে বলল। "আমাদের অবশ্যই যেতে হবে মাঝখানের ফটক দিয়ে!"

"ঠিক, সেই পথে গেলেই সোজা হবে," অন্য একজন কসাক বলল; তার সর্বাঙ্গ ধূলোয় মাখা, ঘোড়াটা ঘামে ভিজে গেছে।

গত রাতে মদ খাবার ফলে লুকাশ্‌কার মুখটা লাল, একটু ফোলা-ফোলা; মাথার টুপিটা পিছন দিকে সরানো। সে কথা বলছে অফিসারের মত ভঙ্গীতে।

অনেক কষ্টে কসাকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ওলেনিন শুধাল, "ব্যাপার

কি ? তোমরা কোথায় যাচ্ছ ?"

"আমরা যাচ্ছি এব্রেকদের ধরতে। তারা পাহাড়ের খাঁজে লুকিয়ে আছে। আমরা সবে যাত্রা করেছি, এখনও যথেষ্ট লোক একত্র হতে পারে নি।" কসাকরা হৈ-চৈ করতে করতে যাচ্ছে, আর ক্রমেই পথ থেকে অনেকে তাদের সঙ্গে জুটে যাচ্ছে। ওলেনিনের মনে হল, এ অবস্থায় তার এখানে বসে থাকাটা ভাল দেখায় না ; তাছাড়া, একটু পরেই তো সে ফিরে আসতেও পারবে। সে পোশাক পরল, বন্দুকে বারুদ ভরল, লাফ দিয়ে ঘোড়ায় চেপে গ্রামের ফটকেই কসাকদের ধরে ফেলল। কসাকরা তখন ঘোড়া থেকে নেমে সঙ্গে আনা ছোট পিপে থেকে একটা পাত্রে চিকির ঢালছে আর পর-পর সকলের হাতে দিচ্ছে ; সকলেই অভিযানের সাফল্য কামনা করে মদ খাচ্ছে। তাদের মধ্যে একটি বাবু গোছের যুবক কর্ণেটও ছিল ; ঘটনাক্রমে সেদিন গ্রামে হাজির থাকায় সেই ন'জন কসাকের এই দলটির নেতা হয়ে বসেছে। কসাকরা সকলেই বেসরকারী সৈনিক, আর কর্ণেটটি একজন কম্যাণ্ডিং অফিসারের ভাব দেখালেও তারা সকলেই লুকাশ্কার কথামতই চলছে।

তারা কেউ ওলেনিনের দিকে নজরই দিল না ; সকলে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যাবার পরে ওলেনিন কর্ণেটের কাছে গিয়ে ব্যাপার কি জানতে চাইল। কর্নেটটি তার সঙ্গে বেশ মুরুব্বির মত ব্যবহার করতে লাগল। অনেক কষ্টে তার কাছ থেকে ওলেনিন আসল ব্যাপারটা জানতে পারল। একদল স্কাউট এব্রেকদের খোঁজে বেরিয়ে গ্রাম থেকে মাইল ছয়েক দূরে কয়েকটি পাহাড়ি লোকের সন্ধান পেয়েছে। তারা একটা খাদের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে, স্কাউটদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছে, জানিয়ে দিয়েছে যে তারা কিছুতেই ধরা দেবে না। এব্রেকদের উপর নজর রাখবার জন্য দুজন কসাককে নিয়ে কর্পোরাল সেখানেই থেকে গেছে, আর একটি কসাককে পাঠিয়েছে আরও লোকজন নিয়ে যেতে।

সূর্য সবে উঠছে। গ্রাম ছাড়িয়ে তিন ভার্স্ট পর্যন্ত চারদিকে ছড়িয়ে আছে তৃণাঞ্চল ; গৃহপালিত পশুর পায়ের দাগে ভর্তি বিশুষ্ক, একঘেয়ে মাঠ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না ; এখানে-ওখানে কিছু শুকনো ঘাসের চাপড়া, কচিৎ পায়ে-চলা কিছু পথ ; আর দূর দিগন্তে দেখা যায় যাযাবর নোগাই জাতিদের কিছু কিছু তাঁবু, কোথাও ছায়া নেই ; সর্বত্র একটা অদ্ভুত রুক্ষতা। তৃণাঞ্চলে সূর্য ওঠে লাল হয়ে, আবার অস্তও যায় লাল হয়ে। যখন ঝড়ো হাওয়া বয়, তখন বড় বড় বালিয়াড়ি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরে যায়। সেদিন সকালবেলাকার মত বাতাস যখন শান্ত থাকে, তখন সম্পূর্ণ নির্বিঘ্ন সেই প্রশান্ত নিস্তব্ধতা সত্যি উল্লেখ করার মত। সকালে সূর্য উঠেছে, তবু তৃণাঞ্চল বড়ই স্তব্ধ ও একঘেয়ে ; বাতাসে কেমন যেন একটা শূন্যতার

অনুভূতি। কিছুই নড়ছে না; শুধু শোনা যাচ্ছে ঘোড়ার পায়ের শব্দ আর হ্রেষা; সেগুলিও বড় দ্রুত দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। ঘোড়া ছুটছে প্রায় নিঃশব্দে। প্রতিটি কসাকের সঙ্গেই তার অস্ত্রশস্ত্র থাকে; কিন্তু তাতে ঠুন্-ঠুন্ ঠক্-ঠক্ কোন শব্দই হয় না। অস্ত্রের ঝন্-ঝন্ শব্দ হওয়াটা একজন কসাকের পক্ষে লজ্জার কথা। গ্রাম থেকে আরও দুজন কসাক তাদের দলে যোগ দিল; কিছু কথাবার্তা হল। লুকাশ্কার ঘোড়াটা হয় হোঁচট খেল, নয় তো ঘাসে তার পা আটকে গেল; ঘোড়াটা চঞ্চল হয়ে উঠল—কসাকদের মধ্যে এটা একটা দুর্ভাগ্যের লক্ষণ; বিশেষ করে এরকম সময়ে এটার গুরুত্ব অনেকখানি। অন্যরা মুখ ফিরিয়ে তাকাল, তারপর যেন খেয়ালই করে নি এমনিভাবে চলতে লাগল। লুকাশ্কা লাগামে টান দিল, চোখে ফুটে উঠল ভ্রূকুটি, দাঁতে দাঁত ঘসল, চাবুকটা তুলল মাথার উপরে। তার চমৎকার কাবার্দা ঘোড়াটা এমনভাবে একবার এ-পায়ে, একবার ও-পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল যেন এই মুহূর্তে পাখা মেলে উড়ে যাবে। কর্নেট বলে উঠল, "আহা, কী চমৎকার অশ্বটি!" ঘোড়ার বদলে অশ্ব কথাটা ব্যবহার বিশেষ প্রশংসারই নিদর্শন।

জনৈক বুড়ো কসাক বলে উঠল, "ঘোড়া তো নয়, একটা সিংহ।"

কসাকরা নিঃশব্দে এগিয়ে চলল; কখনও পায়ে-চলা গতিতে, কখন ও বা কদমে।

প্রায় আট ভার্স্ট পথ ঘোড়া ছুটিয়েও তারা কিন্তু একটিমাত্র নোগাই তাঁবু ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না। প্রায় ভার্স্টখানেক দূর দিয়ে তাঁবুটাকে নিয়ে ধীর গতিতে চলেছে একটা গাড়ি। একটি নোগাই পরিবার তৃণাঞ্চলের একদিক থেকে আর একদিকে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে তাদের দেখা হল চোয়াল-উঁচু, ছিন্নবাস দুটি নোগাই স্ত্রীলোকের সঙ্গে; পিঠের ঝুড়িতে তারা গোবর কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে। কর্নেট তাদের ভাষা জানে না; তবু তাদের কি যেন জিজ্ঞাসা করায় তারা ভয় পেয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। লুকাশ্কা এগিয়ে গিয়ে তাদের সামনে ঘোড়া থামিয়ে কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল। এতক্ষণে স্বস্তি পেয়ে স্ত্রীলোকদুটি খোলা মনে ভাইয়ের মত তার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল।

কসাকরা যেদিকে চলেছে সেইদিকটাই দেখিয়ে তারা বিষণ্ণ গলায় বলল, "আই—আই, কোপ্ এব্রেক।" ওলেনিন বুঝতে পারল যে তারা বলছে "অনেক এব্রেক।"

এ ধরনের হামলা সে কখনও দেখে নি, শুধু ইয়েরশ্কা খুড়োর মুখে গল্প শুনে একটা ধারণা করে নিয়েছে। তাই ওলেনিন দূরে সরে না থেকে কসাকদের সঙ্গে এসেছে সব ব্যাপারটা নিজের চোখে দেখতে। তলোয়ার ও বারুদ ভরা বন্দুকটা সে সঙ্গে করেই এনেছে, কিন্তু যখন বুঝল যে কসাকরা তাকে

এড়িয়ে চলছে তখনই সে স্থির করেছে যে এ-হামলায় সে কোনরকম অংশ নেবে না। সহসা দূরে একটা গুলির আওয়াজ শোনা গেল। কর্ণেট উত্তেজিত হয়ে উঠল; কসাকরা কিভাবে দলে দলে ভাগ হয়ে যাবে, এবং কোন্ দিক থেকে অগ্রসর হবে সে সম্পর্কে হুকুম দিতে শুরু করল। কিন্তু কসাকরা তার হুকুমে কর্ণপাতই করল না; তারা শুধু তাকাল লুকাশ্‌কার দিকে, কান পেতে শুনল তার কথা। লুকাশ্‌কার মুখ ও শরীর শক্ত ও গম্ভীর। সে এত জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল যে অন্যরা তার সঙ্গে তাল রাখতে পারল না; তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে সামনের দিকে তাকিয়ে সে এগিয়ে চলল।

একসময় ঘোড়ার রাশ্‌ টেনে অন্য সকলের সঙ্গে মিলিত হয়ে সে বলল, "ঘোড়ার পিঠে একটি লোককে দেখা যাচ্ছে।"

ওলেনিন ভাল করে তাকাল, কিছুই দেখতে পেল না।

অচিরেই কসাকরা দেখতে পেল দুটি ঘোড়সওয়ারকে; তারা নিঃশব্দে সেই দিকে ঘোড়া চালিয়ে দিল।

"ওরা কি এব্রেক?" ওলেনিন শুধাল।

কসাকরা কোন জবাব দিল না; তাদের কাছে প্রশ্নটা অর্থহীন। ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে নদী পার হয়ে আসবে—এত বোকা এব্রেকরা নয়।

এবার অশ্বারোহী দুজনকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। তাদের দিকে আঙুল বাড়িয়ে লুকাশ্‌কা বলল, "নিশ্চয় বন্ধু রোদ্‌কা আমাদের দেখে হাত নাড়ছে। দেখ, সে এইদিকেই আসছে!"

কয়েক মিনিট পরেই পরিষ্কার বোঝা গেল, অশ্বারোহী দুজনই কসাক স্কাউট। কর্পোরাল এসে দাঁড়াল লুকাশ্‌কার পাশে।

অধ্যায়—৪১

লুকাশ্‌কা শুধু বলল, "তারা কি অনেক দূরে?"

ঠিক সেই সময় প্রায় ত্রিশ পা দূরে একটা গুলির আওয়াজ শোনা গেল। কর্পোরালের মুখে ঈষৎ হাসি।

গুলির দিকে মাথাটা নেড়ে সে বলল, "ওটা আমাদের গুর্কার গুলি।"

আরও কয়েক পা এগিয়ে তারা দেখল, একটা বালিয়াড়ির আড়ালে বসে গুর্কা বন্দুকে বারুদ ঠাসছে। সময় কাটাবার জন্য আর একটা বালিয়াড়ির আড়ালে থাকা এব্রেকদের সঙ্গে সে গুলি-বিনিময় করছে। সেদিক থেকে একটা গুলি হিস্‌-হিস্‌ করে ছুটে এল। কর্ণেটের মুখটা সাদা হয়ে গেল; সে বিচলিত হয়ে পড়ল। লুকাশ্‌কা ঘোড়া থেকে নেমে রাশটা একজন কসাকের হাতে দিয়ে গুর্কার কাছে এগিয়ে গেল। ওলেনিনও ঘোড়া থেকে নেমে উপুড় হয়ে তার পিছু নিল। গুর্কার কাছে পৌছবার আগেই দুটো গুলি তাদের

মাথার উপর দিয়ে শাঁ করে উড়ে গেল। লুকাশ্‌কা হেসে ওলেনিনের দিকে তাকাল। বলল, "ভাল করে নজর রেখো, নইলে ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে দিমিত্রি আন্দ্রীচ। তুমি বরং চলে যাও—এটা তোমার জায়গা নয়।"

কিন্তু ওলেনিন এব্রেকদের দেখতে দৃঢ়সংকল্প। শ' দুই পা দূরে একটা আড়ালে সাদা টুপি ও বন্দুক তার চোখে পড়ল। হঠাৎ ধোঁয়া দেখা গেল, আর তার পরেই একটা বুলেট শাঁ করে বেরিয়ে গেল। পাহাড়ের নীচে একটা জলাভূমিতে এব্রেকরা লুকিয়ে ছিল। ওলেনিনের সব মনোযোগ পড়ল সেদিকে। জায়গাটা তৃণাঞ্চলের অন্য সব জায়গারই মত, কিন্তু ওলেনিনের মনে হল, সেটাই এব্রেকদের ঘাঁটি বানাবার উপযুক্ত জায়গা। লুকাশ্‌কা তার ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেল। ওলেনিন তাকে অনুসরণ করল।

লুকাশ্‌কা বলল, "আমাদের একটা খড়ের গাড়ি যোগাড় করতে হবে, নইলে ওরা আমাদের সব্বাইকে মেরে ফেলবে। ওই যে উঁচু জায়গাটা দেখা যাচ্ছে তার ওপারে নোগাইদের একটা খড়-বোঝাই গাড়ি আছে।" কর্ণেট তার কথা শুনল; কর্পোরালও একমত হল। খড়ের গাড়িটাকে নিয়ে আসা হল; তার আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে কসাকরা সেটাকে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে চলল। ওলেনিন একটা পাহাড়ের মাথায় উঠে গেল; সেখান থেকে সব কিছু দেখা যায়। খড়ের গাড়িটা এগিয়ে চলেছে; তার পিছনে কসাকরা ভিড় করেছে। কসাকরা এগিয়ে গেল, কিন্তু চেচেনরা—সংখ্যায় তারা ন'জন—এক-সারিতে হাঁটু ভেঙে বসে রইল, গুলি করল না।

সব চুপচাপ। হঠাৎ চেচেনদের ভিতর থেকে একটা আর্ত সঙ্গীত ভেসে এল; অনেকটা ইয়েরশ্‌কা খুড়োর "আই দাই, দালালাই"-য়ের মত। চেচেনরা বুঝতে পেরেছে তারা পালাতে পারবে না, তাই যাতে তারা কেউই ভয় পেয়ে পালিয়ে যেতে না পারে সেজন্য একটা পট্টি দিয়ে পরস্পরের হাঁটুর সঙ্গে হাঁটু বেঁধে যার যার বন্দুক হাতে নিয়ে তারা গেয়ে উঠেছে তাদের মৃত্যু-সঙ্গীত।

খড়ের গাড়ির আড়ালে থেকে কসাকরা ক্রমেই তাদের আরও কাছে এগিয়ে চলেছে; ওলেনিন ভাবছে যেকোন মুহূর্তে গুলিবর্ষণ শুরু হবে; কিন্তু সে নিস্তব্ধতা ভাঙল শুধুমাত্র এব্রেকদের শোক-সঙ্গীতে। হঠাৎ গান থেমে গেল; একটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ হল, একটা গুলি এসে লাগল গাড়িটার সামনে, চেচেনদের অভিশাপ ও চীৎকারে নিস্তব্ধতা খান্‌খান্‌ হয়ে ভেঙে গেল, গুলির পর গুলি ছুটতে লাগল, একটার পর একটা বুলেট এসে গাড়িটার উপর পড়ল। কসাকরা কোন গুলি ছুঁড়ল না; ততক্ষণে তারা প্রায় পাঁচ পা দূরে পৌঁছে গেছে।

আরও একমুহূর্ত কেটে গেল—কসাকরা গাড়ির দুই দিক থেকে চীৎকার করে ছুটে বেরিয়ে এল—তাদের সকলের আগে লুকাশ্‌কা। মাত্র কয়েকটা

গুলির শব্দ ওলেনিনের কানে এল ; তারপরেই চীৎকার ও আর্তনাদ। মনে হল, সে যেন ধোঁয়া আর রক্ত দেখতে পেল। কি করছে না বুঝেই সে ঘোড়া ছেড়ে কসাকদের দিকে ছুটে গেল। আতংক বুঝি তাকে অন্ধ করে দিয়েছে। সে কিছুই বুঝতে পারছে না, কিন্তু এটা বুঝল যে সব শেষ হয়ে গেছে। লুকাশ্‌কার মুখখানা কাপড়ের মত সাদা হয়ে গেছে ; একজন আহত চেচেনের হাত চেপে ধরে সে চেঁচিয়ে বলছে, "ওকে মেরে ফেলো না। আমি ওকে জীবন্ত নিয়ে যাব!" এই চেচেনটি সেই লাল-চুল লোক যে লুকাশ্‌কার হাতে নিহত হবার পরে ভাইয়ের লাশটা নিতে এসেছিল। লুকাশ্‌কা তখন তার হাত দুটো বেঁধে ফেলতে ব্যস্ত। হঠাৎ সেই চেচেন নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে রিভালবার থেকে গুলি ছুঁড়ল। লুকাশ্‌কা পড়ে গেল, তার পাকস্থলী থেকে রক্ত ঝরতে লাগল। লাফ দিয়ে উঠেই সে আবার পড়ে গেল ; মুখে রুশ ও তাতার ভাষায় গালাগালি করতে লাগল। রক্তে পোশাক ও মাটি ভিজে গেল। কয়েকজন কসাক ছুটে গিয়ে তার কোমরবন্ধটা ঢিলে করে দিল। তাদের মধ্যে একজন নাজার্কা। সাহায্য করবার আগেই তার হাত-পা কাঁপতে লাগল ; নিজের রক্তমাখা তলোয়ার-খানাকেই খাপের ভিতর ঠিকমত ঢোকাতে পারছিল না।

লাল-চুল, গোঁফ-ছাঁটা চেচেনদের শরীরগুলোকে গুলিবিদ্ধ করে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়েছে। শুধু যে চেচেনটি লুকাশ্‌কাকে গুলি করেছে সেই ক্ষতবিক্ষত দেহে এখনও বেঁচে আছে। আহত বাজপাখির মত রক্তাক্ত দেহে (তার ডান চোখের নীচ থেকে তখনও রক্ত ঝরছে) বিষণ্ণ, ম্লান, গম্ভীর দৃষ্টিতে সে চারদিকে তাকাচ্ছে, দাঁত কড়মড় করছে, হাতের ছুরিটা বাগিয়ে এমনভাবে ওৎ পেতে আছে যেন এখনও আত্মরক্ষায় প্রস্তুত। কর্নেট তাকে পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ ঘুরে তার কানের উপর একটা গুলি করে বসল। চেচেনটি চমকে উঠেই মাটিতে পড়ে গেল।

ঘন ঘন শ্বাস টানতে টানতে কসাকরা মৃতদেহগুলি উল্টে-পাল্টে অস্ত্রগুলি সংগ্রহ করতে লাগল। লুকাশ্‌কাকে গাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল।

হাত-পা ছুঁড়ে'সে চীৎকার করে বলতে লাগল, "না, আমাকে বাধা দিও না। আমি ওকে গলা টিপে মেরে ফেলব। আনা সেনি!"

ওলেনিন ঘোড়ায় চেপে বাড়ি ফিরল। সন্ধ্যায় তাকে বলা হল লুকাশ্‌কা মৃত্যুশয্যায়, কিন্তু নদীর ওপার থেকে আগত একজন তাতার গাছ-গাছড়া দিয়ে তাকে সারিয়ে তুলতে চেষ্টা করছে।

লাশগুলোকে গ্রামের আপিসে নিয়ে যাওয়া হল। স্ত্রীলোক ও ছোট ছেলেরা তাদের দেখতে ভিড় করে দাঁড়াল।

ওলেনিন যখন ফিরে এল তখন অন্ধকার নেমেছে ; যা চোখে দেখেছে তাতে তার মন বড়ই অস্থির। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। মারিয়াংকা

ঘুরে বেড়াচ্ছে ; ঘর থেকে গোয়ালে যাচ্ছে ; টুকিটাকি কাজ করছে । মা গেছে দ্রাক্ষাক্ষেতে, বাবা গেছে আপিসে । মারিয়াংকার হাতের কাজ শেষ হবার আগেই ওলেনিন তার সঙ্গে দেখা করতে গেল । তার দিকে পিঠ রেখে মারিয়াংকা ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল । ওলেনিন ভাবল, সে লজ্জা পেয়েছে ।

বলল, "মারিয়াংকা ! আমি কি ভিতরে যেতে পারি ?"

মারিয়াংকা হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল । তার চোখে প্রায় অদৃশ্য চোখের জলের চিহ্ন ; মুখখানি বিষণ্ণ হলেও সুন্দর । নীরব মর্যাদার সঙ্গে সে ওলেনিনের দিকে তাকাল ।

ওলেনিন আবার বলল : "মারিয়াংকা, আমি এসেছি—"

"আমাকে একা থাকতে দিন !" মারিয়াংকা বলল । তার মুখের কোন পরিবর্তন হল না, কিন্তু দুই গাল বেয়ে নামল অশ্রুর ধারা ।

"তুমি কাঁদছ কেন ? কি হয়েছে ?"

"কি হয়েছে ?" কঠিন কণ্ঠে সে বলল । "আমাদের কসাকদের খুন করেছে ; এই হয়েছে ।"

"লুকাশ্‌কার কথা বলছ ?" ওলেনিন বলল ।

"এখান থেকে চলে যান ! কি চান আপনি ?"

তার কাছে গিয়ে ওলেনিন ডাকল, "মারিয়াংকা !"

"আপনি কোনদিন আমার কাছ থেকে কিছু পাবেন না !"

"মারিয়াংকা, ওকথা বলো না," ওলেনিনের গলায় মিনতি ।

"চলে যান । আপনি অসহ্য হয়ে উঠেছেন !" পা ঠুকে চীৎকার করে কথাটা বলে মারিয়াংকা তার দিকে এগিয়ে গেল । তার চোখে-মুখে যে ঘৃণা, যে বিদ্বেষ, যে ক্রোধ প্রকাশ পেল তা দেখে ওলেনিন সহসা বুঝতে পারল, তার আর কোন আশা নেই ; প্রথম দৃষ্টিতেই এই নারীকে যে অপ্রাপনীয়া বলে তার মনে হয়েছিল সেটা সম্পূর্ণ ঠিক ।

ওলেনিন আর একটি কথাও বলল না ; কুটির থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল ।

অধ্যায়—৪২

বাড়ি ফিরে দু' ঘণ্টা সে চুপচাপ বিছানায় শুয়ে কাটাল । তারপর কোম্পানি কম্যাণ্ডারের কাছে গিয়ে সেনাদলের সঙ্গে যোগ দেবার অনুমতি চেয়ে নিল । বাড়িওয়ালার হিসাবপত্র মিটিয়ে দিতে ভানিয়ুশাকে পাঠিয়ে দিল, আর কারও কাছ থেকে বিদায় না নিয়েই যে দুর্গে তখন তাদের বাহিনী অবস্থান করছিল সেখানে যাবার জন্য প্রস্তুত হল । শুধু ইয়েরশ্‌কা খুড়োই তাকে বিদায় জানাতে এল । দুজনে এক দফা মদ খেল, তারপর দ্বিতীয়

দফা, তারপর আর এক দফা। মস্কো ছেড়ে আসার দিন রাতের মতই আজও দরজায় দাঁড়িয়ে আছে একটি তিন-ঘোড়ার ডাকগাড়ি। কিন্তু সে-দিনের মত আজ ওলেনিনের মনে নিজেকে নিয়ে কোন ভাবনা-চিন্তা নেই। নেই কোন নতুন জীবনের আশ্বাস। মারিয়াংকার প্রতি তার ভালবাসা আজ আরও বেশী হয়ে দেখা দিয়েছে; যদিও সে জানে, মারিয়াংকার ভালবাসা সে কোনদিন পাবে না।

ইয়েরশ্‌কা খুড়ো বলল, "আচ্ছা, তাহলে বিদায় গো ছেলে! যখনই কোন অভিযানে যাবে বুদ্ধিমানের মত কাজ করো, আমার কথাগুলি মনে রেখো—একটি বুড়ো মানুষের কথা। যখন কোন হামলা করতে যাবে, বা ঐ ধরনের কোন কাজে যাবে (তুমি তো জান আমি একটা বুড়ো নেকড়ে, অনেক কিছুই দেখেছি), আর অপর পক্ষ যখন গুলি ছুঁড়তে থাকবে, তখন কোন ভিড়ের মধ্যে, অনেক লোকের জমায়েতের মধ্যে থেকো না। যখন ভয় পাও তখন তো তোমরা চেষ্টা কর অন্য সকলের সঙ্গে মিশে যেতে। মনে কর, লোক যত বেশী হয় ততই ভাল, কিন্তু সেটাই সব চাইতে খারাপ। শত্রুরা সব সময়ই ভিড়কে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। কি জান, আমি সব সময় অন্যদের কাছ থেকে দূরে থাকতাম, একলা চলতাম, আর তাই কোনদিন আহত হই নি। অথচ আমাদের কালে কত কীই না দেখেছি বল?"

ঘরটা পরিষ্কার করতে করতে ভানিয়ুশা বলল, "কিন্তু তোমার পেঠে তো একটা বুলেটের দাগ আছে।"

"ওটা কসাকদের ঠাট্টার ফল," ইয়েরশ্‌কা জবাব দিল।

"কসাকদের? সেটা কি ব্যাপার?" ওলেনিন শুধাল।

"আরে, ব্যাপারটা এই। আমরা মদ গিলছিলাম। ভাংকা সিৎকিন নামে এক কসাক খুশির চোটে ব্যাং করে ঠিক এইখানে বসাল পিস্তলের এক গুলি।"

"আচ্ছা! তুমি আহত হয়েছিলে?" ওলেনিন শুধাল। "আরে ভানিয়ুশা, তোমার তৈরি হতে আর কত দেরি?"

"এত তাড়া কিসের? তোমাকে সব কথা বলতে দাও···সে তো গুলি করল, কিন্তু বুলেটে আমার হাড় ভাঙল না, আটকে গেল। তখন আমি বললাম: তুমি আমাকে খুন করেছ ভাই। কি করেছ বল তো? কিন্তু আমি তোমাকে ছাড়ব না! এক বালতি মদ আমাকে খাওয়াতেই হবে!"

সেকথায় কান না দিয়ে ওলেনিন আবার শুধাল, "আচ্ছা, তোমার লাগে নি তো?"

"আমাকে শেষ করতে দাও। সে তো এক বালতি মদ নিয়ে এল, আমরাও খেলাম, কিন্তু রক্ত পড়তেই লাগল। সারা ঘর রক্তে ভেসে গেল। তখন বুড়ো দাদু বুর্লাক বলল, 'এ ছোকরা দেখছি ভূতকেও তাড়িয়ে ছাড়বে।

ওকে এক বোতল মিষ্টি মদ খাওয়াও, নইলে আমরা তোমার বিচার করব !' অতএব আরও মদ এল, আর আমরাও ঢক্ ঢক্ করে গিলতে লাগলাম—"

"তা তো বুঝলাম, কিন্তু তোমার কি খুব লেগেছিল ?" ওলেনিন পুনরায় জিজ্ঞাসা করল।

"লেগেছিল ? মাইরি আর কি! কথার মাঝখানে বাধা দিও না। আমি পছন্দ করি না। আমাকে শেষ করতে দাও।...সকাল পর্যন্ত চলল সেই ঢুকু-ঢুকু-ঢালি ; তারপরে মাতাল হয়ে স্টোভের উপরেই ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখনও সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারি না—"

ওলেনিন আবার শুধাল, "খুব কষ্ট পেয়েছিলে কি ?"

"আমি কি বলেছি যে কষ্ট পেয়েছিলাম ? কষ্টের কথা তো বলি নি, শুধু বলেছি যে উপুড় হতে পারছিলাম না, আর হাঁটতেও পারছিলাম না।"

"তারপর সেরে গেল তো ?" ওলেনিন শুধাল।

"ঘা শুকিয়ে গেল, কিন্তু বুলেটটা ভিতরেই থেকে গেল। হাত দিয়ে দেখ!" শার্টটা তুলে সে তার চওড়া পিঠটা দেখাল ; হাড়ের পাশেই বুলেটটাকে হাত দিয়ে বোঝা যায়।

খেলনার মতই বুলেটটাকে নাড়তে নাড়তে সে বলল, "দেখ, কি রকম নড়ছে। দেখ, এখন ঠিক পিঠের উপরে উঠে এসেছে।"

"আর লুকাশ্কা ? সে কি ভাল হয়ে উঠবে ?" ওলেনিন শুধাল।

"সেটা ঈশ্বরই জানেন! ডাক্তার তো নেই। একজনকে আনতে লোক গেছে।"

"কোথা থেকে ডাক্তার আনবে ? গ্রোজ্নায়া থেকে ?" ওলেনিন শুধাল।

"নারে বাবা। আমি যদি জার হতাম তাহলে তোমাদের সব রুশ ডাক্তারকে অনেক আগেই ফাঁসিতে ঝোলাতাম। তারা তো শুধু কাটাকাটি করতেই জানে! ওই তো, আমাদের কসাক বাকলাশেভকেই দেখ না ; পাটা কেটে ফেলার পর থেকে সে তো আর আগেকার সে মানুষটিই নেই। তাতেই বোঝা যায় লোকগুলো কী বোকা! এখন আর বাকলাশেভ কোন্ কাজে লাগবে ? না হে বাপু, পাহাড়ি অঞ্চলে সত্যিকারের ভাল ডাক্তার আছে। আমার বন্ধু গির্চিক একবার এক অভিযানে বেরিয়ে বুকের ঠিক এইখানে আঘাত পেয়েছিল। তারপর, তোমাদের ডাক্তাররা তো হালই ছেড়ে দিল, কিন্তু ঐ পাহাড় থেকে একজন এসে তাকে সারিয়ে তুলল! তারা সব গাছ-গাছড়া চেনে হে বাপু!"

ওলেনিন বলল, "বাজে কথা রাখ! আমি বরং হেডকোয়ার্টার থেকে একজন ডাক্তারকে ডেকে পাঠাচ্ছি।"

বুড়ো ঠাট্টা করে বলল, "রাবিশ! বোকা, বোকা! রাবিশ! তুমি

ডাক্তার আনবে !—তোমাদের ডাক্তাররা যদি লোককে সারাতে পারত, তাহলে তো কসাক ও চেচেনরা চিকিৎসার জন্য তোমাদের কাছেই যেত ; কিন্তু আসলে কি হয়, তোমাদের অফিসার ও কর্নেলরাই পাহাড়ি অঞ্চল থেকে ডাক্তারদের নিয়ে আসে। তোমাদের ডাক্তাররা সব নকল, সব মেকি !"

ওলেনিন জবাব দিল না। শুধু এই কথাটাই পুরোপুরি মেনে নিল, যে-জগতে সে একদিন বেঁচেছিল এবং আজ আবার ফিরে যাচ্ছে তার সবটাই ফাঁকি।

"লুকাশ্‌কা কেমন আছে ? তুমি কি তাকে দেখতে গিয়েছিলে ?" সে শুধাল।

"সে তো মরার মত পড়ে আছে। কিছুই খায় না, পান করে না। একমাত্র ভদ্‌কা খায়। তবে যতক্ষণ ভদ্‌কা খাচ্ছে ততক্ষণ সব ঠিক আছে। ছেলেটাকে হারালে আমি খুব দুঃখ পাব। বড় ভাল ছেলে—সাহসী, ঠিক আমার মত। একবার আমিও ঐরকম মরতে বসেছিলাম। বুড়িরা সব কান্না জুড়ে দিয়েছিল। মনে হত, মাথার ভিতরে যেন আগুন জ্বলছে। এমন কি সকলে আমাকে পবিত্র দেবমূর্তির নীচে শুইয়েও দিয়েছিল। আমি তো সেখানে শুয়ে আছি, উপরে স্টোভের মাথায় ছোট ছোট বাজিয়েরা ঢাক বাজাতে শুরু করল। আমি চেঁচিয়ে উঠতে তারা আরও জোরে বাজাতে লাগল। (বুড়ো হাসল।) মেয়েরা পুরোহিতকে নিয়ে এল। আমাকে কবর দেবার আয়োজন করা হল। সকলে বলল, 'অবিশ্বাসীদের সঙ্গে থেকে সে নিজেকে অপবিত্র করেছে ; মেয়েদের নিয়ে ফূর্তি করেছে ; মানুষ খুন করেছে ; উপবাস করে নি, আর বালালাইকা বাজিয়েছে। তোমার পাপ স্বীকার কর।' তারা বলল। আমিও স্বীকার করলাম। বললাম, 'আমি পাপ করেছি।' পুরোহিত যাই বলে অমনি আমি জবাব দেই, 'আমি পাপ করেছি।' —যাক গে সেসব কথা ; হ্যাঁ, যা বলছিলাম। আমার কথা শোন, সব সময় ভিড় থেকে দূরে থাকবে, নইলে অকারণেই প্রাণটি হারাবে। আসল কথা, আমি তোমাকে ভালবাসি। তুমি মাতাল—আমি তোমাকে ভালবাসি।"

"আচ্ছা, তোমাকে ধন্যবাদ ! বিদায় খুড়ো। ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে আবার আমাদের দেখা হবে।" বারান্দায় যেতে যেতে ওলেনিন বলল। বুড়ো মেঝের উপরেই বসেছিল। উঠল না।

শুধু বলল, "তোমরা কি এইভাবে 'বিদায়' নাও না কি ? বোকা, বোকা ! হায়রে, মানুষের এ কী হাল হয়েছে ! দুজন একসঙ্গে ছিলাম, প্রায় এক বছর একসঙ্গে কাটালাম, আর এখন 'বিদায় !' বলেই সটান প্রস্থান ! আরে, তোমাকে আমি ভালবাসি, করুণা করি ! তুমি এত নিঃসঙ্গ, সব সময় একা, একেবারে একা ! মনে হয় কেউ তোমাকে ভালবাসে না। অনেক

সময় তোমার কথা ভেবে আমার ঘুম হয় না। তোমার জন্য দুঃখ হয়। সেই যে একটা গান আছে:

দূর বিদেশে বাস,
সে বড় কষ্টরে ভাই।

তোমারও সেই অবস্থা।"

"আচ্ছা, বিদায়," ওলেনিন আবার বলল।

এবার বুড়ো উঠল; হাতটা বাড়িয়ে দিল। ওলেনিন সে হাতের উপর চাপ দিয়ে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াল।

"মুখটা বাড়াও!" ওলেনিনের মাথাটা দুই হাতে চেপে ধরে ভিজে গোঁফ ও ঠোঁট বুলিয়ে বুড়ো তিনবার তাকে চুমো খেল; তারপর কেঁদে ফেলল।

"আমি তোমাকে ভালবাসি, বিদায়!"

ওলেনিন ডাকগাড়িতে উঠে বসল।

"আচ্ছা, তুমি কি এইভাবেই চলে যাবে নাকি? তোমাকে মনে রাখার মত একটা কিছু তো আমাকে দিয়ে যেতেও পারতে। তোমার একটা বন্দুক আমাকে দাও। দুটো দিয়ে তুমি কি করবে?" ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বুড়ো বলল।

ওলেনিন একটা বন্দুক তুলে তাকে দিল।

ভানিয়ুশা বিড়বিড় করে বলল, "বুড়োটাকে আপনি যে কত জিনিসই দিলেন। ওর আশা আর মেটে না! সত্যিকারের একটা বুড়ো ভিখারি! ওরা সবই এই রকম," ওভারকোটে শরীর ঢেকে বক্সের উপর চড়ে বসতে বসতে সে বলল।

"জিভ সামলে কথা বলরে শুয়োর," বুড়ো হেসে বলল। "কী হাড়-কিপ্টে লোকরে বাবা!"

মারিয়াংকা গোয়াল থেকে বেরিয়ে এল, উদাস চোখে ডাকগাড়িটার দিকে তাকাল, তারপর অভিবাদন জানিয়ে ভিতরে যাবার জন্য পা বাড়াল।

"বিদায় গো মেয়ে!" চোখ টিপে কথাটা বলে ভানিয়ুশা বোকার মত হাসতে লাগল।

"গাড়ি ছেড়ে দাও!" ওলেনিন রেগে চেঁচিয়ে উঠল।

"বিদায় হে বাপু, বিদায়! আমি তোমাকে ভুলব না!" ইয়েরশ্‌কা চেঁচিয়ে বলল।

ওলেনিন ফিরে তাকাল। ইয়েরশ্‌কা কথা বলছে মারিয়াংকার সঙ্গে; নিশ্চয় তার নিজের কথাই বলছে; বুড়ো লোকটি বা মেয়েটি কেউই ওলেনিনের দিকে তাকাল না।

জমিদারের সকাল

A Landlord's Morning

(অসমাপ্ত উপন্যাস A Russian Landlord-এর প্রথম অংশ)

অধ্যায়—১

বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় পাঠক্রম শেষ করে গ্রীষ্মের ছুটিতে প্রিন্স নেখ্‌লয়ুদভ তাদের জমিদারিতে গেল এবং পুরো গ্রীষ্মকালটা একা একা সেখানে কাটাল। তার বয়স তখন উনিশ বছর। সেবছর হেমন্তকালে ছেলেমানুষী কাঁচা হাতের লেখায় সে তার মাসি কাউন্টেস বেলোরেৎস্কিকে একটা চিঠি লিখল। তার বিবেচনায় এই মাসি তার শ্রেষ্ঠ বন্ধু এবং পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে বুদ্ধিমতী মহিলা। ফরাসী ভাষায় লেখা চিঠিটা ছিল এই রকম :

"প্রিয় মাসি,

আমি এমন একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যাতে আমার জীবনের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়ে যাবে। জমিদারির কাজে আত্মনিয়োগ করবার জন্য আমি বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দিচ্ছি, কারণ আমার মনে হচ্ছে, এই কাজের জন্যই আমি জন্মেছি। ঈশ্বরের দোহাই মাসি, তুমি হেসো না। তুমি বলবে আমি ছেলে-মানুষ, হয়তো আমি এখনও ছোট ছেলেটিই আছি, কিন্তু সেটা তো আমি কি কাজ করব—আমি যে ভাল হতে চাই, যা কিছু ভাল তাকে ভালবাসতে চাই—তাতে কোন বাধা হবার কথা নয়।

আগেও তোমাকে লিখেছি, এখানকার অবস্থা এতই বিশৃংখল যে তা বর্ণনার অতীত। এখানে শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে এবং এখানকার অবস্থাকে ভাল করে বুঝতে গিয়ে এটুকু বুঝতে পেরেছি যে চাষীদের শোচনীয় দারিদ্র্যই এর প্রধান কারণ, আর কেবলমাত্র কাজ ও ধৈর্যের পথেই তার প্রতিকার সম্ভব। আমার দুজন চাষী ডেভিড ও আইভানকে যদি দেখ, কি-ভাবে তারা ও তাদের পরিবারের লোকরা বেঁচে আছে তা যদি দেখ, তাহলে আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে আমার এই অভিপ্রায়ের কথা তুমি খুব ভালভাবেই বুঝতে পারবে। যে সাতশ' লোকের জন্য ঈশ্বরের কাছে জবাব-দিহি করতে আমি বাধ্য তাদের ভালর জন্য চেষ্টা করা কি আমার পবিত্র ও প্রত্যক্ষ কর্তব্য নয়? নিজের সুখের জন্য, উচ্চাকাংখার জন্য এই মানুষগুলিকে কড়া মেজাজের গ্রাম-প্রধান ও নায়েবদের খেয়াল-খুশির হাতে ছেড়ে দেওয়া কি পাপ নয়? আর এমন একটা মহৎ, উজ্জ্বল ও আশু কর্তব্য হাতের কাছে থাকতে তাদের ভাল করবার, তাদের কাজে লাগবার জন্য সুযোগ আমি

খুঁজতে যাব কেন? আমি জানি, একজন ভাল জমিদার হবার যোগ্যতা আমার আছে; আর আমি যতদূর বুঝেছি, তোমরা আমার জন্ম বিশ্ব-বিদ্যালয়ের যে ডিপ্লোমা অথবা সরকারী পদমর্যাদা কামনা কর, ভাল জমিদার হবার জন্ম তার কোনটারই দরকার নেই। প্রিয় মাসি, আমাকে নিয়ে তোমরা কোনরকম উচ্চাভিলাষ পোষণ করো না; তোমরা মেনে নিতে চেষ্টা কর যে আমি একটা সম্পূর্ণ বিশেষ পথ বেছে নিয়েছি; আমি মনে করি, পথটা ভাল, আর এই পথেই আমি সুখের দেখা পাব। আমার ভবিষ্যৎ কর্তব্য নিয়ে আমি অনেক, অনেক ভেবেছি এবং নিজের জন্ম একটা কর্ম-নীতি লিখেও ফেলেছি; আর ঈশ্বর যদি আমাকে জীবন ও শক্তি দান করেন তাহ'লে আমার এই প্রচেষ্টায় আমি সফল হবই।

"আমার ভাই ভাসিয়াকে এই চিঠিটা দেখিও না: তার ঠাট্টাকে আমি ভয় করি। সে অভ্যস্ত আমার উপর সর্দারি করতে, আর আমি অভ্যস্ত সেটা মেনে নিতে। আর ভানিয়া যদি আমার এই অভিপ্রায়কে সমর্থন নাও করে, সে এটাকে বুঝতে অন্তত পারবে।''

কাউণ্টেস এই চিঠির যে জবাব দিল ফরাসী ভাষায় তারও তর্জমা এখানে দেওয়া হল:

"প্রিয় দিমিত্রি, তোমার চিঠি শুধু এইটুকুই প্রমাণ করে যে তোমার মনটা আশ্চর্য রকমের ভাল, আর সেটা আমি আগে থেকেই জানি। কিন্তু বাবা, সৎগুণগুলিই আমাদের জীবনে অসৎগুণের চাইতে বেশী ক্ষতি করে। আমি একথা বলব না যে তুমি বোকার মত কাজ করছ এবং তোমার কাজে আমি দুঃখিত; আমি শুধু ব্যাপারটা তোমাকে বোঝাতে চেষ্টা করব। এস, আমরা বিষয়টা ভাল করে বিবেচনা করে দেখি। তুমি বলছ, গ্রামের জীবনের প্রতি তুমি আকৃষ্ট হয়েছ, তোমার ভূমিদাসদের সুখী করতে চাও, একজন ভাল মালিক হতে চাও। আমি বলতে চাই: প্রথমত, একবার ভুল করলে তবেই আমরা জীবনের প্রকৃত লক্ষ্যকে বুঝতে পারি: দ্বিতীয়ত, অন্তের চাইতে নিজেকে সুখী করা অনেক বেশী সহজ, আর তৃতীয়ত, ভাল জমিদার হতে হলে যেরকম শীতল-হৃদয় গুরুগম্ভীর লোক হওয়া দরকার, যতই চেষ্টা কর না কেন তা তুমি কোন দিন হতে পারবে না।

"তুমি মনে করছ যে তোমার যুক্তি অখণ্ডনীয়, এমন কি সেগুলিকে জীবনের মূলনীতি হিসাবে গ্রহণও করেছ, কিন্তু বাবা, আমার এই বয়সে এসে কেউ যুক্তি ও নীতিতে বিশ্বাস করে না, বিশ্বাস রাখে অভিজ্ঞতার উপর; আর সেই অভিজ্ঞতাই আমাকে বলে দিচ্ছে যে তোমার পরিকল্পনা-গুলি নেহাৎই ছেলেমানুষি। আমার বয়স প্রায় পঞ্চাশ হতে চলল, অনেক ভাল-ভাল লোক আমি দেখেছি, কিন্তু এমন কথা কখনও শুনি নি যে ভাল হবার জন্ম কোন সদ্বংশের সক্ষম যুবক নিজেকে গ্রামের মধ্যে আটকে

রেখেছে। তুমি সব সময়ই মৌলিক হতে চাও, কিন্তু তোমার মৌলিকতা আসলে নিজেকে অত্যধিক বড় করে দেখা ছাড়া আর কিছুই না। আমার কথা মানো বাবা, চিরাচরিত পথে চলাটাই ভাল। সেই পথেই সহজে সাফল্য আসে, আর তুমি যদি নিজের জন্য সাফল্য নাও চাও, তবু নিশ্চয় জেনো, মানুষের যে উপকার তুমি করতে চাও তার জন্যও সাফল্য অপরিহার্য।

"কিছু কিছু চাষীর দারিদ্র্য হয় অপরিহার্য আর না হয় তো এমন কিছু সমাজের প্রতি, আত্মীয়স্বজনের প্রতি, ও তোমার নিজের প্রতি যেসব দায়-দায়িত্ব তোমার আছে সেগুলিকে বিস্মৃত না হয়েও যার প্রতিকার করা যেতে পারে। তোমার যে বুদ্ধি, হৃদয়বত্তা ও মানবকল্যাণবোধ আছে তাতে এমন কোন জীবিকা নেই যাতে তুমি সাফল্যলাভ করতে পারবে না; কিন্তু অন্তত এমন একটা জীবিকা তোমাকে বেছে নিতে হবে যেটা তোমার উপযুক্ত এবং যা তোমাকে এনে দেবে সম্মান।

"তুমি যখন বল যে তোমার কোন উচ্চাকাংখা নেই তখন তোমার আন্তরিকতায় আমি বিশ্বাস করি; কিন্তু আসলে তুমি নিজেকেই ঠকাচ্ছ। তোমার যা বয়স, তোমার যা সামর্থ্য তাতে উচ্চাকাংখা একটি সৎগুণ, যদিও সেই উচ্চাকাংখাকে পূর্ণ করবার শক্তি যখন মানুষ হারিয়ে ফেলে তখন সেটাই হয়ে ওঠে একটা ত্রুটি, হয়ে ওঠে নীচতা। তোমার মনোভাব যদি না বদলাও তাহলে সেই অভিজ্ঞতাই তোমার হবে।

"বিদায় প্রিয় দিমিত্রি। মনে হচ্ছে, তোমার এই অবাস্তব অথচ মহৎ ও উদার পরিকল্পনার জন্য তোমাকে বুঝি আমি আগের চাইতেও বেশী ভালবেসে ফেলছি। তুমি যা ভাল বোঝ তাই করো, কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে একমত হতে পারছি না।"

এই চিঠি পাবার পরে যুবকটি এ নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ভাবল, এবং শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী নারীরও ভুল হতে পারে; তাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নাম খারিজের আবেদন-পত্র পাঠিয়ে দিয়ে সে জমিদারিতেই স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করল।

অধ্যায়—২

তরুণ জমিদারটি মাসির চিঠিতেই লিখেছিল যে, জমিদারি পরিচালনা এবং সাধারণভাবে জীবন চালাবার কতকগুলি বিধান সে তৈরি করে ফেলেছে, আর বিভিন্ন কাজের জন্য ঘণ্টা, দিন ও মাসও নির্দিষ্ট করে ফেলেছে। ঠিক হয়েছে, রবিবারগুলোতে সব আবেদনকারীদের—বাড়ির ও অন্য ভূমিদাসদের সঙ্গে দেখা করবে, গরীব চাষীদের মধ্যে যেসব জমি বিলি করা হয়েছে সেগুলো পরিদর্শন করবে এবং গ্রাম কম্যুনের (মির)

সম্মতিক্রমে তাদের জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা করবে। এই সব কম্যুনের সভা বসে প্রতি রবিবার সন্ধ্যায়, আর তারাই স্থির করে কাকে কতটা সাহায্য দেওয়া হবে।

এই সব কাজকর্মে এক বছরের বেশী সময় কেটে গেছে। জমিদারি পরিচালনার ব্যাপারে বাস্তব জ্ঞানে বা নীতিগত জ্ঞানে যুবকটি এখন আর নেহাৎ একজন শিক্ষানবীশ নেই।

জুন মাসের একটি উজ্জ্বল সকালে কফি খাওয়া শেষ করে এবং Maison Rustique-এর কয়েকটি অধ্যায়ে চোখ বুলিয়ে নেখ্‌লয়ুদভ তার হাল্কা ওভারকোটের পকেটে একটা নোট-বই ও এক বাণ্ডিল রুবল-নোট ভরে সারি সারি স্তম্ভ ও বারান্দাওয়ালা বড় কাঠের বাড়িটা থেকে বেরিয়ে পড়ল। এই বাড়ির একতলার একটা ছোট ঘরে সে থাকে। ইংরেজি কায়দার পুরনো বাগানের অপরিষ্কার, আগাছাভরা পথ ধরে সে এগিয়ে চলল বড় রাস্তার দুই পাশে অবস্থিত গ্রামটার দিকে। নেখ্‌লয়ুদভ যুবক, দীর্ঘ সুগঠিত দেহ, মাথায় কোকড়ানো ঘন বাদামী চুল, কালো চোখে উজ্জ্বলতার ঝিলিক, ফর্সা রং, আর গোলাপী ঠোঁটের উপর যৌবনের প্রথম গোঁফের রেখা সবে দেখা দিয়েছে। প্রতিটি চলনে-বলনে যৌবনোচিত শক্তি, উৎসাহ, ও সহজ আত্মতুষ্টি যেন উপচে পড়ছে। রবিবারের সেরা পোশাকে সজ্জিত চাষীরা—বৃদ্ধ, কুমারী, ছেলেমেয়ে, আর শিশু কোলে নারী—বিচিত্র দলে ভাগ হয়ে গির্জা থেকে ফিরছে; নীচু হয়ে মনিবকে অভিবাদন জানিয়ে তার পথ থেকে সরে গিয়ে যার যার বাড়িতে ঢুকে যাচ্ছে। রাস্তা ধরে কিছুটা এগিয়ে নেখ্‌লয়ুদভ থামল; নোট-বইটা বের করে শেষের পাতাটা দেখল; সেখানে তার কাঁচা হাতে মন্তব্যসহ কয়েকটি চাষীর নাম লেখা রয়েছে: "আইভান চিউরিস ঠেকনো চেয়েছে," এই কথাটা পড়ে সে ডানহাতি দ্বিতীয় কুড়ে ঘরটার ফটকে গিয়ে দাঁড়াল।

চিউরিসদের বাড়ি বলতে একটা আধ-পচা কাঠের ঘর; কোণায় কোণায় ছাতা ধরেছে, একটা দিক কাত হয়ে মাটির দিকে এমনভাবে বসে গেছে যে অর্ধেক খোলা ভাঙা শার্শি-পাল্লার ছোট জানালাটা, আর তার চাইতেও ছোট দড়ি দিয়ে বাঁধা কাঠের জানালাটা কোনরকমে সারের গাদার ঠিক উপরে ঝুলে আছে। মূল বাড়িটার সঙ্গে যুক্ত আর একটা নীচু দরজাওয়ালা ঢাকা বারান্দা আছে, তার চাইতেও নীচু আরও পুরনো একটা ছোট ঘর আছে, একটা ফটক আছে, ও একটা কঞ্চির চালা-ঘর আছে। এ সব কিছুই একসময় একটা ছাদ দিয়ে ঢাকা ছিল, কিন্তু এখন শুধু ছাচের দিকগুলিতেই কিছু কিছু ঘন, কালো, পচা খড় ঝুলে আছে, আর বাকি সব জায়গাতেই কড়ি-বরগাগুলি বেরিয়ে পড়েছে। উঠোনের সামনে একটা ছোট কুয়ো আছে; তার চারপাশ ভেঙে গেছে, একটা খুঁটি ও কপিকলের

ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে, আর গরু-মোষের চলাচলে নোংরা একটা ডোবার জলে হাঁসগুলো খেলা করে বেড়াচ্ছে। কুয়োর পাশে দুটো উইলো গাছ দাঁড়িয়ে আছে ; তাদের ডালপালা কেটে ফেলা হয়েছে ; তবু কিছু কিছু ঈষৎ সবুজ পাতা নতুন করে গজিয়েছে। দেখেই বোঝা যায় যে একসময়ে কেউ জায়গাটাকে সুন্দর করে সাজাবার চেষ্টা করেছিল। তারই একটা গাছের নীচে একটি বছর আষ্টেকের মেয়ে বসে আছে, আর একটি দু' বছরের মেয়ে তার চারপাশে হামাগুড়ি দিচ্ছে। একটা কুকুরের বাচ্চা তাদের সঙ্গেই খেলা করছিল ; এবার নেখ্‌ল্যুদভকে দেখতে পেয়ে একছুটে ফটকের কাছে গিয়ে ভয় পেয়ে তারস্বরে ঘেউ-ঘেউ করতে শুরু করল।

"আইভান বাড়ি আছ নাকি ?" নেখ্‌ল্যুদভ হাঁক দিল।

ডাক শুনে বড় মেয়েটি ভয় পেয়ে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল, কোন কথা বলল না। ছোটটি হাঁ করে কেঁদে উঠবার উপক্রম করল। ছেঁড়া ডোরা-কাটা গাউন ও লাল রঙের একটা পুরনো মেখলা পরা বুড়িমত একটি স্ত্রীলোক দরজার পিছন থেকে মুখ বের করল, কিন্তু সেও কোন জবাব দিল না। নেখ্‌ল্যুদভ দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে আর একবার প্রশ্নটা করল।

বৃদ্ধাটি আভূমি নত হয়ে অত্যন্ত ভীত ও উত্তেজিতভাবে কাঁপা গলায় বলল, "আছে কর্তা।"

তাকে সম্ভাষণ জানিয়ে নেখ্‌ল্যুদভ একটু এগিয়ে ছোট উঠোনে পা দিল। বৃদ্ধা দরজা পর্যন্ত এগিয়ে হাতের উপর থুত্‌নি রেখে মনিবকে দেখতে লাগল আর ধীরে ধীরে মাথাটা নাড়তে লাগল।

উঠোনটা অত্যন্ত নোংরা। এখানে-সেখানে পচা কালো সার ছড়িয়ে পড়ে আছে ; আর আছে একটা পচা কাঠের গুঁড়ি, একটা উকনঠেঙ্গা ও দুটো বিদে মই। উঠোনের চারদিককার ছাদে খড় নেই বললেই চলে ; তার একটা দিক এমনভাবে পড়ে গেছে যে কড়িগুলো খুঁটির উপর না থেকে একেবারে সারের স্তূপের উপর নেমে এসেছে। আর এক কোণে পড়ে আছে একটা কাঠের লাঙল, চাকাবিহীন একটা গাড়ি, আর একগাদা ফাঁকা, অকেজো মৌচাক একটার পর একটা স্তূপ করে রাখা। কঞ্চির বেড়াটা চালার চাপে ভেঙে পড়ার উপক্রম হওয়ায় চিউরিস তার কুড়ুলের হাতলটাকে ঠেকা দিয়ে সেটাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে। চাষী আইভান চিউরিস-এর বয়স প্রায় পঞ্চাশ বছর ; সাধারণের চাইতে একটু বেঁটে। মাথার চুল ঘন বাদামী, তাতে সাদার ছিটে লেগেছে ; রোদে-পোড়া ডিমের মত সুন্দর মুখে ঐ একই রঙের দাঁড়ি। আধ-বোজা গাঢ় নীল চোখ দুটিতে বুদ্ধি ও সরল সৎ স্বভাবের প্রকাশ ; সে যখন হাসে, তখন পাৎলা গোঁফের নীচে ছোট মুখখানিতে ফুটে ওঠে শান্ত আত্মবিশ্বাস ও পরিবেশের প্রতি এক ধরনের বিদ্রূপাত্মক উদাসীনতা। তার চামড়ার রুক্ষতা, গভীর বলীরেখা,

গলা, মুখ ও বাহুর সুস্পষ্ট মাংসপেশী, ঘাড় দুটির অস্বাভাবিক ঝুঁকে পড়া, আর বেঁকে-যাওয়া দুটি পা—এই সব কিছু থেকেই বোঝা যায় যে ক্ষমতার অতিরিক্ত পরিশ্রমের ভিতর দিয়েই তার জীবন কেটেছে। তার পরনে মোটা সাদা শন পাটের ট্রাউজার, হাঁটুর কাছে নীলের ছোঁপ, ঐ একই কাপড়ের নোংরা শার্টটার পিঠ ও হাতের দিকটা ছেঁড়া; কোমরে একটা ফিতে জড়ানো; তাতে একটা পিতলের চাবি ঝুলছে।

উঠোনে ঢুকে নেখ্‌লুদভ বলল, "শুভ দিন।"

চিউরিস একবার তাকিয়েই আবার কাজে মন দিল। অনেক চেষ্টার পরে ছাদের চাপ থেকে বেড়াটাকে বাঁচিয়ে সে কুড়ুলটাকে একটা কাঠের গুঁড়িতে বসিয়ে দিয়ে কোমরের ফিতেটা ঠিক করে উঠোনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল।

নীচু হয়ে অভিবাদন জানিয়ে মাথা নেড়ে চুলগুলো পিছন দিকে সরিয়ে সে বলে উঠল, "আজ কী খুশির দিন হুজুর!"

"ধন্যবাদ বন্ধু। তোমার বাড়িঘর দেখতেই এসেছি," বালকোচিত বন্ধুত্ব ও ভীরুতার সঙ্গে চাষীর পোশাকটা দেখতে দেখতে নেখ্‌লুদভ বলল। "কম্যুনের সভায় কেন তুমি ঠেক্‌নোগুলো চেয়েছিলে সেটা নিজের চোখেই দেখতে চাই।"

"ঠেক্‌নো? সে কি, ঠেক্‌নো কিসে লাগে তাতো আপনি জানেন হুজুর। এই তো সেদিন এ কোণটা ভেঙে পড়ল—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ গরু-ঘোড়াগুলো তখন ভিতরে ছিল না। ওগুলোকে আর খাড়া রাখা যাচ্ছে না," বেঁকে যাওয়া, ভেঙে পড়া, ছাউনিবিহীন চালাগুলির দিকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তাকিয়ে চিউরিস বলল। "কড়িগুলো, তিনকপালীগুলো, এড়োগুলো—একবার হাত দিলেই বুঝতে পারবেন যে একটা কাঠেরও কিছু নেই; ওদিয়ে আর কাজ চলবে না। আর আজকালকার দিনে কাঠের যোগাড় কে করবে—সে তো আপনি ভালই জানেন।"

"তাহলে পাঁচটা ঠেক্‌নো দিয়ে তোমার কি হবে, যেখানে একটা চালা এর মধ্যেই পড়ে গেছে, আর বাকিগুলোও শিগ্‌গিরই ভেঙে পড়বে? এতো ঠেক্‌নোর কাজ নয়, তোমার তো দরকার নতুন কড়ি-বরগা, এড়ো, খুঁটি," এসব ব্যাপারে তার যে অনেক জ্ঞান সেটা জাহির করবার জন্যই বুঝি মনিব শেষের কথাগুলি বলল।

চিউরিস চুপ করে রইল।

"তাহলে তোমার চাই কাঠ, ঠেক্‌নো নয়। সেই কথাই তোমার বলা উচিত ছিল।"

"অবশ্য কাঠই আমি চাই, কিন্তু সে তো কোথাও মিলবে না। সব সময়ই তো মনিবের বাড়ি যাওয়া চলে না! যা কিছু দরকার সবের জন্যই যদি

আমাদের মত লোকরা হুজুরের বাড়িতে যাওয়া শুরু করে তো আমরা কেমন ভূমিদাস ?" তারপরই মাথাটা নীচু করে এক পা থেকে আর এক পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, "তবে হুজুরের ঝাড়াই উঠোনে যে ওকের খুঁটিগুলো অব্যবহারে পড়ে আছে সেগুলো যদি দয়া করে দেন, তাহলে ঘরের কতক-গুলো কাঠ পাল্টে দিয়ে আর বাকিগুলো কেটে-ছেঁটে ঠিক করে নিয়ে কোন-রকমে পুরনো মালপত্র দিয়ে ঘরগুলোকে খাড়া করতে পারি।"

"পুরনো মালপত্র ? তুমি নিজেই বললে না সেগুলো পুরনো হয়ে গেছে, পচে গেছে ? আজ এ কোণটা ভেঙে পড়েছে, কাল ওটা ভেঙে পড়বে, তার-পরদিন আর একটা : কাজেই কিছু যদি করতেই হয় তো নতুন করেই করা উচিত, যাতে পরিশ্রমটা বেকার নষ্ট না হয়। বল তো দেখি, তোমার এ বাড়ি কি শীতকালটা পার হতে পারবে ?"

"কে বলতে পারে ?"

"কিন্তু তুমি কি মনে কর ? বাড়িটা পড়ে যাবে, না যাবে না ?"

চিউরিস ভাবতে লাগল।

তারপর হঠাৎ বলল, "সব পড়ে যাবে।"

"তাহলে ? বুঝতেই পারছ, পুরো বাড়িটাই তোমাকে নতুন করে বানাতে হবে, এখানে-ওখানে কয়েকটা ঠেক্‌নো দিলে হবে না। তুমি তো জান, তোমাকে সাহায্য করতে পারলে আমি খুশিই হব…।"

মনিবের দিকে না তাকিয়ে সন্দেহের সুরে চিউরিস বলল, "আপনার এই উপকারের জন্য আমরা খুবই কৃতজ্ঞ। আপনি দয়া করে চারটে বরগা ও কয়েকটা ঠেক্‌নো দেন, তাহলে আমি নিজেই সব ঠিক করে নিতে পারি; আর পচা কাঠগুলোকে বের করে দিয়ে চালাঘরের ঠেক্‌নোর কাজ চালাতে পারি।"

"তাহলে তোমার চালাঘরের অবস্থাও কি খারাপ ?"

"বুড়ি আর আমি তো প্রতিদিনই আশংকা করছি কোন্ দিন সেটা ভেঙে পড়বে," চিউরিস উদাসিনভাবে বলল; "এই তো সেদিন ছাদের একটা এড়োতে লেগে ও বেচারি একেবারে চেপ্টে গেছে।"

"চেপ্টে গেছে ? কি বলছ তুমি ?"

"কি জানেন হুজুর, সেটা এমনভাবে ওর পিঠে লেগেছে যে রাত পর্যন্ত বেচারি একেবারে মরার মত পড়ে ছিল।"

"এখন ভাল আছে তো ?"

"হ্যাঁ, এখন সুস্থ হয়েছে। কিন্তু ও সর্বদাই ভোগে। জন্ম থেকেই ও রুগ্ন।"

বুড়ি তখনও দরজার পাশেই দাঁড়িয়েছিল; স্বামী তার নাম করতেই সে গোঙাতে শুরু করে দিল। তা শুনে নেখ্‌লয়ুদভ বলল, "আরে, তুমি কি

এখনও অসুস্থ ?"

শুকনো, নোংরা বুকটা দেখিয়ে বুড়ি বলল, "ঠিক এই জায়গায় ব্যথাটা লেগেই আছে।"

বিরক্তিতে কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে নেখ্‌লুদভ বলল, "এখনও! অসুস্থ হলে ডাক্তারখানায় যাও না কেন? ডাক্তারখানা তো এই জন্যই আছে। তুমি কি সেকথা শোন নি ?"

"তা তো শুনেছি কর্তা, কিন্তু সময় হয় না। জমিদারির কাজকর্ম তো করতেই হবে; তাছাড়া নিজের কাজ আছে, ছেলেমেয়ে আছে, আর আমি তো একা মানুষ। আমরা তো একেবারেই একা।"

অধ্যায়—৩

নেখ্‌লুদভ চালাঘরটাতে ঢুকল। ঘরের এক কোণের ধোঁয়ায় কালো অসমান দেয়ালের গায়ে যত রাজ্যের ছেঁড়া ন্যাকড়া ও জামা ঝোলানো হয়েছে; সব চাইতে ভাল কোণটা তো লাল লাল আরশুলাতে একেবারে ছেয়ে গেছে; দেবমূর্তি ও বেঞ্চিগুলোকে ঘিরেও আরশুলার ঝাঁক। কালো, দুর্গন্ধভরা, চৌদ্দ বর্গফুট মাপের চালাঘরটার মাঝখানে ছাদে একটা বড় ফাটল ধরেছে; দুটো জায়গায় ঠেক্‌নো লাগানো সত্ত্বেও ছাদটা এমনভাবে ফুলে উঠেছে যে যেকোন সময়ই ছাদটা ভেঙে পড়তে পারে বলে আশংকা হচ্ছে।

চিউরিস-এর দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে নেখ্‌লুদভ বলল, "হ্যাঁ, চালাঘরটার অবস্থা বেশ খারাপ।"

তাকের নীচেকার ইটের উনুনের উপর ঝুঁকে পড়ে কান্না-ভেজা গলায় বুড়ি বলল, "এটা আমাদের চ্যাপ্টা করে দেবে, ছেলেমেয়েগুলোকেও চ্যাপ্টা করে দেবে।"

"বক্ বক্ করো না" চিউরিস কড়া গলায় বলল; তারপর মনিবের দিকে ফিরে গোঁফের ফাঁকে ঈষৎ হেসে বলল, "এই চালাঘরটার যে কি করা হবে আমি বুঝতে পারছি না হুজুর। ঠেকনো দিয়েছি, বোর্ড লাগিয়েছি, কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না।"

"সারা শীতকালটা এখানে কি করে যে কাটাব? ওঃ, ওঃ, ওঃ!" বুড়ি বলতে লাগল।

তাকে বাধা দিয়ে স্বামী বলল, "আরও কয়েকটা ঠেক্‌নো ও নতুন এড়ো যদি লাগাতে পারি, আর একটা বরগা যদি পাল্টে দিতে পারি, তাহলে হয়তো শীতকালটা কোনরকমে কাটিয়ে দেওয়া যেতে পারে। কোনরকমে কাজ চলে যাবে—তবে ঠেক্‌নোগুলো ঘরটাকে বোঝাই করে ফেলবে এই যা। কিন্তু একবার হাত লাগালে আর কিছুই থাকবে না। যতদিন হাত দেওয়া

না হবে ততদিনই কোনক্রমে টিকে থাকবে,” নিজের কথায় নিজেই খুশি হয়ে সে বক্তব্য শেষ করল।

চিউরিস যে এরকম একটা অবস্থায় এসে পৌচেছে, অথচ আরও আগে তাকে কিছু জানায় নি এজন্য নেখ্‌ল্যুদভ বিরক্ত ও দুঃখিত হল, কারণ এখানে আসার পর থেকে সে কখনও কোন চাষী সাহায্য চাইলে তাকে ফিরিয়ে দেয় নি, বরং চেষ্টা করেছে তাদের যেকোন অভাব-অভিযোগের কথা তারা যেন সরাসরি তাকেই এসে জানায়। এমন কি চিউরিস-এর প্রতি এক ধরনের বিরূপ মনোভাব তার মধ্যে দেখা দিল; সে রেগে কাঁধ ঝাঁকুনি দিল, ভুরু কুঁচকাল, কিন্তু চারদিককার শোচনীয় অবস্থা ও তার মধ্যে দাঁড়িয়ে চিউরিস-এর শান্ত, আত্মতুষ্ট ভাব দেখে তার সেই বিরক্তি একটি বিষণ্ণ হতাশায় রূপান্তরিত হল।

নোংরা, বাঁকা বেঞ্চিটায় বসে সে অনুযোগের স্বরে বলল, “তুমি আগে আমাকে বল নি কেন আইভান?”

“সাহস পাই নি হুজুর,” অসমান মাটির মেঝেতে একটা নোংরা খালি পা থেকে অন্য পায়ে ভর দিয়ে হঠাৎ হাসির সঙ্গে চিউরিস জবাব দিল; কিন্তু যেরকম শান্তভাবে ও সাহসের সঙ্গে সে কথাগুলি বলল তাতে সে যে তার মনিবের কাছে কথাটা জানাতে সাহস করে নি এটা বিশ্বাস করা বেশ শক্ত।

বুড়িটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, “আমরা তো চাষী মাত্র; কি করে সাহস হবে...’”

“বক্‌বকানি থামাও তো,” চিউরিস আবারও বলল।

একটু থেমে নেখ্‌ল্যুদভ বলল, “এই চালাঘরে থাকা তোমার পক্ষে অসম্ভব। এটা অর্থহীন! এখন শোন, আমরা কি করতে চাই বন্ধু...।”

“বলুন স্যার,” চিউরিস বলল।

“নতুন গ্রামে ফাঁপা দেয়ালের যে ইটের বাড়িগুলো আমি তৈরি করাচ্ছি সেগুলো দেখেছ তো?”

ভাল সাদা দাঁত বের করে হেসে চিউরিস জবাব দিল, “অবশ্যই দেখেছি। যেভাবে ওগুলো তৈরি হচ্ছে তা দেখে আমরা তো অবাক। ভারী মজার বাড়ি! ছেলেমেয়েরা তো হাসছে আর শুধোচ্ছে, এগুলো কি গুদাম-ঘর হবে, আর, যাতে ইঁদুর থাকতে না পারে সেইভাবে কি দেয়ালগুলো ভরাট করা হবে...চমৎকার বাড়িগুলো! ঠিক যেন জেল-খানা!” তার দৃষ্টিতে একধরনের বিদ্রূপাত্মক সংশয় ফুটে উঠল।

চাষীটির বিদ্রূপে বিরক্ত হয়ে মনিবের তরুণ মুখে ভ্রূকুটি দেখা দিল; বলল, “হ্যাঁ, বাড়িগুলো খুবই ভাল; গরম, শুকনো, আর আগুন লাগবার ভয় নেই।”

“এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই হুজুর—চমৎকার সব বাড়ি!”

"দেখ, একটা বাড়ি সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে গেছে। মাপে তেইশ বর্গফুট, একটা বারান্দা ও একটা ভাঁড়ার ঘর আছে; একেবারে তৈরি। যা খরচ পড়েছে সেই দামে বাড়িটা তোমাকে দিতে পারি, আর দামটাও তুমি যখন পারবে তখনই দিও," ঈষৎ হেসে মনিব বলল; নিজের উদারতার কথা ভেবে আত্মতুষ্টির হাসিটিকে সে কিছুতেই চেপে রাখতে পারল না। "এই পুরনো বাড়িটা ভেঙে ফেলে তুমি এখানে একটা গোলাবাড়ি বানাতে পার। অন্য বাড়িগুলোও আমরা এখান থেকে সরিয়ে দেব। সেখানে ভাল জল আছে। সব্জি বাগানের জন্য সেখানেই তোমাকে নতুন জমি দেব, আর কাছাকাছি চাষের জমিও পাবে। অচিরেই বেশ ভালভাবে থাকতে পারবে। এখন বল, এটা তোমার পছন্দ তো?" নতুন জায়গায় উঠে যাবার কথা শুনেই চিউরিস স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে রইল। তার দৃষ্টি মাটির দিকে। মুখে হাসি নেই।

চোখ না তুলেই সে বলল, "হুজুরের যেমন ইচ্ছা।"

বুড়ি আঁতকে উঠে কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই কথা বলল তার স্বামী।

চোখ তুলে মনিবের দিকে তাকিয়ে, ঝাঁকুনি দিয়ে চুলটাকে পিছনে ঠেলে দিয়ে দৃঢ় অথচ বিনীতভাবে সে বলল, "হুজুরের যেমন ইচ্ছা; তবে নতুন গাঁয়ে বাস করা আমাদের পোষাবে না।"

"কেন পোষাবে না?"

"না হুজুর। আমাদের যদি সেখানে নিয়ে তোলেন—এখানে তো খারাপ অবস্থায়ই আছি, কিন্তু সেখানে গেলে আমরা আর ঠিক চাষী থাকব না। সেখানে আমরা কেমন ধারা চাষী হব? আহা, সেখানে তো বাস করাই চলে না।···তবে হুজুরের যেমন ইচ্ছা!"

"কেন চলে না?"

"আমাদের একেবারে সর্বনাশ হয়ে যাবে হুজুর।"

"কিন্তু সেখানে বাস করা চলবে না কেন?"

"সেখানে জীবনযাত্রা কেমন হবে কে জানে? ভেবে দেখুন। সেখানে কখনও কেউ বাস করে নি, জল মুখে দিয়ে দেখে নি, গোচারণ ভূমিও নেই। আমাদের এই সব শনের ক্ষেতে কতকাল আগে থেকে সার ঢালা হচ্ছে, কিন্তু সেখানে কি আছে? কিছু নেই! সব ফাঁকা! কচি পাতা নেই, ফসল শুকোবার ভাটি নেই, চালা নেই—কিচ্ছু নেই। আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে হুজুর; সেখানে ঠেলে দিলে আমাদের সর্বনাশ হবে। জায়গাটা নতুন, অপরিচিত···," মাথা নাড়তে নাড়তে চিন্তিতভাবে সে বলল।

নেখ্‌ল্‌যুদভ তাকে বোঝাতে চেষ্টা করল, এই পরিবর্তনে তাদের বরং সুবিধাই হবে, ঝোপ-ঝাড় ও চালা তৈরি করা হবে, সেখানকার জল ভাল, ইত্যাদি; কিন্তু চিউরিস-এর একটানা চুপচাপ থাকা তাকে বিব্রত করে

তুলল; তার মনে হল, তার কথাগুলি হয় তো ঠিক নয়। চিউরিস কোন জবাব দিল না, কিন্তু মনিব কথা থামাতেই সে ঈষৎ হেসে জানাল, বাড়ির বুড়ো ভূমিদাসদের ও বোকা আলেশ্‌কাকে সেখানে পাঠালে ভাল হবে; তারা সেখানকার ফসল পাহারা দিতে পারবে।

"সেটাই ভাল হবে," বলে সে গম্ভীরভাবে হাসতে লাগল। "না, ব্যাপারটা খুবই বাজে হুজুর।"

নেখ্‌ল্‌য়ুদভ তথাপি ধৈর্য ধরে বলল, "বেশ তো, সেখানে যদি লোক-বসতি নাই থাকে তো কি হল? এক সময় সেখানে কেউ বাস করত না, কিন্তু এখন তো বাস করে; আর নতুন গাঁয়ে তোমরাই হবে প্রথম বাসিন্দা, এতে তোমাদের ভাগ্য ফিরবে।...সেখানে তোমাদের বাস করতেই হবে।...'

"আহা, হুজুর, ও দুটোর মধ্যে তুলনা চলে কেমন করে?" পাছে মনিব একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে এই ভয়ে চিউরিস তাড়াতাড়ি বলে উঠল। "এখানে আমরা একটা কম্যুনের মধ্যে আছি—জায়গাটা বেশ জমজমাট, এতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এখানে রাস্তা আছে, এখানকার পুকুরে বৌরা কাপড় কাচতে পারে, গরু-মোষকে জল খাওয়াতে পারে, কত প্রাচীন-কাল থেকে গোটা চাষী সমাজ এখানে বসবাস করছে: এই ঝাড়াই-উঠোন, ছোট ছোট সব্জি-ক্ষেত, আর বাবা-মায়ের হাতে লাগানো এই সব উইলো গাছ। ঠাকর্দা ও বাবা এখানেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে; আমিও যদি এখানেই জীবনের বাকি দিনগুলি কাটিয়ে যেতে পারি, হুজুর, তাহলে আর কিছুই আমি চাই না। আপনি যদি আমার ঘরটা মেরামতের ব্যবস্থা করে দেন, তাহলে আপনার দয়ার জন্য আমরা খুব কৃতজ্ঞ থাকব। আর যদি তা নাও করেন তাহলেও এই পুরনো বাড়িতেই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কোন রকমে কাটিয়ে দেব।" মাথা নীচু করে অভিবাদন জানিয়ে সে আরও বলল, "সারা জীবন আমরা আপনার জন্য প্রার্থনা করব। আমাদের বাসা থেকে আমাদের তাড়িয়ে দেবেন না কর্তা...।"

চিউরিস যখন কথা বলছিল তখন তাকের নীচে দাঁড়িয়ে তার স্ত্রী ক্রমেই জোরে জোরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল; এবার স্বামী যখন "কর্তা" বলে ডাকল তখন একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে সে লাফিয়ে এসে নেখ্‌ল্যুদভের পায়ের কাছে নতজানু হয়ে ভীষণভাবে কাঁদতে লাগল।

"আমাদের সর্বনাশ করবেন না রক্ষাকর্তা! আপনি আমাদের বাপ-মা! কেমন করে আমরা এখান থেকে চলে যাব? আমরা বুড়োবুড়ি, সম্পূর্ণ একলা। আমাদের কাছে ঈশ্বরও যা, আপনিও তা...।" সে আবার হা-হুতাশ শুরু করে দিল।

বুড়িকে তুলে ধরবার জন্য নেখ্‌ল্‌য়ুদভ লাফ দিয়ে বেঞ্চি থেকে নামল, কিন্তু বুড়ি তখনও একান্ত হতাশভাবে মাটির মেঝেতে মাথা ঠুকতে লাগল;

তার হাতটাকে সরিয়ে দিল।

"কি করছ তুমি? দয়া করে ওঠ। তোমরা যদি যেতে না চাও তো যেয়ো না। আমি জোর করব না," দুই হাত নেড়ে দরজার দিকে যেতে যেতে সে বলল।

নেখ্‌ল্যুদভ আবার এসে বেঞ্চিতে বসল। ঘরের মধ্যে সব চুপচাপ। শুধু বুড়ির হা-হুতাশ শোনা যাচ্ছে। তাকের নীচে ফিরে গিয়ে সে সেমিজের আস্তিনে চোখ মুছেই চলেছে। বাঁকা-চোরা জানালাটার ভিতর দিয়ে এই ধ্বসে-পড়া বাড়ি, ভেঙে-পড়া কুয়ো, কাদা-ভরা ডোবা, পচা চালাঘর ও বাইরের ঘর, আর ভেঙে-পড়া উইলোর গাছের দিকে তাকিয়ে এই প্রথম নেখ্‌ল্যুদভ যেন বুঝতে পারল, চিউরিস ও তার বৌয়ের কাছে এগুলোর কি অর্থ; সঙ্গে সঙ্গে তার মনটা খারাপ হয়ে গেল; অকারণেই সে লজ্জিত বোধ করল।

"গত রবিবার কেন তুমি কম্যুনকে বল নি আইভান যে তোমার একটা ঘর দরকার? এখন কিভাবে যে তোমাকে সাহায্য করব তাই তো বুঝতে পারছি না। প্রথম সভাতেই তো তোমাদের সব্বাইকে বলেছিলাম যে তোমাদের জন্য জীবন উৎসর্গ করতেই আমি জমিদারিতে বাস করতে এসেছি; তোমাদের সন্তুষ্ট ও সুখী করতে নিজেকে সব কিছু থেকে বঞ্চিত করতে আমি প্রস্তুত; ঈশ্বরের নামে শপথ করছি, আমার সেকথা আমি রাখব," তরুণ মালিক কথাগুলি বলল; কিন্তু সে ভুলে গেল যে এধরনের বাগাড়ম্বর কারও মনেই বিশ্বাস জাগাতে পারে না; বিশেষ করে একজন রুশের মনে তো নয়ই, কারণ সে চায় কাজ, কথা নয়, আর ভাল ভাল কথায় প্রকাশিত ভাবের আবেগকে সে অপছন্দ করে।

কিন্তু এই সরল-হৃদয় যুবকটি নিজের এই নবলব্ধ আবেগে এতই খুশি হয়ে পড়েছে যে সেটাকে প্রকাশ না করে পারল না।

একদিকে মাথাটা কাত করে চিউরিস চোখ মিটমিট করে মনিবের কথাগুলি জোর করেই শুনতে লাগল। কথাগুলি তার ভাল লাগছে না, এগুলি মোটেই "আমাদের" ব্যাপার নয়, তবু শুনতে হয় বলেই সে শুনছে।

"কিন্তু যে যা চাইছে সব তো আমি দিতে পারি না। যারা কাঠ চায় তাদের মধ্যে কিছু লোককে যদি ফিরিয়ে না দেই তাহলে তো অচিরেই এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে যে আমার নিজের বলতে আর কোন কাঠ থাকবে না, এবং কাঠের যাদের সত্যি দরকার তাদেরই কাঠ দিতে পারব না। সেই জন্যই তো "রাজ জঙ্গল"টা আমি চাষীদের বাড়িঘর ভাল করবার জন্যই দিয়ে দিয়েছি এবং সেটার ভার সম্পূর্ণভাবে কম্যুনের হাতে তুলে দিয়েছি। সে-জঙ্গলটা এখন আর আমার নয়, সেটার মালিক কম্যুন। এখন আর আমি সেটার বিলি-ব্যবস্থা করতে পারি না, কম্যুন যা ভাল বোঝে তাই করে।

আজ রাতে সভায় এসো। তোমার অনুরোধের কথা আমি তাদের জানাব, তারা যদি নতুন বাড়ি তৈরি করবার জন্য তোমাকে কাঠ দেয় তো খুব ভাল, কিন্তু এখন আমার নিজের হাতে কোন কাঠ নেই। আমি তো সর্বান্তঃকরণেই তোমাকে সাহায্য করতে চাই, কিন্তু তুমি যদি চেষ্টা না কর, ব্যাপারটা তো আমার হাতে নয়, সেটা কম্যুনের হাতে। বুঝতে পারছ আমার কথা ?"

"আপনার দয়ার জন্য আপনার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ হুজুর," চিউরিস লজ্জিতভাবে বলল। "আপনি যদি দয়া করে বাড়ি করার কাঠটা দেন তাহলে আমরা সোজা সেইপথেই হাঁটব···আসলে কম্যুন কে ? সকলেই জানে··· ।"

"না। তোমাকে আসতেই হবে।"

"হ্যাঁ, আমি যাব। কেন যাব না ? কিন্তু যাই বলুন, কম্যুনের কাছে আমি হাত পাতব না।"

অধ্যায়—৪

তরুণ জমিদারটি বৃদ্ধ দম্পতিকে আরও কিছু প্রশ্ন করতে চাইল ; বেঞ্চি থেকে না উঠে সসংকোচে সে একবার চিউরিস-এর দিকে ও একবার আগুন না দেওয়া খালি ইটের উনোনটার দিকে তাকাতে লাগল।

"তোমাদের ডিনার খাওয়া হয়েছে ?" অবশেষে সে জিজ্ঞাসা করল।

চিউরিস-এর গোঁফের নীচে একটুকরো ঠাট্টার হাসি খেলে গেল, যেন মনিবের এই বাজে প্রশ্নটা শুনে সে বেশ একটু মজা পেয়েছে ; সে কোন জবাবই দিল না।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বুড়ি বলল, "কোন্ ডিনার রক্ষাবার্তা ? আমরা রুটি খেয়েছি—সেটাই আমাদের ডিনার। টক পালং আনবার সময়ই আজ পাই নি, কাজেই ঝোল রাঁধতে পারি নি, আর 'কভাস' যেটুকু ছিল বাচ্চা-দেরই দিয়েছিলাম।"

বৌয়ের কথার ব্যাখ্যা করে চিউরিস বলল, "আজ আমাদের কঠোর উপবাস হুজুর। রুটি আর পেঁয়াজ—এই তো আমাদের মত চাষীদের খাদ্য। প্রভুকে ধন্যবাদ, হুজুরের কৃপায় আমাদের তো তবু ফসল আছে,—আমাদের অনেক চাষীর তো তাও নেই। এ বছর তো পেঁয়াজও ভাল জন্মে নি। সেদিন বাগানের মালী মাইকেলের কাছে গেলে সে তো এক খোকার জন্য দুই কোপেক দাম হাঁকল ; কাজেই আমাদের মত লোক আর কোথায়ই বা সে-সব কিনতে যাবে। ইস্টারের পর থেকে তো গির্জায়ও যেতে পারি নি। সেণ্ট নিকোলাসের মূর্তির সামনে একটা মোমবাতি জ্বালাবার পয়সাও যে নেই।"

ভূমিদাসদের তীব্র দারিদ্র্যের কথা নেখ্‌লুদভ অনেকদিন থেকে জানে; জনশ্রুতি বা অন্য লোকের কথা শুনে নয়, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই জানে; কিন্তু তার জীবনযাত্রা ও তার মানসিক গঠনের সঙ্গে তুলনায় সে দারিদ্র্য এত বেশী কঠোর যে নিজের অজ্ঞাতেই সেকথা সে ভুলেই থাকত; আর আজ আজকের মত যখনই সেকথাটাকে কেউ জোর করে তাকে মনে করিয়ে দেয় তখন একটা দুঃসহ মর্মপীড়া ও বেদনা তার মনে জেগে ওঠে; যেন একটা পাপ কাজ সে করেছে অথচ তার প্রায়শ্চিত্ত করা হয় নি, এমনই একটা স্মৃতি তাকে যন্ত্রণায় দগ্ধ করে।

নিজের অজ্ঞাতেই মনের কথাটাকে ভাষায় প্রকাশ করে সে বলল, "তোমরা এত গরীব কেন?"

"গরীব হওয়া ছাড়া আমরা আর কি হতে পারি হুজুর? আমাদের জমি কেমন তা ভাবুন? আপনি তো জানেন, জমি তো শুধু কাদা আর উঁচু ঢিবি। আর ঈশ্বরও আমাদের উপর রেগে আছে, কারণ কলেরার বছর থেকে জমিতে কোন ফসলই ফলে না। আর আমাদের মাঠ ও চাষের জমিও কমে গেছে; কিছু চলে গেছে মালিকের খামারে, আর কিছু জুড়ে গেছে তার জমিতে। আমি একা মানুষ, তায় বুড়ো...বেশী কাজ করতে পারলে তো খুশি হতাম, কিন্তু গায়ে জোর পাই না। বৌ সব সময়ই ভোগে, প্রতি বছরই একটা করে মেয়ে জন্মায়, আর সে সবগুলিকেই তো খাওয়াতে হয়। কাজ করতে আমি একা, কিন্তু বাড়িতে খাইয়ে সাতজন। অনেক সময় ঈশ্বরের কাছে পাপও করি; মনে মনে বলি, তিনি যদি কয়েকটাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে নিতেন তাহলে অবস্থাটা অনেক ভাল হত, আর তারাও এখানে পড়ে পড়ে কষ্ট পাওয়ার হাত থেকে বাঁচত!..."

যেন স্বামীর কথাগুলিকে সমর্থন করতেই স্ত্রীলোকটি সশব্দে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল, "ওঃ—অ!"

উস্কোখুস্কো শনের মত চুল মাথায় বছর সাতেকের একটি ছেলে এই সময় সশব্দে দরজাটা ঠেলে ভয়ে ভয়ে সেখানে ঢুকল; তার পেটটি মস্ত বড়; দুই হাতে বাবার শার্টটা চেপে ধরে ভুরুর নীচ থেকে বিস্মিত দৃষ্টিতে সে মনিবের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তাকে দেখিয়ে চিউরিস বলল, "এই হল আমার একমাত্র সাহায্যকারী। সে কতদিনে বড় হবে তার জন্য আমাকে অপেক্ষা করে থাকতে হবে। এত কাজ আমি আর সামলাতে পারছি না। যত না বয়স তার চাইতেও ভগ্ন স্বাস্থ্যই আমাকে বেশী কাবু করে ফেলেছে। আবহাওয়া খারাপ হলে কাঁদতে রাজী আছি, কিন্তু আমার বয়সের বিচারে ভূমিদাসের কাজ থেকে আমার তো রেহাই পাবার অধিকার আছে। এই তো দিউৎলভ, দেম্‌কিন, জ্যাব্রেভ্‌ রয়েছে—সকলেই আমার চাইতে ছোট— অথচ তারা তো অনেকদিনই জমিতে কাজ করা ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু

আমার তো কাজ করে দেবার কেউ নেই—সেটাই হয়েছে গোলমাল। খেতে তো হবে, আর তাই কাজ চালিয়েই যেতে হচ্ছে হুজুর।"

ভূমিদাসের দিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকিয়ে তরুণ মনিবটি বলল, "তোমাকে সাহায্য করতে পারলে আমি সত্যি সুখী হতাম। কিন্তু আমি কি করতে পারি?"

"করবারই বা কি আছে? জমি থাকলেই মনিবের জন্য কাজ তো করতেই হবে—সেটা আমরা ভালই জানি। যেমন করেই হোক ছেলেটা বড় হওয়া পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতেই হবে। শুধু দয়া করে ওকে যেন স্কুলে পাঠাবেন না! সেদিন তো করণিক এসে বলে গেল, হুজুর নাকি ওকে স্কুলে পাঠাবার হুকুম দিয়েছেন। ওকে ছেড়ে দিন হুজুর। ওর বুদ্ধিশুদ্ধিই বা কি হয়েছে? কোন কিছু বুঝবার মত বয়সই তো হয় নি।"

নেখ্‌লয়ুদভ বলল, "না, না বন্ধু। তুমি যা বলবে তোমার ছেলে সে-সব বুঝতে পারবে। এই তো ওর লেখাপড়া করার সময়। তোমার ভালর জন্যই বলছি। ভেবে দেখ: ও যখন বড় হবে, বাড়ির কর্তা হবে, তখন ও লিখতে পারবে, পড়তে পারবে, এমন কি গির্জাতেও পড়তে পারবে—ঈশ্বরের ইচ্ছায় বাড়ির অবস্থাও ফিরবে।" সহজ করেই সে কথাগুলি বলল; তবু কেন যে সে লজ্জা পেল, কেন যে তার সংকোচ হতে লাগল, তা সে নিজেই বুঝল না।

"হুজুরের সব কথাই ঠিক, আপনি তো আমাদের ক্ষতি চান না, কিন্তু আমি আর বৌ যখন মালিকের ক্ষেতে কাজ করতে যাব তখন যে বাড়ি-ঘর দেখবার কেউ থাকবে না; অবশ্য ও এখনও ছোট, তবু গরু-মোষ চরাতে বা ঘোড়াকে জল খাওয়াতে তো পারে। ছোট হলেও ও চাষী তো বটে," হেসে কথাটা বলে চিউরিস ছেলের নাকটা চেপে ধরে নিজেই নাক-ঝাড়ার শব্দ করল।

"তা হোক, তোমরা যখন বাড়িতে থাকবে আর ওরও সময় হবে, তখনই ওকে পাঠিও। শুনলে? অবশ্য পাঠিও।"

চিউরিস দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল; কোন জবাব দিল না।

অধ্যায়—৫

"হ্যাঁ, আমি জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছিলাম, তোমার সার কেন গাড়িতে বোঝাই করা হয় নি?" নেখ্‌লয়ুদভই বলল।

"আমার সার কোথায় হুজুর? গাড়িতে বোঝাই করবার তো কিছু নেই। আমার গরু-বাছুর কোথায়? থাকার মধ্যে একটা ছোট ঘোটকী আর একটা বাচ্চা। বকনা বাছুরটাকে তো গত হেমন্তে সরাইওলার কাছে

বেচে দিয়েছি। আমার গরু-বাছুর বলতে তো এই সব।"

মনিব সবিস্ময়ে শুধাল, "সে কি? যথেষ্ট গরু-বাছুর নেই অথচ তুমি বকনাটাকে বেচে দিলে?"

"কিন্তু ওকে কি খাওয়াব?"

"একটা গরুকে খাওয়াবার মত খড় তোমার নেই? অন্যের তো যথেষ্ট আছে।"

"অন্যের তো সার-দেওয়া জমি আছে, আমার জমিতে তো কাদা ছাড়া কিছু নেই। ও দিয়ে কোন কাজ হয় না।"

"বেশ তো, ভাল করে জমির পরিচর্যা কর, যাতে শুধুই কাদা না থাকে; তাহলেই জমিতে ফসল হবে, আর গরু-ঘোড়াকে খাওয়াবার মতও কিছু জুটবে।"

"কিন্তু আমার তো গরু-ঘোড়া নেই, সার আসবে কোত্থেকে?"

"এক আশ্চর্য পাপ-চক্র," নেখ্‌ল্যুদভ ভাবল, কিন্তু চাষীটিকে কি পরামর্শ দেবে বুঝতে পারল না।

চিউরিস বলতে লাগল, "তারপর হুজুর, সার হলেই তো ফসল ফলে না, ফসল ফলান ঈশ্বর। গত বছর একখানা সারহীন জমি থেকে পেলাম ছয় গাদা, কিন্তু সার-জমি থেকে প্রায় কিছুই পেলাম না। সবই ঈশ্বর!" সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "তাছাড়া আপনার খামারে গরু-ঘোড়া বাঁচে না। এই তো ছ' বছর ধরে শুধু মরছে। গত বছর একটা বাছুর মরে গেল, খাবার কিছু না থাকায় আর একটাকে বেচে দিলাম; তার আগের বছর মরল একটা ভাল গরু: মাঠ থেকে নিয়ে এলাম ভাল গরু, তারপরই হঠাৎ টলতে শুরু করল, আর টলতে টলতেই মরে গেল। আমারই কপাল মন্দ!"

"দেখ বন্ধু, তুমি যাতে না বলতে পার যে গরুর খাবার নেই বলে তোমার গরু নেই এবং গরু নেই বলে গরুর খাবার নেই, সেই হেতু একটা গরু কিনবার জন্য এটা নাও," এই কথা বলে নেখ্‌ল্যুদভ সলজ্জভাবে ট্রাউজারের পকেট থেকে কিছু দলা-পাকানো নোট বের করে গুণতে শুরু করল। "একটা গরু কিনে নাও; আমি তোমার সৌভাগ্য কামনা করছি; তাছাড়া ঝাড়াই-উঠোন থেকে তুমি গরুর খাবারও পাবে; আমি হুকুম দিয়ে দেব। মনে থাকে যেন, আগামী রবিবারের মধ্যে গরুটা অবশ্য কেনা চাই। আমি দেখতে আসব।"

চিউরিস কিন্তু এ-পা থেকে ও-পায়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু হাসতে লাগল; টাকাটা নেবার জন্য হাত বাড়াল না; শেষ পর্যন্ত আরও সলজ্জভাবে নেখ্‌ল্যুদভ সেটা টেবিলের উপর রেখে দিল।

"আপনার কৃপায় আমরা খুব খুশি," তার সেই স্বাভাবিক, বরং বলা যায় একটু ঠাট্টার হাসি হেসে চিউরিস বলল।

তার বৌ তাকের নীচে দাঁড়িয়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল ; সম্ভবত প্রার্থনা করতে লাগল

তরুণ মনিব বিব্রত হয়ে তাড়াতাড়ি আসন থেকে উঠে বারান্দায় বেরিয়ে গেল ; চিউরিসকেও তার সঙ্গে যেতে বলল। যে লোকটির সঙ্গে নতুন করে বন্ধুত্ব করছে তাকে দেখতে এতই ভাল লাগছে যে এখনই তার সঙ্গ ছেড়ে যেতে মন চাইছে না।

কুয়োর পাশে থেমে সে বলল, "তোমাকে সাহায্য করতে পেরে খুশি হয়েছি। তুমি অলস নও জানি বলেই তোমাকে সাহায্য করা যায়। তুমি যদি পরিশ্রম কর, আমি তোমাকে সাহায্য করব ; আর ঈশ্বরের ইচ্ছায় তুমিও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে।"

চিউরিসের মুখটা হঠাৎ গম্ভীর, এমন কি বেশ কঠিন হয়ে উঠল ; মনিবের মুখে মাথা তুলে দাঁড়াবার কথা শুনে সে যেন খুশি হতে পারে নি এমনিভাবে সে বলে উঠল, "মাথা তুলে দাঁড়াবার কথা তো নয় হুজুর। বাবার আমলে ভাইদের নিয়ে যখন একত্র ছিলাম তখন আমাদের কোন অভাব ছিল না ; কিন্তু তার মৃত্যুর পরে আমরা ভাগ হয়ে গেলাম, আর সেই থেকেই অবস্থা খারাপ হতে শুরু করল। এসবই একা থাকার ফল!"

"তাহলে আলাদা হলে কেন?"

"সবই বৌদের জন্য হুজুর। তখন তো আপনার ঠাকুর্দা বেঁচে ছিলেন না। তাঁর আমলে আমাদের সে সাহসই হত না ; তখন যে কড়া হুকুম ছিল। আপনার মতই তিনিও সব কিছুর উপর নজর রাখতেন ; আলাদা হবার সাহসই আমাদের হত না। চাষীরা খারাপ পথে চলুক, আপনার ঠাকুর্দা সেটা পছন্দ করতেন না। কিন্তু তারপরেই আন্দ্রু ইলিচ আমাদের কব্জা করে ফেললেন। ঈশ্বর তাঁকে ক্ষমা করুন! তাঁর অনেক কথাই মনে পড়ে—তিনি ছিলেন মাতাল, তাঁর উপর ভরসা করাই যেত না। বার বার তাঁর কাছে গেলাম। বললাম, 'মেয়েরা তো জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে ; আমাদের আলাদা হবার অনুমতি দিন।' অবশ্য তিনি আমাদের বার বার বকুনি দিয়ে ফিরিয়ে দিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেয়েদের জিদই বজায় রইল, আর পরিবারগুলো সব ভাগ হয়ে আলাদা আলাদা বাস করতে লাগল। অবশ্য একজনের সংসার যে কি বস্তু তা সকলেই জানে! তাছাড়া কোন নিয়ম-শৃংখলাও ছিল না। আন্দ্রু ইলিচ খুশি মত শাসন করতেন। 'যা কিছু দরকার তা যাতে পাও সেদিকে নজর রেখো,'—কিন্তু একজন চাষী কেমন করে যে তা পাবে সেকথা জিজ্ঞাসাও করতেন না। তারপরই মাথা গুণতি কর বাড়ল, বেশী করে খাদ্যদ্রব্য বাজেয়াপ্ত হতে লাগল, আমাদের জমি কমে গেল, আর ফসলও খারাপ হতে লাগল। আর নতুন করে জমি বিলির সময় যখন এল তখন তিনি আমাদের সার-দেওয়া জমি নিয়ে মালিকের জমির সঙ্গে

জুড়ে দিলেন—ব্যাটা ইতর—আর আমাদের দফা রফা করলেন। আমরা তো মরেই যেতাম! আপনার বাবা—স্বর্গে তাঁর ঠাঁই হোক!—ছিলেন দয়ালু মনিব; কিন্তু আমরা তো কদাচিৎ তাঁর দর্শন পেতাম; তিনি থাকতেন মস্কোতে, আর সেখানেই আমাদের বেশী করে ফসল পাঠাতে হত। অনেক সময় এমন হত যে বরফ পড়ে রাস্তাঘাট দুর্গম হয়ে উঠত, আমাদের হাতে দানাটুকুও থাকত না, তখনও কিন্তু গাড়ি বোঝাই ফসল পাঠাতেই হত! নইলে মনিবের চলবে কেমন করে। আমরা নালিশ জানাতেও সাহস করতাম না, আর সেরকম কোন হুকুমও ছিল না। এখন তো হুজুর সব চাষীর সঙ্গেই দেখা করেন, আর তাই তো আমরাও অন্য মানুষ হয়ে গেছি, আর নায়েবও বদলে গেছে। অন্তত এখন আমরা এটা জানি যে আমাদের একজন মনিব আছেন। হুজুরের কাছে চাষীরা যে কতখানি কৃতজ্ঞ তা বলা অসম্ভব! আপনি যতদিন অভিভাবকের অধীনে ছিলেন ততদিন আমাদের কোন সত্যিকারের মনিব ছিল না। তখন সকলেই মনিব—আপনার অভিভাবক আর ইলিচ, তার স্ত্রী, এমন কি থানার করণিকটি পর্যন্ত যেন আমাদের মনিব ছিল। সেসময় আমরা চাষীরা বড় কষ্ট পেয়েছি—হা ঈশ্বর! সে কী কষ্ট!"

আর একবার নেখ্‌লুদভ লজ্জা ও অনুতাপ বোধ করল। টুপিটা তুলে নিয়ে সে পথে নামল।

অধ্যায়—৬

"এপিফান ওয়াইজম্যান একটা ঘোড়া বিক্রি করতে চায়," নোট-বই বের করে নেখ্‌লুদভ এই কথাটা পড়ল; তারপর রাস্তা পার হয়ে এপিফান-এর বাড়ির দিকে চলতে লাগল।

এই কুড়ে ঘরটা ভালভাবে খড়ে ছাওয়া; খড় এসেছে জমিদারের ঝাড়াই উঠোন থেকে; হাল্‌কা ধূসর আস্পেন কাঠের খুঁটি দিয়ে তৈরি—তাও এসেছে মনিবের জঙ্গল থেকেই। প্রতিটি জানালায় দুটো করে লাল রং-করা পাল্লা, ছোট ঢাকা বারান্দা, সৌখীন কাজ করা চওড়া রেলিং। বাড়ির বাকি অংশটাও ভাল; কিন্তু বাড়ির এই সুদৃশ্য চেহারাটাকেই মাটি করে দিয়েছে ফটক সংলগ্ন অসমাপ্ত কঞ্চির বেড়া ও খড়হীন ছাদওয়ালা একটা চালা ঘর। নেখ্‌লুদভ একদিক থেকে ছোট বারান্দাটায় পৌঁছতেই একটা লাঠির সঙ্গে জলভর্তি বালতি ঝুলিয়ে দুটি স্ত্রীলোক অন্যদিক থেকে সেখানে এসে হাজির হল। একজন এপিফান ওয়াইজম্যান-এর বৌ, অপরজন তার মা। প্রথম স্ত্রীলোকটির চেহারা শক্ত-সমর্থ, গাল দুটি লাল, ভরাট বুক, চওড়া মাংসল গাল। পরনে একটা পরিষ্কার ঢিলে জামা, আস্তিন ও কলারে কাজ-করা, তার উপরে একটা কাজ-করা এপ্রণ, নতুন সুতীর স্কার্ট, জুতো, পুঁতির মালা,

আর লাল সুতোর কাজ-করা চৌকো টুপি।

লাঠির প্রান্তভাগটা মোটেই দুলছে না; বরং তার চওড়া নীরেট ঘাড়ের উপর একেবারে বসে গেছে। তার লাল মুখ, পিঠের বাঁকা রেখা, আর হাত ও পায়ের মাপা চলন দেখেই বোঝা যায় তার স্বাস্থ্য চমৎকার, শক্তিও অসাধারণ।

লাঠির অন্য প্রান্তে রয়েছে মা; তার বেশ বয়স হয়েছে; বয়স ও বার্ধক্যের একেবারে শেষ সীমায় এসে পৌচেছে। তার শরীর হাড় বের-করা, পরনে নোংরা, ঢিলে জামা ও রং-চটা স্কার্ট; সে এত বেশী বেঁকে গেছে যে লাঠিটা তার কাঁধের বদলে যেন পিঠের উপরেই চেপে আছে। গাঢ় বাদামী রঙের দুটো হাত, আঙুলগুলো বেঁকে কুঁকড়ে গেছে। আর তাই দিয়েই লাঠিটাকে আঁকড়ে ধরেছে। ঝুঁকে-পড়া মাথায় একটা ন্যাকড়া জড়ানো; তাতে অভাব ও বয়সের অদৃশ্য সাক্ষ্য। নীচু কপাল জুড়ে গভীর বলীরেখা; দুটি নিষ্প্রভ চোখ মাটির দিকে নিবদ্ধ। ঝুলে-পড়া উপরের ঠোঁটের নীচ থেকে একটি হলদে দাঁত অনবরত নড়ছে; মাঝে মাঝে নেমে এসে থুতনিটাকে স্পর্শ করছে। মুখের নীচের অংশের ও গলার ভাঁজগুলো প্রতিটি চলনের সঙ্গেই থলের মত দুলে উঠছে। ঘর্‌ঘর্‌ শব্দে ঘন ঘন শ্বাস টানছে, আর অনেক কষ্টে বিকৃত খালি পা দুটোকে একটার পর একটা টেনে টেনে এগিয়ে চলেছে।

অধ্যায়—৭

মনিবের সঙ্গে প্রায় ধাক্কা লাগার উপক্রম হওয়ায় তরুণীটি লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি বালতিটা নামিয়ে অভিবাদন করল, ঝকঝকে চোখ তুলে মনিবের দিকে তাকাল, আর তারপরেই ঢিলে জামার কাজ-করা আস্তিনে ঈষৎ হাসিটি ঢাকবার চেষ্টা করে জুতো খট্‌খটিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল।

দরজার কাছে থেমে বুড়িকে বলল, "তুমি ফিরে যাও মা, বাঁকটা নাস্তা-সিয়া মাসিকে ফেরৎ দিয়ে দিও।"

ভদ্র যুবকটি মনোযোগী অথচ কঠোর দৃষ্টিতে গোলাপী-গাল তরুণীটির দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকাল; তারপর বুড়ির দিকে চোখ ফেরাল। বাঁক থেকে বালতিটা খুলে সেটাকে কাঁধের উপর তুলে বুড়ি ধীর পায়ে পার্শ্ববর্তী কুঁড়ে-ঘরটার দিকে এগিয়ে গেল।

"তোমার ছেলে বাড়ি আছে কি?" মনিব শুধাল।

বুড়ি আরও নীচু হয়ে অভিবাদন জানিয়ে কিছু বলতে যাবে এমন সময় মুখের উপর হাতটা রেখে সে এমনভাবে কাশতে লাগল যে নেখ্‌লুদভ সেখানে অপেক্ষা না করে ঘরের ভিতর ঢুকে গেল।

এপিফান ঘরের সব চাইতে ভাল কোণে একটা বেঞ্চির উপর বসেছিল; মনিবকে দেখেই ছুটে উনুনের পাশে গিয়ে যেন তার কাছ থেকে লুকোবার জন্তই তাড়াতাড়ি একটা কিছু তাকের মধ্যে গুঁজে দিল এবং মনিবকে পথ করে দেবার জন্ত দেয়ালের গা ঘেঁসে দাঁড়াল; তার মুখ ও চোখ দুটি একটু-একটু কাঁপছে।

এপিফানের বয়স বছর ত্রিশের মত; একহারা শক্ত গড়ন, বাদামী চুল, সুঁচলো দাড়ি; কোঁকড়ানো ভুরুর নীচেকার দুটি কুতকুতে বাদামী চোখ আর সামনের পাটির দুটো দাঁতের অভাব না থাকলে তাকে বেশ সুদর্শনই বলা যেত। পরনে কনুইতে লাল পট্টি লাগানো ছুটির দিনের শার্ট, ডোরা-কাটা সুতীর ট্রাউজার ও ভারী বুট। ঘরের ভিতরটা চিউরিসের ঘরের মত জিনিসপত্রে ততটা ঠাসা ও খারাপ দেখতে না হলেও এ ঘরটাও গুমোট, ধোঁয়া ও ভেড়ার চামড়ার গন্ধে ভারী, চাষীদের জামাকাপড় ও তৈজসপত্র ইতস্তত অগোছালোভাবে ছড়ানো। দুটি জিনিস দেখে অবাক হতে হয়: তাকের উপর খাঁজ-কাটা ছোট একটা সামোভার, আর লাল নাক ও ছ' আঙুলে জনৈক মঠাধ্যক্ষের প্রতিকৃতি;—কালো ফ্রেম ও নোংরা কাঁচে বাঁধানো ছবিটা দেবমূর্তির নীচে ঝোলানো রয়েছে। সামোভার, মঠাধ্যক্ষের প্রতিকৃতি ও তাকের উপরকার পিতলের কাজ-করা পাইপটার দিকে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে নেখ্‌লয়ুদভ চাষীটিকে উদ্দেশ করে বলল, "গুড মর্ণিং এপিফান।"

এপিফান মাথা নীচু করে বিড়বিড় করে বলল, "আশা করি আপনি ভালই আছেন ই'র এক্স' সেন্সি।" তার চোখ দুটি কিন্তু তড়িৎগতিতে মনিবের সারা দেহ, ঘর, মেঝে ও ছাদের উপর ঘুরতে লাগল, কোন কিছুতেই স্থির হয়ে বসল না। তারপর ছুটে গিয়ে তাকের উপর থেকে একটা কোট টেনে নিয়ে সেটা পরতে লাগল।

বেঞ্চির উপর বসে যথাসম্ভব কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে নেখ্‌লয়ুদভ বলল, "ওটা কি করছ?"

"আর কি করতে পারি ই'র এক্স' সেন্সি? আমার অবস্থা তো আমি বুঝি…"

"আমি জানতে এসেছি, একটা ঘোড়া বিক্রি করার দরকার তোমার হল কেন, তোমার ক'টা ঘোড়া আছে, আর কোন্‌ ঘোড়াটা বিক্রি করতে চাও," নেখ্‌লয়ুদভ রুক্ষ গলায় আগে থেকে ভেবে আসা প্রশ্নগুলিই আওড়াল।

দ্রুত চোখ ঘুরিয়ে এপিফান মঠাধ্যক্ষের প্রতিকৃতি, উনোন, নেখ্‌লয়ুদভের বুটজোড়া এবং একমাত্র মনিবের মুখ ছাড়া আর সব কিছু দেখে নিয়ে বলল, "ই'র এক্স' সেন্সি যে দয়া করে আমাদের মত চাষীর বাড়িতে এসেছেন সেজন্ত আমরা খুব খুশি হয়েছি। ঈশ্বরের কাছে সর্বদাই প্রার্থনা করি যাতে ই'র

এক্স' সেন্সি…।''

গলাটা পরিষ্কার করে স্বর চড়িয়ে নেখ্‌ল্যুদভ আগের প্রশ্নটাই আবার করল, "তোমাকে ঘোড়া বিক্রি করতে হচ্ছে কেন ?"

এপিফান একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল, চুলটা পিছনে ঠেলে দিল, ঘরের চার দিকটা দেখল, বেঞ্চির উপর একটা বিড়ালকে আরাম করে শুয়ে থাকতে দেখে চেঁচিয়ে উঠল, "স্‌-স্‌, ভাগ্‌ এখান থেকে, জানোয়ার!'' পরক্ষণেই মনিবের দিকে মুখ ফেরাল।

"ঘোড়াটা কোন কাজের নয় ই'র এক্স' সেন্সি…ভাল ঘোড়া হলে আমি বেচতাম না ই'র এক্স'সেন্সি।''

"ক'টা ঘোড়া তোমার আছে ?"

"তিনটে ই'র এক্স' সেন্সি।''

"একটাও বাচ্চা নেই ?"

"অবশ্যই আছে ই'র এক্স' সেন্সি। একটা বাচ্চাও আছে।''

অধ্যায়—৮

"চল, তোমার ঘোড়াগুলো দেখব। বাড়িতেই আছে তো ?"

"ঠিক তাই ই'র এক্স' সেন্সি। হুকুম মতই কাজ করেছি ই'র এক্স' সেন্সি। ই'র এক্স' সেন্সির অবাধ্য হতে কি পারি! জ্যাক এল্‌পাতিচ্‌ আমাকে বলেছে, ঘোড়াগুলো যেন মাঠে না পাঠাই। সে বলল, 'প্রিন্স দেখতে আসবেন ;' তাই তো মাঠে ছেড়ে দেই নি। ই'র এক্স' সেন্সির অবাধ্য হবার সাহস আমাদের নেই।"

নেখ্‌ল্যুদভ ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই এপিফান তাকের উপর থেকে পাইপটা টেনে বের করে উনোনের পিছনে লুকিয়ে রাখল ; তার ঠোঁট দুটো অনবরতই নড়ছে।

চালার নীচে একটা শুটকো ছোট ধূসর রঙের ঘোটকী পচা ঘাস চিবুচ্ছে ; দু' মাসের একটা বাচ্চা তার লেজের কাছে ঘুর্‌ঘুর্‌ করছে। উঠোনের মাঝখানে একটা পিঙ্গল রঙের পেট-মোটা দামড়া ঘোড়া চোখ বুজে মাথাটা নাড়ছে—দেখলেই বোঝা যায়, চাষীদের কাজের উপযুক্ত ঘোড়াই বটে।

"এই কি তোমার সব ঘোড়া ?"

"না ই'র এক্স' সেন্সি, ঐ ঘোটকী ও তার বাচ্চাটাও তো রয়েছে," এপিফান হাত বাড়িয়ে সে দুটোকেও দেখিয়ে দিল।

"দেখলাম। তুমি কোন্‌টাকে বেচতে চাইছ ?"

"কেন, এটাকে ই'র এক্স' সেন্সি," কথা বলে এপিফান ঘুম-ঘুম দামড়াটাকে দেখিয়ে দিল। ঘোড়াটা চোখ মেলে অলসভাবে লেজটা নাড়তে লাগল।

নেখ্‌ল্যুদভ বলল, "দেখে তো বুড়ো মনে হচ্ছে না, বেশ শক্ত-সমর্থ ঘোড়া। ঘোড়াটাকে ধর তো, ওর দাঁত দেখব। বুড়ো কি না আমি বলে দিতে পারব।"

"একজনের পক্ষে ওটাকে ধরা অসম্ভব এক্স' সেল্সি। ওটার দাম এক পেনিও হবে না ; বড়ই বদমেজাজী—কামড়ায়, লাথি ঝাড়ে।" হাসতে হাসতে চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে এপিফান জবাব দিল।

"কী বাজে কথা বলছ! আমি বলছি, ওটাকে ধর।"

এক পা থেকে আর এক পায়ে শরীরের ভর রেখে এপিফান অনেকক্ষণ ধরে হাসতে লাগল। নেখ্‌ল্যুদভ যখন রেগে চীৎকার করে বলল : "আরে, এসব কী হচ্ছে?" তখন সে ছুটে চালার মধ্যে ঢুকল, ঘোড়ার মুখ বাঁধবার দড়ি নিয়ে বেরিয়ে এসে ঘোড়াটার পিছনে ছুটতে শুরু করল। ভয় পেয়ে ঘোড়াটা যত ছোটে, সেও তত তার পিছনে ছুটতে থাকে।

এ দৃশ্য বরদাস্ত করতে না পেরে তরুণ মনিব নিজের কেরামতি দেখাতে চাইল।

বলল, "দড়িটা আমাকে দাও।"

"মাফ করবেন হুজুর, আপনি পারবেন কেন? দয়া করে একাজ করতে যাবেন না…।"

কিন্তু নেখ্‌ল্যুদভ ঘোড়াটার মাথার কাছে এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ এত জোরে তার কান দুটোকে চেপে ধরল যে শান্ত-শিষ্ট চাষীর দামড়া হলেও সেটা ছাড়া পাবার জন্য ঘাড় নাড়তে লাগল আর নাক ঝাড়তে লাগল। এপিফান তখনও হাসছে। তখন নেখ্‌ল্যুদভ বুঝতে পারল যে এত জোর খাটাবার কোন দরকার নেই। তার উপর এপিফানকে হাসতে দেখে তার মনে হল যে এপিফান তাকে ছেলেমানুষ মনে করে মজা পেয়েছে। তাই সে রেগে গিয়ে ঘোড়ার কান ছেড়ে দিয়ে দড়ি ছাড়াই সেটার মুখ খুলে দাঁত পরীক্ষা করে দেখল : খাদন্তটা ভাল আছে, দু' পাটি দাঁতই উঠেছে—তরুণ মনিবটি এর অর্থ ভালই বোঝে। ঘোড়াটার বয়স সত্যি অল্প।

ইতিমধ্যে এপিফান চালার মধ্যে ঢুকে দেখল যে বিদে মইটা ঠিক জায়-গায় নেই ; সেটাকে তুলে নিয়ে কঞ্চির বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে রাখল।

"এদিকে এস!" নেখ্‌ল্যুদভ চীৎকার করে বলল। তার মুখে একটা ছেলেমানুষী বিরক্তি ফুটে উঠেছে ; রাগে গলা প্রায় ভিজে উঠবার উপক্রম। "আচ্ছা, এই ঘোড়াটা কি বুড়ো?"

"দোহাই ই'র এক্স' সেল্সি, খুব বুড়ো। বিশ বছর তো হবেই।… কতক ঘোড়া…।"

"থাম! তুমি মিথ্যেবাদী! অকর্মার ধাড়ি! ভাল চাষী মিথ্যা কথা বলে না—বলার দরকার হয় না।" রাগে তার কান্না পেয়ে গেল, গলা আটকে গেল।

পাছে চাষীটির সামনেই কেঁদে ফেলে এই ভয়ে সে চুপ করে গেল। এপিফানও চুপ করে রইল ; মনে হল সেও বুঝি যেকোন সময় কেঁদে ফেলবে।

যথেষ্ট শান্ত হবার পরে গলার স্বাভাবিক স্বর ফিরে পেয়ে নেখ্‌লুদভ বলল, "আমাকে বল, এই ঘোড়া বেচে দিলে তুমি জমি চাষ করবে কি দিয়ে? ঘোড়া যাতে চাষের উপযুক্ত থাকে সেজন্য তোমাকে পায়ে হেঁটে কাজ করতে পাঠানো হয়, আর তুমি সেই ঘোড়াটাকেই বেচে দিতে চাও? আর তার চাইতে বড় কথা, তুমি মিথ্যা কথা বললে কেন?"

মনিব শান্ত হতেই এপিফানও শান্ত হল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, "ই'র এক্স' সেল্সির কাজ আমরা অন্য কারও চাইতে খারাপ করব না।"

"কিন্তু চাষ করবে কি দিয়ে?"

হুস্‌-হুস্‌ করে ঘোড়াটাকে তাড়িয়ে দিয়ে এপিফান বলল, "ও নিয়ে ভাববেন না, ই'র এক্স' সেল্সির কাজ আমরা ঠিক করে দেব। টাকার দরকার না হলে কি আর ওটাকে বেচতে চাইতাম?"

"কিন্তু তোমার টাকার দরকার হচ্ছে কেন?"

হাতে বাড়তি ময়দা নেই ই'র এক্স' সেল্সি ; তাছাড়া অন্য চাষীদের কাছ থেকে নেওয়া ধার-কর্জও শোধ করতে হবে।"

"ময়দা নেই? অন্য সকলে সপরিবারে বাস করে, অথচ তাদের ময়দা আছে, আর তোমার তো পরিবার বলতে কিছু নেই, তবু তোমার কাছে ময়দা নেই, এ কেমন কথা? ময়দা কি করেছ তুমি?"

"সব খেয়ে ফেলেছি ই'র এক্স' সেল্সি, তাই এখন হাতে কিছু নেই। হেমন্তকালের আগেই একটা ঘোড়া কিনে ফেলব ই'র এক্স' সেল্সি।"

"খবরদার, ঘোড়া বিক্রির কথা মনেও এনো না।"

"কিন্তু ওটাকে বিক্রি না করলে আমাদের চলবে কেমন করে ই'র এক্স' সেল্সি? হাতে ময়দা নেই, কিছু বেচতেও পারব না...," মুখ ফিরিয়ে ঠোঁট কামড়ে এপিফান জবাব দিল। মনিবের মুখের দিকে উদ্ধত ভঙ্গীতে তাকিয়ে বলল—"তার অর্থ, আমরা না খেয়ে মরব।"

"শোন হে বাপু!" নেখ্‌লুদভ চীৎকার করে বলল ; রাগে তার মুখ সাদা হয়ে উঠেছে ; কেমন একটা ব্যক্তিগত বিদ্বেষ জেগেছে মনে। "তোমার মত চাষী আমি রাখব না। তাতে তোমারই খারাপ হবে।"

নকল বিনয়ে চোখ বুজে এপিফান বলল, "আমি যদি ই'র এক্স' সেল্সিকে তুষ্ট না করে থাকি তো আপনার যা ইচ্ছা তাই করবেন, কিন্তু আমার কাজে কোন ত্রুটি আপনি পান নি। অবশ্য ই'র এক্স' সেল্সি যদি আমাকে পছন্দ না করেন তো আপনি তো সবই করতে পারেন ; কিন্তু কেন যে আমার শাস্তি হবে তা আমি জানি না।"

"হবে এই কারণে: তোমার চালায় ছাউনি নেই, তোমার বেড়া ভেঙে

গেছে, তোমার সারে চাষ পড়ে নিড়ে নি, বাড়িতে বসে বসে শুধু পাইপ টান, কোন কাজ কর না ; আরও কারণ, মা তোমার হাতে সব জমি তুলে দিয়েছে, আর তুমি মাকে এক চিল্‌তে রুটিও দাও না ; উপরন্তু তোমার বৌ তাকে মারধোর করে বলে সে আমার কাছে নালিশ করেছে।"

যেন পাইপ টানাটাই সব চাইতে বড় অপরাধ হয়েছে এমনি ভাব দেখিয়ে এপিফান বলে উঠল, "না, না ই'র এক্স' সেন্সি, পাইপ কাকে বলে আমি তো তাই জানি না। একটা মানুষের সম্পর্কে তো যা খুশি তাই বলা যায়···"

"আমায় মিথ্যে কথা বলছ! আমি নিজে দেখেছি।"

"আপনার কাছে কি মিথ্যা বলতে পারি ই'র এক্স' সেন্সি?"

নীরবে ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে নেখ্‌লয়ুদভ উঠোনময় পায়চারি করতে লাগল। এপিফান এক জায়গায় দাঁড়িয়ে চোখ না তুলে মনিবের পায়ের উপরেই নজর রাখল।

"শোন এপিফান," হঠাৎ চাষীটির সামনে গিয়ে থেমে নিজের উত্তেজনাকে লুকোবার চেষ্টা করে নেখ্‌লয়ুদভ শিশুসুলভ কোমল স্বরে বলল, "এভাবে তুমি বাঁচতে পারবে না—তোমার জীবনটাই বরবাদ হয়ে যাবে। ভাল করে ভেবে দেখ। যদি ভাল চাষী হতে চাও তো জীবনের ধারা বদলাও, খারাপ অভ্যাসগুলি ত্যাগ কর, মিথ্যা কথা বলো না, মদ খেয়ো না, মাকে সম্মান করো। দেখ, তোমার সব খবর আমি রাখি। নিজের জমির দিকে নজর দাও, রাজার জঙ্গল থেকে চুরি করো না, শুঁড়িখানায় যাওয়া বন্ধ কর। ও সবে কি লাভ?—ভাল করে ভাব। যদি কিছু দরকার হয়, আমার কাছে যেয়ো, তোমার কি চাই সে কথা আমাকেই সোজাসুজি বলো, আর কেন চাই তাও বলো। মিথ্যা বলো না. পুরো সত্যি কথাই বলো, তাহলে সাধ্যমত তোমাকে আমি ফিরিয়ে দেব না।"

"মাফ করুন ই'র এক্স' সেন্সি, আপনার কথা আমরা বুঝতে পেরেছি।" এপিফান হেসে বলল ; যেন মনিবের রসিকতাটা সে ভালই বুঝতে পেরেছে।

সেই হাসি আর সেই জবাবে নেখ্‌লয়ুদভের স্বপ্ন ভঙ্গ হল ; এপিফানের হৃদয়কে স্পর্শ করে সৎপরামর্শ দিয়ে তাকে সৎপথে নিয়ে আসবার আশা সম্পূর্ণ তিরোহিত হল। উপরন্তু তার মনে হল, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নিজের ভূমিদাসকে এভাবে বোঝাতে চেষ্টা করাটাই তার পক্ষে অশোভন হয়েছে ; যেসব কথা সে বলেছে তা বলাও তার পক্ষে উচিত হয় নি। দুঃখিত মনে মাথা নীচু করে সে বারান্দায় চলে গেল। ঘরের চৌকাঠে বসে বুড়িটা গলা চড়িয়ে কাঁদছে ; মনিবের সব কথাই শুনেছে ; বুঝি সেই কথার জন্য সহানুভূতি জানাতেই সে কাঁদছে।

তার হাতে এক রুবলের নোট দিয়ে নেখ্‌লয়ুদভ ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "রুটি কিনবার জন্য তোমাকে সামান্য কিছু দিলাম। নিজে কিনো, এটা

এপিকানের হাতে দিও না, দিলেই সে মদ খেয়ে উড়িয়ে দেবে।"

হাড়-জিরজিরে হাত দিয়ে দরজার খুঁটিটা ধরে বুড়ি উঠে দাঁড়িয়ে মনিবকে ধন্যবাদ জানাতে চেষ্টা করল, কিন্তু তার মাথাটা কাঁপতে লাগল; পায়ের উপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াবার আগেই নেখ্‌ল্যুদভ রাস্তাটা পার হয়ে গেল।

অধ্যায়—৯

"হোয়াইট ডেভিড চেয়েছে শস্য ও খুঁটি," নেখ্‌ল্যুদভের নোট-বইতে তারপরেই এই কথাগুলি লেখা ছিল।

কয়েকটা বাড়ি পার হয়ে গলির মোড়েই তার নায়েব জেকব এল্‌পাতিচ-এর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দূর থেকে মনিবকে দেখেই মাথার তেল-চামড়ার টুপিটা খুলে একটা নোংরা রুমাল বের করে তার ফোলা লাল মুখটা মুছতে শুরু করল।

"টুপিটা মাথায় দাও জেকব! আমি বলছি, মাথায় দাও…"

তবু টুপিটা মাথায় না দিয়ে সেটাকে সূর্যের দিকে ধরে জেকব বলল, "ইয়োর এক্সেলেন্সি কোথায় গিয়েছিলেন?"

"গিয়েছিলাম ওয়াইজম্যানের কাছে। আচ্ছা বল তো, তার এরকম অবস্থা হয়েছে কেন?" চলতে চলতেই মনিব জিজ্ঞাসা করল।

"কি রকম অবস্থা ইয়োর এক্সেলেন্সি?" নায়েব জিজ্ঞাসা করল। বেশ কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখেই সে মনিবের পিছু পিছু চলেছে। এতক্ষণে সে টুপিটা মাথায় দিয়ে গোঁফে চাড়া দিচ্ছে।

"কি অবস্থাই বটে! লোকটা হাড় পাজি—অলস, চোর, মিথ্যাবাদী, মায়ের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে; দেখে মনে হল সে এত বড় অকর্মার ধাড়ি যে তার সংশোধনের কোন আশাই নেই।"

"আমি তো জানি না ইয়োর এক্সেলেন্সি, সে আপনাকে এতখানি বিরূপ করে তুলেছে কেমন করে…"

মনিব বাধা দিয়ে বলল, "আর তার বৌও একটি ভয়ংকর চিজ্। মায়ের হাল তো ভিখারিরও অধম, মুখে দেবার একটা দানা নেই, অথচ বৌয়ের পোশাকের বাহার কত, আর তার নিজেরও তাই। তাকে নিয়ে যে কি করব বুঝতে পারছি না।"

নেখ্‌ল্যুদভ এপিফানের বৌয়ের কথা উল্লেখ করায় জেকব স্পষ্টতই বিচলিত হয়ে পড়ল। সে বলতে লাগল, "সে যদি এইভাবেই চলতে থাকে তাহলে তো আমাদের একটা ব্যবস্থা নিতেই হবে। একথা ঠিক যে এক-জনের সব পরিবারের মতই সেও গরীব; কিন্তু সে অন্যদের মত নয়, সব

সময়ই কিছুটা হাতে রেখে সে চলে। সে বুদ্ধিমান, লিখতে-পড়তে জানে, আর বেশ সৎলোক। মাথা-গুণতি কর আদায় করতে তো তাকেই চারদিকে পাঠানো হয়; আমার আমলে এই তিন বছর ধরে সেই তো গ্রাম-প্রধান হয়েছে; কখনও তার কোন দোষ তো পাই নি। তিন বছর আগে আপনার অভিভাবক তাকে বরখাস্ত করেছিলেন, কিন্তু জমিদারিতে কাজ করার সময়ও সে তো ঠিক ঠিক কাজই করত। শুধু শহরের পোস্ট স্টেশনে থাকার দরুণ একটু নেশার অভ্যাস করে ফেলেছে; তা সেজন্য তার বিরুদ্ধে অবশ্যই কোন ব্যবস্থা নিতে হবে। এর আগে যখন খারাপ ব্যবহার করেছিল তখন চাবুক মারার ভয় দেখিয়েছিলাম, আর তাতেই সায়েস্তা হয়ে গিয়েছিল। তাতে তার ভালই হয়েছিল, পরিবারে শান্তি ফিরে এসেছিল; কিন্তু ওসব ব্যবস্থা যখন আপনি সমর্থন করেন না, তখন তাকে নিয়ে কি যে করা হবে তা আমি জানি না। আমি জানি, সে আবার খারাপ পথ ধরেছে। তাকে সৈন্য হিসাবেও পাঠানো যাবে না, কারণ আপনিও হয়তো লক্ষ্য করেছেন যে তার দুটো দাঁত নেই। অনেককাল আগে সে নিজেই সে দুটোকে উপড়ে ফেলেছে। কিন্তু হুজুর যদি অনুমতি দেন তো বলি, শুধু সে একাই হাতের বাইরে চলে যায় নি।"

ঈষৎ হেসে নেখ্‌লু্যদভ বলল, "ওসব কথা থাক জেকব! ও নিয়ে আমরা বার বার আলোচনা করেছি। এবিষয়ে আমার মতামত তুমি জান; যতই যা বল, আমার মতের পরিবর্তন হবে না···।"

দুই কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে পিছন থেকে মনিবের দিকে চোখ রেখে জেকব বলল, "অবশ্য ইয়োর এক্সেলেন্সিই সব চাইতে ভাল বুঝবেন। তবে ঐ বুড়ির ব্যাপারটা নিয়ে আপনি অকারণেই কষ্ট পাচ্ছেন। একথা ঠিক যে বাপ-মরা ছেলেমেয়েগুলোকে সেই মানুষ করেছে, এপিফানকে বড় করেছে, বিয়ে দিয়েছে, সব কিছু করেছে; কিন্তু চাষীদের মধ্যে এটাই রীতি যে মা বা বাবা যখন ছেলের হাতে বাড়ি-ঘর ছেড়ে দেয় তখন ছেলে আর তার বৌই মালিক হয়ে বসে, আর বুড়িকে সাধ্যমত খেটে তার পেটের জোগাড় করতে হয়। অবশ্য তারা যে তার প্রতি সদয় নয় এটা ঠিক, কিন্তু চাষীদের সমাজে এটাই স্বাভাবিক রীতি। কাজেই আমি বলতে সাহস পাচ্ছি যে অকারণেই আপনি বুড়ির কথা ভেবে কষ্ট পাচ্ছেন। সে বুদ্ধিমতী, গৃহস্থালীও ভালই বোঝে, কিন্তু এইসব সামান্য বিষয় নিয়ে মনিবকে বিরক্ত করা কেন? দেখুন, পুত্রবধূর সঙ্গে তার ঝগড়া হয়েছিল, আর পুত্রবধূ হয় তো তাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল—সেসব তো মেয়েলি ব্যাপার! আপনাকে বিরক্ত না করে সে ব্যাপার তো তারা নিজেরাই মিটিয়ে ফেলতে পারত। আর তাছাড়া, এসব নিয়ে আপনি বড় বেশী বিচলিত হন," পিতৃসুলভ মমতায় ও বদান্যতায় মনিবের দিকে তাকিয়ে নায়েব বলল; নেখ্‌লু্যদভ তখনও বড়

বড় পা ফেলে নীরবে রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছে।

"আপনি কি বাড়ি চলেছেন স্যার?" সে শুধাল।

"না, দেখা করতে যাব হোয়াইট ডেভিড, না 'ছাগল'···কি বলে যেন তাকে ডাকে?"

"ঐ আর এক মহা আলসে, সেকথা আপনাকে বলে দিচ্ছি। গোটা 'ছাগল' পরিবারটাও ঐ রকম। যতই যা করুন, কিছুতেই কিছু হবে না। কাল চাষীদের ক্ষেত দেখতে গিয়েছিলাম, সে তো বাক-গম এখনও বোনেই নি। এসব লোক দিয়ে কি করে কাজ চলে? বুড়ো যদি ছেলেকেও কাজটা শিখিয়ে দিত, কিন্তু সে নিজেও মহা আলসে—নিজেরই হোক আর মালিকেরই হোক, সব সময় কাজে টালবাহানা করে।···আপনার অভিভাবক ও আমি—তাদের জন্য কি না করেছি? তাকে থানায় পাঠিয়েছি, বাড়িতে চাবুক মেরেছি—কিন্তু আপনার তো আবার তাতে সায় নেই···।"

"কাকে? বুড়ো লোকটিকে নিশ্চয় নয়?"

"বুড়োকেই স্যার। আপনার অভিভাবক তো অনেকবারই সারা কম্যুনের সামনে তাকে চাবুক খাইয়েছেন। কিন্তু আপনি কি বিশ্বাস করবেন, তাতেও কোন ফল হয় নি! কাঁপতে কাঁপতে বাড়ি ফিরে গেল, বাস, আবার যে কে সেই। তবু আমি বলব, ডেভিড শান্ত মানুষ, মোটেই বোকা নয়; ধূমপান করে না, মদ খায় না; অথচ দেখুন না, অনেক মাতালের চাইতেও সে খারাপ। তার একমাত্র দাওয়াই সৈন্যদলে পাঠানো অথবা নির্বাসনে দেওয়া—আর কিছুতেই কিছু হবে না। গোটা 'ছাগল' পরিবারটাই এই রকম। মাত্রিউশ্‌কাও ঐ পরিবারের মানুষ; খোলা চালায় পড়ে থাকে, একেবারে আলসের ডিম! কিন্তু আপনার বোধ হয় আমাকে দরকার নেই ইয়োর এক্সেলেন্সি?" তার কথা মনিব মোটেই শুনছে না দেখে নায়েব বলল।

"না, তুমি যেতে পার," অন্যমনস্কভাবে কথাটা বলে নেখ্‌লুদভ হোয়াইট ডেভিডের বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল।

গ্রামের শেষ প্রান্তে ডেভিড-এর একটেরে নড়বড়ে বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। উঠোন নেই, ভাটি নেই, গোলা নেই; একদিকে কয়েকটা নোংরা গোয়াল ঘর, আর অন্যদিকে বাইরের ঘর তৈরির জন্য সংগৃহীত কাঠ-খুঁটি, কড়ি-বরগা স্তূপ করে রাখা। একসময় যেখানে উঠোন ছিল সেখানে লম্বা সবুজ ঘাস জন্মেছে। বাড়ির আশেপাশে লোকজন নেই; শুধু একটা শুয়োরের বাচ্চা ডোবার মধ্যে নড়াচড়া করছে।

নেখ্‌লুদভ একটা ভাঙা জানালায় টোকা দিল; কিন্তু কেউ সাড়া না দেওয়ায় ভিতরে ঢুকে হাঁক দিল, "হল্লো! কে আছ।" কোন সাড়া এল না। বারান্দা পেরিয়ে শূন্য গোয়ালটা দেখে ঘরের দরজায় ঢুকল। একটা বুড়ো লাল মোরগ ও দুটো মুরগি মেঝেতে ও বেঞ্চিতে খুট্‌-খুট্‌ করে বেড়াচ্ছে।

একজন মানুষকে দেখে তারা ডানা মেলে কক্-কক্ করতে করতে উড়ে গিয়ে দেয়ালের উপর পড়ল; একটা তো লাফিয়ে উনোনের উপরেই উঠে গেল। ঘরটার আয়তন চৌদ্দ বর্গফুটও হবে না; ইটের উনোন ও ভাঙা চিমনি, একটা তাঁত, আর উপরটা চটে-যাওয়া একটা কালো টেবিলেই ঘরটা প্রায় ভরে গেছে।

বাইরেটা শুকনো খট্‌খটে হলেও চৌকাঠের কাছে ঘরের মধ্যে একটা নোংরা ডোবার মত সৃষ্টি হয়েছে; বর্ষাকালে ছাদের ফুটো দিয়ে জল পড়ে পড়েই এটা হয়েছে। ঘরে কোন বিছানা নেই। ঘরের ভিতরে ও বাইরে সব কিছু এতই এলোমেলো ও অগোছালো যে এখানে কেউ যে বাস করে সেটা বিশ্বাস করাই শক্ত। অথচ হোয়াইট ডেভিড ও তার গোটা পরিবার-টাই সেখানে বাস করে; আর সেইমুহূর্তে জুন মাসের গরমেও ভেড়ার চামড়ায় মাথা পর্যন্ত ঢেকেঢুকে ডেভিড ঘরের এক কোণে উনোনের উপর গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ভীত মুরগিটা এখনও সেখান থেকে নীচে নামে নি; চুপচাপ না থেকে সেটা তার পিঠের উপরেই হেঁটে বেড়াচ্ছে; অথচ তাতেও তার ঘুম ভাঙে নি।

ঘরের মধ্যে কাউকে দেখতে না পেয়ে নেখ্‌ল্যুদভ চলেই যাচ্ছিল, এমন সময় একটা একটানা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ঘুমন্ত লোকটির উপস্থিতির কথা জানিয়ে দিল।

"হুল্লো, কে ওখানে?" মনিব হাঁক দিল।

উনোনের উপর থেকে তার একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ভেসে এল।

"কে ওখানে? এখানে এস!"

মনিবের ডাকের জবাবে শোনা গেল আরও একটা দীর্ঘশ্বাস, একটা আর্ত-নাদ ও একটা লম্বা হাইয়ের শব্দ।

"আহা, কি চাই?"

উনোনের উপরে কী যেন ধীরে ধীরে নড়ে চড়ে উঠল। ভেড়ার চামড়ার ছেঁড়া কোটের একটা কোণ দেখা গেল; ছেঁড়া বাকলের জুতো পরা একটা বড় পা নেমে এল, তারপর আর একটা পা, এবং শেষ পর্যন্ত গোটা হোয়াইট ডেভিডের আবির্ভাব হল; উনোনের উপর বসে মস্ত বড় মুঠিতে অত্যন্ত আলসেমির সঙ্গে অসন্তুষ্টভাবে সে চোখ দুটো রগড়াতে লাগল। একটা হাই তুলে ধীরে ধীরে মাথাটা ঘুরিয়ে সে ঘরের চারদিকটা একবার দেখে নিল; মনিবকে দেখে সে আগের চাইতে একটু তাড়াতাড়ি নড়াচড়া করতে শুরু করল বটে, কিন্তু তাতেও সে উনোনের উপর থেকে নেমে আসতে আসতে নেখ্‌ল্যুদভ তিনবার ঘরটাকে পাক দিয়ে ফেলল।

হোয়াইট ডেভিড সত্যি সাদা: তার চুল, শরীর, মুখ—সবই একেবারে সাদা। গড়নটা বেশ লম্বা ও মজবুত, কিন্তু ঠিক চাষীদের মত মজবুত নয়,

কেমন যেন ফুলো-ফুলো, স্বাস্থ্যহীন। মুখটা সুন্দর, শান্ত হাল্কা নীল চোখ, চওড়া লম্বা দাড়ি—সব কিছুতেই যেন স্বাস্থ্যহীনতার আভাষ: রোদে-পোড়া তামাটে ভাবটাও নেই; হাল্কা হলুদের আভাষ; চোখের নীচে একট লালচে আভা; কেমন যেন ফোলা-ফোলা। উদরী রোগীর মত হাত দুটিও ফোলা-ফোলা ও হলুদে, সাদা সাদা লোমে ঢাকা। তার চোখে তখনও এত ঘুম যে ভাল করে চোখও খুলতে পারছে না, বা না টলে দাঁড়াতেও পারছে না।

নেখ্‌লয়ুদভ বলতে আরম্ভ করল, "তোমার লজ্জা করে না? দিনের বেলায় যখন বাইরের ঘরটা তোলার কথা তখন তুমি পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছ, আর এদিকে ঘরে একদানা খাবার নেই…"

ডেভিড যখন ব্যাপারটা বুঝতে পারল, যখন দেখল যে মনিব তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তখন সে দুই হাত এক করে পেটের উপর রেখে মাথাটা নীচু করে এক পাশে একটু হেলে দাঁড়িয়ে রইল, একটুও নড়াচড়া করল না। সে চুপচাপ; কিন্তু তার মুখের ভাব ও দেহের ভঙ্গী যেন বলে দিচ্ছে: "আমি জানি, আমি জানি, এই প্রথম একথা শুনছি না। বেশ তো, মারতে হয় মারুন। আমি সব সহ্য করব।" তার যেন মনের ইচ্ছা, মনিব মুখের কথা থামিয়ে তাড়াতাড়ি তাকে মারুন, দুই ফোলা গালে আচ্ছা করে চড় কসিয়ে দিন, শুধু তার পরে তাকে একটু শান্তিতে থাকতে দিন। ডেভিড তার কথা বুঝতে পারছে না দেখে নেখ্‌লয়ুদভ নানাভাবে প্রশ্ন করে তার এই মৌনব্রত ভাঙবার চেষ্টা করতে লাগল।

"তুমি আমার কাছে কাঠ চাইলেই বা কেন, আর সারাটা মাস সেগুলিকে এখানে ফেলেই বা রেখেছ কেন? বিশেষ করে এই সময়ে যখন তোমার হাতে আছে প্রচুর অবসর?"

ডেভিড তেমনই চুপ করে রইল, একটুও নড়ল না।

"শোন, আমার কথার জবাব দাও!"

ডেভিড বিড়বিড় করে কি যেন বলল; চোখের সাদা লোমগুলো পিট্-পিট্ করতে লাগল।

"তুমি তো জান বন্ধু, সকলকেই কাজ করতে হয়। কাজ না করলে কি কিছু হতে পারে? দেখছ তো। তোমার ঘরে একদানা খাবার নেই, কিন্তু কেন? কারণ তোমার জমিতে ভাল চাষ হয় নি, ভালভাবে নিড়েন পড়ে নি, অনেক দেরিতে বীজ বোনা হয়েছে—আর সেসবেরই কারণ আলস্য। তুমি আমার কাছে খাদ্যশস্য চেয়েছ: ধর, আমি তোমাকে কিছুটা দিলাম, কারণ তোমাকে তো না খাইয়ে মেরে ফেলতে পারি না—কিন্তু এভাবে তো চলবে না। কার ফসল আমি তোমাকে দেব? তুমিই বল, কার ফসল? বল, আমার কথার জবাব দাও! কার ফসল আমি তোমাকে দেব?" নেখ্‌লয়ুদভ বার বার বলতে লাগল।

ভীরু চোখ তুলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে ডেভিড বিড়বিড় করে বলল, "মালিকের"।

"কিন্তু মালিকের ফসল কোথা থেকে আসে? সেটা ভাব। কে জমি চাষ করেছে, মই দিয়েছে? কে ফসল বুনেছে, ফসল কেটেছে? চাষীরা। তাই নয় কি? তাহলেই বোঝ, আমাকে যদি ফসল বিলিয়েই দিতে হয় তো যারা ফসল ফলাতে পরিশ্রম করেছে তাদেরই তো বেশী করে দেওয়া উচিত, আর তুমি পরিশ্রম করেছ সব চাইতে কম। তারা জমিদারিতেও তোমার কাজের ব্যাপারে নালিশ করেছে। তুমি কাজ কর সব চাইতে কম, অথচ মনিবের ফসল চাও সবার চাইতে বেশী। অন্তকে না দিয়ে তোমাকে আমি কেন দেব? তুমি তো বোঝ, সকলেই যদি তোমার মত চিৎ হয়ে শুয়ে থাকত, তাহলে অনেক আগেই আমরা সকলেই না খেয়ে মরে যেতাম। কাজ করতেই হবে বন্ধু। এসব অন্যায়। শুনতে পাচ্ছ ডেভিড?"

"শুনছি স্যার," দাঁতের ফাঁক দিয়ে ডেভিড ধীরে ধীরে বিড় বিড় করে বলল।

অধ্যায়—১০

ঠিক সেই সময় জানালা দিয়ে দেখা গেল, কাঠের বাঁকে জামা-কাপড় ঝুলিয়ে একটি চাষী স্ত্রীলোক আসছে; পরমুহূর্তেই ডেভিডের মা ঘরে ঢুকল। বয়স প্রায় পঞ্চাশ, লম্বা, কর্মঠ ও বেশ সতেজ। দাগ-ভর্তি, কুঁচকে যাওয়া মুখটা দেখতে সুন্দর নয়, কিন্তু তার খাড়া নাক, পাতলা চাপা ঠোঁট ও তীক্ষ্ণ ধূসর চোখে বুদ্ধি ও উদ্যমের প্রকাশ। চৌকো কাঁধ, সমতল বুক, সরু হাত, ও পেশীবহুল খালি পা দুটি দেখলেই বোঝা যায় যে অনেককাল আগে থেকেই নারীত্বকে বিসর্জন দিয়ে সে শুধু একটি মজুরে পরিণত হয়েছে। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে স্কার্টটা নামিয়ে সে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকাল। নেখ্‌ল্যুদভ তার সঙ্গে কথা বলতে চাইল, কিন্তু স্ত্রীলোকটি তার দিকে পিছন ফিরে তাঁতের পিছনে রাখা দেবমূর্তির সামনে ক্রুশ-চিহ্ন আঁকতে লাগল। সে কাজ শেষ করে মাথার চৌখুপি-কাটা নোংরা রুমালটা ঠিক করে নিয়ে সে নীচু হয়ে মনিবকে অভিবাদন করল।

বলল, "হুজুরকে প্রভুর শুভদিন জানাই। ঈশ্বর আমাদের বাবাকে সুখে রাখুন…"

মাকে দেখে ডেভিড আরও বিব্রত হয়ে পড়ল; মাথাটা আরও নীচু করল।

নেখ্‌ল্যুদভ বলল, "ধন্যবাদ আরিনা। তোমার ছেলের সঙ্গে ঘর-সংসারের কথাই বলছিলাম।"

বালিকা বয়স থেকেই চাষীরা তাকে ডাকত "বজরা-টানা আরিনা" বলে। বাঁ হাতের তালুর উপর ডান হাতের কনুইটা রেখে তার উপর থুতনির ভর রেখে স্ত্রীলোকটি মনিবকে তার কথা শেষ করতে না দিয়েই জোরালো কর্কশ গলায় কথা বলতে শুরু করল; তার গলার স্বরে ঘরটা গম্‌গম্‌ করতে লাগল; বাইরে থেকে শুনলে মনে হবে, এক সঙ্গে বেশ কয়েকটি স্ত্রীলোক কথা বলছে।

"ওর সঙ্গে কথা বলে কি লাভ হবে? ও তো মানুষের মত কথাই বলতে পারে না। ঐ তো দাঁড়িয়ে আছে, হতচ্ছাড়া কোথাকার।" ডেভিডের করুণ নীরেট শরীরের দিকে মাথা নেড়ে নেড়ে সে ঘৃণার সুরে বলতে লাগল। "আমার আবার সংসার কি হুজুর? আমরা তো ভিখারী। সারা গাঁয়ে আমাদের মত হতভাগা আর কেউ নেই! নিজেদের জন্য বা জমিদারির জন্য আমরা কিছুই করতে পারি না—এটা খুবই লজ্জার কথা। আর ওর জন্যই আমাদের এই হাল। ওকে পেটে ধরলাম, খাওয়ালাম-পরালাম, মানুষ করলাম, আর এখন এই তো তার ফল! ও তো রুটি ধ্বংস করছে, অথচ এক টুকরো পচা কাঠের চাইতে বেশী কাজ ওর কাছ থেকে পাওয়া যায় না। কাজের মধ্যে তো উনোনের উপর শুয়ে থাকা, আর ঐভাবে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকনো," ছেলের ভঙ্গী নকল করে স্ত্রীলোকটি বলতে লাগল। "পারেন তো আপনি ওকে একটু ভয় দেখান। আমি চাইছি—ঈশ্বরের দোহাই, ওকে নিয়ে আমি আর পারছি না—এই হল অবস্থা।"

চাষীটির দিকে ফিরে নেখ্‌ল্‌য়ুদভ তিরস্কার করে বলল, "মায়ের এই হাল করা কি তোমার পক্ষে পাপের কাজ নয় ডেভিড?"

ডেভিড চুপচাপ।

সেই একই উত্তেজিত অঙ্গভঙ্গী সহকারে আরিনা বলতে লাগল, "রুগ্ন হলেও না হয় কথা ছিল. কিন্তু ওর দিকে তাকিয়ে দেখুন, কারখানার চিমনির মত মস্ত চেহারা! দেখে আপনার মনে হবে, ও তো অনেক কাজ করতে পারে; কিন্তু না, ওই আলসের ডিম, উনোনের উপর পড়ে পড়ে শুধু ঘুমবে। যদি বা কোন কাজে হাত দিল তো ঘুম থেকে উঠতে, চলতে আর কোন কিছু করতে এত সময় লাগিয়ে দেবে যে দেখে দেখে আমার চোখই ক্লান্ত হয়ে পড়বে! এই তো ধরুন না, আজই বুড়ো নিজে গেল জঙ্গলে কাঠ কেটে আনতে, ওকে বলে গেল খুঁটি পুঁতবার জন্য গর্তগুলো খুঁড়ে রাখতে: কিন্তু ওর কম্মই নয়, এখনও কোদালেই হাত লাগায় নি...।" বুড়ি এক মুহূর্ত থামল। "আমি একলা মেয়ে মানুষ। আমাকে একেবারে শেষ করে দিল!" হঠাৎ চীৎকার করে উঠে সে হাত ছুঁড়তে ছুঁড়তে ছেলের দিকে ধেয়ে গেল। "হতভাগা আলসের হাড়ি! ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন!..."

আবার ছেলের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে থুথু ফেলে চোখের জল ফেলতে

ফেলতে মনিবকে উদ্দেশ করে বলতে লাগল, "আমি একেবারে একা রক্ষা-কর্তা! আমার বুড়ো তো রোগা, বয়স হয়েছে, তার মধ্যে আর পদার্থ নেই; সব কিছুই আমাকেই করতে হয়। এত কাজের চাপে পাথরও গুঁড়িয়ে যায়। আমার মরাই ভাল, তাহলেই সব যন্ত্রণার শেষ হয়। এই হতভাগা আমাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে শেষ করেছে! সত্যি বাবা, আমি একেবারে শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি। বৌমাও খাটতে খাটতেই মরে গেছে; আমারও সেই দশাই হবে।"

অধ্যায়—১১

নেখ্‌ল্যুদভ অবিশ্বাসের স্বরে জিজ্ঞাসা করল, "কিসে মরেছে?"

"খাটতে খাটতে রক্ষাকর্তা; ঈশ্বরের পবিত্র নাম নিয়ে বলছি, খেটে খেটেই মেয়েটা মরল। গত বছরের আগের বছর তাকে নিয়ে এলাম বাবুরিনো থেকে," বলতে বলতে বুড়ির গলায় রাগের বদলে দুঃখ ও চোখের জলের ছোঁয়া লাগল। "শান্তশিষ্ট, তর-তাজা যুবতী মেয়ে। বাপের বাড়িতে বেশ সুখে-আরামেই ছিল; অভাব কাকে বলে জানত না; আমাদের এখানে এসেই বুঝল কাজ কাকে বলে—মনিবের জমিদারিতে কাজ, বাড়িতে কাজ, সর্বত্রই কাজ···। সব কাজ করতাম শুধু সে আর আমি। আমার কাছে এ কাজ কিছুই না। আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। কিন্তু সে তো ছেলেমানুষ, তার কষ্ট হত, সাধ্যের অতিরিক্ত খাটাখাটনি করত, বেচারি বড় বেশী খাটত। আর এমনই কপাল, এক বছর আগে সেণ্ট পিটারের উপবাসের দিন তার একটা ছেলে হল। মুখে দেবার রুটি নেই; যা পাই আমরা তো তাই খাই; এদিকে হাতে অনেক জরুরী কাজ;—বেচারির বুকের দুধ শুকিয়ে গেল। সেই প্রথম বাচ্চা; ঘরে গরু নেই; শুধু হাত দিয়ে তো আর বাচ্চা মানুষ করা যায় না। দেখুন, মেয়েটা একটু বোকাও ছিল—তাতেই তার দুঃখ আরও বাড়ল। বাচ্চাটা মরে গেলে সে শুধু কাঁদত আর কাঁদত, সব সময় হা-হুতাশ করত; তার উপর অভাব আর কাজের চাপ; অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে লাগল: গ্রীষ্মকাল নাগাদ তার শরীর এতই ভেঙে পড়ল যে "ইস্টারসেশন" উৎসবের সময় সে নিজেও মারা গেল। ওই—ওই জানোয়ারটাই তাকে মেরে ফেলেছে!" অসহায় ক্রোধে ছেলের দিকে ফিরে সে আর একবার কথাটা বলল। তারপর একটু থেমে গলা নামিয়ে অভিবাদন করে বলল, "আপনাকে একটা কথা বলতে চাই হুজুর···"

তার কাহিনী শুনে নেখ্‌ল্যুদভ বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছে; অন্যমনস্ক-ভাবে সে বলল, "কি কথা?"

"দেখছেন তো ও এখনও জোয়ান-মদ্দ মানুষ। আমি আর কত কাজ

করব ? আজ না হয় বেঁচে আছি, কাল তো মরে যাব। বৌ ছাড়া ওর চলবে কেমন করে ? ও তো আপনারও কোন কাজে লাগবে না।···আমাদের জন্য একটু ভাবুন। আপনি তো আমাদের বাবার মত।"

"তার মানে তুমি ওর বিয়ে দিতে চাও ? বেশ তো, ভাল কথা।"

"আপনি আমাদের বাপ-মা! একটু কৃপা করুন।" ছেলেকে ইসারায় ডেকে নিয়ে দুজনেই মনিবের পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ল।

বুড়ির কাঁধ ধরে তুলে নেখ্‌ল্যুদভ বিরক্তির সঙ্গে বলল, "ওভাবে পায়ে পড়ছ কেন ? যা বলবার সহজভাবে বলতে পার না ? তোমরা তো জান, পায়ে পড়া আমি পছন্দ করি না। যদি চাও তো ছেলের বিয়ে দাও। ওর জন্য একটি বৌ যদি পেয়ে থাক তাহলে আমি খুশিই হব।"

বুড়ি উঠে আস্তিন দিয়ে চোখ মুছতে লাগল। মায়ের দেখাদেখি ডেভিডও তাই করল; চোখ মুছে ধৈর্য ধরে আরিনার কথাগুলি মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগল।

"মেয়ে তো আছে—অনেক মেয়েই আছে। ভাস্কা মিখা-র মেয়েই তো আছে; মেয়েটি ভাল; কিন্তু আপনার ইচ্ছা না হলে সে রাজী হবে না।"

"সে কি রাজী না ?"

"না রক্ষাকর্তা, তার মত চাইলে সে রাজী হবে না।"

"তাহলে আর কি করা যাবে ? আমি তো তার উপর জোর করতে পারি না। অন্য কাউকে দেখ—আমাদের এখানে না হয়, অন্য গাঁয়ে দেখ। সে যদি স্বেচ্ছায় আসে, আমি তাকে টাকা দিয়ে কিনে নেব, কিন্তু তাকে তো জোর করে বিয়ে করাতে পারি না। আইনে তা বলে না, আর সেকাজ খুবই পাপের।"

"হে, হে রক্ষাকর্তা! আমাদের এই জীবন, এই দারিদ্র্য দেখেও কোন মেয়ে কি স্বেচ্ছায় আসবে ? এমন কি অতি বড় গরীব সৈনিকের বউটিও এরকম গরীব ঘরে আসতে রাজী হবে না। এরকম ঘরে কোন্ চাষী তার মেয়ে দেবে ? কোন বেপরোয়া লোকও তা করবে না। আহা, আমরা যে কপর্দকহীন, ভিখারী। তারা তো বলবে, একটাকে আমরা না খাইয়ে মেরে ফেলেছি, তাদের মেয়ের কপালেও তাই ঘটবে। কে মেয়ে দেবে ?" সন্দেহের ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে সে বলল। "সব কথা ভেবে দেখুন হুজুর।"

"কিন্তু আমি কি করতে পারি ?

"আমাদের জন্য একটা কিছু উপায় ভেবে বার করুন," আরিনা মিনতি করে বলল। "আমরা এখন কি করব ?"

"কিন্তু আমি কি উপায় করব ? এরকম অবস্থায় আমি কিছুই করতে পারি না।"

"আপনি না করলে আর কে করবে ?" মাথাটা নীচু করে সখেদে দুই

হাত ছড়িয়ে দিয়ে আরিনা বলল।

মনিব চুপ করে রইল। আরিনা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগল। ছেলে তারই প্রতিধ্বনি করে চলল। একটু পরে মনিব বলল, "শস্যের কথা যা বলেছ, তা যাতে কিছুটা পাও সে হুকুম আমি দিয়ে দেব। এর বেশী কিছু করতে পারব না।"

নেখ্‌লয়ুদভ বাইরে বেরিয়ে গেল। মা ও ছেলে মাথা নুইয়ে তার পিছু নিল।

অধ্যায়—১২

মস্ত বড় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আরিনা বলল, "ওঃ, কী জীবন আমার!"

সে থামল; রেগে ছেলের দিকে তাকাল। ডেভিড সঙ্গে সঙ্গে মুখটা ঘুরিয়ে চৌকাঠের উপর মস্ত বড় নোংরা বাবলের জুতোর শব্দ করতে করতে দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আরিনা বলতে লাগল, "ওকে নিয়ে আমি কি করব মালিক? ও যে কী মানুষ তা তো নিজেই দেখলেন। ও লোক খারাপ নয়, মদ খায় না, ভদ্র, একটা ছোট ছেলেরও ক্ষতি করে না—অন্য কথা বললে পাপ হবে। ওর মধ্যে খারাপ কিছু নেই—কেন যে ও নিজেই নিজের শত্রু হয়ে উঠেছে তা কেবল ঈশ্বরই জানেন। এজন্য ও নিজেও দুঃখিত। আপনি কি বিশ্বাস করবেন, ওর দিকে যখন তাকাই, ওর কষ্ট চোখে দেখি, তখন আমার বুকটা ফেটে যায়। ও যাই হোক, ওকে তো আমি পেটে ধরেছি, ওর জন্য আমার কষ্ট হয়!…কি জানেন, ওযে আমার বিরুদ্ধে, বা ওর বাবার বিরুদ্ধে, বা কর্তাদের বিরুদ্ধে গেছে তাও নয়। ও বড়ই ভীরু, বলা যায় একেবারেই ছেলে মানুষের মতই। বৌ ছাড়া ও যে কেমন করে বাঁচবে? আমাদের জন্য একটা ব্যবস্থা করুন রক্ষাকর্তা।" তারপর ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "আপনি কি জানেন হুজুর, ও যে কেন এরকম হয়ে গেল তা নিয়ে আমি এটা-ওটা অনেক ভেবেছি, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না। একমাত্র হতে পারে, কোন খারাপ লোক ওকে তুক্ করেছে।"

বুড়ি একটু চুপ করল।

"ঠিক মত লোক খুঁজে পেলে ও হয়তো সেরে উঠত।"

"কী বাজে কথা বলছ আরিনা? মানুষকে আবার তুক্ করে কেমন করে?"

"ওঃ কর্তা, মানুষকে এমনভাবে তুক্ করা যায় যেসে আর মানুষ থাকে না! জগতে কি খারাপ লোকের অভাব আছে নাকি! রাগের বশেই তারা হয় তো কোন মানুষের পায়ের ছাপ থেকে খানিকটা মাটি নিয়ে নিল…বা ঐ

ধরনেরই কিছু···অমনি সে আর মানুষ থাকবে না। শয়তান কি আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে থাকে ? আমি তো ভাবছি—ভরোবেভ্‌কা-নিবাসী বুড়ো দান্দুক-এর কাছে একবার যাব নাকি ? সে অনেক রকম মন্ত্র-তন্ত্র, গাছ-গাছড়া জানে ; মন্ত্র কাটান দিতে পারে, আর ক্রুশের ভিতর থেকে জলের ধারা বইয়ে দিতে পারে। সে হয় তো সাহায্য করতে পারবে! হয় তো ওকে ভাল করে তুলতে পারবে।"

দুঃখিত মনে মাথা নাড়তে নাড়তে বড় বড় পা ফেলে গ্রামের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে তরুণ মনিবটি ভাবতে লাগল, "কী দারিদ্র্য আর অজ্ঞতা! তাকে নিয়ে আমি কি করব ? কি আমার জন্য, কি অন্যের সামনে দৃষ্টান্ত হিসাবে, কি তার নিজের জন্য, তাকে তো এভাবে রাখা যায় না। তার এই অবস্থা চোখে দেখা যায় না, কিন্তু এর ভিতর থেকে তাকে উদ্ধারই বা করব কেমন করে ? জমিদারির উন্নতি সাধনের যেসব পরিকল্পনা আমি করেছি, সে যে সবই নষ্ট করে দেবে।·· তার মত চাষী যতদিন থাকবে ততদিন আমার স্বপ্ন কখনও সফল হবে না।···সে যখন কাজ করতেই চায় না, তখন জেকবের পরামর্শ মত তাকে কি সাইবেরিয়ায় পাঠিয়ে দেব, না কি সৈন্যদলে পাঠাব ? যেমন করে হোক তার হাত থেকে রেহাই পেতেই হবে, আর অন্য একটি সৎ চাষীকে সৈন্যদলে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে হবে," মনে মনেই সে কথা-গুলি বলল।

একথা ভাবতেই সে বেশ খুশি হল ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা অস্পষ্ট চেতনা তাকে বলল, সে শুধু মনের একটা দিক থেকেই এই কথাগুলি ভেবেছে, আর এটা ঠিক নয়। সে থামল। নিজেকেই প্রশ্ন করল, "একটু সবুর কর, আমি কি যেন ভাবছিলাম? ও, হ্যাঁ, সৈন্যদলে বা নির্বাসনে পাঠাবার কথা। কিন্তু কিসের জন্য ? সে তো ভাল মানুষ, অন্য অনেকের চাইতে ভাল—তাছাড়া, আমি কতটুকুই বা জানি ? ···তাকে কি মুক্ত করে দেব ?" সে ভাবল ; আগের মত এখন আর সে মনের একটা দিক থেকে প্রশ্নটাকে ভাবছে না। "সেটা তো অন্যায় ও অসম্ভব।" কিন্তু হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় সে খুশি হয়ে উঠল ; যেন একটা কঠিন সমস্যার সমাধান করে ফেলেছে এমনই হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। সে ভাবতে লাগল, "তাকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাই, নিজে তার উপর নজর রাখব, ধীরে ধীরে তাকে কাজে অভ্যস্ত করে তুলব, এবং দয়ার সাহায্যে, অনুরোধের সাহায্যে, ও ঠিক মত কাজ দিয়ে তার চরিত্রকে ভাল করে তুলব।"

অধ্যায়—১৩

সানন্দ আত্মতুষ্টির সঙ্গে নেখ্‌লুয়ুদভ নিজের মনেই বলল, "এই কাজই করব।" সম্পন্ন চাষী দুত্‌লভ-এর সঙ্গে এখনও দেখা করা বাকি আছে, এই কথা মনে হতেই গ্রামের মাঝখানে অবস্থিত দুটো চিমনিওলা একটা উঁচু বাড়ির দিকে সে পা বাড়াল। বাড়িটার কাছাকাছি যেতেই পাশের বাড়ি থেকে সাদাসিধে পোশাক পরা একটি স্ত্রীলোক বেরিয়ে এল।

তার পাশে থেমে মিষ্টি হেসে মাথা নুইয়ে স্ত্রীলোকটি বলল, "খুশির ছুটির দিন স্যার।"

নেখ্‌লুয়ুদভ বলল, "শুভ সকাল ধাই। কেমন আছ? তোমার প্রতি-বেশীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।"

"খুব ভাল কথা ইয়োর এক্সেলেন্সি। কিন্তু দয়া করে একবার ভিতরে আসবেন না? আমার বুড়ো খুব খুশি হবে!"

"বেশ তো, ভিতরে গিয়ে একটু কথাবার্তাই বলা যাক।"

এই স্ত্রীলোকটিই তার ধাই ছিল। তার পিছু পিছু উঠোনে ঢুকে নেখ্‌লুয়ুদভ একটা পিপের উপর বসে সিগারেট ধরাল।

"ওখানটা বড় গরম। এস, এখানে বসেই একটু গল্প করা যাক," ধাই তাকে ঘরের ভিতরে যেতে বলায় সে কথাগুলি বলল। নার্সটি এখনও দেখতে বেশ তাজা ও সুদর্শনা। তার মুখ, বিশেষ করে বড় বড় দুটি কালো চোখ, দেখতে অনেকটা তার মনিবের মত।

"আপনি দয়া করে দুত্‌লভের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন কেন স্যার?"

"আমার ইচ্ছা, তাকে কিছু জমি, প্রায় ত্রিশ দেসিয়াতিনের মত (১ দেসিয়াতিন = ২$\frac{৩}{৪}$ একর), তাকে ভাড়া-বিলি করব, আর তার সঙ্গে অংশী-দারীতে একটা খামার বানাব এবং একটা জঙ্গল কিনব। দেখ, ওর তো টাকা আছে, তাহলে সে টাকাটা অকেজো হয়ে পড়ে থাকবে কেন? তুমি কি মনে কর ধাই?"

"বেশ তো, কেন করবেন না? অবশ্য সকলেই জানে যে দুত্‌লভরা খুব শক্ত মানুষ। আমি তো মনে করি, এ জমিদারির সেই প্রধান চাষী," মাথা দোলাতে দোলাতে ধাই বলল। "গত সন তো আপনাকে বিরক্ত না করে নিজেদের কাঠ দিয়েই তারা আর একটা বাড়ি বানিয়েছে। তাদের তো ছোট ছোট বাচ্চা ছাড়াও অন্তত আঠারোটা ঘোড়া আছে; আর গরু ও ভেড়া—সেগুলোকে নিয়ে মেয়েরা যখন পথে বেরোয় তখন তো সেটা দেখবার মত দৃশ্য; তাছাড়া বেশী না হলেও দু'শ মৌচাক তো তাদের নিশ্চয় আছে। দুত্‌লভ তো শাঁসালো চাষী; তার তো টাকা থাকবেই।"

"তুমি কি মনে কর তার অনেক টাকা আছে?" নেখ্‌লুয়ুদভ জানতে

চাইল।

"লোকে তো বলে—সেটা তাদের হিংসাও হতে পারে—যে বুড়োর অনেক টাকা। স্বভাবতই সেকথা সে মুখে বলে না, বা ছেলেদেরও বলে না, তবে টাকা তার আছে। জঙ্গল কেনায় তার আগ্রহ হবে না কেন? অবশ্য তার টাকার কথাটা জানাজানি হয়ে পড়বার একটা ভয় আছে। বছর পাঁচেক আগে সরাইওলা স্মালিক-এর সঙ্গে ভাগে সে মাঠ কিনেছিল, কিন্তু হয় সরাইওলা তাকে ঠকিয়েছে, বা অন্য কিছু ঘটেছে, বুড়ো মানুষটির তাতে প্রায় তিন শ' রুবল নষ্ট হয়, আর সেই থেকে সেও মাঠ ছেড়ে দিয়েছে. তাছাড়া, তারা বড় মানুষ হবেই বা না কেন ইয়োর এক্সেলেন্সি? তাদের তিন লপ্তে জমি আছে, এত বড় পরিবারের সকলেই খাটে, আর বুড়ো নিজেও দেখাশোনার ব্যাপারে পাকা লোক। আর তার ভাগ্যটাও এত ভাল যে সকলেই অবাক হয়ে যায়; কি ফসল, কি ঘোড়া, গরু, মৌমাছি, আর কি ছেলেপুলে—সব ব্যাপারেই সে ভাগ্যবান। সকলেরই বিয়ে দিয়েছে। আগে আমাদের ভিতর থেকেই বৌ খুঁজে নিত, কিন্তু এখন ইল্যুশ্‌কার বিয়ে দিয়েছে একটি স্বাধীন মেয়ের সঙ্গে—তার মুক্তির টাকা বুড়ো নিজেই দিয়েছে—আর সে বৌটিও খুব ভাল হয়েছে।"

"তারা তাহলে বেশ শান্তিতেই আছে?"

"বাড়ির কর্তা ঠিক থাকলেই সে বাড়িতে শান্তি থাকে। হুত্‌লভদের কথাই ধরুন—অবশ্য বৌরা উনোনের পাশে বসে ঝগড়া-ঝাটি করে, কিন্তু মাথার উপরে বাবা থাকায় ছেলেরা মিলেমিশেই আছে।"

ধাই একটু থামল।

"মনে হচ্ছে, বুড়ো এখন বড় ছেলে কার্পকে বাড়ির কর্তা বানাতে চাইছে। সে বলছে, 'আমি বুড়ো হচ্ছি। আমার কাজ এখন মৌমাছির দেখাশোনা করা।' ভাল কথা, কার্পও ভাল চাষী, সতর্ক চাষী, কিন্তু যতই হোক বুড়োর মত চালাতে পারবে না—সে বুদ্ধিই তার নেই।"

"তাহলে কার্প তো জমি ও জঙ্গল নিতে রাজী হতে পারে। তুমি কি মনে কর?" ধাইয়ের কাছ থেকে প্রতিবেশী সম্পর্কে সব খবরাখবর জেনে নেবার জন্য নেখ্‌ল্যুদভ তাকে প্রশ্ন করল।

"সে আশা খুব কম স্যার," ধাই জবাব দিল। "বুড়ো টাকার কথা কিছুই ছেলেকে বলে নি। সে যতদিন বেঁচে আছে আর বাড়িতেও টাকা আছে, ততদিন বুড়ো হাতের মুঠ আল্‌গা করবে না।"

"তাহলে তুমি মনে কর যে বুড়ো মত দেবে না?"

"সে ভয় পাবে।"

"কিসের ভয়?"

"মনিবের একজন ভূমিদাস কেমন করে একথা জানাজানি হতে দেবে

যে তার অনেক কিছু আছে ? দুর্দিনে টাকাপয়সা তো নষ্ট হতেও পারে ! সরাইওলার সঙ্গে ব্যবসা করতে গিয়ে সে ভুল করেছিল, কিন্তু তা নিয়ে মামলা করবে কেমন করে ? কাজেই টাকাটাই গেল। সঙ্গে সঙ্গে মালিকের সঙ্গে একটা মিটমাট করে নিল।"

"ওঃ, তাহলে এই ব্যাপার ?..." নেখ্‌ল্যুদভ বলল। "আচ্ছা. চলি।"

"বিদায় ইয়োর এক্সেলেন্সি। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।"

অধ্যায়—১৪

দুত্‌লভ-এর বাড়ির ফটকে পৌঁছে নেখ্‌ল্যুদভ ভাবল, "বাড়ি ফিরে গেলেই হত না ?" একটা অস্পষ্ট বিষাদ ও নৈতিক ক্লান্তি তাকে পেয়ে বসল।

কিন্তু ঠিক সেইমুহূর্তে নতুন কাঠের পাল্লাটা সশব্দে খুলে গেল, আর ফটকে দেখা দিল একটি লালচে মুখ সুদর্শন ছেলে ; বছর আঠারো বয়স, যাত্রীগাড়ির কোচয়ানের পোশাক, সঙ্গে তিনটে লোমশ শক্তসমর্থ ঘর্মাক্ত ঘোড়া। শনের মত চুলগুলোকে পিছনে ঠেলে দিয়ে সে অভিবাদন জানাল।

"তোমার বাবা বাড়ি আছে ইলিয়া ?" নেখ্‌ল্যুদভ শুধাল।

আধ-খোলা ফটক দিয়ে একটার পর একটা ঘোড়াকে বের করতে করতে ছেলেটি বলল, "উঠোনের পিছনে মৌমাছির ঘরে বাবা আছে।"

"না, আমি যা ভেবেছি তাই করব, প্রস্তাবটা তাকে দেব, আমার যা করার তা করব," এই কথা ভেবে ঘোড়াগুলিকে বের হবার পথ করে দিয়ে সে দুত্‌লভের প্রকাণ্ড উঠোনটায় প্রবেশ করল। সার-মাটিটা সদ্য গাড়ি-বোঝাই করে পাঠানো হয়েছে : মাটিটা এখনও কাল ও ভেজা রয়েছে, এখানে-ওখানে, বিশেষ করে ফটকের কাছে, লালচে সার-মাটি ছড়িয়ে আছে। উঠোনে ও বড় চালাঘরটার নীচে অনেকগুলো গাড়ি, লাঙল, স্লেজ, বালতি, গামলা, ও চাষের নানা রকম জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা হয়েছে। চওড়া, শক্ত আড়ার নীচে ছায়ায় পায়রাগুলো উড়ে উড়ে ডাকছে। সর্বত্র সার ও আলকাতরার গন্ধ। এক কোণে কার্প ও ইগ্‌নাত লোহার কাঠামোওলা বড় একটা তিন-ঘোড়ার গাড়ির নীচে একটা নতুন আড়কাঠ লাগাচ্ছে। দুত্‌লভের তিন ছেলের মধ্যে চেহারার বেশ মিল আছে। ছোট ইলিয়ার মুখে দাঁড়ি নেই, কিছুটা বেঁটে, লালচে, ও অন্য দুজনের তুলনায় পোশাক-পরিচ্ছদে ফিটফাট। দ্বিতীয় ইগ্‌নাত একটু লম্বা, রং ময়লা, ছুঁচলো দাঁড়ি ; পরনে বুট, কোচয়ানের শার্ট ও টুপি থাকলেও তার পোশাকে ছোটর মত পারিপাট্য নেই। বড় কার্প আরও বেশী লম্বা, পায়ে বাকলের জুতো, গায়ে গ্রেটকোট ও পট্টিহীন শার্ট। মুখে লম্বা লাল দাড়ি ; দেখতে শুধু গম্ভীর নয়, বেশ বিষণ্ণও বটে।

সে মনিবের কাছে এগিয়ে এসে অদ্ভুতভাবে মাথাটা একটু নুইয়ে জিজ্ঞাসা করল, "বাবাকে ডেকে দেব কি ইয়োর এক্সেলেন্সি?"

"না, আমি নিজেই সেখানে গিয়ে সেখানকার ব্যবস্থাগুলি দেখব।...কিন্তু তোমাকে আমার কিছু বলার আছে।" ইগ্‌নাত যাতে কথাগুলি শুনতে না পায় সেজন্য উঠোনের বিপরীত দিকে সরে গিয়ে নেখ্‌ল্যুদভ কথাটা বলল।

এই দুটি চাষীর আত্মবিশ্বাস ও আচরণে কিছুটা গর্বের ভাব লক্ষ্য করে এবং ধাই তাদের সম্পর্কে যেসব কথা বলেছে তা স্মরণ করে তরুণ মনিবটি এতই বিব্রত বোধ করল যে এখানে যে কাজের কথা বলবে মনে করে এসেছে সেটা বলা খুব সহজ বলে তার মনে হল না। নিজেকেই যেন কিছুটা অপরাধী বলে মনে হতে লাগল; তাই একজনের অগোচরে আর একজনকে কথাটা বলাই তার কাছে সহজ বলে মনে হল। মনিব তাকে এক কোণে ডাকছে দেখে অবাক হলেও কার্প তার সঙ্গে এগিয়ে গেল।

একটু সংকোচের সঙ্গেই নেখ্‌ল্যুদভ শুরু করল, "ব্যাপারটা এই। আমি জানতে চাইছি, তোমাদের কি অনেক ঘোড়া আছে?"

পিঠ চুলকে কার্প সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, "পাঁচখানা 'ত্রয়কা' চালাবার মত ঘোড়া তো আমাদের রাখতেই হয়; তাছাড়া বাচ্চা-কাচ্চাও আছে।"

"তোমার ভাইরাও কি যাত্রীগাড়ি চালায়?"

"তিনটে 'ত্রয়কা' দিয়ে আমরা যাত্রী-গাড়ি চালাই, আর ইলিয়া গিয়েছিল সার-বোঝাই গাড়ি নিয়ে; সে তো এইমাত্র ফিরল।"

"কাজটা বেশ লাভজনক তো? কি রকম উপার্জন হয়?"

"উপার্জন ইয়োর এক্সেলেন্সি? কোনরকমে নিজেদের চলে যায়, আর ঘোড়াগুলোরও খাবার জোটে—আর সেটাই ঈশ্বরের দয়া।"

"তাহলে তোমরা অন্য কিছু কর না কেন? তোমরা তো জঙ্গল কিনতে পার, বা জমি-বিলি নিতে পার।"

"তা তো বটেই ইয়োর এক্সেলেন্সি, সুবিধামত জমি পেলে তো খাজনা-বিলিতে নিতেই পারি।"

"সেই প্রস্তাবই আমি করতে চাই। গাড়ির ব্যবসায় যখন খাওয়া-পরার বেশী কিছু হয় না, তখন আমার কাছ থেকে ত্রিশ দেসিয়া তিন-এর মত জমি খাজনা-বিলিতে নাও না কেন? সাপভ্‌-এর ওদিককার সব জমি আমি তোমাদের দিচ্ছি, তাই নিয়ে বেশ বড় মাপের খামারের কাজ শুরু কর।"

একটা খামারের কথা নেখ্‌ল্যুদভ অনেকদিন থেকেই ভেবে আসছে; তাই এবার সে বিনা সংকোচে তার প্রস্তাবটা বুঝিয়ে বলতে শুরু করল। কার্প গভীর মনোযোগ দিয়ে মনিবের কথাগুলি শুনতে লাগল।

কথা শেষ করে কার্প-এর জবাব শুনবার জন্য নেখ্‌ল্যুদভ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। কার্প বলল, "হুজুরের কাছে আমরা খুবই কৃতজ্ঞ।

প্রস্তাবটা খারাপ নয়। হাতে চাবুক নিয়ে গাড়ি চালানো অপেক্ষা জমিতে কাজ করা একজন চাষীর পক্ষে অনেক ভাল কাজ। অপরিচিত লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে গিয়ে আমাদের মত লোকরা অনেক সময় খারাপ হয়ে যায়। চাষীর কাছে জমির কাজের চাইতে কোন কিছুই ভাল নয়।"

"তাহলে এবিষয়ে তোমার কি মত ?"

"যতদিন বাবা বেঁচে আছে ততদিন আমার আর মতামত কি ইয়োর এক্সেলেন্সি ? বাবা যা মত করবে তাই হবে।"

"আমাকে মৌমাছির ঘরে নিয়ে চল। তার সঙ্গেই কথা বলব।"

"এদিকে আসুন," পিছনের গোলাবাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে কার্প বলল। একটা নীচু দরজা খুলে ধরল। মনিব ঢুকবার পরে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে সে ইগ্‌নাতের কাছে ফিরে গিয়ে তাদের আগেকার কাজে হাত লাগাল।

অধ্যায়—১৫

নেখ্‌ল্যুদভ মাথা নীচু করে চালাঘরের নীচু দরজাটা পেরিয়ে উঠোনের ওপারে মৌমাছি ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। খড় ও কঞ্চি দিয়ে হাল্কা করে গড়া বেড়া দিয়ে ঘেরা একটা ছোট্ট জায়গায় বোর্ডের টুকরো দিয়ে ঢাকা মৌচাকগুলি সুন্দরভাবে সাজানো রয়েছে। সোনালী মৌমাছিগুলি গুন-গুনিয়ে চাকের চারপাশে ঘুরছে; জুন মাসের সূর্যের তপ্ত উজ্জ্বল রোদে জায়গাটা যেন ভেসে যাচ্ছে। দরজা থেকে একটা পায়ে-চলা পথ চলে গেছে একটা কাঠের বেদীর দিকে; বেদীর উপরে একটি রাঙতায় মোড়া দেবমূর্তি সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে। কয়েকটা ঝাকড়া লেবু গাছের মাথা পাশের বাড়ির খড়ের ছাদের উপর দিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে; তাদের ঘন সবুজ পাতার অস্পষ্ট মর্মর ধ্বনি মৌমাছিদের গুঞ্জণের সঙ্গে মিশে গেছে। নতুন-ছাওয়া কাঠের বাড়ির দরজায় একটি ন্যুব্জদেহ বেঁটে বুড়ো মানুষ দাঁড়িয়ে আছে; তার পাকা চুলে ঢাকা মাথায় একটা টাক; টাকটা সূর্যের আলোয় চকচক করছে। দরজার কেঁচর-কেঁচর শব্দ শুনে বুড়ো মুখটা ফেরাল; আলখাল্লার আস্তিনে রোদে-পোড়া ঘর্মাক্ত মুখটা মুছে হাসি-খুশি মুখে মনিবের দিকে এগিয়ে গেল।

রৌদ্রালোকিত মৌমাছির ঘরটা বেশ শান্ত ও আরামদায়ক; পাকা-চুল বুড়ো লোকটির চোখের চারপাশের চামড়া কুঁচকে গেছে; তার খালি পায়ে বড় মাপের জুতো; স্বাভাবিক আত্মতুষ্টির হাসি হেসে সে থপথপিয়ে এগিয়ে গেল মনিবকে নিজের বাড়িতে স্বাগত জানাতে। লোকটি এতই সরল-হৃদয় ও দয়াশীল যে মুহূর্তের মধ্যে নেখ্‌ল্যুদভ সকাল বেলাকার দুঃখের মনোভাবটা ভুলে গেল; বহুবাঞ্ছিত স্বপ্ন যেন স্পষ্ট হয়ে তার চোখের সামনে ফুটে উঠল।

তার মনে হল, তার সব চাষীরাই বুড়ো ফুত্‌লভের মত অবস্থাপন্ন ও দয়ালু; তাকে দেখে সকলেই আন্তরিকতার সঙ্গে মনের সুখে হাসছে, কারণ নিজ নিজ সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য তারা সকলেই একমাত্র মনিবের কাছেই ঋণী।

বেড়ার গা থেকে বাকলের সঙ্গে জড়ানো মধুর গন্ধে ভরা একটা নোংরা কাপড়ের থলে মনিবের দিকে এগিয়ে দিয়ে বুড়ো বলল, "ইয়োর এক্সেলেন্সি কি এই জালটা নেবেন? মৌমাছিগুলো এখন খুব রেগে আছে, হুল ফোটাতে পারে।" তারপর মৃদু হেসে বলল, "মৌমাছিরা আমাকে চেনে, তাই আমাকে কামড়ায় না।"

অকারণেই হেসে নেখ্‌ল্যুদভ বলল, "তাহলে আমিও ওটা চাই না। ওরা কি এখনও ঝাঁক বেঁধে উড়ছে?"

"ঠিক ঝাঁক বেঁধে উড়ছে না স্যার দিমিত্রি নিকোলায়েভিচ," বুড়ো জবাব দিল, "আরে, ওরা তো সবে কাজ শুরু করেছে। জানেন তো এবার কি রকম ঠাণ্ডা পড়েছে।"

একটা মৌমাছি চুলের মধ্যে ঢুকে পড়ায় নেখ্‌ল্যুদভ সেটাকে তাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করল।

"দয়া করে হাত ছুঁড়বেন না, তাতে ফল আরও খারাপ হবে," বুড়ো বলল। "ওর চাইতে জালটা নিলেই কি ভাল করতেন না?"

মৌমাছির কামড়ে নেখ্‌ল্যুদভের বেশ কষ্ট হচ্ছিল; তবু ছেলেমানুষী অহংকারের বশে সেকথা স্বীকার না করে মৌচাক গড়ার ব্যাপারে **Maison Rustique** বইতে যা পড়েছে সেই কথাই বুড়োকে বলতে লাগল। ঠিক সেই সময় একটা মৌমাছি তার ঘাড়ে হুল ফুটিয়ে দেওয়াতে সে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল এবং কথার মাঝখানেই থেমে গেল।

পিতৃসুলভ দৃষ্টিতে মনিবের দিকে তাকিয়ে বুড়ো বলল, "কথাটা সত্যি স্যার দিমিত্রি নিকোলায়েভিচ; বইতে ওইরকমই লেখে বটে। কিন্তু এও তো হতে পারে যে এসব ভুল করে লেখা হয়। হয়তো তারা বলে, 'সে আমাদের পরামর্শ মত কাজ করবে, আর তারপর আমরা তাকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করব।' তাও হয়ে থাকে। মৌমাছিরা কোথায় চাক বানাবে সেটা কি কেউ তাদের শেখাতে পারে? সেটা তারা নিজেরাই ঠিক করে নেয়।" বলতে বলতে সে কয়েকটা মৌমাছিকে নিজের ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলল। মৌমাছিগুলো তাকে কামড়াল না, কিন্তু নেখ্‌ল্যুদভ সেখান থেকে এক দৌড়ে না পালিয়ে থাকতে পারল না; তারা তাকে তিন জায়গায় হুল ফুটিয়েছে; তার মাথা ও গলার চারধারে অনবরত গুন গুন করছে।

দরজার দিকে হাঁটতে হাঁটতে সে শুধাল, "তোমার কতগুলো মৌচাক আছে?"

ফুত্‌লভ হেসে জবাব দিল, "ঈশ্বর যতগুলো দিয়েছেন। কি জানেন স্যার,

গুগুলো পোশা উচিত না। মৌমাছিরা সেটা পছন্দ করে না। ভাল কথা ইয়োর এক্সেলেন্সি, আপনাকে একটা কথা বলতে চাই। কথাটা আপনাদের খাইয়ের স্বামী ও সিপকে নিয়ে—আপনি যদি তাকে একটু বলে দেন। একই গ্রামে থেকে প্রতিবেশীর সঙ্গে এরকম ব্যবহার করাটা অন্যায়।"

"কি হয়েছে ?···আঃ, ওরা যে এখনও হুল কোটাচ্ছে!" দরজার হাতলে হাত রেখে মনিব বলল।

মনিবের মুখভঙ্গী লক্ষ্য না করেই বুড়ো বলতে লাগল, "দেখুন, প্রত্যেক বছর সে আমার বাচ্চা মৌমাছিদের মধ্যে তার মৌমাছিগুলোকে ছেড়ে দেয়। তাদের তো বেড়ে ওঠার সুযোগ দিতে হবে, কিন্তু অপরিচিত মৌমাছিগুলো চাকের মধ্যে ঢুকে মোম খেয়ে নেয়।"

"ঠিক আছে···পরে দেখব···এখনই···" নেখ্‌ল্‌যুদভ তো-তো করে কথাগুলি বলল ; তারপর যন্ত্রণা সইতে না পেরে দুই হাত নাড়তে নাড়তে দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল।

মনিবের পিছন পিছন উঠোনে নেমে বুড়ো বলল, "মাটি দিয়ে জায়গাটা রগড়ে দিন, তাহলেই ঠিক হয়ে যাবে।" মনিব মাটি তুলে হুল ফোটানো স্থানে ঘষতে লাগল। তারপর যখন চোখ তুলে দেখল যে কার্প ও ইগ্‌নাত্‌ মোটেই তার দিকে তাকাচ্ছে না তখন তার মুখটা লাল হয়ে উঠল ; সক্রোধ ভ্রূকুটি ফুটে উঠল তার মুখে।

অধ্যায়—১৬

মনিবের ক্রুদ্ধ দৃষ্টিকে না দেখার ভান করে অথবা সত্যি সত্যি না দেখে বুড়ো বলল, "আমি শুধু ইয়োর এক্সেলেন্সিকে বলতে চাই···"

"কি বলতে চাও ?"

"দেখুন, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমাদের কয়েকটা ঘোড়া আছে, একটা মজুরও আছে, কাজেই আমাদের দ্বারা মনিবের কাজে কোনরকম অবহেলা হবে না।"

"আরে, আসল কথাটা কি ?"

"আপনি যদি দয়া করে মুক্তি-পণ নিয়ে আমার ছেলেদের আপনার কাজ করা থেকে মুক্তি দেন তাহলে ইলিয়া ও ইগ্‌নাত্‌ তিন জোড়া ঘোড়া নিয়ে সারা গরম কালটা গাড়ি চালিয়ে কিছু রোজগার করতে পারে।"

"তারা কোথায় যাবে ?"

ইতিমধ্যে ঘোড়াগুলোকে চালাঘরের সঙ্গে বেঁধে রেখে ইলিয়া এসে বাবার পাশে দাঁড়িয়েছে। সে বলে উঠল, "দেখুন, সেটা অবস্থার উপর নির্ভর করে। কাদ্‌মিন্‌স্কির ছেলেরা আটখানা ত্রয়কা নিয়ে রোমেনে গিয়ে-

ছিল ; তুয়কা প্রতি প্রায় ত্রিশ রুবল নিয়ে ফিরে এসেছে। তাছাড়া, ওডেসা আছে ; লোকে বলে সেখানে পশুর খাদ্য খুব সস্তা।"

বুড়োর দিকে ফিরে মনিব বলল, "আমিও তো ঐ বিষয়েই তোমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছি।" কায়দা করে খামারের কথাটা তুলবার চেষ্টা করে বলল, "আচ্ছা বল তো, বাইরে গিয়ে গাড়ি চালানো কি বাড়িতে ক্ষেতি করার চাইতে বেশী লাভজনক ?"

সবেগে মাথার চুল পিছনে সরিয়ে দিয়ে ইলিয়া আবার বলল, "অনেক বেশী লাভজনক ইয়োর এক্সেলেন্সি। বাড়িতে তো ঘোড়ার খাবারই জোটে না।"

"এক গ্রীষ্মে তুমি কত রোজগার করতে পারবে ?"

"তা—ধরুন—বসন্তকালে তো পশুখাদ্যের দাম বেশ চড়ে যায়—তবু আমরা কিয়েভে গাড়িতে মাল বোঝাই করেছি, কুর্স্ক-এ মস্কোর জন্ত ভাঙা যই বোঝাই করেছি, নিজেরা খেয়েছি-থেকেছি, ঘোড়াগুলোকে পেট ভরে খাইয়েছি, আর পনেরো রুবল নিয়ে বাড়ি ফিরেছি।"

মনিব পুনরায় বুড়োকে লক্ষ্য করেই বলল, "সৎপথে থেকে কাজকর্ম করায় তো কোন ক্ষতি নেই, তা সে যেখানেই হোক না কেন ; কিন্তু আমার মনে হয় অন্য কাজও তো পাওয়া যেতে পারে।" পরে কার্পের কথার পুনরাবৃত্তি করে বলল, "গাড়ি চালানোর কাজ নিলে ছেলেকে যেখানে-সেখানে যেতে হয়, নানা রকম মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়, আর তার ফলে সে গোল্লায়ও যেতে পারে।"

মৃদু হেসে বুড়ো জবাব দিল, "আমরা তো চাষী, গাড়ি চালানো ছাড়া আর কি কাজই বা করতে পারি ? ও কাজ ভালভাবে করতে পারলে যথেষ্ট খাবার জোটে, ঘোড়াগুলোও পেট ভরে খেতে পায়। আর—গোল্লায় যাওয়ার কথা যদি বলেন, তো ছেলেরা তো এই প্রথম ও কাজে যাচ্ছে না, আর আমি নিজেও তো ও কাজে গিয়েছি, কারও কাছ থেকে খারাপ কিছু পাই নি—ভাল ছাড়া কিছু জোটে নি।"

"বাড়িতে থেকেও তো যথেষ্ট কাজ করতে পার।"

ইলিয়া উত্তেজিতভাবে বলে উঠল, "তা কি করে করব ইয়োর এক্সেলেন্সি ? আমরা তো এই পরিবেশেই জন্মেছি, এই কাজই জানি, এই কাজই আমাদের উপযোগী : গাড়ি চালানোটাই আমাদের কাছে সব চাইতে মজার কাজ ইয়োর এক্সেলেন্সি।"

"মহামান্য কি দয়া করে একবার আমাদের কুড়েঘরে যাবেন ? অনেক দিন তো যান নি," নীচু হয়ে অভিবাদন জানিয়ে বুড়ো কথাগুলি বলল, আর ছেলেকে কি যেন ইঙ্গিত করল। ইলিয়া ছুটে কুড়েঘরে ঢুকে গেল ; নেখ্‌ল্যুদভকে সঙ্গে নিয়ে বুড়ো তার পিছন পিছন গেল।

অধ্যায়—১৭

ঝুঁড়ে ঘরে ঢুকে বুড়ো আবার অভিবাদন জানাল, আলখাল্লার আস্তিন দিয়ে সামনের বেঞ্চিটার ধুলো মুছে দিল, তারপর হেসে শুধাল :

ইয়োর এক্সেলেন্সিকে কি খেতে দেব বলুন ?"

ঘরটা পরিচ্ছন্ন, বেশ বড়, ছাদের কাছে শোবার জায়গা আছে, পাটাতন আছে। একটা চিম্‌নিও আছে। নতুন কাঠের বেঞ্চি ও খাটিয়াগুলো এখনও ব্যবহারে মসৃণ হয় নি ; মাটির মেঝে এখনও পায়ে পায়ে শক্ত হয়ে ওঠে নি। ইলিয়ার স্ত্রী একহারা চেহারার একটি চাষী যুবতী ; ডিম্বাকৃতি মুখে কিছুটা স্বপ্নের আমেজ। একটা পাটাতনের উপর বসে ছাদ থেকে ঝোলানো একটা দোলনাকে দোল দিচ্ছে। দোলনায় একটি শিশু চোখ বুজে হাত-পা ছড়িয়ে ধীরে ধীরে শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে। কার্পের স্ত্রী মোটাসোটা, গালদুটো লাল ; উনুনের পাশে বসে একটা কাঠের বাটিতে পেঁয়াজের খোসা ছাড়াচ্ছে ; জামার আস্তিন কনুই অবধি তোলা ; রোদে-পোড়া হাত ও কব্জি দেখা যাচ্ছে। মুখভর্তি দাগ একটি গর্ভবতী নারী আস্তিনে মুখ ঢেকে উনুনের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের ভিতরটা গরম ; রোদের তাপ ছাড়াও আছে উনুনের তাপ ; সদ্য-সেঁকা রুটির একটা তীব্র গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। উপরের শোবার তাক থেকে দুটি ছেলেমেয়ে কৌতুহলী চোখ মেলে তাকিয়ে আছে।

এই সমৃদ্ধির ছবি দেখে নেখ্‌ল্‌য়ুদভ খুশি হল ; তবু এই সব নারী ও ছেলেমেয়েরা তার দিকেই তাকিয়ে আছে দেখে তার খুবই অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। মুখ লাল করে সে একটা বেঞ্চিতে বসে পড়ল।

"আমাকে একটুকরো গরম রুটি দাও, ওটা আমি পছন্দ করি," বলতে বলতেই মনিবের মুখখানি আরও রাঙা হয়ে উঠল।

কার্পের স্ত্রী রুটির একটা বড় টুকরো কেটে প্লেটে করে মনিবের হাতে দিল। নেখ্‌ল্‌য়ুদভ কোন কথা বলল না ; কি বলবে তাই তো জানে না ; মেয়েরাও চুপচাপ ; বুড়ো মৃদু মৃদু হাসছে।

"সত্যি তো, আমার এত লজ্জা কিসের—আমি যেন একটা অন্যায় কিছু করে ফেলেছি ?" নেখ্‌ল্‌য়ুদভ ভাবল। "কেন ওদের কাছে একটা খামারের কাজ শুরু করার প্রস্তাব দিচ্ছি না ? কী-যে বোকামি···!" তবু সে চুপ করেই রইল।

বুড়ো বলল, "তাহলে স্যার, ছেলেদের ব্যাপারে কি হুকুম হয় ?"

হঠাৎ সাহস অর্জন করে নেখ্‌ল্‌য়ুদভ বলে উঠল, "দেখ, আমি তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি, ওদের বাইরে না পাঠিয়ে এখানেই কাজ খুঁজে নিতে বল। আসলে তোমার জন্য আমি কি ভেবে রেখেছি জান ? রাষ্ট্রীয় জঙ্গলে একটা বাগান ও কিছু জমি কেনার ব্যাপারে তুমি আমার সঙ্গে হাত মেলাও।"

বুড়ো বাধা দিয়ে বলল, "তা কি করে হবে ইয়োর এক্সেলেন্সি ? আমি

টাকা পাব কোথায় ?"

নেখ্‌ল্যুদেভ বলল, "আরে, একটা ছোট বাগান তো, শ' দুই রুবলের মত লাগবে।"

বুড়ো কঠিন হাসি হাসল।

বলল, "টাকা থাকলে তার কিনে ফেলতে বাধা কিসের ?"

মনিব তিরস্কারের সুরে বলল, "এখনও এ টাকাটা তোমার নেই ?"

দরজার দিকে তাকিয়ে বুড়ো সখেদে বলল, "হায় ইয়োর এক্সেলেন্সি, স্যার! পরিবারের ভরনপোষণের জন্ত আমাকে অনেক কাজ করতে হয়। বাগান কেনা আমাদের কাজ নয়।"

নেখ্‌ল্যুদেভ তথাপি বলল, "কিন্তু তোমার তো টাকা আছে; সেটাকে ফেলে রেখে লাভ কি ?"

বুড়ো মানুষটি হঠাৎ খুব উত্তেজিত হয়ে উঠল; তার চোখ দুটি চক্‌চক্‌ করতে লাগল; দুটি কাঁধ কুঁচকে যেতে শুরু করল।

কাঁপা গলায় সে বলতে লাগল, "হয় তো কোন দুষ্টু লোক আমার সম্পর্কে একথা বলেছে; কিন্তু বিশ্বাস করুন, ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে বলছি, ইলিয়া যে পনেরোটি রুবল নিয়ে বাড়ি এসেছে তাছাড়া আর কিছু যদি আমার থাকে তো আমার চোখ যেন ফেটে চৌচির হয়ে যায়, আমি যেন এইখানেই মাটির নীচে সেঁধিয়ে যাই। এমন কি আমাকে তো পোল-ট্যাক্সও দিতে হবে। আপনি নিজেই তো জানেন এই কুড়েঘরটি তৈরি করেছি..."

"আরে, ঠিক আছে, ঠিক আছে!" উঠতে উঠতে মনিব বলল: "বিদায় বন্ধুরা।"

অধ্যায়—১৮

অবহেলিত বাগানের ছায়াঢাকা পথে বড় বড় পা ফেলে চলতে চলতে অন্তমনস্কভাবে গাছের পল্লব ও পাতা ছিঁড়তে ছিঁড়তে নেখ্‌ল্যুদেভ মনে মনে বলল, "হে ঈশ্বর, ঈশ্বর আমার! জীবনের লক্ষ্য ও কর্তব্য সম্পর্কে যত স্বপ্ন আমি দেখেছি সবই কি তাহলে অর্থহীন ? জীবনের এই পথের পরিকল্পনা যখন করেছিলাম তখন ভেবেছিলাম এ-চিন্তা প্রথম যখন মাথায় এসেছিল তখন যে নৈতিক সন্তুষ্টি বোধ করেছিলাম সে অভিজ্ঞতা চিরদিন আমার হবে। তাহলে আজ কেন এমন মন-মরা ভাব, এত দুঃখ ও নিজেকে নিয়ে এত অসন্তোষ বোধ করছি ?" এক বছর আগেকার সুখের মুহূর্তগুলি অসাধারণ স্পষ্টতায় বিশিষ্ট হয়ে তার স্মৃতি-পটে ভেসে উঠল।

মে মাসের সেই সকালে খুব ভোরেই সে ঘুম থেকে উঠেছিল; বাড়ির অন্ত কেউ তখনও ঘুম থেকে জাগে নি। যৌবনের এক অস্পষ্ট গোপন

আবেগে বেদনার্ত ও উত্তেজিত অন্তরে প্রথম গেল বাগানে, পরে সেখান থেকে জঙ্গলের মধ্যে। শান্ত প্রকৃতির মধ্যে অনেকক্ষণ একা একা ঘুরে বেড়াল। বুকের মধ্যে একটা অস্পষ্ট অনুভূতির উচ্ছ্বাস, কিন্তু মুখে তার কোন ভাষা নেই। অজানার আকর্ষণে উদ্বুদ্ধ যৌবন-কল্পনার একটি স্নুলাঙ্গী নারীর ছবি সে মনে মনে আঁকল—তার মনে হল সেখানেই রয়েছে তার অনুচ্চারিত কামনার পরিতৃপ্তি। কিন্তু গভীরতম আর এক অনুভূতি তাকে বলল: "তা নয়;" তাকে বাধ্য করল অন্য কিছুর সন্ধান করতে। তার অনভিজ্ঞ, উদ্দীপ্ত মন অমূর্তের রাজ্যে ধাপে ধাপে উপরে উঠতে উঠতে এক সময়ে বুঝিবা আবিষ্কার করে ফেলল অস্তিত্বের বিধানকে; সগর্ব আনন্দে সেই চিন্তায়ই সে মগ্ন হয়ে রইল। কিন্তু পুনরায় উর্ধ্বতর আর একটি অনুভূতি তাকে বলল: "তা নয়"; আবারও সে উত্তেজিত বোধ করল, নামল অনুসন্ধানের পথে। তারপর একসময় চিন্তা ও অনুভূতিহীন অবস্থায় একটা গাছের নীচে চিৎ হয়ে শুয়ে মাথার উপরকার সীমাহীন আকাশের বুকে চলমান সকালের মেঘের দিকে তাকিয়ে রইল। সহসা অকারণেই তার দুই চোখ জলে ভরে গেল; কেন তা ঈশ্বরই জানেন, একটা নির্দিষ্ট চিন্তা তার মনে এল, তার সমস্ত অন্তরকে ভরে দিল—সে ভাবল প্রেম ও কল্যাণই সত্য ও সুখ—সেটাই একমাত্র সত্য ও একমাত্র সুখ যা এ জগতে সম্ভব। এবার কিন্তু গভীরতর কোন অনুভূতি বলল "না: তা নয়", আর সেও উঠে এই নতুন চিন্তাকে সপ্রমাণ করতে সচেষ্ট হল। নব-আবিষ্কৃত পূর্ণ সত্যের আলোয় জীবনের দিকে না তাকিয়ে সে উচ্ছ্বাসের সঙ্গে নিজের মনেই বলে উঠল, "এই তো ঠিক! এই! ঠিক এই!" আপন মনে বলতে লাগল: "এতদিন যা জেনেছি, ভালবেসেছি, বিশ্বাস করেছি সেসব কত তুচ্ছ। প্রেম, আত্মত্যাগ—সেই তো একমাত্র সুখ!" হেসে উঠে সে দুই হাত মেলে ধরল।

চোখের সামনে দেখা দিল সারা জীবনের এক বিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্র। সে জীবন সে কাটাবে কল্যাণের সাধনায়, আর তার ফলেই সুখী হবে। কর্মক্ষেত্রকে খুঁজে নেবার কোন দরকার নেই—কর্মক্ষেত্র তো তার সম্মুখেই রয়েছে; তার তো একটা প্রত্যক্ষ কর্তব্য রয়েছে—অনেক ভূমিদাসের মালিক সে···তার সম্মুখে পড়ে আছে এক আনন্দময়, সকৃতজ্ঞ কর্তব্য! "এই সহজ, সরল মানুষগুলিকে প্রভাবিত করা; দারিদ্র্যের হাত থেকে তাদের রক্ষা করা, তাদের জীবনে প্রাচুর্য এনে দেওয়া, যে শিক্ষা আমি পেয়েছি সেটা তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারজাত পাপ থেকে তাদের মুক্ত করা, তাদের নীতিবোধকে উদ্বুদ্ধ করা, সত্যকে ভালবাসতে শেখানো···কী এক উজ্জ্বল, সুখের ভবিষ্যৎ! আর আমি—নিজের সুখের জন্য এসব করলেও বিনিময়ে পাব তাদের কৃতজ্ঞতা, দিনের পর দিন একটু করে এগিয়ে যাব আমার নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে। এক আশ্চর্য ভবিষ্যৎ! এতকাল কেন যে এটা

চোখে পড়ে নি ?”

সঙ্গে সঙ্গে সে আরও ভাবল, “আর এসব কিছু ছাড়াও একটি নারীকে ভালবেসে, পারিবারিক জীবনের আনন্দকে উপভোগ করে নিজে সুখী হবার পথে কে আমাকে বাধা দিচ্ছে ?” যৌবনসুলভ কল্পনায় একটি অধিকতর মোহময় ভবিষ্যতের ছবি সে এঁকে ফেলল। “আমি আর আমার স্ত্রী, যাকে আমি এত ভালবাসি যেমনটি এর আগে পৃথিবীতে কেউ কাউকে ভালবাসে নি, আমরা দু'জন এই কাব্যময় শান্ত প্রকৃতির মাঝখানেই বেঁচে থাকব—সঙ্গে থাকবে আমাদের ছেলেমেয়েরা, আর হয় তো আমার বুড়ি মাসি। আমরা পরস্পরকে ভালবাসব, সন্তানকে ভালবাসব, দু'জনই জানব যে আমাদের জীবনের লক্ষ্যই কল্যাণসাধন। সেই লক্ষ্যপথে এগিয়ে যেতে আমরা পরস্পরকে সাহায্য করব। সাধারণ সে ব্যবস্থাগুলি করব আমি, সব রকমে সাহায্য করব, খামার চালাব, একটা সঞ্চয়-ব্যাঙ্ক ও কারখানা চালাব ; আর আমার স্ত্রী তার সুন্দর ছোট্ট মাথাটি দুলিয়ে, একটি সাধারণ সাদা পোশাক সুন্দর পা দুটির উপর তুলে ধরে কাদার ভিতর দিয়ে হেঁটে যাবে চাষীদের স্কুলে, দাতব্য চিকিৎসালয়ে, সাহায্য পাবার অনুপযুক্ত হলেও কোন ভাগ্যহীন চাষীর কাছে, সর্বত্র নিয়ে যাবে সান্ত্বনা ও সাহায্য। ছেলেমেয়েরা, বুড়োরা, বুড়িরা—সকলেই তার প্রশংসা করবে, তাকে দেবদূতের মত দেখবে—ঈশ্বরের মত মনে করবে! তারপর সে ফিরে আসবে। আমি তাকে সজোরে আলিঙ্গন করব, তার দুটি সুন্দর চোখে, লজ্জারাঙা দুটি গালে, আর হাসি-ভরা গোলাপী ঠোঁটে ধীরে ধীরে চুমো খাব।”

অধ্যায়—১৯

“কোথায় গেল সেই সব স্বপ্ন ?”—জমিদারি পরিক্রমার পরে নিজের বাড়ির দিকে যেতে যেতে যুবকটি ভাবতে লাগল। “বৎসরাধিক কাল ধরে আমি সুখ খুঁজে ফিরেছি, কিন্তু কি পেয়েছি ? একথা ঠিক যে কখনও কখনও আমার মনে হয়েছে যে নিজেকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার অধিকার আমার আছে, কিন্তু এটা তো শুকনো যুক্তির সন্তোষমাত্র। না, সে কথাও সত্য নয়, নিজেকে নিয়েও আমি অসন্তুষ্ট! আমি অসন্তুষ্ট কারণ এত প্রচণ্ডভাবে সুখ চেয়েও এখানে আমি সুখ পাচ্ছি না। শুধু যে সুখ পাই নি তাই নয়, যা কিছু সুখদায়ক তার থেকেই আমি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছি। কেন ? কিসের জন্য ? এতে কার ভাল হয়েছে ? মাসি ঠিকই লিখেছিল যে অন্যকে সুখী করার চাইতে নিজে সুখী হওয়া অনেক সহজ। আমার চাষীরা কি অধিকতর ধনী হয়েছে ? তারা কি অধিকতর শিক্ষিত বা নৈতিক উন্নতির অধিকারী হয়েছে ? মোটেই না! আগের চাইতে তারা মোটেই ভাল হয় নি, শুধু

দিনের পর দিন আমারই কষ্ট বেড়েছে। যদি দেখতাম যে আমার পরিকল্পনা সফল হচ্ছে, বা আমি অনেকের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছি···কিন্তু না, আমি দেখছি শুধু মিথ্যা কর্মধারা, পাপ, সন্দেহ ও অসহায়তা। বৃথাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলির অপচয় করছি।" কথাগুলি ভাবতে ভাবতে তার মনে পড়ে গেল, ধাইয়ের কাছে সে শুনেছে প্রতিবেশীরা তাকে গলাকাটা-ওয়ালা বলে ডাকে; তার হাতে আজ কোন টাকা নেই; নতুন কেনা ঝাড়াই যন্ত্রটা অকেজো হয়ে পড়ে চাষীদের হাসির খোরাক জোগাচ্ছে; বিভিন্ন নতুন প্রকল্পে হাত দেওয়ার ফলে মর্টগেজের কিস্তি ঠিকমত দিতে না পারায় ভূমি-আদালতের কর্মচারি যেকোনদিন আসতে পারে তার সম্পত্তির তালিকা তৈরি করতে। সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ সমান স্পষ্টভাবে তার মনে পড়ল মস্কোর সেই ছোট ঘরটার কথা যেখানে একটিমাত্র মোমবাতির আলোয় ষোল বছরের প্রিয় বন্ধু ও সহকর্মীকে নিয়ে ছাত্র হিসাবে যে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে কাটিয়েছে। সেদিন তরুণ ছাত্র দুটির সামনে ভবিষ্যৎ ছিল কত স্বতন্ত্র! তখন ভবিষ্যৎ জীবন ছিল আনন্দে ভরা, বিচিত্র কর্মে ও উজ্জ্বল সাফল্যে ঠাসা, দুজনেরই মনে সন্দেহাতীত বিশ্বাস ছিল যে জগতের সেই শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদের দিকে তারা এগিয়ে চলেছে যার নাম—খ্যাতি!

বন্ধুর কথা মনে হতেই নেখ্‌লুদভ ভাবল, "সে তো এর মধ্যেই সেপথে পা রেখেছে—দ্রুত এগিয়ে চলেছে, আর আমি···"

কিন্তু ততক্ষণে বাড়ির দরজায় পৌঁছে সে দেখতে পেল জন দশেক বা তারও বেশী চাষী ও পারিবারিক ভূমিদাস নানা অনুরোধ নিয়ে তার জন্য দাঁড়িয়ে আছে, আর তখনই তার স্বপ্নের পরিবর্তে দেখা দিল বাস্তব সত্য।

তাদের মধ্যে আছে ছিন্নবস্ত্রা, আলুলায়িত বেশ, রক্তাক্ত দেহ একটি চাষী রমণী: চোখের জল ফেলতে ফেলতে সে অভিযোগ করল শ্বশুর তাকে মেরে ফেলতেই চেয়েছিল; আর আছে দুই ভাই—একটা খামারের ভাগাভাগি নিয়ে দু' বছর ধরে ঝগড়া চালাবার পরে এখন তারা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে বেপরোয়া ঘৃণা নিয়ে; আর আছে মাথাভর্তি পাকা চুল একটি পারি-বারিক ভূমিদাস, মাতাল হবার দরুণ তার হাত কাঁপছে, বাগানের মালী তার ছেলে তাকে ধরে এনেছে মনিবের কাছে দুশ্চরিত্রতার অভিযোগ শোনাতে; আর একটি চাষী এসেছে—সারা বসন্তকাল তার বউ কোন কাজ করে নি বলে সে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে; আর তার বউটা—এত রুগ্ন যে কথা বলতে পারছে না, ফটকের কাছে ঘাসের উপর বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, আর ময়লা ন্যাকড়া দিয়ে কোনরকমে জড়ানো একটা ফুলে-ওঠা ঘেয়ো পা বার বার দেখাচ্ছে···

নেখ্‌লুদভ সব অভিযোগ ও নালিশ শুনল; কাউকে পরামর্শ দিল, কারও ঝগড়া মিটিয়ে দিল, কাউকে বা কিছু প্রতিশ্রুতি দিল; তারপর ক্লান্তি, লজ্জা,

অসহায়তা ও বিমর্ষতার একটা মিশ্র অনুভূতি নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল।

অধ্যায়—২০

নেখ্‌লয়ুদভের ঘরটা বেশী বড় নয়। তাতে আছে পিতলের পেরেক-বসানো একটা পুরনো চামড়ার কোচ, অনুরূপ কয়েকটা হাতল-চেয়ার, পিতলের পাত লাগানো কারুকার্য-করা একটা সেকেলে তাসের টেবিল, আর পুরনো কালের একটা বড় ইংলিশ পিয়ানো—তার বাক্সটা হল্‌দেটে আর চাবি-গুলো জীর্ণ ও সরু। জানালার মাঝখানে ঝুলন্ত গিল্টি-করা ফ্রেমের একটা বড় আয়না। টেবিলের পাশে মেঝের উপর কাগজপত্র, বই ও হিসাবের খাতার বাণ্ডিল পড়ে আছে। মোটামুটিভাবে সারা ঘরটার চেহারাতেই একটা বিশৃংখলা ও বৈশিষ্ট্যহীনতার ছাপ। মস্ত বড় বাড়িটার অন্যান্য ঘরগুলোর সেকেলে আভিজাত্যের কঠোর ব্যবস্থার সঙ্গে এই ঘরটার অপরিচ্ছন্নতার ছাপ যেন একেবারেই সামঞ্জস্যহীন।

ঘরে ঢুকে নেখ্‌লয়ুদভ রাগতভাবে টুপিটাকে টেবিলের উপর ছুঁড়ে দিয়ে পিয়ানোর সামনে বসে পায়ের উপর পা রেখে মাথাটা নুইয়ে দিল।

একটি ঢ্যাঙা, সরু বৃদ্ধ স্ত্রীলোক ঘরে ঢুকল। তার মাথায় টুপি, পরনে ছাপা পোশাক ও একটা বড় শাল, সে বলল, "ইয়োর এক্সেলেন্সি কি এখন খাবেন?"

"না, এখন খাব না নার্স," বলে আবার সে চিন্তায় ডুবে গেল।

বুড়ি ধাই বিরক্তির সঙ্গে মাথা নেড়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

"আচ্ছা দিমিত্রি নিকোলায়েভিচ, আপনি এত মন-মরা হয়ে থাকেন কেন? এর চাইতেও বেশী গোলযোগ তো আছেই! সব ঠিক হয়ে যাবে—নিশ্চিত জানবেন সব ঠিক হয়ে যাবে..."

হাসবার চেষ্টা করে নেখ্‌লয়ুদভ বলল, "কিন্তু আমি তো মন-মরা হই নি। কে তোমার মাথার মধ্যে একথা ঢুকিয়েছে মলানিয়া ফিলোজেনভ্‌না?"

বুড়ি ধাই আদর করে উত্তর দিল, "আপনার কি মন খারাপ না হয়ে পারে—আমি কি কিছু দেখতে পাই না? সারাটা দিন একা-একা কাটান। সব কিছুতেই মনে এত আঘাত পান, আর সব কিছুর উপরেই নিজে নজর রাখতে চান—এখন তো কিছু খাচ্ছেন না বললেই চলে। এটা কি সঙ্গত? ...মাফ করবেন মনিব, আমি একটু বসছি," দরজার কাছে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে সে বলতে লাগল। "আহা, আপনি তো ওদের এত বেশী লাই দিচ্ছেন যে ওরা তো কারও তোয়াক্কা করে না। কোন মনিব কি এরকম ব্যবহার করে? এতে কারও ভাল হয় না; শুধু আপনি নিজের সর্বনাশ ডেকে

আনছেন, আর লোকগুলোকেও গোল্লায় দিচ্ছেন। আমাদের লোকজনরাই ঐ রকম; তারা এসব বোঝে না! অন্তত পক্ষে আপনার মাসির সঙ্গে দেখা করতে তো যেতে পারেন। তিনি ঠিকই লিখেছেন...”

নেখ্‌ল্যুদভ ক্রমেই আরও বেশী বিমর্ষ হয়ে পড়ল। হাঁটুর উপর কনুই রেখে ক্লান্তভাবে পিয়ানোর চাবিতে ডান হাতটা ছোঁয়াল। একটা কোন সুর বেজে উঠল, তারপর আর একটা, আরও একটা।...চেয়ারটা টেনে নিয়ে অপর হাতটা পকেট থেকে বের করে সে পিয়ানো বাজাতে শুরু করল। বাজনায় প্রস্তুতির অভাব পরিস্ফুট; সব সময় ঠিক শুদ্ধও নয়; অনেকটাই তুচ্ছ ও অতি সাধারণ; শুনলেই বোঝা যায় সুরের প্রতিভা তার নেই; তবু এই বাজনা তাকে একটা অস্পষ্ট, বিষণ্ণ সুখের স্বাদ এনে দিল। অতীতের অনেক স্মৃতি তার মনের মধ্যে এসে ভিড় করল। মুখ ঘুরিয়ে একবার ধাইয়ের দিকে তাকাল। তখনও সে দরজার পাশে বসে একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে, আর মাঝে মাঝে মাথাটা নাড়ছে। তারপরই হঠাৎ তার মনে হল সে যেন তিনটে ঘর্মাক্ত ঘোড়াকে দেখতে পাচ্ছে, আর দেখতে পাচ্ছে ইলিয়ার সুঠাম সমর্থ মূর্তি—মাথায় সুন্দর কোঁকড়া চুল, আনন্দে উজ্জল দুটি ছোট নীল চোখ, ঠোঁটে ও থুতনিতে সন্ত-গজানো হাল্কা রঙের গোঁফ-দাড়ি। তার মনে পড়ল, পাছে তাকে গাড়ি চালাতে না দেওয়া হয় তা ভেবে ইলিয়া কেমন ভয় পেয়ে গিয়েছিল তাও মনে পড়ে গেল। তারপরই হঠাৎ দেখতে পেল একটি কুয়াশা-ঢাকা ধূসর প্রত্যূষ, একটা পিচ্ছিল বড় রাস্তা, আর তিন ঘোড়ার গাড়ির একটা দীর্ঘ সারি। সুখাদ্য-পরিপুষ্ট শক্ত দেহ ঘোড়া-গুলো পিঠ বেঁকিয়ে, ঘণ্টা বাজিয়ে অসমান পথ বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে; পায়ের অসমান ক্ষুর দিয়ে পিচ্ছিল পথটাকে প্রাণপণে আকড়ে ধরছে। দ্রুত-গতিতে পাহাড়ি পথ বেয়ে নীচে নেমে গেল একটা ডাক-গাড়ি, আর বোঝাই গাড়িগুলোর ঘণ্টা-ধ্বনি বনের মধ্যে দূর হতে দূরে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

প্রথম গাড়ির চালকটি ছেলেমানুষী গলায় চেঁচিয়ে উঠল, “হেই, হেই, হেই!” তার টুপিতে একটা পিতলের নম্বর লাগানো; হাতের চাবুকটাকে মাথার উপরে অনবরত ঘোরাচ্ছে।

কার্পের মুখে লাল দাড়ি, চোখের দৃষ্টি বিষণ্ণ; মস্ত বড় বুট পরে প্রথম গাড়ির সামনের চাকার পাশাপাশি ভারী পা ফেলে ফেলে সে হাঁটছে। দ্বিতীয় গাড়িটার ভিতর থেকে ইলিয়া তার সুন্দর মুখখানি বের করল। চাকার ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ, ঘণ্টার টুং-টাং আওয়াজ, আর চীৎকার-চেঁচামেচির মধ্যে তিনটে ত্রয়কা ছুটে চলেছে। ইলিয়া মুখ সরিয়ে নিয়ে আবার আরাম করে ঘুমিয়ে পড়ল। ক্রমে সন্ধ্যা নামল—পরিষ্কার, আতপ্ত সন্ধ্যা। বোর্ড-লাগানো ফটকের ভিতর দিয়ে ক্লান্ত ত্রয়কাগুলি স্টেশন-চত্বরে ঢুকে একসঙ্গে ভিড় করে দাঁড়াল; প্রশস্ত চালাঘরের নীচে ঢুকে গেল বিশ্রাম নিতে। সুন্দর

মুখ, চওড়া বুক গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে ইলিয়া মনের আনন্দে কুশল-বিনিময় করল। গৃহকর্ত্রী শুধাল, "তোমরা কি অনেক দূর থেকে এসেছ? তোমরা কতজন রাতের খাবার খাবে?" উজ্জ্বল দুটি চোখ মেলে সে মনের সুখে সুন্দর তরুণটিকে দেখতে লাগল। এদিকে ঘোড়াগুলোর দেখাশুনা সেরে ইলিয়া ভিড়-ঠাসা ঘরটার ভিতর ঢুকে গেল, ক্রুশ-চিহ্ন আঁকল এবং একটি পরিপূর্ণ কাঠের বাটি সামনে নিয়ে বসে গৃহকর্ত্রী ও বন্ধুদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল। পরে তার রাতের থাকার ব্যবস্থা হল চালাঘরের নীচে। সেখান থেকে তারার ভরা খোলা আকাশ দেখা যায়। সেখানে সে শুয়ে পড়বে খড়ের সুগন্ধ শুঁকতে শুঁকতে; ঘোড়াগুলো এ-পা থেকে ও-পায়ে শরীরের ভর বদলে বদলে নাকের শব্দ করবে, আর কাঠের পাত্র থেকে জাবনা খাবে। সে খড়ের গাদার দিকে এগিয়ে গেল, পূব দিকে মুখ করে দাঁড়াল, চওড়া বুকের উপর বার ত্রিশেক ক্রুশ-চিহ্ন আঁকল, সুন্দর কোঁকড়া চুলকে মাথার পিছনে ঠেলে দিয়ে বার বিশেক "আমাদের পিতা" ও "প্রভু করুণা কর" আবৃত্তি করল, তারপর কোটটা দিয়ে মাথা পর্যন্ত সর্বাঙ্গ ঢেকে সমর্থ যৌবনোচিত গভীর ও নিশ্চিন্ত নিদ্রায় ঢলে পড়ল। তার দুই চোখে শহরের স্বপ্ন নেমে এল: সাধু-সন্ত ও তীর্থযাত্রীতে ঠাসা কিয়েভ, ব্যবসায়ী ও মালপত্রে ঠাসা রোমেন, ওডেসা ও সাদা পালে ভর্তি সুদূর নীল সমুদ্র, আর সোনালী ঘরবাড়ি এবং সাদা-বুক বাদামী রঙের তুর্কী রমণীর দলসহ সারগ্রাড (কনস্টান্তিনোপল্)—অদৃশ্য পাখায় ভর দিয়ে সে উড়ে চলল দূর থেকে দূরান্তরে। অবাধ মুক্ত গতিতে সে উড়ে চলল আরও আরও দূরে—নীচে দেখা যাচ্ছে উজ্জ্বল আলোয় স্নাত সোনালী শহরগুলো, তারকাখচিত নীল আকাশ, সাদা পাল তোলা নীল সমুদ্র। আহা, দূরে আরও দূরে উড়ে যেতে কত না আনন্দ, কত না মজা···

"চমৎকার!" নেখ্‌লয়ুদভ নিজের মনেই বলে উঠল; তারপরই মনে হল: "আমি কেন ইলিয়া হলাম না?"

॥ তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত ॥